খুলে বেরিয়ে গেল। টানাটানিতে গ্রীগরের সার্টটা কাঁধের কাছে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছিল। এই ফুরসুতে সেটা খুলে ফেলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তেই ঝড়ো মেঘের মত বৃদ্ধ আবার চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে গ্রীগরের পিঠের পানে চেয়ে সরোষে বললে—'এই বেজাত ছেলেকে আমি বিয়ে দিয়ে দোবোই? কালই যাবো মেয়ে দেখতে। মুখের ওপর ছেলে চোখ রাঙাবে। তাই দেখে আমায় বাঁচতে হবে।'

—'সার্টটা খুলে নি,' তার পর বিয়ে দিও'খন।'

—'আমি তোর বিয়ে দেবোই দেবো! গ্রামের একটা অকাট মূর্খ মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো!' সশব্দে দরজার কপাট বন্ধ হ'য়ে গেল। বৃদ্ধের পদ শব্দ সিঁড়িতে ক্ষীণতর হ'তে হ'তে অবশেষে মিলিয়ে গেল।

* * *

(৪)

সিত্রাকভ্ গ্রামের প্রান্তে ত্রিপল-ঢাকা গাড়ীগুলি সারিবদ্ধ ভাবে সাজান। প্রান্তরে অসম্ভব দ্রুততার মধ্যে একটি শ্বেতবর্ণের শহর গড়ে তোলা হয়েছে। চতুর্দ্দিকে সটান সোজা পথ চলে গেছে। কেন্দ্রস্থলের স্কোয়ারের চারি পাশে শান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে।

ট্রেনিং ক্যাম্পের স্বাভাবিক নিয়ম-মাফিক জীবন যাত্রা নিতান্তই একঘেয়ে। ভোরবেলা পাহারারত কসাকদল চারণভূমি থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে আসে; তার পর চলল সাফ করা, ক্রস করা, জিন লাগান, নাম ডাকা, প্যারেড ইত্যাদি। ক্যাম্পের স্টাফ্-কমাণ্ডার কর্কশস্বরে চেঁচামেচি ক'রে ঘুরে বেড়ায়। সামরিক কর্ম্মচারীগণ ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা করে। সার্জ্জেন্টরা তরুণ কসাকদের শিক্ষা দেবার বেলা হেঁকে অর্ডার দেয়। আক্রোমণোদ্দেশ্যে তাদের পাহাড়ের ও পাশে জড়ো করা হ'ল। সুকৌশলে তারা এগিয়ে এসে শত্রুকে ঘিরে ফেলল। এর পর চলল চাঁদমারি। তরুণ কসাকদল অসিখেলায় পরস্পরকে হারাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পাকা খেলোয়ার যারা, তারা ঝিমিয়ে ক্লান্তি দূর করছে।

ক্যাম্প শেষ হবার হপ্তাখানেক পূর্ব্বে আইভ্যান তোমিলিনের স্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে এলো। সঙ্গে ছিল কিছু খাবার, আর গ্রামের মুখরোচক দু-চারটি সংবাদ। প্রত্যুষেই সে আবার চলে গেল। কসাকরা যে যার প্রিয়জন কি আত্মীয়দের সম্ভাষণ কিং [illegible] দিশ তার মারফতে পাঠিয়ে দিলে।

একমাত্র স্টীফানের কোন সংবাদই সে নিয়ে যেতে পারলে না। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। রোগমুক্তির জন্য ভোড্কার মাত্রাটা এমন বেশীই হ'ল যে, পর দিন তোমিলিনের স্ত্রী তো দূরের কথা, বিশ্ব-দুনিয়ার সব কিছুই তার চোখে একাকার হয়ে গিয়েছিল। প্যারেডের সময়েও সে এল না। ডাক্তারের সহকারী তার অনুরোধে রক্ত বার ক'রে ফেলবার জন্য ডজনখানেক জোঁক তার বুকে লাগিয়ে দিলে। গাড়ীর চাকায় ঠেস দিয়ে বসে স্টীফান স্থির দৃষ্টিতে সেই শোণিত-পিপাসু জলোকাগুলির পানে চেয়ে ছিল। তোমিলিন এসে সসঙ্কোচে ডাকলে। স্টীফান ঘাড় ফেরাতেই বললে—'একটা কথা আছে।'

—'বল।'

—'আমার স্ত্রী এসেছিল এখানে। আজ ভোরেই চলে গেছে।'

—'বলিস্ কি? তার পর!'

—'তোমার স্ত্রীকে নিয়ে গাঁয়ে অনেক কথাই উঠেছে ভাই।'

—'বটে।'

—'মোটেই সুখবর নয়!'

—'হুঁ, তার পর।'

—'সে নাকি গ্রীগর মেলেকভকে নিয়ে…নিতান্ত… প্রকাশ্যভাবেই'…

মুহূর্ত্ত মধ্যে স্টীফানের মুখখানা ছাইয়ের মত বিবর্ণ হ'য়ে গেল। জোঁক কটাকে ছিঁড়ে, এক এক করে মাড়িয়ে পিষে ফেলে নীরবে সার্টের বোতাম আঁটকে দিলে। তার পরই আবার সশঙ্কিতভাবে তাড়াতাড়ি বোতাম খুলে দিলে। নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ওষ্ঠদ্বয় অবিরত কাঁপতে লাগল। ম্লান একটুক রূঢ় হাসি ঠোঁটের প্রান্তে মিলিয়ে

গেল। অবশেষে কুঞ্চিত অধর দাঁতে চেপে স্থির হ'য়ে বসে রইল। তোমিলিন ভাবলে স্টীফান শক্ত একটা কিছু চিবোচ্ছে।

ক্রমে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো। মাথা থেকে টুপীটা খুলে ধীরে স্টীফান বললে—'ধন্যবাদ তোমিলিন...খবরটা জানালে, সে জন্য ধন্যবাদ।'

—'আমি শুধু তোমাকে সতর্ক ক'রে দিলাম।'

স্টীফানকে একটু তোয়াজ করবার জন্য তার উরু-দেশে দু-একটা চাপড় মেরে আবার বললে—'কিছু করো না ভাই।'

তোমিলিন চলে গেলেও স্টীফান্ অনেকখন তেমনি বিমূঢ়ভাবে টুপীটার পানে চেয়ে বসে রইল। অর্দ্ধমৃত একটা জলৌকা সন্তর্পণে আবার তার বুট বেয়ে উঠলে।

* * * (ক্রমশঃ)

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

উগাণ্ডা

ইয়ালা হ'তেই উঁচু ভূমি এবং স্বাস্থ্যকর স্থান আরম্ভ হয়েছে। এখানে ভারতবাসীরা কোনরূপ কৃষিকাজ নতুন ক'রে আরম্ভ করতে পারে না। ইয়ালা হ'তে রওয়ানা হ'য়ে একটি ছোট গ্রামে এসে পৌছলাম। গ্রামের নাম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ভুল ক'রে গ্রামের নামটি ডাইরীতে লিখি নি। গ্রামটিতে কয়েক ঘর নিগ্রোর বাস। থাকব ভেবেই ঐ গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামের অবস্থা দেখে মনে হ'ল বাংলা দেশের কোনও গ্রামে এসেছি। কাছে কাছে কতকগুলি ঘর। প্রায় লোকই অর্দ্ধনগ্ন। সন্ধ্যার পূর্বে সকলেই পাকের বন্দোবস্ত করছে। ছেলেমেয়েরা ধূলা, মাটি, এবং কাদা নিয়ে খেলা করছে। লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের মস্তক মুণ্ডিত। সভ্য নিগ্রোরা তাদের ছেলেমেয়েদের মাথা প্রায়ই মুণ্ডন করতে আরম্ভ করেছে। অনেকে বলে, বার বার মস্তক মুণ্ডন করলে ভেড়ার লোমের মত চুল ছাগলের লোমের মত চুলে পরিণত হয়। কথাটা বাস্তবিকই ভাববার বিষয় বটে। লোহার ঘষায় চুলের স্বভাব-ধর্ম বদলে যাওয়াটা যদিও আশ্চর্যের বিষয়, তা হ'লেও আমার কাছে তা আশ্চর্য বলে মনে হ'ল না, কারণ আমি নতুন ধরণে চিন্তা করতে শিখেছি।

গ্রামে কোথায় থাকব এই নিয়ে চিন্তা করছি আর গ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একজন পাঞ্জাবী মুসলমান বাইরে দাঁড়িয়ে একজন লোকের সংগে কথা বলছে। তাকে গিয়ে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দেবার জন্য অনুরোধ করতেই সে তৎক্ষণাৎ আমাকে নিয়ে তার বাড়ীতে গেল। বাড়ীখানা খুবই ছোট্ট। শুধু স্বামী-স্ত্রীতেই থাকা যায়। এরূপ বাড়ী দেখে সেখানে থাকতে আমি সম্মত হলাম না। সে হেসে বলল, 'আমার বাড়ীতে থাকতে আমি কখনও বলব না। আমার মাঝে আর সেই দেশী নিয়ম-কানুনের প্রচলন নাই। এখানে একটু বসুন, এক কাপ চা খান, তার পর আপনাকে আমি নিকটস্থ একটি বাড়ীতে নিয়ে রেখে আসব।' চা খাওয়া হ'য়ে গেলে লোকটি আমাকে খুব কাছে আর একখানা বাড়ীতে নিয়ে গেল। ঘরখানা খালিই ছিল। ঘরে একখানা লোহার খাট, তার উপর একটা শণের জাজিম মাত্র বিছান, একদিকে একখানা টেবিল এবং তার চার

দিকে চারখানা চেয়ার। চেয়ারগুলি ভয়ানক অপরিষ্কার, অনেক দিন সেগুলি কেহ ব্যবহার না করায় ধূলায় ধূসরিত হয়েছিল। পাঞ্জাবী লোকটি আমায় বললে, 'এখানে বসুন, এখনই লোক এসে ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যাবে, রাত্রে থাকতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।' এই কথা বলেই লোকটি চলে গেল।

আমি ঘরখানার গড়ন দেখতে লাগলাম। মেঝে মাটির নয়। কাঠ দিয়ে আমেরিকান অথবা ইউরোপীয় ধরণে কেবিন করা হয়েছে। জলের বন্দোবস্ত আছে। শৌচাগার যদিও বর্তমান প্রথা মতে তৈরী হয় নি, তবুও মেথরের দরকার হয় না। ঘরখানা দেখেই আমার মনে হ'ল কোনও ইউরোপীয় ইন্‌জিনিয়ার ঘরখানা তৈরী করেছে। ঘরখানাতে এবরিজিনাল ভাবধারা মোটেই নেই। আমি এই সব ভাবছি, এমন সময় একটি নিগ্রো বয় একটি মোটা মোমবাতি হাতে ক'রে ঘরে এসে প্রবেশ করল। বাতি জ্বালিয়ে সে বিছানা ঝেড়ে বিছানা পেতে দিল। টেবিল চেয়ারও ঝেড়ে পরিষ্কার করল। তার পর আমাকে মুখ-হাত ধোবার জল দিয়ে শৌচাগার দেখিয়ে দিল। সে জানত না আমি তার আসার পূর্বেই ঘরখানার সব কিছুই দেখে নিয়েছিলাম। হাতমুখ ধুয়ে আমি বিছানায় না বসে চেয়ারেই বসলাম এবং একটি সিগারেট ধরিয়ে ঘরের চারদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বয় আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে চলে গেল।

কতক্ষণ পর পাঞ্জাবী মুসলমানটি এসে আমাকে এক পেয়ালা চা দিয়ে বলল, বিছানায় গিয়ে বসুন।

আমি বললাম, তা করব কেন, বিছানায় বসে বিশ্রাম ক'রে যারা অসভ্য, যাদের বসবার কিছুই নেই, তারাই।

লোকটি হেসে বলল, আপনি দেখছি সভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন পুরাদমেই।

আমি বললাম, এসব ঠেকে শিখতে হয় নি, এ সব বিষয় শিক্ষা করা সমূহ দরকার। আচ্ছা এ ঘরখানা কে তৈরী করেছে?

"আমিই করেছি, বিলাত হ'তে ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আনি নি। এ দেশে আসার পর ইউরোপীয়দের ভাব-গতিক দেখে আর পুরাতন প্রথাকে আকড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হ'ল না। দেখলাম ইউরোপীয় প্রথা যাকে আমরা বলি, তা ইউরোপীয় প্রথা অথবা ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার নয়। যা দরকার উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে তা যদি কয়েক বৎসর পূর্বে আর কেউ প্রচলন ক'রে থাকে তবে সেটা তার নিজস্ব নয়। একই চিন্তা একই সময়ে দুজনার মনেতে জাগে বটে, একটি লোক তার চিন্তাকে কাজে পরিণত করেছে, আর অন্য লোকটি করেনি বলে সে খাটো হয়ে যায় না; সে তার মাঝে অলসতার প্রশ্রয় দেয় মাত্র। এখন এসব কথা বাদ দিয়ে আসল কথা শুনুন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ অঞ্চলে নতুন ক'রে কাউকে ভূমি চাষ করতে দেওয়া হয় না।

আমি বললাম, শুনেছি নিশ্চয়ই, তবে এমন লোকের সংগে সাক্ষাৎ হয় নি যে লোকটি দরখাস্ত ক'রেও ভূমি পায় নি।

পাঞ্জাবী লোকটি তখন বলল, "আমি বার বার দরখাস্ত ক'রে যখন ভূমি পেলাম না তখন এই নিগ্রোদের অধীনে প্রজাত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি। এখন আমার অধীনে অনেক লোক কাজ করছে। তুলা এবং আখের আবাদ বেশ চলছে। একদিকে প্রজাত্ব স্বীকার করার অপমান, অন্য দিকে অফিসিয়েলদের অত্যাচার বড় কম হয় নি। আমি প্রথম প্রথম আদালতে গিয়ে ভারতীয় প্রথা মতে আদালত ফাঁকি দিতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু এখন আর তা করি না। যখনই আদালতে যাই তখনই নিজের কথা নিজেই বলি এবং মাঝে মাঝে চাষা-সুলভ দু-একটা ধমকিও দেই, এতেই আমার সব কাজ হ'য়ে যায়। ইউরোপীয় জাতের পদসেবা করে যে ফল পাই নি, পদাঘাত ক'রে তার চেয়ে বেশি ফল পেয়েছি। এখন আমার উঁচু ভূমিতে থাকা আর কষ্টকর বলে মনে হয় না, তবে একটি কথা, এখানে আর দ্বিতীয় ভারতবাসী না থাকার জন্যই আমার অনেক সুবিধা হয়েছে। যদি অন্য কোন ভারতবাসী এখানে থাকত তবে হয়ত আমাকে মহা বিপদেই পড়তে হ'ত।

পাঞ্জাবী মুসলমানটিকে দেখলে গ্রীকদের মতই দেখায়। সে আমায় বলেছিল, দেশেতে পাজামা এবং কামিজ ব্যবহার তারা করত। এখানে পাজামাটাকে পাতলুনের

মত করেছে আর কামিজটা পাতলুনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয় মাত্র। এটাকে কি ইউরোপীয় পোষাক বলা যেতে পারে? পোষাকটার একটু উন্নতি করা হয়েছে মাত্র।

প্রতিবাদ করা যায়, কিন্তু প্রতিবাদ করি নি। আমার মনেই বেজে উঠেছিল সেই কথা যেদিন একটা সত্য কথা বলার জন্য আমাকে মেরেছিল এবং আমাকে ফাসাবার জন্য আফিস হতে একটা ফাইল চুরি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। বিষয়টা এখনে বলতে বাধ্য হলাম।

ইরাণের বিরজন্দ বলে একস্থানে গত মহাযুদ্ধের সময় আমি কাজ করতাম। দিবানিদ্রা আমার অভ্যাস ছিল না। তাই দ্বিপ্রহরে কতকগুলি রুশের সংগে ইংগিতে কথা বলতে চেষ্টা করছিলাম। রুশেরাও আমার সংগে কথা বলবার চেষ্টা করছিল। এমনি সময় একটি ইংলিশ সেপাই একটি বেহালা নিয়ে আমাদের কাছে এসে তাই বাজাতে আরম্ভ করল। সে বেশ ভালই বেহালা বাজিয়েছিল। বাজান শেষ হ'য়ে গেলে সবাই তাকে বাহবা দিল। আমিও বাহবা দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য, আমার বাহবা শুনে লোকটা রেগে গেল এবং বলল, 'তোদের দেশে এমন বাদ্যযন্ত্র নিশ্চয়ই নেই।'

আমিও বলতে ছাড়লাম না, বললাম, "যখন তোরা বনমানুষ ছিলি এবং বৃটেনের বনে জংগলে উলংগ হ'য়ে থাকতিস তখন আমাদের দেশের লোক এ সব বাজিয়ে আনন্দ করত।"

এতে লোকটা আরও রেগে গেল এবং পিঠে গোটা-কতক কীল বসিয়া দিল। আমার কাছে যদিও তা বিরাশী ওজনের মতই লাগছিল, সে কিন্তু তাচ্ছিল্য ক'রেই মেরেছিল। যদি ঠিক ঠিক ক'রে একটা কিল মারত তবে আজ হয়ত আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে হ'ত না। আমি একটু দূরে গিয়ে মুখ হ'তে পাইপ খুলে তার কপালে ছুঁড়ে মারলাম। এতে তার চুল পুড়ে যায় এবং কপালে এমন আঘাত লাগে যে, রক্ত বের হ'য়ে পড়ে। দলে তারা ভারী ছিল তাও একটা কারণ বটে, দ্বিতীয়ত তখন আমার বয়স অল্প, বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। সেজন্যই হয়ত ভয়ে যেখানে ইণ্ডিয়ানরা থাকে সেদিকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তখন জানতাম না আমার এই গোরা সেপাইটাকে পাকড়াও করবার অধিকার ছিল।

আমার মনে হ'ল সেই কথা। আমি সেই কথা স্মরণ ক'রেই পাঞ্জাবী মুসলমানের কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার সহানুভূতি পেয়ে সে বড়ই সুখী হ'ল এবং পরের দিন বিদায়ের বেলা অনেক দূর পর্য্যন্ত সংগে এসে বিদায় দিয়েছিল।

কোথায় আফ্রিকা আর কোথায় ইরাণ! একটা দেশের কথার সংগে যেন অন্য একটা দেশের কথার বেশ একটা সম্পর্ক ছিল, অথচ বিষয়গুলির সংগে সম্বন্ধ ছিল শুধু আমারই। চারদিকের আবহাওয়া এবং উঁচু-নীচু ভূমিকে অবহেলা ক'রে আমি শুধুই ভাবতেছিলাম। মন যখন সতেজ ও সজাগ থাকে তখন শরীরের ছোটখাটো দুঃখের কথা মনেই আসে না। ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানই আমার উচিত ছিল, কিন্তু তা না ক'রে আমি ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলাম। মাঝে মাঝে যখন চড়াই আসত তখন নেমে পড়তাম সাইকেল থেকে আর ভাবতাম সাম্রাজ্যবাদীদের কথা, ছোটমনা জাতীয়তাবাদীদের কথা। শুধু তাই নয়। দেশের কথাই সকল সময় চিন্তা করতাম।

আমাদের দেশের লোকের ধর্মান্ধতা এখনও কাটে নি। ধর্মান্ধতা কাটার পর আসে জাতীয় ভাব। জাতীয় ভাব যখন খাটো হ'য়ে যায় তখন আসে আরও বড় ভাব। কিন্তু আমরা এখনও ধর্মান্ধ। আমাদের দেশের লোকের এখনও সদ্‌গুণের অনেক অভাব, এই সব ভাবছি আর সাইকেল পুরাদমে চালাচ্ছি, সেই সঙ্গে মনে হচ্ছিল দেশটাকে কি ক'রে বিদেশীর হাত হ'তে মুক্ত করা যায়। অনেকে বলে পুঁজিবাদী স্বদেশী বিদেশী সবাই সমান। কথাটা সত্য নয়। বিদেশী পুঁজিবাদী সকল সমান হয় না। বৃটিশ পুঁজিবাদী এবং জাপানী পুঁজিবাদী এক জাতীয়। আমি ভিক্ষা করার সময় সেকথা বেশ ভাল করেই বুঝেছিলাম। জার্মান, আমেরিকান, চীনা এবং গুজরাতী পুঁজিবাদীরা অন্য ধরণের। এদের মন বড়ই নরম, তবে রাগ করলে আবল তাবল বকে মাত্র। আমি যে পথে চলছিলাম সেই পথ তৈরী করেছে বৃটিশ পুঁজি-

বাদীরা, সেজন্যই বৃটিশ পুঁজিবাদীদের প্রতি আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার উপায় ছিল না। কংকরযুক্ত পথেই আমাকে চলতে হচ্ছিল। বৃটিশ পুঁজিবাদীর দল রেলপথটিকে বিশেষ সুযোগ দেবার জন্যই ভাল রাস্তা তৈরী করেনি। মোটরকারের কারবারে আমেরিকানদের কাছে হার মানতে ছিল ক্রমাগতই। দুর্নীতিপরায়ণ বৃটিশ পুঁজিবাদীর প্রতি সকল কথা জেনে-শুনে মন বদলি করার আর উপায় ছিল না।

এখানে আমি জার্মান পুঁজিবাদীদের একটু ভাল বলেছি। একটু ভাল বলার জন্য অনেকে হয়ত রাগ করবেন। এরূপ রাগ যদি কেউ করেন তবে তার উত্তরে বলব পুঁজিবাদী শব্দটার অর্থ জানা থাকলে অর্থাৎ অনুভব করার মত মন এবং বুদ্ধি থাকলে রাগ করবার আর কিছুই থাকবে না। গোখরা সাপে কামড়ালে যেমন মানুষ মরে, কেউটে সাপে কামড়ালেও তেমনি মানুষ মরে। বিষ বিষই, তেমনি পুঁজিবাদীর তুলনা পুঁজিবাদীই।

ভ্রমণ কথা লিখতে গিয়ে বাজে কথায় এসে পড়লাম। এসব বাজে কথা আমার মাথায় তখন ক্রমাগত ক্রিয়া করছিল, অতএব এসব কথাও আমার ভ্রমণের অন্তর্গতই। যাঁরা ঔপন্যাসিক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ করতে চান তাঁরা যেন এখানেই আমার ভ্রমণ-কথা শেষ করেন।

মুনিয়াস নামক স্থানে পৌঁছে একটি গুজরাতী খোজার বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। গুজরাতী খোজাটি পূর্বে বেনে ছিল। সে আমাকে বার বার ধর্ম কথাই জিজ্ঞাসা করছিল। আমি তাকে বললাম, ধর্ম কথা আমার সংগে বললে কোনরূপ সদুত্তর পাবে না! এতে লোকটি চটে যায় এবং তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে ভুষিয়া নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার রাত। পথটা ছিল ভাল। বিনা চিন্তায় পথ চলতে লাগলাম। অন্ধকারের মাঝে পথ-চলা বড়ই কষ্টকর। শরীরটাও ছিল দুর্বল। বয়স বেশি হওয়ায় চোখেও কমই দেখছিলাম। কিন্তু মন ছিল শক্ত। মানুষের কল্পিত ভগবানের কাছে আর মাথা নত করতে ইচ্ছা হচ্ছিল না।

পথে মাঝে মাঝে খরগোস, বনবিড়াল এবং ছোট ছোট হিংস্র জীবও পড়ছিল। কিন্তু সাইকেলের বেল বাজাতেই তারা সরে পড়ছিল। আমি ভাবছিলাম, যদি অন্ন এবং আশ্রয় স্থানের জন্য আজ আমাকে খোজার ঘরে থাকতে হ'ত তবে নিশ্চয়ই আমাকে ভগবান আছেন তাও বলতে হ'ত। অর্থনীতির চাপে পড়ে অনেক সময় 'না' কে 'হাঁ' বলতে হয়, তা পূর্বেও অনুভব করেছি, আজও অনুভব করলাম।' অনেক রাত পর্যন্ত সাইকেল চালিয়ে শেষে পথের এক পাশেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। সূর্যের আলো এবং মাছির কামড়ে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শরীরটা বেশ দুর্বলই বোধ হচ্ছিল। কতক্ষণ চলার পর একদল ভারতীয় বোরানীর সংগে দেখা হ'ল। তাদের কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষ ক'রে একটু বিশ্রাম ক'রে নিলাম, সেই সঙ্গে বোরানীদের কাজও দেখতে লাগলাম।

নিগ্রোরা দল বেঁধে ঘাড়ে তুলা নিয়ে এসেছিল। বোরানীরা ওদের বেশ করে ঠকাচ্ছিল। ওজন নাম্‌কা-ওয়াস্তে করছিল বটে, দাম কিন্তু ঠিক ঠিক দিচ্ছিল না। নিগ্রোদের ঠকানই ওদের ব্যবসা, বেশিক্ষণ দেখতে ভাল লাগল না। উঠতে যদিও ইচ্ছা হচ্ছিল না তবুও স্থল ত্যাগ করে ভুষিয়ার দিকে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হলাম।

তখন বোধ হয় একটা বেজে গিয়েছে। রোদে পথ ঘাট খাঁ খাঁ করছিল। আমার কাছে জল ছিল না, জল পিপাসায় আমি কাতর হয়ে পড়লাম। ভুষিয়া যদিও আমার দৃষ্টিপথে এসেছিল তবু পৌঁছাতে পারছিলাম না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় আমাকে কাতর করেছিল। সাইকেল থেকে নেমে কাঁপতে কাঁপতে পথ চলছিলাম। ভয় হচ্ছিল কখন বা অজ্ঞান হয়ে পথে পড়ে যাই। সেজন্য একটু দূরের একপায়া পথে চলছিলাম। মনে মনে হাসছিলাম আর ভাবছিলাম, এমনি অবস্থায় কত লোক মরে তার হিসাব কজনা রাখে। অবুঝ বুভুক্ষুর দল ভাবে ভগবান তাদের উপবাস রাখছেন, ভগবান তাদের কষ্ট দিচ্ছেন, এবং সেই কষ্টের উপশমের আর কোন উপায় না পেয়ে ভগবানের কাছেই আত্মসমর্পণ করে। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। পুঁজিবাদীর অসৎ প্রবৃত্তির ফলেই আজ আমাকে কষ্ট পেতে হচ্ছে। আসল কথা

জানাও অন্যায় যদি তার প্রতিকার করতে না পারা যায়। এই সব ভাবছি, হঠাৎ পেটে একটা প্রবল বেদনা সুরু হ'ল। আমি তৎক্ষণাৎ কেতলী থেকে একটু জল মুখে দিলাম। সেই জলের পরিমাণ দশ ফোঁটার বেশি হবে না। আমাকে আরও দু'মাইল যেতে হবে, তার পর পাব জল এবং খাবার। আমার শরীরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল।

(ক্রমশঃ)

ঋণ

(গল্প)

শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য

(১)

আজ বিল্বষষ্ঠি। প্রতিমা সাজানোর ভার বরাবরই রথীনের উপর। রথীন সবেমাত্র এবার শিবপুর ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজ থেকে পাস ক'রে বেরিয়েছে।

'ছোড়দা, চা খেতে যাবে চল। বাঃ, চমৎকার সাজানো হচ্ছে ত।' নমিতা ছুটতে ছুটতে এসে বলল।

রথীন হাসতে হাসতে একবারটি নমিতার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে—'তোরও যখন সমর্থন পাচ্ছি, তখন সত্যি হয়ত ভাল হচ্ছে। বাবা! যা খুঁত ধরতে পারিস তুই!'

নমিতা তার মাথাটা বার দুয়েক ডান দিকে ও বাঁ দিকে দোলাতেই তার পিঠের ছেড়ে-দেওয়া কালো কুচ-কুচে বেণীটা ও কানের কানবালা দু'টো একসঙ্গেই সায় দিল।

রথীন তেমনি সাজাতে সাজাতে বললে—'তার মানে?' নমিতা বললে—'উঃ হুঃ, চুলগুলি তুমি ঠিক মত বসাতে পার নি, তাছাড়া আর সবই ভাল হয়েছে। এবার সাজ যা হয়েছে একেবারে চমৎকার। আর হবেই বা না কেন? পছন্দটা কার? চিৎপুরের সেই ছোট্ট ছোট্ট দোকান, তারপর আবার পুজোর ভিড়—কত কথাই না বলেছিলে? এবার দেখলে ত আমার পছন্দটা?'

রথীন ছোট্ট একটা 'হুঁ' ক'রে নমিতার কথা মত ঠাকুরের চুলগুলি ঠিক মত বসাবার জন্য বার ২।৩ চেষ্টা করেও যখন পারল না, তখন একটা সলজ্জ দৃষ্টি বোনের দিকে নিক্ষেপ করলে।

নমিতার সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে একটুও দেরী হল না। সে খানিকটা আব্দার ও অবহেলার সুর একসঙ্গে জড়িয়ে ব'ললে—'সর সর, আমিই ঠিক ক'রে দিচ্ছি'—এই বলে সে নিজেই গিয়ে টুলটার উপর উঠল।

রথীন নীচে নেমে এসে ভগবতীর কাপড়টা আর একটু পায়ের দিকে টেনে দিতে দিতে বললে—'দেখ নমি, যদি তুই ধরলিই, তাহলে কাপড়গুলি ও চুলগুলি ভাল ক'রে বসিয়ে দিস।'

'হ্যাঁ, আমি বসে বসে সারা বিকেলটা এখন এই করি।'

রথীন নমিতার বিনীটায় ছোট্ট একটা টান দিতেই নমিতা 'উঃ মা' ক'রে উঠল। রথীন গভীর স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরেই বললে—'তবে যে বড় আমার ভুল ধরছিলি? এত তোদেরই কাজ। মেয়েদের সাজ-সজ্জায় মেয়েরাই চিরদিনই পটু। ব্যাটাছেলেরা যে এর ভেতর আসে, সেত তোরা আসিস্ না বলেই?'

'হুঁ—আসি না বুঝি? তোমরা ডাকলে ত আসব? কি জানি, আমাদের ডাকলে পর তোমাদের বাহাদুরির ভাগ আবার আমাদের দিতে হয়!'

'তুই দিন দিন বড় বকাটে হ'য়ে উঠছিস নমি। বেথুনে একবছর যেতে না যেতেই এই!'

'তাত বলবেই! সত্যি কথা ব'ললেই তখন তোমরা তোমাদের—ব্রহ্মাস্ত্র—আমাদের দুর্ব্বল জিনিষগুলি টেনে এনে আমাদের মুখ বন্ধ করতে খুবই জান। ঐ যাঃ—তুমি ত এখনও দাঁড়িয়েই রইলে—বৌদি সেই কখন থেকে তোমার চা আর খাবার নিয়ে বসে আছেন। যাও, যাও গিয়ে এক বকুনি। আজ আবার মিসেস চ্যাটার্জ্জি তাঁর মেয়ে রুবিকে নিয়ে পূজা দেখতে এখানেই আস্‌ছেন। জান, ছোড়দা রুবি যা চমৎকার গান গাইতে পারে—আমাদের স্কুলে সে সেবার গানে প্রথম হয়েছিল। তাছাড়া ফোটোগ্রাফীতেও তার বেশ ভাল হাত।'

'মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আবার কে রে?'

'কেন, ঐ যে সিলেটের 'বাণী স্টুডিও'র মিঃ অমরেশ চ্যাটার্জ্জি—তাঁরই স্ত্রী। তখন দেখলে না—গাড়ী গেল তাদের স্টেশন থেকে আনতে?'

'কখন কোথায় গাড়ী গেল তাই বসে বসে আমি দেখি? আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নাই,' বলেই রথীন বাংলোর দিকে এগিয়ে চ'লল।

নমিতা রথীনের ছোট বোন—বেথুন কলেজের ফার্ষ্ট-ইয়ারের ছাত্রী। রূপ? হ্যাঁ, তার আছে।

(২)

কিছুক্ষণ আগে খুব জোর একপশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। এই মাত্র কলঘরের সিটি বাজতেই কুলি এবং কুলি-মেয়েরা ভিজে কাপড়ে কাঁপতে কাঁপতে চা-পাতির টুকরি মাথায় ক'রে কে কার আগে পাতি ওজন করতে পারে তাই নিয়েই ব্যস্ত। কোন কোন কুলিরমণীর পিঠে বাঁধা সদ্য জলে ভিজা শিশু চীৎকার করে কাঁদছে মায়ের বুকে আশ্রয় পাবার জন্য—মা তাদের পিঠটা দোলাতেই আবার থেমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সর্দ্দারের "এক লেইন হো যাও," "হড়বড়াও মাৎ" ইত্যাদি চীৎকার চা-বাগানের অস্তিত্ব স্বপ্রকাশ করছে।

রথীন বাংলোয় ঢুকতেই তার বড় ভাই নীতিনের রাগজড়িত গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—'হ্যালো, হ্যালো; হাই অফিসে কি কেউ নাই! কে? কেরাণীবাবু? এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনারা সব! আমি সেই কখন থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে আপনাদের হাঁকা-হাঁকি করছি—কি ক'রছিলেন এতক্ষণ? কুলিগুলি যে অবেলায় ভিজে গেল, এ জন্য দায়ী কে?'

রথীন নিঃশব্দে ভিতরে চলে গেল।

নীতিন কণ্ঠস্বর আরও চড়িয়ে টেবিলটার উপর একটা চাপড় মেরে বললে—'পাতি? পাতি একঘণ্টা কম তুললে কি আমার বাগান ফেল পড়ে যেত? আপনারা আবার দায়িত্বপূর্ণ লোক বলে নিজেদের জাহির করতে চান। I pity you—all my staff. নিজেদের সুখ-সুবিধের কথা ত একটুও ভোলেন না!'

নীতিন ঢপ ক'রে রিসিভারটা ফেলে দিতেই সাম্‌নে অনিতাকে দেখতে পেয়েই যত রাগ গিয়ে তার উপর পড়ল। একরকম ভেঙচেই নীতিন বললে—'সারা দুপুর বসে বসে কি কর? আমাকে একটু ডেকেও দিতে পারলে না?'

অনিতা তার স্বামীকে ভাল ক'রেই চেনে—তবুও সে হঠাৎ এ ভাবে আক্রান্ত হবে, একথা সে ভাবতেও পারে নি—তাই নিজেকে একটু সামলে নিয়েই সে উত্তর দিল—'তোমার মত পড়ে পড়ে নাক ডাকাই, আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই!'

নীতিন তার কণ্ঠস্বর সম্ভব মত কোমল ক'রে ব'ললে—'না, না, অনিতা—আমি তা বলিনি। আমি বলছিলাম যে, কুলিগুলি অবেলায় ভিজে গেল—এর ভিতর কি আর গণ্ডাকয়েক ম্যালেরিয়া দেবীর প্রকোপে না পড়বে?

অনিতা রাগ এবং অভিমান জড়িতস্বরে বললে—'এ তোমার কিন্তু ভারী অন্যায়। তুমি তোমার দিবানিদ্রার সুখটুকু ছাড়তেপারবে না—অথচ হুকুম দেবার মালিক একমাত্র তুমিই।'

নীতিনের স্বর নিম্নতম স্তরে এসে একেবারে মোলায়েম হ'য়ে গেল। সে বললে—'তুমি কিন্তু অনর্থক আমার উপর রাগ করছ। এই যে কাল থেকে দুর্গোৎসব আরম্ভ হবে—এই যে পয়সা খরচ ক'রে সিনেমা আর Jungle film এসেছে, এ কাদের জন্য?'

অনিতার মনে ক্ষোভ ও অভিমানের লেশমাত্রও আর এর পরে থাকতে পারে না—কিন্তু তবুও মুখে সে কথা

প্রকাশ না ক'রে, স্বামীর ওজস্বিনী ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিবার ভয়েই সে বললে—'থাম, খুব হয়েছে—আর তোমার অনুভূতিহীন সহানুভূতির সান্ত্বনা দিয়ে বেদনার উপশম করতে হবে না। চা টা খেতে হবে, না এই ভাবেই বেদনার উপশম করলে চলবে? ঠাকুরপো সেই কখন থেকে চায়ের টেবিলে এসে বসে আছে।'

'তবে আর speakটি not—যথা আজ্ঞা দেবী' বলেই নীতিন চট ক'রে সোফা থেকে উঠে গিয়েই অনিতার হাত দু'খানা ধরে কাছে টেনে আনতেই সভয়ে অনিতা হাত ছিনিয়ে নিয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে বললে—'এ বেহায়াপানা আর কবে যাবে তোমার—বয়স ত প্রায় চল্লিশের কাছাকাছিই হ'তে চলল।'

(৩)

এই চা-বাগান নীতিনদের। এটা আগে ছিল সাহেব-বাগান—তখন নীতিনের বাবাই ছিলেন এই বাগানের হেড্ ক্লার্ক। ১৯৩০—৩১ সালে চা-বাগানের মন্দা অবস্থা পড়ায় নীতিনের বাবা একরকম জলের দামেই এই বাগান খরিদ ক'রে নিয়েছিলেন। বার দুয়েক বি-এ ফেল ক'রে তৃতীয়বার লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্যই নীতিন তার পিতার একরকম অমতেই বছর তিনেক ধরে এই বাগানেই এপ্রেনটিস খেটে চলছিল—ঠিক এই সময় এসেছিল চায়ের বাজারে ভীষণ মন্দা, পিতার মৃত্যুতে নীতিনকেই সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে ক'রে নিতে হয়েছিল। কেউ কেউ বলেও ছিলেন যে উড়োনচণ্ডী বাগানটাকে ফেল ফেলে দেবে—কিন্তু সত্যিকারের কর্ত্তব্যের ডাক যখন মানুষের আসে, তখন সে তাকে কিছুতেই অবহেলা করতে পারে না। রথীন ও নমিতা নীতিনের ছোট ভাই ও বোন। মা এদের আগেই মারা গিয়েছিলেন। এক রকম ধরতে গেলে অনিতাই নমিতাকে মানুষ করেছে—এখন রথীন কলকাতায় বোর্ডিংএ থেকে পড়ে। বাড়ী এদের ছিল কোন দিন বিক্রমপুর—কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ নদীগর্ভে।

(৪)

চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়ের শ্রেণী—মাঝে মাইল তিনেক ব্যাপী সমতলভূমির উপর চায়ের গাছগুলি সমান ভাবে ছাঁটা। কলঘরটা ঠিক এই সকল জায়গার মাঝখানটায়—আর তারই চারদিকে চারটে কঙ্করের রাস্তা। একটা রাস্তা পাহাড় অতিক্রম করে এঁকেবেঁকে সহরের দিকে চলে গেছে, আর তিনটা তিনদিকে সিদে পাহাড়ের উপর উঠে এসেছে। পশ্চিম দিকের পাহাড়ের উপর বড় বাংলো—উত্তরে বাবুদের বাসা আর দক্ষিণে পাহাড়ের উপর দিয়ে পর পর কুলি-লাইন। পূবের পাহাড়গুলিতে লাকড়ির জন্য রিজার্ভ করা জঙ্গল—আর ঠিক তার পরেই গভীর জঙ্গলে কুকিদের বস্তি।

(৫)

বর্ষণক্লান্ত মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলে দিনমণি পশ্চিম আকাশটাকে রক্তিমাভায় আরক্ত ক'রে দিক-বলয় সবে মাত্র অতিক্রম করেছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত কুলিদের মাদলের শব্দে সন্ধ্যার আকাশ ভরে গেছে। নীচের সুবিস্তীর্ণ সমতল সবুজ চা-ক্ষেতের উপর আসামের বর্ষার শেষে শীতের ম্লান কুহেলী ধীরে ধীরে নেমে আস্‌ছে। কলকাতার বেতার-কেন্দ্র থেকে কি একটা করুণ রাগিণী রেডিও সেট্‌টায় বেজে চলেছে। রথীন আস্তে আস্তে বাংলো থেকে বেরিয়ে সামনের ফুলবাগানে এসে দাঁড়িয়ে মস্ত বড় একটা ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপ তুলে নিল। ঠিক এই সময় হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা সবে মাত্র গাঁজার কল্কিটায় একটা সজোরে টান দিয়ে উড়ে মালির হাতে দিয়েছে—ছোটবাবুকে দেখেই উৎকলবাসী কোন রকমে কল্কিটাকে লুকিয়ে ফেলল—কিন্তু হিন্দুস্থানী আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও ধোঁয়া সবটুকু গিলতে না পেরে "বোম্" বলে এক শব্দ ক'রে চিৎ হ'য়ে পড়ে গিয়ে গোঁ গোঁ করতে লাগল। রথীন দৌড়ে সামনে যেতেই উড়ে মালিটা ভয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে সুরু করল। রথীন বললে—'এই, কি হয়েছে রে?'

মালি জড়িত কণ্ঠে বললে—'মু কোন কহিবি বাবু?'

গাঁজার গন্ধে রথীনের বুঝতে আর কিছুই বাকী ছিল না। সে মুখ ভেঙচেই বললে, "মু কোন কহিবি বাবু—

গাঁজা কোন খাইথিলা? যা ব্যাটা, জল নিয়ে আয়।" মালি সভয়ে জল আনতে ছুটল। দারোয়ান কোন রকমে টালটা সাম্‌নে নিয়েই ধূলো ঝেড়ে উঠে বসবার উদ্যোগ করতেই রথীন রাগের মাথায় বললে—'ক্যায়া হুয়া দারোয়ান?' দারোয়ান আর একটু টাল সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে—'মায়ত কুচ নেহি জানতা-হ্যায়—মেরা তবিয়ত ঝটছে খারাপ হুয়া, আউর পটসে ম্যায় গির গিয়া।' এদের ভাব দেখে রথীনের রাগ সপ্তমে চড়ে গেল—চীৎকার ক'রে সে বললে—'আউর থোড়া গাঁজাকা শ্রাদ্ধ কর, যত গেঁজেল এসে জুটেছে। আউর কোন দিন শুনেগা যে গাঁজাকা শ্রাদ্ধ করা হায় ত আমি তোমাদের পিণ্ডি চটকায়গা।' বাংলোর কুলি-ঝিটা তার উপর ওদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার স্বুবর্ণ স্বুযোগ মনে ক'রে কোথা থেকে ছুটে এসে বললে—'এ বাবু, হামি আউরভি কথা তোকে কহিয়ে দেবে।' কিন্তু আর তার বলা হল না—পিছন থেকে অনিতা এসে বললে, 'তুই থাম।' তারপর রথীনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঠাকুর-পো, এদিকে এস।' রথীন তার বৌদির পিছন পিছন আসতে আসতে বললে—'দেখ না বৌদি, এদের কাণ্ডটা!' অনিতা হেসে বললে—'কাণ্ড দেখলাম, কিন্তু তুমি এমন চটকদার হিন্দি আবিষ্কার করলে কোথা থেকে শুনি?' এবার দু'জনেই হো-হো করে হাস্‌তে আরম্ভ করলে। হাসি থেমে যেতেই অনিতা বললে—'ওঃ ঠিক কথা, আমার ত ছাই দিনের বেলায় খেয়ালই থাকে না। ড্রইং রুমের বাতিটার যেন কি দোষ হয়েছে—কখনও কখনও স্বুইচ টিপলেও জ্বলে না। একবারটি ঠিক ক'রে দিতে পারবে ঠাকুরপো?'

'চেষ্টা ক'রে দেখা যাক,' বলেই রথীন স্বুইচটা পরীক্ষা করতে লাগল।

অনিতা হেসে বললে—'ওঃ আমার ত ছাই খেয়ালই থাকে না যে তুমি একজন বি-ই। আমরা আমাদের বাগানের অপাশ করা এঞ্জিনিয়ার বাবুকেই এঞ্জিনিয়ারের মত শ্রদ্ধা ঢেলে নিঃশেষ ক'রে দিয়ে বসে আছি।'

স্বুইচে কোন গণ্ডগোল না দেখে রথীন একখানা চেয়ারের উপর ছোট একটা টুল তুলে দিয়ে, তার উপর নিজে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাল্‌বটা পরীক্ষা ক'রে দেখে বললে—'বৌদি, ও ঘর থেকে আমার টর্চটা এনে ধর দেখি, বোধ হয় পয়েণ্টটাই খারাপ হয়েছে।'

অনিতা বললে—'মেইন (main) কি off করতে হবে?'

রথীন নিঃশব্দে শুধু ঘাড় নেড়ে জানাল—'না'। একটু পরেই সে বললে—'স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লায়ার, ও ব্ল্যাক্‌টেপও চাই।'

রথীন বাতি ঠিক করছে, আর অনিতা টর্চটা ধরে আছে। মাঝে মাঝে অনিতা আনমনা হ'য়ে টর্চ-এর (focus) 'ফোকাস' এদিকে ওদিকে ফেলছে দেখে রথীন বললে—'বৌদি, কি ভাবছ?'

অনিতা তার হাতের torchটা ঠিক ক'রে ধরতে ধরতে বললে—কই না, কিছুই ভাবছি না ত।

রথীন একটু জোর দিয়েই বললে—সে হ'তেই পারে না বৌদি, নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছিলে, জানত, আমি কিছু দিন self-magnetism practice করেছিলাম। transmission, reception এবং transference of thoughts আমি কিছু কিছু জানি।'

অনিতা গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললে—'রক্ষে কর ঠাকুরপো, তোমাদের ঐ সব ইন্‌জিনিয়ারী ভাষার magnet, transmission ত ছাই আমি কিছুই বুঝব না। ভাবছিলুম মিঃ চ্যাটার্জির মেয়ে রুবির কথা—আচ্ছা ঠাকুরপো, গরীবের একটা দায় উদ্ধার ক'রে দাও না। সত্যি ঠাকুরপো, মেয়েটা খুব ভাল।'

রথীন একটু রেগেই বললে—'ও সব বাজে কথা এখন রাখ। শোন, আমি যে self-magnet-এর কথা বল-ছিলাম, এর সাথে electro-magnet-এর কোন সম্পর্ক নাই—তাছাড়া এ transmission ত Radio-transmiss-ion নয়। এ হচ্ছে মানবীয় আকর্ষণী শক্তি দিয়ে চিন্তা ধারার আদান-প্রদান। Human Psychology—অর্থাৎ মানুষের মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের সাথে এর যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে।'

ঠিক্ এই সময় হর্ন দিয়ে গাড়ীটা বাংলোর পোর্টিকোর সামনে এসে দাঁড়াল। অনিতা তাড়াতাড়ি টর্চটা রেখে যেতে যেতে বললে—'তুমি একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো, আমি এক্ষুনি কাউকে গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

৬

অন্ধকার ঘরে রথীন টুলটার থেকে নামবার চেষ্টা করলেও টুলটা চেয়ারের ওপর কাঁপছিল—তাই সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বোধ হয় রুবি সম্বন্ধেই নানা রকম কৌতূহল-পূর্ণ চিন্তা করছিল। তাদের আসবার সঙ্গে সঙ্গে ও পাশের ঘরগুলি কলহাস্য-মুখরিত হ'য়ে উঠেছিল। রুবি যে তার ছোট বোন নমিতার থেকেও বেশী চঞ্চল, সে কথা বুঝতে আর রথীনের বেশী দেরী হ'ল না।

মানুষের মন কখন যে কি চায়, আবার তার পর মুহূর্ত্তেই তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে অসংলগ্ন চিন্তাধারার মাঝ দিয়ে কি যে কখন মনের উপর অজানিত ভাবে ছাপ ফেলে দেয়, তার খবর ক'জনে রাখে। চাওয়া এবং পাওয়া এ দুটো জিনিসই নিছক মনের ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকম মধুর অসংলগ্ন চিন্তাধারায় যখন রথীন বিভোর, ঠিক্ তখনই দরজার সামনে কার তড়িত আগমনের পায়ের শব্দ পেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই নমিতার কণ্ঠস্বর—'রুবি, পালালে কিন্তু ভাল হবে না বলছি—একখানা গান তোমার এক্ষুনি গাইতে হবে।'

তাড়াতাড়ি রথীন বললে—'এই কে, আমি কিন্তু উপরে আছি।' সঙ্গে সঙ্গেই একটা দারুণ পতনের শব্দ এবং পুরুষ কণ্ঠে 'উঃ' আর মেয়েলি গলায় 'মাগো' ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। নমিতা এতক্ষণে ঘরে ঢুকে অন্ধকারে কিছু না দেখতে পেয়ে 'বৌদি,' বৌদি' বলে চীৎকার করতেই অনিতা ছুটে এল এবং টর্চটা জ্বালতেই রুবি উঠে বসবার চেষ্টা করে—রথীনের সংজ্ঞাশূন্য দেহে মাথা কেটে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে—"কাকিমা, কি হবে" বলেই আবার কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল। নমিতা ততক্ষণে নিজের শাড়ীটার খানিকটা ছিঁড়ে দাদার মাথা বাঁধতে লেগেগেছে।

আজ বিজয়া দশমী। চারিদিকে বিদায়ের একটা ম্লান ছায়া যেন আস্তে আস্তে জমাট হ'য়ে উঠছে। রথীন নমিতা ও তার বৌদির অক্লান্ত শুশ্রূষায় আস্তে আস্তে ভালোর দিকই যাচ্ছে। উঠবার এখনও শক্তি নাই। বেশী চিন্তা করতে গেলেও মাথাটা কেমন যেন ঝিম্-ঝিম্ ক'রে উঠে। বাগানের ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ আগে ব্যাণ্ডেজ খুলে আবার নূতন ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে গেছেন—এখন রথীন তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে পড়ে আছে। রুবি ও তার মা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। রুবির মা যতদূর সম্ভব গলার স্বর নীচে নামিয়ে বললেন—'ও এখন কেমন আছে নমিতা?'

নমিতা অবসাদ জড়িত স্বরে উত্তর দিল—'কিছুটা ভাল।' রুবির মা নমিতার ভাব লক্ষ্য ক'রে নিঃশব্দে তার একখানা হাত ধরে বাইরে নিয়ে চললেন—রুবিও পিছন পিছন আসছে দেখে তিনি একটু বিরক্ত হ'য়েই বললেন—'নমিতা খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, তুই এখন এইখানেই থাক্‌বি—আর রাতে থাকব আমি নিজে। এর এ অবস্থার জন্যে দায়ী কে? সে ত তুই।'

নমিতা বাধা দিয়ে বললে—'দায়ী ও না, দায়ী আমিই।' রুবি নমিতার উত্তরে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে না পেরে কিসের যেন একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা ক'রেই সর্ব্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত ক'রে অপরাধীর ন্যায় সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। অশান্ত মনে—এতে তার নিজের দোষ যে কতখানি, তাই ওজন করবার জন্য নিজের মনের সঙ্গে আপ্রাণ লড়ছিল। মায়ের অহরহ চাপা তিরস্কারে সে তার নিজের দোষ খানিকটা স্বীকার ক'রেই নিয়েছিল—কিন্তু চাঞ্চল্যই যাদের স্বভাব তাদের চিন্তাধারা যে ক্ষণভঙ্গুর সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি। রুবি আস্তে আস্তে রথীনের মাথার কাছে টুলটার উপর এসে বসল।

বাইরে আস্তে আস্তে হাড়িয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুলিদের ঝুমুর নাচ জমে উঠছিল। হঠাৎ রথীনের তন্দ্রাভাব কেটে যেতেই সে অস্ফুট কণ্ঠে বললে—'আমার কপালটা একটু টিপে দাও ত।'

রুবির হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া তখন দ্বিগুণ হ'তে আরম্ভ করেছে। সে যতদূর সম্ভব রথীনের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে রেখে—ডান হাতখানা কাঁপাতে কাঁপাতে রথীনের মাথার উপর তুলে দিল।

রথীন নিজের দুখানা হাতেই রুবির হাতটার উপর ঈষৎ চাপ দিয়ে—'আঃ' বলে একটা স্বস্তির নিশ্বাস

ফেলল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থেকে রথীন বললে—'আচ্ছা বৌদি, তুমি ত আমায় মায়ের মত শুশ্রূষা ক'রে কতবার বাঁচিয়ে তুললে—সেই যে, সেইবার টাইফয়েড হয়েছিল—সেও ত এই পূজার ছুটিতেই...'

রুবি রুদ্ধশ্বাসে আস্তে আস্তে ঘেমে উঠছিল। সে বার দু-তিন চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই কথা বলতে পারলে না।

কোন উত্তর না পেয়ে রথীন বললে—'কে, নমি নাকি?'

কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে এবার রুবি বললে—'আমি রুবি।'

রথীন তাড়াতাড়ি তার হাতখানা ঠেলে দিয়ে নিঃশব্দে আবার চোখ বুজল। রুবি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জানালার ধারে উঠে গিয়ে গরাদ ধরে ঘামতে লাগল। লজ্জা এবং অপমানের তীব্র কশাঘাতে কে যেন তার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলছিল। এই ভাবে সে কতক্ষণ যে ছিল কে জানে—হঠাৎ টুং ক'রে একটা শব্দ হ'তেই সে মুখ ফেরাল এবং রথীনের সাথে তার চোখাচোখি হ'য়ে গেল। লজ্জায় সে চোখ নামিয়ে নিয়ে দেখল যে রথীন খানিকটা উঁচু ক'রে হাত বাড়িয়ে ফিডিংকাপে জল ঢালবার চেষ্টা করছে। রুবি যতদূর সম্ভব সঙ্কোচটুকু কাটিয়ে নিয়ে বললে—'আপনি উঠবেন না, আমিই জল দিচ্ছি।'

রথীনের মাথা ঝিম্-ঝিম করছিল, সে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। রুবি ফিডিং কাপটা আস্তে রথীনের মুখের কাছে তুলে ধরল। কিছুক্ষণ আবার নিঃশব্দে কেটে যাবার পর এই আবহাওয়াটাকে লঘু করবার জন্য রথীন বললে—'তুমি...আপনি...আমার জন্য এত কষ্ট করছেন কেন?'

রুবি অন্য দিকে তাকিয়ে নিজের আঁচলের খুঁটটা খুঁটতে খুঁটতে বললে—'আপনার এ অবস্থার জন্য ত দায়ী আমি—আপনি আমায় ক্ষমা করুন'—বলেই সে মুখ তুলল।

রথীন দেখল, রুবির মুখে একটা বেদনার ছায়া পড়ে মুখটাকে পাণ্ডুর ক'রে তুলেছে—চোখ দিয়ে একটা অব্যক্ত ভাষা বেরিয়ে এসে তার পায়ের কাছে আছড়ে মরছে। অবাক বিস্ময়ে রথীন খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিয়ে বললে—'আপনি আমার এ অবস্থার জন্য দায়ী—তার মানে?'

রুবি খানিকটা স্তম্ভিত হ'য়ে থাকল। সহসা তার নিজের চঞ্চল ভাবটা তাকে পেয়ে ব'সতেই সে বললে—'কেন, আপনি কি জানেন না যে আমিই আপনাকে ফেলে দিয়েছিলুম?'

রথীন একটু হেসে বললে—'তা ত জানি না, তবে আপনি যে পড়ে গিয়েছিলেন তা শুনেছি। আর তা ছাড়া আমার জন্য দায়ী কেউ নয়—এ হচ্ছে আমার starric influence। কোন কোন সময় evil stars এ রকম করায়।'

রুবি চুপ করে দাঁড়িয়ে—এ বাড়ীর সকলের বিশেষতঃ তার মায়ের বক্র চক্ষুর অন্তরালে একটা যেন আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছিল। সে বললে—'আমি যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম!'

রথীন তার কথা শেষ না হ'তেই বললে—'তাই বুঝি উঠে-পড়ে আমায় ভাল করবার জন্য লেগে গেছেন। আপনারা আমাদের অতিথি—আপনাদের সেবা নিয়ে আমাকে যে ঋণী হ'য়ে থাকতে হবে'—এই কথা বলে ফেলেই রথীন এর গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে সহসা লজ্জা পেল।

রুবি সে দিকে লক্ষ্য না ক'রেই চট্ করে বলে ফেললে—'বাঃ, আমিই ত আপনার কাছে ঋণী।'

অনিতা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনছিল—সহসা ঘরে ঢুকে বললে—'বেশত, দু'জনেই দু'জনের কাছে ঋণী। এ ঋণ শোধ করবার অবসর তোমরা পাবে ঠাকুরপো।'

রুবি লজ্জায় লাল হ'য়ে পাশের ঘরে ছুটে পালাল।

রবীন্দ্র-কাব্যের সার্ব্বভৌমিকতা

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী, এম্-এ

সাধারণ কবির কাব্য দেশ, কাল ও পাত্রকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হয়। সে কাব্য বা কবিতার মধ্যে অসাধারণত্ব থাকিলেও সার্ব্বভৌমিকতা নাই। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—প্রায় সকলের কবিতাই ব্যক্তিগত, স্বজাতিগত বৈশিষ্ট্যের রঙে রঙীন হইয়া তাহা একটি বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কবির মধ্যে এমন কবিও আছেন—যাঁহার কবিতা কোন একটা বিশিষ্ট দেশের বা বিশিষ্ট কালের নয়; তাহা সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের। দেশ, কাল ও পাত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহা সকল লোকের, সকল-কালের, সকল জাতির রসতৃষ্ণা মিটায়। কবির মধ্যে এমন কবি যাঁহারা—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম।

অবশ্য আমি মহাকাব্য বা মহাকবির কথা বলিতেছি না। মহাকাব্যও গণ্ডীছাড়া নয়। বিশেষ একটা জাতি বা দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, উত্থান-পতনের কথা লইয়াই গড়িয়া উঠে মহাকাব্য। সুতরাং দেশ বা কালকে মহাকাব্য অস্বীকার করে না, বরং বিশেষ একটা বিরাট জাতি বা দেশের কথাতেই ইহা মুখর হইয়া উঠে। ইহার ভিতর কবির নিজস্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ না থাকিলেও—দেশগত বা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ ইহাতে থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ব্যাস, হোমার, ফের্দ্দৌসী ইঁহারা মহাকবি। ইঁহারা সকলেই বিশেষ একটা জাতীয় ইতিহাসের উপর রঙ ফলাইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ব্যাসদেবের মহাভারত ভারতের, হোমারের ইলিয়ড (Iliad) গ্রীসদেশের এবং ফের্দ্দৌসীর শাহনামা পারস্যের জাতীয় ইতিহাস-কাব্যের দর্পণ!

ইলিয়ড যখন আমরা পড়ি তখন ওই গ্রীসদেশের এবং গ্রীক জাতির বীরত্ব, মহত্ত্ব—তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই আমাদের মনকে নাড়া দিয়া যায়। একিলিজ-এর (Achilles) বীরত্ব এবং হেক্‌টরের (Hector) ভ্রাতৃ-প্রীতিতে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবি শৌর্য্য-বীর্য্যের দিক হইতে, প্রীতির দিক হইতে তৎকালীন গ্রীস কতই না উচ্চস্তরে অবস্থান করিতেছিল। তেমনই ব্যাসদেবের মহাভারতে ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার একটা চিত্র আমরা দেখিতে পাই। ভারতীয় আর্য্যজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা শুদ্ধ ঘরোয়া গোলমালের একটা সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। ফের্দ্দৌসীর 'শাহনামাতে'ও পারস্যদেশের সমাজগত, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের আভাস রহিয়াছে। ইরাণ তুরাণের মর্ম্মকথা সোরাব ও রুস্তমের অনুপম কারুণ্যের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য এ রকম বিশেষ কোন জাতি বা দেশের কথায় মুখর হইয়া উঠে নাই। যাহা কিছু তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে তাহাই দেশাতিগ, কালাতিগ হইয়া সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি নন—কাজেই মহাকাব্যও তিনি রচনা করেন নাই। কিন্তু তিনি বিশ্বকবি—তিনি গাহিয়াছেন বিশ্বের চিরন্তন সুখ-দুঃখের গান। কেহ কেহ হয়তো আপত্তি তুলিবেন, তাঁহারা বলিবেন, বিশ্বকবি বলিয়া কোন কবির সংজ্ঞা হইতে পারে না—ইহা অর্থশূন্য। কিন্তু যে-কবি মহাকবি না হইয়াও অনন্ত বিশ্বের সকল কথা, সকল গান কবিতায় প্রকাশ করেন—"বিশ্বকবি"ই বোধ হয় একমাত্র সংজ্ঞা যাহা তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এই কবিত্বের দাবী করিতে পারেন। আমাদের ভারতবর্ষে তো নাই-ই, সমস্ত পাশ্চাত্য জগতেও এমন কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। Shelleyই বলি আর Browningই বলি—সকলের কবিতাই একতরফা। বিশ্ব-কবিত্বের মাপকাঠিতে তাহার বিচার হয় না। বস্তুতঃ আদিহীন, অন্তহীন কালের কবি

রবীন্দ্রনাথ। নিখিল-বিশ্বে যে সুগভীর ধ্বনি আকাশ-পাতাল কম্পিত করিয়া অনাদ্যন্ত কাল হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে—তাহারই সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ যাত্রাপথের মঙ্গলগীতি গাহিয়া গিয়াছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। হিংসা ভুলিয়া, দ্বেষ ভুলিয়া, সত্যের মঙ্গল আদেশ শিরে বহন করিয়া তিনি জ্যোতির্ম্ময়ী শাশ্বত করুণার পথে চলিতে চলিতে গাহিয়াছেন—

"যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক।"

প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, ক্ষুদ্রত্বের বলিদানে অনন্ত অমৃতত্বের অধিকারী হওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন করিতে চাহিয়াছেন সেই ত্যাগ যে-ত্যাগ মানুষকে মহত্তর পথে পরিচালিত করে।

রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছিলেন—বন্ধনে মন হয় ক্ষুদ্র, সীমা তার ক্রমেই ছোট হইয়া আসে। দুঃখও ঠিক সেইখানেই বাজে গভীর হইয়া যেখানে মানুষ অখণ্ডের পরিবর্ত্তে খণ্ড লইয়া মাতিয়া উঠে। এই জন্যই তো সমন্বয়ের বাণীটাই বড় হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার কাব্যে। তিনি চান মিলন। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অতীতে বর্ত্তমানে, প্রাচীনে নবীনে মিলন হউক। মিলন হউক ধনী-দরিদ্রে, পণ্ডিতে মূর্খে, প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে। মিলন—সে যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন—ব্যর্থ হয় না—'পুণ্যের পদ-পরশ তাদের 'পরে।' এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তাই তাঁহার কাব্যে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে—দেশ-বিদেশ অভেদে এমন একটা নিরপেক্ষ সুরের অবতারণা করা হইয়াছে—যাহা সকলেরই প্রিয়—গ্রহণীয় এবং আদরের বস্তু।—"সকল কালের সকল কবির গীতি" যেন এক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে। যাহা কিছু অনন্তকালের এবং যাহা বিশ্বজনীন তাহাই তাঁহার কাব্যে স্থান পাইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের অধিকাংশ অনুভূতিই নিখিল বিশ্বের অনুভূতি। তাঁহার প্রেম বিশ্বপ্রেম এবং তাঁহার বিরহ বিশ্বজনের বিরহ। কিছুমাত্র তাঁহার নিজের নয়—নিজের জাতি বা নিজের দেশেরও নয়—সমস্ত কিছুই বিশ্বজাতির এবং বিশ্বমানবের। উর্ব্বশীকে তিনি চিত্রিত করিলেন অনন্ত আর বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের প্রতীক করিয়া—উর্ব্বশী বিশ্বের প্রেয়সী—

"যুগ যুগান্তর হ'তে তুমি শুধু
বিশ্বের প্রেয়সী।"

কবি কালিদাস মেঘদূত লিখিলেন। তাঁহার কাব্য বিরহী যক্ষের ব্যক্তিগত বেদনার রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া সকলের মনোহরণ করিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহার অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি 'মেঘদূতকে' বিশ্বের দরবারে তুলিয়া ধরিলেন—যক্ষের ব্যক্তিগত দুঃখের প্রকাশ হিসাবে নয়—বিশ্বলোকের চিরদিনকার বিরহ-বেদনার রূপক হিসাবে। মেঘদূতের বিরহ কেবলমাত্র যক্ষের নহে—ইহা অভিশপ্ত, ভাগ্যহত বিশ্বমানবের—

"অন্তর্গূঢ় বাষ্পাকুল বিচ্ছেদ ক্রন্দন।"

রবীন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছেন মানুষকে—কিন্তু সে মানুষ একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—তাহা চিরকালের মানুষ। কাব্য ভরিয়া তিনি গাহিয়াছেন সেই মানুষের গান; তিনি গাহিয়াছেন সেই মানুষের দাবী; অপূর্ব্ব ছন্দে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন—সেই মানুষেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তাই তো তিনি সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চান না—তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে—তিনি [illegible]লেন—

"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্ব্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে।"

নিত্যবিগলিত তাঁর বিরাট্ অন্তর—অনন্ত তাঁর স্নেহরাশি—গভীর তাঁর অনুভূতি গণ্ডী পার হইলেই মানুষ মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে; এই আনন্দই উদ্বেল ও উদ্দাম হইয়া কবির মনে আঘাত করে—আর তিনি "হিল্লোলিয়া, মর্ম্মরিয়া, কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া" সমস্ত ভূলোকের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিতে চান। অশান্ত মনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁর 'সীমাহীন, অন্তহীন' হইয়া সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে চায়।

এ কল্পনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সেই সম্ভব; কারণ তিনিই একমাত্র কবি যাঁহার কাব্যে এই বিরাট্ বিশ্ব-মানবতার প্রথম স্থান পাইতে পারে। তিনি তো স্পষ্টই বলেন—

"আমার সব অনুভূতি ও রচনার ধারা এসে ঠেকেছে মানবের মধ্যে। * * * স্বাজাত্যের খুঁটি গাড়ি করে নিখিল মানবকে ঠেকিয়ে রাখা আমার দ্বারা হ'য়ে উঠল না। কেন-না অমরতা তারই মধ্যে যে মানব সর্ব্বলোকে। আমরা রাহুগ্রস্ত হ'য়ে মরি; যেখানে নিজের দিকে তাকিয়ে—তার দিকে পেছন ফিরে তাকাই।"

সত্য কথা বলিতে কি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একটা চিরন্তন সত্ত্বা—সে সত্ত্বা কেবল নিজেকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। সেই জন্যই তিনি তরী ভাসাইয়াছেন "ভুবনের ঘাটে ঘাটে।" তাঁর কাব্যও তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের প্রতি উৎসর্গ করেন নাই; "মহুয়া"র প্রারম্ভে তিনি মুখবন্ধ করিয়াছেন—

"শুধায়ো না, কবে কোন গান
কাহারে করিয়াছিনু দান,
পথের ধূলারপরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।"

এই রকম একটা বিরাট্ সর্ব্বজনীন অনুভূতি তাঁর কাব্যের মধ্যে আছে বলিয়াই তিনি কাব্যজগতের সার্ব্বভৌম সম্রাট।

বড় কাব্য বা শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শনই এই যে তাহা সীমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সকলের হইয়া দাঁড়ায়। রবীন্দ্র-নাথের কাব্যে আমরা তাহারই আভাস পাই। ইহা যেন একটি নদী। পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া নদী কত গ্রাম, কত জনপদের প্রান্ত ঘেঁসিয়া কল্‌কল্, খল্‌খল্ করিয়া প্রবাহিত হয়। যেখানে যেখানে তাহার পদস্পর্শ পড়ে—তাহাই শ্যামসবুজতার রঙে রঙীন হইয়া উঠে। মাঠ ভাবে নদী তাহার—তীর ভাবে নদী তাহার—গ্রাম ভাবে নদী তাহার। কিন্তু নদী তো কাহারও নহে। সীমার মধ্য দিয়া সে অসীমে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহার বুকে মহা-সাগরের সহিত মিলন-স্পন্দন। সে সকলেরই অথচ কাহারও নয়—তাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু আসক্তি নাই—যেন 'নলিনীদলগতজলম্'। রবীন্দ্র-কাব্যও ঠিক তাই। তাঁহার কাব্যে সোলোমনের গীতাবলীর (Songs of Solomon) প্রভাব দেখিয়া কেহ বলেন—'ইহা আমাদের'; কেহ বা সুফিমতবাদের (Suffism) গন্ধ পাইয়া বলেন, 'ইহা আমাদের; আবার কেহ কেহ বৈষ্ণবভাব ও উপনিষদের আদর্শের ধরণ বলিয়া ভাবেন,'ইহা আমাদের।' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে কেহ বলেন ইয়েটস্-এর (Yeats) মৃত্যু, তাঁহার অজ্ঞেয়বাদকে (Mysticism) কেহ বলেন মেটারলিঙ্ক-এর (Materlink) অজ্ঞেয়বাদ; তাঁহার প্রেমকে কেহ বলেন ব্রাউনীং-এর (Browning) প্রেম। ওই নদীর মত ইহা সকলেরই, কিন্তু কাহারও নয়। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব। তিনি বিশ্বমানবের প্রাণের এমন তন্ত্রীতে আঘাত করেন, যাহার ফলে সকলের মন-বীণাই বাজিয়া উঠে। এমন একটা অভিনব সজ্জায় তিনি তাঁহার কাব্যসুন্দরীকে সাজাইয়াছেন যে, ইহা যেন সত্যই "সকল কালের সকল কবির গীতি" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কবিবর মাইকেল একস্থানে বলিয়াছিলেন, সমস্ত কিছু আহরণ করিয়া এমন কাব্য রচনা করিয়া যাইব—

'গৌড়জন যাহে—
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মধুসূদন তাঁহার উক্তিকে কতদূর সার্থক করিয়াছিলেন তাহা সুধীজনের বিচার্য্য; কিন্তু তাঁহার উক্তির যদি কোন অসম্পূর্ণতা থাকিয়া থাকে তো একথা আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ তাহা পূর্ণ করিয়াছেন। সর্ব্বজাতির, সর্ব্বদেশের এবং সর্ব্বকালের ভাব ও অনুভূতির সমন্বয়ে তিনি যে কাব্য, যে গান রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি—শুধু গৌড়জন নয়—

বিশ্বজন তাহে—
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

হে তুমি হতভাগ্য !

(গল্প)

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

তারপর অনেক কষ্টের পর—শিশুর সমস্ত দেহটা ধাত্রী দেখতে পেল। দেখতে পেল ক্রমে-ক্রমে আরও অনেকে, শুধু শুক্লা অর্থাৎ শিশুর জননী ছাড়া।

শিশু যে মুহূর্ত্তে ফুটল, শুক্লা সেই মুহূর্ত্তে ঝরে পড়ল।

শুক্লার স্বামী কেঁদে ফেলল, শিশুর পিতা ভাবল: আমার মেয়ে।

* * *

রবিবার, সকালবেলা। অয়স্কান্ত তবলা বাজাচ্ছেন কিংবা শিখাচ্ছেন···

খর্ব্বকায়, টালু কপাল, একটু যেন নিষ্প্রভ-মণি-সমন্বিত দু'টি চোখ, দৃষ্টি নিরতিশয় অনুসন্ধিৎসা-মাখান, চোখা নাক, দাড়ি—দূর থেকে দেখতে অনেকখানি সাবানের ফেনা—কাছে এলে সন্দেহ হয়: ভাড়া করা, এমন অদ্ভুত দাড়ি! গা'র রঙ, ফ্যাকাসে হলদে—যেন স্বাস্থ্যহীন, কিন্তু তা না, ঐরকমই রঙ। এই ভেঙ্গে-চুরে মাটির সঙ্গে মিশে-যাওয়া-প্রায় গোছের দুর্ব্বল, বৃদ্ধ, আবার একসময় যাকে বলে, অনেকটা বরযাত্রীদের মধ্যে 'ক্যারিকেচার জানা ঘোড়েল ও তোখড়' ছেলে গোছের। যখন গম্ভীর তখন পৃথিবীর গাম্ভীর্য্যের প্রতীক যেন, কয়েক ঘণ্টা বাদে আবার হয়তো চায়ের টেবিলে সকলের মধ্যে সব চেয়ে আমুদে, বাক্‌পটু, কলহাস্যপরায়ণ—যেন ছোট ছেলেটি। কিন্তু সাধারণতঃ বেশীর ভাগ একজন সাধারণ গৃহস্বামী, একটা পরিবারের কর্ত্তা—'সংসারের ভাল হয় কিসে,' এই চিন্তায় আচ্ছন্ন।

এত কথা অয়স্কান্তেরই সম্বন্ধে—তাঁর আর গান-বাজনার। যাক্, যা বলছিলুম—অয়স্কান্ত তবলা বাজাচ্ছেন কিংবা শিখাচ্ছেন···

তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা একদিন যিনি অবশ্য সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু এখন না, শুধু তাই না, বর্ত্তমানে অতি বিশ্রী ও হাড়গিলা-সদৃশ যাকে বলে—তা তিনি। বিশেষ দ্রষ্টব্য: চুল তাঁর ইঁদুরের গা'র রঙের মতন—একদিন তিনি অবশ্য সুন্দরী ছিলেন। তাঁর বয়সও তো কম হ'ল না। সব সময়েই ভীষণ ব্যস্ত।—বিশেষ ব্যস্ততা-সহকারে তিনি তখন রাঁধছিলেন।

আর অমলা, তাঁদের একমাত্র কন্যা শয়ন-ঘরের মধ্যে কতকগুলি ছবির ঝাড়পোছে ব্যস্ত।

অমলা স্কুলে পড়ে—পড়তে তার ভাল লাগে। তাই বলে সেই 'ভাল-লাগার' মধ্যে সে এমনিভাবে ডোবে নি যাতে না-কি সংসারের কাজ করতে গেলে তার বিরক্তি লাগতে পারে। কাজ করবার নামে 'মাই গড্' বলে যে পড়ুয়ে মেয়েরা,—অমলা তাদের পংক্তির মধ্যে নয়। তবে, একথা ঠিক, কাজের চেয়ে সে পড়াশুনা বেশী পছন্দ করে।

দু'টি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলে—তার দুই ভাই—সেই সময় লাফাতে লাফতে, চেঁচাতে চেঁচাতে তার কাছে এসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল—দিদি, ও দিদি শুনছ—

'আঃ ছিঃ, চেঁচায় না' অমলা ভাইদের বলল, 'বাবা রাগ করবেন।'

ছেলে দুটি তাদের ছোটভাই যেখানে বসে বসে ঘুরি বানাচ্ছিল—সেদিকে এগুল···

ঠিক সেই সময় হুড়্‌মুড় ক'রে একটি লোক সেখানে এসে উপস্থিত। সে হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে—ভীষণভাবে কাঁপছে, চুল তার উস্কখুস্ক—চোখ-মুখ শুক্‌নো। সমস্ত কিছু মিলে সে যেন ঝড়ো কাক।

মণ্টু—হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলে দুটির মধ্যে যেটি ছোট তাকে দেখে চীৎকার করে উঠল, 'ওরে মেসোমশায় এসেছে!'

আর অমলা 'ওমা, মেসোমশায় যে!' বলে, সহাস্য-মুখে লোকটির দিকে তাকাল। সুপ্রভা রান্নাঘর থেকে

ছুটে এলেন: 'কই, কোথায়? তাই তো, তবুও যা হোক্ মনে পড়ল।'

লোকটি তাঁদের দিকে কিয়ৎক্ষণ ট্যালার মতন তাকিয়ে রইল, তার পর কি যেন বলতে গেল—ঠিক সেই সময় অয়স্কান্তের তবলার মিষ্ট আওয়াজ ভেসে আসল—ধিন্ তা-তা-ধিন—। সে কানে হাত দিল,—যা বলতে যাচ্ছিল তা রয়ে গেল অপ্রকাশিত। ঘরটার মধ্যে কেমন একটা থম্‌থমে পীড়াদায়ক নিঃস্তব্ধতা আবহাওয়াকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে তুলল যেন।

'শুক্লা মারা গেছে!' হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে লোকটি বলল—গুড়ুম করে একটা আওয়াজ হ'ল যেন তার মুখ থেকে: 'কাল রাত্রে একটার সময়।'

শুনে সুপ্রভা বজ্রাহতের মতন নিঃস্পন্দ, অমলা আর তার ভাই দুটি বিমর্ষভাবে চেয়ে রইল তাদের মেসোমশাইর দিকে!

আবার সেই পীড়াদায়ক নিঃস্তব্ধতা, শুধু অয়স্কান্তের তবলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

সময় কেটে যেতে লাগল···

'আমার', লোকটি থেমে থেমে বলল অনেকক্ষণ পরে: 'একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়ে উপহার দিয়েই শুক্লা চলে—' সে আর বলতে পারল না

'এই যে—বড়কর্ত্তার খবর কি? সুখবরটা দেবে না-কি হে ভ্রাদার?' অকস্মাৎ অয়স্কান্ত দরজার কাছে এসে উপস্থিত হলেন, মুখে তাঁর একগাল হাসি। সে-হাসি পরক্ষণেই লোপ পেয়ে গেল, তিনি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গেলেন, যখন অন্যান্য সকলের মুখাকৃতি ভাল ক'রে দেখলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে উঠলেন, ব্যাপার কি?

'বাবা', মন্টু বলে ফেলল, 'মাসীমা মারা গেছে!'

সঙ্গে সঙ্গে 'কিন্তু', লোকটি বলল, এমনভাবে বলল যেন সে বলল না: 'একটি মেয়ে দিয়ে গেছে আমায়।' বলে অদ্ভুতভাবে নিঃশব্দ-হাসি হাসল একটু, বড় করুণ বড় সহানুভূতি আকর্ষক সে হাসি।

অয়স্কান্ত দরজার কাছেই স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তাঁরা সকলেই জাত: শুক্লার সন্তান হবে—প্রথম সন্তান! সেই শুভদিনের শুভ-বার্ত্তা শুনবার জন্য তাঁরা উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু তা যে এমন মর্ম্মান্তিক হবে কে ভেবেছিল!

সময় কেটে যেতে লাগল···

এবং যখন অনেকটা কেটে গেল—তখন শ্লথ-গতিতে বিড়ালের মতন চুপি-চুপি এসে ঘরে ঢুকলেন অয়স্কান্ত: 'ও রকম মন-মরা হয়ো না বিনয়।' লোকটির কাঁধে হাত দিয়ে তাকে তিনি সান্ত্বনা দেন: 'জানি, এ বড়ই দুঃখের, কিন্তু সব ভগবানের হাত ভাই।' একটা ঢোক গেলেন: 'যখন আমরা মানুষ, তখন এসব সইতে হবে। আমাদের কাজও করতে হবে, খেতেও হবে, শুতেও হবে। সম্মুখে আমাদের রাশি-রাশি কর্ত্তব্য পড়ে রয়েছে।'

বিনয় সেই মুহূর্ত্তে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল। সে যেন আর সহ্য করতে পারছিল না—এমনি ভাবে সে টল্‌তে টল্‌তে শয়ন-ঘরের পাশে অপেক্ষাকৃত একখানি ছোটঘরে প্রবেশ ক'রে একটা চেয়ারে ধপ্ ক'রে বসে পড়ল, নির্জ্জীবের মতন।

অয়স্কান্ত ভাবলেন, আহা, অভাগা!

জগতে বিনয়ের আপনার জন বলে কেউ যখন ছিল না তখন একদা অয়স্কান্তের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ। স্নেহ-পরবশ হয়ে যত্নসহকারে অয়স্কান্ত বিনয়কে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তারপর কোন এক শুভদিনে বিনয়ের সঙ্গে শুক্লার বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'ল। তার পরই এক ইন্সিওরেন্স অফিসে একটি কাজ পেয়ে সহরের অন্য প্রান্তে শুক্লাকে নিয়ে বিনয়ের বাসা বাঁধতে হ'ল। সে সব কতদিনেরই বা কথা! তার এই জীবনে বিনয় মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য সুখী হয়েছিল। আবার এ কি হ'ল?

কথাটা ভাবা মাত্রই বিনয়ের সারা দেহের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হ'য়ে গেল—এমনিভাবে সে কেঁপে উঠল, যে-চেয়ারটায় সে বসে সেটাও উঠল ঠক্-ঠক্ ক'রে মৃদুভাবে! হঠাৎ ঘরের চারিদিকে তার দৃষ্টি পড়ল: হ্যাঁ, এই ঘর, এই ঘর হয়েছিল বাসর ঘর—যেদিন শুক্লাকে সে বাস্তবিক পেয়েছিল। শুক্লা—তার কর্কশ জীবনে যে এনেছিল স্নিগ্ধতা, যে ছিল তার একান্ত সমস্ত কিছু, সে কোথায় গেল! কেন গেল! আমার আর রইল কি, আমায়

আর রইল কে! কিছু না, কেউ না,...শুধু আমার মেয়ে ছাড়া। হয়তো সে-ও চলে যাবে! বিনয় ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠল, ভাবল: আমি থাকব না, আমি বাঁচব না! আর সেই মুহূর্ত্তেই 'কিন্তু', কে যেন বলে উঠল অথচ সে-ই বলে উঠল তার অজান্তে, 'আমার মেয়ে?'

হ্যাঁ, আমার মেয়ে। তাকে বাঁচাতে হবে, বড় করতে হবে, মানুষ করতে হবে—বিনয় দৃঢ়ভাবে ভাবতে লাগল।

সে ভাবছিল আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছিল। কিন্তু সে যে ভাবছিল সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছিল—তার কোনটাই সে বুঝতে পারছিল না। অথচ এটা অনুভব করছিল যে তার গণ্ড বেয়ে জল পড়ছে। এমন কি সে-জল মাঝে মাঝে হাত দিয়ে সে মুছেও ফেলছিল। তথাপি,—মোটের উপর এটা নির্ভুল যে, সে যে তার দুঃখময় ও হঠাৎ-আলোর ঝলক্‌ মিশ্রিত বিচিত্র জীবনের কথা ভাবছিল ও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছিল—তা সে বুঝতে পারছিল না, অনুভব করতে পারছিল না।...

ভগ্নীর মৃত্যু-সংবাদের প্রথম নিদারুণ আঘাতটা কিছুটা কাটিয়ে উঠে সুপ্রভা স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন বিনয়ের বাড়ী। এলেন যখন, কোলে তাঁর তখন বিনয়ের 'সবে কাল-রাত্রে-হওয়া' মেয়েটি, সে কাঁদছে...ভয়ানক কাঁদছে। তাকে কোলে ক'রে সুপ্রভা যখন বিনয়ের সন্ধান করলেন—তখন দেখা গেল, বিনয় সেই ঘরে, সেই চেয়ারে ঠায় বসে রয়েছে।

সুপ্রভা তাকে অনেক বুঝালেন।

কিছুক্ষণ তাঁর দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। তার পর মেয়ের উপর দৃষ্টিপাত করল। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ সে গভীর ভাবে তাকে দেখল। চোখের পলক পড়েছিল—কিন্তু তা এত কম যে, তা কিছু না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে যখন সে আবার সুপ্রভার দিকে চোখ উঠাল সুপ্রভার তখন পা দুটোতে বেশ ঝিন্‌ঝিনি ধরেছে। তবু স্থির ভাবে তিনি অপেক্ষা করলেন—হয়তো বিনয় কি বলবে—এই ভেবে।

বিনয় বলল, কিন্তু আর কিছুই সে বলল না, শুধু তার মেয়েকে দেখিয়ে ধরা গলায় বলল, 'মেয়েটাকে আমার আপনি নিজের চোখে রাখবেন—ও কোন ঝি-টির উপর নির্ভর করবেন না।' বলেই, সেই যে সে গুম্‌ হ'য়ে গেল আর সন্ধ্যার আগ পর্য্যন্ত সে এমনি ভাবেই বসে রইল।

চারিদিক যখন অন্ধকারাবৃত—তখন সে শ্লথগতিতে যেখানে তার মেয়েকে নিয়ে সুপ্রভা পাহারায় ছিলেন—সেখানে উপস্থিত হ'ল। ছোট্ট একখানি রেলিঙ দেওয়া খাটে শিশু তখন শুয়ে।

সেই খাটখানার পাশে গিয়ে সে দাঁড়াল, ডান হাতটা বাড়িয়ে রেলিঙগুলোর মধ্যে কতটা ফাঁক তা সে আঙুল দিয়ে মাপল। এই সময় শিশু সামান্য একটু নড়ে-চড়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ সে একটু ঝুঁকে পড়ল, তাকে পরিপূর্ণ ভাবে অনেকক্ষণ সে দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করল। 'এই আমার সর্ব্বস্ব,' বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে উঠল সে, শিশু যখন তার দিকে একটু চাইল—অন্ততঃ সে তাই মনে করল অনেকটা।

সুপ্রভাকে লক্ষ্য করে: 'আমি—' একটা ঢোক গিলল সে, বলল—'নিশ্চিন্ত, আমার মেয়েকে আপনার তত্ত্বাবধানে রেখে।'

হঠাৎ 'এখন যাই, কাল সকালেই আসব' বলেই সে চলে গেল।

সুপ্রভা কোন কথাই বলতে পারলেন না। শুধু মনে মনে বলে উঠলেন: আমি এত ক'রে শুক্লাকে বলেছিলুম যে যখনই বুঝবি তখনই—চোখ দিয়ে তাঁর টস্‌টস্‌ ক'রে জল পড়তে লাগল। স্বামীকে আসতে দেখে চোখ মুছলেন।

'বিনয় গেল কোথায়?' অয়স্কান্ত প্রশ্ন ...লেন এসেই।

'কে জানে!' সুপ্রভা বলল, 'সকালে আসব ব'লে গেল।'

'দেখলুম বেরিয়ে যাচ্ছে—ডাকলুম, কিন্তু—' অয়স্কান্ত কাঁধ ঝাকালেন। 'ওর জীবনটায় যে,' অয়স্কান্ত যেন মাটির ভিতর থেকে কথা বললেন, 'কত দুঃখ ছিল!' তার পর অনুসন্ধিৎসু হলেন: 'কোথায়ই বা গেল, খুঁজবই বা কোথায়!' একটু থেমে 'কি যে করি' বলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। নত ও গম্ভীর মুখে আস্তে আস্তে কয়েকবার পাইচারী করলেন। এত আস্তে আস্তে যে,

এটা আশ্চর্য্য নয়, যদি কেউ বলে, তিনি দাঁড়িয়েই আছেন, অবশ্য কথাটা তার ভুল হবে, বা বলা চলে চোখের ভুল। তবে এটা ঠিক্, তাঁর ওধরণের পাইচারী দেখলে চোখের ভুল হওয়াটা অসম্ভব নয়, সাধারণতঃ। যাই হউক, মোটের উপর তিনি পাইচারী করলেন—করতে করতে কখন যে তিনি তাঁর গানবাজনার ঘরে গিয়ে হারমোনিয়ম নিয়ে বসলেন তা নিজেই টের পেলেন না। টের পেলেন না যে, তিনি হারমোনিয়ম বাজাচ্ছেন, অনেকক্ষণ বাজাচ্ছেন। কানে তাঁর আওয়াজ যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল না, তা অন্ততঃ তাঁর বিকৃত মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না মোটেই।

চমক্ ভাঙল তাঁর সুপ্রভার হিস্ হিস্ শব্দ সংক্রামিত গলায়: 'আঃ, শুনছ! বসে বসে হারমোনিয়ম বাজাচ্ছ··· মেয়েটা যে ঘুমুচ্ছে। রাত অনেক হয়েছে কিন্তু।'

'এ্যা?'

'বিনয় আবার এসেছে, মেয়েটার কাছে বসে আছে। হারমোনিয়ম শুনলে সে কি মনে করবে বলতো!'

'তাই তো!' অয়স্কান্ত হারমোনিয়ম ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন: 'এ আমার উচিত হচ্ছিল না।' দাঁড়িয়ে পড়লেন যেন কেউ দাঁড় করিয়ে দিল।

'দাঁড়িয়ে থেক না—চল, খেতে চল। আর বিনয়টার পেটেও তো কিছু যাওয়া দরকার, সে তো দাঁত লাগিয়ে বসে আছে। চল, অমলা কতক্ষণ বসে থাকবে।'

অমলা কতক্ষণ বসে থাকবে—এ কথাটাকে ব্যাখ্যা ক'রে দেখলে অর্থটা দাঁড়ায়: অমলা কতক্ষণ ভাত নিয়ে বসে থাকবে। কারণ সে-ই বর্ত্তমানে রান্নার ভার নিয়েছে, যে-হেতু মা তার ব্যস্ত বিনয়ের মেয়েকে নিয়ে, তাঁর, বলা চলে—এখন মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নেই। যদিও কথাটা ঠিক্ তিনি স্বভাবতঃই ভয়ানক ব্যস্ত—তাহলেও এখন আরো ···আর-ও বড় বেশী রকম ব্যস্ত। এককথায় লোকে যাকে বলে সাধারণতঃ,—মরবারও ফুরসৎ নেই।

খাওয়া-দাওয়ার পর অয়স্কান্তের যখন নাক ডাকছিল, বিনয় এসে দাঁড়াল তাঁর কাছে। অয়স্কান্তের নাকে হাত দিল সে, একটা ঠেলা মারল তাঁকে। অয়স্কান্ত জেগে উঠলেন, ঘুমন্ত-চোখেই তিনি উঠে বসলেন, বিনয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'কি বিনয়?'

অনতিদূরে ছোট খাটখানার উপর তার ঘুমন্ত মেয়েকে দেখিয়ে সে বলল, 'ও জেগে পড়বে।' গম্ভীর গলায় আবার বলল, 'নাক ডাকাবেন না।' বলে, এগিয়ে গিয়ে ঘুমন্ত শিশুর চিবুকে আল্‌তো করে তার ডান হাতের তর্জ্জনী ছোঁয়াতে গেল, কিন্তু বিদ্যুৎগতিতে তর্জ্জনীকে নিরস্ত করল সে: থাক্ জেগে উঠবে, না ঘুমুলে শরীর খারাপ হবে ওর। ভাবতে-ভাবতে মেয়ের দিকে চোখ রেখেই সে পিছাতে লাগল, আর যেন মাঝপথে কে তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিল—হঠাৎ সে এমনিভাবে এগিয়ে এল একেবারে সুপ্রভার কাছে। তাঁকে সে বলল, 'ঘুমে কাতর হবেন্ না যেন, আর,' মেয়েকে দেখিয়ে কথা সমাপ্ত করল, 'লক্ষ্য রাখবেন, ওর গলা যেন শুকিয়ে না যায়, ওর ঘুম না ভেঙ্গে যায়।'

কাঁথা সেলাই করছিলেন সুপ্রভা, বললেন, 'না-না, তুমি ভেব না।'

'কাঁথা যেন শক্ত না হয়—ওর গায়ে লাগবে, কষ্ট পাবে।' সুপ্রভার হস্তস্থিত কাঁথাখানাকে স্পর্শ ক'রে সে পরীক্ষা করল।

তারপর সে চলে গেল, যাবার সময় বিড়্‌বিড়্ ক'রে বলতে-বলতে গেল, 'আমার মেয়ে, তা'র জন্য আমাকে অনেক ভাবতে হবে।'

অয়স্কান্ত ও সুপ্রভা ভাবলেন: আহা! বেচারী!

সকাল আটটা লাগাৎ বিনয় আবার এল। চোখে তার নিদ্রাহীনতার সুস্পষ্ট ছাপ। মুখ তার শুকিয়ে চিম্‌সিয়ে এমন হ'য়ে গেছে যে মনে হ'ল: জালি অবস্থাতে-ই একটা লাউয়ের পরিপূর্ণ মৃত্যু হয়েছে। সে দুঃখ প্রকাশ করল যে, তার উঠতে দেরী হ'য়ে গেছে, ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

প্রকাশ করল ঐটুকু বটে, কিন্তু মনে হ'ল তার কথার ধাঁচে যে, এটুকু সে অপ্রকাশ রাখল ঐ-প্রকাশের মধ্যেই:—

'ভোরের দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম একটু, আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, আমার ঘুমিয়ে না পড়বার জন্য শত-চেষ্টা সত্ত্বেও, এবং ঐটুকু ঘুমিয়ে পড়ে আমি মহা অন্যায় করেছি —আমায় ক্ষমা করুন।'—কিন্তু তার এই অপ্রকাশিত

বক্তব্য তার প্রকাশিত বক্তব্যের চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট হ'ল, তার দু'টি চোখ এ-ব্যাপারে খুব সাহায্য করল।

আয়স্কান্ত সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, 'এতো খুব ভাল কথা। তা আরও একটু ঘুমিয়ে নিলে না কেন? শরীরটা বেশ ঝরঝরে হ'য়ে যেত।'

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে সে এসে দাঁড়াল তার মেয়ের কাছে। সুতীক্ষ্ণতা মিশ্রিত স্নেহসিক্ত চাহনি ফেলল মেয়ের উপর। শিশুর প্রায় আধা-জীবন্ত মিটমিটে চোখ দু'টির দিকে সে তার মুখ নামাতে লাগল ক্রেনে করে মাল নাবানোর মতন, অনেকটা সেই রকম। আধা-জীবন্ত, মিট্‌মিটে চোখ দুটি ও তার মুখ যখন এক বিঘতেরও কম দূরত্বের সৃষ্টি করল—তখন তার মুখ নামানোর গতি রুদ্ধ হ'য়ে গেল বা রুদ্ধ ক'রে দিল এবং উচ্চারণ করল: 'চমৎকার দু'টি চোখ!'

'রাত্রে ঘুমিয়েছিল বেশ?' কিছু পরে সে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ।' সুপ্রভা বললেন।

'এ ঘরে,' শঙ্কিত-দৃষ্টিতে ঘরের চারিদিকে তাকাতে তাকাতে সে বলল, '—সে-রকম আলো-বাতাস খেলে না।'

'না-না, এ তুমি বলছ কি? এ-ঘরে চমৎকার আলো-বাতাস খেলে।' অয়স্কান্ত বললেন।

কে জানে তার সন্দেহ গেল কি-না, তার মেয়ের দিকে আঙুল বাড়াল সে: 'ওর মাথার বালিস উঁচু হ'য়ে গেছে—ওতে মাথার গড়ন খারাপ হ'য়ে যায়, আমি জানি।'

'তোমার মেয়ের জন্য কিছু ভাবতে হবে না। চল, মুখ-টুখ ধোবে চল।' অয়স্কান্ত তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন কলতলার দিকে।...

* * *

দিনের পর দিন কাটতে লাগল আর বিনয় হ'তে লাগল অদ্ভুত···অদ্ভুততর···অদ্ভুততম—

কথা বলে না, হাসির রেশ মাত্র তার মুখে দেখা যায় না, চুপচাপ প্রায় সর্ব্বদাই ব্যথা-মলিন হ'য়ে বসে থাকে। নাওয়া-খাওয়ার দিকে তার মোটেই লক্ষ্য নাই, জীবনী-শক্তির যেন যথেষ্ট অভাব তাকে পেয়ে বসছে, এমনও মনে হয়, কে যেন তাকে "হিপ নোটাইজ" করেছে।

দিনের মধ্যে শুধু তার একমাত্র চিন্তা তার মেয়ের লালন-পালন সম্বন্ধে। সে একখানা খাতা করেছে। প্রতিদিন তার মেয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সেই খাতায় সে মন্তব্য লিখে রাখে। যদি কোনদিন শিশুর স্বাস্থ্য একটু খারাপ হয়—অমনি তার চোখ তাড়া-খাওয়া মাছের চোখের মত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠে, তার শরীর আরও যেন ভেঙেচুরে যায়, অস্থিরচিত্তে সে কেবল মেয়ের কাছে কাছে পাইচারী করতে থাকে। সুপ্রভা হয়তো দুধ খাওয়াচ্ছেন সে হঠাৎ তাঁর হাত থেকে ফিডিং-বোতলটা একরকম ছিনিয়েই নেয়, দুধটা সে পরীক্ষা করে; একটু কি অস্পষ্টভাবে বলে উঠে—সুপ্রভা তা বুঝবার আগেই দুধটা সে ফেলে দিয়ে কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করে: 'এ দুধ খারাপ।' ততোধিক কঠিন কণ্ঠে বলে—'দুধ ভাল করে ছাঁকা হয়নি'। ঠিক্ সেই সময় অমলা কি কাজে সেখানে এসেছিল। তার দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে বিনয় বলল—'তুমি কাজে অবহেলা করছ।'

'আমি?' অমলা বিস্মিত।

'তুমি দুধ ছাঁক না কেন ভাল করে?' সে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। জড়িয়ে জড়িয়ে মেয়েকে দেখিয়ে 'ওর স্বাস্থ্য আজ খারাপ' বলে সে জানলার কাছে এগিয়ে যায়, আকাশের দিকে চেয়ে থাকে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ।···

তার মেয়েকে স্নান করানো নিয়ে প্রায়ই সে সুপ্রভার সঙ্গে গোলমাল করে। সে নিজে অমলাকে উনুনের কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে এক বালতি জল গরম করে—ভীষণ গরম!

নাওয়াবার সময় সুপ্রভা কেঁপে উঠে বলেন, 'এ কি! এ যে ভীষণ গরম। ওর গা যে পুড়ে যাবে!'

'না', সে প্রতিবাদ করে, 'জল বেশী না গরম করলে—দোষ কাটে না। আমি কত স্বাস্থ্যের বইতে একথা পড়েছি।'

'আমি জানি না, যা ইচ্ছে কর।' সুপ্রভা বলে ফেলেন এবং তার মেয়েকে তার দিকে বাড়িয়ে দেন। সেও হাত বাড়ায়। কিন্তু—

সুপ্রভাকে হাত সরিয়ে আনতে হয়। তিনি বোঝেন:

বিনয়ের মতন মনোভাব তাঁর থাকা উচিত নয়। সে যা করছে রেগে গিয়ে তা'তে ইন্ধন যোগালে শিশুর সমূহ ক্ষতি সুনিশ্চিত। তাই, শিশুকে নিজের কোলেই আবার শুইয়ে দেন, পরে জল শিশুর গা-সহা মতন হ'লে তাতে তোয়ালে ভিজিয়ে, নিঙ্‌ড়ান তোয়ালে দিয়ে শিশুর গা মোছাতে থাকেন।

নিজের মেয়ের নাওয়া সম্বন্ধে নিজের মত আহত হওয়ায় বিনয় নিজেকে অসুখী মনে করে, অবহেলিত বোধ করে। সে সকলের সঙ্গে একদম কথা বন্ধ ক'রে দেয় কয়েক ঘণ্টার মত ইচ্ছে ক'রে। সেই সময় সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল নিজের মেয়ের কাছে বসে থাকে। মেয়ের দিকে সে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। চেয়ে থাকা অবস্থাতেই আপনমনে বলে: 'চমৎকার দেখতে! বেশ মোটাসোটা হচ্ছে।'—যদিও, সত্য কথা বলতে কি, শিশুটি কঙ্কালসার। সে এত রুগ্ন যে সন্দেহ হয়: 'সে বুঝি নেই…অস্তিত্বহীন।' কিন্তু বিনয় তা বোঝে না, কিংবা বুঝেও বোঝে না, হয় তো। হয় তো বা মেয়ের দিকে যখন চায় তখন তার চোখে রঙীন চশমা থাকে, কে জানে!

শিশুর কানের কাছে মুখ দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে তাকে ডাকে: 'খুকু!' তার পর লক্ষ্য করে সে তার দিকে চায় কি না। কিন্তু তার আগেই তা'র চোখ জলে ভরে উঠে।…

ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে সে তাকে সব সময়ে গাদা গাদা গরম জামা পরিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত। শিশু তাতে ছটফট করে, কেঁদে উঠে। আর অমনি সে আস্তে আস্তে শিশুকে ভুলাবার জন্য আরম্ভ করে: 'ও আমার খুকু, ও আমার সোনা, কেঁদ না, তোমাকে আমি ক-ত ভালবাসি।' সঙ্গে সঙ্গে মৃদু মৃদু তাই দেয়। কিন্তু শিশু কেঁদেই চলে…

সুপ্রভা তাড়াতাড়ি শিশুকে কোলে নেন্, গা থেকে তার গরম জামার বাণ্ডিল খুলে ফেলেন।

বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দেয়: 'জামা খুলবেন না, ওর ঠাণ্ডা লাগবে।'

'আমি নিজে মা, আমি জানি না কিসে কি হয়?' সুপ্রভা বলেন।

'ডাক্তাররা বলেন ঐ রকম ভাবে রাখতে—।'

'ওতে আরও ছেলেপেলেরা কষ্ট পায়, দম আটকে আসে, শরীর খারাপ হ'য়ে যায়।'

সুপ্রভার কথা শুনে সে আরও কালো হয়ে যায়। সে শিউরে উঠে।

অয়স্কান্ত তাঁর ছাত্রদের গান-বাজনার ঘরে গান শিখাচ্ছিলেন। মাঝে একসময় জল খেতে এসে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ ক'রে কিছু না বলে চলে গেলেন। বিনয়ের দিকে চেয়ে শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকানি দিলেন মাত্র যাবার সময়।

একদিন অমলা বিকালে শিশুটিকে ঘুম পাড়াবার জন্য কোলে ক'রে বেড়াচ্ছিল ঠিক তাদের বাড়ীর সামনে যে ঘেরা বাগানটুকু ছিল সেখানে।

বিনয় এসে বলল, 'বাগানে ওকে নিয়ে বেড়িও না, গাছ থেকে এখন বিশ্রী গ্যাস বের হয়, তার পর স্যাঁতসেঁতে হাওয়া উঠছে ঘাস থেকে।'

'এ জায়গাটা তো খুব খট্‌খটে,' অমলা বলল: 'আর সবে তো বিকাল হয়েছে। গড়ের মাঠে দেখেন নি, সাহেবদের ছোট ছেলেমেয়েরা এই সময়ে—'

বিনয় তাকে থামিয়ে দেয়: 'আমি কিছু দেখতে চাই না, শুধু আমার মেয়েকে ছাড়া,' একটু চুপ করল, তার পর: 'ওকে সুস্থ রাখা আমার কর্ত্তব্য, আমি বাপ।'

'ডাক্তারবাবুও তো বলেছেন—'

'মোটের উপর,' আবার অমলাকে চুপ করিয়ে দিল সে, কঠিন হ'য়ে উঠল রীতিমত, বলল, 'আমার মেয়ের সম্বন্ধে আমি অনেক বুঝি, এটা ঠিক।' তৎক্ষণাৎ আবার আদেশের সুরে: 'যা বলছি তা তুমি শুনবে।'

এই সময় তার মেয়ে কেঁদে উঠল, অমলা শিশুকে মৃদু ভাবে নাচাতে লাগল।

'অত জোরে না!' বিনয় চীৎকার ক'রে উঠল: 'ও এখন ফুলের মতন নরম—ওতে ওর লাগে।'

অমলার সামনেই পরীক্ষা তা সত্ত্বেও সে এত কিছু

করছে বিনয়ের জন্য,—সে আজ ক-ত দিন বই খুলতে পায় না, বই তাকে হাতছানি দিচ্ছে, আর তা সে তুচ্ছ ক'রে যাচ্ছে শুধু বিনয়ের জন্য এককথায় তারই মেয়ের জন্য,—কিন্তু বিনয়ের এ কি ব্যবহার! সে ভিতরে ভিতরে রেগে উঠল, আর একটু হ'লে বলতে যাচ্ছিল আর কি: মেসোমশায়, দয়া ক'রে নার্স-টার্স রাখুন মেয়ের জন্য—ওসব আমাদের দ্বারা হবে না।' কিন্তু সংযত হ'য়ে গেল কোনরকমে এবং হনহন করে সুপ্রভার কাছে গিয়ে কেঁদে ফেলল: 'মা, মেসোমশাই আমায় কি রকম ক'রে চোখ রাঙালেন, আমি মা কোথায়—' তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে গেল। চোখ মুছতে-মুছতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল অয়স্কান্তের কাছে; কারণ, কয়েকদিন থেকে হঠাৎ দুর্ব্বল হয়ে পড়া মা'র অবস্থা দেখে তার একটা দরকারী কথা মনে পড়ে গেল, ঠিক সেই সময়।

'বাবা!'

'কি?' একটা তার-ছেঁড়া সেতারকে অয়স্কান্ত ঠিক করছিলেন, ঠিক করতে-করতেই বললেন, 'হয়েছে কি?'

'মা'র শরীর খাটতে-খাটতে কি রকম হ'য়ে পড়েছে দেখেছ। মেসোমশায়ের ঐ মেয়েকে নিয়ে রাত্রি বেলায় মা না-ঘুমিয়ে কেবল জেগে থাকে। ঠায় তিন চারদিন ধরে লক্ষ্য করছি মেয়েটা রাত্রে একটু ঘুমায় না—কি চেঁচানি! আর মা ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেল ওঁর মেয়েকে নিয়ে, ঝক্কি সামলাতে সামলাতে মা কাহিল হ'য়ে পড়েছে। মেসোমশাই বলেন, আমি না-কি ওর মেয়ের ফিডিং-বোতল ধুই না, শুনেছ কথা? কিন্তু—' একটু থেমে বলল, 'খুকুকে আমি কি যে ভালবাসি।'

'তা বল, কি করব?' সেতারটা মাটিতে নামিয়ে রাখলেন তিনি।

'মা'কে একটু ডাক্তার বাবুকে ডেকে দেখাও, মা'র অষুধ-টষুধের বন্দোবস্ত কর।'

'বেশ।' অয়স্কান্ত বললেন আবার: 'তোমার মা'র অবস্থা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি।'—একটু হাসলেন।

'আর মেসোমশায়ের কথা যা বললুম?'

'ওর কথা ছেড়ে দেও মা। ওর মনের ঠিক নেই! আহা বিনয়টা বড় দুঃখী, বেচারী!' বলে অয়স্কান্ত জানালার কাছে গেলেন।

মুহূর্ত্তে অমলার মন আর্দ্র হ'য়ে গেল। বিনয়ের জন্য গভীর সহানুভূতিতে সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। ভাবল: মেসোমশায়ের কি কষ্ট!—অমলা পলকে, যাকে বলে, উল্টে গেল।

আর যে-মুহূর্ত্তে সে উল্টে গেল সেই মুহূর্ত্তে তারও অয়স্কান্তের কানে ভেসে এল ঘৃণা-মিশ্রিত কণ্ঠস্বর: 'সরে যাও, ওর মুখের কাছে ঝুঁকোনা।'

'বিনয়ের গলা না?'

অয়স্কান্তের প্রশ্নের উত্তর দিল অমলা, 'হ্যাঁ।'

'চল তো,' অয়স্কান্ত দরজা-মুখী হলেন, বললেন, 'আবার কি হ'ল দেখি-গে!'

গিয়ে দেখলেন, নন্তু, পূর্ব্বোক্ত হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলে দুটির মধ্যে যেটি বড় এককথায় তাঁর বড় ছেলে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই পাশে মণ্টু দাঁড়িয়ে সহজ ভাবে। তাদের দুই জনেরই চোখ একটু দূরে যেখানে বিনয় তার মেয়েকে কোলে ক'রে বসে আছে সেখানে। আর দেখলেন, বিনয়ের মুখ-চোখ অস্বাভাবিক রকম কুঁচকান।

আস্তে আস্তে অয়স্কান্ত মণ্টুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে রে?'

'বাবা,' ধীরে ধীরে এগিয়ে এল মণ্টু পিতার কাছে, বলল: 'দাদা না খুকুর কাছে গিয়ে যেই একটু আদর ক'রে কথা বলেছে অমনি,' গম্ভীর গলায় মণ্টু কথা শেষ করল: মেসোমশায় দাদাকে বললেন, "তোমার নিঃশ্বাস ওর নাকে গেলে ওর অসুখ করবে"—আরও বললেন, দা'দার নিঃশ্বাসে না-কি বিষ আছে, তাতে খুকুর ছোঁয়াচে রোগ হ'তে পারে।'

দূরে বিনয় তার মেয়ের চুল-বিহীন মাথায় আলতো ক'রে হাত বুলাচ্ছিল। অয়স্কান্ত তাকে উদ্দেশ ক'রে আপন মনে গজ্‌গজ্ ক'রে উঠলেন: 'ননসেন্স!...ওর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়।' অয়স্কান্ত পৃথিবীর গাম্ভীর্য্যের প্রতীক হ'য়ে উঠেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে।

* * *

বৈশাখ মাস। বিকালের দিকে বড়-বড় ফোঁটা-আলা সামান্য একটু বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে এমন গুমোট গরম পড়েছে যে তা অসহনীয়।

সুপ্রভার শরীরটা সেই সময় থেকে এত খারাপ লাগছিল! তবু—বিনয়ের মেয়েকে নিয়ে তাঁর ব্যতিব্যস্ততার সীমা ছিল না। শিশু ঘুমাচ্ছিল না কিছুতেই, তাকে নিয়ে তিনি একবার উঠেন একবার বসেন, একবার ঘুমপাড়ানি গান গান...

শিশু যখন ঘুমাল—তখন বেশ রাত্রি। নিশ্চিন্তমনে সুপ্রভা কলতলার দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় খাওয়ার ঘরে তার চোখ পড়ল। দেখলেন: ভাতের থালা সামনে রেখে বিনয় গুম্‌ হ'য়ে বসে আছে আর অয়স্কান্ত তাকে খাওয়ার জন্য সাধছেন—

'কি হল বিনয়? খাচ্ছ না কেন?' সুপ্রভা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'রান্না যাচ্ছে-তাই,' বিনয় মন্তব্য করল: 'আপনার মেয়ে রাঁধতে পারে না।'

'আচ্ছা, তুমি মাছের ঝোল দিয়ে অন্ততঃ দু'টি ভাত খাও।' অয়স্কান্ত পীড়াপীড়ির কিছু বাকী রাখছিলেন না: 'খেয়েই দেখ না, কেমন লাগে।'

কিন্তু বিনয় ঠায় গুম্‌ হয়ে বসে রইল।

ঠিক এই সময়ে সুপ্রভা দুড়ুম করে মাটিতে পড়ে গেলেন। অয়স্কান্ত ছুটে গেলেন, অমলা ছুটে এল। সুপ্রভা একেবারে সংজ্ঞাশূন্য। অমলা মাগো বলে কেঁদে উঠল। নন্তু দৌড়ল ডাক্তার বাবুকে ডেকে আনতে।

সুপ্রভার যখন জ্ঞান হ'ল তখন তিনি দেখলেন তাঁর চারিপাশে তাঁরই দিকে ব্যাকুল-নয়নে তাঁহার স্বামী, তাঁর সন্তানরা চেয়ে আছে। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন কি হ'য়ে যাচ্ছেন আনন্দে, আবেগে—তা তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, উপভোগ্য অশ্রু তাকে বলা চলে, হ্যাঁ।—আর তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

ডাক্তারবাবু বললেন অয়স্কান্তকে, 'ভয়ানক দুর্বল হ'য়ে পড়েছেন রীতিমত বিশ্রাম দরকার। এক কাজ করুন, ওঁকে অন্ততঃ মাস দেড়েকের জন্যে চেঞ্জে নিয়ে যান।' একটু থেমে বললেন, 'আর এর আগের বারে যে অষুধটা দিয়ে ছিলুম সেটাও খাওয়াবেন—তাহলেই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন।'

অয়স্কান্ত তৎক্ষণাৎ রাজী হ'য়ে গেলেন: 'কিন্তু—' একটু থেমে বললেন, 'ঐ বাচ্চাটির কি করা যাবে? মানে বিনয়ের মেয়ের কথা বলছি।'

'আমি তো সেদিন আপনাকে বলেছি সে কথা। বাপের সংস্পর্শে ও যত কম থাকবে ওর পক্ষে ততই মঙ্গল। ঐ ভদ্রলোকই দেখবেন মেয়েটিকে মারবেন, আর পনেরোটা দিনও বোধ হয় পার হবে না।' বলে, সুপ্রভার কিছু দূরে বিনয়ের ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে চাইলেন।

'আমরা থাকতে অন্ততঃ তা—'মৃদুস্বরে সুপ্রভা কি বলতে যাচ্ছিলেন—ঠিক্‌ এমন সময় ছায়ার মত বিনয় উপস্থিত হ'ল। ঘসঘসে গলায় বলল সুপ্রভাকে: 'আপনার কাছে আমার মেয়ে থাকলে, আমি বেশ বুঝছি, ওর ছোঁয়াচ লাগবে, ও—'গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল: 'রোগে পড়তে পারে। তাই ওকে আমি এখান থেকে এখনই নিয়ে যাব।' বলেই চিলের মতন তার মেয়েকে সে ছোট খাটটার থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে বুকের সঙ্গে তাকে জাপটে ধরে 'আচ্ছা আসি' বলে হন্‌ হন্‌ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর বাড়ীর বাইরে রাস্তার উপর এসে সোজা তার নিজের শূন্য-গৃহের দিকে একপ্রকার ছুটতে আরম্ভ করল ...

'বেচারী!' অয়স্কান্ত বলে উঠলেন।

'দেখবেন আমি বলে দিচ্ছি,' ডাক্তার কপাল কুঁচকিয়ে মন্তব্য করলেন: 'আগে বলেছিলুম পনেরো দিনের মধ্যে—কিন্তু এখন বলছি, ও দেখবেন তিনদিনের মধ্যেই...'*

* ইংরেজী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

ইতিহাস রচনায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রভাব

(পূর্ব্বানুবর্ত্তী)

শ্রীপ্রিয়নাথ নিয়োগী

তৃতীয় উইলিয়ম ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮১৫ সালে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ হয়। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ১২৬ বৎসরের। এই ১২৬ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে সাতটি এবং *মোটের উপর এই সাতটি যুদ্ধের পরিমাণ কাল যাট বৎসর। এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের কারণ কি? নূতন আবিষ্কৃত মহাদেশ।* এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনে থাকিবে কি ফ্রান্সের অধীনে থাকিবে, এই প্রশ্নই যে এই সাতটি যুদ্ধের মূলে রহিয়াছে, দীর্ঘ ১২৬ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কাল ব্যাপীই পৃথিবীর বাণিজ্যে হল্যাণ্ডের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার। ক্রমওয়েলের সময়ে এবং দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব কালে ইংলণ্ড হল্যাণ্ডের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে এবং আমরা দেখিয়াছি, শেষ পর্য্যন্ত এই সংগ্রামে একদিকে লড়িয়াছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এবং আর একদিকে লড়িয়াছে হল্যাণ্ড। এই যুদ্ধের পরিণামে হল্যাণ্ড অনেকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু ডাচরা পৃথিবীর বাণিজ্য তখনও হারায় নাই, পৃথিবীর বাণিজ্যে ইংলণ্ডের নেতৃত্ব তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পৃথিবীর বাণিজ্যে ডাচ্‌দের পতন অনুভবযোগ্য হইয়া উঠে ইউট্রেচ্‌টের সন্ধির পর। এই সন্ধির পর হইতে নূতন মহাদেশ এবং পৃথিবীর বাণিজ্যে ইংলণ্ডের পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী হল্যাণ্ডের পতন হইল, কিন্তু নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল ফ্রান্স। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল হল্যাণ্ডের উইলিয়ম অব অরেঞ্জ যখন তৃতীয় উইলিয়ম রূপে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। চতুর্দ্দশ লুইয়ের পৌত্র স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, সুতরাং নূতন মহাদেশে স্পেনের সাম্রাজ্য ফ্রান্সের সহিত সংযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। ইহাতে তৃতীয় উইলিয়ম নিজের দেশ হল্যাণ্ডের বিপদ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। স্পেনের সাম্রাজ্য যাহাতে ফ্রান্সের অধীনে না আসিতে পারে তাহার জন্য তাঁহারই চেষ্টায় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে *হল্যাণ্ড, জার্ম্মানী, রাশিয়া, পর্ত্তুগাল,* এবং ইংলণ্ডের মধ্যে *মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা মহতী মৈত্রী বা* Grand Alliance নামে খ্যাত।

১৬৮৯ সালে ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যে যুদ্ধ হয় তাহার পরিসমাপ্তি হয় ১৬৯৭ সালের রিজউইকের সন্ধিতে। এই সন্ধিতে চতুর্দ্দশ লুই ১৬৭৮ সাল হইতে যে সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই ছাড়িয়া দিতে এবং তৃতীয় উইলিয়মকে ইংলণ্ডের রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হন। এই সন্ধির পরে ইউরোপের বড় বড় শক্তিগুলি স্পেনের সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে ফ্রান্সের ভাগ্যে বিশেষ কিছুই জুটিল না। কাজেই তিন বৎসর না যাইতেই চতুর্দ্দশ লুই এই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া তাঁহার পৌত্রের উত্তরাধিকারিত্বের সবটুকুই দাবী করিয়া বসিলেন। এখানে ফার্ষ্ট পার্টিশন ট্রিটি ও সেকেণ্ড পার্টিশন ট্রিটি সম্পর্কে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয় উইলিয়ম ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করার গুরুত্ব আরও বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন যখন চলিতেছিল তখনই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং রাণী এনে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধই স্পেনিশ উত্তরাধিকারিত্বের যুদ্ধ (War of the Spanish Succession) নামে খ্যাত এবং ইউট্রেচ্‌টের সন্ধিতে উহার উপসংহার।

ইউট্রেচ্‌টের সন্ধির সর্ত্তানুসারে চতুর্দ্দশ লুই-এর পৌত্র স্পেনের রাজা হইলেন, কিন্তু সর্ত্ত হইল ফ্রান্স এবং

স্পেনের রাজা কখনওএকজন হইতে পারিবেন না। অষ্ট্রিয়া মিলান, নেপলস্, সার্ডিনিয়া এবং নেদারল্যাণ্ডস্ পাইল, ডিউক অব্ সেভয় পাইলেন সিসিলি। নূতন মহাদেশে স্পেনের সাম্রাজ্য বজায় রহিল। ইংলণ্ড ইউরোপে পাইল জিব্রাল্টার ও মাইনর্কা* এবং আমেরিকায় পাইল আকাডি (নোভাস্কটিয়া), সেণ্ট ক্রিষ্টফার দ্বীপ, নিউফাউণ্ড-ল্যাণ্ড, হডসন উপসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চল আর পাইল ক্রীতদাস বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার এবং বৎসরে এক বার একটি করিয়া জাহাজ পাঠাইয়া স্পেনের উপনিবেশ-গুলিতে বাণিজ্য করিবার অধিকার। চতুর্দ্দশ লুই-এর পৌত্র যাহাতে স্পেনের সিংহাসন না পায় তাহারই জন্য ইংলণ্ড এই যুদ্ধে নামিয়াছিল, ইতিহাসে এই কথাই স্বীকার করা হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যতঃ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, এবং ইংলণ্ডও পরে আর ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। উপনিবেশ এবং বাণিজ্যই যে আসলে এই যুদ্ধের মূল কারণ সন্ধির এই সর্ত্তাবলী হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ইংরেজ ও ডাচ্ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ করা হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লুই-এর পৌত্র স্পেনের সিংহাসন পাইলে, ফ্রান্স এবং স্পেনের সাম্রাজ্য একত্রীভূত হইত এবং ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ডের নিকট নূতন মহাদেশের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যাইত, নূতন মহাদেশে পূর্ণ আধিপত্য হইত ফ্রান্সের।†

মিত্র শক্তিবর্গের সাফল্যের অনুপাতে সর্ত্তাবলী বৈষম্য-পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া ইউট্রেচ্টের সন্ধির কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে। সাফল্যের অনুপাতে এই সন্ধি যে বৈষম্যপূর্ণ হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।‡ এই সন্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফ্রান্সই ছিল ইউরোপে প্রধান রাষ্ট্র, কিন্তু এই সন্ধির পর হইতেই ফ্রান্সের এই গৌরব ম্লান হইয়া গেল, তাঁহার স্থান অধিকার করিল ইংলণ্ড। এই সময় হইতে প্রাচীর বাণিজ্যে ডাচ্ বণিকদিগের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, যদিও পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ডাচ্ বণিকগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পরেও কয়েক বৎসর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। ১৭৫৯ সালে বাংলা দেশে ডাচ্দের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ডাচ্রা পরাজিত হইবার পর ভারতের বাণিজ্যে ইংরেজ বণিকদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, ডাচ্ বণিকরা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়াই সন্তুষ্ট রহিল।†

ইউট্রেচটের সন্ধিতে শান্তি স্থাপিত হইলেও উহা খুব বেশী দিন স্থায়ী হইল না। স্পেনের উপনিবেশগুলিতে বাণিজ্য করিবার জন্য বৎসরে একবার একখানা জাহাজ ইংলণ্ড পাঠাইবে, এইরূপ একটি সর্ত্ত হইয়াছিল। কিন্তু কৌশলে এই সর্ত্তটি এড়াইবার চেষ্টা করা হয়। বাণিজ্য-জাহাজ একখানাই যাইত বটে, কিন্তু অনেকগুলি ছোট জাহাজে করিয়া আরও অনেক পণ্য পাঠান হইত। এইগুলি স্থল হইতে অনেক দূরে লুকাইয়া থাকিত এবং রাত্রিতে এই সকল জাহাজ হইতে বড় বাণিজ্য-জাহাজে পণ্য চালান দেওয়া হইত। বৃটিশ উপনিবেশগুলি গোপনে বাণিজ্য চালাইবার চেষ্টা করিত। ইহা লইয়াই স্পেনের সঙ্গে এক ঝগড়ার সৃষ্টি হয় এবং উহার পরিণতি হয় কয়েকটি খণ্ড-যুদ্ধে। এই যুদ্ধ জেঙ্কিনের কানের যুদ্ধ (Jenkin's Ear War) নামে পরিচিত। অষ্ট্রিয়া রাজ্যের উত্তরাধীকারিত্ব লইয়াও এক যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিয়াছিল ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে উহার পরিসমাপ্তি হয়।

তৃতীয় উইলিয়মের সময় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহার মূল কারণ যে উপনিবেশ ও বাণিজ্য তাহা আমরা দেখিয়াছি। উপনিবেশ এবং বাণিজ্যের জন্য

* এই দ্বীপটি ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স অধিকার করে, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে উহা বৃটেনকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে উহা স্পেন অধিকার করে এবং পরবর্ত্তী বৎসরে এই দ্বীপে স্পেনের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।

† "In reality it is the most businesslike of all our wars, and it was waged in the interest of English and Dutch merchants whose trade and livelihood were at stake. All those colonial questions which had been setting Europe at discord ever since the New World was laid open, were brought to a head at once by the prospect of a union between French and the Spanish Empire, for such a union would close almost the whole New World to the English and Dutch, and throw it open to the countrymen of Colbert, who were at that moment exploring and settling the Mississippi." *Expansion of England*, p. 151-52.

‡ The treaty of Utrecht has been the subject of much reproach, as disproportioned to the distinguished successes of the allied powers, and insufficient for securing the independence of Europe. That it was disproportioned to the successes of the allies must be acknowledged. George Miller: *Modern History*, Vol. IV, p. 17.

† Maurice's *Modern History of Hindostan*, Vol. II, p. 277.

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই যুদ্ধ হইয়াছিল ইউরোপে, উত্তর-আমেরিকায় এবং ভারতবর্ষে। উত্তর-আমেরিকায় ফ্রান্স এবং বৃটিশ উপনিবেশগুলির সীমা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। ইউরোপে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়ার সেক্স্যানী এবং রাশিয়া প্রুশিয়ার ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে মিত্রতায় আবদ্ধ হয় এবং ফ্রেডারিক এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আমেরিকায় ঔপনিবেশিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংলণ্ড ফ্রেডারিকের পক্ষে যোগ দান করে। ফ্রেডারিকের নিকট অর্থ প্রেরণের সময় চেথাম (William Pitt, the elder) বলিয়াছিলেন, "জার্ম্মানীতেই আমি আমেরিকা জয় করিব।' ('I will conquer America in Germany')। এই তীক্ষ্ণধী বৃটিশ-রাষ্ট্রনীতিবিদ বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপের যুদ্ধে ফ্রান্সকে যদি আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে উত্তর-আমেরিকায় উপযুক্ত সৈন্য এবং জাহাজ ফ্রান্স পাঠাইতে পারিবে না। ফ্রান্স নূতন মহাদেশে তাহার উপনিবেশগুলি কেন হারাইল তাহার কারণের উল্লেখ করিতে যাইয়া স্যার জে, আর সিলি বলিয়াছেন,

"As to France, it is still more manifest that she lost the New World because she was always divided between a policy of colonial extension and a policy of European conquest. If we compare together those seven great wars between 1688 and 1815, we shall be struck with the fact that most of them are double wars, that they have one aspect as between England and France and another as between France and Germany. It is the double policy of France that causes this, and it is France that suffers by it." (*Expansion of England*, p. 111-12).

আরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছিল, ইউরোপীয় বণিকগণ তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়ে নাই, বিভিন্ন ভারতীয় নৃপতির সংগ্রামের সহিত তাহারা আপনাদিগকে সংযুক্ত করিয়াছিল।* আরকটের নবাবীর দুই দাবীদারের এক পক্ষে ফরাসী বণিক আর একদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগদান করে। এই যুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ বাংলায় বৃটিশ আধিপত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফরাসীদের নিকট হইতে পণ্ডিচেরী অধিকার করে। ইহার পর হইতে বৃটেনের ভারতীয় বাণিজ্যে ফরাসী-প্রতিযোগিতার অবসান হয়।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারী নগরীতে সন্ধি হইয়া সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। ইংলণ্ড কানাডা, টোবাগো, ডোমিনিকা, সেণ্টভিন্সেণ্ট এবং গ্রেনাডা প্রাপ্ত হয়, স্পেনকে মার্টিনিক, হাভানা এবং ম্যানিলা এবং ফ্রান্সকে পণ্ডিচেরী ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এই সন্ধির দুই বৎসর পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী প্রাপ্ত হয়। প্যারীর সন্ধি হইতেই পৃথিবীর বাণিজ্যে ইংলণ্ডের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও এই সময় হইতেই। কিন্তু এই সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধই উত্তর-আমেরিকায় মূল বৃটিশ উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও অব্যবহিত কারণ সৃষ্টি করিয়াছিল।

আমেরিকায় রাজ্য বিস্তার লইয়া ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধের পরিণামে কানাডা বৃটেনের অধিকারভুক্ত হইল বটে, কিন্তু এই যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য পার্লামেণ্ট বৃটিশ উপনিবেশগুলির উপর অত্যধিক কর ধার্য্য করিলেন। এই করের বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলিতে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই বিপ্লবে পরিণত হইয়া আমেরিকার স্বাধীনতার সূচনা করিল। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের কারণ সম্বন্ধে জর্জ্জ মিলার বলিয়াছেন,

"The question, upon which they afterwards separated, was not that of commercial restriction, but that of internal taxation. Even the exercise of a power of taxation did not excite a spirit of resistance, so long as it appeared only to be a part of that system of commercial regulation to which they were accustomed to yield submission." (*Modern History*, Vol. IV, p. 137).

এ কথা অবশ্য খুবই ঠিক যে এই ট্যাক্স ধার্য্যের পূর্ব্বে আমেরিকার বৃটিশ উপনিবেশগুলি বিদ্রোহ করে নাই, যদিও মেসাচুসেট্‌স্ উপনিবেশ অনেক পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের বাণিজ্য-নীতির জন্য আমেরিকার বৃটিশ

* James Mill : *History of British India*, Book I, Chapter II.

উপনিবেশগুলিতে যে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপনিবেশগুলির তারকাঁটা, ছুরী প্রভৃতি লোহার জিনিষ তৈয়ার করিবার অধিকার ছিল না, কারণ ইহাতে বৃটিশ লৌহ-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বীবর হ্যাটও উপনিবেশগুলি তৈয়ার করিতে পারিত না। ইংলণ্ডে বীবর পাঠাইয়া দেওয়া হইত, সেখান হইতে টুপী তৈয়ার হইয়া আমেরিকার বাজারে বিক্রীত হইত। উপনিবেশগুলিতে চিনি এবং তামাক উৎপন্ন হইত, কিন্তু এইগুলি তাহারা সোজাসুজি অন্য দেশে চালান দিতে পারিত না। এইগুলি শুধু ইংলণ্ডে চালান দেওয়ার অধিকার তাহাদের ছিল। ইহা লইয়া উপনিবেশবাসীদের মনে যথেষ্ট অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার ফলে ফ্রান্সের অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল। সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পরে এই আশঙ্কা যখন রহিল না, তখনই তাহাদের অন্তরের অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহারা অভিযোগ করিতে লাগিল ইংলণ্ড তাহাদের বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় যখন বাণিজ্যশুল্ক ধার্য্য হইল, ষ্ট্যাম্প আইন পাশ হইল এবং স্পেনিশ উপনিবেশ-গুলির সহিত বৃটিশ উপনিবেশগুলির বাণিজ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল, তখনই দেখা দিল অন্তরের অসন্তোষের বাহ্যিক রূপ। বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করা হইল তাহাদের প্রথম কর্ম্মপদ্ধতি। আমেরিকার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য পার্লামেণ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। এই তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় মিঃ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে তাঁহার সুদীর্ঘ জবানবন্দীর উপসংহারে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আমেরিকার গর্ব্বের বিষয় কি ছিল?" ফ্রাঙ্কলিন উত্তর দিলেন, "বিলাতী ফ্যাসনের অনুকরণ করা।" আবার প্রশ্ন হইল, "এখন তাহাদের গর্ব্বের বিষয় কি?" ফ্রাঙ্কলিন বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের পরিধেয় নিজেরা তৈয়ার না করিতে পারে তত দিন পুরাতন ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া ব্যবহার করাই তাহাদের গর্ব্বের বিষয়।"

ফ্রাঙ্কলিন ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, নূতন আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্ট যেরূপ লাভবান হওয়ার আশা করিতেছেন, তাহা ত হইবেই না, অধিকন্তু ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি হইবে। তাঁহার চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া ষ্ট্যাম্প আইন রহিত হইল বটে, কিন্তু একবৎসর না যাইতেই উপনিবেশগুলির উপর ছয়টি নূতন কর ধার্য্য হইল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পাঁচটি ট্যাক্স রহিত হইল বটে, কিন্তু চায়ের উপর ট্যাক্স রহিয়াই গেল। শেষ পর্য্যন্ত এই চায়ের ট্যাক্স লইয়াই আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রাম সুরু হইল। জর্জ্জ মিলারের মত শুধু অব্যবহিত কারণকেই যদি আমেরিকার স্বাধীনতার কারণ বলা হয়, তাহা হইলে চাকেই আমেরিকার স্বাধীনতার কারণ বলিতে হয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে, কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাই। যে-সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধে আমেরিকায় স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই ভারতে রাজ্য স্থাপনে ফ্রান্সের প্রতিযোগিতার বিনাশ করিয়াছিল। আমেরিকার স্বাধীনতায় ইংলণ্ডের যে ঔপনিবেশিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ হইয়াছিল ভারতে।

"The pen that signed reluctantly, after six years' costly and disastrous war, the recognition of American independence traced an enlarged scheme of territorial compensation for the loss in Hindustan." (W. M. Torrens: *Empire in Asia*, p. 6).

শাদা কালো

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

* * *

"কিন্তু ওমা! সেদিনই বিকেলে এসে যাদু বলল উজ্জ্বল কণ্ঠে: দাদা! দিদি রাজি হয়েছেন যেতে, আপনাকে কী ব'লে যে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাই নে।"

'রাজি হয়েছে?' একটু অবাক লাগল, 'আরতি?'

'হ্যাঁ। কেন দাদা?'

'না—এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।—কবে যাচ্ছ তোমরা?'

'কালই ভোরে।'

'হুঁ—।'

* * *

"সে দিন রাত্রে মিলি অনেকক্ষণ ঘুম এল না চোখে। ওকে আরতির কথা বলেছিলাম আমি এমনিই—আলটপ্‌কা। কিন্তু দাঁড়িয়ে গেল যেটা সেটা বড় বিচিত্র। মুখচোরা যাদু সাধল আরতিকে? বিশেষ চোরপর্বের পরে? কী ক'রে পারল? কিন্তু তবু এতেও আমি তত আশ্চর্য হই নি, যত আশ্চর্য হয়েছিলাম আরতির রাজি হওয়াতে। কারণ যাদুর ওপর ওর যে গভীর অবজ্ঞা সে দিন প্রকাশ হ'য়ে পড়েছিল তার পরেও যে ওর আতিথ্য আরতি গ্রহণ করতে পারবে এ আমি ভাবতে পারি নি সত্যিই।"

প্রমীলা বলল: "কিন্তু কেন পারো নি ভাই?—ও যে বিলিতি মেয়ে ভুলছ কেন? যতই কেন না ওদের গুণগান করো তুমি, জেনো ভ্রমণ ও নতি ওদের রক্তে। তাই নতির খাতিরে ওরা অনেক অবনতিই সইতে পারে।"

অসিত হাসল: "যা বলেছিস মিলি! এক একটা কথা তুই বলিস বড় চমৎকার।"

নির্ম্মল বলল: "কিন্তু বড় বাধা প'ড়ে যাচ্ছে—তারপর হ'ল কী—বল আগে।"

অসিত হাসল: "বলি—কারণ সেটা বলবার মতনই বটে। যেহেতু পর্বটা এবার চোরের চেয়েও সঙিন—কী হ'তে পারে বল্‌ দেখি?"

নির্ম্মল হাত তুলে বলল—"I give up"

অসিত গম্ভীর মুখে বলল: "ব্যাঘ্রপর্ব। অথ—যাদুর বাঘশিকার।"

"বা—ঘ?—আর যাদু?" প্রমীলা ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেলে।

অসিতও হাসল: "তাই তো বলছিলাম মিলি, শাদা প্রতি পদে কালোর সঙ্গে কোঁদল করে—নৈলে ড্রামা ঘটবে কেন?"

নির্ম্মল হেসে বলল: "জমে উঠেছে রে—বল্‌ বল্‌ থামিস নে।"

অসিত বলল: "এপিসিডোটা হয়ত একটু অবান্তর—কিন্তু না, তাই বা বলি কেমন ক'রে? আরতি একটি চিঠি লিখেছিল যাদুর বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর বর্ণনা ক'রে।"

প্রমীলা উৎসুক কণ্ঠে বলল: "চিঠিটা আছে অসিদা! তোমার কমলাকান্তের দপ্তরে মজুদ থাকে তো প্রায় সব চিঠিই।

অসিত খুসি হ'য়ে বলল: "আছে—শুনবি? আচ্ছা তাহ'লে ওঘর থেকে আমার চিঠির দপ্তরটা নিয়ে আয় সেই কালো চামড়া দিয়ে বাঁধানো খোপ-ওয়ালা—বুঝেছিস?"

প্রমীলা বলল: "তা আর বুঝি নি? তাড়া তাড়া

চিঠি আসে আর কত যত্নে গুছিয়ে সব ডকেট ক'রে রাখো—কার চোখে না পড়ে বলো—এক অন্ধ ছাড়া ?"

ওরা হেসে ওঠে ফের। প্রমীলা ছুটে যায় পাশে অসিতের কামরায়।

* * *

অসিত পড়ে :

"অসিত

কাশ্মীরে তো কতবারই এসেছি—কিন্তু যতবারই দেখি চোখে পড়ে এ-মায়াবিনীর যেন এক নতুন রূপ—অদেখা রূপ—ফুরোতে যেন জানে না সে। বিধাতার 'পরে এক সময়ে আমার রাগ হ'ত এ-ধরণের একচোখোমির জন্যে। অর্থাৎ যখন আমি ছিলাম সাম্যবাদিনী—বলতাম সব মানুষই সমান সব দেশই সমান—অন্তত না হ'লেও হওয়া উচিত। কিন্তু জগতটা আমাদের উচিত অনুচিতের গজকাঠি মেনে চলে না যে—তাই না হ'ল সব মানুষ সমান, না সব দেশ। তাই শাহারা হ'ল মরুভূমি আর কাশ্মীর ভূস্বর্গ। অথচ মাটি দিয়ে গড়া দুটোরই কায়া। তবু কী তফাৎ বলো তো।—না অসিত, বলো দেখি তুমি কাশ্মীর দেখলে কি মনে না হ'তে পারে যে ভগবানের কাশ্মীর-রচনার সময় হঠাৎ এসে গিয়েছিল দিলদরিয়া মেজাজ। নয় ? প্রকৃতির এত সম্পদ এমন অঢেল ভাবে পেয়েছে আর কোন্ দেশ—শুধু ভূ-ভারতে নয় ভূলোকে ? নদী নদ, ঝর্ণা হ্রদ, পশু পাখি, শিল জল, গিরি গুহা, আলো হাওয়া, তুষার তপন, নাচ গান গতি স্থিতি, শিখর গহ্বর—কী নেই এ দেশে বলো তো ? বিশেষ ক'রে এ দেশে ফুলের ফলের গন্ধ। কাল থেকে থেকে কেবলই মনে বেজে বেজে উঠছিল গুরুদেবের গম্ভীর স্তোত্র পাঠ সেদিনকার—মনে পড়ে সেদিন যখন ভোর বেলা তিনি আবৃত্তি করছিলেন অথর্ব বেদ থেকে :

যস্তে গন্ধঃ পৃথিবি সংবভূব
যং বিভ্রত্যোষধয়ো যমাপঃ
যস্তে গন্ধঃ পুষ্করমাবিবেশ
তেন মাং সুরভিং কৃণু।

এখানে এই রাবণ হ্রদের ধারে কাল এই ভাবটা যেন নিল নবজন্ম গোধূলির অন্তরালে—যখন দুটো পাহাড়ের মাঝে সূর্যদেব নামলেন পাটে আর সারা আকাশে তার বিদায়বাণীর বান ডেকে গেল যেন। ভেসে আসছিল তখন এই গন্ধের শিহরণ—কোথা থেকে, কে বলবে ? কারণ সেখানে চারদিকে যে ফুল ফুটে ছিল তা নয়—কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত উদ্ভিদ লোক গন্ধের স্তোত্রকে দূতী পাঠাচ্ছে আকাশে। সত্যি অসিত, সব ইন্দ্রিয়ের আবেশের মধ্যে বোধ হয় গন্ধের আবেশই সব চেয়ে কোমল, পেলব, অধরা—অথচ কত না ভাবেরই খনি সে! কত স্মৃতিই না সে জাগায় কত বিচিত্র নেশায়, না ? মনে হয় না তোমার যে ধরেও ধরা যায় না ছোঁওয়া তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে কেবল আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় ? কত রকম ভাবের আলোছায়া ফুটে ওঠে আমাদের গন্ধের আয়নায়—নয় ? কাল গোধূলির আলোয় এমনি মনে হচ্ছিল যে আমার প্রার্থনাও বুঝি ছড়িয়ে-পড়া গন্ধ, জাগায় সে নতুন ক'রে—কিন্তু কাজ কি, শোনোই না কী লিখলাম কাল। কবি বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে তার কবিত্বের উপদ্রব সব সময় এড়িয়ে চলা যায় কি—ধরি মাছ না ছুঁই পানি ক'রে ? শোনো লিখলাম আমি কাল :

My prayers are like sweet all-pervading scents :
They wake a dormant tender wistfulness
To new-lit memories of far firmaments
No dark downpull can shake,
No fall efface.

My prayers are rhythms which change all
dross to gold
Of primal music echoing thy star-will :
They fashion lovelier forms from
the outworn mould,
Figures which through each shock
of beauty reveal.

Thy song's designs lurking in toneless sound,
Thy rose-intention guarded by sharp thorns,
Thy solicitude this nursling spark around
Menaced by rude assaults and cynic scorns.

My prayer to thee feels thy own
prayer through mine
Reach backward to the Source whence
starts thy flow,
Making our pale mortality outshine
Static divinities which failed to grow.

"কিন্তু মাভৈঃ, পদ্যের অন্তরীক্ষ থেকে গদ্যের ধূলিধামে মানলাম ব'লে।

"আমি এখানে এসেছিলাম অনেকটা কারে পড়ে জানোই তো। যাদুকে সেদিন রাতে ঐ কড়া কথাগুলো বলে মনটা একটু ব্যথিয়েই ছিল। ভেবেছিলাম এর পরে ও আমার সঙ্গে দেখা হ'লে মুখ ফিরিয়ে চলবেই চলবে। কিন্তু, আশ্চর্য, ও হঠাৎ ছোট ভাইয়ের সুরে বলল: 'দিদি, চলুন না শ্রীনগরে আমার মোটরে।' তুমি তো জানোই তোমাদের দেশের এই সহজে দাদা দিদি পাতানো আমার কিরকম ভালো লাগে—এ বিষয়ে তোমরা আমাদের চেয়ে কত বেশি সহজিয়া—সুন্দর! এর পরে আমি 'না' করি কী ক'রে বলো দেখি? কিন্তু ওর সঙ্গে কাশ্মীরে আসা এক আর এক বজরায় থাকা আর। এ আমি কোনোদিন কল্পনাই করতে পারি নি যে কোনো সদ্যপরিচিত বাঙালী যুবকের সঙ্গে এ ভাবে একই বজরায় কাটাব দিনের পর দিন! দুর্নামের কথা বলছি না অবিশ্যি—তুমি তো জানো দুর্নামে সবাই মুষড়ে পড়ে না—তোমার আমার মতন মানুষও জগতে আছে যাদের মনময়ূর কলঙ্কের মেঘ দেখলেই সবচেয়ে সহজে পেখম মেলে।—তবু একেবারে সবে-পাওয়া বন্ধু—প্রায় সমবয়সী যুবকের সঙ্গে একলা একত্র বাস—(বুঝলে না?)—প্রথমটা মনে কোথায় যেন একটা কিন্তু কিন্তু ভাব আসে। তোমাদের ভাষায় বলবে হয়ত 'সংস্কার'—এটি তোমাদের আর একটি অতি আশ্চর্য গভীর কথা এ-ও মানব—কিন্তু তবু আমি বলবই বলব যে না—এ কুণ্ঠা পুরোপুরি সংস্কারও নয়। মেয়েদের মধ্যে কোথায় কি একটা আব্রু আছেই—ঘোমটা খুলে ব্রীচেস পরলেও পারি কই তাকে ডিশমিশ করতে?

"কিন্তু পারি না বলেই না আমি রুখে উঠলাম। ভাবলাম—যাদু যখন আমার সঙ্গে একত্র বাসে ডরিয়ে উঠছে না তখন আমি এমন কিন্তু কিন্তু ভাবকে প্রশ্রয় দিই কোন্ লজ্জায়? তাই র'য়ে গেলাম এক নৌকায় ওর সঙ্গে—এক রকম রোখ ক'রেই বৈ কি।

"সময়ে সময়ে মনে হয় কিন্তু যে রোখ ক'রে ভালো করি নি। অন্য কোনো কারণে ভেবো না—শুধু এই জন্যে যে মানুষের সঙ্গে একটু বেশি ঘেঁষাঘেঁষি হ'তে না হ'তে তার ছোট ত্রুটিগুলোও বড় হ'য়ে দেখা দেয়। যাদু অবশ্য ভালো ছেলে মানতেই হবে।—কিন্তু—না থাক্ গে যে এত আদর-যত্নে ঘিরে রেখেছে তার নামে চুকলি কাটি কোন্ মুখে?

"কিন্তু না। তোমাদের শাস্ত্রে বলেছে পরধর্ম ভয়াবহ। তাই স্বধর্মেই ফিরে আসি—মেয়েলি ধর্ম—কি না পরচর্চা।

হোক্ গে নিজমূর্তি জাহির। সেজেগুজে থাকব আর কত বলো দেখি? ব'লেই ফেলি। তবে এটা জনান্তিকে মনে রেখো: বন্ধুকে নিয়ে হাসাহাসি—ও জানতে পারলে দুঃখ পাবেই—মুখে যতই ভান করুক নির্বিচলতার। পুরুষ সবচেয়ে শক পায় মেয়েদের হাসিতে। আর ঠিক সেই জন্যেই তো আমরা হেসে কুটিকুটি হই তোমাদের মধ্যে এতটুকুও হাস্যকর কিছু দেখলে।

"ভাবছ—কী ব্যাপার না জানি! ব্যাপার—গুরুতর, এ-ও মানতেই হবে। সংসারে আমাদের দিনের পর দিন চলতে হয় হেসে কেশে হাই তুলে তুড়ি দিয়েই বেশি। বাঘশিকার আর কজনের ভাগ্যে হয় বলো? সুতরাং এহেন রোমহর্ষক অভিযানে যদি গুরুচণ্ডালী কিছু যোগাযোগ দেখি একটু রসিয়ে চুটিয়ে হাসতেও পাব না—এতটা আবদার সই কী ক'রে বলো দেখি? সুশীলা ব'লে কি মহিলা নই?

"ব্যাপারটা এই: মধ্যে হঠাৎ গিয়েছিলাম পেশোয়ারে যাদুরই মোটরে। ওর সঙ্গে বেড়িয়ে কিন্তু আরাম আছে এ মানব। কেবল—হায়রে—যদি এ ব্যাঘ্রবিভ্রাটে না পড়তে হ'ত!

"হ'ল কি জানো? পেশোয়ারে গিয়েই দেখি আমাদের আশ্রমের বিক্রম। ওর নিম্নরুচ পিতৃদেব নামটা ওর ঠিকই দিয়েছিলেন। নইলে বাপকা বেটা এই বিশ বছর বয়সেই অতগুলো বাঘ বাইসন সাবাড় ক'রে বাংলাদেশের

গোকুলে বাড়ে ? পেশোয়ারের পথে জঙ্গলে জঙ্গলে বাঘ মেলে দঙ্গলে দঙ্গলে এ-খবর শুনেই ও ধরল যাদুকে চলো—বাঘশিকারে বেরুনো যাক্।

"বললও আবার বড় দুর্লগ্নে। আমরা পেশোয়ারে এক অতি সুশ্রীলা কাশ্মীরি মেয়ের অতিথি হ'য়ে সবে বসেছি চা খেতে এমনি সময়ে। আর হবি তো হ মেয়েটি আবার নবাবজাদী—একেবারে কুলীন শাহজাদার শাহজাদী। তুমি হয় তো জানো তাকে—দৌলত। বড় মানুষের এক মেয়ে—বিধবা হয় অল্প বয়সেই। স্বামীর সম্পত্তি প্রাস বাপের। স্বাধীনা। পেশোয়ারি-গান্ধি আবদুল গফুর খাঁর অতি প্রিয়পাত্রী। বিলেতও গিয়েছিল। যদি ওকে দেখে নাও থাকো কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছ ওর কথা।

"আমার সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছিল বম্বের ক্রিকেট ক্লাবে—swimming bathএ। আমাকে ওর মনে বোধ হয় ধরেছিল। নৈলে সেই শুভদৃষ্টির সময়েই অনুরোধ করবে কেন পেশোয়ারে ওর অতিথি হ'তে ? যাদু পেশোয়ারে খাইবার পাস দেখবার লোভে নামতেই না ব'লে কয়ে ওকে নিয়ে গিয়ে তুললাম সোজা দৌলতের ওখানে। ওকে দৌলতের কথা বলি নি কেন না বললে ও কখনই পেশোয়ারের বা খাইবার পাসের ছায়া মাড়াত না।

"যাক—এ হেন সুন্দরী বেগমের তীব্র নয়নালোকের তলে ও করে কী বলো ? তার ওপর ও দিকে আমি—টেবিলে ওর ঠিক পাশেই শোভমানা—ও অনুভব করছে আমার ব্যঙ্গভরা তির্যক দৃষ্টি ওর কণ্ঠে কপালে গালে স্কন্ধে! ও ঘামতে লাগল ঐ শীতেও।

"দৌলত বলল : 'কী ? যাবেন ?'

"যাদু শুষ্ক মুখে হাসি টেনে বলল : 'যাব বৈ কি ? বাঃ—এমন সুযোগ হাতছাড়া করা যায় কখনো ? তবে বেশ বড় বাঘ তো বিক্রম ? মানে, এই—অর্থাৎ—হরিণ-টরিণ নয় তো—ওতে আমি নেই কিন্তু।"

"আমি হেসে বললাম : 'তা থাকবে কেন বন্ধু ? তোমার যত বীরত্ব মাছ ধরায়। তবে মনে রেখো হরিণের শিঙ আছে—যা'—ব'লে ফিক ক'রে হেসে বললাম—'যা ছিঁচকে চোরেরও নেই।'

"যাদু এমন মিনতিভরা চোখে আমার দিকে চাইল যে প্রবল লোভ সত্ত্বেও বলা হ'ল না ওর কীর্তির কথা। দৌলত বলল সকটাক্ষে : 'চোরের শিং মানে ?' কী করি ?—ঘুরিয়ে নিলাম কথাটা, বললাম : 'ও স্বপ্নে এক ভুতুড়ে চোর দেখে ভয় পেয়েছিল কি না, তাতে ছিল দুটো লতানে শিং—না যাদু ?'

"যাদু—জানোই তো সহজেই রাঙা হ'য়ে ওঠে—একটা ঢোক গিলে বলল : 'বিক্রম একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার শিকার করার সাধ আমার আজকের নয়, বহু দিনের। কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই কাজেই—'

"আমাদের পোল্যাণ্ডে একটা প্রবচন আছে যে পঙ্গু যদি হয় অভাগা তার সামনে উঁইঢিবিও হ'য়ে ওঠে তুঙ্গ : দৌলত সোৎসাহে বলল : 'বন্দুকের জন্যে ভাববেন না, আমার চারটে আছে। চলুন কালই যাওয়া যাক। আমি বাঘ শিকার কখনো দেখি নি।'

"তার পর ? স্থান সিন্ধুনদের উপরেই সেই বিখ্যাত জঙ্গলটা—কী যেন ? যাঃ ভুলে গেছি নামটা। মরুক গে। কথাটা হ'ল এই যে সেখানে বাঘ ঠিক তেমনি সস্তা যেমন চিল্কা হ্রদে মাছ। অন্তত এ ক্ষেত্রে এইটেই হ'ল আসল কথা—অর্থাৎ যাদুর দুর্ভাগ্য সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক।

"চিঠি বড় হ'য়ে যাচ্ছে—এখনি যাদু ডাকতে আসবে খেতে। কিন্তু লক্ষ্মীটি অসিত, ওকে বোলো না তোমাকে ব'লে দিয়েছি। জানি—এ মেয়েলি 'বোলো না কিন্তু' শুনে তুমি হাসবে তোমার পুরুষালি হাসি—কিন্তু তোমরা, পুরুষেরা, জানবে কী ক'রে জীবনের কত স্বাদুরস জমাট হ'য়ে থাকে এর কথা ওর কাছে নিরন্তর এই গোপনে বলার মধ্যে ?—যা সত্যিই নিভৃত মহলের কথা তাকে টেনে বের ক'রে সাত কান না করে কি পারে কেউ ? মানে সুরসিকা ? যারা শুধু খোলাখুলি সরলতার মিষ্ট রসই চেখে এল—যা গোপন কথার সিন্দুক প্রগলভ জিভের চাবি দিয়ে কখনো খুলল না হাটের মাঝে তারা অতি বড় দুর্ভাগা—যেহেতু জানল না আজো কপটতার সুচারু চাটনির স্বাদ।

"যা হোক—যা বলছিলাম। বিক্রমের ওদিকে জানাশোনা ছিল। নর্মদায় ওর এক বন্ধু আছে—তারই একটা বাংলো ছিল। সেই বন্ধুই ওকে ডেকেছিল।

"এবার সংক্ষেপে বলি বাকিটুকু।

"আমরা পাঁচ জন বসলাম গিয়ে দুটো মাচাতে। একটা গাছের পাতায় একেবারে ঢাকা সেটাতে আমি দৌলত আর যাদুর বন্ধু ললিত। আর একটাতে যাদু আর বিক্রম—দুই জাঁদরেল রাইফেল হাতে। যাদুর মুখ বেশ দেখা যাচ্ছে। আমি ওকে খুব ভরসা দিচ্ছি মাঝে মাঝে হাত তুলে—ও-ও হাসছে বীর্যবান্ হাসি। কিন্তু হায় রে, 'ওর হাসি বেচারির ঢেউ ঠোঁটে লাগতে না লাগতে বুঝি অশ্রুর ফেনা হ'য়েই মাথা খুঁড়ে মরে'—বলল দৌলত চুপি চুপি। ও শেয়ানা মেয়ে জীবনে নানা ঘাটেরই জল খেয়েছে—এক আঁচড়ে নিয়েছে চিনে বীরপুরুষকে।

"নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ব'সে আছি। যতই যাদুকে ভরসা দেই না কেন অসিত—গোটা বাঘ, ছাড়া বাঘ—ভাবতে কেমন যেন অস্বস্তি জমাট হ'য়ে ওঠে বুকের মধ্যে। —যতই করি না কেন অরণ্যের গুণগান—মানুষ স্বভাবে আরণ্যক নয়—পুরবাসী। তাই সে ভগবানের আদিম জৈবলীলার অপ্রতিহত লীলালোকে কিনা অরণ্যে আজও অবান্তরই র'য়ে গেল।

অলডাস কি সাধে বলেছেন—বনের মতন বন দেখলে মানুষের প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠেই! খাঁটি কথা। কারণ বন নিয়ে কবিত্ব করা সম্ভব নয়—কবিত্ব করা যায় কেবল কানন নিয়ে। ঠিক্ তেমনি প্রাণী নিয়ে ঘরকন্না করা যায় কেবল ততক্ষণ যতক্ষণ না প্রাণ নিয়ে পড়ে টানাটানি। নইলে কি বাঘ ভাবতেই কাঁধটার ওপরে মুণ্ডুর জায়গাটা এমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়?

"কিন্তু ঈশপের গল্পটি গভীর জ্ঞানগর্ভ মানতেই হবে। খরগোশ মশায় ভেবেছিল তাঁর চেয়ে দুর্ভাগা জীব আর কেউ নেই—গেল তাই আত্মহত্যা করতে পুকুর পাড়ে। দেখলেন ব্যাং মশায় লাফিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাঁরই ভয়ে। তখন ফিরে এল তাঁর সুপীরিয়র আত্ম-সম্মান—বাঁচা সম্ভব হ'ল।

"আমারও তাই তো ধড়ে প্রাণ এল যাদুর আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া হবার জো দেখে।—ঐ পূব দিকে খশ্ খশ্!—অমনি ওর ঘাড় ঘুরল বিদ্যুৎবেগে—না একটা শকুনি। সর্বরক্ষে!—কিন্তু আবার ঐ যে পশ্চিমদিকে ঝির্ ঝির্—ঘাড়টা তৎক্ষণাৎ একশো আশি ডিগ্রি ঘুরল—উঃ বাঁচোয়া—দুটো ঝরা পাতা! বাস্তবিক বেচারার ওপর দয়া হ'ল ওর এই চম্‌কে-চম্‌কে-সারা হাল দেখে।

"কিন্তু গীতাকার মিথ্যা বলেন নি—যারই আছে সুরু, তারই আছে সারা। কাজেই আমাদের ঘনায়মান ভয়াবহ অস্বস্তিও ক্রমশ ফিঁকে হ'য়ে এল—বিশেষ ক'রে বাইরের সৌন্দর্যে। সব ভুলিয়ে দিল যখন চোখের দৃষ্টি একটু থিতিয়ে এল। তখন দেখবার ভঙ্গিটাও গেল বদ্‌লে কি না।

"এতক্ষণ দেখছিলাম—সমস্ত বনটা সমগ্রভাবে—যাকে বলে ensemble—কিন্তু এবার চোখ তীখন হ'য়ে পড়ল তার খুঁটিনাটির পরে। এককথায় দ্রষ্টার দূরবীণ এবার পরীক্ষকের অনুবীণে সঙ্কুচিত হ'য়ে এল।

"পাতার ফাঁক দিয়ে দুলে দুলে ওঠে সবুজ আর লাল পশমের ঘেরাটোপ-পরা পাহাড়ের পর পাহাড়। শাল শেগুন, আমলকী, দেবদারু, বট, অশ্বত্থ আরো কত যে নাম-না-জানা জটাজুটধারী গাছ, তন্বী শ্যামা লতা ব্রততী কাঁটাবন ঝোপঝাপ! থেকে থেকে পলাশ আর কৃষ্ণ-চূড়ার লাল রঙের মশালও উঠছে জ্বলে জ্বলে পাতাগুলোর ঝুলুনির দোলে তাল দিয়ে। এখানে ওখানে মস্ত মস্ত শিমুল গাছের গুঁড়ির সাদা আভা উঠছে [illegible] ঘনশ্যাম রঙের মাঝে মাঝে। মিষ্টি কেতকীর গন্ধের সঙ্গে পেলাম আর একটা ভারি চমৎকার গন্ধ। ললিত বলল—মহুয়া। শুনেছিলাম ভালুকে বড় ভালোবাসে। মনের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—কে জানে হয়ত বাঘে ভালুকে হবে মোকাবিলা—রাজযোটক বলে আর কাকে?

"আলো আরো উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে···দেখতে দেখতে পাখির কাকলিতে জঙ্গল উঠল ভ'রে। একটা পাপিয়ার ডাক ভেসে আসে থেকে থেকে। বৌ-কথা-কও আমার কত প্রিয় পাখি জানোই তো—ভারি ভালো লাগল হঠাৎ তার সম্ভাষণ শুনে। এ রাজ্যেও এত পাখি জানতাম

না। তোমাদের দেশে পাখি যে কত রকম তা কি তোমরা জানো অসিত? না—জানো না। যারা অঢেল পায় তারাই সব আগে ভোলে আনন্দের সম্পদ। রাজার সামনে রাজভোগ নিত্যই অবহেলার বস্তু—আহারের মর্ম জানে কেবল নিরন্নরা। পেতে হ'লে সব আগে হ'তে হয় নিঃস্ব। বেশি করেই মনে পড়ছে একটি হলদে পাখির কথা। এ তোমার চোখে কখনই পড়ত না—কিন্তু আমি ওকে ভুলব না কোনোদিনও। কী ছোট্ট তনুশ্রী...নরম ভঙ্গি...আর কী যে মিষ্টি শিষ!

"হঠাৎ আর এক ঝাঁক পাখি কিচির-মিচির কিচির-মিচির করতে করতে নেমে এল। ললিত বলল—'শ্যামা'। কী মিষ্টি নাম!

কিন্তু তারপরই দেখি তারা উঠেছে ডরিয়ে। বুঝলাম যে 'বীটার-দের' আওয়াজে। তবু পারে না পুরোপুরি চুপ ক'রে থাকতে—(মেয়ে পাখি কি না!—বলবে হয়ত তুমি?)—তাই থেকে থেকে ডেকে ওঠে আর নিঃশব্দ জঙ্গলটা মুখর হয়ে ওঠে তাদের কলগানে।

"হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি, আমাদের মাচাটির ঠিক বাঁ-দিক ঘেঁসে একটা শুকন নালা একে-বেঁকে চলে গেছে ডান দিকে। আর একটা ছোট নালা পাহাড়ের উপর থেকে নেমে ওর সঙ্গে রচেছে নির্জলা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম। ললিত আমায় চুপি চুপি বললে ব্যাঘ্রাচার্য গা ঢাকা হ'য়ে না কি এই রকম নালায়ই চলাফেরা ক'রে থাকেন—যুগপৎ শিকার ও শিকারীদের ফাঁকি দিতে। নালাগুলো শুকনো ব'লেই আরও জুৎ পান তিনি, কেন না নালার শয্যা হ'ল বালির সতরঞ্চি, চললে পায়েও লাগে না, আওয়াজও হয় না। ললিত আরও বললে যে পাহাড়ের উপর থেকে যে-রাস্তায় জল নেমে আসে জন্তু-জানোয়াররাও সেই পথই ব্যবহার করে, কেন না জল পাহাড় থেকে নামে shortest route-এর খাত বেয়েই—জীবজন্তুরাও বলে 'ডিটো' কেন না প্রকৃতির যে নিয়মে জলও চায় shortest cut, সেই নিয়মেই জীবজন্তুও চায় shortest cut. ললিল বেশ বলেছিল হেসে: জৈবলীলায় কেবল মানুষই ঘুরপাক খেয়ে চলতে ভালোবাসে আরতি দেবী!' তবে কেন যে শুধু মানুষই মনোলীলায় রাজপথ ছেড়ে নিত্যি গলিঘুঁজির ইশারা খোঁজে—কেন তৃষ্ণা যায় সরলতার দিকে ক্ষুধা ধায় তার জটিলতার পানে—একথা তোমার মতন 'মনের মানুষের' কাছে বলতে যাওয়াটা হবে carrying coal to New-castle.

"যাই হোক এবার ফিরে আসি দৃশ্যলোকে।

"ক্রমে বীটার-দের আওয়াজ আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। ওমা! দেখি কি—ওরা কখনো বা চিৎকার ক'রে শিকার তাড়ায়, কখনো বা পাথরের গায়ে কুড়ুল ঠুকে শব্দ করতে থাকে। দেখে বাঘ-মারার সম্বন্ধে পুঁথিতে পড়া বীরত্বের ওপর অশ্রদ্ধা এসে গেল। বীরত্ব নেই সেখানে রিস্ক্ নেই যেখানে—বটেই তো! কিন্তু থাক্।

"হঠাৎ দেখি একটা প্রকাণ্ড জংলা মোরোগ পুত্রকলত্র পরিবৃত হ'য়ে শোভাযাত্রা সুরু করে দিয়েছে, আর তাদের ঠিক পিছনেই তিন তিনটে ময়ূর সোজা যেন মাচা টিপ ক'রেই ধাওয়া করেছে। উৎসাহে আমি যেই দৌলতকে ইশারা করতে যাব—অমনি—ওমা!—ওরা কি স—ব কটাই এক্ জোটে হ'ল উড়ুক্কু—দেখতে দেখতে কেউ কোথাই নেই, স—ব ফর্সা! আমি দৌলতকে বললাম ফিশ ফিশ ক'রে: 'দৌলত, দুঃখিত—অত্যন্ত—ওদের এ হেন ungallant ব্যবহারে—তুমি বেচারি দেখতে পেলে না ওদের পেখম মেলা।' ললিত সান্ত্বনা দিয়ে হেসে বলল: 'কিন্তু প্রাণের দায় যে বড় দায় আরতি দেবী! ওরা gallant হয় কী ক'রে বলুন?' দৌলত বলল: 'তার মানে?' ললিত কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে নিয়ে বলল: 'ময়ূর শুধু যে অতি লাজুক পাখি তা-ই নয় অতি সজাগ পাখি—"শ্যেনচক্ষু" হওয়া উচিত ছিল ওরই পদবী। আমি বাজি রেখে বলতে পারি—কিছু একটা ও দেখেছে।—ঐ দেখুন ওরা ফের এসে বসল ঐ শেগুন গাছটায়—ঐ, ঐ—কিন্তু এখন একেবারে চুপ—ব'লেই ঠোঁটে আঙুল রেখে তীক্ষ্ণনেত্রে এদিকে ওদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"বুঝতেই পারছ ওর মুখচোখের এ তীক্ষ্ণতা দেখে কী হ'ল আমাদের। দৌলতের আপেলের মত টকটকে রাঙা গালদুটো চা-খড়ির মত ফ্যাকাশে দেখাল। ভয়ের কারণ ছিল না কারণ আমরা বেশি উঁচু ও মজবুৎ মাচায়

সুরক্ষিতা—তবু মেয়ে তো আমরা: দুজনেরই রক্তে বেজে উঠল মাদল—আসন্ন ড্রামার প্রত্যাশায়। কারণ ললিত কথায় কথায় এ-ও বলেছিল যে বাঘ দেখলে সব পশুপক্ষী পালায়, শুধু ময়ূর বাদে। বাঘ যখন চলে নিচে নিচে, ময়ূর চলে ডালে ডালে—ওর কাজ হ'ল অন্য সব বনচারীদের ক্রমাগত সতর্ক ক'রে দেওয়া চৌকিদারের মতন। কাজেই আমরা নিশ্বাসও ফেলতে লাগলাম যথাসম্ভব সন্তর্পণে।

"হঠাৎ বিক্রম হাত তুলে হুঁশিয়ার ক'রে দিলে। সাম্নে দিয়ে একটা মনোহর হরিণ ছুটে চ'লে গেল হন্তদন্ত হ'য়ে। সঙ্গে সঙ্গে গজ পঞ্চাশেক দূরে শেগুন গাছে আসীন ময়ূর তিনটির চৌকিদারি শোনা গেল সঘনে। সে-ধ্বনি যে স্বকর্ণে না শুনেছে তাকে বোঝাতে পারব না তার নিহিতার্থ: মনে হ'ল যেন সারা জঙ্গলটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে বলছে বনচারীদেরকে: 'সাবধান।' ওদিকে বিক্রম ঠায় বেয়ে রয়েছে আমাদের দুই মাচার মাঝামাঝি একটা ঝোপের দিকে। কিন্তু গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল যাদুর চেহারা দেখে! ওর শরীরে সব রক্ত যেন জমে পাথর হ'য়ে গেছে। জলজ্যান্ত খাড়া মানুষের যে এমন মরণাপন্ন চেহারা হয় চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। দৌলত আমার ব্লাউসের হাতায় টান দিতেই ললিত বন্দুক উঁচিয়ে 'শ-শ' ক'রে উঠল।

"বিক্রম বাহাদুর ছেলে—এসব ব্যাপারের অন্ধিসন্ধি ওর জানা। বাগিয়ে ধরেছে ওর বন্দুক। অমনি ওমা! যাদুর হাত থেকে প্রকাণ্ড বন্দুকটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ও চিৎকার ক'রে বিক্রমের গলা ধরল জড়িয়ে: 'কাজ নেই বিক্রম—কাজ নেই—যদি গুলি না লাগে—' ব্যাঘ্রাচার্য আমাদের নয়ন পথে উদয় হলেন ঠিক সেই মুহূর্তে। ললিত আর বিক্রম আগেই দেখেছিল।

"বাঘটা শোরগোল শুনেই দাঁড়িয়েছে ঘাড় সোজা ক'রে জ্বলছে ওর চোখ দুটো সেই আলো-আঁধারী ঝোপে। কী সুন্দর যে সে ভঙ্গি! সত্যি অসিত, ভয় ভুলে গেলাম আমি ওর রূপ দেখে। থেকে থেকে ওর ডোরাকাটা গায়ে পাতার-মধ্যে-দিয়ে-ছানিয়ে-আসা রোদ উঠছে ঝিকমিকিয়ে—সে যে কী অপরূপ দেখালো—বিশেষ ক'রে পাশে যাদুর ঐ জবুথুবু অবস্থার কন্‌ট্রাস্টে। কারণ মনে রেখো এসব বলতে সময় লাগছে বটে কিন্তু ঘটতে সময় লাগে নি। ময়ূর ডাকা, বাঘ আসা, বিক্রম ললিতের বন্দুক ওঠানো, যাদুর ডুকরে কেঁদে ওঠা—বাঘের ঘাড় সোজা ক'রে দাঁড়ান—সব ঘটে গেল যেন মুহূর্তে।

"দু—ম্! চমকে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওমাচায় শোনা গেল তকরার: বিক্রম যাদুর কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে আর বলছে: 'কী করো যাদু! ছাড়ো? মরবে যে—' ভাগ্যে ললিত বন্দুক ছুড়ল। নইলে বাঘটা ওদের মাচার দিকে তাগ ক'রে লাফ দিত কি না কে জানে?"

"গুলিটা নিশ্চয় বাঘটার লেগেছিল—কারণ একটু হ'টে গিয়েই কেমন যেন ঘুরে পড়ল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ গর্জন ক'রে ফের উঠল গা-ঝাড়া দিয়ে। দ্রুম্—দ্রুম্—বিক্রম যাদুকে গুঁতো দিয়ে সরিয়ে পর পর দু-বার ছুড়েছে বন্দুক। বাঘটা কেমন যেন একবার কেঁপে উঠেই ভূমিশয্যা নিল—কিন্তু এবার আর মাটির মায়া কাটাতে নয়—তাকেই করতে চিরশয্যা।"

"কিন্তু আজ আর সময় নেই অসিত। সত্যি, কী হ'ত বল তো? এখন হাসছি বটে যাদুর যাদুপনার কথা ভেবে—কিন্তু তখন it was no laughing matter mind you! নাঃ—যাই বলো অসিত, যাদুকে ভালো যে লাগে না তাও নয়—কিন্তু সইতে পারি না ওর এই দারুণ ভয়কাতুরে—ভাব। স্নেহ হয় ত ওকে করা যায়—কিন্তু শ্রদ্ধা?

তোমার আরতি"

* * * ক্রমশঃ

বৈষ্ণব কবিতায় বসন্ত

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য

বৈষ্ণব-কবিতা প্রেমের কবিতা। প্রেমের দেবতাকে বৈষ্ণব কবিগণ অন্তরের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছেন। সৌন্দর্য্যলোকের মরকত মণিরূপে আত্মার আত্মীয় বন্ধনে বেঁধে প্রেমশতদলে এই দেবতার অর্চ্চনা তাঁরা করেছেন। আমরা যাকে ভালোবাসি কেবল তারই মাঝে পাই অনন্তের পরিচয়। দেবতাকে আমরা ভালোবাসি—আমরা শ্রদ্ধা করি—আমাদের অন্তরের নিষ্ঠা দিয়ে তাঁকে আমরা পূজা করি। আপন হ'তে আপনতর—প্রিয় হ'তে প্রিয়তমরূপে অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরকে সসীমের মানুষ আমরা আমাদের অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করতে চাই। তাই বিশ্বরূপ লীলার মাঝে আমরা শুনি প্রিয়তমের বাঁশি, যে-বাঁশির প্রেমের সুর অসীম সুরলোকের সন্ধান দিয়ে আমাদের মরমী চিত্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে—আমাদের দার্শনিক সত্তাকে অনন্তলোকে বিকশিত করে। সে প্রেমের দেবতা কোথায় বাঁশিতে যাঁর এত সুর—ইঙ্গিতে যাঁর এত আহ্বান? মানুষের মাঝেই তাঁর প্রকাশ—ভক্তের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেমপূর্ণ অন্তরেই তাঁর স্থান।

ওপার হ'তে যে বাঁশি তিনি বাজান এপার হ'তেই তা শোনা যায়। ভক্ত এবং ভগবানের সম্পর্ককে সহজ হ'তে সহজতর ক'রে বৈষ্ণব কবিগণ ভগবৎ প্রেমের মহত্ত্ব অনুভব করেছেন।

শুধু বৈকুণ্ঠলোকের গান তাঁরা গান নি। এই মাটির পৃথিবীর মাঝে এই সৃষ্টির লীলাখেলায় প্রকৃতির লীলা-রহস্যে তাঁরা পরম সুন্দরের যে সুন্দর তথ্য প্রকাশ করেছেন কাব্যদর্শনদৃষ্টিতে তা সুন্দর—ভক্ত প্রেমিক হৃদয়ে তা পবিত্র।

"এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাবো কোথা?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা!"

"প্রকৃতির মাঝে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ" —এই সুন্দর ধরণীর মাঝে যা-কিছু সুন্দর—যা-কিছু রূপ-মধুর তারই বিচিত্র রসধারায় বৈষ্ণব কবিগণ দেবতার চরণে তাঁদের প্রেম-অর্ঘ্য সাজিয়েছেন, তাঁদের প্রেম-নৈবেদ্য নিবেদন করেছেন।

প্রকৃতির প্রতি রূপে প্রতি অণুতে-পরমাণুতে পরম-প্রিয়ের যে স্পর্শ জাগরিত—যে রহস্য অন্তর্নিহিত, তার প্রকাশভঙ্গীমায় বৈষ্ণব কাব্যের একটি দিক্ সুউজ্জ্বল। ঋতুতে ঋতুতে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য—যে রূপলীলা—যে সৌন্দর্য্য-সুষমা বৈষ্ণব-কাব্যের ঋতু-উৎসবে তা অপূর্ব্ব রূপশ্রীমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। কাব্যের ছন্দে ছন্দে গীতিসুরের সুর-ঝঙ্কারে রাধাকৃষ্ণের রূপলীলা বৈষ্ণব-কাব্যের সৌন্দর্য্য-অনুভূতির সূক্ষ্ম মর্ম্মবাদকে সুঅলঙ্কৃত করেছে। ঋতুরাজ বসন্তের শুভাগমনে দিকে দিকে সৌন্দর্য্যের কী অপরূপ রূপ-সম্ভার!—ধরণীর ধূলিকণা অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার নববৃন্দাবন-রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য-লীলায় মধুসূদন-রাধা বনবিহার করছেন—

আওল ঋতুপতিরাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর কিরণ ভেল পয়গণ্ড
কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥
নৃপ-আসন নব পাটল-পাত।
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল মুকুল ভেল তায়।
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥

পদ্ম শীতের হাত হ'তে উদ্ধার পেয়ে যখন নবজীবন লাভ করলে—তার প্রেম-নবদলে তখন সৌন্দর্য্যালোকের দেবতার পবিত্র প্রেমিক আসনই বৈষ্ণব কবির চোখে পড়ে। সৌন্দর্য্য-রাণী তার অপূর্ব্ব রূপসম্ভার বিস্তার ক'রে প্রেমের দেবতা পরম সুন্দরেরই আরাধনা করে—

আওরে ঋতুরাজ-বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরু ফুল মুকুলিত, অলিকুল ধায়।
মদন মহোৎসব পিককুল কায়॥

প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্য অবদান—এই রূপ-মাধুর্য্য প্রেমের দেবতার অর্ঘ্য সাজায়। প্রেমের দেবতারও স্নেহ যেন রসসাগরের মধ্যে বিকশিত পদ্মের ন্যায় শোভা পায়। অনন্ত রূপ-লাবণ্য সসীম আনন্দালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। ফাগুয়ার ঋতু-উৎসবে রঙে রঙে ভরে ওঠে দিক্-দিগন্ত, সেই রঙের মেলায় রূপের দেবতা—সৌন্দর্য্যের দেবতার লীলাখেলা কী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়!

"কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি-অঙ্গে।
মুখমোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥"

আকাশ ফাগুয়ার রঙে রঙিন—বৃন্দাবনের তরুলতায় ফাগুয়ার রঙ—

"রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে, রাঙ্গা কোকিল গায়
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানী।
গগন ভুবন দিক বিদিগ না জানি।"

ফুলে ফুলে ফুলময় ধরণী—এ ধরণীর মাঝে বাস্তবের ধূলি-মলিনতা নেই। এই উজ্জ্বল রূপ-রস-গন্ধভরা বসন্ত-উৎসবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ফুল-বিলাস কাব্য-সৌন্দর্য্যের যে দ্যুতি বিকীরণ করেছে কাব্য-সাহিত্যের তা অমূল্য সম্পদ—ভক্ত-প্রাণের তা পবিত্র সৌন্দর্য্য-রুচি। এই রূপ-লীলায় বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস স্বহস্তে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ক'রে ধন্য হয়েছেন—

ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু।
ফুলময় আভরণ, করে ফুলধনু॥
ফুলময় ক্ষিতিতল, ফুলময় কুঞ্জ।
ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ॥
ফুল-তনু হেরি' মুগধ ফুলবান।
ফুলশরে হানল ফুলময় কান॥
ফুলে উয়ল বন, ফুল বায়ু মন্দ।
ফুল-রসে গুঞ্জয়ে মধুকর বৃন্দ॥
অপরূপ-ফুল-দোল ফুল-বিলাস।
ফুল-করে রহ যদুনন্দন-দাস॥

এই মধুর রসগানে পৃথিবীর মলিনতা মুছে যায়। ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে প্রেমের দেবতা ধরণীর মাঝে যে প্রেমলীলা করেন তার পবিত্র সৌন্দর্য্যরূপ দর্শনে আমরা বিমুগ্ধ হই। বৈষ্ণব কাব্যের এই মধুর বসন্ত-লীলা গীতি-কাব্যের অপূর্ব্ব বিস্ময়—কাব্য-সাহিত্যে সৌন্দর্য্যের মরকত মণি—

মধু-ঋতু মধুকর-পাঁতি
মধুর কুসুম মধু-মাতি
মধুর বৃন্দাবন-মাঝ
মধুর মধুর রসরাজ॥

সঞ্চয়ন

বিদেশী পত্রিকা হইতে

দৃশ্যের রূপান্তর

[লণ্ডনের The Fortnightly পত্রিকায় প্রকাশিত প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ডাঃ জুলিয়ান্ হাক্স্লির (Dr. Julian Huxley) প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ]

আজকের দিনে আমাদের একটি কাজের মূল্যে দুটি কাজ করার সম্ভাবনা—প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন—হ'য়ে প'ড়েছে। এ পর্যন্ত আমরা প্রায় সবাই একটি কাজ নিয়ে—যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু যুদ্ধের কাঁধের উপর দিয়ে অপর একটা কিছুও উঁকিও মারছে। এ বস্তুটি আর কিছুই নয়—পৃথিবীর রূপান্তর। যখন সাধারণের চেয়ে দ্রুততর অবস্থায় ইতিহাস তৈরী হচ্ছে এবং যে-সব ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে, এবং মধ্যে আমরা বেঁচে থাকি, তার সমস্ত কাঠামোটাই সম্পূর্ণ নতুন ভাবে ভেঙে গড়া হচ্ছে, তখন পৃথিবীর রূপান্তর দ্বারা আমি দারুণ রকমের একটা পরিবর্তন পদ্ধতিই বুঝি। ইতিহাসে দেখা যায় যে, মানবজাতি এইরূপ বহু নিদারুণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এসেছে। আমাদের কাছে এইরূপ একটি অতি পরিচিত যুগ হচ্ছে রেনেশাঁস্ বা জ্ঞান-বিপ্লব (Renaissance) এবং রিফর্মেশান্ বা ধর্ম-বিপ্লবের যুগ—এইরূপ আরেকটি যুগ হচ্ছে শ্রম-শিল্পের বিপ্লবের যুগ (Industrial Revolution)। শ্রম-শিল্পের বিপ্লবের ফলে বর্তমানে যে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তারই আবার সংস্কার হবে বর্তমানে আমরা যে নতুন পরিবর্তনের যুগে বাস করছি তারই সাহায্যে।

যদি আমরা গত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই, তবে দেখতে পাই যে দেশের পর দেশ ভগ্ন জীর্ণ পুরাতন পদ্ধতির বদলে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। কখনও কখনও এই রূপান্তর আবার বিপ্লবে পরিণত হয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে রাশিয়া, ইটালী, তুরস্ক, চীন, জার্মানী, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি কয়েকটি দেশে বিপ্লব হয়েছে এবং ততটা উল্লেখযোগ্য না হ'লেও ফ্রান্সে ভিশি পরিবর্তনকেও বিপ্লব বলা চলে। এই সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে কিংবা প্রধানত এ বিপ্লব এসেছে এক-নায়কত্বের সাহায্যে। কিন্তু অ-বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরও সম্ভবপর। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জাতিদের কাছে এ রূপান্তর দেখা দিয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষার্থ ব্যাপক আইন প্রণয়নের রূপে। ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহ—বিশেষ ক'রে হয়ত নিউজীল্যাণ্ড—স্বাধীনভাবে এরই একটি ঘনিষ্ঠ সমান্তরাল পথে এগিয়ে চলেছে। অনেক দিন থেকে ততটা ব্যাপক না হ'লেও দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটেনও এই রকম ধারার অনুসরণ করেছে এবং বর্তমান যুদ্ধের সময়ে এই ধারানুসরণ প্রবলতর হ'য়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নব-বিধান (New Deal) এই রূপান্তরের আংশিক কিন্তু বড় আকস্মিক কিস্তির রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অনেক ঘটনা ঘটছিল। জাতি-সঙ্ঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের অসাফল্যে প্রমাণিত হ'ল যে কোন একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্ঘের একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে হিটলারের স্বপ্ন হ'চ্ছে নব-বিধান (New Order) সৃষ্টি এবং জাপানের স্বপ্ন হচ্ছে পূর্ব এশিয়া সম-সমৃদ্ধি অঞ্চলের (East Asia Co-prosperity Sphere) প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহেরও স্বপ্ন আছে—যদিও এ স্বপ্ন এখনও যথেষ্ট অস্পষ্ট। মূলত পৃথিবী বুঝতে পেরেছে যে সে একটি এককে পরিণত হয়েছে। এই রূপান্তরের আরেকটি আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য এই যে পশ্চাদ্‌বর্তী দেশ এবং জাতি সমূহ সম্বন্ধে সকলেরই উদ্বেগ বেড়েছে। কখনও এ উদ্বেগ দেখা যায় রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যেমন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ফিলি-পিনোদের স্বাধীনতার পথে পরিচালনায়—কখনও বা এ উদ্বেগের প্রকাশ দেখা যায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মঙ্গল বিধানে—যেমন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। কখনও এ উদ্বেগ প্রকাশ পায় সর্বপ্রকার উন্নতির চিন্তায়—ব্রিটেন্

যেমন তার উপনিবেশগুলির জন্য যুদ্ধের সময় প্রাপ্য টাকার পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। কখনও বা দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলের জন্য এ উদ্বেগ দেখা যায়—যেমন ব্রিটেনের নিম্ন অঞ্চলের বেলায় (Depressed Areas) কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের টনেসি ভ্যালী অর্থরিটির (Tounessee Valley Authority) বেলায়; আবার কখনও বা অধীন জাতির দাবীর চাপে প'ড়ে কাজ করতে হয়—যেমন ভারতবর্ষে।

প্রথম দৃষ্টিতে এই বিশৃঙ্খল ঘটনা-প্রবাহ এবং ভাবধারার মধ্যে কোনি সাধারণ বৈশিষ্ট্য নাও দেখা যেতে পারে। যাই হোক, একটু গভীর ভাবে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে সারা পৃথিবীতে এই রূপান্তর মোটামুটি কয়েকটা বিশেষ ধারা অনুসরণ করে; অর্থনৈতিক ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের উদাসীনতার (laissez faire) চেয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দিকেই ঝোঁক বেশী; জীবনের অনেক ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্টের শাসন প্রবর্তনের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে; অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের চেয়ে অন্য উদ্দেশ্যের উপরই জোর দেওয়া হচ্ছে বেশী; পশ্চাদ্‌বর্তী অঞ্চলের মানব-শক্তি এবং প্রাকৃতিক উপাদান সম্বন্ধে বেশী উদ্বেগ দেখা দিয়েছে; এবং কোন শক্তিশালী ও সম্পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বোধও বেড়ে যাচ্ছে।

রূপান্তরের মধ্যে এগুলোই হচ্ছে সাধারণ উপাদান। কোন-না-কোন রূপে এগুলো সম্পন্ন হবেই। নাৎসী জার্মানীতে এগুলো সম্পাদিত হয়েছে এক-নায়কত্বের পথে। গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক থেকেও কি ক'রে এসব সম্পাদন করবে? অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই ধরা যাক্—এমন অনেক লোক আছে যারা সত্যই বিশ্বাস করে যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্বৈরতান্ত্রিক কীলকের পাত্‌লা অংশ মাত্র। কাজেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মতবাদকে জোর ক'রে বন্ধ না ক'রে ঐক্য-স্থাপন কি ক'রে সম্ভব? সর্বশেষে গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতার নীতিকে ব্যাহত না ক'রে আন্তর্জাতিক কোন প্রতিষ্ঠানে কি ক'রে বিভিন্ন জাতিকে যোগ দিতে বাধ্য করা যায়?

উত্তরে বলা যায় যে, কাজটা কঠিন বটে, তবে অসম্ভব নয়। পরিকল্পনাও গণতান্ত্রিক হ'তে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে টনেসি ভ্যালী অথরিটি একমাত্র বাঁধ নির্মাণ ও বিদ্যুতাগার তৈয়ারীর ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে ও-অঞ্চলে তাঁদের পরিকল্পনা জোর ক'রে চালান না। এঁরা কৃষকদের বুঝিয়ে কৃষিকার্যের উন্নতি-বিধান করেন এবং ধ্বংস নিবারণ করেন। এঁরা যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেন, সে বিদ্যুৎ এঁরা সরবরাহও করেন না; এঁরা সহরের এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের নিজেদের সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে প্ররোচিত করেন। এঁরা জোর ক'রে লোকের উপর নতুন পদ্ধতি চাপান না; কিন্তু এঁরা ছোট ছোট কৃষক এবং গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য কতকগুলি কৃষিকার্যোপযোগী বৈদ্যুতিক যন্ত্র নির্মাণ করেছেন—এই সব যন্ত্রপাতি এঁরা কম দামে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বে-সরকারী ফার্মের মারফৎ জনসমাজের হাতে পৌঁছিয়ে দেন। এঁরা সহর-পরিকল্পনার কাজের উপর জোর দেন না; কিন্তু যে সহর-পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুভব করে, তার জন্য এঁরা সব রকম গবেষণার সুবিধা দেন এবং নিজেদের বিচক্ষণ উপদেষ্টাদেরও সেই কাজে লাগতে দেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে ধ্বংস না ক'রে এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা তার সাহায্য করেছে।

গণতন্ত্রের পথে একতা প্রতিষ্ঠাও অসম্ভব নয়। একতার *একটি বড় সহায়ক বস্তু হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় সংস্কৃতি—সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, রেডিয়ো, শিল্প, স্থাপত্য প্রভৃতি যা-কিছু জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রতিফলিত করে,* একটা জাতিকে তার নিজের সম্বন্ধে, তার সংহত অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তার ভাগ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে। বিশ্বজনীন শিক্ষার একটা উচ্চ স্তরও সংহতি এবং একত্ব বোধের সহায়ক হ'তে পারে; তেমনি বড় বড় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে—যেমন যুব-প্রতিষ্ঠান, সামরিক প্রতিষ্ঠান (যেমন সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডে), বেসামরিক প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকদের স্বেচ্ছাকৃত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি। তার পর অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের উপরে অন্যান্য উদ্দেশ্যকে স্থান দিলেও একতা স্থাপনের সাহায্য হ'তে পারে। যুদ্ধকালীন স্বদেশ-প্রেমই হোক্, আর শান্তির

সময়ের স্বদেশ-প্রেমই হোক্—স্বদেশ-প্রীতিমূলক উদ্দেশ্য সমষ্টিগত অহঙ্কার এবং সংহত মত সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্পকলা, দুর্দশা-নিবারণ প্রভৃতি যেসব উদ্দেশ্য জাতির উপরেও উঠতে পারে, তাদের সাহায্যে একতা এবং সহযোগিতা স্থাপন সম্ভবপর।

সর্বশেষ অসুবিধা হচ্ছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে গণতান্ত্রিক করা। কিন্তু এ অসুবিধা কি প্রকৃতই এত বড়? প্রথমে সর্ববিষয়ে স্বাধীন কতকগুলি এককে বৃহত্তর সমগ্রতায় একত্রিত ক'রেই ত যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এক সময়ে বিভিন্ন এবং পরস্পরবিরোধী ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড একত্রিত হ'য়ে গণতান্ত্রিক সহযোগিতা স্থাপন করেছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের যুক্ত সরবরাহ এবং সামরিক কার্য পরিচালনায় অনেক সময় জাতীয় স্বাধীনতা ব্যাহত হয়—যেমন ঘাঁটি ইজারা দেওয়া এবং স্থাপনের সময়; তবু এসব কিছুই ত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতামূলক ভিত্তিতে সাধিত হচ্ছে—যুদ্ধে জয়লাভের পরে শত্রু-অধিকৃত দেশসমূহে খাদ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য প্রেরণের যে পরিকল্পনা বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে, সে পরিকল্পনাও ত এই জাতীয়।

এই যুদ্ধের জন্যও দৃঢ়সংকল্পে শীঘ্র এই রূপান্তর সাধনের প্রয়োজন আছে। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যে-সব দেশ ভালভাবে এই রূপান্তর সাধন করতে পেরেছে, তারা সাধারণতঃ বেশী সামরিক নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে। স্বৈরতন্ত্রশীল দেশগুলি যে শুধু দীর্ঘদিন ধ'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে তাই নয়—স্বৈরতন্ত্রশীল দেশগুলি রূপান্তরের দিক থেকেও বেশী সম্পূর্ণ। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে সামরিক নৈপুণ্য বাড়ানোর জন্য যে-সব পরিবর্তন প্রয়োজনীয় ব'লে অনুভূত হয়েছে, সে-সব প্রয়োজনের গতি সাধারণত আরও বেশী কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের দিকে, অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধবিবর্জিত যুদ্ধে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যের কাছে লাভের উদ্দেশ্য এবং সাধারণভাবে ব্যবসায় চালানোর উদ্দেশ্যের আত্মসমর্পণের দিকে, আরও বেশী ঐক্যের দিকে এবং আরও বেশী পূর্ণাঙ্গ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার দিকে—পৃথিবীর রূপান্তরে এই চারিটিই প্রধান ধারা।

একটি শেষ প্রশ্ন বাকী আছে। আমরা কি ক'রে লৌকিকভাবে, সচেতন অবস্থায় এবং যথাসম্ভব সবচেয়ে বেশী উৎসাহ নিয়ে এই রূপান্তরে প্রবেশ করব? উত্তর অতি স্পষ্ট—রূপান্তর সাধনের প্রশ্নসহ আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে হবে। হিটলার এবং জাপানীরা তাঁদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন। এই সব উদ্দেশ্য ব্যাপক এবং সাহসের সঙ্গে পৃথিবীর রূপান্তর সাধন করতে চায়, বিরুদ্ধ পদ্ধতিতে বাধা দেবার মত ক'রে নয়—কিংবা প্রয়োজনকে সহ্য ক'রে যাবার মত ক'রেও নয়—ব্রত-সাধনের মত তারা এ সুযোগ গ্রহণ ক'রেছে। এই রকম করতে পেরেছে বলেই তারা বহুলাংশে তাদের লোকদের আবেগ-শক্তির সহানুভূতি পেয়েছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহেরও এরূপ না করার কোন কারণ নেই—একই জিনিষ ভিন্ন উপায়ে করতে হবে এই যা—গণতান্ত্রিক উপায়ে; একই জিনিষ আরও বেশী শক্তিশালী হবে—কেন-না আবেদনের দিক থেকে শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ভাবই বেশী শক্তিশালী। কিন্তু আমরা যদি প্রথমত পৃথিবীর রূপান্তর সম্বন্ধে সচেতন না হই, এ'কে বোঝার চেষ্টা না করি এবং এটাকে গণতন্ত্রের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সুযোগ ব'লে মনে না করি, তবে ভাবধারার পরিবর্তন সংঘটিত হবে না।

(জুলিয়ান্ হাক্সলি)

মানবোদ্ধার কার্যালয়

[আমেরিকার কনেক্টিকাট্ প্রদেশে কি ক'রে বিকলাঙ্গ লোকদেরও নানা কার্যে নিযুক্ত করা হয় এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে তারই আলোচনা করা হয়েছে]

কনেকটিকাটে যে মানবোদ্ধার কার্যালয়টি (Man-Salvage Clinic) আছে—তার সরকারী নাম হ'চ্ছে বৃত্তিমূলক পুনর্নিয়োগ কার্যালয় (Vocational Rehabilitation Clinic)। বিকলাঙ্গ লোকের কার্যে পুনর্নিয়োগের জন্য সৃষ্ট এই কার্যালয়টির জনক হ'চ্ছেন স্টেটের শিক্ষাবিভাগের ঈ. পি. চেস্টার (E. P. Chester)। স্টেটে এখন পর্যন্ত যে পঁয়ত্রিশ হাজার রেজেস্ট্রীকৃত বেকার আছে, তার মধ্যে বারো হাজার হচ্ছে ভীষণভাবে বিকলাঙ্গ। এরা ছাড়াও অবশ্য হাজার হাজার লোক আছে যারা মনে করে যে নাম

রেজিষ্টারী করা অর্থহীন; পৃথিবীর ধনোৎপাদন কার্যে তারা আর কোন অংশ গ্রহণ করতে পারবে—সে আশা তারা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু উল্লিখিত ক্লিনিক এটা প্রমাণ করেছে যে তাদের তিন-চতুর্থাংশকেই শিল্পকার্যে নিয়োগের উপযোগী ক'রে তোলা যায়। নিয়োগকর্তাদের মনে এই ক্লিনিক যে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে যুদ্ধোত্তর যুগে তার ফল বেশ গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই যুদ্ধের শেষে এমন অনেক বিকলাঙ্গ লোক দেখাযাবে যাদের কাজের দরকার—এই কঠিন সত্যকে চাপা দিয়ে লাভ নেই। কুসংস্কার ভেঙে ফেলে এমন সব কিছুই তাদের ভবিষ্যতের পথকে সুগম ক'রে তুলবে।

সমস্ত স্টেটই বিকলাঙ্গ লোকদের কার্যে পুনর্নিয়োগ করার জন্য চেষ্টা করে। কনেক্‌টিকাটের অভিনবত্ব এইখানে যে একটি মাত্র লোক উৎসাহ ও নৈপুণ্যের সঙ্গে নিয়োগকর্তাদের শিক্ষাবিধান করেছেন এবং বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাদের স্বমতে নিয়ে এসেছেন। বাজীকরের মত তিনি তাঁর কাজের মধ্যে নাটকীয় উপাদানের আমদানি করেছেন।

চেস্টার দশ বৎসর যাবত বৃত্তিমূলক কার্যে পুনর্নিয়োগের পরিচালক ছিলেন; যুদ্ধ বাধবার পর তিনি তাঁর সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে দেখতে পেলেন। তিনি ব্যগ্রভাবে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা সুরু করলেন—তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, শীঘ্রই তাঁদের ভীষণ শ্রমিকের অভাব হবে। কনেকটিকাটের ম্যানুফ্যাক্‌চারার্স অ্যাসোসিয়েসন্‌ (Manufacturers' Association) তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হলেন। চেস্টার তখন নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকেও আগ্রহান্বিত ক'রে তুললেন—কনেক্‌টিকাট্‌ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন্‌, ইয়োক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়, ট্রিনিটি কলেজ, দি, ইউ, এস্‌, এম্‌প্লয়মেণ্ট সার্ভিস, অন্ধদের প্রতিষ্ঠান, কৃত্রিম পা এবং হাত নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং শিল্পবিদ্যালয়সমূহ।

বিকলাঙ্গদের শ্রমশিল্পে নিয়োগ করতে হ'লে তাদের প্রথম খুঁজে বার করতে হয়। শ্রমশিল্পে যদি এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটে যার ফলে স্থায়ী বিকলাঙ্গত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে, তবে সে খবর চেস্টারকে জানানো হয়। যে-সব ছেলে-মেয়ের দৈহিক কোন বিকৃতি থাকে, পাবলিক স্কুলগুলি তাদের খবর তাঁকে জানায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে যারা বিকলাঙ্গ হ'য়েছে এবং যাদের কথা রেকর্ডে লেখা আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য একজন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারী আছেন।

কোনও সময় হার্ট্‌ফোর্ডে, কখনও বা নিউ হ্যাভেনে কিংবা ব্রিজপোর্টে পাঁচ শ জন ক'রে এই বিকলাঙ্গদের একত্রিত করা হয়। সকালে প্রত্যেক পদপ্রার্থীকে এমন একজন চিকিৎসক পরীক্ষা করেন শ্রম-শিল্প সম্বন্ধে যাঁর বিশেষ জ্ঞান আছে—রোগীর পক্ষে কোন কার্য চেষ্টা করা উচিত বা কোন কার্য থেকে তাঁর দূরে থাকা উচিত সে বিষয়ে তিনিই উপদেশ দেন। যন্ত্রবিষয়ক এবং কেরাণীর কার্যে দক্ষতা, নৈপুণ্য, বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা দেবার জন্য চিকিৎসকের কাছ থেকে পদপ্রার্থীকে মনস্তত্ত্ববিদের কাছে যেতে হয়।

তারপরে আসে একজন অভিজ্ঞ পরিদর্শকের পালা, তিনি পদপ্রার্থীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, তার পূর্বেকার কার্যতালিকা যদি থাকে, সেটা দেখেন, তাঁর স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন—এক কথায় বিকলাঙ্গ লোকটি শিল্পকার্যে যে স্থানটি পূর্ণ করবে, মনে মনে তার একটি সুন্দর চিত্র কল্পনা করেন।

বৈকালে আসেন প্রকৃত নিয়োগকর্তারা; এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছোট ছোট শ্রমশিল্পের স্বত্বাধিকারী—তবে বেশীর ভাগই থাকেন বড় বড় শ্রমশিল্পে অভিজ্ঞ কর্মচারী। স্পষ্টতই তাঁরা মিঃ চেস্টার ও পদপ্রার্থীদের উপদেশ দিতে আসেন এবং তাঁরা উপদেশ দেনও বটে।

"এই যুবকটির হার্ট-ফোর্ড ট্রেড স্কুলের নৈশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া উচিত।...যে কাজে লোকের সঙ্গে বেশী দেখা হয় এমন কোন কাজ এই মেয়েটির করা উচিত নয়..." কিন্তু কার্যত ক্লিনিকের প্রায় অর্ধেক পদপ্রার্থীকেই তখন কাজে নেওয়া হ'য়ে থাকে।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক্‌। মিঃ চেস্টার একটা রেকর্ড থেকে প'ড়ে যান: "এই লোকটির অ্যারোপ্লেন-

চালক-যন্ত্র-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু স্ফীত-শিরা রোগ হওয়ায় এক বছর ধ'রে লোকটি বেকার ব'সে আছে। তার স্ত্রী এবং নয়টি ছেলেমেয়ে আছে...” মনস্তত্ত্ববিদ্ সর্বদা সাধারণ-বোধ্য ভাষাতেই তাঁর বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন: “বুদ্ধির দিক থেকে লোকটি সাধারণের ওপরে; যান্ত্রিক কার্যে তার নৈপুণ্যও ভাল। তাকে দেখে ধীর স্থির, প্রশান্ত ব'লেই মনে হয়—কিন্তু পরিবার ভরণপোষণের জন্য দীর্ঘদিন কিছু রোজগার না করতে পেরে এখন অবশ্য কিছুটা মন-মরা হ'য়ে আছে।”

তার পরে ডাক্তারের রিপোর্ট: “নিয়োগকর্তারা এ পর্যন্ত লোকটিকে কাজে না নিয়ে ভালই করেছেন; সামান্য কোন দুর্ঘটনায় তার পায়ে আঘাত লাগলেই সে রক্ত প'ড়ে মারা যেত। কিন্তু একটা অস্ত্র-চিকিৎসায় সে শীঘ্রই সুস্থ হ'য়ে উঠতে পারে।”

তার ভাবী নিয়োগকর্তারা তাকে যাতে পরীক্ষা করতে পারেন, সে জন্য লোকটিকে ডেকে আনা হয়। তার বয়েস চল্লিশের নীচে বটে, তবে সে হাঁটতে পারে না বললেই চলে। লোকটি ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর চেস্টার চতুর নীলামকারীর মত উপস্থিত নিয়োগকর্তা এবং তাঁদের কর্মসচিবদের দিকে তাকিয়ে দাবী করেন: “এই লোকটির অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য আমাদের কি করদাতাদের অর্থ ব্যয় করা উচিত? তার জন্য কি কোন কাজের ব্যবস্থা হবে?”

একজন অ্যারোপ্লেনের চালক-যন্ত্র নির্মাণকারী ব'লে উঠলেন: “ও লোকটি সুস্থ হ'য়ে উঠলেই আমি ওকে কাজ দেব।”

অস্ত্র-চিকিৎসা করা হ'ল; দুই সপ্তাহ পরে লোকটি কাজে যোগ দিল। স্টেট তার অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য যে-টাকা অগ্রিম দিয়েছিল সেটা সে স্বেচ্ছায় ছোট ছোট কিস্তিতে ফেরৎ দিচ্ছে।

সব ক্ষেত্রেই অবশ্য এত সহজে কার্য সুসম্পন্ন হয় না। এমন লোকও আছে যাদের কেউ চায় না। সাধারণত দেহ-গত বাধাটাই বড় কথা নয়; তাদের চেহারা নেহাৎ নিরাশা-জনক এমন সব বিকলাঙ্গেরও কাজ জোটে। কিন্তু সময় সময় বুদ্ধিবিহীন চোখে, সরল প্রশ্নের ধীর বিশৃঙ্খল উত্তরে বিকৃত দেহের মধ্যে অপরিণত মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। এ পর্যন্ত রেকর্ডে দেখা যায়, শতকরা পঞ্চাশ জন তৎক্ষণাৎ কাজ পেয়েছে; শতকরা পঁচিশ জনকে বিশেষ শিক্ষালাভের জন্য পাঠাতে হয়েছে—তাদের কাজ পাবার খুবই সম্ভাবনা আছে; শতকরা দশজনকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ধন-ভাণ্ডারের টাকায় শ্রবণ-যন্ত্র, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে—তাদেরও কাজ পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বাকী শতকরা পনের জনের আরও ভেষজ এবং মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার প্রয়োজন—তাদের কাজ পাবার সম্ভাবনা অবশ্য সন্দেহ-জনক।

সারা বিকাল এই শোভাযাত্রা চলে; একটি এক পা-ওয়ালা লোক আগে ওয়েল্ডারের (welder) কাজ করত; স্টেট যদি তার জন্য একখানি কৃত্রিম পায়ের ব্যবস্থা করে দেয়, তবে কি সে কাজ পাবে? জাহাজ নির্মাণ কারখানার একজন বললেন: “তাকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও।” একজন কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রস্তুতকারী প্রতিশ্রুতি দিলেন: “আমি দু-দিনেই ওর একখানা পা'র ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।” দুর্বল-হৃদয় একজন লোককে গণনা-কার্যের জন্য নেওয়া হ'ল—তার পক্ষে ব'সে ব'সেই সে কাজ করা সম্ভব। একটি মধ্যবয়স্কা নারীর একখানি হাত নেই। “আমাদের একজন মেট্রনের দরকার আছে—তবে ওর একখানা কৃত্রিম হাতের ব্যবস্থা করতে হবে—কোন কোন মেয়ে আপত্তি করতে পারে।” সরু-পা একটি মেয়ে টাইপিং শিখছে। একজন নিয়োগ-কর্তা বললেন: “ভুল হচ্ছে। টাইপিস্ট কিংবা সেক্রেটারী হ'লে ওকে হরদম নিজের ডেস্ক ছেড়ে লাফিয়ে উঠে এদিক-ওদিক যাতায়াত করতে হবে। ওকে গণনাকার্য্য শিখিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।”

চেস্টারের কাজে মাঝে মাঝে হাসির খোরাকও জোটে। ক্লিনিক একবার একটি এক-চোখো নিগ্রোর জন্য রেডিয়োর কারখানায় সামান্য একটা কাজ জোগাড় ক'রে দিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে তার অভ্যস্ত মাল ওঠানোর জায়গায় তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। নিয়োগ-

কর্তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল: 'স্যাম কোথায়? সে কি ভাল কাজ করতে পারছিল না?" নিয়োগ-কর্তা জবাব দিলেন: "বাস্তবিক সে ভালই কাজ করছিল। তাকে পরিদর্শনাগারে পাবেন। সে ভালই কাজ করছে।" স্যামকে দেখা গেল একটা অন্ধকার ঘরে আরও ষাট জন পরিদর্শকের সঙ্গে কাচে চোখ লাগিয়ে তড়িৎ-পাত্রের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যাম বুঝিয়ে বলল: "আমি মনিবকে বলেছিলাম যে আমি এখানে ভাল কাজ করতে পারব—কারণ আমার ত আর এক চোখ বন্ধ ক'রে সময় নষ্ট করতে হয় না।"

নিউ হ্যাভেনের একজন নিয়োগ-কর্তা যিনি ফেলে-দেওয়া বড় বড় লৌহখণ্ড কাজে লাগান—এমন একজন অ্যাসেটইলিস্ টর্চ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ লোক চেয়েছিলেন যে বড় বড় লৌহখণ্ড নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারবে এবং প্রয়োজন হ'লে ওঠাতেও পারবে। কিন্তু তিনি উপযুক্ত লোক পাচ্ছিলেন না। মানবোদ্ধার ক্লিনিক তাঁর জন্য দুটি লোককে খুঁজে বের করেছিল—একজন একহাত-ওয়ালা টর্চ-বিশেষজ্ঞ এবং আরেকজন প্রায় অন্ধ, স্যামসনের মত বলবান লোক—ক্লিনিক প্রস্তাব দিয়েছিল যে একজনের বেতনের বিনিময়ে এরা দুজনে কাজ করবে। কিন্তু তারা বর্তমানে এত বেশী কাজ করছে যে নিয়োগ-কর্তা তাদের প্রত্যেককে পুরো মাইনে দিচ্ছেন।

বিকলাঙ্গ কর্মচারীকে নিয়োগ-কর্তা হয় ত একটা চুক্তিপত্রে সই করতে বলতে পারেন; এই চুক্তিপত্রের অর্থ এই যে, তার বিকৃত অঙ্গের দোষে যদি কোন শারীরিক দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্য সে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না; প্রায় বেশীর ভাগ রাষ্ট্রেই এই নীতি অবলম্বিত হ'য়ে থাকে। বিগত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় এইরূপ চুক্তিপত্রে সইকারী একটি লোকের এ রকম দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বিকলাঙ্গদের যুদ্ধ-কার্যে লাগানোর প্রচেষ্টায় কনেকৃটি-কাটই একমাত্র অগ্রণী রাষ্ট্র নয়। জনশক্তি কমিশন (The man Power Commission) সর্বত্র নিয়োগ-কর্তাদের সাবধান ক'রে দিয়েছে যে এ বৎসরের শেষে যারা কখনও কাজ পায় নি এমন বিশ লক্ষ থেকে ত্রিশ লক্ষ কর্মী খুঁজে বার করতে হবে; এদের মধ্যে যারা আবার বিকলাঙ্গ তাদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে।

কনেকৃটিকাটের শতকরা হিসাব সমগ্র জাতির পক্ষেই খাটে; রেজিষ্ট্রীকৃত পঁয়ত্রিশ লক্ষ বেকারের মধ্যে দশ লক্ষ লোক কোন-না-কোন প্রকারে বিকৃতাঙ্গ। কনেকৃটি-কাটের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রমাণ হয় যে সুনিপুণ কর্ম-প্রচেষ্টা এবং নিয়োগ-কর্তাদের সহযোগিতার সাহায্যে তাদের পাঁচ ভাগের চার ভাগকে অন্তত স্বাবলম্বী ক'রে তোলা যায় এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টায়ও তারা তাদের অংশ গ্রহণ করতে পারে।*

রুশ মৈত্রী

[ইংলণ্ডের 'দি কন্‌টেম্‌পোরারী রিভিয়্যু' (The Contemporary Review) পত্রিকায় প্রকাশিত স্যার বার্ণার্ড পেয়ার্স (Sir Bernard Pares) লিখিত রুশ মৈত্রী (The Russian Alliance) নামক বর্তমান প্রবন্ধটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। স্যার বার্ণার্ড পেয়ার্স রাশিয়া সম্বন্ধে একজন খ্যাতনামা ইংরেজ বিশেষজ্ঞ; তিনি সুদীর্ঘকাল রাশিয়ায় ছিলেন এবং পেঙ্গুইন সিরিজে প্রকাশিত রাশিয়া সম্বন্ধে একখানি বহুতথ্যপূর্ণ পুস্তকেরও তিনি প্রণেতা।]

রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সংস্থাপিত হয়েছে এবং যুদ্ধ হোক, শান্তি থাকুক, এ মৈত্রী বিশ বছর ধ'রে অটুট থাকবে। এইটাই আমাদের দেশের বর্তমানে নির্ধারিত নীতি। অতীতে হিটলারের তুষ্টি বিধান করার পক্ষে যে যুক্তিই থাক্ না কেন, এখন আর তা নেই—এখনও কেউ যদি হিটলারকে তুষ্ট করার নীতি অনুসরণ করে, তবে সে আমাদের বিজয়-লাভের শত্রু। যাঁরা এ সম্বন্ধে অনুরূপ চিন্তা করতেন, তাঁদের অবশ্য আমি দোষ দিচ্ছি নে। তাঁদের কেউ কেউ এখনও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন।

* [The Rotarian পত্রিকায় T. E. Murphy লিখিত Man Salvage Clinic নামক প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের অনুবাদ]

আমাদের দাবী শুধু এই যে সর্বান্তঃকরণে জাতীয় নীতিকে অনুসরণ করা তাঁদের কর্তব্য এবং এ মৈত্রীকে প্রকৃত সার্থকতায় পরিণত করার জন্ম তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

দেশের বেশীর ভাগ লোক যে উষ্ণতার সঙ্গে এ মৈত্রীকে গ্রহণ করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি প্রায় গত দশ মাস ধ'রে সংবাদ-মন্ত্রী-বিভাগের (Ministry of Information) আহ্বানে রাশিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি—দেশব্যাপী হাজার হাজার সভায়—ইন্‌ভার্নেস্ থেকে কর্ণওয়াল পর্যন্ত আমাকে ছুট্‌তে হচ্ছে। এবারডীন্, সাণ্ডারল্যাণ্ড, হাল্, বুট্‌ল, কভেন্ট্রী, সোয়ানসী প্রভৃতি যে-সব স্থান শত্রুর বোমায় সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—বিশেষ ক'রে পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলবর্তী অঞ্চলেই লোকের আগ্রহ এবং উৎসাহ সব চেয়ে বেশী। আমার বক্তৃতা-মঞ্চে সব রকম দলেরই সমাগম হয়েছে; অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীল দলের লোকই রাশিয়ার প্রতিরোধে আমাদের যে পরম উপকার হয়েছে সে-বিষয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন। স্কট্‌ল্যাণ্ড, ইয়র্কশায়ার, মিডল্যাণ্ডস্ এবং ওয়েল্‌স্ সবাই এ বিষয়ে একমত (মতদ্বৈধ যদি থাকে তবে সেটা লণ্ডনেরই অংশ-বিশেষে আছে) এবং সবাই দাবী করে যে যুদ্ধকালীন সহযোগিতা শান্তিকালীন সহযোগিতায় পরিণত করতে হবে। রাশিয়ার ভাষা শেখার জন্ম এবং রাশিয়ার সম্বন্ধে পড়াশুনো করার জন্ম সারা দেশে অনেক পাঠ-চক্র গ'ড়ে উঠেছে।......আমার জীবনে আমি এরূপ উৎসাহ আর দেখি নি। বাবার কাছ থেকে শুনেছি যে গ্যারিবল্‌ডীর সময় ইটালীর ব্যাপারেও আমাদের দেশে প্রবল জাতীয় উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল—একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা করা চলে, যদিও পরিমাণ এবং বিস্তৃতির দিক থেকে বর্তমান উৎসাহ অনেক বেশী গভীর ও বিস্তৃত। গভর্ণমেণ্ট যদি কখনও দেশের লোকের মতামত জান্‌তে চান্, তখন এটা স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেবে বলেই আমার নিশ্চিত ধারণা। সর্বোপরি আমরা রুশজাতি ও রুশ সৈন্যদল সম্পর্কে ভাল ভাবে অবহিত নই কেন সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।

এই মৈত্রী বিষয়ে আমাদের বিস্ময় প্রকৃতই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ছিল। এক সময়ে আমরা ক্রিমিয়াতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম—অদ্ভুত একটা খিঁচুড়ীগোছের যুদ্ধ। এই আমরা পঞ্চমবার একই স্বার্থে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পৃথিবীগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে মৈত্রী-বদ্ধ হয়েছি। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের বর্তমান পররাষ্ট্র-সচিব (আমার সোভিয়েট্ বন্ধুরা তাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতার কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন) মস্কোতে বলেছিলেন যে তিনি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কোন স্বার্থের সংঘাত দেখতে পান না—তাঁর একথা এশিয়া সম্বন্ধেও যেমন খাটে ইউরোপেও তেমনি, প্রশান্ত মহাসাগরেও যেমন প্রযোজ্য অতলান্তিক মহাসাগরেও তেমনি প্রযোজ্য।

তবু অতীতের ইতিহাস আমাদের যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি সতর্কও করে। বিগত চারবারের মধ্যে তিনবারের মৈত্রীই শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি—এগুলোর কারণ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা ভাল। জার্ পলের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী ভেঙে যাবার জন্ম অংশত দায়ী ছিল নেপোলিয়ঁর সঙ্গে বন্দী বিনিময়ে ফরাসী সৈন্যের বদলে রুশ সৈন্য গ্রহণে আমাদের অনিচ্ছা; নেপোলিয়ঁ আমাদের ভুলের সুযোগ দিয়ে অনেক ছোটখাটো উপহার সঙ্গে দিয়ে তাঁর বন্দীদের রাশিয়ায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পলের ছেলে আলেকজাণ্ডার অতি সহজেই প্রভাবিত হ'তেন; তাঁর সঙ্গে টিল্‌জিটে আমাদের সন্ধি ভেঙে যাবার প্রধান কারণ এই ছিল যে, ডানজিগ্ পরিত্রাণের জন্ম আমাদের প্রতিশ্রুত সাহায্য কখনও গিয়ে পৌঁছয় নি। গত মহাযুদ্ধে আমি রুশ সৈন্যদলের পুরোভাগে ছিলাম—আমি নিজের চোখে দেখেছি যে মিঃ লয়েড জর্জের নেতৃত্বে আমাদের দুঃসাহসী সৈন্যদল পৌঁছানোর অনেক আগেই নিয়মিত রুশ সৈন্যদল তিন তিন বার চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে গিয়েছিল—আমি তাদের সংখ্যাও বলতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যখন রাশিয়ায় আমাদের সাহায্য গিয়ে পৌঁছেছিল, তখন সে সাহায্য ব্যবহারের জন্ম নিয়মিত সৈন্যদল আর ছিল না।

এর থেকে আমরা বর্তমান সামরিক সহযোগিতার কঠিন প্রশ্নে এসে হাজির হই। কতকগুলো অত্যাবশ্যক

সাধারণ ব্যাপারে বর্তমানের রুশসৈন্যদল আমার গতযুদ্ধে দেখা সৈন্যদলের মতই আছে। সর্বদা পশ্চাৎভাগে আমরণ প্রবল যুদ্ধ ক'রে—বিশেষ ক'রে রাত্রিতে বেয়নেট যুদ্ধে রুশ সৈন্য পাকা ওস্তাদ—রুশরা আক্রমণকারীকে পর্যুদস্ত করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার বুকে প্রবল জার্মান আক্রমণেও তারা তাই করেছিল—তাদের অন্য কোন অস্ত্র ছিল না; অবশেষে রুশদের সাহসের ফলে সেপ্টেম্বর মাসে এ অভিযান যখন বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল, তখন লুডেনডর্ফ অভিযোগ করেছিল যে তিনি রণনৈতিক সাফল্য ছাড়া আর কিছু লাভ করতে পারেন নি। ঘেরাও করার প্রচেষ্টা পূর্বের মতই সুদূরপরাহত ছিল। কার্যত সর্বপ্রকার সরবরাহে বঞ্চিত সৈন্যদলই এ সাফল্য লাভ করেছিল। এখন রাশিয়ার যান্ত্রিক যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নিজস্ব কারখানা আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে, তার নিজস্ব শিক্ষিত যান্ত্রিক কর্মিবৃন্দ আছে। তখন সর্বব্যাপী নিরক্ষরতা সাধারণ সৈনিকের পদ থেকে কমিশন পদে উন্নতির প্রধান অন্তরায় ছিল—এখন বোধ হয় লালফৌজ অন্য যে কোন সৈন্যদল অপেক্ষা দীর্ঘতর সুশৃঙ্খল সামরিক শিক্ষা পেয়েছে। তবু চৌদ্দ বৎসরে স্ট্যালিন জার্মান শিল্পের সমপর্যায়ে উঠে আসবেন এ প্রত্যাশা কেউ করতে পারে না। এ সবই এখানে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে এবং আমরা নিজেরা যখন সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তিতে বিব্রত, তখন আমরা যে প্রচুরভাবে সরবরাহ করেছি তারও তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতার ফলে আমার ধারণা হয়েছে যে মৈত্রী জিনিসটা বড় ক্ষণভঙ্গুর এবং হয়ত বিশেষ ক'রে রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী। আমার মনে পড়ে—এ রকম কথা আমি বহুবার শুনেছি যে ইংলণ্ড শেষ বিন্দু পর্যন্ত রুশ রক্ত পান ক'রে যুদ্ধ করেছিল। বর্তমান যুদ্ধে রুশ সৈন্যদলের ক্ষতির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ। রুশরা বৃহদাকার শিশুদের মতই সহজে প্রভাবান্বিত হয়। বিপদের সময় যারা তাদের বন্ধুর কাজ করে তাদের জন্য তাদের উৎসাহের অন্ত থাকে না, কিংবা সাধারণ স্বার্থে তাদের আত্মোৎসর্গেরও সীমা থাকে না। কিন্তু সেই জন্যই তারা অপর পক্ষের আত্মোৎসর্গ বিষয়েও অতিমাত্রায় সচেতন। তারা অবশ্য বোঝে যে অনেক মাস ধ'রে যুদ্ধের প্রধান ধাক্কাটা তাদের উপর দিয়েই যাচ্ছে এবং বর্তমানে তারা এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে হয়ত ইচ্ছা থাকলেও তাদের সাফল্যলাভ নাও হ'তে পারে। স্বভাবতই একজন মিত্র জিজ্ঞাসা করে যে অপর মিত্র কি করছে। আমার নৈশ অভিযানে আমরা যখন জার্মান সৈন্যদলের সামনে লুকিয়ে ব'সে থাকতাম, তখন সাধারণ সৈনিকরা আমায় এই সব কথা জিজ্ঞাসা করত; কোন দূরবর্তী বন্ধু অপর দিক থেকে আঘাত করছে, এই ধারণায় তারা অন্তত সান্ত্বনা পেত। এখানে প্রভাবশালী কোন লোক এমন আশা পোষণ করেন যে জার্মান এবং রুশরা পরস্পরের বিনাশসাধন করুক—এমন কথা যদি তাদের কানে যেত—তবে তারা কি ভাবত—সে কথা ভেবে শুধু বিস্মিত হ'তে হয়। এখানে কিংবা রাশিয়ায় এরূপ ধারণাকে শুধু কভেন্ট্রির ধ্বংসাবশেষে প্রদত্ত উইনচেস্টারের মনোনীত বিশপের বক্তৃতার ভাষায় "অবিশ্বাস্যরূপে হীন" ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে।

...হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করার পূর্বে তাঁর সৈন্য-শক্তি বিশেষ ধ্বংস হয় নি। রুশরা তাদের প্রকাশিত ইস্তাহারে সর্বদা হিটলারের সৈন্যবাহিনীর ক্ষয়ের হিসাব দেয়। এই জন্য তারা পশ্চিমে মিত্রশক্তির আক্রমণ বিষয়ে এত উদ্বিগ্ন। আগামী বৎসর হয়ত অপেক্ষাকৃত কম জার্মাণ সৈন্যদলই রুশদের ধ'রে রাখতে পারবে—তখন পশ্চিমে মিত্রশক্তির অসুবিধা দ্বিগুণিত হ'য়ে উঠবে। রাশিয়া যদি যুদ্ধ না করে, তবে বিজয়লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা লুপ্ত হ'য়ে যাবে। অবশ্য দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাই সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করবেন—অবশ্য এরূপ দুর্ঘটনা যদি ঘটে, তবে আমাদের বিবেচনা ক'রে দেখা উচিত যে বিপদের সম্মুখীন হবার যেমন দায়িত্ব আছে, বিপদের সম্মুখীন না হবারও তেমনি দায়িত্ব আছে।...যুগ্ম-প্রচেষ্টায় দুই রকমের বিভিন্ন সময় নির্ঘণ্ট থাকতে পারে না এবং সর্বোপরি এই গুরুতর ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে স্পষ্ট বোঝাবুঝি থাকাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মিত্রশক্তিদের যখন যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় ক্ষেত্রেই জয়ী হ'তে হবে, তখন মৈত্রীর বাঁধন শিথিল ক'রে কিংবা পূর্বতন সন্দেহ সংশয়

জাগিয়ে তোলে এমন কোন কিছু ঘটতে দেখলেই মনে আশঙ্কা হয়।

আর একদিক থেকেও আন্তরিক মৈত্রীর অন্তরায় আছে—এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় অজ্ঞতার অংশও কম নয়। স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির মারাত্মক দ্বন্দ্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা—কিন্তু আমাদের এখানে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী কিংবা উদাসীন কেউ এর সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। এঁরা যে রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে পরস্পরবিরোধী এই সোজা কথাটি আমাদের বামপন্থীরা সাধারণত বুঝে উঠতে পারেন নি; স্ট্যালিন স্বদেশ-সংগঠনকারী রাষ্ট্রনেতা, তিনি পরিবারের মর্যাদা ফিরিয়ে দিয়েছেন—এমন কি কৃষকদের সহজ সম্পত্তি-বোধেরও কিছুটা নিবৃত্তি তিনি করেছেন (তিনি এখন ধীরে ধীরে ধর্মের উপর থেকে বাধা-নিষেধ তুলে নিচ্ছেন)—এক কথায় তাঁর ক্ষমতা প্রাপ্তির পর থেকে আন্তর্জাতিকতার স্থানে জাতীয়তা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার মনে করেন যে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রীর ফলে, সোভিয়েট প্রথম যুগে যে-সব ভুল এবং আতিশয্য করেছিল (বহুদিন হ'ল রাশিয়া থেকে সে-সব অদৃশ্য হয়েছে) সে-সব ভুল আমরা বুঝি আবার অনুকরণ করব। তাঁরা আবার আমাদের ১৯১৮-২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান—সেটা ছিল ট্রটস্কির স্বর্ণ-যুগ; কিন্তু সে-সময় স্ট্যালিনের কিছু হাত ছিল না। এটা অসাধারণ রকম খারাপ ইতিহাস-জ্ঞান ও অসাধারণ রকম খারাপ বুদ্ধির পরিচায়ক। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি এবং স্বাধীনতাকে অবজ্ঞা ক'রে তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন। আমরা ট্রটস্কি এবং তাঁর "চিরন্তন বিপ্লবে"র সাথে মৈত্রী-বদ্ধ হই নি—আমরা মৈত্রী-বদ্ধ হয়েছি সেই লোকটির সঙ্গে যিনি ট্রটস্কির উচ্ছেদসাধন করেছেন এবং যিনি আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়াকে আত্ম-রক্ষায় সমর্থ ক'রে তুলেছেন। আমাদের সাহসী মিত্রপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বজাতীয় আকাঙ্ক্ষার একচেটিয়া অধিকার দাবী করার অধিকার তাঁদের নেই। এ সব প্রশ্ন যথেষ্ট সরল; কিন্তু যুদ্ধের পর রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার প্রশ্ন আলোচনা করতে হ'লে এসব সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। গত মহাযুদ্ধের পরে আমরা বোধ হয় ভেবেছিলাম যে রাশিয়া এবং জার্মানী উভয়েই চিরদিনের মত গণনার বাইরে চলে গেছে। কাজেই আমরা ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ইউরোপের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেছিলাম যদিও পূর্ব ইউরোপের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমরা এত অজ্ঞ ছিলাম যে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা-স্থাপনে আমরা বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলাম। আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ এবং আমারাও যাদের রক্ষা করতে অসমর্থ প্রমাণিত হয়েছি—এমনি কতকগুলি ছোট রাজ্যের তাসের দেশ গঠন করাই আমাদের পরিকল্পনা ছিল—যদিও ফরাসীরাই এ পরিকল্পনায় আমাদের চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়েছিল। ফলে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সর্ববিজয়ী জার্মানীকে প্রতিরোধ করার জন্য শুধু আমরাই ছিলাম—প্রকৃত পক্ষে কার্যক্ষেত্রে একজনও মিত্র ছিল না—ছিল শুধু বহু দূরবর্তী ছোট ছোট দেশের প্রতি সীমাহীন কর্তব্য-বোধ। ব্রিটেন আক্রমণে ব্যর্থ হ'য়ে হিটলার এক বছরের মধ্যে অতি কম যুদ্ধ ক'রে এই দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে দখল করেছিলেন; এদিকে বাধা পেয়ে নেপোলিয়ঁর রাশিয়ায় পৌঁছাতে যত সময় লেগেছিল, হিটলারের তার চেয়ে কম সময় লেগেছিল। বড়দের চেয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ার গ্যারাণ্টি ছাড়া চিরন্তন শান্তির সম্ভাবনা নেই। তাই যদি হয় তবে কি ক'রে একাজ সম্পন্ন করা যাবে সে বিষয়ে আমাদের মত রাশিয়ার মতও বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে।...

বর্তমান রূপেই হোক বা অন্য রূপেই হোক্ রাশিয়ার বিপ্লব ছিল অবশ্যম্ভাবী—মহাযুদ্ধে রুশ গবর্ণমেণ্টের ব্যর্থতায় সে বিপ্লব দ্রুততর হয়েছিল। বিপ্লব প্রায় ক্ষেত্রেই একটা দেশকে সন্নিহিত দেশগুলোর দয়ার উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে। পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে রাশিয়া যা-কিছু লাভ করেছিল তার সবই তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া এখন আন্তর্জাতিকতা থেকে জাতীয়তায় ফিরে এসেছে। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তার বিশ্রাম-কালটা

সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের হারানো রাজ্য উদ্ধারে ব্যাপৃত ছিল—এসব রাজ্য ছিল আত্মরক্ষায় অসমর্থ এবং রাশিয়া এগিয়ে না গেলে হিটলারের Mein Kampf-এর ঘোষিত নীতি অনুযায়ী সেগুলো জার্মানীর ভাগে পড়ত। দেশের অভ্যন্তরে সে জারদের অনুসৃত একজাতীয়নীতি (one-nation policy) পরিবর্তিত ক'রে সকল জাতীয়দের জন্য সমান অধিকার এবং দায়িত্বের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। জার্মানীর ভবিষ্যৎ আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে সদ্ভাবাপন্ন এবং স্বাধীন পোলাণ্ড কিংবা চেকোস্লোভাকিয়া তার পক্ষে প্রয়োজন, কিন্তু পোলাণ্ড যদি হোয়াইট্ রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ভাগ চায় তবে সে দাবীতে সে বাধা দেবে—কেননা এক্ষেত্রে জাতীয়তার দিক থেকে পোলাণ্ডের চেয়ে রাশিয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আরও বেশী নিকট। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে রাশিয়ার সাময়িক বিপর্যয়ের আগে ইউরোপের ম্যাপে জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ ছোট বাল্‌টিক্ স্টেট্‌গুলোর কোন অস্তিত্ব ছিল না। এক অর্থে এগুলো তার আত্মরক্ষার বহির্দ্বার—এগুলোর প্রতি রাজ্য-লিপ্সু জার্মানীর প্রখর দৃষ্টি। এখন জার্মানী যেমন ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে লেনিন্‌গ্রাড্ আক্রমণ করছে, ভবিষ্যতে কেউ তেমন করতে পারবে না, এ ভরসা যদি সে পায়, তবে ফিন্‌ল্যাণ্ডের স্বাধীনতায় রাশিয়ার কোন বিপদ নেই।

ভবিষ্যৎ জার্মান আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রিটেন্ ও আমেরিকা প্রতিভূ হ'লেই রাশিয়া সম্মিলিত ভাবে এসব সমস্যা সমাধানে মন দিতে পারে। ব্রিটেন্ ইতিপূর্বেই বিশ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে—দরকার হ'লে ভবিষ্যতে চুক্তিকাল বাড়ানোর প্রতিজ্ঞাও সে করেছে।

অনুসৃত বর্তমান নীতিতেই ইউরোপের ভবিষ্যৎ স্থায়ী শান্তির যাকিছু প্রকৃত আশা দেখা যায়। আমাদের বর্তমান দুঃখ-দৈন্য থেকে আমরা যদি কিছু শিক্ষা পেয়ে থাকি, সে শিক্ষা এই হওয়া উচিত যে আমাদের ভবিষ্যৎ সন্ততি ও আমাদের বংশধরদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে আমরা কোন প্রকার রাষ্ট্রগত বা শ্রেণীগত দাবীর প্রাধান্য স্বীকার করব না। আমাদের সম্মিলিত দেশ-সমূহের যোদ্ধারাই যুদ্ধ জিতবে। ১৯৪০ খৃস্টাব্দে আমাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল আমাদের যুব-সমাজ। তাদের ঘাড়ে অসম্ভব কাজ চাপালে চলবে না। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে যুব-সমাজের সঙ্গে সর্বদা সংস্পর্শের ফলে—(আমি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমিতির প্রধান কোষাধ্যক্ষ, এই সমিতিতে প্রায় তেরো হাজার ছাত্রছাত্রী আছে)—আমি সর্বদাই যুবকদের অকাল মৃত্যুর কথা শুনতে পাচ্ছি। আর যারাও বা বেঁচে আছে তাদের পক্ষে আজ, যখন দেশের সব লাঙ্গলের ফাল অস্ত্রে পরিণত হয়েছে,—নিজেদের জীবন সম্পর্কে পরিকল্পনা করা কিংবা তাদের পরে যারা আসবে তাদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। জার্মান-আক্রমণ-আশঙ্কিত পৃথিবীর এরূপ নিরাপত্তার আশা আমি দেখি নে; শুধু যদি বর্তমান যুদ্ধের প্রধান তিনটি মিত্রপক্ষের সহযোগিতা যুদ্ধের পরেও চলতে থাকে, তবেই কিছু আশা আছে—এ তিনটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নামের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি আছে—ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থ্ অব্ নেশন্‌স্, ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব্ আমেরিকা ও ইউনিয়ন অব্ সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিক। গত বারের শান্তি-প্রতিষ্ঠার সময় শেষোক্ত দুটি শক্তি অনুপস্থিত ছিল। অবশ্য এর সঙ্গে চীনের গণতন্ত্রকেও ধরতে হবে। শুধু এই সব শক্তির সহযোগিতাই ছোট রাষ্ট্রগুলি তাদের অধিকার নিয়ে স্থায়ী শান্তিতে বাস করার আশা করতে পারে।*

*[The Contemporary Review পত্রিকা থেকে অনূদিত]

দেশী পত্রিকা হইতে

সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণে ধর্ম্ম

(সুবোধ ঘোষ)

[ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অভিবাদন' থেকে সংকলিত]

"ছেলেবেলায় মনে করিতাম ভগবান বুঝি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত দেখিতে"—এক লেখিকা রবীন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা-প্রসঙ্গে এই কথা লিখেছেন। কথা-গুলির মধ্যে সরল সত্যতা আছে। লেখিকা যে সম্প্রদায়ের মানুষ, তাতে ধারণা হয় যে তিনি ছেলেবেলা থেকেই নিরাকার ভগবানের আরাধনা করতে শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছিলেন। তবু তাঁর কিশোর কল্পনায় সকল রকম দার্শনিক সংজ্ঞা ঠেলে ফেলে ভগবান দেখা দিলেন রবীন্দ্রনাথের রূপে—সুশ্রী ও দীর্ঘকান্তি, সুকণ্ঠ ও সুবেশ, গুণী ও জ্ঞানী, যশস্বী ও ধনী এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

এই ধারণা কোন দোষের বা গুণের কথা নয়। প্রবাদ আছে যে, মানুষ তার নিজের 'ইমেজ' মতই ভগবানকে গড়ে থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানুষ তাই করেছে। সামাজিক জীবনে যা কিছু বড় হওয়ার গুণ, সামাজিক রুচিতে যা কিছু শ্রেয়, প্রেয় ও কাম্য—তা সব কিছুই ভগবানের আছে। সামাজিক জীবনে যা-কিছু পাপ-তাপ, শোক-দুঃখ ও বেদনা অর্থাৎ যা কিছু অবাঞ্ছিত—ভগবানের সে-সব নেই, ভগবানকে সে-সব দুর্ভোগ ভুগতে হয় না। পাপুয়ানদের ভগবান তাই সবচেয়ে বেশী সজারুর মাংস খেতে পান, তাঁর হাতের বল্লম সবচেয়ে বেশী মজবুত, দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ। হিন্দুর ভগবান তাই সর্ব্বশক্তিমান, পরম দয়ালু ও সুবিচারক—পাপীকে দণ্ড ও পুণ্যাত্মাকে সুখশান্তি দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ ভগবান একজন খুব ভাল রাজা। শ্রীরামচন্দ্রই ভগবান।

মানুষের সমাজ আছে এবং এই সমাজের শাসন আছে। এই শাসনের বিধানে মানুষের আচরণকে ভাল-মন্দ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। আচরণ ও চিন্তার দিক দিয়ে কতগুলি বিষয় গর্হিত ও কতগুলি বিষয় বরণীয়। এই বরণীয় আচরণ ও চিন্তার চরম প্রকাশ যার মধ্যে সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ; কিন্তু বাস্তবে এমন মানুষ হয় না। এই শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা হয় এক কাল্পনিক পরমপুরুষকে—যিনি ভগবান অর্থাৎ আদর্শ সমাজ-রুচির 'X' মাত্র।

কিন্তু সর্ব্বদেশে মানুষের সমাজের গঠন ও রীতি এক নয়। তাই সর্ব্বদেশে ভগবানও এক নয়। কেষ্ট-বিষ্টু থেকে সুরু ক'রে 'বোঙা' পর্য্যন্ত অজস্র শাস্ত্রীয় ভগবান্ আছে—তারা রূপে রূপে বিচিত্র ও বিভিন্ন। তা ছাড়া এই সব শাস্ত্রীয় ভগবানগুলি প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তায় প্রবেশ ক'রে আরও কত বিচিত্র হয়ে ওঠে কে জানে। বলতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভগবানই তার নিজস্ব ও তারা পরস্পর বিভিন্ন। এক ব্যক্তির মানসেশ্বরের সঙ্গে অপর ব্যক্তির মানসেশ্বরের কোন সাদৃশ্য নেই। সুতরাং বলতে হয় এই ভগবান মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ এ'কে ইচ্ছামত গড়ে আর তার অধীনতাও স্বীকার করে। ধর্ম্মের প্রসঙ্গে ভগবানের প্রসঙ্গ এনে এত কথা বলা এই কারণে যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস আধুনিক সভ্য মানুষের সমাজে একটা অতি শক্তিশালী মানসকূট। আর একটি ঘটনার কথা বলে নেওয়া যাক্ :—

সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন হ্যারিসন রোড দিয়ে পূব থেকে পশ্চিমে বহু প্রতিমা শোভাযাত্রা ক'রে চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন কলেজের ছাত্রদের এক একটি দল বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে গানবাজনা ও রোশনাই জাঁকিয়ে মোটর ট্রাকের ওপর প্রতিমা চড়িয়ে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক গলির মুখে পাড়ার পুরুষ মহিলা ও শিশু বৃদ্ধ ভীড় করেছে। এক একটি প্রতিমা যায় আর জনতা সভক্তি প্রণাম করে। যাদবপুর কলেজ দলের একটি সুদৃশ্য ও সুসজ্জিত প্রতিমাও চলে গেল; জনতা প্রণাম জানালো। তার পরেই এল একটি প্রতিমা—অতি ক্ষুদ্র-গঠন সাদাসিধে একটি সরস্বতী। কোন জাঁকজমক নেই; গরীব গোছের একটি লোক প্রতিমাটি মাথায় নিয়ে চলেছে, বোধ হয় 'মানৎ' ছিল। সঙ্গে মাত্র আর একটি লোক কাঁসর বাজিয়ে চলেছে। এই প্রতিমাটিও যথারীতি প্রত্যেক জনতার সামনে এসে অনেকক্ষণ ধরে থামলো। বাজিয়ে লোকটা কত নেচেকুঁদে কাঁসর

বাজালো, কিন্তু জনতা শুধু তাকিয়ে রইলো নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়ে—এই প্রতিমাটিকে কেউ প্রণাম করলো না।

এই ঘটনার মধ্যে দেবতা-প্রীতি ও ধার্ম্মিকতার একটু মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বৈকি! এ ক্ষেত্রে বলতে পারা যায়, সরস্বতী সত্যিই দেবতা নয়—দেবতা হ'ল জাঁকজমক, আড়ম্বর আর অলঙ্কার। সামাজিক রুচিকে এইভাবেই দেবতা নামে অলৌকিক ও অলীক কোন শক্তিবিশেষে আরোপ ক'রে আমরা পরোক্ষে প্রচলিত সামাজিক মনোবৃত্তিকেই সুকীর্ত্তিত করতে চাই।

প্রশ্ন উঠতে পারে—এই ভগবান বা দেবতা অলীক হ'লেও, এদের দোষটা কি? এদের থাকাতে জগতে কার কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে?

এদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আপত্তি হ'লো—এরা সমাজের পরিবর্ত্তনের পথে বাধা। উন্নতি অর্থই পরিবর্ত্তন, সুতরাং এরা উন্নতির বিঘ্ন। মানুষের সমাজগত কতকগুলি প্রবৃত্তি থেকে তৈরী হয়েও ভগবান ও দেবতা ক্রমেই একটি অব্যয় সত্যের রূপ নিয়ে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির উপর বিভ্রমের জাল পেতে বসে। সমাজে 'যা আছে তাই থাক' (Status quo) মনোভাবই একটি সদাচরণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সদাচরণকেই ধর্ম্ম আখ্যা দেওয়া হয়। ধার্ম্মিকেরা মনোবৃত্তি বদলাতে চায় না, কেন না, তা হ'লে ভগবান বদলে যায় যে। ধর্ম্ম চায় সমাজ ভগবানের দোহাই নিয়ে একটা পরিণামের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকুক। নতুন পরিণাম সৃষ্টির প্রেরণা ধর্ম্মের মধ্যে নেই। এ পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ সমাজ-মনস্তত্বের দিক দিয়ে ধর্ম্মের একটা পরিচয় পেলাম। এই ধর্ম্ম (পরিবর্ত্তনবিমুখতা) ভগবান নামে একটি অপ-দার্শনিক প্রতাপের (Force) আশ্রয়ে নিজেকে বজায় রাখতে চায়।

অধিকাংশ ধর্ম্মই ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত। কিন্তু এই আস্তিক্যবাদই ধর্ম্মের একমাত্র গুণ লক্ষণ নয়। রীতিমত ভগবান-বিরোধী ধর্ম্মও অনেক আছে। ভগবান মানুক আর না-মানুক সকল ধর্ম্মই মানুষের সামাজিক প্রগতির বিরোধী। ভগবান ছাড়াও বহুবিধ কুসংস্কারের সমষ্টি নিয়ে ধর্ম্ম। নানা অর্থহীন ক্রিয়াকাণ্ড এই ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অনুষঙ্গ। ধর্ম্মবোধ মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসা বিভ্রান্ত করে। ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রকোপে মানুষ বুঝতে পারে না তার প্রাকৃত-ঐতিহাসিক-সামাজিক স্বরূপ। সমাজবিজ্ঞানী মার্ক্স সমগ্র ইতিহাসের গতি প্রকৃতি ও পরিণাম বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার ক'রে যে সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তার অনুসরণের ফলে আমরা সমস্ত পরিবর্ত্তন ও প্রগতির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে পারি। মার্ক্সবাদকে ঠিক তাই কোন প্রকার 'বাদ' বলা যায় না। এটা বিজ্ঞানসিদ্ধ বিচার-পদ্ধতি। মার্ক্সবাদের সঙ্গে কোন দিব্য-সিদ্ধান্ত জড়িয়ে নেই—কোন ধরণের বিশ্বাসের ফরমূলা দিয়ে বাঁধা নয়। মার্ক্সীয় বিচার-প্রণালী দিয়ে আলোচনা করলে আমাদের বহু পুরাতন ও পরিপুষ্ট ধারণা ও সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বদলে যায়! তখন বুঝতে পারি এ পর্য্যন্ত আমরা অনেক কাঁচকে কাঞ্চন ব'লে বৃথা উল্লাস ক'রে এসেছি; অনেক রজ্জুকে সর্পভ্রম করে বৃথা ভয় পেয়ে এসেছি। মার্ক্সীয় বিচার আধুনিকতম জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা। ইতিহাসের সর্ব্বক্ষেত্রে এই বিচার প্রয়োগ ক'রে আমরা পরিবর্ত্তনের একই সূত্র আবিষ্কার করি। প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-গঠন, আর্ট, নীতি ও রুচি, পদার্থ, মন ও চেতনার সেই পরিবর্ত্তনের পরম নিয়মটুকু মার্ক্সীয় বিচারে যেভাবে ধরা পড়েছে, তার ফলেই আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসার সমূহ সংজ্ঞানও বদলে গেছে। ধর্ম্ম যে কি-বস্তু মার্ক্সীয় বিচারে তার নির্ণয় পাওয়া যায়।

এই মার্ক্সীয় বিচার-পদ্ধতি জানলে ধর্ম্মের আসল রহস্যটুকু সহজে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ধর্ম্মের ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তার অর্থ অনর্থ তখন যথাযথ ভাবে জানা যায়।

মার্ক্সীয় বিচারের প্রথম আবিষ্কার হ'লো—বস্তুবাদ (materialism)। য়ুরোপীয় দর্শনের ভাববাদী কুহক থেকে তিনি এই বস্তুবাদের তত্বকে উদ্ধার করেছেন। বস্তুবাদ এককালে ভারতীয় দর্শনের মধ্যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু মার্ক্সীয় বস্তুবাদের মধ্যে যে যৌক্তিক সমগ্রতা আছে, প্রাচীন ভারতীয় বস্তুবাদে ততটা ছিল না। তবু ভারতীয় চিন্তায় বস্তুবাদের এই প্রথম আবির্ভাব বৈজ্ঞানিক সন্ধিৎসার ঐতিহ্যকে স্মরণ

করিয়ে দেয়। ভারতীয় লোকায়ত (চার্ব্বাক, বৃহস্পতি প্রবর্ত্তিত দর্শন) যখন বলেন—'প্রত্যক্ষমেব প্রমাণম্' অথবা 'পৃথিব্যপ্‌ তেজো বায়ুরিতিতত্ত্বানি, তৎসমুদায়ে শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞা'—তখন বুঝতে পারি বস্তুবাদের সত্যতা প্রাচীন দার্শনিকেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি। বৈশেষিকের কণাদের পরমাণুবাদের মধ্যেও বস্তুবাদের একটি বড় রকমের তত্ত্বের ঘোষণা দেখতে পাই। [অবশ্য, কণাদের পরমাণু হ'লো সৎ নিত্য ও অনুমেয়] পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কণাদ যে নিয়ম বর্ণনা করেছেন, সেটাই বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। অর্থাৎ—"ঘট এবং পটাদি দ্রব্য পরমাণুর স্বরূপ নয়, পরমাণুপুঞ্জের সমষ্টিবাদ দ্রব্যান্তর এবং এই দ্রব্যান্তরের নাম অবয়বী।" কতিপয় পরমাণুর সংযোগে দ্ব্যাণুক, দ্ব্যাণুকের সংযোগে ত্রসরেণু এবং ক্রমে ক্রমে মহাবয়ব দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দার্শনিক কাণ্ট তাঁর "Theory of Heavens" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাণ্টের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এঞ্জেলস্ খুসী হয়ে বলেছেন—"কাণ্টের এই আবিষ্কারের মধ্যেই পরবর্ত্তী সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তার বীজ লুকিয়ে রয়েছে। যদি পৃথিবী একটি সৃষ্ট বস্তু [Become যা ছিল না, পরে হয়েছে] মাত্র, তবে পৃথিবীর বর্ত্তমান ভূতত্ত্ব, জলবায়ু গাছপালা ও জীবজন্তু প্রভৃতি সবারই পেছনে সৃষ্টি ও রূপান্তরের আদি ও ইতিহাস আছে। 'কাল ও ক্ষেত্র' হিসাবে এই 'পাত্রে'রও ইতিহাস আছে।" বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদগত পদার্থান্তরের সূত্র কাণ্টিয় সূত্রের মতই বস্তুবাদের সত্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। ভারতীয় অন্যান্য কতকগুলি দর্শনের মধ্যে বস্তুবাদের সামান্য কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়—জৈনও যোগাচারী বৌদ্ধদের মধ্যে। দীঘনিকায়ের অন্তর্গত 'সমন্নফল সুত্ত' (দার্শনিক অজিত কথিত) বস্তুবাদের একটি বড় স্বীকৃতি।

মার্ক্স ও এঞ্জেলস্ বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠাতা। তাঁরা সকল দার্শনিক ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের ভাববাদের (idealism) ভ্রান্ততা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। শেষে এসে তাঁরা কিছুক্ষণ পরীক্ষার জন্য দাঁড়ালেন হেগেলের ভাববাদী দর্শনের কাছে। তার কারণ, হেগেলীয় ভাববাদের বিচার-পদ্ধতি অন্যান্য দার্শনিকের মত ছিল না। এই হেগেলীয় দর্শনের মধ্যে বিচারের এক সোনার কাঠি লুকিয়ে ছিল—ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ (Dialectics) বা দ্বান্দ্বিকতা। হেগেলীয় বিচারের মহৎ বৈশিষ্ট্য এখানে; তিনি মেটাফিজিক্সের আধিপত্য কাটিয়ে যুক্তিকে নতুন পথে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

কিন্তু হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক আর মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিকে মৌলিক পার্থক্য আছে। দ্বান্দ্বিককে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় 'দুই বিপরীতের একত্ব প্রাপ্তি' (unity of opposites)। ব্যাখ্যা ক'রে বললে বলা যায়—পরিদৃশ্য মাত্রই (form) পরিবর্ত্তনশীল, পরিদৃশ্যের উৎপত্তি ও বিনাশের নিয়ম-কানুনও পরিবর্ত্তনশীল, পরম সত্য বা চরম পরিণাম বলে কিছু নেই, পরিবর্ত্তনের গতি একটানা বা ক্রমিক নয়—পরিমাণ অবশেষে গুণে রূপান্তরিত হয়, একই বস্তুর মধ্যে পরস্পরবিরোধী দুই গুণের উদ্ভব হয়—বিরোধগুলি পরিবর্ত্তিত ও সমন্বিত (Synthesis) হয়—ইত্যাদি। কিন্তু হেগেলের কাছে 'আইডিয়া' হলো প্রধান সত্তা—বস্তু 'আইডিয়া'র বহিঃপ্রকাশ।

মার্ক্স ও এঞ্জেলস্ হেগেলের এই আইডিয়া সর্ব্বসত্তার নিদারুণ প্রমাদটুকু বুঝতে পেরেছিলেন। 'আইডিয়া'র জন্য হেগেলীয় মতবাদের বৈজ্ঞানিকতাটুকু বেঁচে যায়। হেগেলীয় দ্বান্দ্বিকতার সঙ্গে বৌদ্ধ-দর্শনের 'প্রতীকসমুৎপাদ' থিওরির একটা সাদৃশ্য আছে।—'অস্মিন্ সতীদং ভবতি অস্যোৎপাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে'। একটির কারণ ঘটলে অন্যটি ঘটে, একের উৎপত্তি হ'লে অন্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু হেগেলের বাষ্পীয় আইডিয়ার মত বৌদ্ধ যুক্তির সূত্রগুলি দুঃখবাদের সর্ব্বসত্তায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে।

মার্ক্সবাদে তাই নিরীশ্বরবাদের সহজ অভিব্যক্তি—কিন্তু নিছক নিরীশ্বরবাদ মার্ক্সবাদ নয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা যতদূর এসেছি, তাতে বুঝেছি—মার্ক্সীয় বিচারে বস্তুবাদ ও জাগতিক সর্ব্ববিষয়ের রূপান্তরের দ্বান্দ্বিক স্বরূপ হলো সার কথা।

অনেক পণ্ডিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্য ভাবে একটা সমর্থন খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন। কেউ বলেন আত্মিক (spiritual) উন্নতির তাগিদ থেকে ধর্ম্ম এসেছে; কেউ বলেন ধর্ম্মের

মধ্যে সমাজ তার কৃষ্টিগত অনুশীলনী বজায় রাখে। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা থেকে এই তত্ত্বই বার বার উঁকি দেয় যে তাগিদটা ছিল সমাজ-অর্থনীতিক (socio-economic)। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যে-সব সামাজিক অভ্যুত্থান হয়েছে, তার প্রয়োজন ও প্রেরণা সামাজিক কারণ থেকেই উদ্ভূত। একটা পরিবর্ত্তনের সৃষ্টিশীল দ্বান্দ্বিক বেদনা সমাজকে রূপান্তরের পথে নিয়ে যায়। ধর্ম্ম একটা অজুহাত মাত্র; যুক্তিবাদের নাস্তিত্বের জন্যই সে-সব অভ্যুত্থানের স্বরূপ মূলতত্ত্ব পণ্ডিতদের নজরের আড়ালে পড়ে যায়। ঝড়ে গাছের পাতা নড়ে, কিন্তু পাতা নড়াটা ঝড়ের কারণ নয়, তা ছাড়া কৃষ্টিগত অনুশীলন সমাজ-ধর্ম্মের প্রেরণাতেই স্বাধীনভাবে সম্ভব—ধর্ম্মের দোহাইটুকু সরিয়ে নিলে যেমন ব্যক্তিগত জীবনে কোন লোকের সাংস্কৃতিক অধঃপতন হয় না, সামাজিক জীবনেও সেই রকম কিছু অঘটন ঘটে না।

যে-দেশে যেমন ধর্ম্মই থাকুক ধার্ম্মিকতার একটা সর্ব্বদেশীয় রূপ ও তার একটা বিশেষ মানসিক ভিত্তি দেখা যায়। পরকাল, জন্মান্তর, অদৃষ্ট, অনাসক্তি, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, কৃচ্ছ্র-সাধনা, স্বর্গ, আত্মা, অব্যয় সত্য, পাপপুণ্যের ইতি-নেতি ভগবান ইত্যাদি। এর সঙ্গে মানসিক তথা নৈতিক একটা পর্য্যায় আছে—বীরপূজা, প্রতিযোগিতার উচ্চাদর্শ, ব্যক্তিগত বড় হওয়া, আত্মবলিদানের মাহাত্ম্য প্রভৃতি।

শুধু পণ্ডিত কেন, বৈজ্ঞানিকদের কথাই ধরা যাক্, যাঁরা টেস্ট টিউব নাড়াচাড়া করেন। তাঁরা পদে পদে পদার্থতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্বের বস্তুবাদী স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন; কিন্তু দেখা যায় তাঁদের অনেকেই সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের বেলায় বস্তুবাদ-বিরোধী কথা বলেন। জীন্সের 'গাণিতিক ভগবান', অলিভার লজের 'প্রেত ভগবান' এমন কি আইনস্টাইনের 'পরমাত্মা ভগবানে'র কথা অনেকে শুনেছেন। বৈজ্ঞানিক হয়েও এঁদের চিন্তায় শেষরক্ষা হয় নি; কারণ মনন-শীলতায় বৈজ্ঞানিকতার অভাব। যুক্তির গোড়ায় বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিকতাকে স্বীকার করলে অলৌকিক ভাবুকতার কুহেলিকায় এঁদের বিদ্যা পথভ্রষ্ট হতো না।

আমরা দেখেছি ধর্ম্মের নামে কতগুলি অপমানসিক অনুশাসন মানুষের বুদ্ধিকে ঘিরে রেখেছে, ফলে সামাজিক প্রতিভা হয়েছে ক্ষুণ্ণ। এই ধর্ম্মীয় অনুশাসনগুলি সমাজের বিশেষ এক অর্থনীতিক অবস্থাকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখার পক্ষে। এই কায়েমী অর্থনীতি বর্ত্তমান সমাজের প্রগতির পথে হিংস্রতম বিঘ্ন। এরই মধ্যে শ্রেণীগত শোষণের ঠাটটুকু বর্ণচোরা হয়ে ফলে আছে। মার্ক্সের বিচারে সমাজ-ইতিহাসের ভেতর থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণীগত শোষণের কুকীর্ত্তি লয় না হ'লে সামাজিক ও সর্ব্বমানসিক উন্নতি অসম্ভব ধর্ম্মের ধ্বজা এই শ্রেণীস্বার্থের দুষ্টবুদ্ধির মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে।

শেষ প্রশ্ন, ধর্ম্মের উচ্ছেদ কি ভাবে সম্ভব? মার্কস্ এঙ্গেলস্ ও সাম্যবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা লেনিনের উক্তিই এই বিষয়ে প্রামাণ্য। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সোজাসুজি কোন জেহাদ ঘোষণা করার কোন অর্থ হয় না। তা হ'লে সেটা বিষ-বৃক্ষের মূল রেখে ডালকাটা হবে মাত্র। চাই ধর্ম্ম-ধ্বজার ঐ সামাজিক ভিত্তিটুকু উপড়ে ফেলা। যে-সব সামাজিক বিধি-বিধান ও অবস্থা ধর্ম্মকে লালন করছে—সেই বিধানের বিনাশ হলেই 'ধর্ম্ম' আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

উপসংহারে এসে শুধু এই কথা মনে পড়ে—মার্কস্, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের প্রতিভার প্রেরণাকে বর্ত্তমান যুগের যে মনস্বী কর্ম্মীবৃন্দ যুগসম্ভূত উত্তরাধিকার রূপে পেয়েছেন— তাঁরা বিপ্লবী ও সাম্যবাদী। তাঁরা বুঝেছেন জড় অণুপুঞ্জে গড়া এই মহাবয়ব পৃথিবীর রূপান্তরের ইতিহাস এক পরিবর্ত্তনের বেদনায় সমাচ্ছন্নতা—স্বয়ং জড় প্রকৃতিও রূপে গুণে বদলে যায়। পদার্থে প্রাণের সাড়া লাগে। প্রাণময় জীবের দেহকোষের তন্তুতে তন্তুতে তার সংগ্রাম ও আচরণের অভিজ্ঞতা চেতনার রঙ লাগিয়ে দেয়। চেতন জীবলীলা নিজেই প্রকৃতিকে সৃষ্টি করতে থাকে—ভাব ভাষা কল্পনা সুর, শোক আনন্দ ভালবাসা দিয়ে মানুষ তার এক বিচিত্র সুন্দর সামাজিক প্রকৃতি গড়ে তোলে, আবার বদলে যায়। শাশ্বত পরিণাম বলে কিছু নেই—এই পরিণামের প্রবাহই এখন আমাদের গোচরীভূত সত্য। সাম্যবাদী বিপ্লবী মনের এই শিক্ষার মধ্যেই তার ইতিকর্ত্তব্যের ইঙ্গিত।

আজ সাম্যবাদের প্রেরণায় সারা পৃথিবীর মানুষ চঞ্চল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া ধর্মাশ্রয়ী এক বিরুদ্ধ শক্তিও চাড়া দিয়ে উঠেছে—ফাসিস্তবাদের রূপে। ফাসিস্তবাদের দার্শনিক ভিত্তি ভাববাদের (idealism) পুরাতন আখড়ায়। ভগবান ও ধর্ম এদের একটা বড় সহায়। সভ্যতা আজ একটা পরীক্ষার সম্মুখীন।

আমরা বুঝবো—একদিন যেখানে টেথিস সমুদ্রের লবণাম্বু তরঙ্গভঙ্গে চূর্ণ হয়ে বাষ্প বিস্তার করেছে, সেখানে আজ সুকঠিন হিমগিরি সমাসীন। এই প্রচণ্ড রূপান্তরের ইতিহাসের মধ্যে যুগজীর্ণ ধর্মের বিগ্রহ নিজেকে অক্ষয় মনে করতে পারে না। ধর্ম হলো অ-পদার্থ ও অসামাজিক। ধর্ম শুধু অপেক্ষা ক'রে আছে যতদিন না নববুদ্ধিতে বলীয়ান নতুন মানুষের সমাজ তাকে গলিত শবের মত ভাগাড়ে ফেলে দেয়।

ভারতের জনসংখ্যা

[ভারতের ১৯৪১ সালের লোকগণনার চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার কয়েকটি হিসাব প্রদত্ত হইল]

সমগ্র ভারতের লোকসংখ্যা ৩৮ কোটি ৮৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৯ শত ৫৫; ১৯৩১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৩৩ কোটি ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ১ শত ৫৪। প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা :—

প্রদেশ	১৯৪১	১৯৩১
মাদ্রাজ	৪৯,৩৪১,৮১০	৪৪,২০৫,২৪৩
বোম্বাই	২০,৮৪৯,৮৪০	১৭,৯৯২,০৫৩
বাংলা	৬০,৩০৬,৫২৫	৫০,১১৫,৫৪৮
যুক্তপ্রদেশ	৫৫,০২০,৬১৭	৪৮,৪০৮,৪৮২
পাঞ্জাব	২৮,৪১৮,৮১৯	২৩,৫৮০,৮৬৪
বিহার	৩৬,৩৪০,১৫১	৩২,৩৬৭,৯০৯
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৬,৮১৩,৫৮৪	১৫,৩২৩,০৫৮
আসাম	১০,২০৪,৭৩৩	৮,৬২২,৭৯১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩,০৩৮,০৬৭	২,৪২৫,০৭৬
উড়িষ্যা	৮,৭২৮,৫৪৪	৮,০২৫,৬৭১
সিন্ধু	৪,৫৩৫,০০৮	৩,৮৮৭,০৭০

প্রধান প্রধান সহরগুলির লোকসংখ্যা

সহর	১৯৪১	১৯৩১
কলিকাতা	২,১০৮,৪৯১	১,১৬৩,৭৭১
বোম্বাই	১,৪৮৯,৮৮৩	১,১৬১,৩৮৩
মাদ্রাজ	৭৭৭,৪৮১	৬৪৭,২৩০
লাহোর	৬৭১,৬৫৯	৪২৯,৭৪৭
দিল্লী	৫২০,৮৪৯	৩৪৭,৫৩৯
করাচী	৩৫৯,৪৯২	২৪৭,৭৯১
হাওড়া	৩৭৯,২৯২	২২৪,৮৭৩
কাশী	২৬৩,১০০	২০৫,৩১৫
ঢাকা	২১৩,২১৮	১৩৮,৫১৮
কাণপুর	৪৮৭,৩২৪	২৪৩,৭৫৫
আমেদাবাদ	৫৯১,২৬৭	৩১০,০০০
লক্ষ্ণৌ	৩৮৭,১৭৭	২৭৪,৬৫৯

শিক্ষিতের হার

সমগ্র ভারতে শিক্ষিতের হার ১৯৩১ সাল অপেক্ষা শতকরা ৭০ বৃদ্ধি পাইয়াছে:—প্রদেশগুলির মধ্যে পাঞ্জাবেই শিক্ষিতের হার সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা যায়, ঐ প্রদেশে বর্ত্তমানে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৩০। যুক্তপ্রদেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৮ জন মাত্র। শিক্ষিতের সংখ্যা বোম্বাই প্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১৯৪১ সালের হিসাবানুসারে এই প্রদেশে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন শিক্ষিত এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯ জন শিক্ষিত। বোম্বাইয়ের পরেই বাংলার স্থান। বাংলায় পুরুষদের মধ্যে শতকরা ২৫ জন এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৭ জন শিক্ষিত অর্থাৎ এই প্রদেশে গড়পড়তা শতকরা ১৬ জন শিক্ষিত।

১৯৪১ সালের হিসাবে দেখা গিয়াছে, ফরাসী অধিকৃত ভারতের মোট লোকসংখ্যা ৩২৩,২৯৫ তন্মধ্যে পুরুষ ১৬২,৯১৬ এবং নারী ১৬০,৩৭৯।

কবিতা

ভগবান্

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ঈশ্বর আছেন কি না এ প্রশ্নের কি দিব উত্তর ?
আমি শুধু এই জানি, আমি আছি, আছে মোর মাঝে
জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাস্বপ্ন অনুভূতি কাজে
সীমানা মানে না তারা, শুভঙ্কর সত্য ও সুন্দর
বুঝি যাহা তার তরে নমস্কার জানায় অন্তর
শ্রদ্ধাভরে, প্রাণের আঁধারে কোথা শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে
ভূমার পূজার লাগি, ভালবাসা আর জিজ্ঞাসা যে
দেশকালে ব্যবধান উত্তরিতে চায় নিরন্তর।

দৌর্বল্যে বা পরবশে অসত্যে অশিবে অসুন্দরে
আমার আসল আমি আত্ম-বিস্মৃতি ও বিকৃতিতে
হয় যবে মুহ্যমান্ স্বতঃস্ফূর্ত বাঁচিবার আশা
আমারে উদ্বুদ্ধ ক'রে বক্ষে যবে জাগে ভালবাসা
মানুষ স্বদেশ কিম্বা মহত্তম আদর্শের তরে
মোর ভগবান্ সেথা দেখা দেন হেরি আচম্বিতে।

"দুর্য্যোগ"

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

অসীম বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলেছে জীবনের এই মায়া,
চারিদিকে আজ শুনেছি মায়ার সুর,
নয়ন-সম্মুখে আঁধার রজনী মেলিয়াছে কালো ছায়া
দুর্য্যোগ রাত্রি ঘনায়ে চিত্ত-পুর।

পান্থ আমিরে পথের ধারেতে কাটিছে আমার বেলা,
সমুখে পিছনে না পাই দেখিতে পথ ;
পথে পথে শুধু ধূলি নিয়ে আমি করিতেছি ধূলি-খেলা'
মিশিছে জীবন ধূলি'পরে অবিরত।

বন্দী ব্যথায় নিবিড় অন্ধ হয়েছে নয়ন মোর
নিভিয়া গিয়াছে আলোক আঁখির 'পরে,
আমার আঁধার আমার রজনী হবে নাকি আর ভোর,
মুক্তি-আলোক ফুটিবে না মোর ঘরে ?

অগ্রদূত

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

ক্লান্তির পঙ্কিল স্তূপ ফেলে দাও দূরে।
তোমার আমার দ্বারে এল অগ্রদূত,
উদ্ভাসিত জ্যোতিঃ নিয়ে সর্ব্বপৃথ্বী ঘুরে,
সুদূর ভবিষ্যবাণী জানায় অযুত।
গোধূলির লাল রঙ্ ললাটে লেপন,
অগ্নির জ্বলন্ত পিণ্ড বক্ষে জ্বল জ্বল,
দুহাতে বাজিছে শোনো কাস্তের স্বনন,
স্মিতহাস্যে ভরা মুখ—সরস শ্যামল।

অগ্রদূত দ্বারে এল,—ক্লান্তি দূরে যাক্।
আকাশের তারা আর হরিয়াল পাখী,
যাক মুছে মন থেকে, সুরু ইতিহাস।
রক্তের যথার্থ মূল্য সুমর্য্যাদা পাক,
কল্পিত স্বপন আজ থাক পড়ে বাকী,
অগ্রদূত ইসারায় দিয়েছে আশ্বাস।

হংস-বলাকা

শামসুদ্দীন

কণ্টকিত অনির্দেশ প্রান্তে সবে চলে—
লক্ষ্যহীন দ্বিধাগ্রস্ত আঁখি ;
কমল ফুটিবে, আশা নব সূর্যালোকে
সম্ভাষিবে সকলেরে ডাকি।

রক্তনেশা যৌবনের মর্ত্যধূলিরথে
পুষ্পভরা ছন্দময় দিনে,
স্বর্গ রচে অধ্যুষিত সম্মুখ বেলায়
সুরঞ্জিত লক্ষ্য পথ চিনে।

হর্ষোৎফুল্ল দিনান্তের গোধূলির ছায়া
সচকিয়া যেন অর্ধপথে
উলংগও পংগুসম আঁধার কারায়
ব্যাপ্ত রহে মৌন কালস্রোতে।

ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তে যেন বসি হংসদল
পক্ষ ঢাকে অন্ধ সরোবরে ;
মনে হয় : জবদগব মনুষ্যের রূপে
সঞ্চরিছে নিখিলের ঘরে।

পুস্তক-পরিচয়

নিশীথ সূর্য—শ্রীরবীন্দ্রবিনোদ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দুই টাকা। পৃ. ২১২।

একটি অসামাজিক প্রেম-কাহিনী এবং আর একটি সমাজ-বিপ্লব—এই দুই প্রকারের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থের আরম্ভ। নায়ক সঞ্জয় জাতিতে বিপ্লবী, বিপ্লবের ভিতর দিয়েই তার এই আখ্যায়িকায় আবির্ভাব। একদিকে তার মন সমাজ-চেতনায় ভরা, অন্য দিকে তার মনে ভ্রাতৃবধূর প্রতি প্রেমাসক্তি।—তার পর, ঘটনার গতির সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় নারীর শুভাগমনে চিরন্তনী ত্রিভুজের সৃষ্টি। মূলতঃ, এই গ্রন্থের এই কয়টিই উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

গ্রন্থের কাহিনী আরম্ভ হ'য়েছে সুগভীর পটভূমিকায়। বিপ্লবী নায়ক সামাজিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে চলার চেষ্টায় জীবনে আঘাত পেলো এবং সংসার থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার জন্যে আদিষ্ট হলো। আর সংসার-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমাসক্তা ভ্রাতৃবধূটি (উর্মিবউ) হৃদয়ে নীরব আঘাত পোষণ করতে আরম্ভ করলো। নায়ক তখন কারখানার মজুরদের নিয়ে কর্তব্য কাজে আত্মনিমগ্ন, সেখানে এলেন ছবি (দ্বিতীয় নারী)।

দুই নারী ও এক পুরুষ এবং নেপথ্যে একটি বিরাট কারখানার অগণ্য মজুরদের রক্ত শোষণের মহোৎসব।—কারখানা ও কুলিদের প্রাধান্য দিয়ে গ্রন্থটি আরম্ভ হলো, কুলিদের প্রতি সহজ সহানুভূতিতে মন সচেতন হ'য়ে উঠলো। এ দিকে লেখকের কৃতিত্ব আছে। তিনি তাঁর নিজের চিন্তার গতি চালিত ক'রেছেন যে নির্দিষ্ট পথে, পাঠকের মন সেই পথেই চালিত হ'তে বাধ্য হ'য়েছে। সহজ কথায়, তিনি নিজের মনের চিন্তাধারা পাঠকের মনে প্রবাহিত করতে পেরেছেন। এই প্রবাহে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় নি কোথাও। কিন্তু চিন্তার গতি (অর্থাৎ কাহিনীর গতি) হঠাৎ ভিন্ন পথে চালিত হ'য়ে পড়েছে। যে রিয়ালিষ্ট আবেষ্টনীকে গ্রন্থের আরম্ভ, গ্রন্থের শেষে তার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নি, সজল রোমান্টিসিজম-এ এসে কাহিনী থেমে গেছে।

এই সঙ্গে একটি কথা বলার আছে: ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে প্রেম জিনিষটা সমাজ সমর্থন না করলেও, আমরা প্রয়োজন-বোধে তা মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু এখানে সে প্রয়োজনটি ঠিক কোথায় তা স্পষ্ট ধরা গেলো না। প্রেমিকা ভ্রাতৃবধূ না হ'য়ে যদি অন্য কোনো রমণী হতেন তা হ'লেও গল্পটির কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হ'তো ব'লে মনে হয় না।

লেখকের এটি প্রথম গ্রন্থ। দোষত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম গ্রন্থ হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের প্রশংসা করতেই হবে। নায়ক সঞ্জয় যতটা বিপ্লবী, লেখক তার চেয়ে কম বিপ্লবী নন—এ কথাও স্বীকার্য। ভাষা সহজ ও স্পষ্ট। কিন্তু স্থানে স্থানে শব্দ-চয়নে দোষ ঘটেছে। প্রুফ দেখার দোষেই হয়ত বানান ভুললক্ষ্য করা গেল অনেক।

আশা করি তাঁর বিজ্ঞাপিত আগামী গ্রন্থে তিনি এ সব দোষত্রুটি থেকে কিছুটা মুক্ত হয়ে আমাদের সম্মুখে আরো পরিপূর্ণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করবেন।

সুশীল রায়

শিল্প-সম্পদ বার্ষিকী—শ্রীকমলচন্দ্র নাগ সম্পাদিত। ১৫।১ সি নীরোদ বিহারী মল্লিক রোড, কলিকাতা। শিল্প-সম্পদ প্রকাশনীর পক্ষ হইতে শ্রীকমলচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আটআনা।

শিল্প-সম্পদ বার্ষিকী পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। বাংলা ভাষায় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-সংক্রান্ত 'ইয়ার বুকে'র একান্তই অভাব। শিল্প-সম্পদ বার্ষিকী এই অভাব পূরণের প্রচেষ্টা। ভারতের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ব্যবসায় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বিবরণ এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। ভারত তথা বাংলায় শিল্প ও ব্যবসায়ে যাঁহারা স্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা সন্নিবেশে গ্রন্থের সম্পাদনা-কৃতিত্ব পরিস্ফুট। এইরূপ একখানি পুস্তক পঞ্জিকার মতই গৃহে গৃহে স্থান পাইবার যোগ্য। আমরা কমলবাবুর এই নূতন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

আফগানিস্থান—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। ভারতী সাহিত্য সভার পক্ষ হইতে শ্রীসমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬৮। মূল্য দুই টাকা।

'আফ্গানিস্থান' বইখানি খ্যাতনামা বাঙ্গালী ভূপর্য্যটক শ্রীযুত রামনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের ভ্রাম্যমান জীবনের একটি পরিচ্ছেদ। রামনাথ বাবু বাঙ্গালীর ঘরকুণো দুর্নাম দূর করিয়াছেন। বাঙ্গালী আজ তাঁহারই কল্যাণে বাঙ্গালীর নিজের চোখে দেখা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিবরণ পড়িবার সুযোগ পাইয়াছে।

আফ্গানিস্থান ভারতবর্ষের প্রতিবেশী দেশ। কিন্তু যে-কারণেই হউক এই দেশের পরিচয়ই বোধ হয় আমরা সব চেয়ে কম রাখি। রামনাথ বাবুর আফ্গানিস্থান আমাদের এই অভাব দূর করিল। আফ্গানিস্থানের রাজনীতি, সমাজরীতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা বইখানিকে সরস ও প্রাণবন্ত করিয়াছে। তাঁহার নিরাভরণ ভাষায় এবং সহজ ও সরল বর্ণনভঙ্গীতে বইখানি চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বাংলা ভাষায় ভ্রমণ-সাহিত্যের দৈন্য রামনাথ বাবু অনেকখানি পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার আফ্গানিস্থান বাংলা ভাষায় আর একখানি উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-গ্রন্থ। তাঁহার অন্যান্য ভ্রমণ-গ্রন্থের ন্যায় আফ্গানিস্থানও যে পাঠকসাধারণের কাছে সমাদৃত হইবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

প্রতিদিনের তীরে (কবিতাগুচ্ছ)—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত। ১২, হ্যারিসান রোড, দি কালচার পাবলিশার্স হইতে শ্রীতারাপদ পাত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা।

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে দিলীপকুমার সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে আমরা দিব্য জীবনের প্রতি যে একটি গভীর অভীপ্সার সন্ধান পাই, তাহা সত্যই অপূর্ব—বাংলা সাহিত্যে এটি নূতন। কবিতাগুলির মূল সুর ভগবদভিমুখীন বলিয়া একশ্রেণীর জড়বাদী পাঠকের হয়ত ততটা চিত্তাকর্ষক নাও হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত রসবোদ্ধা সহৃদয় কাব্যরসপিপাসু পাঠকের চিত্ত যে দিলীপকুমারের কাব্যরসে মুগ্ধ, অভিভূত হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

যুগে যুগে বহু শ্রেষ্ঠ কবির কবিতাই ভগবৎ বিষয় অবলম্বনে লিখিত,—তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বও অনস্বীকার্য—তথাপি বর্ত্তমান কালের এই শ্রেণীর সমালোচকগণ মনে করেন নারীপ্রেম ও দেহবাদই শ্রেষ্ঠ কবিতার একমাত্র বিষয়বস্তু—দিব্যজীবন ও ভগবত অভীপ্সা শ্রেষ্ঠ কবিতার বিষয়বস্তু হইতে পারে না। বর্ত্তমান কালে দিলীপ-কুমারের অপূর্ব কবিতাগুলি সে কথা সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণ করিয়াছে। তাঁহার কবিতার জনপ্রিয়তাই ইহার একমাত্র প্রমাণ। বস্তুত এই জাতীয় বিচার পাঠকের নিজ নিজ অভিরুচির উপর নির্ভর করে—এবং পাঠকের রুচি "বহুধা বিভিন্না"। সুতরাং কবিতার বিষয়বস্তু নিরূপণ তাঁহারা যতটা সহজ বিবেচনা করেন, তাহা নয়।

'প্রতিদিনের তীরে' কয়েকটি সনেটধর্মী ষোড়শপদী কবিতার সমষ্টি। ভাষা ও ছন্দ অনবদ্য। কল্পনা জোরালো ও তাহাতে নূতনত্ব আছে। কবির দৃষ্টিভঙ্গীও সুন্দর এবং জীবনদর্শন সুস্থ মনের পরিচায়ক। শব্দ-সঞ্চয়ন সত্যই অপূর্ব—এবিষয়ে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁহার স্থান দিতে হয়।

প্রতিদিনের নানা স্বাভাবিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লেখা বলিয়া জড়বাদী পাঠকদেরও বইখানি ভাল লাগিবে—যদিও এ ক্ষেত্রেও কবিতাগুলির অন্তরতম মূল সূত্র ভগবদভিমুখী নিঃসন্দেহ।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'আবিষ্কার' কবিতায়—

"যখনি বঞ্চিত হই—না-পাওয়ার সে-বেদনা মাঝে
শুধু তো সান্ত্বনা নয়—পাওয়ার অতীত ছায়া-সুরে
অপরূপ নির্বেদের আকাশ-বৈরাগ্য বাঁশি বাজে
অনির্বচনীয় ছন্দে কোন্ নব বরণ-নূপুরে ?"

'তনুশ্রী' কবিতায়—

"রূপ তব ভালো লাগে, জানি—রূপ নহে মরীচিকা
আভায় তাহার যদি জ্বলে চিন্ময়ের চিরপ্রভা :
সে-আলো না পারো যদি বিলাতে—বিফল দীপালিকা,
দেবতা জাগেনি যেথা সে-তনুশ্রী নহে মনোলোভা।"

শেষ লাইনে কবির জীবন-দর্শন সংক্ষেপে সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এমনি আরও বহু চমৎকার স্তবক পাঠক বইটিতে পাইবেন। স্থানাভাবে অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

ছাপা, কাগজ উত্তম। বইখানির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

হক্‌ সাহেবের পদত্যাগ

২৮শে মার্চ্চ রবিবার রাত্রে মৌলবী ফজলুল হক সাহেব বাংলার প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করেন, ১লা এপ্রিল হইতে গবর্ণর ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে *বাংলার শাসনকার্য্য পরিচালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হক-সাহেব কেন পদত্যাগ করিলেন,* কি কারণ উপস্থিত হইয়াছিল তাঁহার পদত্যাগ করিবার? বাংলার শাসনকার্য্য পরিচালনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা সম্পর্কে গবর্ণরের ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "যেহেতু বাংলা প্রদেশের গবর্ণর উপলব্ধি করিয়াছেন যে, এমন অবস্থা উদ্ভূত হইয়াছে তাহাতে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে···ইত্যাদি। কেন এই অবস্থার উদ্ভব হইল তাহার কারণ আলোচনা করা হইয়াছে লাট-প্রাসাদ হইতে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে "৩১শে মার্চ্চ তারিখে গবর্ণর দেখিতে পান যে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর বিলোপ ঘটিয়াছে এবং ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে বাংলার বাজেটের অবশিষ্টাংশ আইন সভা কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লওয়া অসম্ভব···।" গবর্ণর মন্ত্রিমণ্ডলীর বিলোপ কেন দেখিতে পাইলেন? উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "যাহাতে অধিকতর ব্যাপক এবং স্থায়ী ভিত্তিতে মন্ত্রি-সভা পুনর্গঠন সম্ভব হইতে পারে তজ্জন্য সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে ফজলুল হক গত ২৮শে মার্চ্চ রবিবার গবর্ণরের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করেন এবং উহা গৃহীত হয়।"

সরকারী ইস্তাহার পড়িলে এই কথাই লোকের মনে হইবে, হক সাহেব স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়াছেন, এবং এই পদত্যাগের উদ্দেশ্য অধিকতর ব্যাপক এবং স্থায়ী ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব করিয়া তোলা। মনে হইবে যেন হক সাহেব পদত্যাগ না করিলে অধিকতর ব্যাপক ও স্থায়ী ভিত্তিতে মন্ত্রি-সভা গঠন সম্ভব ছিল না। কমন্স সভায় ভারত-সচিব মিঃ আমেরী উহাকে একটা নিয়মতান্ত্রিক রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অর্থাৎ হক সাহেবের পদত্যাগটা প্রাদেশিক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি অনুসারেই হইয়াছে। শ্রমিক দলের সদস্য মিঃ সোরেন্সেনের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন, "প্রাদেশিক প্রতিনিধি-মূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি অনুসারেই বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হকের পদত্যাগ ঘটিয়াছিল। তাঁহাকে *পদচ্যুত করা হয় নাই।"* তিনি আরও বলেন যে, পদ-*ত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া মিঃ ফজলুল হক বঙ্গীয়* পার্লামেণ্টে একটি বিবৃতি দিয়াছিলেন। মিঃ আমেরীর 'বঙ্গীয় পার্লামেণ্ট' কথাটা যেমনি মুখভরা তেমনি শ্রুতি-সুখকর। 'বঙ্গীয় পার্লামেণ্ট' শত বার উচ্চারণ করিয়াও যেন তৃপ্তি হয় না। সেই বঙ্গীয় পার্লামেণ্টে হক সাহেব কি বিবৃতি দিয়াছিলেন এবং তাহাতে 'প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি'র কি পরিচয় পাওয়া যায়?

'বঙ্গীয় পার্লামেণ্ট' 'প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান' এবং কার্য্য-পদ্ধতির মনোমুগ্ধকর মোহ-জাল হইতে হক সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপারটিকে মুক্ত করিলে ঘটনাটি এইরূপ দাঁড়ায়: ২৮শে মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যার সময় গবর্ণর হক সাহেবকে ডাকিয়া পাঠান। উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ দুই ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চলিয়াছিল। সর্ব্বদলীয় মন্ত্রি-সভা গঠনের জন্য গবর্ণর কতকগুলি প্রস্তাব হক সাহেবকে দেন, কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইহাতে হক সাহেবের পদত্যাগ করা উচিত বলিয়া গবর্ণর প্রস্তাব করেন। হক সাহেব এ সম্পর্কে সহযোগী মন্ত্রীদের এবং নিজের দলের সহিত পরামর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণর তাহাতে রাজী হন নাই; কাজেই তাঁহাকে পদত্যাগ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয় সেইদিন রাত্রেই। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি অনুযায়ী হক সাহেবের পদত্যাগ সম্পর্কে 'বঙ্গীয় পার্লামেণ্টে' তাঁহার নিজের প্রদত্ত বিবৃতির ইহাই সারমর্ম্ম। এই বিবৃতিতে যেটুকু অস্পষ্টতা ছিল, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের প্রশ্নে এবং উক্ত প্রশ্নের হক সাহেবের উত্তরে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল জিজ্ঞাসা করেন, "এ কথা কি

সত্য যে, আপনার সহির জন্ম পদত্যাগ-পত্রখানি টাইপ করিয়া লাট-ভবনে প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল? আর এ কথাও কি আপনাকে বলা হইয়াছিল যে, ঐ পদত্যাগ-পত্রে সহি করা এবং পদচ্যুত হওয়া—এই দুইটির মধ্যে যে কোন একটি আপনাকে বাছিয়া লইতে হইবে?" ডাঃ সান্যাল তাঁহার প্রশ্নের উত্তরের জন্য জেদ করায় হক সাহেব বলেন যে, *একখানি পদত্যাগ-পত্র টাইপ করিয়া প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল তাহা সত্য।* প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর যদিও তিনি দেন নাই তাহা হইলেও হক সাহেবের সহির জন্য একখানি পদত্যাগ-পত্র টাইপ করিয়া লাট-ভবনে প্রস্তুত রাখা হইতেই উহার উত্তর কি হইতে পারে অনুমান করা যাইতে পারে। তাহা হইলে প্রাদেশিক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি অনুযায়ী হক-সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপারের স্বরূপ কি ইহাই দাঁড়াইল না যে, পদচ্যুতি এবং পদত্যাগ এই দুইটির একটি তাঁহাকে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব হইতেই টাইপ করাইয়া রাখা একখানি পদত্যাগ-পত্রে তিনি দস্তখত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন? 'প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি'তে সহযোগী মন্ত্রীদের এবং নিজের দলের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ পর্য্যন্ত হকসাহেব পাইলেন না। বস্তুতঃ 'প্রদেশিক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি'র ইতিহাসে হক-সাহেবের পদত্যাগের ঘটনা চিরদিন উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে।

—

বাংলার প্রকৃত সমস্যা কি?

হক্-সাহেবের পদত্যাগ ব্যাপারটি কিরূপ ভাবে ঘটিয়াছিল তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু ইহার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল কেন? আমরা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের কথা শুনিয়াছি? স্যার নাজিমুদ্দিন মন্ত্রী হইলেই যদি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা হয়, তাহা হইলে গবর্ণর অনায়াসে তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিতেন। ইহার জন্য হক-সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার কি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে হক-সাহেবের বিবৃতি হইতে আমরা জানিতে পারি, এমন কতগুলি প্রস্তাব করা হইয়াছিল যাহা তিনি আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই প্রস্তাবগুলি কি তাহা অবশ্য তিনি প্রকাশ করেন নাই। কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে যাওয়া বৃথা। আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া উহাতে তিনি সম্মত হইতে পারেন নাই, হক-সাহেবের এই উক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু পদচ্যুতি এবং পদত্যাগের মধ্যে একটি বাছিয়া লওয়ার অবস্থা তখনই উপস্থিত হইতে পারে, *প্রধান মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভা ব্যবস্থা-পরিষদের আস্থাভাজন নহেন এইরূপ সন্দেহ করিবার মত* ঘটনা যখন সংঘটিত হয়। কিন্তু বাংলায় এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল কি?

মুসলিম লীগ ও ইউরোপীয় দল মিলিয়া তিনবার হক-সাহেবের শক্তি পরীক্ষা করিয়াছেন। এই তিন পরীক্ষাতেই হক-সাহেব জয়লাভ করিয়াছেন। প্রথম পরীক্ষা ব্যবস্থা-পরিষদের স্পীকার নির্ব্বাচন লইয়া। প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের মনোনীত প্রার্থী সৈয়দ নৌশের আলী নির্ব্বাচিত হওয়ায় ব্যবস্থা-পরিষদে হক-সাহেবেরই সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরীক্ষা লীগদলের আনীত নিন্দাসূচক প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে হক-সাহেব ১১৬-৮৬ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। তৃতীয় পরীক্ষা ইউরোপীয় দলের আনীত নিন্দাসূচক প্রস্তাব। এই পরীক্ষাতেও হক-সাহেবই জয়লাভ করিয়াছেন। একথা অবশ্যই ঠিক যে মাত্র ১০ ভোট বেশী পাইয়া হক-সাহেব জয়ী হইয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, হক-সাহেবের সমর্থক কয়েকজন সদস্য অনিবার্য্য কারণে অনুপস্থিত আছেন। সেকথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। তথাপি ব্যবস্থা-পরিষদে হক-সাহেবেরই যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে যিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ, তিনি কবে কোন কালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিবেন, সেই আশায় হক-সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা, সত্যই অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। কিন্তু এই বিস্ময়কর ব্যাপারই বাংলায় ঘটিল।

হক্-সাহেবের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস পাইতেছে, ইহা মনে করিবার যদিই কোন কারণ থাকে,—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এইরূপ কোন কারণ নাই—তাহা হইলে সোজাসুজি নিন্দা-

সূচক প্রস্তাবের ফলাফল দেখা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা হইল না কেন? তিন-তিন বার পরাজয়ের পর লীগ দল ও ইউরোপীয় দল কি হকসাহেবকে পরাজিত করা সম্পর্কে সত্যই নিরাশ হন নাই? এই জন্যই কি স্বয়ং গবর্ণরের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল?

বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠদল প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলের সমর্থিত হক্-মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনভিপ্রেত বলিয়া মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? ২৮শে মার্চ্চ গবর্ণরের নির্দ্দেশে হক-সাহেব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২৭শে মার্চ্চ শনিবার ইউরোপীয় দলের কর্ত্তৃপক্ষ হইতে চোরাবাজার এবং খাদ্যদ্রব্যের ফটকাবাজী ও মজুদকরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে গবর্ণমেণ্ট অসমর্থ হইয়াছেন এই অভিযোগে নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনা হইয়াছিল। লীগ দল ও ইউরোপীয় দল মিলিয়া এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। কিন্তু খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে লীগ দল ও ইউরোপীয় দলের নিজস্ব কোন নীতি আছে কি? খাদ্য-সমস্যা সমাধান সম্পর্কে হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর অসামর্থ্যের কারণ কোথায়, তাহাও কি জানা প্রয়োজন নহে? ইউরোপীয় দল কর্ত্তৃক উল্লিখিত প্রস্তাব আনয়ন করিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে বে-সামরিক খাদ্য-সরবরাহ ডিরেক্টরেট সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। হক-সাহেব এই বিতর্ক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে পরে মন্ত্রীদের সম্মতি লওয়া হইয়াছে।" মন্ত্রীদের অসামর্থ্যের কারণ কোথায় এইখানেই কি তাহার পরিচয় আমরা পাই না? খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন প্রধান মন্ত্রী হইলেই কি এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে? হক সাহেব সরলভাবে প্রকৃত অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন কি করিতেন, তাহা অনুমান করার মত কিছু আমরা পাই কি? গত ২৩শে মার্চ্চ মুসলিম লীগ দলের পক্ষ হইতে "সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্য-সমূহের দায়িত্ব গ্রহণে মন্ত্রিমণ্ডলীর অক্ষমতা"র অভিযোগ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এক নিন্দাসূচক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল। ব্যবস্থা-পরিষদের ১১৬ জন সদস্য অবশ্য এই প্রস্তাবের মহৎ উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন গদীতে বসিলে যে "সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ" করিতেন, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে ফল কি হইবে? আমাদের খাদ্যসমস্যা দূর হইবে কি?

হক-সাহেবকে কেন পদত্যাগ করিতে হইল, গবর্ণর নিজ হাতে শাসনভার কেন গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্নের প্রকৃত স্বরূপ নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে, যদি তাঁহারা সত্যই গণতান্ত্রিক অধিকারকে মূল্যবান বলিয়া মনে করেন। বাংলার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর অধিকার আজ ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। এই অধিকার শুধু তাঁহারাই তাঁহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফৎ রক্ষা করিতে পারেন।

—

বাংলায় ৯৩ ধারা

বাংলা দেশ গবর্ণরের প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৩১শে মার্চ্চ তারিখে গবর্ণর দেখিতে পান যে তাঁহার মন্ত্রিমণ্ডলীর বিলোপ হইয়াছে এবং ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে বাংলার বাজেটের অবশিষ্টাংশ আইন সভা কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লওয়া অসম্ভব…। কিন্তু মন্ত্রিসভার বিলোপ কেন হইল? মন্ত্রিসভার এই বিলোপ কি একটা সৃষ্ট ঘটনা নয়? ভারতের আর কোন প্রদেশে এই ভাবে ৯৩ ধারার প্রয়োগ হইয়াছে কি?

গবর্ণরের নির্দ্দেশে হক-সাহেব যদি পদত্যাগ করিতে বাধ্য না হইতেন তাহা হইলে ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে বাজেটের অবশিষ্টাংশ আইনসভা কর্ত্তৃক মঞ্জুর করাইয়া লওয়া সম্ভব হইত। আইনসভায় হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অভাব ছিল না,—বাজেট নির্ব্বিঘ্নে পাশ হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা হইতে পারিল না কেন? হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর বিলোপ একটা সৃষ্ট ঘটনা এবং সৃষ্ট ঘটনা হইতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাই বাংলায় ৯৩ ধারা প্রয়োগের কারণ হইল। ৯৩ ধারার এবম্বিধ

প্রয়োগের কল্পনা ভারত-শাসন আইন রচনার সময় পার্লামেণ্ট করিয়াছিলেন কি? বস্তুতঃ বাংলায় যে-ভাবে ৯৩ ধারায় প্রয়োগ হইল ভারতের আর কোন প্রদেশে সেরূপ ভাবে ৯৩ ধারার প্রয়োগ কখনও হয় নাই। আসামে সাদুল্লা-মন্ত্রিসভা যখন পদত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা সাহসী হন নাই বলিয়াই পদত্যাগ করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীযুত রোহিণীকুমার চৌধুরী মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিতেন, কিন্তু স্যার মহম্মদ সাদুল্লাকে পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সুযোগ দিবার জন্য আসামে অনেক দিন পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হক-মন্ত্রিমণ্ডলীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল এবং হক সাহেব যেদিন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন তাহার পূর্ব্ব দিন তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি হক সাহেব এই মুহূর্ত্তে আবার মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া তাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সমর্থ।

সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "গবর্ণরকে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল।" কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হওয়ার উপযোগী অবস্থা কি আগেই সৃষ্ট করা হয় নাই? সরকারী ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, যথাসম্ভব শীঘ্র যথারীতি গঠিত মন্ত্রি-সভার নিয়োগ দ্বারা জরুরী শাসন-ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে গবর্ণরের ইহাই একান্ত অভিলাষ। যাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠাতা আছে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা সহজ, কিন্তু যাঁহার সংখ্যাগরিষ্ঠাতা নাই তাঁহার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের কোন সোজা পথ নাই।

—

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রি-সভা

এক সংবাদে প্রকাশ, গবর্ণর খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনকে মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবিত উপায়গুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু কি ফল হইয়াছে তাহা প্রকাশ নাই। মুসলিম লীগ পরিষদ-দলের সাধারণ সম্পাদক খান্ বাহাদুর মহম্মদ আলী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে, লীগ দল বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের ১৩০ জন সদস্যের সমর্থন লাভ করিয়াছেন—অবশ্য ইউরোপীয় দল লইয়া। তথাপি ইহা এক ভৌতিক ব্যাপারের মত বলিয়াই মনে হইতেছে। লীগদল যদি ১৩০ জন সদস্যের সমর্থন পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে মন্ত্রিসভা গঠনে খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন অযথা বিলম্ব করিতেছেন কেন?

হক-সাহেবের বিবৃতিতে আমরা সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভার কথা শুনিয়াছি। সরকারী ইস্তাহারেও সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভার কথা আছে। কিন্তু খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন কিরূপ সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন? লীগদল সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্য বিখ্যাত, তাঁহারা মুসলমান-দিগকে একটা পৃথক্ রাষ্ট্রজাতি (nation) বলিয়া মনে করেন। স্যার নাজিম এ পর্য্যন্ত স্বদেশী মনোবৃত্তির কোন পরিচয় দেন নাই। হক-মন্ত্রিমণ্ডলী সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যসমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অসমর্থ বলিয়া লীগদলের পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। হক-মন্ত্রিমণ্ডলীই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ভিত্তিতে গঠিত মন্ত্রিমণ্ডলী। উহা অপেক্ষাও ব্যাপক ভিত্তিতে স্যার নাজিম কিরূপ মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন? কি মূল নীতির ভিত্তিতে উহা গঠিত হইবে?

হক-সাহেব সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের তিনটি মূল নীতির কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট দূর করিয়া জনগণের মঙ্গল ও নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ মূল নীতি প্রদেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও বে-সামরিক জনরক্ষার সন্তোষজনক সমাধান। তৃতীয়তঃ, বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থাতেও জনগণ যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নাগরিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই তিনটি মূল নীতি ছাড়াও আমাদের দেশে আর একটি সমস্যা আছে—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন। ইহার গুরুত্বের কথা অধিক বলাই এখানে নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে চারিটি মূল-নীতির ভিত্তিতে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে।

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনে এই চারিটি মূল নীতি সম্পর্কে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কারণ সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের অর্থ হইল ব্যবস্থা-পরিষদে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধী দল থাকিবে না। এইজন্যই একমাত্র জনসাধারণের অধিকার রক্ষার ভিত্তিতেই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে।

খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভার সন্ধান করিতেছেন বটে, কিন্তু কোন মূল নীতি এপর্য্যন্ত ঘোষণা করিয়াছেন? তিনি বর্ণহিন্দুদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতেছেন, হক সাহেবের দল ভাঙাইয়া সদস্য নিতে সচেষ্ট আছেন। কিন্তু কোন সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। এই অবস্থায় কোন ব্যক্তির দ্বারা যে অচল অবস্থার সমাধান হইতে পারে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু তাহা করিতে হইলে হক-সাহেবকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য পুনরায় আহ্বান করিতে হয়।

—

ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্বেতপত্র

ভারত গবর্ণমেণ্ট বিলাতে একখানি শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্বেতপত্রে ভারতের গোলযোগ সম্বন্ধে কংগ্রেসের দায়িত্ব বিবৃত করা হইয়াছে। পঞ্চাশ হাজার শব্দে ইহা রচিত হইলেও আসলে উহা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি।

শ্বেতপত্রে ১৯৪২ সনের ৯ই এপ্রিল হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সমুদয় ঘটনার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, ঐ সময়ের মধ্যে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ এবং সমগ্রভাবে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান এক ব্যাপক গণ-আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ৯ই এপ্রিল হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রকাশ্যে বৃটেনকে ভারত হইতে অপসৃত হইবার দাবী জানান। ৭ই আগষ্ট বোম্বাইয়ে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হয়। মহাত্মা গান্ধী বৃটেনকে ভারত হইতে চলিয়া যাইবার দাবী করিয়াছিলেন এবং এই দাবীর কি অর্থ তাহাও তিনি একাধিকবার সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন। বৃটেনের হস্তক্ষেপ ছাড়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের সুযোগ দেওয়াই তাঁহার এই দাবীর অর্থ। এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী যখন যাহা বলিয়াছেন সমস্তই পরস্পরসংশ্লিষ্ট একটি অখণ্ড উক্তি। একটিকে বাদ দিয়া অপরটির অর্থ করা যায় না। কংগ্রেস যে গণ-আন্দোলনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল তাহা অভিযোগের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু উহা সপ্রমাণ করা প্রয়োজন। এই অভিযোগ প্রমাণিত হইতে পারে ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য কংগ্রেস কি কি কাজ করিয়াছিল তাহারই দ্বারা এবং গোলযোগের সহিত ঐসকল কার্য্যের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কংগ্রেস যদি গণবিক্ষোভের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছিল, তাহা হইলে গোড়া হইতেই উহার প্রতিবিধানের চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট করেন নাই কেন?

অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের দাবী। শ্বেতপত্রে বলা হইয়াছে, এই অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এমন সব লোকের দ্বারা গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল যাহারা প্রথম হইতেই পরাজয়ের মনোবৃত্তিসম্পন্ন। ইহাদের নেতা জাপানের সহিত একটা কথাবার্ত্তা চালাইতে প্রথম হইতেই উৎসুক। কাহাদের দ্বারা অস্থায়ী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা ভারত-গবর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছেন? কংগ্রেসীদের লইয়া কি? তাঁহারা কি পরাজয়ের মনোবৃত্তিসম্পন্ন? তাঁহাদের নেতা কি জাপানের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে উৎসুক? প্রথমতঃ কংগ্রেস নিজের জন্য কিছুই চায় নাই। সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হউক, ইহাই ছিল কংগ্রেসের ইচ্ছা। কংগ্রেস নিজের জন্যই ক্ষমতা চাহিয়াছিল, শ্বেতপত্রে তাহার কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নাই। উহা ভারত-গবর্ণমেণ্টের এমন একটা অভিমত যাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। কংগ্রেস পরাজয়মূলক মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ গবর্ণমেণ্ট শ্বেতপত্রে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। কংগ্রেসের নেতা জাপানের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক তাহার প্রমাণ কোথায়? ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ফিল্ড মার্শাল স্মাটের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "মহাত্মা গান্ধীকে জাপ অনুরাগী বলা শুধু একটা আড়ম্বরপূর্ণ কপটতা মাত্র।" কংগ্রেস বৃটেনের বিপদের সুযোগ লইতে চাহিয়াছিল, তাহারও

কোন প্রমাণ ভারত-গবর্ণমেন্ট দিতে পারেন নাই। পণ্ডিত কুঞ্জরু ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে পাল্টা অভিযোগ করিয়াছেন যে, সামরিক পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বৃটেনই ক্ষমতা হস্তান্তর না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

—

নেতৃ-সম্মেলনের ব্যর্থচেষ্টা

বোম্বাই নেতৃসম্মেলনের প্রতিনিধি দলের স্মারক লিপির উত্তরে বড়লাট এক সুদীর্ঘ জবাব দিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জবাবের সারমর্ম এই যে, প্রতিনিধিদিগকে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ দিতে তিনি অসম্মত। বোম্বাই নেতৃসম্মেলনকে বিশ্লেষণ করিয়া বড়লাট দেখাইয়াছেন যে, বিরাট মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কার্য্যতঃ কেহই উক্ত নেতৃসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। তপশীলভুক্ত জাতি ও ভারতীয় নৃপতিদের পক্ষেও কেহ ছিলেন না। তার পর মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভাও বোম্বাই নেতৃসম্মেলনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। বড়লাটের এই দৃষ্টিকেন্দ্র হইতে বোম্বাই সম্মেলনের অবস্থা কি দাঁড়াইল তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

বড়লাটের পত্রে ভারতের গোলযোগ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি বলিয়া নূতন করিয়া এখানে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। স্মারক লিপিতে কংগ্রেসের হিংসাত্মক আন্দোলনের নিন্দা করা হয় নাই বলিয়া বড়লাট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই হিংসাত্মক কার্য্যাবলীকে যে ভারতবাসী সমর্থন করে না, বড়লাট তাহা অবশ্যই জানেন এবং তিনি ইহাও নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারতবাসী ইহার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী বলিয়া মনে করে না। হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর নিন্দা করা এক জিনিষ আর উহাকে কংগ্রেসের কার্য্যাবলী বলিয়া নিন্দা করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার এবং তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। এ সম্পর্কে শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী বলিয়াছেন, "যদি এইরূপ আশা করা যায় যে, অশান্তির ব্যাপারে কংগ্রেসের দায়িত্ব সম্পর্কে কেবল গবর্ণমেন্টের নজিরে এক পক্ষের বিচার মানিয়া লইব, তাহা হইলে উহাকে একান্ত অন্যায় দাবী বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

মুসলিম লীগের বোম্বাই সম্মেলনে যোগদান করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? বোম্বাইয়ের নেতৃসম্মেলন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসা করিবার উপায় সন্ধানের চেষ্টা মাত্র। ভারতীয় নৃপতি-বৃন্দেরও বোম্বাই-সম্মেলনে যোগদান করিবার কোন কারণ নাই। ভারতের দাবী পূরণ না করিবার পক্ষে যুক্তি হিসাবে মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, দেশীয় রাজন্যবর্গের উল্লেখ নূতন নয়। কিন্তু বোম্বাই-নেতৃসম্মেলন তো কংগ্রেসের সমর্থনে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চান না! তবে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া যে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে না, তাহা লীগ ও মহাসভা উভয়েই স্বীকার করেন। কংগ্রেসকে বাদ দিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে অন্যান্য সকল দল মিলিয়াও পারে না বলিয়াই অচল অবস্থার সমাধান হইতেছে না। কাজেই মীমাংসার চেষ্টা কংগ্রেসের সহিত আলোচনা হইতেই আরম্ভ করা প্রয়োজন। এই জন্যই মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। এই আলোচনা হইলেই ভারতের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন হইয়া উঠিবে, এইরূপ মনে করিবারও কোন কারণ নাই। 'ইয়র্কশায়ার অবজারভার' পত্রিকাও এইরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত-সচিব মিঃ আমেরী বোম্বাই-নেতৃসম্মেলনের প্রচেষ্টাকে শুভ প্রচেষ্টা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। নেতৃবৃন্দ মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইলেন না। এই অবস্থায় তাঁহাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করার কোন অর্থ আছে কি? ভারতবাসীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে বলা হইবে, ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টার প্রশংসাও করা হইবে, কিন্তু এই প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী করিবার জন্য যে সুযোগ দরকার তাহা দেওয়া হইবে না।

—

বাংলার চাউল-সমস্যা

গত ৯ই এপ্রিল বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের রিজিওন্যাল কমিশনার বিচারপতি ব্রাও বাংলার চাউল সমস্যা সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, আমাদের চাউলের অভাব মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে ২৭৫ লক্ষ

টন চাউল উৎপন্ন হইত এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আসিত ১৫ লক্ষ টন। সুতরাং ব্রহ্মদেশের চাউল আসা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের চাউলের অভাব শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী হইতে পারে না। কথাটা খুবই সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু চাউলের অভাব শতকরা পাঁচ ভাগের বেশী না হইলেও দাম বাড়িয়াছে পাঁচগুণের বেশী। বিচারপতি ব্রাণ্ড চাউলের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কারণটি সম্পর্কে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, অধিকাংশ চাষীকেই বৎসরে সাত-আট মাস চাউল কিনিয়া খাইতে তাহাদের আর্থিক অবস্থাও যার পর নাই খারাপ। কাজেই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক সময় অপেক্ষা বেশী পরিমাণ শস্য ধরিয়া রাখিতে বা কিনিতে চাওয়া স্বীকার করা অসম্ভব। তাঁহার দ্বিতীয় কারণটি আতঙ্ক ও বুদ্ধিবিভ্রম। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার বিপরীতটাই কি সত্য নয়? বস্তুতঃ চাউলের দাম বৃদ্ধির ফলেই আতঙ্ক ও বুদ্ধিভ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে। তবে তাঁহার তৃতীয় কারণটি যে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। অত্যধিক লাভ করিবার আশায় কতক লোক যে গোপনে চাউল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে এবং রাখিতেছে, গবর্ণমেণ্টও গত ডিসেম্বর মাসে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত দিনেও অতিলোভীরা ধরা পড়িল না, তাহাদের গোপন সঞ্চয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বিচারপতি ব্রাণ্ড ভরসা দিয়াছেন, ধান, চাউল, গম আসিয়া পৌঁছিতেছে এবং আরও পৌঁছিবে এবং দাম স্বাভাবিক দামের হার বা উহার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিবে। গত ২৩শে মার্চ্চ তারিখেও তৎকালীন বে-সামরিক সরবরাহ সচিব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আশ্বাস দিয়াছিলেন, অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করা হইতেছে এবং আট-দশ দিনের মধ্যে তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখা যাইবে। এই আট-দশ দিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল—হক সাহেব পদত্যাগ করিলেন, বাংলায় মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব আর রহিল না, গবর্ণর নিজ হস্তে প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু চাউলের বাজারের কোন পরিবর্ত্তন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তার পর ৬ই এপ্রিল বাংলার বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার এক প্রেস-নোট জারী করিয়া জানাইলেন, কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী হইতেছে এবং আরও হইতে থাকিবে বলিয়া ধান-চাউল চালানসম্পর্কে গত জানুয়ারী মাসে যে-আদেশ জারী করা হইয়াছিল তাহা শিথিল করা হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতায় অধিক পরিমাণে চাউল আমদানী হওয়া সত্ত্বেও চাউলের বাজার একটুও নরম দেখা গেল না। তারপর বিচারপতি ব্রাণ্ডের এই আশ্বাস। চাউল গম আমদানী সম্পর্কে সংবাদপত্রে কয়েকখানি ছবিও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু চাউলের বাজারের অবস্থা দেখিয়া লোকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, এই যে চাউল আসিতেছে তাহা কোথায় গা-ঢাকা দিতেছে? উহা কি অতিলোভীদের গোপন সঞ্চয়কেই স্ফীততর করিতেছে? চাউলের দাম কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না কেন?

—

কণ্ট্রোলের চাউল

কণ্ট্রোলের দোকানগুলির সংখ্যা প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম। বহু কষ্টে চাউল পাওয়া যায়, এত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয় যে, পেটের জ্বালায় যাহাদের খাটিয়া খাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে অতখানি সময় করিয়া উঠাই কঠিন। অনেক সময় শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া শেষে খালি হাতেই ফিরিতে হয়। অনেক সময় আবার ওজন ঠিক হয় না বলিয়াও অভিযোগ শো... যায়। এই রকমও শোনা যায় যে, কতকগুলি ক্ষুদে দালাল কিঞ্চিৎ লাভের জন্য নিয়মিত ভাবে কণ্ট্রোলের দোকানে ভীড় জমাইয়া চাউল কিনে। সেই চাউল আবার দোকানে যাইয়া অত্যধিক উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। এই অভিযোগ সত্য হইলে কণ্ট্রোলের দোকান উপলক্ষে চোরাবাজারের একটা ব্যবসা চালান হইতেছে। এই বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা একান্তই প্রয়োজন।

হাওড়ার একজন কণ্ট্রোলের চাউল-বিক্রেতা কুলীর মাথায় এক ছালা কণ্ট্রোলের চাউল চাপাইয়া বাড়ী যাইবার সময় ধরা পড়িয়াছে। ধরা পড়ে নাই এমন

সৌভাগ্যবানদের অস্তিত্বটা কি নিছক কাল্পনিক? কর্ত্তৃপক্ষ এ দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন কি?

—

অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন

গত বৎসরের ন্যায় এবারও ভারত গবর্ণমেণ্ট অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য আন্দোলন চালাইতেছেন। এই আন্দোলনের ফলে গত বৎসর ৮০ লক্ষ একর বেশী জমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ হইয়াছিল। এবার আরও ২০ লক্ষ একর বেশী জমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় ৮০ লক্ষ বা ১ কোটি একর বেশী জমিতে খাদ্যশস্যের আবাদ হওয়া বিশেষ কিছু না হইলেও যদি অনাবাদী পতিত জমি আবাদ দ্বারা এই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতের মোট আবাদী জমি বাড়িয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইয়া থাকিলে অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদনের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি শুধু অর্থকরী ফসলের আবাদ হ্রাস পাইয়া খাদ্যশস্যের আবাদ বাড়িয়া থাকে, তাহা হইলে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন সাফল্য লাভ করিয়াছে, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

—

বাংলার জমিদারী প্রথা

ভূমি-রাজস্ব কমিশনের সুপারিস অনুসারে হকমন্ত্রিমণ্ডলী বাংলার প্রকৃত চাষীদিগকে প্রত্যক্ষভাবে গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫ই মার্চ্চ রাজস্বসচিব শ্রীযুত প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া জানান যে, প্রথম দফায় কোর্ফা প্রজার উপরিস্থ সমস্ত শ্রেণীর খাজানা আদায়ীস্বত্ব বা স্বার্থ গবর্ণমেণ্ট দখল করিবেন, যতদূর সম্ভব সত্বর এ সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা হইবে এবং প্রথমতঃ একটি জেলায় পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ আরম্ভ করা হইবে। জমিদারী-প্রথা বিলোপের জন্য দশ হইতে পনের গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়।

ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশ ১৯৪০ সনে দাখিল করা হইলেও হক-নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলী এ সম্পর্কে কেবল কালক্ষয় করিবার নীতিই গ্রহণ করিয়া চলিতেছিলেন। হক-মন্ত্রিমণ্ডলী পনর মাস কার্য্যকালের পরেই জমিদারী প্রথা বিলোপের সুপারিশ গ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বর্ত্তমানে হকমন্ত্রিমণ্ডলীর অস্তিত্ব আর নাই। কাজেই ভূমিরাজস্ব কমিশনের সুপারিশগুলির ভাগ্যে অতঃপর কি ঘটিবে, তাহা কিছুই অনুমান করিবার উপায় নাই।

—

নিয়মতান্ত্রিক শাসন ও প্রাদেশিক স্বরাজ

"সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যসমূহের দায়িত্ব গ্রহণে মন্ত্রিসভার অক্ষমতার" অভিযোগে লীগদলের পক্ষ হইতে হকমন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যখন নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, তখন ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ ডেভিড হেণ্ড্রী এই প্রস্তাব আনয়ন করার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার মতে ব্যবস্থা-পরিষদে সরকারী কর্ম্মচারীদের সমালোচনার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে রক্ষা করার কর্ত্তব্য হইতে মন্ত্রিগণ বিচ্যুত হওয়ায় নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের মূলদেশেই আঘাত করা হইয়াছে। মিঃ হেণ্ড্রী এখানে নকলকেই আসল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনে মন্ত্রীদের নীতি ও নির্দ্দেশই সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রতিপালন করিতে বাধ্য। সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্য আসলে মন্ত্রীদেরই কার্য্য। কাজেই সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্য মন্ত্রিগণ সমর্থন না করিয়া পারেন না। কিন্তু ভারত-শাসন আইনে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কতকগুলি বিষয়ে গবর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ চাহিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। আবার কতকগুলি বিষয় গবর্ণরের বিবেচনাধীন। এই সকল বিষয়ে গবর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ না চাহিতেও পারেন। তার পর ভারত-শাসন আইনের ১২৬ ক ধারা অনুসারে প্রদেশের সরকারী কর্ম্মচারীরা বড়লাটের আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারিগণ সম্রাটের কর্ম্মচারী এবং বড়লাট ও প্রাদেশিক গবর্ণরদের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁহারা ব্যবস্থা-

পরিষদের নিকট দায়ী নহেন, কিন্তু মন্ত্রীরা ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল। ইহাই ভারতের প্রাদেশিক স্বরাজ—নিয়মতান্ত্রিক শাসন।

বিলাতের নিয়মতান্ত্রিক শাসনের সঙ্গে ভারতে প্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনের পার্থক্য দেখাইয়া রায় শ্রীযুত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বলিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডে সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রধান কর্ত্তব্য মন্ত্রীদের রক্ষা করা। ভারতে উহার অবস্থা বিপরীত। এখানে এইরূপ আশা করা হয় যে, মন্ত্রীরা স্থায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের সব কাজে সায় দিয়া যাইবেন, তাঁহাদের অন্যায় কার্য্যের উপর চুণকাম করিবেন এবং তাঁহারা যেখানে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইবেন সেখানে তাঁহাদের প্রশংসা করিবেন।" ইহাই যদি অবস্থা হয় তবে তাহাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসন বলা যায় কি?

ভারতের প্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনে মন্ত্রীদের নির্দ্দেশের ভাগ্যে কি ঘটে তাহা হক সাহেব ব্যবস্থা-পরিষদে জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে সমস্ত আদেশ দিয়াছেন মধ্যপথে কোন-না-কোন উপায়ে ঐ সকল আদেশ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, হয়ত কোন ডানাওয়ালা দূত কর্ত্তৃক এইরূপ হইয়াছে এবং আদেশগুলি আর ভূমিস্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, এমন কতকগুলি কার্য্য হইয়াছে যাহা তিনি সমর্থন করিতে পারেন না এবং এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রী সহ্য করিতে এবং ন্যায়ত সমর্থন করিতে পারেন না। ইহাই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে ইহাকেই কি মিঃ হেণ্ড্রী নিয়মতান্ত্রিক শাসন বলিবেন? তাহা হইলে জনমতটা কি তাঁহার মতে নিয়মতান্ত্রিক শাসনের বাধা-স্বরূপ? দেখা যাইতেছে, লীগদল ও ইউরোপীয় দলের মতে জনমতটাই ভারতের প্রাদেশিক নিয়মতান্ত্রিক শাসনের মস্ত বড় ত্রুটি।

—

বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা

গত ২১শে মার্চ্চ এক বেতার বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা রক্ষার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন, আগামী বৎসর কিম্বা তাহার পরের বৎসর কোন একদিন হিটলার পরাজিত হইবেন। জাপানকে পরাজিত করিবার কাজ সুরু হইবে হিটলারের পরাজয়ের পরে। হিটলারের পরাজয়কেই তিনি যুদ্ধের চূড়ান্ত অবস্থা বলিয়া মনে করেন এবং ঐ সময়ই আসিবে তাঁহার মতে ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী ঘোষণা করিবার দিন। এই কর্ম্মসূচীটা কি রকমের হইবে, বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাষ দিয়াছেন এবং বৃটেনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে চতুর্ব্বার্ষিকী পরিকল্পনায় একটা কাঠামোও প্রদান করিয়াছেন।

বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দুইটি পরিষদ গঠিত হইবে,—একটি ইউরোপীয় পরিষদ, আর একটি এসিয়া পরিষদ। হিটলারের পরাজয়ের পরেই ইউরোপীয় পরিষদ গঠিত হইবে এবং বৃটিশ কমনওয়েলথ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সম্মিলিত জাতিবর্গ ভাবী পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিবেন। ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলি এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্রের মুরুব্বিয়ানার তাঁবে বিভিন্ন রাষ্ট্রসংহতি বা কন্‌ফেডারেশন গঠন করিয়া নিজেদের প্রতিনিধির মারফৎ নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিবেন। এই কাজ যখন আরম্ভ হইয়া যাইবে এসিয়ায় তখনও জাপানের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকিবে। জাপানের পরাজয়ের পর হইবে এসিয়া পরিষদ গঠিত। কিন্তু কাহাদিগকে লইয়া এই পরিষদ গঠিত হইবে তাহা কিছুই বলা হয় নাই।

বিশ্বশান্তি রক্ষার এই যে কর্ম্মপদ্ধতি উহা দ্বারা কি কাজ করা হইবে—কর্ম্মপদ্ধতির বিষয় বস্তু কি হইবে? মিঃ চার্চ্চিল দুইটি মাত্র বিষয়বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন। একটি কার্য্য হইল অপরাধী রাষ্ট্রগুলিকে কার্য্যকরী ভাবে নিরস্ত্র রাখা এবং ঐ সকল রাষ্ট্রের অপরাধী নেতাদের এবং তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের বিচারের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয় কার্য্যটি হইল ইউরোপীয় পরিষদকে সংহত করিবার জন্য একটি উচ্চ আদালতের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক অথবা উভয়বিধ সৈন্যদল গঠন। মিঃ চার্চ্চিল মনে করেন, ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে গেলেই খুটিনাটির মধ্যে যাওয়া হইল এবং এখন তাহাতে যাওয়া সঙ্গত নয়। এসিয়া সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল শুধু জাপানকে

পরাজিত করিয়া বৃটেন এবং হল্যাণ্ডের হৃত রাজ্য উদ্ধারের কথা বলিয়াছেন। ভারতবর্ষের কথা তাঁহার বিশ্বশান্তি নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে স্থান পায় নাই। বৃটিশ উপনিবেশগুলির দায়িত্ব যখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরই, তখন এ সকল বিষয়ে কিছু বলা হয়ত তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া থাকিবেন। এসিয়া পরিষদ ইউরোপীয় পরিষদের তাঁবেদার পরিষদ হইবে কি না তাহাই বা কে জানে ?

হিটলারের পরাজয়ের পর বৃটিশ রপ্তানী বাণিজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হওয়ার যথেষ্ট সুযোগের কথা মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ করিয়া ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের উপরেই একান্ত ভাবে নির্ভর করে। যুদ্ধের পরেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে অক্ষুন্ন থাকিবে তাঁহার বেতার বক্তৃতায় তাহা বুঝিতে পার যায়। ধনতন্ত্র থাকিলেই সাম্রাজ্যবাদ থাকিবে। তাহা হইলে বিশ্বশান্তির নিরাপত্তা কি আসলে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তা রক্ষারই ব্যবস্থা ?

—

যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ এন্থনী ইডেন আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কমন্স সভায় জানাইয়াছেন, মোটামুটি সব বিষয়েই আমেরিকার সহিত বৃটেনের মতৈক্য হইয়াছে। যে-সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে সেগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে : প্রথম, যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কিত সমস্যাদি, দ্বিতীয়, সামরিক কার্য্যাবলী সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা, তৃতীয়, ভবিষ্যৎ নীতি। সামরিক জয়কে স্থায়ী শান্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে যুদ্ধোত্তর নীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ ইডেন ফ্রান্স ও শত্রুর অধিকৃত দেশগুলির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বৃটেনের অধীন দেশগুলি সম্পর্কে কোন আলোচনা ও মতৈক্য হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই।

বৃটেন ও আমেরিকার পরস্পর সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ ইডেন বলিয়াছেন, "প্রতি বিশ বৎসর অন্তর পৃথিবীব্যাপী শোচনীয় সজ্ঘাত বন্ধ করিবার এবং জগতের শান্তি রক্ষায় উভয় দেশে যে তুল্য স্বার্থ বর্ত্তমান, তাহারই উপর এই সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন।" এই তুল্য স্বার্থ কি তাহা তিনি কিছু বলেন নাই। ইহা কি বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজিপতিদের শিল্প ও বাণিজ্য স্বার্থ, না সমগ্র পৃথিবীর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ? যদি প্রথমোক্তটিই হয় তাহা হইলে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ অংশীদায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু উহাতেই কি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ব্যবস্থা সার্থক হইবে ? বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধন বক্তৃতায় শ্রীযুত নলিনী-রঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, "ভারত ও চীনের নিম্নতম জীবন-যাত্রার সুযোগ লইয়া উন্নততর দেশসমূহের জনগণের উচ্চতম জীবনযাত্রা-প্রণালী বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে।" বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সকল কথা আমরা এপর্য্যন্ত শুনিয়াছি তাহা এতই অস্পষ্ট যে পরাধীন ও অনুন্নত দেশগুলি ভরসার কিছুই পাইতেছে না। পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যের সহিত মুদ্রানীতির সম্পর্ক ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যুদ্ধোত্তর বিশ্বমুদ্রানীতি সম্পর্ক বৃটেনের একটি পরিকল্পনা আছে। উহাকে ব্যাঙ্কর পরিকল্পনা নামে অভিহিত করা যায়। বিখ্যাত বৃটিশ অর্থনীতিবিদ্‌ লর্ড কীনস্‌ এই পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় মুদ্রামানের নাম 'ব্যাঙ্কর'। মার্কিন পরিকল্পনার মুদ্রামানের নাম 'ইউনিটাস'। বৃটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ ইউনিটাস পরি-কল্পনার বিরোধীতা করিতেছে, কারণ এই পরিকল্পনায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ফাইনান্‌সিয়াল নিউজ মন্তব্য করিয়াছেন, "বিশ্বের বিনিময় ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব থাকিবে ইহা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার।" কিন্তু বৃটিশ পরিকল্পনা ও মার্কিন পরিকল্পনা উভয়ই ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মার্কিন পরিকল্পনার 'ইউনিটাস' যে কোন সময় সোনায় পরিবর্ত্তিত করা যাইবে। কিন্তু বৃটিশ পরিকল্পনার 'ব্যাঙ্কর' স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও আন্তর্জ্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউসের সম্মতি ছাড়া স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা যাইবে না। পার্থক্যটা অতি সামান্যই মনে হইতে পারে, কিন্তু

ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার দিক হইতে দেখিলে সহজেই উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ভারতের মুদ্রা ষ্টার্লিং-এর সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিদেশে ভারতের তহবিলে যে অর্থ সঞ্চিত হইবে, তাহা সমস্তই 'ব্যাঙ্করে' পরিবর্ত্তিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব যে ষ্টার্লিং অঞ্চল ও ডলার অঞ্চলের কথা বলিয়াছেন, তাহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে। বঙ্গীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে সভাপতি মিঃ জি, এল, মেটা তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "ভারতের মুদ্রা ষ্টার্লিং-এর সহিত বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, ষ্টার্লিং চুক্তি আমাদের প্রতিও বাধ্যতামূলক হইয়া দাঁড়াইবে।" বৃটিশ পরিকল্পনায় পাওনাদার দেশ দেনদার দেশের নিকট তাহার পাওনাগণ্ডা সোনায় পরিশোধ করিবার দাবী করিতে পারিবে না। ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক ক্লিয়ারিং হাউসে প্রাধান্য থাকিবে বৃটেন ও মার্কিনের। ফলে যুদ্ধের পরেও যদি ভারতের ষ্টার্লিং সোনায় মিটাইয়া না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ভারতই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বৃটিশ পরিকল্পনায় অনুন্নত দেশগুলিতে শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটা খুবই ভাল সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদেশী মূলধন দেশী মূলধনে গঠিত শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে যে কিরূপ ক্ষতিকর, সে সম্বন্ধে ভারত-বাসীর কাছে নূতন করিয়া কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যদি পরাধীন ও অনুন্নত দেশগুলির অনুন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া বৃটিশ ও মার্কিন ধনতন্ত্রের পরিপুষ্টি সাধন করাই হয়, তাহা হইলে মিঃ জি, এল, মেটার কথায় বলা যাইতে পারে, "এই সকল যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার জালে যদি আমরা জড়াইয়া পড়ি, তাহা হইলে আমাদের উপর ইঙ্গ-আমেরিকান প্রভুত্ব কায়েম হইয়া দাঁড়াইতে পারে।"

অর্থনৈতিক প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য রক্ষা ও বিস্তার করিবার প্রয়োজন হয়। পরাধীন দেশগুলি যদি রাষ্ট্রনৈতিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার না পায়, তাহা হইলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন অধিকার পাইবে না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্বন্ধে যে-সমস্ত আলোচনা এ পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহা কি শুধু পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার ব্যবস্থাই নহে? মিঃ ইডেন বৃটেন ও আমেরিকার মতৈক্যের কথাই শুধু বলিয়াছেন, কিন্তু রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য সম্মিলিত জাতি-বর্গের সহিত বৃটেন ও আমেরিকা একমত হইয়াছেন কি? 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কী লিখিয়াছেন, "যুদ্ধ চলিবার সময়ই যদি যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, চীন ও অন্যান্য সম্মিলিত জাতি নিজেদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মূলতঃ একমত না হয়, তাহা হইলে আটলাণ্টিক সনদ মিঃ উড্রু উইলসনের চতুর্দ্দশ দফার মতই আমাদিগকে বিদ্রূপ করিবে।" কিন্তু যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটেন ও আমেরিকা এই দিক দিয়া চিন্তা করিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছে না।

পরলোকে বেগম আজাদ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পত্নী বেগম আজাদ ৯ই এপ্রিল সকাল ছয় ঘটিকার সময় ইহলোক হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। দুই বৎসর যাবৎ তিনি যক্ষারোগে ভুগিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার উদরাময় দেখা দেয়। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে চিকিৎসকের বুলিটিনে বলা হইয়াছিল যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু অবধারিত। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মৌলানা আজাদ পত্নীর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। পত্নীকে দেখিবার জন্য মৌলানা আজাদকে ...গ-সুবিধা দিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণের ক্ষণে বেগম আজাদ স্বামীকে দেখিতে না পাওয়ায় অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অসীম দুঃখ লইয়াই ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই দুঃখ সমস্ত দেশবাসীকে আরও অধিকতর ব্যথা-কাতর করিয়াছে।

প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদের শেষ মুহূর্ত্তে তাহাকে দেখিতে না পাওয়ার যে বেদনা ভাষায় তাহা প্রকাশ করা যায় না। মৌলানা আজাদের এই দুঃখ রাখিবার স্থান নাই। দেশের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি সমস্ত দেশসেবকের অগ্রগামী হইয়াছেন। সমগ্র দেশ তাঁহার এই গভীরতম

শোকের অংশ গ্রহণ করিতেছে। ভগবান তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

—

পরলোকে শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি

মাদ্রাজের অন্যতম কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি গত ২৮শে মার্চ্চ মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বাধীনতার বীর সৈনিকের এই অকাল মৃত্যুতে সমগ্র ভারতবাসী গভীর ব্যথা অনুভব করিতেছে। অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের সহিত তিনিও ভারত রক্ষা আইনে ধৃত ও বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। অসুখের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি দিলেও তিনি হাসপাতালেই ছিলেন।

শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তি একনিষ্ঠ কংগ্রেসসেবী ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পর স্বরাজ্যদল গঠিত হইলে তিনি ঐ দলে যোগদান করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই, তখন তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষে নির্ভীকভাবে প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিতেন তাহা দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করিতে ও প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যেমন সুবক্তা ছিলেন তেমনি তাঁহার তর্কশক্তিও ছিল অসাধারণ। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে যে-স্থান শূন্য হইল তাহা কোন দিন পূরণ হইবে না। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

পরলোকে ডাঃ প্রভু গুহ-ঠাকুরতা

গত ১৩ই মার্চ্চ শনিবার বিকালে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইণ্ডিয়ান টী মার্চ্চেণ্ট এক্সপ্যানসন্ বোর্ডের প্রথম ভারতীয় প্রচার-সচিব ডাঃ প্রভু গুহ-ঠাকুরতা অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল মাত্র ৪২ বৎসর। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গজননী যে একজন কৃতী সন্তানকে হারাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এত শীঘ্রই যে তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান ঘটিবে ইহা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। তাঁহার আদিনিবাস ছিল বরিশাল জিলায়; ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করিয়া তিনি আমেরিকায় গিয়াছিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎপর ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি কিছুকাল লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য্য করিয়াছিলেন; তিনি কিছু দিন হিন্দুস্থান টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগেও কাজ করিয়াছিলেন। তিনি একাধারে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত, সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার 'এ-ও তা' নামক চিন্তাশীল প্রবন্ধ-পুস্তক জনসমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। তিনি মৃত্যুকালে কয়েকটি পুত্রকন্যা ও তাঁহার বিধবা পত্নী সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিতা নীলিমা দেবীকে রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

—

আরাকানের অভিযান

গত ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ পক্ষ হইতে আরাকান অভিযান আরম্ভ হয়। কিন্তু এই অভিযান সম্পর্কে এত দিন সুস্পষ্ট খবর কিছুই পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ভারতীয় সমর বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি যুক্ত ইস্তাহার হইতে জানা যায়, বৃটিশবাহিনীকে ডনবাইক হইতে মায়ু উপদ্বীপের ইন্দিন হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে কিয়াকপাণ্ডুতে সরাইয়া আনা হইয়াছে। শত্রুপক্ষ গোপনে কয়াজনের দক্ষিণ-পশ্চিমে মায়ু নদী অতিক্রম করিয়া বৃটিশবাহিনীর সরবরাহসূত্র বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এই জন্যই ডনবাইক হইতে ঘাঁটি সরাইয়া আনা হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে ডনবাইক হইতে মায়ু উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কয়াজন ও টাংলাও পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যূহ রচনা করিতে হইলে এমন ভাবে করা প্রয়োজন যাহাতে বর্ষার সময়েও উহা অব্যাহত রাখা যায়। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এইরূপ কোন পরিকল্পনা লইয়া এই অভিযান আরম্ভ করা হয় নাই। জাপানীরা অবশ্য

কতকগুলি ঘাঁটি পুনরায় দখল করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এইগুলি বর্ষার সময় রক্ষা করা সম্ভব হইত না।

আরাকান অভিযানকে ব্রহ্মদেশ পুনরুদ্ধারের জন্য অভিযান বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। জাপান যখন চীনের ইউনান প্রদেশ আক্রমণ করে তখন এই অভিযান আরম্ভ হয়। মুখ্যতঃ ইহার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি, ভারতের সীমান্ত রক্ষা করা এবং ইউনানে জাপানীদের চাপ হ্রাস করা। এই উদ্দেশ্য যে সফল হয় নাই তাহা নহে; তবে আরাকানের অভিযান যে খুব দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় নাই, তাহার কারণ গতিবিধির অসুবিধা ও পর্য্যাপ্ত যুদ্ধ জাহাজের অভাব। তারপর জাপানীরা চোরাযুদ্ধ করিতে খুব সিদ্ধহস্ত। পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গে কতকদিন ধরিয়া যে জাপানী বিমানের হানা চলিতেছে তৎসম্বন্ধে উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উহার উদ্দেশ্য আক্রমণাত্মক নহে। বর্ষারম্ভের এখনও যে কয়েক সপ্তাহ বাকী আছে এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মদেশ রক্ষার ব্যবস্থা খর্ব্ব হইবে না বলিয়াই এই হানা চলিতেছে।

—

মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা

বাংলার গবর্ণর মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের জন্য খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনের সাহায্য চাহিয়াছেন এবং খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনও এই সাহায্য করিতে সম্মত হইয়া একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে গবর্ণর তাঁহাকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রি-সভা গঠনের উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের রিপোর্টের ভিত্তিতেই মন্ত্রি-সভা গঠনের জন্য তিনি আহূত হইয়াছেন কি না তাহা অবশ্য কিছুই জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার বিবৃতি সম্বন্ধে প্রথমেই যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাহা এই যে, তিনি সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে এই বিবৃতি দিয়াছেন, পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদের সহযোগে এই বিবৃতি দেন নাই। পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতারা এই বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন একথাও তিনি বিবৃতিতে বলেন নাই।

বিবৃতির বিষয়বস্তুর দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রথমেই দেখা যায়, তিনি বাংলার সমস্ত মুসলমানদের পক্ষ হইতে হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে সহযোগিতার হস্ত সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, তিনি কৃষক-প্রজাদল ও প্রগতিশীল কোয়ালিশন দলকে স্বীকার করিতে চান না এবং কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল এবং অফিসিয়াল কংগ্রেসকে তিনি হিন্দু-প্রতিষ্ঠান বলিয়া সাব্যস্ত করিতে চান। স্যার নাজিমুদ্দিনের বিবৃতিতে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা, ধরপাকড়, আটক রাখা, রাজনৈতিক অপরাধের বিচারকার্য্য, রাজবন্দীদের মুক্তিদান কিংবা সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, পাইকারী জরিমানা ইত্যাদি সমস্যা জাতীয়তার দিক হইতে সমাধান করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। স্যার নাজিমুদ্দিন হিন্দু-মুসলমানের একজাতিত্বে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং কিরূপ জাতীয়তার দিক হইতে এই সকল সমস্যার সমাধান করা হইবে, তাহা কিছুই বুঝা গেল না। তা ছাড়া 'জাতীয়তার দিক্' হইতে সমাধান করা কথাটার অর্থ খুবই অস্পষ্ট, এত অস্পষ্ট যে, জাতীয়তা বিরোধী সমাধানকেও জাতীয়তার দিক হইতে সমাধান বলিয়া সাব্যস্ত করা যায়।

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভার অজুহাতেই হক সাহেবকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে, কিন্তু খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহূত হইয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে আমরা শুধু একদলীয় অর্থাৎ লীগদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনেরই আভাষ পাইতেছি। গবর্ণর সার্টিফিকেট করিয়া বাজেট পাশ করিয়াছেন, সুতরাং কয়েক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আহূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় স্যার নাজিমুদ্দিনের বিবৃতির আলোকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা সম্পর্কে একটা সন্দেহ ও আশঙ্কা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

—

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতা

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-উৎসবে স্যার আব্রেশির দালাল তাঁহার অভিভাষণে ভারতের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকে দেশের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্য

আংশিক ভাবে দায়ী করিয়াছেন। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেশের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি দূর করিবার উপযোগী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। বরং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থাই এমন যে তাহাতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবারই সুযোগ পায়। আজ্রেশির দালালের কথাগুলি যে এই দিক দিয়া খুবই সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিষেধক শিক্ষা-ব্যবস্থা কিরূপে প্রচলন করিতে পারা যায়।

সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার সুবিধা কি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থাতেই আছে? আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার গোড়া হইতেই কি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় না? প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় এখনও মক্তব ও পাঠশালার অস্তিত্ব রহিয়াছে। শিশুকাল হইতেই দুই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদিগকে পৃথক্ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা। এইখানেই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠে এবং তাহাই ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সমগ্র সমাজ-জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিষেধক হইলেই চলিবে না। দেশের শতকরা কয়জন লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায়? কাহাদের ভাগ্যে এই সুযোগ জুটে? দেশের যাঁহারা ধনী এবং নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোক তাঁহারাই ছেলেমেয়েদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইতে পারেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রেণীস্বার্থরক্ষায় তৎপর। কিন্তু দেশে আজও শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। জাতীয়তাবাদ তাঁহাদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাই তাঁহাদের বুদ্ধি যায় সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার নামে শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখিবার উপায়ের সন্ধানে। এই বুদ্ধিই ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ও বিপন্ন ইসলামের ধ্বনি তুলিয়াছে। তাই শিক্ষা—যাহা আসলে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বিষয় তাহার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিয়াছে। কারণ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেন ইঁহারাই। ইহার প্রতিকারের পথ স্যার আজ্রেশির দালাল দেখাইতে পারেন নাই।

—

মানুষ স্বরূপতঃ ভাল, না মন্দ?

মানুষের স্বভাব প্রকৃতিগতই মন্দ কিনা তাহা সূক্ষ্ম এবং জটিল প্রশ্ন। ল-কলেজ ইউনিয়ন সপ্তাহের শেষ দিবসে বিচারপতি মিঃ আর, বি, পাল এই জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিচারপতি মিঃ পাল মনে করেন, মানুষের স্বভাব স্বরূপতঃ মন্দ। কিন্তু মানুষ যদি স্বাভাবিক মন্দ প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে উহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণ মানুষের স্বভাবধর্ম্মেরই যদি পরিবর্ত্তন হয় তাহা হইলে তাহার আর রহিল কি? স্বভাব-ধর্ম্মের বিনাশ কি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বেরই বিনাশ নহে? আমরা ভাল মানুষও দেখি, মন্দ মানুষও দেখি। ইহা হইতে এইটুকুই শুধু আমরা মনে করিতে পারি যে, মানুষ স্বভাবতঃ ভালও নয়, মন্দও নয়, প্রতিবেশের প্রভাবেই মানুষ ভাল বা মন্দ হইয়া গড়িয়া উঠে। শুধু তাই নয়, মানুষের সৃষ্টি পরিবেশই এমন হইয়াছে যে-মানুষ মন্দপ্রবণ না হইয়া পারে না। মানুষকে ভাল করিতে হইলে প্রয়োজন এই প্রতিবেশের পরিবর্ত্তন করা। যে-সমাজ-ব্যবস্থা মানুষের লোভকে জাগ্রত করে, সে-সমাজ-ব্যবস্থায় নির্লোভ মানুষ তৈয়ার করা সম্ভব নয়।

—

ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

লর্ড সভায় ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় উদারনৈতিক দলের সদস্য লর্ড স্যামুয়েল বলিয়াছেন, "ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্য এই যে, সেখানে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে।" কথাটা কতক পরিমাণে হয়ত ঠিক, কারণ মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল। কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব কতটুকু, তাহাদের শক্তির উৎস কোথায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা লর্ড স্যামুয়েল অনুভব করেন নাই। কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। লর্ড স্যামুয়েল কংগ্রেসকে তেমন আমল দিতে চান না। তবে এইটুকু পর্য্যন্ত তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কংগ্রেস বড় জোর ভারতের অর্দ্ধেকের কিছু বেশী লোকের পক্ষে কথা বলিতে

পারে। কিন্তু বাকী অর্দ্ধেকের কম যাহারা তাহাদেরও বেশীর ভাগই কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, তাহা লর্ড স্যামুয়েল ইচ্ছা করিলেই জানিতে পারেন। কংগ্রেস যদি ভারতের অর্দ্ধেকের বেশী লোকের পক্ষে কথা বলিতে পারে তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার স্থান কোথায় তাহা লর্ড স্যামুয়েল নিশ্চয়ই বুঝিতে পারেন।

বর্ণগত ও ধর্ম্মগত ভেদ ভারতে আছে সত্য, কিন্তু উহাকে মৌলিক ভেদ বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। মুসলিম লীগ অপেক্ষা কংগ্রেসেই মুসলমান সদস্য বেশী। ইহা দ্বারা কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, ধর্ম্ম ও বর্ণভেদ সত্ত্বেও ভারতবাসী জাতীয়তার সূত্রদ্বারা একত্র গ্রথিত হইতে পারে?

লর্ড স্যামুয়েল কংগ্রেসের একনায়কোচিত মনোভাবের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস কখনই নিজের জন্য কিছু চায় নাই—এমন কি প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইলে লীগের হাতে উহা দিতেও কংগ্রেস আপত্তি করে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস দাবী করিয়াছে গণপরিষদের। কিন্তু বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ এ পর্য্যন্ত গণপরিষদের দাবীকে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কারণ কি ইহাই নয় যে, গণপরিষদ আহূত হইলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে এবং ভারতকে স্বাধীনতা না দিবার পক্ষে প্রধান যুক্তি সাম্প্রদায়িক বিভেদের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হইয়া যাইবে? বস্তুতঃ সাম্রাজ্যবাদের আওতাতেই সাম্প্রদায়িক দলগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ঐগুলিই আবার সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিবার অজুহাতে পরিণত হইয়াছে।

—

বার্ণার্ড শ'য়ের ভবিষ্যদ্বাণী

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ কবে শেষ হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু ইহারই মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কার কথা আমরা কাহার কাহার মুখে শুনিয়াছি। উহা কেবল সাধারণভাবে একটা মহাসমরের আশঙ্কা মাত্র। কি কারণে তৃতীয় মহাসমর বাঁধিয়া উঠিতে পারে এখনই তাহা অনুমান করা সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করে না। কিন্তু গত ১০ই এপ্রিল 'নিউ লিডার' পত্রিকায় বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার মিঃ জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' পৃথিবীর পরবর্ত্তী মহাসমর সম্বন্ধে বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—"জার্ম্মানী, জাপান এবং ইটালীর সাম্রাজ্য-সমূহ ধ্বংস হইবার পর রুশ-চীন মৈত্রী এবং ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রীর মধ্যস্থ বর্ত্তমান চুক্তি প্রত্যক্ষভাবে পার্থক্যে এবং অপকৃষ্টভাবে পৃথিবী ব্যাপী অপর একটি মহাসমরে পর্য্যবসিত হইবে। ষ্ট্যালিন এবং চিয়াং-কাইশেকের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যই সর্ব্বশেষ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।"

বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে মৈত্রীকে বার্ণার্ড শ' দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী এবং রুশ-চীন মৈত্রী। এই দুই মৈত্রীর মধ্যে কেন পার্থক্য সৃষ্টি হইবে এবং কেন যুদ্ধ বাঁধিবে, তাহার কারণ তিনি কিছু বলিয়াছেন কি-না, রয়টারের প্রেরিত সংক্ষিপ্ত সংবাদের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। জর্জ্জ বার্ণার্ড শ অনেক সময় এমন উক্তি করিয়া থাকেন, যাহা লোকের কাছে স্ববিরোধী এবং দুর্ব্বোধ্য বলিয়া মনে হয়। তৃতীয় মহাসমর সম্বন্ধে তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী ঐরূপ উক্তি হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আর একটি মহাসমরের আশঙ্কা মানব-সমাজের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। বিশ্বশান্তির নিরাপত্তার ভিত্তি সম্বন্ধে যতটুকু আভাষ আমরা পাইয়াছি, তাহা শুধু ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার নামান্তর বলিয়াই মনে হইয়াছে। তথাপি বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ তাহাদের নীতির পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতে পারে, এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়ার আশা করা কি একান্তই অসম্ভব?

—
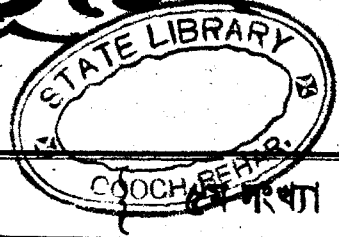
পঞ্চম বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫০ { ২য় সংখ্যা

বাঙ্গলা সাহিত্যের ধারা

শ্রীপ্রশান্তকুমার চক্রবর্ত্তী

আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই সর্ব্বপ্রথম যে প্রশ্নটা আজ আমাদের মনের মধ্যে দেখা দেয় তা খুব সম্ভবতঃ এই যে—আমরা যে স্তরের কবি পেয়েছি ঠিক সেই স্তরের ঔপন্যাসিক পাই নি কেন ? আবার যে স্তরের ঔপন্যাসিক পেয়েছি ঠিক সেই স্তরের নাট্যকার কেন পাই নি ?

আমাদের এ প্রশ্ন আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হ'লেও প্রাচীন সাহিত্যকে বাদ দিয়ে এর আলোচনা অসম্ভব। কারণ আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের নাড়ীর যোগ রয়েছে এবং সে যোগসূত্র ক্ষীণ হ'লেও অদৃশ্য হয় নি।

এ প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার আগে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। পৃথিবীর কোনও সাহিত্যই হঠাৎ এক দিনে বড় হ'য়ে ওঠে নি। যে সাহিত্যই আজ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়েছে—তারই ভিতরে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে—বহু লেখকের বহু দিনের মিলিত চেষ্টা, আদর্শ এবং সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপন্থা তাকে ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। সেক্স্‌পীওর বা রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ জন্মেছিলেন এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার্য্য নয়—কারণ তাঁদের মত যুগান্তকারী লেখক খুব কমই জন্মান—অনেক যুগে হয়ত জন্মানই না। কিন্তু তবু এ কথাও ত সত্যি যে তাঁরা ইংলণ্ডে এবং ভারতেই জন্মেছিলেন—যেখানকার সাহিত্যে একটা সুনিয়ন্ত্রিত প্রাচীন ধারা বর্ত্তমান ছিল। তাঁরা বা তাঁদের মত কেউ ত তিব্বতে, আফ্রিকায় বা ব্রহ্মদেশে জন্মান নি।

এখানে আর একটা কথা বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়—তা হচ্ছে এই যে, সাহিত্যের উৎকর্ষ প্রধানতঃ নির্ভর করে তার আদর্শের ওপর। যখনই কোন সাহিত্য তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়ে তখনই তার অধঃপতন হয়—ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য তাই বলে যে একযুগের আদর্শ অন্য যুগেও টিকে থাকবে এমন কোন কথা নেই।

যা হোক এবার আমাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আমাদের প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করাই উচিত বলে মনে হয়। কারণ বিশ্ব-সাহিত্যে বাঙ্গলার যা কিছু দান তার প্রধান অংশই যে তার কাব্য এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কাব্যই আজ বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রধান ভূষণ। বাঙ্গলা কাব্যের এই উৎকর্ষের কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখতে গেলে প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যের ধারা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

বাঙ্গলা কাব্যের উদ্ভব তার উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির বহু পূর্ব্বে। দোহাবলীর কথা বাদ দিয়ে অন্ততঃ যদি

কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস থেকেও ধরা যায় তা হ'লেও বাঙলা কাব্যের বয়েস কম ক'রেও পাঁচ-শ বছর। এই পাঁচ-শ বছরের বাঙলা কাব্যের ইতিহাসের মধ্যে তার একটা অখণ্ড সমগ্র রূপ ফুটে উঠেছে! এই সমগ্র বাঙলা কাব্যকে বিভিন্ন রকম ফুলে গাঁথা মালার সঙ্গে তুলনা করলে অশোভন হবে না। ফুল বিভিন্ন প্রকারের হ'লেও সূত্রটা একই। সেটা হচ্ছে বাঙলাদেশের সুর—তার আকাশ, বাতাস, আলো-হাওয়ার বিশিষ্ট রূপ। বিভিন্ন কবির কাব্য বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন ভঙ্গীর হ'লেও—তাদের সৌন্দর্য্যোপলব্ধির মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য সব সময়ই দেখা যায়।

কাশীরাম দাসের মহাভারত বা কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংস্কৃতের অনুবাদ হ'লেও এই বাঙলা দেশেরই ছাঁচে ঢালা। কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস মহাভারত ও রামায়ণকে—এই "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল"র যে একটা বিশিষ্ট সুর আছে—সেই সুরের ছাঁচে ঢেলে সম্পূর্ণ নূতন করে গড়েছেন।—তাই অনুবাদ হ'লেও তা সম্পূর্ণ অভিনব দুটি মহাকাব্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে ঠিক খাঁটি বাঙলা কাব্যের সৃষ্টি কাশীরাম দাস বা কৃত্তিবাসের সময়ও হয় নি। কারণ তাদের কাব্য বাঙলার ছাঁচে ঢালা হ'লেও তার মূল কাহিনীর আমদানী করতে হয়েছে বাঙলা দেশের বাইরে থেকে। রামায়ণ বা মহাভারত কোনোটাই বাঙলা দেশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নয়। আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণব কবিদের আমলেই আমরা খাঁটী বাঙলা কাব্যের পরিচয় প্রথম পেয়েছি। সেই সুদূর ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের জল বাতাস, বাঙলা দেশের স্নিগ্ধ শ্যামলতা বাঙালীর মনে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবমাধুর্য্য এনে দিয়েছিল—সেইটেই প্রকাশিত হ'ল তার নিজের হাতে গড়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে। আবার সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই রাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীতি-কাব্যের উদ্ভব হ'ল। এই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন ক'রে বাঙলা দেশের বিশিষ্ট যে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠল তাই হ'ল ভাব-প্রধান বৈষ্ণব-সাহিত্য। বৈষ্ণব কাব্যের প্রথম যুগ প্রবর্ত্তন করলেন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। অবশ্য বিদ্যাপতিকে আমাদের আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে—কারণ তাঁর কাব্য মৈথিলী ভাষায় রচিত—বাঙলা ভাষায় নয়। চণ্ডীদাসই আমাদের মতে খাঁটি বাঙলা কাব্যের স্রষ্টা। কারণ তাঁর কাব্যের ভাব, ভাষা, ভঙ্গী ইত্যাদি সমস্ত কিছুই বাঙলা দেশের নিজস্ব জিনিষ।

বৈষ্ণব যুগে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ছাড়াও বহু কবি জন্মগ্রহণ করেন—এবং বৈষ্ণব যুগের পরেও বহু বিশিষ্ট কবির উদ্ভব হয়,—তবে তাঁদের প্রত্যেকের বিষয় পৃথক ভাবে আলোচনা করা অনাবশ্যক। বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগ গত হ'লেও তার প্রভাব বাঙলা সাহিত্য থেকে কখনও বিলুপ্ত হয় নি। বৈষ্ণব-সাহিত্য নানাভাবে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বৈষ্ণব গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এসে চরম পরিণতি লাভ করেছে।

বৈষ্ণব যুগের পরে প্রতিভাশালী কবিদের মধ্যে কবি-কঙ্কণ মুকুন্দরামের নাম করা যেতে পারে। মুকুন্দরাম প্রাচীন ধারারই অনুসরণ ক'রে কাহিনীমূলক কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরামের পরে অনেক বিশিষ্ট কবি জন্ম-গ্রহণ করেন, তবে তাঁদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের নামই উল্লেখ যোগ্য। ভারতচন্দ্রই একহিসাবে খাঁটি বাঙলার শেষ কবি (অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধেও একথা কতকাংশে প্রযোজ্য)। ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই সমগ্র বাঙলা দেশ ইংরাজের অধীন হ'য়ে পড়ে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সমাজ, সাহিত্য, শিক্ষা প্রভৃতি সব কিছুই প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়তে থাকে। বাঙলা সাহিত্যও এই যুগসন্ধিক্ষণে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হ'য়ে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় অসাধারণ প্রতিভাশালী মনীষী ও কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। অধিকাংশ শিক্ষিত লোকই এ সময় এত অধিক মাত্রায় পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েন যে, বাঙলার সমাজ, সাহিত্য বা ভাষাকে তাঁরা ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই সময় বাঙলা কাব্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার [illegible] প্রাণসাধ্য চেষ্টা

করেন বটে; কিন্তু সংখ্যাবহুল বিরুদ্ধ পন্থীদের সঙ্গে বিরোধিতা করবার মত প্রতিভা বা পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল না। তাই মধুসূদনের মত মনীষী কবির আবির্ভাবের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল সে সময় বাঙলা সাহিত্যে। মধুসূদনের জন্ম না হ'লে বাঙলা কাব্যকে আজ আমরা যে ঠিক কি রকম অবস্থায় দেখতে পেতাম তা অনুমান করা শক্ত।

যাই হোক, মাইকেলের প্রতিভা বাঙলা কাব্যকে আসন্ন সমস্যার হাত থেকে মুক্ত ক'রে তার গতি সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে দিল। মধুসূদন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন—কিন্তু তাই বলে তাঁর নিজের দেশ বা তার সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি প্রথম জীবনে পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিকে খুব বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর কাব্যে আমরা পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় ভাবধারার অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখতে পাই—আর এই সমন্বয়েরই ছিল তখন একান্ত প্রয়োজন। কারণ পাশ্চাত্য ও বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে চরিত্রগত বা নীতিগত পার্থক্য বা বিরোধিতা অত্যন্ত প্রবল এবং সেই কারণে এই দুটো পরস্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন সাহিত্যের এক জায়গায় টিঁকে থাকা হ'য়ে উঠেছিল অসম্ভব। কাজে কাজেই এই দুই ভাবধারাকেই বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র উপায় ছিল এ দুয়ের সমন্বয় সাধন ক'রে দেওয়া। মধুসূদনের কাব্য পাশ্চাত্য ভাবাদর্শে রচিত হ'লেও বাঙলা দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়েচে। তাঁর অধিকাংশ রচনারই মূল কাহিনী বা মূল ভাব প্রধানতঃ প্রাচীন বাঙলা কাব্য থেকেই গ্রহণ করা হয়েচে। কাজে কাজেই প্রাচীন বাঙলা কাব্যধারার সঙ্গে তার যোগসূত্রও ছিন্ন হয় নি। মধুসূদনের এই অসাধ্য সাধনের ফলেই যে বাঙলা কাব্য আসন্ন বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত।

মধুসূদনের প্রতিভা বাঙলা কাব্য সাহিত্যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করল। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি শক্তিশালী কবি মধুসূদন প্রদর্শিত পথ দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে তাকে আরও এগিয়ে নিয়ে এলেন। অবশেষে এই নূতন ধারা এসে চরম পরিণতি লাভ করল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেন বিশ্বসাহিত্যের সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠল বৈষ্ণব-সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যকে মিলিয়ে দিলেন। তাই তাঁর কাব্য সম্পূর্ণ প্রাদেশিকতা দোষ বর্জ্জিত, নৈর্ব্যক্তিক ও সার্ব্বজনীন হ'য়ে বিশ্বের এক পরম আদরের জিনিষ হয়ে দাঁড়াল—তাই রবীন্দ্রনাথ হলেন বিশ্বকবি।

এ পর্য্যন্ত আমরা এটুকু অন্ততঃ দেখতে পেলুম যে, বাঙলা কাব্য বহু প্রাচীন কালে উদ্ভব লাভ করলেও কখনও প্রাচীনের সঙ্গে তার যোগসূত্র হারায় নি। এবং ধীরে ধীরে নূতন নূতন ধারায় নূতনতর পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। সেই জন্যেই কাব্য সম্পদে বাঙলা সাহিত্য আজ গৌরবান্বিত হ'তে পেরেছে।

কাব্যের পরই বাঙলা সাহিত্যে ঠিক উপন্যাসের স্থান নয়। কাব্যের পর বাঙলার নিজস্ব যদি কিছু থাকে তা হচ্চে তার ছোট গল্প। কিন্তু আমাদের প্রশ্নের বাইরে বলে তাকে এ আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

কাব্য বা ছোট গল্পের তুলনায় বাঙলা সাহিত্যে ভাল উপন্যাসের একান্ত অভাব। খুব বেশী ক'রেও মাত্র খান দশেক উপন্যাসের নাম করা যেতে পারে যা প্রথম শ্রেণীর বলে মেনে নেওয়া যায়—যদিও আজ পর্য্যন্ত অসংখ্য উপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছে বাঙলা দেশে। তবে সে জন্যে দুঃখ করবার কারণ বিশেষ কিছু নেই। কারণ প্রথমতঃ বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে সামান্য কিছু দিন আগে। তার পর দ্বিতীয়তঃ বাঙালীর সঙ্কীর্ণ, একঘেয়ে জীবন উপন্যাসের বা নাটকের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই কারণেই অধিকাংশ বাঙলা উপন্যাস প্রাণহীন নির্জ্জীব রচনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু এত বাধা সত্ত্বেও এত অল্প দিনের মধ্যে যে কয়েকখানাও প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস বেরোতে পেরেছে—তাও কম কথা নয়।

বাঙলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রধানতঃ তিনজনের নাম করা যায় যাঁদের চেষ্টায় বাঙলা উপন্যাস আজ অন্ততঃ নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পেরেছে। তাঁরা হচ্ছেন— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, এবং শরৎচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রই

আধুনিক বাঙলা উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর আগে দু-একখানা উপন্যাসের ধরণে লেখা বই থাকলেও ঠিক ঔপন্যাসিক বলতে কেউ ছিল না। উপন্যাসের কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদেশী থেকেই আমদানী করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই আমদানী-করা কল্পনাকে এ দেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে তাঁর সে চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি। সেই কারণেই তাঁর প্রথম দিকের লেখা উপন্যাস কয়েকখানার অধিকাংশ স্থানই অলীক অসম্ভব কল্পনা বলে মনে হয়। তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে এ জন্ত দোষ দেওয়া যায় না। কারণ একটা জিনিষকে নূতন সৃষ্টি ক'রেই তার উৎকর্ষ সাধন করা যে কত বড় শক্ত কাজ তা অনুমান করা কঠিন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যেই তাঁর নূতন সৃষ্টিকে অপূর্ব্ব সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করতে পেরেছিলেন পরবর্ত্তী জীবনে। তিনি তাঁর প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে পরবর্ত্তী জীবনে সাফল্য অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর আবির্ভাব হ'ল রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ধারা অনুসারে বাঙলা উপন্যাসকে টেনে নিয়ে গেলেন। তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাস দুখানা সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমী ধাঁচে লেখা। তবে তার পরেই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে থাকে তাঁর উপন্যাসে। বাঙলা উপন্যাসও তাঁর সঙ্গে এক নূতন অভিনব পথে অগ্রসর হয়। রবীন্দ্রনাথই বাঙলা সাহিত্যে এক রকম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর শেষের দিকের কয়েকখানা উপন্যাসে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের পর এলেন শরৎচন্দ্র। তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁর রচনাকে ভরে তুললেন বিশ্বঘৃণিত গরীব-দুঃখীদের কথায় যাদের কথা তাঁর আগে বাঙলা সাহিত্যে আর কোনও ঔপন্যাসিকের রচনায় দেখা যায় নি। সেই কারণেই তাঁর উপন্যাস সবচেয়ে লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠল। শরৎচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম তাঁর উপন্যাসে বাঙলা দেশের সামাজিক সমস্যা বা ত্রুটিগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরেন।

এই তিনজন ছাড়াও বহু ঔপন্যাসিক এঁদের সমসাময়িক কালে উদ্ভব লাভ করেছিলেন। তবে তাঁদের কথা বিশদভাবে আলোচনা না করলেও ক্ষতি হবে না।

মোটের উপর আমরা দেখতে পাই শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বাঙলা উপন্যাস বেশ ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শের অনুসরণ ক'রে তার উৎকর্ষ সাধন করার চেষ্টা ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের পরেই হঠাৎ কেন যেন বাঙলা উপন্যাসের গতিরুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে। এখন যেন মনে হয় সে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হ'য়ে পড়েছে। বহু শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের পরেও আবির্ভূত হয়েছেন—কিন্তু কোন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস তাঁদের কাছ থেকে বড় একটা পাওয়া যায় নি। তবে এতে ভীত হবার বিশেষ কোনও কারণ নেই এই জন্তে যে, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর বেশী দিন অতীত হয় নি।

উপন্যাসের পর আসছে বাঙলা নাটকের কথা—যে ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্য সবচেয়ে দীন। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হয়েচে যে, দুখানা কি একখানা ছাড়া—প্রথম শ্রেণীর ত দূরের কথা—সাধারণ ভাল নাটকও আমাদের নেই। এর সর্ব্বপ্রধান কারণ খুব সম্ভবতঃ বাঙালীর সঙ্কীর্ণ প্রাণহীন জীবন-যাত্রা-প্রণালী। বাঙালীর জীবন নিয়ে জোর ক'রে উপন্যাস পর্য্যন্ত লেখা চলে, কিন্তু নাটক রচনা প্রায় অসম্ভব। কারণ নাটকের প্রধান গুণই হচ্চে ঘটনাবৈচিত্র্য। যে নাটক বৈচিত্র্যহীন সে নাটক 'নাটক' নামেরই অযোগ্য। তবে এ ছাড়াও একটা দ্বিতীয় কারণ আছে যে জন্তে বাঙলা সাহিত্যে ভাল নাটক রচিত হ'তে পারে নি। আধুনিক নাটকের কল্পনাও উপন্যাসেরই মত বিদেশ থেকে আমদানী করা। প্রাচীন কালে বাঙলা নাটক যে একেবারেই ছিল না তা নয়—তবে তার সঙ্গে আধুনিক নাটকের রচনা পদ্ধতির কোনও সম্বন্ধ নেই। আধুনিক বাঙলা নাটক সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভঙ্গীতে রচিত। এর সৃষ্টি করেন খুব সম্ভবতঃ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক রচনা ক'রে বাঙলা সাহিত্যে এক নূতন ধারায় সৃষ্টি করলেন বটে, কিন্তু বিদেশ

থেকে আমদানী করা জিনিস এখানকার মাটিতে টিঁকবে কিনা এ কথা তিনি ভেবে দেখবার অবসর পেলেন না। প্রাচীন সাহিত্য-ধারার সঙ্গে তিনি এই নূতন আমদানী-করা জিনিষকে কোনও দিন খাপ খাইয়ে নেওয়ারও চেষ্টা করলেন না। তার ফলে সে একেবারে বিনষ্ট না হ'লেও পঙ্গু হয়ে বেঁকে পড়লো। এই সব কথা আলোচনা ক'রে আমাদের সন্দেহ হয় বাঙলা নাট্য সাহিত্য ভবিষ্যতে কোনো দিন উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না—যদি না তাকে আমূল পরিবর্ত্তন ক'রে দেশের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়।

"ধীরে বহে ডন্"

(অনুবাদ-উপন্যাস)
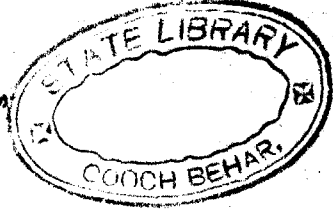
(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিখেল্ শোলকভ্

৫

দিন দশেকের মধ্যে কসাকরা গ্রামে ফিরবে।

প্রণয়ের বেপরোয়া আতিশয্যে একসিনিয়া উন্মাদপ্রায়। পিতার শাসানি সত্ত্বেও প্রতি রাত্রেই গ্রীগর লুকিয়ে একসিনিয়ার কাছে আসত। ভোরবেলা সবাই তাকে দেখত গৃহে।

হপ্তা দুয়েক এমনি ক'রেই চলল। নিজের ওপর বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়েছে গ্রীগর। বিনিদ্র রাত্রি যাপনে মুখে একটা বিশুষ্ক ক্লিষ্ট ভাব। কোটরাগত নয়নে ক্লান্তির ম্লানিমা। একসিনিয়া বেপরোয়া। মুখ অনাবৃত ক'রেই সে ঘুরে বেড়াত। তার চোখের তলার কালিমা-রেখা নির্ব্বাপিত চিতাগ্নির মতই বীভৎস; তার ঈষৎ খোলা উন্মুখ ওষ্ঠাধরে সঙ্কোচমুক্ত স্মিত হাসিরেখা।

ওদের এ সম্পর্কটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এমনি সঙ্কোচমুক্ত দ্বিধাহীন ভাব, লোকের চোখে একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হ'ত। গোপন রাখা তো দূরের কথা, লুকোবার চেষ্টা পর্য্যন্ত নেই। গ্রীগরের বন্ধুমহলে পূর্ব্বে একসিনিয়া সম্পর্কে ঠাট্টা-তামাসা চললেও, আজকে তারা ওকে দেখলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করে। মেয়েরা মনে মনে একসিনিয়াকে হিংসে করলেও, তার নিন্দায় পঞ্চমুখ।

গ্রীগর যদি এ যোগাযোগের কথা গোপন রাখত, কি একসিনিয়া ব্যাপারটা লুকিয়ে যাবার চেষ্টা করত, তা হ'লে সমাজের চোখে এর মধ্যে কোন কিছুই বিসদৃশ মনে হ'ত না। দু'চার দিন মধু-গুঞ্জনের পর সবাই ভুলে যেতে পারত। কিন্তু এরা চলেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। বিবাদ সেইখানেই। সাময়িক বিলাসের সঙ্গে এর সৌসাদৃশ্য নেই। সম্পর্ক এদের আরও দৃঢ়তর সূত্রে আবদ্ধ। কুৎসিত আগ্রহ নিয়ে পড়শীরা ফলাফলের প্রতীক্ষা করতে লাগল। স্টীফান আসুক, তাহ'লেই বাঁধন ছিঁড়বে।

এস্টাকভদের শয্যার উপরে শাদা-কালো তুলোর রঙীন এলোমেলোভাবে জড়ান একগোছা দড়ি টাঙান ছিল। মশা-মাছি তার উপর রাত্রি যাপন করত। একসিনিয়ার নগ্ন বাহুর উপর মাথা রেখে গ্রীগর স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছে। একসিনিয়া অপর হাতে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আঙুল থেকে দুধের গন্ধ আসে। মুখ ঘুরিয়ে গ্রীগর যখন একসিনিয়ার বগলে মুখ চেপে ধরে, নারীর ঘেমের একটা তীব্র আমেজে তার নাক ভরে যায়। খাটখানা ছাড়া ঘরে একটা সিন্দুক আছে দরজার পাশে—সযত্নে একসিনিয়া বিবাহের যৌতুক, পরিচ্ছদ, গহনা ভরে রেখেছে তার মধ্যে। কোণে আছে টেবিল একটা, খান দুয়েক চেয়ার আর তৈলচিত্র একখানা—সম্মুখে প্রোথিত

[illegible] [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] জেনারেল [illegible] [illegible]। পালের কোণে অনেকগুলি [illegible], তার মধ্যে দেওয়ালে [illegible] স্টীফানের একখানা [illegible] [illegible] একটা দিকে ঝোলানো ছিল। জানালার পথে চাঁদের খানিকটা ম্লান আলো এসে তার ওপর পড়েছে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে একসিনিয়া গ্রীগরের ভ্রূযুগলের মধ্যে চুম্বন করে ডাকলে—'গ্রীস্কা!'

—'বলো!'

—'আর মাত্র ন'দিন!'

—'কম কি?'

—আমি কি করব গ্রীস্কা?

—'আমি কি বুঝি বল?'

দীর্ঘশ্বাস চেপে নীরবে একসিনিয়া হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খানিক পরে আবার বললে—'স্টীফান আমাকে খুন করবে!'

গ্রীগর নিরুত্তর। ঘুমে তার চোখ ভেঙে আসছে। নিদ্রালস চোখ চেয়ে দেখে, একসিনিয়া তার সুনীল আয়ত নয়ন মেলে স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে আছে।

—'আমার স্বামী এলে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে? ভয় পাবে?'

—'আমি ভয় করতে যাব তাকে? তুমি তার স্ত্রী, ভয় করতে হয় তুমিই করবে!'

—'যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, এতটুকু ডরাই না। কিন্তু দিনের বেলা একলা বসে যখন মনে পড়ে, আমার সত্যিই ভয় করে গ্রীস্কা!'

—'স্টীফানের আসাতে কিছুই এসে যায় না; কিন্তু বাবা যে আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন!'—হাই তুলে গ্রীগর বলে, আবার কি বলতে যেতেই টের পেল, তার মাথার তলায় একসিনিয়ার হাতখানা অবশ হ'য়ে নেতিয়ে পড়ে বালিশের মধ্যে, পরে সহসা আবার দৃঢ় হ'য়ে ওঠে।

—'কার সঙ্গে কথা বলছেন?'

—'পাকাপাকি কোথাও হয় নি কিছু। মা বললে—করশুনভদের স্লাতালিয়ার কথা নাকি বাবা বলেছেন?'

—'স্লাতালিয়া…স্লাতালিয়া খুব ভাল মেয়ে…খুব সুন্দর দেখতে… তুমি তাকে বিয়ে করলে…সেদিন তাকে দেখে-[illegible] [illegible]—[illegible] একটা লোককে শেষ [illegible] আছে।'

—[illegible] কথা আমার কাছে জানবে না, একসিনিয়া, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

গ্রীগরের মাথার তলা থেকে হাতখানা টেনে এনে একসিনিয়া স্থির দৃষ্টিতে জানালার পানে চেয়ে রইল। পাতলা কুয়াশার কটা আবরণে আঙিনা আচ্ছন্ন। বনে বিরামহীন ঝিল্লিরব। ডনের ভাঁটি থেকে বকের গম্ভীর স্বর কানে আসছে।

—'গ্রীস্কা!'

—'কিছু ভাবছিলে?'

গ্রীগরের অনমনীয় হাতখানা টেনে নিজের বক্ষদেশে, হিমশীতল গালে চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে একসিনিয়া বলে উঠল—'আমায় এমন ক'রে পাগল কেন তুমি করলে গ্রীস্কা—এখন আমার উপায়?…আমি ডুবেছি, স্টীফান এলে আমি কি বলবো? কে আমায় দেখবে?'

নীরবে গ্রীগর পড়ে রইল। একসিনিয়া তার সুগঠিত ঈগলের মত নাক, তার ছায়াচ্ছন্ন চোখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সহসা উচ্ছ্বাসের বন্যায় তার সংযমের বাঁধ ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। ঝুঁকে সে উন্মাদের মত অজস্র চুম্বনে গ্রীস্কার মুখ, চোখ, ঘাড়, তার লোমশ বক্ষ ভরে দিতে লাগল। পরে হাঁফ ছেড়ে মৃদু কম্পিত স্বরে বললে, (গ্রীগর টের পেল তার সারা দেহ থরথর ক'রে কাঁপছে) —গ্রীস্কা, গ্রীস্কা চল আমরা পালিয়ে যাই। সব ছেড়ে চল আমরা চলে যাই। আমি স্বামী, সংসার সব ছাড়বো …যতক্ষণ তোমার কাছে থাকবো…চল দূরে খনি অঞ্চলে কোথাও যাই। আমি তোমাকে ভালবাসব, তোমার সেবা করব। চল! প্যারোমনভ খনিতে আমার এক মামা দারোয়ান আছে। তাকে বললে সে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবে। গ্রীস্কা! গ্রীস্কা! বল যাবে? একটি শুধু মুখের কথা!'

অসাড় ভাবে চোখ বুজে গ্রীগর পড়ে রইল। অপ্রত্যাশিত ভাবে চাইলে যখন, চোখে তার রূঢ় বিদ্রূপের হাসি।

—'তুমি একেবারেই বোকা, একসিনিয়া… সত্যি

খোকা! মানুষের [illegible] বলে যাচ্ছ। ফার্ম ছেড়ে কোথায় গিয়ে [illegible]? [illegible] বছরেই আমাকে ক্যাম্পে যেতে হবে। ফার্ম ছেড়ে এক পাও আমি নড়ব না। এখানে দেখছ দিগন্তবিস্তৃত বিশাল প্রান্তর,—আর সেখানে?—ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি, কয়লার গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত—দম আটকে আসে আর কি! বাবার সঙ্গে গত বছর স্টেসনে গিয়ে আমি টের পেয়েছি। কি ক'রে সেখানে যে লোকে বাস করে, আমি ভেবে পাইনে। হয়ত তারা অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে।'

থুথু ফেলে গ্রীগর আবার বললে—'গ্রাম ছেড়ে কোথাও আমি যাচ্ছি নে।'

রাত্রির অন্ধকার গভীর হ'য়ে উঠল। প্রাঙ্গণের কুয়াসার আস্তরণ খসে পড়েছে। চাঁদের ওপর দিয়ে একখণ্ড মেঘ উড়ে গেল। ছায়া ঘরের মধ্যেও গভীরতর হ'য়ে এল। সেই নিরন্ধ্র আঁধারে একসিনিয়ার কাঁধের মৃদু কম্পন কিংবা দু'হাতে মাথা চেপে বালিশের ওপর উপুড় হ'য়ে যে সে চোখের জলে ভাসছিল, এ দুয়ের কোন কিছুই গ্রীগরের নজরে পড়ল না।

* * *

৬

তোমিলিনের স্ত্রীর আগমনের পর থেকে স্টীফানের চোখ মুখের ভাব একেবারেই বদলে গেছে। ভ্রূ ঝুঁকে পড়েছে চোখের ওপর। কপালে গভীর চিন্তা-রেখা। ঘোড়া যেমন নিরুপায় হ'য়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সওয়ারকে পিঠে বহন ক'রে চলে, মৌন ধূমায়িত ক্রোধে স্টীফানও তেমনি নিজের দুঃখের বোঝা বহন করতে লাগল। সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বড় বেশী বলে না; সামান্য একটু কিছুতেই চটে-মটে অস্থির। তা ছাড়া পিয়োত্রার সঙ্গে তার বহু দিনের বন্ধুত্ব একেবারেই ছিন্ন হ'য়ে গেছে, ফিরেও একবার তার পানে চায় না। পরস্পর রীতিমত শত্রু হ'য়েই তারা বাড়ী ফিরল।

আসবার সময় পূর্ব্বের মত দল বেঁধেই এল। পিয়োত্রা এবং স্টীফানের ঘোড়া দুটোকে গাড়ীতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, [illegible]নিয়া পিছনে তার নিজের ঘোড়ায় পিঠে। তোমিলিনদের ঘর। গাড়ীর [illegible] [illegible]। গাড়ী [illegible] পিয়োত্রো, [illegible] [illegible]। [illegible] পিয়োত্রা[illegible] [illegible]। স্টীফান গাড়ীর মধ্যে [illegible] হাতের চাবুকটা দিয়ে পথিপার্শ্বের কাঁটা-গাছগুলির শীষ চাবকে ভেঙে দিচ্ছে।

টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হ'ল। চর্ব্বির মত চক-মৃত্তিকা চাকায় জড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রমে রাত্রি ঘনিয়ে এল। গ্রামের কোন প্রদীপশিখা দেখবার জো নেই। কশাঘাতে পিয়োত্রা ঘোড়া দুটোকে অস্থির ক'রে তুলল। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে স্টীফান চীৎকার করে বললে—'এই, ওকি! নিজেরটা ছেড়ে সব সময়ে কেবল আমারটার পিঠেই চাবুক চলছে!'

—'ভাল ক'রে চোখ চেয়ে দ্যাখো না। যেটা না চলছে তাকেই মারছি।'

স্টীফান্ জবাব দিলে না। আধ ঘণ্টাখানেক নীরবে এই ভাবেই চলল। চাকার তলায় কাদা প্যাচ প্যাচ করছে। রাশ ছেড়ে পিয়োত্রা একটা সিগ্রেট ধরালে। *স্টীফানের সঙ্গে পরবর্ত্তী ঝগড়ায় যে-সব গালাগাল ব্যবহার হবে,* মনে মনে পিয়োত্রা বসে তার মহড়া দিচ্ছিল। সহসা একটা ঝাঁকানি খেয়ে গাড়ীটা থেমে গেল। কাদায় পিছলে ঘোড়া দুটো পা দিয়ে মাটি ঘষছে।

—'কি হোলো আবার?' শঙ্কিতভাবে স্টীফান্ জিজ্ঞাসা করলে।

—'একটা আলো নিয়ে এসো না, শীগ্‌গির করে।' পিয়োত্রা বললে।

সামনে ঘোড়া দুটো উঠবার চেষ্টা করছে আর নাসিকা-শব্দ করছে। কে একটা দিশলাইর কাঠি জ্বাললে। ক্ষীণ একটু আলো-রেখা জ্বলে উঠে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিভে গেল। আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার। কম্পিত হস্তে পিয়োত্রা পতিত ঘোড়াটাকে লাগামের নীচুতে ধরে রাখল।

কোঁসকোঁস শব্দ ক'রে ঘোড়াটা কাত হ'য়ে পড়ল। অনেকগুলি কাঠি একসঙ্গে জেলে স্টীফান্ দেখলে, তার ঘোড়াটার সামনের বাঁ পাখানা প্রায় হাঁটু অবধি ইঁদুরের গর্ত্তে ঢুকে গেছে। ক্ষতপদে অগ্রসর হ'য়ে ক্রিস্তোনিয়া

—'যাহোক একটা কিছু দাও আমাকে।'

একসিনিয়া দুধ এবং রুটি এনে দিয়ে, স্টোভের কাছে সরে দাঁড়াল। স্টীফান পলকহীন দৃষ্টিতে তার কৃষ্ণবলয়-বেষ্টিত চোখের পানে বারে বারেই চাইতে লাগল। খাওয়া শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে স্টীফান ক্রশ্ করলে।

একসিনিয়া টেবিলের কাছে এগিয়ে আসতেই সহসা স্টীফান্ জিজ্ঞাসা করল'—'এখন বলো সব!'

একসিনিয়া চুপ ক'রে টেবিল সাফ্ করতে লাগল'।

—'বলো, কি করে তোমার স্বামীর ইজ্জৎ রক্ষা করেছ, কি ভাবে তোমার পাতিব্রত্য পালন করেছ, বলো।'

মাথার উপর প্রচণ্ড ঘুষির চোটে হুমড়ি খেয়ে একসিনিয়ার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল যেন।' দরজার উপর ছিটকে পড়ে সে আর্তনাদ ক'রে উঠল। তাক ক'রে স্টীফান যদি মাথার ওপর একঘা লাগাতে পারে তাহ'লে বড় বড় জোয়ানের অবস্থাই কাহিল হয়ে উঠে, আর একসিনিয়া তো মেয়ে। ভয়ে কিংবা মেয়েদের স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক্ দু' এক মিনিট সেই ভাবে পড়ে থেকে একসিনিয়া চার হাত-পায়ে ওঠে দাঁড়াল। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে স্টীফান ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাঁই তুলছিল; একসিনিয়াকে সরে পড়তে দেখেই সে সিগ্রেটটা ছুঁড়ে ফেলে দরজার দিকে রুখে এগুল, কিন্তু একসিনিয়া ইতিমধ্যে কপাট বন্ধ ক'রে দিয়েছে। স্টীফান্ ছুটে তার পেছন পেছন গেল। দরদর্ ধারায় নাক দিয়ে একসিনিয়ার রক্ত ঝরছে, দৌড়ে সে মেলেকভ এবং তাদের বাড়ীর সীমানার বেড়া পর্য্যন্ত পৌঁছুতে না পৌঁছুতে, বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে স্টীফান দৃঢ় মুষ্টিতে তার চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে দিলে। চড় চড় ক'রে ছিঁড়ে অনেকগাছি চুল স্টীফানের হাতের মুঠোয় রয়ে গেল।

স্বামী যদি নিজের স্ত্রীকে জুতো দিয়ে পদদলিতও করে, তাতেই বা কি এসে যায়? বাহুহীন এলেক্সী শ্যামীল যাবার পথে উঁকি মেরে দেখে দাড়ি ফাঁক ক'রে হেসে চলে গেল। তাছাড়া স্টীফান যে তার আইনতঃ বিবাহিতা স্ত্রীকে মারবে, এতো জানা কথা। শ্যামীল একবার ভাবলে দেখে যাই মেরে ফেলে নাকি। কিন্তু বিবেক বরদাস্ত করতে পারলে না। তাছাড়া, সে তো আর মেয়ে নয়।

দূরথেকে স্টীফানকে তখন দেখলে মনে হয় সে কসাক-নৃত্য করছে। গ্রীগর ও তাকে লাফাতে দেখে প্রথম তাই ভেবেছিল। তার পর জানালা দিয়ে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দৌড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পিয়োত্রাও ছুটলে পেছন পেছন। পাখীর মত উড়ে গ্রীগর বেড়া পার হ'ল এবং ছুটে পেছন থেকে স্টীফানকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু টলতে টলতে স্টীফান বন্য ভল্লুকের মত তার দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বিনা বাক্যব্যয়ে ধস্তাধস্তি আরম্ভ হ'য়ে গেল। মেলেকভ ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণপণে যুঝতে লাগল। মনে হয়, দুটো দাঁড়কাক মিলে একটা কঙ্কালকে ঠুকরে অস্থির ক'রে তুলেছে। স্টীফানের ঘুষিতে কয়েক বারই গ্রীগর ধরাশায়ী হয়েছে। স্টীফান শক্তপোক্ত হ'লেও পিয়োত্রা তার তুলনায় বেশী জোয়ান। তবু সে পর্য্যন্ত বায়ুতাড়িত গুল্মের মত স্টীফানের ঘুষিতে অস্থির হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু দমবার মত ছেলে সে নয়! স্টীফান তাদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে এক পা দু'পা ক'রে পিছু হটে সিঁড়ি পর্য্যন্ত এসেছে। ক্রিস্তোনিয়া এমনি সময়ে তার কাছে কি ধার নেবার জন্য এসেছিল। দেখে, সে ওদের ছাড়িয়ে দিলে।

—'আঃ থামো,—' হাত ঘুরিয়ে ক্রিস্তোনিয়া বললে, 'সরে যাও, না হ'লে আমি আতামানের কাছে রিপোর্ট করে দেবো।'

থুক্ করে হাতের তেলোয় কিছু রক্ত এবং আধখানা দাঁত ফেলে রুক্ষ স্বরে পিয়োত্রা বললে—'চলে আয় গ্রীস্কা, আর একদিন দেখে নেবো।

—'আমার পেছনে লাগতে আস্‌বি না, এই বলে দিচ্ছি! ভাল হবে না!'—স্টীফান সিঁড়ি থেকে শাসিয়ে বললে।

—'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে।'

—'দেখা যাবে নয়। তা হ'লে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব বলে দিলাম'।

—'ও, ভুঁড়ি ফাঁসাবে, মুখে অনেক বেটাই বলে।'

'মুখে বলে! দাঁড়া!' স্টীফান ছুটে ওদের দিকে এলো, গ্রীগর রুখে দাঁড়াল; কিন্তু ক্রিস্তোনিয়া তাকে ফটক অবধি ঠেলে দিয়ে বললে,—'ফের আসবি তো আমিই ভাল করে দু'ঘা দেবো তোকে।' (ক্রমশঃ)

লোকশিক্ষা

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত

মাত্র তিনদিন পূর্ব্বে এই কনফারেন্সের সম্পাদক প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত মিহিরকুমার সেন লোকশিক্ষা সম্বন্ধে এই সভায় কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে নিজের অযোগ্যতার কথা ভাবিয়া আমি প্রথমে ইহাতে অসম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এই সম্মেলনে বহু বিদ্বজ্জনের সমাগম হইবে যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী আছেন। আমিও যখন প্রকারান্তরে একটা বিশেষ আদর্শ লইয়া লোকশিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছি তখন আমার বক্তব্য এই সম্মেলনের সম্মুখে ব্যক্ত করিলে তাঁহারা আমার আদর্শটি সম্বন্ধে বিচার করিবার সুযোগ পাইবেন। তাঁহার কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হইল। তাই নিজের অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; মনোভাব ঠিক ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি কি না জানি না।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী ছিলাম। এত দীর্ঘকাল পরে সেই অভিজ্ঞতার দাবী লইয়া সমবেত প্রবীণ ও নবীন অভিজ্ঞ শিক্ষক মহোদয়গণের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। গত ত্রিশ বৎসর যাবত পল্লী-উন্নয়ন-মূলক একটি প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতারূপে আমি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। প্রধানতঃ তপশীলভুক্ত শ্রেণীসমূহের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এই সমিতির বৈশিষ্ট্য। ইহার নাম "বঙ্গীয় অবনত জাতির উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি।" বাংলা দেশের নানা স্থানে এই সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই সমিতির দ্বারা প্রায় সাড়ে-চারিশত স্কুল পরিচালিত হইত। তন্মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়; কয়েকটি মাত্র উচ্চ ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়। এখন স্কুল-বোর্ড স্থাপিত হওয়ায় সমিতির স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব অনেকটা কমিয়া গিয়াছে এবং ইহার পরিচালনাধীন স্কুলের সংখ্যাও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এ স্থানে এই সমিতির বিচিত্র জীবন-ইতিহাস ও ইহার অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু এই কার্য্যের সংশ্রবে থাকিয়া জন-শিক্ষা সম্বন্ধে যে-সকল চিন্তাধারা মনে উদয় হইয়াছে তাহাই আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

পল্লীগ্রামে আমার জন্ম—প্রাথমিক শিক্ষাও পল্লীতেই লাভ করিয়াছিলাম। এই জন্য আজকালকার সহর-জাত তরুণ ও প্রবীণ সম্প্রদায় অপেক্ষা পল্লীর অভিজ্ঞতা আমার বেশী। তদুপরি পূর্ব্বোক্ত সমিতির কার্য্য উপলক্ষে আমি বাংলার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করিয়াছি; শুধু রেল, ষ্টীমার অথবা নৌকাযোগে নহে, জল-কাদা ভাঙ্গিয়া পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের লোকের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি—তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়াছি—তাহাদের ঘরের মাটির মেঝেয় চাটাই পাতিয়া সযত্নে তাহারা যে বিছানা পাতিয়া দিয়াছে তাহাতে রাত্রি যাপন করিয়াছি। কিসে গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, কি প্রকারে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, কি প্রকারে মুমূর্ষু গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা যায়, রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া গ্রামের প্রধান প্রধান মাতব্বরদের সহিত তাহার আলোচনা করিয়াছি।

ষোল বৎসর পূর্ব্বে পাবনা জেলার নমঃশূদ্রদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণের জন্য এক প্রবল ও ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের দুর্ব্ব্যবহার-জনিত অভিমানই ছিল এ আন্দোলনের মূল কারণ। এই আন্দোলন প্রশমনের জন্য আমাকে সিরাজগঞ্জ মহকুমার কতকগুলি গ্রাম পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। একটি গ্রামে রাত্রি যাপন করিয়া ভোর বেলায় পদব্রজে বাহির হইতাম। মধ্যাহ্নে

গ্রামান্তরে অতিথি হইয়া আবার সন্ধ্যাকালে অন্য গ্রামে উপস্থিত হইতাম। এই ভাবে কয়েক দিন ঐ অঞ্চলে কাটাইতে হইয়াছিল এবং তাহার ফলে জনসাধারণের অবস্থা ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।

অদ্য হইতে মাত্র সাত দিন পূর্ব্বেও ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার বিল অঞ্চলের নমঃশূদ্র ভাইদের ঐকান্তিক আগ্রহে রেল, ষ্টীমার ও নৌকাপথে আমাকে সস্ত্রীক টুঠামান্দ্রা গ্রামে যাইতে হইয়াছিল। দিবানিশি বৈষয়িক কর্ম্ম-ব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও প্রাণের টানে আমার কৃষাণ ভাইবোনদের মধ্যে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে সময় যাপন করিতে এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়া বুদ্ধি পরামর্শ দিতে ও যথাশক্তি সাহায্য করিতে আমার মন আকুল হইয়া উঠে। জন-শিক্ষা সম্বন্ধে আমার চিন্তাধারা উপরে লিখিত পটভূমিকাকে ভিত্তি করিয়াই গঠিত হইয়াছে

সাধারণতঃ জাতির শিক্ষাবিধানের ভার রাষ্ট্রই গ্রহণ করিয়া থাকে। যে সর্ব্বব্যাপী অশিক্ষা, মূঢ়তা ও কুসংস্কার আজ আমাদের জাতীয় জীবনকে দূষিত ও বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, রাষ্ট্রশক্তি আমাদের হাতে থাকিলে তাহার অনেক কিছুই হয়ত আজ থাকিত না। রাষ্ট্রশক্তি ইচ্ছুক হইলে একটা জাতিকে কত সহজে গড়িয়া তোলা যায়, সোভিয়েট রাশিয়া এবং বর্ত্তমান চীন তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু সে সুদিনের আশায় বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না; বরং তাহাকে নিকটতর করিবার জন্যই নিষ্ঠার সঙ্গে, ঐকান্তিকতার সঙ্গে আমাদিগকে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে; ভারতীয় সভ্যতার মূল পল্লীর বুকে নিহিত—একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে শতকরা ৮৯ জন লোক গ্রামে বাস করে এবং শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, আমাদের পল্লী-গ্রামে দুঃখ-দারিদ্র্য আছে সত্য; কিন্তু লোকেরা সব সময় দুঃখ-দারিদ্র্যের জন্যই কষ্ট ভোগ করে না। তাহাদের কষ্ট ভোগের অন্যতম প্রধান কারণ তাহাদের শিক্ষার অভাব। অবশ্য শিক্ষা বলিতে আমি শুধু পুঁথিগত বিদ্যার কথাই বুঝি না। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মানব-জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করা। বর্ত্তমানে আমাদের পল্লীগুলির সংস্কার ও উন্নতি বিধান করিতে হইলে, আমাদিগকে পল্লীবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে। এক কথায় আমাদের পল্লীগুলিতে জন-শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

এই জন-শিক্ষার মধ্যে প্রধানতঃ চারিটি সমস্যা বিজড়িত। এর কোন একটিকে বাদ দিয়া প্রকৃত জন-শিক্ষা সম্ভব নহে। জন-শিক্ষা বলিতে আমি বুঝি (১) বিদ্যা-বিষয়ক শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা, (৩) অর্থনৈতিক শিক্ষা ও (৪) ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা।

নিরক্ষর দেশবাসীদের মধ্যে বিদ্যা-শিক্ষার প্রচলন যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। বিদ্যা মানুষের অন্ধত্ব ঘুচাইয়া তাহাকে নূতন করিয়া পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করায়—অনেক ভ্রম ও কুসংস্কার বিদ্যার প্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়। কিন্তু সকল নিরক্ষরকে বিদ্যাদান দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হয়ত সম্ভব নহে। আর তাহা না হইলেই যে অন্য উপায়ে অশিক্ষার অন্ধকার প্রচুর পরিমাণে দূর করা যায় না তাহা নহে।

সাধারণতঃ গ্রামের নিরক্ষর বয়স্ক ব্যক্তিরা দিবাভাগে কার্য্যরত থাকে, এ জন্য তাহাদের শিক্ষার জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা ছাড়া উপায় নাই। অনেক স্থলে দেখিয়াছি, নৈশ বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় না। সাধারণ বিদ্যালয় হইতে এই ধরণের বিদ্যালয়ের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের হওয়া উচিত। শুধু পুস্তক পাঠ ও অঙ্ক কষিতে দিলেই চলিবে না; ইতিহাস, ভূগোল, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, পল্লীস্বাস্থ্য, অর্থনীতির মূল সূত্র এবং দেশের সকল প্রকার অবস্থা সম্বন্ধেও জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। নানা প্রকার চার্ট, গোলক, মানচিত্র, আলোকচিত্র ব্যবহার করিলে নৈশ বিদ্যালয়গুলি চিত্তাকর্ষক হয় এবং জ্ঞান বিস্তার ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত করিতে বিশেষ সাহায্য করে। চেষ্টা করিলে এই নৈশ বিদ্যালয়গুলিকে শুধু জ্ঞান-প্রচারের নয়, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম-

জ্ঞান প্রচারেরও কেন্দ্র করিয়া তোলা যায়। হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণনা করিলে সকলেরই মন ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষা গ্রামবাসীদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামের স্বাস্থ্যই ভাল নয়। স্বাধীন দেশে উন্নত বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে পানামা যোজকের পার্শ্ববর্তী মহা অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলিও স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হয়। আর আমাদের দেশে স্বাস্থ্যকর গ্রামগুলিও দিনের পর দিন অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এ কথা সত্য যে, গ্রামবাসিগণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইলে দেশের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে। গ্রামস্থ জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। মুখে এবং আলোকচিত্র-সহযোগে ম্যালেরিয়া বসন্ত কলেরা প্রভৃতি রোগের কারণ, চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগকে প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশু-পালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামবাসীদিগকে সম্মিলিত ভাবে জঙ্গল পরিষ্কার, জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার, রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার করিতে শিখাইতে হইবে।

অর্থনৈতিক শিক্ষা—কৃষকেরা আজ ঋণভারে জর্জ্জরিত; এই ঋণের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাহাদের মুখে আবার হাসি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, তাঁহাদের অর্থনৈতিক শিক্ষা-বিধানের প্রয়োজন বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে। কৃষকদিগকে সঞ্চয়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে—তাহাদের মধ্যে বিজ্ঞান-সম্মত কৃষিতত্ত্ব এবং কৃষি-কার্য্যের উন্নততর প্রণালী সমূহের প্রচার করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপনে কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। কৃষকদিগের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের নানা দিক দিয়া এত পথ রহিয়াছে যে, তাহার বিস্তৃত আলো[illegible]স্থানে হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে। উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান কর্ম্মীরা কার্য্যারম্ভ করিলে ক্রমে সকল পন্থাই তাহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইবে।

তার পর, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া আমাদের দেশে কোন শিক্ষাই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। জীবনের মূলে ভগবদ্‌ভক্তি না থাকিলে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়। ধর্ম্মের ভিত্তিতে জন-শিক্ষার আদর্শ গঠিত হওয়া উচিত। তাই বলিয়া জন-শিক্ষার আদর্শের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি-প্রণোদিত কোন সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাবের স্থান হওয়া উচিত নয়। জন-সমাজে ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতে হইবে। স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রকৃত আস্থাবান হইয়াও যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় প্রীতির বন্ধন থাকা সম্ভবপর গ্রামবাসীদিগকে সেই শিক্ষা দিতে হইবে। এককালে আমাদের দেশে ধর্ম্মভাব প্রচারের একটা বড় উপায় ছিল কথকতা ও যাত্রা। এখন কথকতা ও যাত্রা ক্রমশঃই আমাদের পল্লীজীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এগুলির পুনঃপ্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

লোকশিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহার কোন কথাই হয়ত নূতন নয়। সকলেই হয়ত স্বীকার করিবেন যে, এই সকল বিষয়ে এবং এই প্রণালীতেই এ দেশে লোকশিক্ষা হওয়া উচিত। কিন্তু প্রধান অন্তরায় কর্ম্মীর অভাব। শুধু সুশিক্ষিত শিক্ষক হইলেই চলিবে না, শুধু ত্যাগী লোক হইলেও চলিবে না। চাই চরিত্রবান, উৎসাহী, ত্যাগী, বিশ্বাসী মানুষ—মানবের অন্তরে ভগবান বাস করেন এবং ছোট বড়, উচ্চ নীচ, সকলেরই অনন্ত উন্নতি সম্ভবপর এই বিশ্বাস যাহাদের অন্তরে জীবন্ত ভাবে বর্ত্তমান এমন মানুষ। এরূপ লোক-শিক্ষক আমি দেখিয়াছি এবং যাহাতে এই শ্রেণীর লোক-শিক্ষক আরো প্রস্তুত হয় তজ্জন্য ভগবানের নিকট আকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেছি। দুইজন কর্ম্মীর কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। "অবনত জাতির উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি" স্থাপিত হইবার ২০ বৎসর পর অধিকতর ব্যাপক উদ্দেশ্য লইয়া "জনসেবামণ্ডলী" নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। যিনি প্রথমোক্ত সমিতির প্রাণ হইয়া ৩০ বৎসর ইহার সেবা করিয়াছেন, জনসেবামণ্ডলীরও কর্ণধার তিনি। তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি,

যে, তপশীলভুক্ত জাতিসমূহের মধ্যে তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে, নিজেদের পরমাত্মীয় পরিজন বলিয়া মনে করে। আবালবৃদ্ধবনিতার তিনি প্রিয়। পিতাপুত্রের কলহ তিনি মীমাংসা করিয়া দেন, পতি বিপথগামী হইলে স্ত্রী তাঁহার সাহায্য চাহেন। শত শত বালক-বালিকার তিনি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে আদর্শ লোকশিক্ষক বলিয়া মনে করি। বিদ্যায় কিন্তু তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ।

জনসেবামণ্ডলীর আর একজন কর্ম্মীর কথা এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি। তিনি মুসলমান। ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা তীব্র। তিনি সত্যাগ্রহী, গত সত্যাগ্রহ আন্দোলনে জেল খাটিয়াছিলেন। প্রথম যখন তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তখন তাঁহার সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, পিতা ও ছোট ভাই দিনমজুরী করিয়া পরিবার চালান, জ্যাঠা মহাশয় তাহাকে খাইতে দেন। তিনি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে শতাধিক ছাত্রছাত্রী। আরো দুইজন শিক্ষকের সাহায্যে তিনি বিদ্যালয়টি চালাইতেছেন। সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত তিনি ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেন, কোরাণ শিখান। প্রায় ২৫টি ছাত্র রাত্রেও তাঁহার সঙ্গে স্কুলগৃহে বাস করে এবং প্রাচীন কালের ব্রহ্মচারী স্নাতকের ন্যায় তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করে। স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোকসাধারণের উপর তাঁহার আশ্চর্য্য প্রভাব। সম্প্রতি তিনি স্বগ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের চোরদিগের সংশোধনের জন্য এক সভা করিয়াছেন। যাহারা চুরি করে, ধরা না পড়িলেও গ্রামবাসীরা জানে তাহারা চোর। গ্রামবাসীদিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তিনি বলিয়াছেন, 'আমরা সকলেই জানি চোর কাহারা। আপনারা সকলে প্রতিজ্ঞা করুন, আর তাহারা চুরি করিতে চাহিলে আপনারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবেন।' সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। আশা করি এই চোরের দল তাহাদের এই দুষ্ট ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইবে। দূর পল্লীগ্রাম হইতে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কয়েক দিন "জনসেবামণ্ডলীর" আশ্রমে থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি চোরদিগের সভার অধিবেশন আছে বলিয়া থাকিতে চাহেন নাই। দেশে গিয়া কয়েকটি টাকা চাহিয়া তিনি আমাকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। আমি টাকা পাঠাইয়াছি, কিন্তু কিছু দেরী হইয়া গিয়াছিল। টাকা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অন্যত্র হইতে টাকা পাইয়া তিনি লিখিয়াছেন, "আপনি টাকা পাঠান নাই বলিয়া আমি দুঃখিত হই নাই। অন্যত্র হইতে আমি টাকা পাইয়াছি। খোদার উপর যাহাদের নির্ভর, খোদা তাহাদের অভাব দূর করেন। আমাকে লিখিলেই আমি এখন কয়েক দিনের জন্য কেন্দ্রীয় আশ্রমে আসিয়া বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারি।"

এই শ্রেণীর ভগবদ্বিশ্বাসী, উৎসাহী, তেজস্বী, ত্যাগী কর্ম্মীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, দেশে ততই প্রকৃত লোকশিক্ষা বিস্তারলাভ করিবে এবং দেশের প্রকৃত মুক্তির দিন তত নিকট হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর কর্ম্মী যথেষ্ট পরিমাণ তৈরী না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা লোকশিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহের সহিত প্রবৃত্ত হইব না, তাহা হইতে পারে না। আমাদের, বিশেষতঃ শিক্ষক সম্প্রদায়ের, এ বিষয়ে গুরুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্য যে কত গুরু, সপ্তাহ পূর্ব্বে বিল অঞ্চলে লব্ধ আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা হইতে আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন। অনেকে হয়ত জানেন, গোপালগঞ্জের বিল অঞ্চল অতি[illegible] উর্ব্বরা। এ অঞ্চলে প্রচুর ধান্য জন্মে। এই বৎসরেও এই অঞ্চলের লোকেরা প্রায় সকলেই উদর পূর্ণ করিয়াই খাইতে পাইতেছে। কিন্তু টুঠামান্দ্রা অঞ্চলের লোকদের মুখে আমি একটা আতঙ্কের ছায়া, সম্মুখে একটা বিপদের সম্ভাবনায় ভীত—দেখিয়া আসিয়াছি। এই অঞ্চলে এই সময়ে চাষ-আবাদ করিয়া আউস ও আমন ধান বপন করা হয়। কিন্তু এ বৎসর অকালে অতিবৃষ্টি হইয়া বিল ডুবাইয়া ফেলিয়াছে। কৃষকদের মন হইতে আগামী শস্য ফলাইবার আশা লুপ্ত হইয়াছে। তাহারা বলিল, এরূপ অকালে অতিবৃষ্টি সে অঞ্চলে গত [illegible] বৎসরে

হইয়াছে বলিয়া কেহ জানে না। অনুসন্ধানে জানিলাম, ১৪।১৫ হাজার টাকা খরচ করিয়া একটা খাল কাটাইলে জমিতে এরূপ জল জমিতে পারিত না, নিয়মিত ফসল উৎপাদনে এরূপ বাধার সৃষ্টি হইত না। গবর্ণমেণ্ট নাকি প্রস্তাবিত খাল খননের জন্ম ১২ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, মাত্র আড়াই হাজার টাকা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট চাহিয়াছেন। এই আড়াই হাজার টাকা চাঁদা করিয়া তোলা তেমন কষ্টসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, পূর্ব্বে অবগত হইলে এই আড়াই হাজার টাকা আমি অগ্রিম দিয়া পরে চাঁদা আদায় করিয়া উঠাইয়া লইতাম। তাহারা বলিল, তাহাদের কোন নেতা না থাকায় এ চিন্তা তাহাদের মনেই আসে নাই, এবং এই বৎসরেই যে এরূপ অতিবৃষ্টি হইবে তাহাও তাহারা কল্পনা করে নাই। এই অঞ্চলে হাই স্কুলের সংখ্যা অনেক। উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব নাই। কিন্তু শুধু একটু দূরদৃষ্টির অভাবে আগামী বৎসর লক্ষ লোকের অন্নাভাবের ব্যবস্থা হইয়া রহিল।

আপনাদিগকে আমি অনুরোধ করি, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যাশিক্ষা দানের কার্য্যের বাহিরে আপনারা জনসাধারণের সুখদুঃখ সম্বন্ধে আরো বেশী করিয়া মনোযোগী হউন, সম্মুখে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ আসিতেছে, আপনাদের ছাত্রদিগকে যদি আপনারা দেশ, জাতি ও মানবতার সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহেন, তবে এই গ্রীষ্মাবকাশে প্রত্যেক ছাত্রকে সাধ্যমত নিজ গ্রামে লোকশিক্ষা বিস্তারে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্টা করুন। পূর্ব্বোল্লিখিত চতুরঙ্গ লোকশিক্ষার প্রথম তিনটি বিস্তারের অনেক সহায়তা এই ছাত্রদল দ্বারা হইতে পারে। কি জাতীয়তাবাদী কি আন্তর্জাতীয়তাবাদী সকল মতাবলম্বী নেতাগণই জনজাগরণ কামনা করেন। ছাত্রগণ যে মতাবলম্বী হোক না কেন, এই জনজাগরণ আনয়নে সাহায্য করিলে প্রকৃত জনসেবা, দেশসেবা করা হইবে। বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত হইলে জনগণের সুপ্ত ও মুগ্ধ মন জাগ্রত হইয়া স্বগ্রামের হিতচেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে চিত্তের বিস্তারের সহিত স্বদেশ ও অবশেষে বিশ্বমানবের হিতার্থে চিন্তা ও চেষ্টা করিতে শিখিবে। এই শিক্ষাও লোকশিক্ষারই অঙ্গ। কিন্তু প্রথমে গ্রামবাসীর নিজ স্বার্থ, গ্রামোন্নয়ন ইত্যাদির প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা বিস্মৃত হইলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা। পূর্ণজাগ্রত না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ স্বার্থ ভুলিতে পারে না। ভোলার প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাহাও বলা কঠিন। অতএব জনসমাজকে নিজ স্বার্থের দৃষ্টিকোণ হইতে ক্রমে বিশ্বমানবতার স্বার্থের বিষয়ে অবহিত করিতে হইলে, তাহাদের সাধারণ স্বার্থের প্রতি অবহিত হইয়া, সহানুভূতিশীলভাবে তাহাদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণের প্রচেষ্টা দ্বারা প্রথমে তাহাদের হৃদয় জয় করিতে হইবে। তার পর জাতীয়তাবাদের বা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শ ক্রমে তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলে তাহা জনগণের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। উপদেষ্টরূপে গেলে উচ্চ আদর্শের প্রচারক কখনই জনগণের মন আকৃষ্ট করিতে পারিবেন না। জনগণের দরদী বন্ধু, তাহাদেরই একজনরূপে নিজকে প্রমাণ করিতে পারিলেই ক্রমে গ্রামবাসীদের মধ্যে উচ্চ আদর্শের বীজ বপন করা সম্ভব হইতে পারে। এই কথা লোকশিক্ষা বিস্তারকারী ছাত্রদলের প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ রাখিয়া নিজ ব্যবহার, ভাষা ও চিন্তা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। গ্রীষ্মাবকাশের প্রারম্ভে আপনারা নিজ ছাত্রদলকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে ও সাধ্যমত তাহাদের সহকর্ম্মীরূপে কাজে নামিতে পারিলে আপনারা নিজ ছাত্রদের প্রতি, দেশ ও মানবতার প্রতি, আপনাদের গুরু কর্ত্তব্যসাধনে সফলকাম হইবেন এই আমার বিশ্বাস।*

* গত ২০শে এপ্রিল নিখিল বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সম্মেলনে পঠিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দান

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের একদল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মানুষ একটা ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই সমাজবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের আর একদল বলেন, কথাটা হয়ত ঠিক, কিন্তু ধর্ম দ্বারা মানুষের ক্ষতিই হইয়াছে বেশী। পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে ধর্মের নামে মানুষে মানুষে এত মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে যে, শেষোক্ত সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদল উহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই মনে হইবে না। বস্তুতঃ পৃথিবীতে ধর্ম একটি নয়, একাধিক। প্রত্যেক ধর্মের ধারক এবং বাহকগণ ধর্মের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বাদ দিয়া যখন শুধু আচার-অনুষ্ঠান লইয়াই মাতিয়া উঠে, তখনই দেখা দেয় ধর্মের গ্লানি। আচার-সর্ব্বস্বতা হইতেই ধর্মের গ্লানি জন্মে এবং ধর্মের এই গ্লানিই পরিণত হয় ধর্ম-বিদ্বেষের বীজে। পৃথিবীতে যখনই কোন দেশে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' কোন এক সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ধর্মকে সত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সত্যের সন্ধানই আমরা পাইয়া থাকি। আজ হইতে একশত সাত বৎসর পূর্ব্বে ধর্মকে গ্লানি মুক্ত করিবার মহান্ উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া বদ্ধ জলাশয়ের মত পঙ্কিলতায় আবিল হইয়া উঠিয়াছিল তখন তাহাকে আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধন হইতে মুক্তি দিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন অমিতাভ গৌতমবুদ্ধ। ইহুদীধর্মে যখন গ্লানি প্রবেশ করিয়াছিল, তখন যিশুখৃষ্টের আবির্ভাব হইয়াছিল। তেরশত বৎসর পূর্ব্বের আরবরা যখন প্রকৃত ধর্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পুতুল-পূজাকে পরিণত হইয়াছিল, তখনই ইসলামের বাণী লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন হজরত মহম্মদ। বৌদ্ধধর্মের পতনের যুগে আমরা পাইয়াছি অদ্বিতীয় জ্ঞানবীর শঙ্করাচার্য্যকে। হিন্দুধর্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণের জন্যই প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। 'ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ হইয়াছে। এই বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ ধর্ম-জগতে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছিল, প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল এমন একজন মহান পুরুষের আভির্ভাব যিনি সকল ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের অখণ্ডত্ব নিজের জীবনের সাধনাদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ। বস্তুতঃ ধর্মজগতে ইহা এক বিপুল বিপ্লবের-পূর্ব্বাভাষ। ধর্মজগতে এই বিপ্লবের বাণী-মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষিরূপে আবির্ভূত হইলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

পৃথিবীতে বিপ্লব অভিনব বা ভয়ের কিছুই নয়, বিপ্লব শুধু বিবর্ত্তনের একটা দ্রুততর গতি মাত্র। বিবর্ত্তনের গতিপথ যখন প্রতিক্রিয়াশীলতার শত বাধায় বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে, তখন বিবর্ত্তনেরই অন্তর্নিহিত শক্তি প্রবল বেগে ধাক্কা দিয়া সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া "চরাচর প্লাবিয়া বহিয়া" নিজের গতিপথকে বাধামুক্ত করিয়া লয়। ধর্ম সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছে, প্রত্যেকের আবির্ভাবের সঙ্গে গড়িয়া উঠিয়াছে এক-একটি নূতন ধর্ম। এইরূপে একের পর আর ধর্মের সংখ্যা যেমন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল তেমনি সমস্ত ধর্মের গ্লানি স্তূপীকৃত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিল। এইরূপে সমাজ-বিবর্ত্তনের রথচক্র যখন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল, তখন সর্ব্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী লইয়া আসিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি শুধু বাণীই মানুষের জন্য আনেন নাই, নিজের জীবনের সাধনার দ্বারা সমস্ত ধর্মের তাত্ত্বিক একত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন। মানুষ নিজ নিজ ধর্মের [illegible] তান

অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও যে কি ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তাহার জীবন্ত আদর্শ। ইহা যদি ধর্ম্ম-জগতে বিপ্লব না হয় তবে বিপ্লব বলিতে আর কি বুঝায় আমি জানিনা—ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই মানুষ যদি সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে, তবে মানব-সমাজের অগ্রগতির জন্য ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিপ্লব আর কিছুই হইতে পারে না।

একদিক হইতে দেখিতে গেলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নূতন কোন ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, আবার আর একদিক হইতে দেখিতে গেলে তিনি এক মহান্ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্ম শুধু সমস্ত ধর্ম্মের Synthesis নয়, ইহাকে বলিতে পারা যায়—Religion of humanity—মানবতার ধর্ম্ম। বস্তুতঃ ধর্ম্মকে তিনি জীবনের মস্তবড় একটা আর্টে পরিণত করিয়াছেন। জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে—aspect-এর মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া মানবীয় বিবর্ত্তনের বহুবিধ সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায় আর্ট (Art) আমাদিগকে সেই শিক্ষাই দিয়া থাকে। যুগের ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াই মানুষকে চলিতে হয়, কারণ মানুষ তো abstract individual নয়, মানুষ concrete individual অর্থাৎ Social Animal—সমাজের মধ্যে বাস করিয়াই তাহার পূর্ণতা, তাহার জীবনের সার্থকতা! কর্ম্ম, জ্ঞান এবং প্রেম মানুষের একই সংস্কৃতি বা culture-এর বিভিন্ন দিক মাত্র। মানুষ এই সংস্কৃতি-বিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মানুষকে নূতন করিয়া নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। মানুষের এই যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাহাই আর্ট। যে উপায়ে সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মানুষ নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে, আত্মোন্নতির সঙ্গে দেশের ও দশের উন্নতি বিধান করিতে পারে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট এবং এই আর্টই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

মানুষের সঙ্গে মানুষের, তাহার সমাজ ও রাষ্ট্রের এবং সমগ্র বিশ্বমানবের অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ। সুতরাং ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক সব দিক দিয়াই নিজেকে গড়িয়া তোলা মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য। কি ভাবে জীবনকে এই ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় তাহারই যে শিক্ষা-ব্যবস্থা—যে training তাহাই মানুষের ধর্ম্ম-সাধনা। এই ধর্ম্মসাধনার পথের জন্য বহুদিন মানুষকে প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছে—দীর্ঘদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে নূতন পথের সন্ধানের জন্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই মানবতার ধর্ম্ম সাধনার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন—মানুষকে দিয়াছেন উন্নততর ধর্ম্মের সন্ধান। যে ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতি মানুষকে তিনি দিয়াছেন তাহা সার্ব্বজনীন। মানুষকে ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান। ইহাই যুগধর্ম্ম—The spirit of the age. উপনিষদের তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষি মানুষকে যে স্বরাজ্য লাভের বাণী শুনাইয়াছেন ইহা তাহারই সহজ ও সরল পথ। উপনিষদের ঋষি যে 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিত দুরত্যয়া' দুর্গম পথের কথা শুনাইয়াছেন, ইহা সেই দুর্গম পথ নয়—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ইহাকে rational basis-এর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।*

* ইটচুনা (হুগলী) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম-উৎসবে পঠিত।

শিকল

(গল্প)

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

শেষটায় একদিন অবস্থা সত্যিই সঙ্গীন হয়ে উঠল। বাউরীর ছেলে ব'লে স্বরূপ একেবারে পচে যায় নি। অন্তত তুলসীর মতো মেয়ের চোখে সে মুদ্দোফরাস হতে পারে না। আর যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে কোন্ আক্কেলে তুলসী এসেছিল তার সঙ্গে ঘর করতে? সে কি তাকে সেধে এনেছিল? ওই ত চেহারা—তার আবার দেমাক কত!

সেধে আনে নি সে সত্যি কথা। কিন্তু তা-ই বলে তুলসী কি মানুষ নয়? গরুছাগলের মতো মারধোর খেয়ে মরবে সে স্বরূপের হাতে? আজই না-হয় তিনকুলে কেউ নেই তার—কিন্তু মেদিনীপুরের মণ্ডলের মেয়ে ত সে! নেহাৎ ভাগ্যের দোষেই না কলকাতায় ঝি-গিরি করতে এসেছিল। তবু তা-ই ছিল তার ভালো। কতো কথাই বলেছে স্বরূপ তখন তাকে—দেখিয়েছে কতো আশা! নইলে কি দরকার ছিল তার একটা আধা-সাঁওতালীকে বিয়ে করবার?

দুজনারই এ-সব সমালোচনা ইদানীংকার। তিন বছর আগে কিন্তু স্বরূপের কাছে তুলসীর চেয়ে সুন্দর সারা কলকাতায় আর কেউ ছিল না, আর তুলসীও স্বরূপকে পেয়ে হাতে স্বর্গই পেয়েছিল।

আর এখন তুলসীকে দেখে স্বরূপের গা ঘিন্ ঘিন্ করতে থাকে। আবার তুলসীও স্বরূপের পুরু ঠোঁটে জংলী মানুষের ইতরামোই দেখতে পায়।

অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে ছোট ছোট চোখগুলো জলজলে করে বলেছিল স্বরূপ: "থাকতে লারবি ত আছিস ক্যানে? তুর মতো গণ্ডা গণ্ডা বাঁদী রাস্তায় পড়ে আছে!"

তাড়ির টক গন্ধে ঘরটা ভুরভুর করছিল—কাপড়ের এক মুঠো আঁচল নাকে ঠেসে তুলসী জবাব দিলে: "আর তোর মতো মুদ্দোফরাস? ঘরের বাঁধে তার ঠাঁই হয় কখনো?"

স্বরূপ কাপড়ের খুঁটটা কোমরে জড়িয়ে টলমলে পায়ে এগিয়ে এলো তুলসীর দিকে। আজ যদি খুনই না করে ফেলতে পারে সে তুলসীকে, তবে তার নাম স্বরূপ বাউরী নয়। তুলসী তার ভাঙা টিনের সুটকেসটা একহাতে টেনে নিয়ে আরেক হাতে প্রাণপণে একটা ধাক্কা দিল স্বরূপকে। দু'তিনটা পাক খেয়ে স্বরূপ মেঝেতে পড়ে গেল। তুলসী তখন রাস্তায়।

কালীঘাটের নাটমন্দিরেই পড়ে থাকবে তুলসী—না হয় ভিক্ষে করেই চালাবে যদ্দিন না একটা কাজ খুঁজে পায়—তবু স্বরূপের সঙ্গে আর নয়। জেদের উপর নয়—ঠাণ্ডা মাথায়ও অনেক সময় ভেবে দেখেছে তুলসী স্বরূপের সঙ্গে তার থাকার কথা। থাকা অসম্ভব। হাজার হোক ছোট জাত ত স্বরূপ—ওর সঙ্গে তুলসীর মিল হতে পারে কখনো? যেম্নি নোংরা স্বভাব তেম্নি তার চলাফেরা। হবে না? বাঙালী-ইত নয়, যত সব বুনো সাঁওতালের জাতভাই! সমস্ত আক্কে[illegible] গিয়ে ঢুকল শেষটায় তুলসীর বাঙালী রক্তে। মাগো, কি বাঁচা-টাই না সে বেঁচেছে আজ যে ছেলেটা তার নেই! ও আপদ বেঁচে থাকলে সারাটা জন্ম মাতালের কীল চড় খেয়ে মরতে হ'ত তার—থাকতে হ'ত মুখ গুঁজে ওই নরককুণ্ডে! একা পেটে কি চিন্তা এখন তার? দুবেলা খাটবে যেখানে, দুমুঠো খেতে পাবেই।

লোক পেলে দুমুঠো খেতে দিতে কেন, বাড়ি ছেড়ে দিতেও কলকাতায় তখন অনেকে রাজী। বোমার ভয়ে লোক পালাচ্ছে। কলকাতার জীবনের পালা প্রায় স্ত্রীভূমিকাবর্জ্জিত। অলিতে-গলিতে হু-হু করে মেসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। স্ত্রীরা যখন চাক[illegible] জীবন

পরমায়ুতত্ত্ব

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল

সংসারে সকলই দীর্ঘায়ু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়। নিতান্ত বিকৃতমস্তিষ্ক না হইলে কেহই মরিতে ইচ্ছা করে না। শোকে দুঃখে যাহাদের জীবন দুর্বহ হয় তাহারাই নিজের মৃত্যু কামনা করে। প্রাণিগণ যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিনই তাহাদের পরমায়ু। ভগবান কাহারও আয়ু নির্দিষ্ট করিয়া দেন না। কোন্ প্রাণী কতদিন বাঁচে তাহার একটা গড় নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

অনেকের ধারণা সত্যযুগে মানুষ হাজার হাজার বছর বাঁচিত। অনেক মুনিঋষি নির্জনে বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া কাটাইয়াছেন পৌরাণিক গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে। আমাদের পঞ্জিকাতে কোন্ যুগে মানুষের দেহ কত হাত দীর্ঘ ও কয় সহস্র বৎসর তাহাদের পরমায়ু ছিল তাহার তালিকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিশ্বাসী লোকেরা তাহা সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। দু-একটি সাধু-সন্ন্যাসী দেখিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের শিষ্যদিগের মুখে শুনিয়াছি বাবাদের কেহ শত শত, কেহ আটশত বছর হিমালয়ের নিভৃত গহ্বরে তপস্যা করিয়াছেন। তাঁহাদের দাঁত পড়িয়া আবার উঠিয়াছে, চুল পাকিয়া আবার কাঁচা হইয়াছে ইত্যাদি।

বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। বেদ-মন্ত্রগুলি অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল। বেদ পাঠ করিলে জানা যায়, সে কালের ঋষিরা শত বৎসর পরমায়ু লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন। ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রের রচয়িতা ঋষিরা দেবতাদিগের নিকট দীর্ঘজীবন লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দেবতাদিগের নিকট বর চাহিতে কেহই কম চায় না। মানুষের যত বছর বাঁচিয়া থাকা সম্ভব তত বৎসর বাঁচিয়া থাকার জন্যই তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের রচয়িতা ঋষি অগ্নিদেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—হে অগ্নি [illegible]কে দূরীভূত কর। আমাদের অন্ন বর্দ্ধিত কর। আমরা যেন শোভন পুত্র-পৌত্রাদি সমন্বিত হইয়া শত হেমন্ত অর্থাৎ শত বৎসর জীবিত থাকিয়া সুখ ভোগ করি।

বি দ্বেষাংসীনুহি বর্ধয়েলাংমদেম শতহিমা সুবীরাঃ॥ ৬।১০।৭

আর একটি মন্ত্রে আছে,—শতবর্ষ-জীবী পুত্র যেন আমরা পোষণ করি। (১।৬৪।১৪) আরও একটি মন্ত্রে একজন ঋষি কন্যার পতির শতবর্ষ পরমায়ু লাভের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতি জীবাত শরদঃ শতম্। ১০।৮৫।৩৯

সুতরাং পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও একশত বৎসর পরমায়ু লাভ করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া ঋষিরা মনে করিতেন।

কঠোপনিষদে আছে বালক নচিকেতা পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য যমের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। নচিকেতা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য যমকে কয়টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বালক আত্মজ্ঞান দানের উপযুক্ত পাত্র কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য যম তাঁহাকে কতকগুলি প্রলোভন দিয়াছিলেন। যম প্রথমে ধনৈশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইলেন। নচিকেতা তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যম জানিতেন মানুষের দীর্ঘজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা অতিশয় প্রবল। তিনি নচিকেতাকে বলিলেন—

শতায়ুষঃ পুত্র-পৌত্রান্ বৃণীষ
বহূন পশূন্ হস্তি হিরণ্যমশ্বান্।

হে নাচিকেতঃ, তুমি শতবর্ষ-জীবী পুত্র পৌত্র, বহু পশু, অশ্ব, গজ ও হিরণ্য প্রার্থনা কর।

শত বৎসর পরমায়ু যদি তৎকালে অত্যধিক না হইত তবে যম তাহা নচিকেতার পক্ষে লোভনীয় মনে করিতেন না।

রামায়ণ মহাভারতের যুগেও শত বৎসর পরমায়ু দীর্ঘ বলিয়াই বিবেচিত হইত। তখনও 'শত বৎসর পরমায়ু হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করা হইত। ইহা হইতে মনে হয়, প্রাচীন কালে যাহারা একশত বৎসর বাঁচিত তাহাদিগকে লোকে দীর্ঘজীবী মনে করিত। অনেকে হয়ত একশত বৎসর অতিক্রম করিয়া যাইত। এখনও যায়। প্রাচীন অনেক গ্রন্থে জীবজন্তুর কি পরিমাণ পরমায়ু হইতে পারে তাহার তালিকা পাওয়া যায়। 'শব্দমালা' গ্রন্থে মানুষের ও হস্তীর পরমায়ুকাল ১২০ বৎসর ৫ দিন, অশ্বের ৬২ বৎসর, কুকুরের ১২, গো ও মহিষের ২৪ বৎসর নির্ধারিত হইয়াছে। মৃগ ও শূকরের যত দিন পর্যন্ত ছয়টি দন্ত না হয় তত দিন পরমায়ু। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও মানুষের পরমায়ু ১২০ বৎসর নির্ধারিত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে ভারতবাসীর পরমায়ু অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ দারিদ্র্য, অনাহার। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য ভোজন ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাসহেতু ভারতবাসীর পরমায়ু হ্রাস পাইতেছে। দিন দিনই আমাদের জীবনী শক্তি কমিয়া যাইতেছে। শরীরের ব্যাধি সংরোধক ক্ষমতা লোপ পাইতেছে। দরিদ্রতা দূর না হইলে ভারতবাসীর পরমায়ু বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। স্বাধীন দেশে জনসাধারণের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য বহু তদন্ত, আলোচনা ও উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। আমাদের বিদেশী শাসনকর্তারা এই সম্বন্ধে সময় ও অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক বোধ করেন না।

জন	পরিপাক শক্তি শতকরা			নিদ্রা গড়ে	প্রাতে শয্যা ত্যাগ
	ভাল	মধ্যম	খারাপ		
(১) ৬১০ (৮০—৯০ বৎসর)	৯১,	৯,	০	৮ ঘণ্টা	৬টা
(২) ২০২ (৯০—১০০ বৎসর)	৯৪,	৬,	০	৮ ঘণ্টা	৬টা
(৩) ৫২ (১০০ ঊর্ধে)	৯৮,	২	০	৭ ঘণ্টা	৬টা
৮৬৪					

এই তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেরই হজমশক্তি খুব ভাল ছিল। স্থূল ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষীণ ব্যক্তিরা অধিক দিন বাঁচে। তাহাদের দেহ দীর্ঘ, ওজন একমণ উনত্রিশ সেরের অধিক নয় এবং দেড় মণেরও কম নয়। দীর্ঘজীবন লাভের জন্য সুনিদ্রা প্রয়োজন। পূর্বোক্ত শতবর্ষজীবীরা রাত্রি ১০টার সময় নিদ্রা যাইতেন, ৬টার সময় গাত্রোত্থান করিতেন। আট ঘণ্টার কম তাঁহারা নিদ্রা যাইতেন না। পূর্বোক্ত ৮৬৪ জন দীর্ঘজীবীর মধ্যে শতকরা ৫০ জন ছিলেন নিরামিষভোজী। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা অল্প পরিমাণ মাংস ভোজন করিতেন। তাঁহারা কেহই ধূমপান করিতেন না। শতকরা ৫০ জন সামান্য পরিমাণ মদ্য পান করিতেন। ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় হানিকর। মদ্যপান হইতেও নাকি ধূমপান স্বাস্থ্যের অধিকতর অনিষ্ট করিয়া থাকে। Dr Arthur Macdonald লিখিয়াছেন,

"It appears to be shown that tobacco affects the heart and the vascular system and shortens life. The fact that a few drunkards and habitual smokers live to an advanced age are the exceptions which prove the rule. Seventy per cent of the centinarians had never smoked."

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই ধূমপান করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও সিগারেট খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিড়ির কাটতি বাড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে। যাঁহারা ৮০ বৎসর হইতে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন তাহাদের অধিকাংশই গড়ে ২৪—২৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ মানুষকে সংযমী করে ও যথেচ্ছাবিতার পথ রুদ্ধ করে।

ডাক্তার মেকডনেল্ড লিখিয়াছেন তিনি নানা দেশের শত শত দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন সাধারণতঃ দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদিগের সন্তানই দীর্ঘজীবী হয়।

মাতাপিতার জীবনীশক্তি সন্তান লাভ করে। অল্পায়ু ব্যক্তিদিগের সন্তানও অল্পায়ু হয়। বিবাহ কালে পাত্র ও পাত্রীর মাতাপিতার পরমায়ুর কথা অনুসন্ধান করা একান্ত প্রয়োজন। ডাক্তার মেকডনেল্ড পর্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন স্বগোত্রে বিবাহ সন্তানের পক্ষে অনিষ্টকর। সন্তান দীর্ঘজীবী হয় না। হিন্দুরা এই তথ্য বহু পূর্বেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও স্বগোত্রে বিবাহ অনিষ্টকর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিবাহের গড় বয়স						
জন	পিতা	মাতা	পূর্বপুরুষ দীর্ঘজীবী শতকরা	স্বগোত্রে বিবাহ %.	ভিন্ন গোত্রে %.	সন্তানগণ
৬১০ (৮০—৯০)	৩৪	৩০	৯৮	৩	৯৭	৬টি
২০২ (৯০—১০০)	৩৩	৩০	৯৯	৪	৯৬	৭টি
৫২ (১০০—তদূর্ধে)	৩২	২৯	৯৯	৩	৯৬	৬টি

ধনী ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অল্পায়ু হয়। তাহার কারণ নীরা পান আহার সম্বন্ধে অনেক সময়ই অমিতাচারী। তাহারা শ্রমবিমুখ ও অলস। শ্রমবিমুখতা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। ধনীরা যে অল্পায়ু হয় ইহা প্রকৃতিরই প্রতিশোধ।

ডাক্তার মেকডনেল্ড লিখিয়াছেন, "বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ ায় নয় হাজার লোকের বংশাবলী আলোচনা করিয়া ্থির করিয়াছেন যে, দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদিগের সন্তান দীর্ঘজীবী য়। পিতামাতার দেহের ধাত ও উন্নত স্বাস্থ্য ও ীবনীশক্তি বংশানুক্রমে সন্তান প্রাপ্ত হয়।" এই সম্বন্ধে াহারও মত ভেদ নাই।

In a study of the Hyde geneology involving 8,797 sons that a tendency to longivity was an inheritable racteristic which probably consists in a strong conution and through the superior facundity of the long ed, tends to improve the vigar and vitality of coming neration.

যে সকল দেশের আদমসুমারীর বিবরণ প্রকাশিত হয় ়ই সকল দেশের অধিবাসীদের তুলনায় ভারতবাসীর রমায়ু যে সর্বাপেক্ষা কম নিম্নোক্ত তালিকা হইতে তাহা মাণিত হইবে।

হল্যাণ্ড	৬৫	বৎসর গড়ে বাঁচে
অষ্ট্রিয়া	৬৩	,,
আমেরিকা	৬১	,,
নরওয়ে	৬১	,,
ইংলণ্ড	৬০	,,
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৬০	,,
জার্মানি	৬০	,,
সুইজারল্যাণ্ড	৬০	,,
ফ্রান্স	৫৪	,,
ইটালি	৫৪	,,
জাপান	৪৫	,,
চীন	৩৫	,,
ভারতবর্ষ	২৭	,,

ভারতবর্ষের পরমায়ু অধিকাংশ পাশ্চাত্য জাতিদিগের পরমায়ুর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ফ্রান্স ও ইটালির অর্দ্ধেক। জাপানের লোকের পরমায়ু এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীনেরও উন্নতি হয় নাই।

কিছুদিন পূর্বে British Medical Association-এর অন্তর্ভুক্ত ৪০০ শত অভিজ্ঞ ডাক্তার ৮৬৪ জন দীর্ঘজীবী ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা, তাহাদের খাদ্য ও জীবনধারণ-প্রণালী আলোচনা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকার বৃত্তান্ত সকলেই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার Arthur Macdonald M. D. সেই সকল বিবরণ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং তাঁহার নিজের সংগৃহীত বিবরণ সকল বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি সাধারণ তথ্য প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে অনেক কৌতুহলজনক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়।

পূর্বোক্ত ৮৬৪ জন দীর্ঘজীবী ব্যক্তিদিগের মধ্যে ৬১০ জন ৮০-৯০ বৎসর, ২০২ জন ৯০-১০০ বৎসর এবং ৫২ জন শতবর্ষের অধিক জীবিত ছিলেন। কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁহাদিগের কি বিশেষত্ব ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জন বৎসর	দেহাকৃতি শতকরা			উচ্চতা	গড়ে ওজন
	স্থূল	ক্ষীণ	মধ্যম	গড়ে ফিট	মণ সের
(১) ৬১০ (৮০-৯০)	১২	৩৮	৫০	৫.৪	১—২৯
(২) ২০২ (৯০-১০০)	৯	৫১	৪১	৫.৪	১—২৭
(৩) ৫২ (১০০ বেশী)	১৮	৪৫	৪৭	৫.৮	১—২৯

ডাক্তার মেকডেনেল্ড ইউরোপ ও আমেরিকার বহু-

সংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তির পরমায়ুর পর্যালোচনা করিয়া বিভিন্ন কালের লোকদিগের পরমায়ুর একটি গড় নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	শতকরা যত লোক ৬০ বৎসর বাঁচিয়াছে	শতকরা যত লোক ৮০ বৎসর বাঁচিয়াছে
প্রাচীন কালে	৭৬	৩৬
১৫শ—১৬শ শতাব্দী	৫৮	১২
১৭শ— ,,	৬৫	১৩
১৮শ— ,,	৭২	১৯
১৯শ— ,,	৭৬	২০
২০শ— ,,	৮১	২৫

প্রাচীনকালে লোক দীর্ঘায়ু হইত। ১৫শ হইতে ১৬শ শতাব্দীতে লোকের আয়ু হ্রাস পাইয়াছিল। তাহার পর আয়ু বৃদ্ধি হইতে থাকে। আধুনিক কালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরমায়ু প্রাচীন কাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা স্বাস্থ্যোন্নতির সাহায্য করিতেছে।

ডাক্তার মেকডোনেল্ড পাশ্চাত্য দেশের কোন্ ব্যবসা লোক গড়ে কত বৎসর বাঁচে তাহারও একটি তালিক প্রস্তুত করিয়াছেন। এই তালিকাটি কৌতূহল-উদ্দীপ সন্দেহ নাই।

	গড়ে বৎসর
সঙ্গীত ব্যবসায়ী	৬২
ঔপন্যাসিক	৬৩
চিত্রকর ও ভাস্কর	৬৬
ধর্মযাজক	৬৬
সাহিত্যিক	৬৭
রাজনীতিজ্ঞ	৭১
বৈজ্ঞানিক	৭২
ঐতিহাসিক	৭৩

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মতে সবলের প্রতি যখন কোন দোষারোপ করা হয় তখন বলা হয় লোকটা করুণার পাত্র। আমি সেরূপ মত মোটেই পোষণ করি না। বোধ হয় আমি সাহিত্যিক নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে, এ সব কথার কোন মূল্য নাই। করুণা আবার কিসের? এক গালে চড় মেরেছে, যদি ফিরিয়ে দিতে পারলাম ত ভালই, নতুবা গালখানার উপর হাত বুলাতে বুলাতেই ফিরে এসেছি। আমি যা এখানে বললাম তাই অনেক স্থলেই করেছি, আবার কোথাও চড় খেয়ে কিছুই না করতে পেরে এক দম চম্পট দিয়েছি। ভুখিয়া দূর হ'তেই দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু শরীরে এমন শক্তি ছিল না যে, দু-মাইল পথ চলে গিয়ে খাবার কিনে অথবা কারো কাছ থেকে খাবার চেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করি। ঠিক এমনি সময় সামনে পথের ডান দিকে পড়ল একটা বাগানবাড়ী। বাগানে ফল ছিল না বটে; কিন্তু বাগান ছিল চমৎকার সাজানো। পাইন, লম্বা বট যা দিয়ে শীতপ্রধান দেশে টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের পোষ্ট করা হয়। তার পর ছিল কতকগুলি ফুলের গাছ। ফুলের গাছগুলি ফুলে একেবারে ছেয়ে রয়েছে। কিন্তু ফুল তো আর খাবার নয়, তাই হাতখানা পেছন দিকে আপনা থেকেই চলে আসছিল।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বাগানে একজন শ্বেতকায় তখন উর্ধ আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো যেন [illegible] দেখছেন

আর তাঁর রূপ নয়ন ভরে পান করছেন। এ সব ভাওতা সাহেব পাদরী কেন ব্রাহ্মণ পাদরী অথবা মোল্লা ঠাকুরদের একটা রোগবিশেষ তা আমি ভাল ক'রে জানি। তাই ধ্যানমগ্ন আত্ম-সমাহিত মহাপ্রাণের ধ্যান ভাংতে আমার কোনরূপ সংকোচ হলো না। সামনের দিকে গিয়ে বললাম, "মহাশয় ক্ষমা করবেন, আমি ক্ষুধার্ত, এক টুকরা রুটি এবং এক গ্লাস জল পেলে ভাল হয়।"

ধ্যান ভেংগে মহা ঋষি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "হে পাপী, মহাপ্রভুকে স্মরণ কর।"

আমি বলিলাম, "আমি পাপী নই, তুমি পাপী, রুটি দিবে কিনা বল?"

"এখানে পাপীর জন্য রুটি নেই।"

আমার রাগ তখন পন্চমে উঠেছে. এক রকম যেন আত্মবিস্মৃতই হ'য়ে পড়েছিলাম। তাই যা মুখে এল তাই বলে লোকটাকে গাল দিয়ে বাগান থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। উত্তেজনায় আমার সমস্ত অবসাদ যেন কেটে গেল, এগিয়ে যেতে আমার যেন আর মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না।

রাগের মাথায় এক দমে দু-মাইল হেঁটে এক খোজার বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খোজা ইস্নেসেরী শ্রেণীর লোক। সিয়া মত মেনে চলে। সিয়ারা সুন্নিকে খুব কমই পছন্দ করে। হিন্দুদের মোটেই হিংসা করে না, একটু করুণার চক্ষেই দেখে এবং নিজের মতবাদে টেনে আনবার চেষ্টা করে। খোজা ভদ্রলোক প্রথমেই আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। নাম শুনেই তিনি বুঝলেন আমি হিন্দু অর্থাৎ করুণার পাত্র। আমাকে বসতে দিয়েই ঘরের ভিতর চলে গেলেন, এবং এক বদনা জল এনে আমাকে হাত-মুখ ধুতে বললেন। আমার হাত-মুখ ধোয়া হ'য়ে গেলে একখানা বড় থালাতে করে ভাত, রুটি, ডাল, সব্জি, দই এবং কিছু মিষ্টি এনে আমার সামনে ধরলেন। আমিও আর বিলম্ব না ক'রে সেই উত্তম খাদ্য গরুর মত গিলতে লাগলাম। আমি যখন খাদ্য গিলছিলাম তখন তিনি আমাকে একটি গল্প শোনাতে লাগলেন। গল্পটি বলার পূর্বে আমি অন্য একটি কথা বলব। বেনারস নগরীতে কোন এক [illegible]লোক ছিলেন। তিনি যখন খেতে বসতেন তখন তাঁকে গল্প না শোনালে খাওয়া হতো না। আজ আমাকে সেই বেনারসী ধনীর সমপর্যায়ের লোক ভেবে মনে বেশ হাসি পাচ্ছিল।

এবার সেই খোজা ভদ্রলোকের বলা গল্পটি বলছি। আল্লার দরবারে এক ছিল ফেরেশ্তা। ফেরেশ্তার চরিত্রে দোষ ছিল। আল্লার কাজ-কর্ম বেশি থাকায় স্বর্গধামে অসৎ লোক যে বাস করছে সেই সংবাদ আল্লার মোটেই জানা ছিল না। হঠাৎ পাপী ফেরেশ্তার কথা আল্লার মনে হবামাত্রই তাকে ডেকে এনে আল্লা বললেন, 'তুই বেটা মহাপাপী, স্বর্গে থাকার উপযুক্ত নস্। তুই দুনিয়ায় গিয়ে পাপ ভোগ কর্।' তখন ফেরেশ্তা আল্লার পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। আল্লা দয়াপরবশ হ'য়ে তাকে বললেন, তুমি দুনিয়ায় গিয়ে সমস্ত দুনিয়া পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করবে। এতে তোমার বেশ পরিশ্রম হবে। পাহাড়-পর্বত ডিংগাতে তোমার নাক হ'তে যত দীর্ঘনিশ্বাস বইবে সেই দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি আমি শুনতে পাব। যখন তোমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্বার আর শক্তি থাকবে না তখনই আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব। দুনিয়াতে তোমার নাম হবে মুসা পীর। দুনিয়ার লোকে তোমার কথা মন দিয়ে শুনবে এবং তোমাকে বেশ শ্রদ্ধা করবে।

খোজা ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, তুমিও আল্লার পিয়ারা, তোমার যখন পাপ ক্ষয় হ'য়ে যাবে তখন তোমাকেও আল্লা ডেকে পাঠাবেন। তোমার চরিত্র-দোষ হবার খুবই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মনে রেখো, যদি চরিত্রদোষ হয় তবে স্বর্গের দরজা তোমার চিরদিনের তরে বন্ধ হ'য়ে যাবে।

খোজা ভদ্রলোকের গল্পটি যে একদম বানানো তা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। কারণ মুসাপীর ছিলেন একজন প্রফেট। তিনি কখনও স্বর্গচ্যুত হন নি সে কথাই বোধ হয় পশ্চিম দেশীয় ধর্ম পুস্তকগুলি বলে থাকে। যা হোক গল্প গল্পই, তবে তাতে বেশ ভাল উপদেশই আত্মগোপন করেছিল। খোজা ভদ্রলোককে তার খাদ্য এবং শিক্ষা-সূচক গল্প বলার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে বের হ'য়ে পড়লাম।

ইচ্ছা করলেই ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকতে পারতাম, কিন্তু থাকি নি। না থাকবার একমাত্র কারণ হলো তিনি যে আবার কোন্ কাহিনী বলতে সুরু করবেন তার ঠিক নেই। সে জন্যই আরও একটু এগিয়ে গিয়ে শহরটি দেখতে বড়ই ইচ্ছা হলো।

শহরে উপস্থিত হ'য়ে দেখলাম, একটি ইউরোপীয়ও সেখানে বাস করে না। শহরের কাছে কোথায় ইউরোপীয়রা বাস করে, সে সন্ধান নেবার ইচ্ছা হলো না। রাত্রে এক গুজরাতী পেটেলের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। লোকটি সজ্জন, স্বদেশবাসী একজন পর্যটককে পেয়ে তিনি খুব খুসী হয়েছিলেন এবং রাত্রেই অনেককে ডেকে এনে একটা সভা করেছিলেন। কথা প্রসংগে অনেক কথাই আমাকে বলতে হয়েছিল। উপসংহারে আমি বলেছিলাম, আপনারা তো এদেশে কুকুর বিড়ালের মতই থাকেন, আপনাদের মান ইজ্জত কিছু আছে বলে আমার মোটেই মনে হয় না, অতএব ভারত হ'তে আমদানী সাম্প্রদায়িকতা ভুলে গিয়ে এক জাত এক ধর্ম মেনে নিয়ে আপনাদের কাজ করা উচিত। আপনাদের যদি কোন ধর্ম থাকে তবে তা হবে ইউরোপীয়দের সমান হওয়া, এর বেশি কিছুই নয়।

এখানকার ভারতীয়দের অনেকের ধারণা ইউরোপীয়রা অবশ্যই নরকে যাবে। ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেও যাদের সেই সনাতন ভাবধারা অটুট রয়েছে তাদের কাছে বলার মত আমার আর কিছু ছিল না। অনেকে এসব কুকথা কুবার্তা প্রকাশ্যেই বলতেছিল। তারা বলছিল, হিন্দু এবং সিয়াগণই একমাত্র স্বর্গে যাবার অধিকারী,আর কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না। সিয়াদের মতে সুন্নিরা কখনও স্বর্গে যেতে পারে না। সুখের বিষয় সভাতে কোন সুন্নি মুসলমান ছিল না। আফ্রিকাতে সুন্নি মুসলমান এবং আহামদীয়া শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা বাংগালীর সংখ্যার সমান বললেও ভুল হয় না। এদের সংখ্যা অংগুলিতে গোনা যেতে পারে। যে কয়জন পাঠান হালে কেনিয়া এবং উগাণ্ডাতে প্রবেশ করেছে তারা শিখদেরই সংগে সমাজ ক'রে থাকে।

সভা শেষ হ'য়ে গেলে আমি পেটেল মহাশয়কে বললাম, এতদূর এসেও যে আপনাদের এখনও কোন পরিবর্তন হয় নি এ বড়ই দুঃখের বিষয়। পেটেল আমাকে নীরবে এমনই একটি ইংগিত করলেন যাতে ক'রে আমি বুঝতে পারলাম, এখানকার লোক সবাই অশিক্ষিত এবং দুনিয়ার কোন সংবাদই রাখে না।

পর দিন প্রাতে মবিলীর দিকে রওয়ানা হলাম। মবিলীর দিকের পথটা খুবই ভাল এবং প্রায়ই সমতল ভূমি। দুদিকে আখের ক্ষেত। মাঝে মাঝে তুলার ক্ষেতে তুলাও পেকে রয়েছিল। আমি ঠিক্ করলাম এর পর থেকে আর কোন ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকতে যাব না। ইণ্ডিয়ানদের বাড়ীতে থাকলে নিগ্রোদের কথা মোটেই মনে আসে না। ইণ্ডিয়ানদের বাড়ীতে শুধু শোনা যায় নিগ্রোরা চোর আর ডাকাত। কিন্তু ভারতবাসী যেমন ক'রে ব্যবসায়ের ভেতর দিয়ে দিনে ডাকাতি করেন সেরূপ নিগ্রোরা কিছুই করে না।

এ দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই সুন্দর। সমতল ভূমির ওপর হঠাৎ একটা পাহাড় যেন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। পার্বত্য ভূমির ওপর সমতল ভূমি প্রায়ই উঁচুনীচু। উঁচু-নীচু ভূমির উপর ভাল পথ থাকলে সাইকেল চলে ভাল। আমার সাইকেলও পুরা দমেই চলছিল। কিন্তু একটা কথা সকল সময়ই মনে রাখতে হবে, শরীরে যদি শক্তি না থাকে তবে কিছুই ভাল লাগে না। ক্রমাগত ঘেমে ঘেমে আমার শরীর দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল। তাই মাঝে মাঝে নিগ্রোদের বাড়ীতে গিয়ে একটা পুরা ঘরই ভাড়া করে শুয়ে থাকতে হতো। এরূপ করে কয়েক দিন শুয়ে থাকলেই শরীরে ফের শক্তি ফিরে আসত।

এ দিকের নিগ্রোরা প্রায়ই সভ্য। সুদানীদের সংগে এদের বেশ সম্বন্ধ রয়েছে। নিগ্রো এবং আরবে মিলে যে জাতের সৃষ্টি হয়েছে তারাই হ'ল সুদানী। সুদানীদের মাঝে গ্রীক, তুরুক এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতের রক্ত মিশে যাওয়ায় এদের শরীরের রং মাথার চুল বেশ তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা বলতে বাধ্য হব যার জন্য আমি বাস্তবিকই অনুতপ্ত, কিন্তু না বললে আমার ভ্রমণ-কথা সার্থক হয় না। সুদানীরা বড়ই ধূর্ত এবং পরশ্রীকাতর। নিগ্রোদের [illegible] অত্যাচার

করতে কোন দিনই কোনরূপ কসুর করে না। পথে কয়েকটি সুদানীর সংগে দেখা হয়েছিল, এমন কি কয়েক রাত্র এদের বস্তিতেও থেকেছি। বস্তিগুলি আমাদের দেশের পশ্চিমানুচলের গ্রামের মতই। সুদানী গ্রাম-প্রথা এবং ভারতীয় গ্রাম-প্রথা একই ধরণের। গ্রামের মাঝেই গৃহপালিত জীব রাখা হয় এবং গ্রামের অদূরেই চাষের ভূমি। নিগ্রোরা সেরূপ কিছু করে না। যারা একটু সভ্যতা লাভ করেছে তারাই গ্রামে কোনরূপ গৃহপালিত জীব রাখা দূরের কথা মুরগী পর্যন্ত রাখে না। এতে গ্রাম থাকে পরিষ্কার। তার পর গ্রামের বাইরে খামার-ঘরগুলি রয়েছে, তথায় গিয়ে তারা মজুরী করে মাত্র। প্রকৃত পক্ষে যে সকল নিগ্রো একটু সভ্য হয়েছে তারাই বৈজ্ঞানিক প্রথা গ্রহণ করেছে। বৈজ্ঞানিক প্রথা মতে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয় অতি সত্বর। নিগ্রোদের এই সুবুদ্ধি দেখে আমার আনন্দ হয়েছিল। যে সকল সোমালী আমার সংগে কথা বলত তাদের কথার আভাসে বুঝলাম এদের মাঝে সামাজিক দোষ এত প্রবেশ করেছে যে এরা রাষ্ট্র বলে কিছুই বুঝতে রাজি নয়। তারা শুধু জানে টাকা এবং টাকার বদলে যতটুকু সুখ-সুবিধা ভোগ করা যায় তাই ভোগ ক'রে যাওয়া, এর বেশি নয়।

এদেশে এক প্রকার লতা হয় তা প্রায় সোমালীরাই রাত্রের বেলা একটা-দুটা ক'রে খায়। এই লতাগুলি খেলে ঘুম মোটেই হয় না এবং কামভাব সকল সময়ই প্রবল থাকে। আমি একদিন দুটি লতা খেয়ে তার কুফল বেশ অনুভব করেছিলাম। যে সমাজে এরূপ জিনিস প্রকাশ্যে সর্বসাধারণ ব্যবহার করে সেই সমাজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমাদের দেশে গাঁজা ভাং এবং চরস প্রচলিত আছে, তা বলে সেই নেশাগুলিকে আমরা ভাল বলি না। গাঁজাখোরকে আমরা কোন মতেই সম্মান প্রদর্শন করি না। কিন্তু সোমালীরা এই শ্রেণীর লতা যৌবন অবস্থাতে প্রকাশ্যেই ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এতে তাদের মা-বাবা অথবা অভিভাবকরা কেউ বাধা দেয় না।

[illegible]র খাদ্য আমাদের মতই। ডাল, রুটি, ভাত এদের প্রধান খাদ্য। মাছ-মাংস পেলেই খায়। মাছ-মাংসের পাক-প্রণালীও আমাদের মতই। এদের হোটেলে এবং বাড়ীতে খেতে বেশ ভালই লাগত, কিন্তু এদের অমানুষিকতা মোটেই পছন্দ হ'ত না।

এদিকে পথে কোন ইণ্ডিয়ানদের বাড়ীতে না থেকে সোমালী এবং নিগ্রোদের বাড়ীতে থেকে বেশ আরামই পেয়েছিলাম। ইণ্ডিয়ানরা হাজার কথা বকিয়ে এক পেয়ালা চা দেবে, সোমালী এবং নিগ্রোরা যদি দেবার হয় তবে কিছু না বকিয়েই খাদ্য দিয়ে শোবার স্থান দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়বে। এরূপ সদ্ব্যবহার পেয়েও সোমালীদের বিরুদ্ধে যে কিছু বলতে হ'ল সেজন্য পর্যটক সমাজ দায়ী নন, দায়ী আমি। আমার এটা একটা মস্ত দোষ।

ছয় দিন পথে কাটিয়ে মবিলীতে গিয়ে পৌছি। এখানে অনেক ইণ্ডিয়ান বাস করে। খোজা শ্রেণীর লোকই বেশি। মাথায় তুর্কী টুপি, পরনে পাজামা, পায়ে শুধু জুতা। বেনেরা ধুতি পরে পথে অর্ধ-উলংগ অবস্থায়ই হাটে। অনেক ইউরোপীয়ান প্রতিবাদ করেছে, শুনেছি এখানে পাজামা, ধুতি, লুংগি প্রচলন যাতে বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করা হবে। আমি একদিন একজন ইউরোপীয়ের সংগে এ সম্বন্ধে আলাপ করেছিলাম। তিনি আমাকে কথায় জবাব না দিয়ে কতকগুলি দৃশ্য দেখালেন, যা দেখে আমার মত লোকেরও সরমে মাথা নত করতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে আমি আর প্রতিবাদ করি নি এবং সেদিন থেকেই এ বিষয়ে প্রতিবাদ করা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। সেই ইউরোপীয় ভদ্রলোকই একদিন আমাকে তার কাছে বসিয়ে এমন কতকগুলি কথা বলে-ছিলেন তারও প্রতিবাদ আমি করি নি এবং কখনও প্রতিবাদ করতে পারব না।

যাকে আমরা তুর্কী টুপি বলি, ইউরোপে যাকে ফেজ বলে, আরবগণ তাকেই বলে তুপি কাফের অথবা কাফের তুপি। নিগ্রোরা সেই তুপি বা টুপি ব্যবহার ক'রে বলে তাকে কাফের টুপি বলা হয় না। তার পুরাতন ইতিহাসও আছে। যে কোন মতেই হউক বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকাতে এই টুপির নাম হয়েছে কাফের টুপি। এই

টুপি আমাদের দেশী ভাইরা ব্যবহার ক'রে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেন।

একটা কথা আছে সেই কথাটা হ'ল দুর্বলের সকল কাজেই সবল ব্যক্তিরা দোষ দেখতে পায়। ভারতবাসীরা ফেজ মাথায় দেয় সেজন্য ভারতবাসীদের ইউরোপীয়গণ ঘৃণা করে, কিন্তু মিশরের লোক সেই ফেজ ব্যবহার করলে কোন দোষই হয় না। অবশ্য মিশরের লোকও বৃটিশ পূর্ব-আফ্রিকাতে ফেজ মাথায় দিয়ে কোনও ইউরোপীয় সমাজে মিশতে সমর্থ হন না এ কথাটা সকলেই জানে। মিশরের লোক কিন্তু এ অঞ্চলে পাজামা পরে পথে-ঘাটে বের হয় না। আমরা পরাধীন দেশের লোক প্রথম কথা, দ্বিতীয় কথা হ'ল আমরা বিদেশে গিয়ে একটুও বদলাব না, এতেই ইউরোপীয়গণ আমাদের দেখে ক্ষেপে যায়। দক্ষিণ-আফ্রিকার পেগ বিলটার প্রথম কারণই হলো তাই। যারা ইউরোপীয় প্রথামতে চলে তাদের প্রতি বুয়রগণ অনেকটা সদয় তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

মবিলীতে পৌঁছে আমি স্থানীয় হিন্দু ধর্মশালাতে আশ্রয় নিই। ধর্মশালার চাকরটি হিন্দি জানতো, তারই মারফতে সেই স্থানের অনেক সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। নিগ্রো চাকরটি যেরূপ সুন্দর ভাবে পাক ক'রে দিত তাতে মনে হ'ত সে একজন ওস্তাদ পাচক।

মবিলী সমুদ্রতীর হ'তে অন্তত তিন হাজার ফিট উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। উত্তর দিকে পর্ব্বতমালা উঁচু হ'য়ে বেশ একখানা কালো চাদরের মত মবিলীর লজ্জা নিবারণ করছে, দক্ষিণ দিকটা এক দম ফাঁকা। পূর্ব দিকটা ক্রমে নীচু হ'য়ে সাগরে গিয়ে ডুব দিয়েছে আর পশ্চিম দিকে কংকর-ভূমি ধীরে ধীরে নেমে গিয়ে মিশেছে বালু-সমুদ্র সাহারাতে। স্থানটি আমার কাছে ভারি ভালো লাগল। ধর্মশালার পাশেই একটি আমগাছ। আমগাছের এক দিকে আম পেকে রয়েছে আর অন্য দিকে নূতন বোল হচ্ছে। দিনের বেলা বেশ গরম, রাতে বেশ একটু শীত অনুভব হয়। জল পরিষ্কার।

উত্তরে পাহাড়টির দিকে আমি অনেক সময় চেয়ে থাকতায়। এতে অনেকে ভাবত পাহাড়ের ওপর আমার একটা ঝোঁক পড়েছে। অনেক ইণ্ডিয়ান এসে আমাকে জানাত পাহাড়ে পরী আছে। একটা হাতী এবং একটা অজগর সাপ নাকি পর্বতমালা পাহারা দিয়ে থাকে। নানা লোক নানা কথা বলতে লাগল। এখানে যেমন আমি ভূত-প্রেতের কথা উঠিলেই বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিই সেখানেও তেমনি ভাবে ভূত-প্রেতের কথা বাজে বলে উড়িয়ে দিতাম।

এ দিকের ইণ্ডিয়ানরা নিগ্রোদের ঠকিয়ে বেশ ধনী হয়েছে। ধনীরা প্রায়ই বাজে কথায় বিশ্বাস করে। ভূত পরী এ সবে ওদের বেশ আস্থা ছিল। যখন তারা শুনল আমি এ সব কথা বাজে বলে উড়িয়ে দিই তখন কয়েক জন ধনী এসে আমাকে বলল যদি আমি পাহাড়ের মাঝে রাতে একাকী কাটিয়ে আসতে পারি তবে তারা ভূত-প্রেত কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি তাদের প্রস্তাবে রাজি হলাম। পরের দিন একখানা ট্রাকে ক'রে কতকগুলি দেশবাসী সন্ধ্যার সময় আমাকে একটা পাহাড়ের কাছে রেখে চলে গেল।

আমার কাছে কোনরূপ অস্ত্র ছিল না, কারণ আমি ভাল করেই জানতাম এ অঞ্চলে হিংস্র জীবের মাঝে হাতী ছাড়া আর কোন জন্তু-জানোয়ার নেই। সে জন্য পাহাড়ে গিয়েই কাঠ কুড়িয়ে একটা প্রকাণ্ড আগুন জ্বালিয়ে তার কাছে বসে ব্লেকের একখানা ডিটেকটিভ নভেল পাঠ করতে সুরু করেছিলাম। রাত যখন বারটা তখন ধনীদের দেওয়া উত্তম খাদ্য আহার ক'রে, উত্তম বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার মাথায় প্রচুর কোয়াশা পড়ে মাথা ভিজে গেছে। একটুও দেরী না ক'রে নিকটস্থ ঝরনায় গিয়ে স্নান ক'রে, গরম জল ক'রে চা খেলাম। যখন পাহাড়ের গহ্বরগুলি দেখতে বেরুই তখন অনেক দূরে মোটর আসছে বলেই মনে হয়েছিল।

সে দিকে বেশিক্ষণ না তাকিয়ে প্রকাণ্ড একটা গুহাতে প্রবেশ করলাম। গুহাতে তখনও অন্ধকার জমে রয়েছিল। টিপ বাতি দিয়ে গুহাটা পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, সেখানে মাত্র কয়েক দিন আগে কে বা কাহারা পাক ক'রে খেয়েছে এবং হাড়ি ও অর্দ্ধদগ্ধ কাঠ চারি [illegible] বিক্ষিপ্ত

অবস্থায় রেখে গেছে। মনে মনে একটু হাসলাম, ভাবলাম এমন স্থানে দিন কাটান যেতে পারে যদি প্রচুর খাদ্য এবং পড়বার বই থাকে সঙ্গে। আরও অনেকগুলি গুহা দেখে মনে হ'ল এ অনচলে প্রচুর চূণা-পাথর থাকার ফলেই গুহাগুলি আপনি হচ্ছে, আপনি বুজে যাচ্ছে। চূণা-পাথরের ধর্মই হ'ল তাই। চূণা-পাথর যখন যেখানে মাটির উপর ভেসে উঠে তখন তথায় কোনরূপ বিষাক্ত সাপ থাকতে ভালবাসে না অথবা হিংস্র জীবও নিকটস্থ স্থানের জল খেতে ভালবাসে না। এখানকার চূণা-পাথর পচে গেছে বলেই বন্য জীব এ দিকে আসে না। চূণা-পাথর যদি না পচে কঠিন পাথরের আকারে থাকে তবে কিন্তু বন্য জীবরা এসে আরও বেশি করে বসবাস করে, এ কথাটাও মনে রাখতে হবে। মালয় দেশের ইপো শহর তার প্রমাণ।

সূর্য উঠার সংগে সংগেই মথিলী হ'তে ধনীর দল আমার মৃতদেহ খুঁজে বের করার জন্য এসে যখন দেখল আমার কিছুই হয় নি তখন তারা বেশ আনন্দই প্রকাশ করল। কিন্তু এদের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, আমার মৃত দেহ দেখলেই তারা সুখী হ'ত।

(ক্রমশ)

শাদা কালো

(উপন্যাস)

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

প্রমীলা বলল: "ভাবিয়ে দিলে বৈ কি অসিদা!"

অসিত বলল: "কী হিসেবে?"

প্রমীলা বলল: "আমার মনে হচ্ছিল একটু আগেই যে তোমার আরতি দেবীর বাইরের পালিশ যতই থাকুক না কেন ভেতরটা তেমন চক্‌চকে নয় হয়ত—নৈলে—রাগ কোরো না ভাই—নিজের হোস্টকে নিয়ে কি কেউ এ ভাবে হাসাহাসি করে? কিন্তু এখন হয়ত ব্যাপারটাকে খানিকটা দেখতে পারছি তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে। এ রকম মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করা সত্যিই কঠিন—মানছি।

নির্মল বলল: "মরুক গে। তার পর কী হ'ল বল?"

* * *

কফিতে চুমুক দিয়ে অসিত শুরু করল ফের: "পট পরিবর্তন করবার সময় এল। কাল—এর দিন পনের বাদে। স্থান—ডুমেল। আরতি পেশোয়ার থেকে গেছে কলকাতায় বেড়াতে দৌলতের মোটরে। ফিরে এল একা—[illegible]

প্রমীলা পাদপূরণ করল: "সেই prodigal son, চির-পরিচিত যাদু তোমাদের—মাসিমা—অমিতা—অসিদার পরিবেশে?"

অসিত একটু হাসল, বলল: "গ্রীক দার্শনিক বলেছেন শুনে থাকবি হয়ত নির্মলের কাছে যে, এক জলে মানুষ ডুবার স্নান করে না। কথাটা গভীর। কিন্তু এর একটা হিন্দুভাষ্য আছে, সেটা আরও গভীর: যে এক মানুষ ডুবার এক জায়গায় ফেরে না। আরো শাদা বাংলায় বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় যে, যাদুও ফিরল বটে—আর মাসিমা—অমিতা—অসিতদার মধ্যেও বটে—কিন্তু যে ফিরল সে-ও যেমন চিরপরিচিত যাদু ছিল না, তেমনি যাঁদের মধ্যে ফিরল তাঁরাও ছিলেন না ওর সেই পূর্বপরিচিত মাসিমা-অমিতা-অসিতদা।

নির্মল হেসে প্রমীলার দিকে তেরছ চাহনি হেনে বলল: "করছ কী মিলি! প্রোটেস্ট করো।"

প্রমীলা মুখ বেঁকিয়ে বলল: "ঢ—ঙ।"

নির্মল বলল: "ঢঙ হ'ল? ও যা বলল তার

নিহিতার্থ কী দাঁড়ায় একটু ভেবে দেখেছ কি? বলছে যে, এ চঞ্চল জগতে conservative অচলায়তনের মাটি কামড়ে যাঁরা চিরদিন প'ড়ে আছেন সেই তোমরা—খুড়ি মহিলারাও—বদলে যেতে পারো!"

প্রমীলা ভুরু কুঁচকে বলল: "কথা শুনলে গা জ্বালা করে।" অসিতের দিকে তাকিয়ে: "তোমার তো অনেক বৈশ্বমানবীকা সখী আছেন অসিদা, দিতে পারো তাদের কারুর সঙ্গে ওকে এক বার জুতে? দেখিই না সে-পক্ষিরাণীদের সঙ্গে পক্ষিরাজ ঠাকুর কদিন ঘরকন্নার জুড়িগাড়ি টানেন চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করতে করতে।"

অসিত হেসে বলল: "আহা, অত রাগতে আছে দিদি! এত দিনে এটুকুও বুঝলি নে যে তোদের আমরা যে নিন্দা করি সেটা আসলে হ'ল ব্যাজস্তুতিই বটে?"

"বিশ্বাস হয় না যে—" বলে প্রমীলা বেণী দুলিয়ে।

"তা হ'লে প্রমাণ দিতে হ'ল। ধর ধরশানদের সেরা ডি এল রায়কে। তাঁর স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন তত দিন সে সর্বংসহাকে নিয়ে রং-তামাশার কবির যে কতই ঘটা জানিসই তো? কখনো বা দুঃখ করা উদাস খাম্বাজে—" বলে গুনগুনিয়ে:

'দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে হ'লে আরো পরিচয়
উর্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়।
বরং শেষে মাথার রতন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন,
বিফল চেষ্টা বিফল যতন স্বর্গ হ'তে হ'ল পতন
রচেছিলাম যাহারে ভাবলাম বাহা বাহা রে!'

কখনো বা ঝাঁক করা না-তোয়াক্কা মল্লারে:

'তোমায় ভালোবাসি ব'লে তুমি বুঝি মনে ভাবো?
(যে) তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে ম'রে যাবো?
ডাকলে তোমার পাই নে সাড়া নেই কি কেউ আর
তোমা ছাড়া?
(এই) গোঁপজোড়াতে দিলে চাড়া
তোমার মতন অনেক পাবো।'

কিন্তু কে না জানে বল যে গভীরের দিকে তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিলো ঐ জীবনসঙ্গিনীরই অকাল মরণ? তখন কখনো বা বললেন কবিতায়:

হাস্য শুধু আমার সখা? দুঃখ আমার কেহই নয়?
হাস্য ক'রে অর্ধজীবন করেছি তো অপচয়।

কখনো বা গাইলেন আরো গভীর সুরে—গানে—যেখানে তাঁর জুড়ি ছিল না—যে:

সুখের কথা বলো না আর—বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি
দুঃখে আছি আছি ভালো—দুঃখেই আমি ভালো থাকি।

অতএব আশ্বস্ত হ দিদি, আশ্বস্ত হ, কারণ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি যে, তোর পাখা হওয়ার কল্পনায় ওর উর্বশীর কথা মনে ক'রে রোমাঞ্চ হয় না—বড় জোর পিপীলিকার কথা মনে ক'রে হৃৎকম্প হয়।"

নির্মল করযোড়ে বলল: "আর থাক্ দৈবজ্ঞ ঠাকুর, ঢের হয়েছে অন্তর্যামিয়ানা।—না, সত্যি অসিত, তোর মুখে একেবারেই মানায় না এই ঘরোয়া ঘরকন্নার কথা: তাই এ অনধিকারচর্চা রেখে হাত দে সেই কাজে যা তুই পারিস্: বল্ ঘরহারানোর রোমান্স—শোনা আমাদের তোদের আশ্রমে এসে কী ক'রে গিন্নিপনা কমল মাসিমার।"

প্রমীলা বলল: "এতে আমিও, কিন্তু আমার নামে পতিব্রতা অপবাদ চাপাতে পারবে না ভাই। না ঠাট্টা নয় অসিদা—সত্যি কি মাসিমাও বদলে গেলেন নাকি তোমাদের আশ্রমে যাদু ফিরতে না ফিরতে ঐ বছরখানেকের মধ্যে?"

অসিত বলল: "গেলেন বৈ কি।"

প্রমীলা উৎসুক কণ্ঠে বলল: "কিন্তু ঠি কী ভাবে বলবে?"

অসিত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল: "বলতে বাধে একটু মিলি। না শোন্, রাগ করিস নে দিদি লক্ষ্মীটি। কেন বাধে একটু শুনলেই বুঝবি। এ সব কথা শুনতে হ'লে এসব বিষয়ে একটু দরদ চাই। কিন্তু একেলে মানুষের এ সবে শুধু যে দরদ নেই তা নয়—ঐ সঙ্গে সঙ্গে আছে এমন একটা বদ্ধমূল অশ্রদ্ধা যে—দাদুর একটা ঠাট্টা মনে প'ড়ে গেল—তাঁদের ওপর ক্ষোভ হ'ত খুবই যদি না দয়া হ'ত আরো বেশি।"

নির্মল হেসে বলল: "ঠাট্টাটা করেছিলেন তিনি কাকে রে?

অসিতও হাসল: "এক বৈজ্ঞানিককে, সেই যেবার এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় তাঁর সঙ্গে দেখা না? সেইবারেই জর্জ টাউনে এক সভায়।

প্রমীলা উৎসুককণ্ঠে বলল: "বলো না ভাই। বেশ লাগে এ-সব শুনতে।'

"সে ভারি মজা—বলবার মতনই বটে, একেবারে আচম্‌কা কি না! হ'ল কি, কুম্ভমেলায় জনসমাগমে অদ্ভুত সাড়া দেখে ক্ষেপে উঠলেন—দাদুর ভাষায়—আলোকপ্রাপ্ত ও আলোকপ্রাপ্তাগণ, বললেন—এত বড় ব্যাপক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রোটেষ্ট না করলে আলো লজ্জায় মুখ ঢাকবে, অতএব ডাকা হোক এক পেল্লায় ভাগবতভক্ত-ভগবান-নিবারিণী সভা, ধর্মের সেকেলিয়ানাকে একেলে যুক্তি-ধুনুরিরা তুলো ধুনে না দিয়ে আর জলগ্রহণ করবেন না কিছুতেই। দাদু বললেন হেসে: 'চলো দাদা, একবার দেখে আসি কোন্ চার্জে ওঁরা ভগবানকে পুলিপোলাও পাঠাবে ফের মরীয়া।'

"সভায় লোক হয়েছিল বটে!—'হবে না দাদা? খোদ ভগবানকে তুলো ধুনবে!—বললেন দাদু সভায় ঢুকেই ফিশফিশ ক'রে।

"দাদুর একদল ভক্ত শিষ্য ছিল, তারা তুলল তাঁকে জোর ক'রে বক্তৃতার মঞ্চে। দাদু সেখানে গদিয়ান হ'য়ে আমাদের দিকে থেকে থেকে নয়না হানতে লাগলেন মুচকে হেসে।

"সভায় কালাপাহাড়ি বাগ্মিতার বান ডেকে গেল দেখতে দেখতে—বলাই বেশি: কেউ বললেন: ভারত ডুবল ধর্ম ধর্ম ক'রে। কেউ রাগলেন: ভারত ডুবল ছুঁও না ছুঁও না ক'রে। কেউ বা কাঁদলেন: হায় ভারত, সায়েন্স ছেড়ে এখনো ভেল্কি মানো—তাই তো তোমার দুঃখে আজ শেয়াল-কুকুর কাঁদছে! কেউ বা হাসলেন: ভারত দেউলে হ'ল যত সব নিষ্কর্মা গেরুয়াপরা ভক্তদের উদারাত্মার সিধে জোগাতে (সভায় ঘন ঘন করতালি)—শেষে ক্লাইমাক্স এল যখন এক স্থূলকায় বৈজ্ঞানিক উঠে অকাট্য যুক্তি দিয়ে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে অজ্ঞানের হিমে ভয়ের কুয়াশা জ'মে যে-প্রাণহীন বরফের চাই গ'ড়ে ওঠে তারই নাম ভগবান্—যাঁর হাজারো বাঁধের দরুণ বুদ্ধির জাহাজ ষ্টীমার কিছুই চলতে পারে না। (সভায় পুনরায় অট্টহাস্য) 'আর'—বললেন বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক—'এই সাধু সন্নিসি পাণ্ডাপুরুত মোহান্তেই আরও প্রগতির স্পীডের দফা সারল—কেন-না এ বরফের অচলায়তন ওরা ভাঙতে দেবে না কিছুতে, আগলাবে শাস্ত্র পুঁথি তন্ত্র-মন্ত্রের প্রতিমা উঁচিয়ে।—কিন্তু' বললেন তিনি বজ্রনাদে টেবিলে ঘুঁসি মেরে—'এই সব নিষ্কর্মা প্যারাসাইটিক সাধুসন্তদের দিন ফুরিয়ে এসেছে—বিজ্ঞানের জয়জয়কারে অহঙ্কার তাঁদের খাবি খাচ্ছে—অতএব লেডীস অ্যাণ্ড জেণ্ট্‌লমেন, আপনাদের সবারই কর্তব্য একবাক্যে এই অহঙ্কার কুসংস্কার তথা ভণ্ডামির বিরুদ্ধে রেজলুশন পাস করা। আর সব আগে তাড়ানো চাই তাঁদের-যাঁরা সমাজের কোনো কাজেই লাগেন না শুধু এই জাঁক করা ছাড়া যে কেবল তাঁরাই ভগবানকে জানেন—ব'লে ভেংচি কেটে আওড়ালেন: বেদামি চাহং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।—' উঃ সভায় সে কী হাততালি।

"হঠাৎ উঠলেন দাদু—সবাই অবাক, কিন্তু দাদু গ্রাহ্যও করলেন না—বললেন: 'সভাপতি মহাশয় ও সভাপত্নী মহোদয়া—আমাকে দুটো কথা বলতে দিতে আজ্ঞা হয়—' (সভাপত্নী শুনে চেয়ারম্যানের স্ত্রী তো লজ্জায় রাঙা—লোকের হাসিতে) ব'লেই ফিরে সভার দিকে: 'আর হে আলোকপ্রাপ্ত ও প্রাপ্তাগণ! (সভায় এবার আরো হাসির সাড়া প'ড়ে গেল) সুফি কবি জলালুদ্দিন রুমির একটি কবিতা আপনাদের কর্ণগোচর করতে চায় এ দুর্ভাগা গেরুয়াধারী। কবিতাটি এই যে একদা জনৈক বর্ধিষ্ণু সিংহ সাহেব হাওয়া খেতে বেরিয়ে হঠাৎ এক কুয়োর পাড়ে হাজির। দেখেন—কুয়োর জলে আর এক সিংহসাহেব পরিসরে সমানই বর্ধিষ্ণু। (সবাই ঔৎসুক্যবশে একেবারে চুপ) সিংহসাহেব তো রেগেই আগুন। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে সম্মান তিনি কখনো করেন নি, নিজের কণ্ঠ-ল্যাবরেটরির নাদ ছাড়া আর কোনো নাদকে কখনো দেন নি সিংহনাদ নাম। (সভায় ফের হাসির টিটকিরি—'বৈজ্ঞানিক

মহাশয়ের মুখ লাল্‌চে') কারণ তাঁর এই এক বদ্ধমূল যে সিংহনাদাৎ পরতরং নহি।

যাহোক, বললেন দাদু আরো চেঁচিয়ে, কারণ সভায় একদল ছিল যারা এতে খুশি হচ্ছিল খুবই, 'এহেন সিংহ-সাহেব তো তাকালেন কুয়োর জলে রেগে টং হ'য়ে। বললেন ঘাড় নেড়ে সিংহল ভাষায়—সাবধান! (সভায় হাসি বেড়ে উঠল আরো) ওমা! নিচের সিংহ সাহেবও কেশরের কলার ফুলিয়ে সাড়া দিলেন সাবধান! আর ভদ্রতা রক্ষা করলে ভদ্রস্থ থাকে না: সিংহসাহেব খিঁচুলেন দন্ত। কিন্তু ও কী—ও-ও দাঁত দেখায় যে—কী দুঃশীল! গাঁক্—ইনি উঁচোলেন থাবা। ধমকের প্রতিধ্বনি এল—গাঁক্। এহেন পাপিষ্ঠের সাজা না দিলে মহতী বিনষ্টিঃ—তাই অগত্যা সিংহল ভাষায় তবে রে ব'লেই দিলেন সিংহসাহেব লাফ। ফল অনুমেয়। (হাততালি)

"সাধু ও সাধ্বীগণ! (ফের হাসির রোল ও করতালি) রাগ করবেন না যদি আমি বলি যে একথা বুদ্ধির বেলায়ও খাটে অক্ষরে অক্ষরে: অর্থাৎ জগৎটাকে স্থূল দেখেন তাঁরাই যাঁদের বুদ্ধির বহর আকার সদৃশঃ প্রাজ্ঞঃ (সভায় অট্টহাস্য বৈজ্ঞানিক লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু দাদু অকুতোভয়ে ব'লেই চললেন): যেহেতু জীবনের সাক্ষ্য সত্যিই এই যে যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—ন্যাবা যার হয় নি সে জগতটাকে হলদে দেখে না—জগতে যে রঙ ফেলবে সেই রঙই ফিরে আসে: সুন্দর দেখে সে-ই যার সৌন্দর্যবোধ আছে, অসুস্থ দেখেন তিনি যিনি নিজে মুমূর্ষু। নিজের মনে যাঁর আলো জ্বলে নি তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের চোখেও দেখেন কুসংস্কারের ছায়া, আত্মোপলব্ধির কোনো ঝঙ্কারই যাঁর প্রাণে জাগে নি তিনি সে-সব উপলব্ধির মেঘনির্ঘোষেও শোনেন অহঙ্কারের মুখরতা। (আরও ঘন ঘন হাততালি)

'গম্ভীর ও গম্ভীরাগণ! আজ আপনারা আরও কত যে শিখে গেলেন! জেনে গেলেন এখানে অনেক জাজ্জ্বল্যমান বক্তার মুখে যে জগতকে ধ্বংসের পথে রওনা ক'রে দিচ্ছে কি ধরণের ভক্তজ্ঞানী মনীষীদের আস্তিকতা। এ কথার প্রতিবাদ করব না আমি, কারণ, যাঁরা ক্রুসে ঝুলবার সময়েও বলেছিলেন: 'পিতা, যারা আমাকে হত্যা করছে তাদের ক্ষমা করো—তারা জানে না তারা কি করছে', যাঁরা গুণ্ডা জগাই মাধাইকেও আলিঙ্গন ক'রে বলেছিলেন 'মেরেছিস বেশ করেছিস শুধু একবার হরি বল্' এ জগতের ধ্বংসের জন্যে তাঁরাই দায়ী, না যাঁরা বুদ্ধি দিয়ে বারুদ, ট্যাঙ্ক, বোমা, গ্যাস তৈরি করছেন তাঁরাই দায়ী—এ বিচার আজ ভুক্তভোগীই করছেন কোনো বাইরের জজ জুরির দরকার নেই আর। আমি আজ শুধু বলব গীতার একটি প্রাচীন শ্লোকের কথা যে, অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। অবিশ্যি এ মুহ্যমানদের মধ্যে যে এ সভার বৈজ্ঞানিক বক্তা জন্তবঃগণ পড়েন না তা বলাই বেশি, কারণ তাঁদের ইষ্টদেবতার পুরাণেই তাঁদের রেহাই দিয়েছে এই ব'লে যে the present company is always excepted তাই আশা করি তাঁরা গীতাকারের বা গেরুয়াধারীদের বিরুদ্ধে ডিফামেশনের চার্জ আনতে রাতারাতি উকিলবাড়ি ছুটবেন না—' কিন্তু কথাটা তাঁর শেষ হ'ল না, বৈজ্ঞানিক লাঠিয়ালরা আর সইতে পারলেন না পড়লেন লাফিয়ে—সভায় বেধে গেল এক প্রচণ্ড কুরুক্ষেত্র—শেম্ শেম্, হিয়ার হিয়ার, থামো থামো, না না আমরা আরো শুনতে চাই—এই সব করতে করতে শেষটায় চেয়ার ছোড়াছুড়ির—একেবারে দক্ষযজ্ঞ।"

* * *

একটু থেমে অসিত বলল: "কিন্তু দাদু ঐ যে 'অজ্ঞানেন আবৃতং জ্ঞানে'র শ্লোকটি আড়লেন সেই অজ্ঞানের আবরণ নিদারুণ ব'লেই আমার দয়া মতন হয় তাঁদের 'পরে যাঁরা না জেনে গাল দেন ধর্মকে, যোগকে, করুণাকে।" বলতে বলতে অসিতের মুখে ফুটে ওঠে অনুকম্পার হাসি: "কেমন জানিস্। মাসিমার কথা দিয়েই বোঝাতে চেষ্টা করি কী বলতে যাচ্ছি। কারণ তাঁর খানিকটা জ্ঞান তো সত্যিই হয়েছিল। তবু সংস্কার আনে হাজারো পাৎলা আবরণ যাদের একটির নাম দায়িত্ববোধ। ভাবটা এই যে সংসার সত্যি আমরাই চালাচ্ছি। প্রতি পদে আমরা দেখি 'না বাঁধিতে ঘর হাটের ভিতর ভেঙে যায় এই সাধের মেলা'—তবু ক্রমাগতই সেই একই যুক্তি ফিরে ফিরে মাথা চাড়া দেয় যে, আমাদের মনই এ সংসারের [illegible] ব'সে।

"কথাটা অবান্তর নয়, কেন-না এই সব নিয়েই বাধত আমাতে মাসিমাতে। মাসিমার এই দায়িত্ববোধ হ'য়ে উঠেছিল যেন 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী'। তাই তো তিনি ঘুরেফিরে প্রায়ই বলতেন অমিতার বিয়ে না দিলে তিনি ভগবানকে সুস্থির হ'য়ে ডাকতে পারছেন না। সব আগে অমিতার বিয়ে দেওয়া তাঁর যে কর্তব্য, বলতেন মাসিমা প্রায়ই ভারিক্কি ভঙ্গিতে।"

'কেন মাসিমা?' বলতাম আমি, 'তুমি যখন ভগবানের কাছেই চাইছ শরণাগতি তখন শুধু অমিতার বেলায়ই বা নিজেকে কর্ত্রী মনে করছ কেন?'

'তোদের কী যে-সব উদ্ভট কথা অসিত', বলতেন মাসিমা মুখভার ক'রে, 'অমিতার জন্ম দিলাম আমি, আমার কোনো দায়িত্ব নেই? বললেই হ'ল?'

'আছে যদি মেনেও নিই—তা হ'লেই বা কী মাসিমা? সে দায়িত্বের পালা কি এখনো ফুরোয় নি বলতে চাও? শিক্ষা তো ওকে দিয়েছ খানিকটা। এখন ও সাবালিকাও বটে। তা ছাড়া ও যে খুব সুবুদ্ধি মেয়ে এ-ও তুমি জানো খুব ভালো ক'রেই। বেশ তো, এবার ওর পথ ও-ই বেছে নিক না। বিশেষ যখন তোমার লক্ষ্য আর সংসারও নয়, ঘরকন্নাও নয়।'

"কিন্তু তাই ব'লে—মানে—তুই কিচ্ছু বুঝবি না বাছা, কেবল তর্ক করবি। আহা, ওর প্রতি কর্তব্য তো আছে একটা—মা তো আমি। না তাও না?'

'ঐ তো মাসিমা, মুখে যতই বলো ভগবান্ই কর্তা, আমরা অকর্তা, মনে জানো যে তা নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে হয় নীতির দোহাই পাড়ো, না হয় মমতা নিয়ে করো উচ্ছ্বাস।'

'গোড়ায় গোড়ায় এই ধরণের কথা কাটাকাটি প্রায়ই হ'ত মিলি। কারণ মাসিমাকে প্রথম প্রথম এই কথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারতাম না যে শরণাগতির বীজমন্ত্র হ'ল নিজের স্বতন্ত্র দায়িত্ব বোধ থেকে মুক্তি—মমত্ববোধ থেকে নিষ্কৃতি। পরমহংসদেবের কথা বলতাম: সেই যে একজন নিঃস্ব এসে তাঁকে বলেছিল: ঠাকুর, আমার কেউ নেই—তাতে তিনি হাততালি দিয়ে বলেছিলেন: কী চমৎকার! যার কেউ নেই তারই ভগবান আছেন। কিন্তু যদিও এ ধরণের কথাকটায় মাসিমার মন টানত, কাজের বেলায় এদের তিনি বড় একটা আমল দিতে চাইতেন না—রকমারি ওজরে নাকচ করবার চেষ্টা পেতেন।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয় ত এ কথাটা পরিষ্কার হবে।

মাসিমার মা ছিলেন বেচে। তাঁর অসুখ করল একবার। অমনি বায়না ধরলেন তিনি যেতেই হবে মানে সেবা করতে। ফের বাধল আমার সঙ্গে। বললাম গুরুদেব এ ধরণের আসক্তির জন্যে সাধনা ছেড়ে কিছু দিনের জন্যে সংসারে ফেরারও অনুমোদন করেন না, বলেন: এ যাওয়ার মূলেও থাকে মমত্ববোধ না হয় কর্তব্যবোধ—অর্থাৎ বাসনা কিম্বা অহঙ্কার। বললাম: গুরুদেব প্রায়ই বলেন দেশের জন্যে স্বজন ত্যাগ করলে লোকে হাততালি দেয়, কিন্তু ভগবানের জন্যে ঘর ছাড়লে সে করে ঘরেরই ওকালতি। বললাম রাবেয়ার কথা: যে ভক্তিমতী রাবেয়াকে যখন একজন জিজ্ঞাসা করেছিল সে বিয়ে করবে কি না তখন রাবেয়া বলেছিল: বিয়ে করতে পারে সে-ই যার ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া নিজের ইচ্ছা ব'লে কোনো জিনিস আছে।

'বিয়ের কথা হচ্ছে না, তুই সংসারের কিছু বুঝিস না অসিত, তবু কথা কবি সব তাতে। নিজের মা, গর্ভধারিণী —তাঁর অসুখ—'

"এই ধরণের সেই একই মামুলি ওজর নানা ছদ্মবেশে। খতিয়ে দেখলে দাঁড়ায় কী? না আমি আমি—আমার আমার। বললাম শেষটায় হেসে: 'মাসি-মা, সেই গান আছে না:

আমার আমার ব'লে ডাকি আমার এ ও আমার তা
তোমার নিয়ে তুমি থাকো নিয়ো না তো আমার যা।'

"মাসিমা তবু যেন মেনেও মানতে চাইতেন না। এ যোগমায়া দেবীর আর এক মায়া মিলি, যার দরুণ সংসারে যখন থাকি তখন দুর্গমের দুর্গতিই মন টানে—অথচ যোগে আসতে না আসতেই দেখি সংসারই ফের পিছু ডাকতে শুরু করেছে। এই দোটানায় পড়েই মাসিমা তর্ক করতেন, বলতেন: 'কিন্তু আমার আমার যাকে বলছিস সেই

মমতায় গোড়া যদি সবাই কেটে দিত বাবা তাহ'লে সংসার তরুর আগায় কোনো ফলই ফলত কি ?"

"বলতাম তখন : "মাসিমা এখানে এসেও সেই সবাইয়ের কথা ? এখনও কি তুমি বুঝতে পারো নি যে, সবাই সংসার-তরুর তলায় জল দিচ্ছে, না যে-ডালে বসেছে সে ডালে কোপ মারছে এ চিন্তা আমাদের নয়—অর্থাৎ কি না তাদের নয় যারা ও তরুর ছায়ায় থাকতে নারাজ ? আসলে কথাটা সবাই বা বিশ্বমানবের নয় মাসিমা, কথাটা হ'ল স্বধর্মের। সংসার যাদের কাছে স্বধর্ম তারা চলবেই সেই ধর্ম মেনে সুখে দুঃখে—আর—"

"রোস্ রোস্, চ'লে কি ভুল করে বলতে চাস ? সবটাই ফক্কিকারি ?

'কে বলছে ? গুরুদেব কি প্রায়ই বলেন না যে যাকে ভুল বলি সেটাও আসলে ঠিকেরই উল্টো-পিঠ ? ভুলের যদি ষোলো কড়াই কাণা হ'ত তবে তার টাঁকশালের টাকায় বিশ্বলীলার বেচা-কেনা যে এত দিন চলত না এ-ও মানি। কিন্তু তবু অধ্যাত্ম সত্যকে যে সত্যের সত্য ব'লে চিনেছে আর যোগকেই চিনেছে এ-সত্যকে পাবার সেরা পথ বলে তাকে অন্তত অন্তরেও তো 'এ-অঙ্গীকারের কাছে খাঁটি থাকতে হবে, না হবে না ?'

'কে অস্বীকার করছে ?'

'যদি এ কথা অস্বীকার না করো তবে এও তোমাকে স্বীকার করতেই হবে মাসিমা, যে সংসারের সত্য যা-ই হোক না কেন তার মামুলি ওঠাপড়া, গোনাগুন্তি, ভাবনা-চিন্তা, রফা-নিষ্পত্তির পথ দিয়ে যোগমায়া দেবী তাঁর দীক্ষা-দুলালদের রওনা ক'রে দেন নি কোনো দিনই, কেন-না প্রকৃতির চিরকেলে হাঁটা-পথ তাঁর বাঁধাশড়ক নয়। আর নয় ব'লেই যুগে যুগে দেশে দেশে যাঁরা এ দীক্ষা নিয়েছেন তাঁরা বলেছেন এক বাক্যে যে ক্রমবিকাশের পথে প্রকৃতি আমাদের যেভাবে ঠেলছেন গজেন্দ্রগমনে বিদ্যুৎপর্ণা যোগ-মায়া দেবী অত ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলতে নারাজ—কেন না তাঁর প্রগতির ছন্দই আলাদা। তাই তো দেশে দেশে যুগে যুগে সত্যের শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির তীর্থযাত্রী হয়েছেন যাঁরা তাঁরা কেউই সাধারণের পায়ে-চলা পথে চলেন নি—নিজের পথ কেটে নিয়েছেন যোগমায়া দেবীরই ডাকে নিজের উপলব্ধির নির্দেশে। মাসিমা, বিশ্বলীলায় লৌকিক অভিজ্ঞতা আর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি প্রাণ-মনের চাহিদা আর অন্তরের তৃষ্ণা, সংসারের টান আর আকাশের ডাক যখন এক জিনিষ নয় তখন ওদের নির্দেশ এক হবে কেমন ক'রে শুনি ? তুমি রাগ করলে করব কী বলো—সংসারের চোখে যার নাম বিচক্ষণতা, জ্ঞানের দৃষ্টিতে তার সাড়ে-পনের আনা না হোক্ অন্তত বার আনা মেকি তো বটেই।"

নির্মল বলল : "মাসিমা এ সব অপ্রিয় সত্যে যদি এতই রাগ করতেন তবে তুই বলতে যেতিস কেন ?"

অসিত বলল : "আমাদের সবাইকার মতন মাসিমারও মনের মধ্যে যে ভাল ছিল সেটা ভুলছিস কেন ? তাই সংসারিয়ানার বিরুদ্ধে কোনো কোনো কথায় তিনি রাগ করলেও সব কথায়ই কিছু রেগে টং হতেন না। অনেক দিন থেকে ধর্মচর্চা করে চ'লে ঠেকেও তো শিখেছিলেন যে খাঁটি ধর্ম হ'ল গরীব, তার কথা বাসি হ'লে তবেই মিষ্টি হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া অনেক সময়েই দেখতে পেতাম যে, যে-সব ঘর-ভাঙানি কথা আমি বলতাম তাদের সুরে তাঁর মন প্রাণ বিদ্রোহ করলেও হৃদয় আগে থেকেই সাড়া দিয়ে বসে আছে—কেবল সে-সাড়া মন-প্রাণের দেউড়ির নজরবন্দী পেরুতে পারছে না। এ-ও যোগে প্রায়ই ঘটে : আমরা ভুল পথে যখন রওনা হই বেশ বুঝি ভুল করছি—(যেটা সংসারে সব সময়ে এত পরিষ্কার বুঝি না) —বুঝি, কেন-না যোগমায়া দেবীর মায়া ও একগুঁয়ে চীজ—তাঁর দেওয়া আলো তুমি দেখেও দেখবে না সাধ্য কি—দৃষ্টিদান না ক'রে তিনি ছাড়লে তো ? ডান দিকে তাঁর উদয় হ'লে যদি তুমি বাঁ দিকে মুখ ফেরাও—ও মা, অমনি তিনি শূট ক'রে ঘুরে গেছেন বাঁ দিকে, তুমি ফের চাইলে ডান দিকে অমনি তিনিও ঘুরে ফের সেইখানেই হাজির! পারি না বললে ছাড়বার পাত্রী তো তিনি নন। পারিয়ে নেবেনই নেবেন তিনি—অবিশ্যি যদি তাঁর সালিসি মানি।"

"কিন্তু সাড়ে পনের আনা লোকই তো মানে না।" বলে নির্মল।

"বটেই তো ভাই, মানলে সংসারের [illegible] ফিরে

যেত করে। তবে—" ব'লে অসিত হাসে ফের—"তবে কি জানিস ভাই? মজা এই যে ওই সাড়ে-পনের আনার দল ভারে কাটলেও ধারে কাটে ঐ বাকি আধ আনার দল যাদের গীতা বলেছে শ্রেষ্ঠ—যদ্ যদ্ আচরতি শ্রেষ্ঠ-স্তত্তদেবেতরো জনঃ—পথ দেখাতেও তারা, যত রকম অদল-বদলের ঢেঁড়া পেটাতেও তারা। এরা কেমন জানিস্? ঠিক যেন দুরন্ত ছেলে তাই মা প্রকৃতিকে নিত্যি দেয় তাড়া, ধরে বায়নাক্কা, বলে: 'চলুন না মা, বেলা যে ব'য়ে যায়!'

"প্রকৃতি বলেন: 'আঃ দিক্ করিস নে। জানিস নে সবুরে মেওয়া ফলে?'

'আমরা যে সে-মেওয়া চাই নে মা।'

'তবে?'

'আমরা চাই বিপুল আলো?'

'তাতে কী হবে শুনি?'

'তা জানি না মা।'

'তবে কী জানিস বাছা?'

'কিছুই না মা, শুধু এইটুকু ছাড়া যে অল্পে সুখ নেই। অথচ তুমি মা, এই অল্পকেই রইলে অঞ্চলের নিধি ক'রে।'

'ছেলের কথা শুনলে গা জ্বালা করে!—তোদের ঐ বিপুল আলো, অনন্ত অমৃত এসবের মে-ও ধরবেন কিনি শুনি? বাছা, সব কিছুই র'য়ে স'য়ে।'

'কিন্তু আমাদের যে তর সয় না মা। তাই তুমি যদি না যাও তবে আমরা চললাম তোমাকে রেখেই—'

'যা, যাঃ, বিরক্ত করিস্ নি।—ও কি? যাস কোথায়? আহা শোন্ না বাছা—আয় ফিরে আয় মাণিক! আয় আমার অঞ্চলের নিধি—নয়নতারা! শোন্—অমন দুরন্ত-পনা করে কি? কোথায় যাবি শুনি ও অচিন পথে—না জানিস পথ-ঘাট, না পেয়েছিস পাথেয়—'

'পাথেয় তো মা, পথেরই দান'—

'ও সব পুঁথিপড়া বুলি ছাড়্ বাছা!—শোন্, দিক্ করিস নে, এবার আমি রাগ করব—দাঁড়াব পথ আগ্‌লে।'

'আগ্‌লে কি কেউ কাউকে রাখতে পারে মা-মণি? না, লক্ষ্মীছেলে কখনো পোষ মানে? মায়েপোয়ে মকদ্দমা ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে—পায় না কি তোমার দুরন্ত ছেলেরা সবাই? তা ছাড়া মা, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, কিন্তু যারা তোমার উপরওয়ালার ডাক শুনেছে তারা তোমার শাসন মানবে কেন বলো? তারা বলবেই বলবে তুমি একটু সেকেলে হ'য়ে গেছ ব'লেই জানো না যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যারা চলে তাদেরই নাম পঙ্গু।'

"একটু থেমে অসিত বলে: 'এই-ই হ'য়ে এসেছে মিলি, আবহমানকাল—প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের এই দ্বন্দ্ব—সনাতনের সঙ্গে অনাগতের মন কষাকষি। আর আবহমান কাল নবরবিরই জয়জয়কার হয়েছে শেষটায়—যদিও পথে জয়-পরাজয় বহু বার হয়ত বদলিয়েছে—পুরোনো জড়তা বার বার ছিনিয়ে নিয়েছে জয়মাল্য বিজয়ী দুরাশার হাত থেকে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত এ মালা সে রাখতে পারে নি, কেন-না অনাগতের শক্তিই যে সমস্ত সনাতন শক্তিকে রেখেছে জীইয়ে। তবে—" ব'লে একটু থেমে অসিত বলে—"এ কথাটা মাসিমা অন্তত বুঝতেন। তাই তো বোঝাতেন তিনি অমিতাকে যে সত্যকে তো আমাদের ছাঁচে ঢালাই করা চলবে না মা—আমাদেরই ঢালাই করতে হবে সত্যের ছাঁচে।"

প্রমীলা বলল: "অমিতা বুঝি তর্ক করত এ নিয়ে?"

"একটু করত বৈ কি প্রথম প্রথম। হাজার সুবুদ্ধি হোক্ কলেজে-পড়া মেয়ে তো—ভক্তিকে খুব সুনজরে দেখতে পারত না, মানে গোড়ার দিকে। তা ছাড়া সত্য বলতে ও বুঝত দিল্লীর লাড্ডু নয়—রসগোল্লার পায়েস। তাই বুঝতে পারত না যে এ হেন সুস্বাদু বর পেতে কেউ আপত্তি করতে পারে, অর্থাৎ সত্যের আলো নামতে চাইলে বাধা পেতে পারে আমাদের স্বভাবের বাঁদরামির দরুণ। মাসিমা এই সব সময়েই সব চেয়ে সুন্দর বোঝাতেন ওকে আর তখনই তাঁর মধ্যে যে পূজারিণী ছিল সে দিত দেখা। বলত সে: 'ওরে মেয়ে! সত্য চাওয়া কি সহজ কথা ভাবিস? আমাদের দেহে মনে প্রাণে হাজারো গুপ্তচর রয়েছে লুকিয়ে—সত্যের মুক্ত আলো হাওয়া নামতে-না-নামতে তারা হানা দেয় লোভের কাড়াকাড়ির ক্রোধের মূর্তি ধ'রে। তাই তো সত্যকে চাইতে হ'লে সব আগে চাই এই সব মিথ্যার ঘুষখোরদেরকে তাড়ানো আমাদের

মধ্যে থেকে। লক্ষ্মী নামেন না আঁস্তাকুড়ে—'প্রণাম ক'রে—সাধে কি মা-র নাম কমলাসনা?'

"অমিতা প্রথম প্রথম এ কথা মানতে পারত না কিছুতে, কিন্তু ক্রমশঃ গুরুদেবের সংস্পর্শে আসতে আসতে যখন ওর হৃদয়ে সত্যতৃষ্ণার শিখা জ্ব'লে উঠল তখন বুঝল ক্রমশ। বুঝল, কেন-না তখন প্রত্যক্ষ করল যে, যে-সত্যকে ওর একটা অংশ চায় তাতে ওরই আর একটা অংশ প্রাণপণে দেয় বাধা। তখনই ও প্রথম বুঝল যে অন্তরের দাবি বড় হ'লে দামও বেড়ে উঠে কিন্তু আমাদের প্রাণ-মন ছোটরই কারবারী, কাজেই কোনো কিছুর জন্যে বিধাতা একটু বেশি দর হাঁকলে তারা খুঁৎ খুঁৎ করে, ভয় পায়—শেষটায় বিদ্রোহ ক'রে বলে বসে—চাই না এমন অমূল্য নিধি। তাই তো আধ্যাত্মিক পথে গোড়ার দিকে আসে এত শুষ্কতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুঃখ, বেদনা, নিরাশা—যাকে Pilgrim's Progress এ নাম দিয়েছে Slough of Despond"

"দুঃখ বেদনা আসে—বুঝি, কিন্তু নিরাশা আসে কেন অসিদা?"

"যখন অভয়ের শিখা প্রাণ-মনের আঁধার তুফানের সঙ্গে লড়াইয়ে নিভে যাবার মতন হয় তখনই আসে নিরাশা। কারণ এ-আলোই হ'ল দুরাশার একমাত্র সম্বল সত্যসন্ধানের অচিন পথে। এ-হেন আলো নিভে গেলে সে চোখে অন্ধকার দেখবে না? তবে এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে: আমরা যার সঙ্গে বেশি দিন ঘর করি সে হ'য়ে ওঠেই ঘরণী—তাকে বিদায় দিতে বাজে। শ্রীমতী মিথ্যাদেবীকে নিয়ে আমরা সাধারণতঃ থাকি তো?—কাজেই তাঁকে তুষ্ট করতে তাঁর জন্যে গহনা গড়াতে হবে তো তাঁরই রুচি মেনে—অর্থাৎ মিথ্যারই পালিশ দিয়ে? তাই যদি তাঁর শ্রীঅঙ্গের জন্যে সত্যের তিল পরিমাণ সোনা দেই শেকরাকে তাহ'লে তাকে বলি: 'বাপু, দেখো কিন্তু, এ তিল পরিমাণ সোনায় তাল পরিমাণ পান মিশিয়ে তবে গড়বে ওঁর গয়না। কেন-না জানোই তো উনি—মানে—হুম্।'

প্রমীলা হেসে বলে: "যতই বলো অসিদা, সংসারটাকে তুমি শুধু যে দেখেছ তা-ই না বেশ একটু রসিয়ে রসিয়ে চেখেছ।"

অসিত বলল হেসে: "নৈলে কি আর ওঁকে অত ডরাতাম দিদি?—কিন্তু এটা হাসির কথা নয় মিলি", ব'লে অসিত গম্ভীর হ'য়ে, "কেন জানি না আমাকে এখনো বাজে ভাবতে যে সংসারটা ভগবানের হাতে গড়া হওয়া সত্ত্বেও সত্য যারা যায় তাদের সঙ্গে কিছুতে খাপ খাওয়ানো গেল না। প্রথম প্রথম—মানে তরুণ যৌবনে যখন কবির কাব্যের নিকষে সত্যকে কষতাম তখন বলতাম সিংহনাদ ক'রে যে 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।'—কিন্তু বৃথা দিদি বৃথা! বৈরাগ্য বিনা সত্য মেলে না, অনাসক্তি বিনা শান্তি নেই, ত্যাগ বিনা ভোগও অসম্ভব। তাই প্রথম দিকে একটু আধটু কাব্যনাদ করলেও শেষটায় ছাড়তেই হয় কাব্যের অভিমান, কেন-না কবির কাব্য, শিল্পীর শিল্প বড় জোর অর্ধসত্য। তাই মান্‌তেই হয় যে সত্যের পরম বল্লভকে পেতে হ'লে কুমারী দুরাশাকে আগে হ'তে হবে রিক্তা নিরাভরণা আর সংসারকে যে আগেই প্রিয়তম ব'লে বরণ ক'রে ফেলেছে তাকে হ'তে হবে বিধবা। আলোর আলো ফোটে শুধু ছায়ার ছায়ায়—কাঁটাপথে। কান্নাকাটি ক'রে লাভ নেই—হ'তে হবে বীর্যবান্, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত—'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—তো আর কথার কথা নয়—মান্ধাতার আমল থেকে অন্য কোনো পথেই পায়নিও কেউ অমৃতকে।"

প্রমীলা দুঃখিত হ'য়ে বলল: "মাসিমার ক্ষেত্রে এ রিক্ততা এল কী ভাবে?"

"সে কি কোনো একটা মাত্র চেনা পথে? যেখানেই অভিমান, বাসনা, মমতা, আত্মবঞ্চনা ছিল সবই দিতে হ'ল বিদায়—ধ্রুব সম্পদকে ছাড়তে হ'ল অধ্রুবের জন্যে। দুদিন যেতে না যেতে বুঝতে পারলেন মাসিমা যে রঙ বাংতা দিয়ে সাজানো চলবে না তাঁর মাতৃত্বের মানসী প্রতিমাকে। বলতে হ'ল গুরুদেবকে—গুরুদেব, তোমাকেই দিলাম সুধী অমিতার ভার—যা করবে করো—আমি মা হ'য়েও মা নই আর। আর যত চোখের জলের মধ্যে দিয়ে যে একথা তাঁকে বলতে হয়েছিল জানি তো।

"কিন্তু মাসিমা যেই একথা বলতে পারলেন। অমনি

শুধু যে তাঁর চলার বাধা কেটে গেল তাই নয়—সেই সঙ্গে ছন্দও গেল বদলে। বাইরেটা যখন বদলে যায়, ধীরে ধীরে ভিতরটাও যায় বদলে, আবার ভিতরটা বদলালে বাইরেটাও বদলাতে হয় সে-বদলের সঙ্গে তাল রেখে। মাসিমার ক্ষেত্রে এ দেখলাম এত স্পষ্ট যে কী বলব? শুধু তাঁর মন রুচি মেজাজই নয়,—ধরণ-ধারণ চলন-বলন, এমন কি মুখের চেহারা পর্যন্ত গেল বদলে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ গোড়াকার সংস্কারেও পৌছল রূপান্তরের চাপ—তারাও বদলাতে শুরু করল। তাই বলছিলাম মিলি, যে যাদু যখন ফিরে এল মাস-ছয়েক বাদে তখন দেখা গেল মাসিমা সে আর এডুকেটেড্ গ্রাজুয়েট লেডি নেই—সাধনায় ডুবে প্রায় পর্দানসীনার সামিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।"

প্রমীলা দুঃখিত হ'য়ে বলল: "আর অমিতা?"

"অমিতাও বদলে যাচ্ছিল বৈ কি। আর কী ভাবে বদলাচ্ছিল তারও আভাষ দিয়েছি একটু আগেই। কিন্তু গোড়ার গোক ছেলেমানুষ তো—মাসিমার মতন অত ভক্তির মূলধন ওর কোথায়? কাজেই ওর ধারণা বদলালেও ধরণ বদলায় নি রূপান্তরের শুদ মিলতেও তাই দেরি হ'ল।

কিন্তু তবু সে-ও শান্ত হয়েছিল অনেকখানি। যেমন ধর, আগে আগে তর্ক করত—প্রায় তোরই মত, কিন্তু ইদানীং তর্ক ছেড়ে ঝুঁকছিল জিজ্ঞাসুতার দিকেই। চোখের মধ্যেও তার একটা নতুন আভা ফুটে উঠেছিল খানিকটা বিষাদের খানিকটা প্রশান্তির। ওর আর একটা বদল হয়েছিল এই যে ও আমার কাছে খুব কীর্তন-ভজন শেখা শুরু ক'রে দিল। সুকণ্ঠী ও ছিল আগে থেকেই, ক্রমশ সুগায়িকা হ'য়ে উঠল দেখতে দেখতে।

"যাদু ফিরে এলেই পড়ে গেল এই নতুন পরিবেশের মধ্যে আর যেহেতু ইতিমধ্যে মাসিমার দৃষ্টিদীপ এসেছিল নিভে, সেহেতু ও একটু ভরসা পেয়ে মিলতে শুরু করল অমিতার সঙ্গে সহজ ভাবে। দেখতে দেখতে বেশ একটা ঘরোয়া পরিমণ্ডল গ'ড়ে উঠল আমাদের।

* * *

ক্রমশ

কবিতা

সন্ধান

গোপাল ভৌমিক

জীবনের ভিত্তি ন'ড়ে ওঠে :
যৌবনের কি তীব্র দাপটে—
কেঁপে ওঠে পুরাতন পৃথিবীর বুক
তরঙ্গিত রাত্রির মতন,
তারই মাঝে পরিস্ফুট
সুপ্তি-ভাঙা আলোর স্বপন—
স্বপিত যৌবন।

কালো মৃত্যু ছায়া ফেলে আকাশের গায়—
ঝরে মৃত্যু পৃথিবীতে
শকুনির পাখায় পাখায় :
পৃথিবীর স্বপ্ন তবু জীবনের স্পর্শ পেতে চায়—
হে মৃত্যু বিদায়।

সৃষ্টির প্রেরণা শুধু—
কামনায় হবে না নিঃশেষ :
জীবনের অমোঘ নির্দেশ
এনে দেবে পৃথিবীতে নব রূপান্তর—
আলোকের ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ভেসে যাবে দিক্ দিগন্তর ;
খুঁজে পাবে লক্ষ্যস্থল
ধানুকীর সুনির্দিষ্ট শর।

জীবন ও মৃত্যু

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র

অলঙ্কার,
শিলা, স্বর্ণ, রং,
নটিনীর ঢং,
বহুরূপী বিচিত্র আকার,
—অংশুমান্ কঠিন দর্শক !—
এলো ওই আলোর কুহক,
রূপায়িত ত্রস্ত লাজ,
পরো পরো সাজ।

তিমির,
নির্বাত স্বকীয় নীড়
দর্শকের নাহি ভীড়,
কে লঙ্ঘিবে কালের প্রাচীর ?
কোথা গেল পূর্বাহ্ণ শিশির ?
সুপ্ত বিহঙ্গম
দেখিয়াছে সমুচ্চয় স্থাবর-জঙ্গম—
আজ নাহি লাজ,
খোলো খোলো সাজ।

ইভ্যাকুয়্যির স্বগতোক্তি

মিহিরকুমার সেন

আজ যারা রয়েছে রেংগুনে
তারা কি দেখেছে চোখে
রক্তপায়ী জাপানের সে মহাউৎসব ?
আজো কি পথেতে রাজে
প্রাণহীন, মূর্ত্তিময় শব ?
তারা কি পথেতে শুয়ে
লালসাদা চূর্ণসুর্কী 'পরে,—
যারা একদিন
রেংগুন রক্ষিবে বলি, করেছিল পণ
কোন্ এক প্রবঞ্চক প্রাতে ?
জীবনের আয়ু হ'ল ক্ষীণ।

শত্রু এল ধীরে ধীরে
পথের বাতাসে তার ধ্বনি শুনি কাঁপে
বারে বারে ফিরে ফিরে
তার পর শবের উপর দিয়া চলে আসি স্বদেশের পানে।
সেই ক্ষণে—
একটি বিচিত্র শিহরণ করি তোলে আণবিক ঘোর
বাতাস কহিছে, 'ওরে, সরম কি নাই তোর
যাহারে ঘিরিয়া তোর গড়ে উঠেছিল ধরার আমরা
তাহারেই পদদলি'
কাপুরুষ প্রাণ ভয়ে যেতেছিস্ চলি
পৃথিবীর ইতিহাসে রহিল তোদের কীর্ত্তি লজ্জা দিয়ে মোড়া।'

বাতাসের এই কথা শুনে
নির্বেদের তপ্ততাপে জ্বলি মনে মনে
দূরে থেকে নমস্কার করি তাহাদের
আজো যারা রয়েছে রেংগুনে॥

লৌহশ্রী

সুশীল রায়

লোহা মহার্ঘ, শুনি চারিদিকে লৌহের টানাটানি—
চারিদিকে তাই শুনি নানা কানাকানি।
বন্দীরা বুঝি এবার মুক্তি পাবে
লোহার গরাদ লোহার শেকল যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে।
গুজন করিয়া হন্দরে হন্দরে
লোহার জাহাজ লোহা নিয়ে যায় নানাবিধ বন্দরে।
দৈনিক খুলে দেখি প্রথমেই, সৈনিক কতগুলা
নিমেষে হ'য়েছে ধূলা।
সধবারা সাবধান !
হাতের লোহায়, বলা তো যায় না,
পড়িতেও পারে টান।

আমাদের এই লৌহযুগের বাণিজ্য থাক বেঁচে
সধবার লোহা বন্দীমুক্তি প্রার্থনা করিতেছে।
খুলে দেয় বুঝি কারাগার-দ্বার মস্লিম-হিন্দুর
শত সধবার হাতের লোহা ও সীমন্ত-সিন্দুর।

গান

(মালকোষ)

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য

সুখের দিনে তোমারে ভুলে যাই,
দুঃখে তোমায় নিবিড় করে পাই॥
তাই তো, প্রভু, বারে বারে
মেগেছি দুখ তোমার দ্বারে,
গর্ব্বে উঠে জীবন ভরি তাই॥

আজকে যখন অকূল জীবন-তরী
দুখের জলে উঠল ভরি ভরি—
চেয়ে দেখি কখন নিজে
তোমায়, প্রভু, ভুলেছি যে,
স্নেহ তোমার কেমন করে চাই॥

সঞ্চয়ন

(বিদেশী পত্রিকা হইতে)

১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রেশনিং

[মেলবোর্ণের The New Age পত্রিকায় প্রকাশিত Rationing in 1336 শীর্ষক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ]

বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধারণ নাগরিকদের পোষক-বিষয়ক সামান্য অমিতব্যয়ও শেষ হয়েছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের উপর মিতাচার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্যাশন বিকৃত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের আইন-প্রণয়নকারী কিংবা তাদের কর্মীদের কুশলী কূটনীতির ফলে ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার এবং সৌষ্ঠব আজ পরাজিত। শুধু যুদ্ধকালীন অবস্থাই এইরূপ অদ্ভুত সামাজিক সংস্কার সম্ভবপর ক'রে তোলে—যদিও বহু শতাব্দী পূর্বে অনেক সভ্যদেশ বস্ত্র এবং খাদ্য-বিষয়ক অমিতব্যয় ও বিলাস সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ব্যয়নিয়ামক আইন নিয়ে ব্যর্থ পরীক্ষা করেছে।

১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় এডওয়ার্ডের অধীনে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট তৎকালীন ভূরিভোজ কমানোর জন্য আইন পাস করেছিল—এই আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে দিবা-ভোজন কিংবা নৈশভোজন কিংবা যে কোন রকমের ভোজন হোক্, কেউ দুই পর্যায়ের (two courses) বেশী খাবার খেতে পারবে না; "এবং বেশী পক্ষে মাছ হোক আর মাংস হোক—দুই রকমের খাবারের সঙ্গে সাধারণ ব্যঞ্জন থাকবে—চাটনি কিংবা অন্য কোন খাবার থাকবে না। আর কেউ যদি চাটনি খেতেও চায় তবে সে চাটনি বেশী অর্থ ব্যয় ক'রে তৈরী করা চলবে না; এবং তার সঙ্গে যদি মাছ কিংবা মাংস মেশাতে হয়, তবু এটা বেশী পক্ষে দুই প্রকারেরই হ'তে হবে। অবশ্য বছরের প্রধান প্রধান ভোজের দিনগুলোতে প্রত্যেক লোকই বেশী পক্ষে তিন পর্যায়ের খাবার খেতে পারবে।"

ইংরেজদের পোষাক নিয়ন্ত্রণ ক'রে প্রথম আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে—অবশ্য এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল যে, একদৃষ্টিতে দেখেই যেন মানুষের পদমর্যাদা বোঝা যায়। পোষাকের সূক্ষ্মতম বর্ণনাও নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের খুসীমত পোষাক-পরার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপে জন্ম-স্বাধীন ইংরেজ জাতি এরূপ প্রবল বিরোধিতা করেছিল যে বারো মাস পরে এই আইন প্রত্যাহার ক'রে নিতে হয়েছিল।

একশ বছর চলে গেল এবং ইংলণ্ড যখন দুই গোলাপের যুদ্ধ নামক মারাত্মক গৃহ-যুদ্ধে ছিন্নবিচ্ছিন্ন—তখন সাধারণের ব্যয় সঙ্কোচ করা আবার প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হ'ল। বলা হ'ল যে লোকেরা "বেশী পোষাক পরছিল; ফলে ঈশ্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠছিলেন, ইংলণ্ড দরিদ্র হ'য়ে পড়ছিল, অন্য দেশ সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠছিল এবং পরিমিত ব্যয় সমগ্রভাবে ধ্বংস হচ্ছিল।" কাজেই সপ্তম হেনরী আইন করেছিলেন যে লর্ড ছাড়া অন্য কেউ দামী পশমের পোষাক, সোনার জড়ি দেওয়া কাপড় বা সম্মানসূচক পোষাক পরবে না; নাইট ছাড়া অন্য কেউ ভেলভেট, স্যাটিন্, আর্মাইন্ কিংবা এই জাতীয় নকল কাপড়ের পোষাক পরতে পারবে না। কোন নাগরিক যদি বছরে ৪০ পাউণ্ডের কম রোজগার করে, তবে তার পক্ষে ফার্, বিদেশী রেশম কিংবা 'স্বর্ণ ও রৌপ্য-ভূষিত' কটিবন্ধ পরা নিষিদ্ধ হয়েছিল। যদি বার্ষিক আয় দুই পাউণ্ডের কম হয় তবে ফাষ্টিয়ান্ নামক কার্পাস বস্ত্র, লাল রঙের পোষাক এবং শাদা কিংবা কালো ভেড়ার লোম ছাড়া সর্বপ্রকার পশমের পোষাক পরিধান নিষিদ্ধ ছিল। আর কোন শ্রমিক কিংবা শ্রম-শিল্পী দুই শিলিং গজের চেয়ে বেশী দামের কাপড় ব্যবহার করতে পারত না। শুধু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই ছোট টিউনিক কিংবা জ্যাকেট পরতে পারতেন; আর সবাইকে নিয়ন্ত্রিত দৈর্ঘ্যের পোষাক পরতে হ'ত, না হলে পোষাক বাজেয়াপ্ত করা হ'ত এবং যে দর্জি সে পোষাক তৈরী করত তাকেও শাস্তি দেওয়া হ'ত। ডিউক, আর্চবিশপ্ এবং মার্কুইসদের প্রতি গাউনের জন্য ষোল গজ কাপড় দেওয়া হ'ত। আর্ল[illegible] গজ নিয়ে

সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত, ভাইকাউণ্টরা পেতেন বারো গজ, ব্যারনরা আট গজ এবং নাইটরা ছয় গজ—আর সাধারণ লোকদের জন্য পাঁচ গজকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হ'ত।

অষ্টম হেন্‌রী নিজের ছাড়া আর কারও অমিতব্যয় অনুমোদন করতেন না; তিনি চারটি ব্যয়-নিয়ামক আইন প্রণয়ন করেছিলেন। যদি কোন কৃষিকর্মী তার পোষাকের জন্য গজপ্রতি দুই শিলিংয়ের বেশী দাম দিত, তবে তাকে তিনদিন তুড়ংয়ে ফেলে যন্ত্রণা দেওয়া হ'ত—এরূপ শাস্তিবিধান সত্ত্বেও অন্যের আইনের মত তাঁর "পোষাক-বিষয়ক আইনও" অমান্য করা হ'ত। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে ব্যয়-নিয়ামক আইন যাজক-সম্প্রদায় সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়েছিল। দামী বিদেশী পোষাক ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং তাঁদের আরও বেশী আঘাত করেছিল খাদ্য-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ; যদিও আর্চবিশপরা মাছ-মাংসের ছয় প্রকারের খাবার খেতে পেতেন, বিশপরা পেতেন শুধু পাঁচ প্রকারের, ডীন্ এবং আর্চডীকনরা পেতেন চার প্রকারের—আর নীচু দরের যাজক-সম্প্রদায় পেতেন মাত্র দুই প্রকারের খাবার। এই প্রকারে বাধ্যতামূলকভাবে খাদ্যদ্রব্য থেকে যে টাকা বাঁচানো হ'ত, তাই দিয়ে গরীবদের জন্য সাধারণ খাবার কিনে দেওয়া হ'ত। তিন-চার মাস ধরে এই সব আইন পালন করা হয়েছিল—তার পর অব্যবহারের দরুণ এ সব আইন উঠে গিয়ে আবার পুরানো অমিতব্যয় সুরু হয়েছিল।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে রাণী মেরী শেষ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কিন্তু নিরর্থক ব্যয়-নিয়ামক আইন তৈরী করেছিলেন। পোষাক-বিষয়ক আতিশয্যের দরুণ কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নাইটের নীচে কোন লোকের পক্ষে রেশমের পোষাক পরা সম্ভব ছিল না। নিজের বহুমূল্য এবং পরিপূর্ণ পোষাকাগার সত্ত্বেও রাণী এলিজাবেথ ভয় দেখিয়ে এবং প্ররোচিত ক'রে তাঁর প্রজাদের পোষাক-প্রিয়তা কমাতে চেষ্টা করেছিলেন; কিন্তু তিনি কোন নূতন আইন তৈরী করেন নি—তিনি তাঁর পিতা এবং ভগ্নীর তৈরী আইন প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তাঁর প্রচেষ্টায় অকৃত-কার্য হ'য়ে তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে একটি ঘোষণা প্রচার করলেন; তার মধ্যে অতিরিক্ত ব্যয়ের দোষগুলো দেখানো হয়েছিল, "বিশেষ ক'রে যে-সব যুবক এই সব জিনিসের অর্থহীন চাকচিক্য দেখে প্রলুব্ধ হয় এবং শুধু যে নিজেদের সব-কিছু ধ্বংস করে তাই নয়—পিতৃপ্রদত্ত ধনসম্পত্তিও ধ্বংস করে এবং ঋণগ্রস্ত হ'য়ে এমন বিপদে পড়ে যে তারা বে-আইনী কাজ করার চেষ্টা না ক'রে আইনের আওতার বাইরে থাকতে পারে না; ফলে তারা যেমন দেশের কাজে লাগতে পারত, তেমন কোন কাজেই তারা লাগে না।" ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে রাণী ঘোষণা করলেন যে তিনি দীর্ঘ বহিরাবরণ এবং বড় গলবস্ত্র পছন্দ করেন না—তাই তিনি তাঁর অনুরক্ত প্রজাদের এসব ব্যবহার না করতে অনুরোধ করলেন।

প্রথম জেম্‌সের রাজত্বকালে সব ব্যয়-নিয়ামক আইন প্রত্যাহৃত হয়েছিল—যদিও তিনি নিজে দাসী এবং শিক্ষা-নবিশদের ফ্যাশন্-প্রিয়তায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন—ফলে উদ্ধত যুবকদের পোষাক-বিষয়ক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সহরের গিল্ডগুলো আইন পাস করেছিল। শিক্ষা-নবিশের পা-জামা ফাষ্টিয়ান্ (এক প্রকারের কার্পাস-বস্ত্র), চটের কাপড় কিংবা ক্যানভাস কিংবা প্রতি গজ আধ ক্রাউন দামের চেয়ে বেশী দামের কাপড়ে তৈরী হ'তে পারবে না; তার মোজা হবে পশমে তৈরী; এবং স্পেনীয় জুতা যাতে সে না পরে, সে জন্য সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিল। দাসীমেয়েদের পক্ষে লন্ ও কেম্‌ব্রিক পরা, চওড়া গলবস্ত্র কিংবা ফার্দিংগেল্ এবং সূক্ষ্ম জাল দেওয়া স্কার্ট পরা নিষিদ্ধ হয়েছিল। জেম্‌স ফার্দিংগেল্‌কে (এক প্রকারের পেটিকোট) "ঔদ্ধত্য-সূচক পোষাক" বলে নিন্দা করেছিলেন—কেন-না এক বার জেম্‌স যখন গ্রেজ ইনের (Gray's Inn) ভদ্র-লোকদের অভিনীত একটি মুখোস-পরা অভিনয় দেখার জন্য হোয়াইট হলের একটি কক্ষে প্রবেশ করছিলেন, তখনই ফার্দিংগেল্-পরা এ দলে মেয়ে তাঁর পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে-ছিল। মেয়েরা শুধু তাদের এই ঘৃণ্য ফার্দিংগেলের আকার বাড়িয়েই জেম্‌সের নিন্দার প্রত্যুত্তর দিল এবং তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন তারা এটা পরেছিল।

এর পরে রাজা এবং পার্লামেণ্ট বিজ্ঞের মত স্বাধীন

নাগরিকদের পোষাক বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করেছিলেন। এর পরে একটা মাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে চতুর্থ জর্জের সময়। প্রায় ১২০ বৎসর আগে তিনি রাজসভায় হুপ পেটিকোটের (Hoop Petticoat) ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।*

—

নেতৃত্ব

প্রাচীন কালের রোমান সাধারণ-তন্ত্রের মত যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে আজকের দিনে ইংরেজী ভাষাভাষী জগতেও নেতৃত্বের প্রয়োজন বেড়ে গেছে। আধুনিক গণতন্ত্রে নেতৃত্বের প্রকৃতি এবং কার্য সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে দেখবার এটাও একটা কারণ। আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা যখন প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করছি, তখন আমাদের শত্রুদের ফুয়েরার-নীতির (Fuhrer-Princip) কাছে আমাদের গণ-তান্ত্রিক নীতি যাতে পরাজিত না হয় সে বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত হ'তে হবে। নেতৃত্ব এবং তার উপকারিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই একটা অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়; বার্গস এ বিষয়ে মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "জীবনকে বোঝার স্বাভাবিক অসামর্থ্য বুদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য।" মানুষের ব্যাপারে যুক্তি প্রয়োগ করতে গেলে হৃদয়াবেগকে অবজ্ঞা করা এবং যে-সব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মানুষের কার্যকে প্রধানতঃ পরিচালনা করে সে-সবকে অবহেলা করা খুবই স্বাভাবিক। কি কি উপাদানে নেতৃত্ব তৈরী আমরা যদি সেটা আবিষ্কার করতে চাই এবং কি প্রকারে নেতা তৈরী করতে হয়, এই বহু আলোচিত প্রশ্নের উপর যদি আলোক নিক্ষেপ করতে চাই, তবে আমাদিগকে এই বিপদের বিরুদ্ধে সাবধান হ'তে হবে।

আমরা কার্যত আমাদের চতুর্দিকে যে-নেতৃত্ব দেখতে পাই, তার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমরা সর্ব-প্রকারের নেতাদের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ গুণ না আবিষ্কার ক'রে পারি না; রাজনীতিতে, ব্যবসায়ে, যুদ্ধ-বিভাগে এবং যুদ্ধে সাহায্যকারী বিভাগে (যেমন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মধ্যে তেমনি ওলিভার ক্রমওয়েলের মধ্যে), শান্তিকালীন আবিষ্কার, পর্বতারোহণ কিংবা সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি নানারূপ দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে এবং সর্বপ্রকারের শিকার মধ্যেও এই সাধারণ গুণ দেখতে পাওয়া যায়। অন্তত এই ধরণের পাঁচটি গুণ আমার কাছে অতি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। প্রত্যেক নেতারই নিম্নোক্ত গুণগুলি থাকা চাই:

(১) তিনি কোথায় যাচ্ছেন এবং কোন্ পথে সেখানে পৌছাতে পারেন সে বিষয়ে জ্ঞান: এই জ্ঞান তাঁকে তাঁর স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়।

(২) তিনি এবং তাঁর অনুসরণকারীরা তাঁদের গন্তব্য স্থানে পৌছাবেন এরূপ বিশ্বাস এবং সুনিশ্চিত আশা থাকা চাই: তাদের উপরে তাঁর বিশ্বাস, তাঁর উপরে তাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে: প্রকৃতপক্ষে তিনি যে অভিযানের নেতৃত্ব করেন, সে বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ থাকতে হবে যাতে প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে হৃদয়াবেগ, অনুভূতি এবং শক্তিশালী প্রবৃত্তিসমূহের যোগ থাকে।

(৩) কৃতকার্যতা লাভের জন্য সংকল্প: তাঁর গন্তব্য-স্থানে পৌছানোর জন্য তাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যে তাঁর আগ্রহ কেন্দ্রীভূত থাকবে যাতে যখনই তিনি বিপদের সম্মুখীন হবেন তখনই তাঁর ইচ্ছা-শক্তির সমস্ত শক্তি দেখা দেবে।

(৪) তাঁর অনুসরণকারীদের সম্বন্ধে তাঁর সহানুভূতি-শীল বোধ থাকা উচিত: বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে তাদের অসুবিধা সম্বন্ধে তিনি যেমন সজাগ থাকবেন তেমনি ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, প্রেম প্রভৃতির দ্বারা তিনি তাদের সঙ্গে ভাই হিসাবে আবদ্ধ থাকবেন—এই প্রকারে তিনি তাঁর সামাজিক পারিপার্শ্বিকে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠেন।

(৫) তার পর তাঁর একটা দর্শন কিংবা আরও, ভাল হয় যদি একটা ধর্ম থাকে: এই ধর্ম তাঁর অভিযানকে

* [এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে পৃথিবীতে বোধ হয় কিছুই নতুন নেই। বর্তমান যুদ্ধের দরুণ পৃথিবীর সর্বত্র যে খাদ্য ও বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চলছে, সেটাও নতুন কিছু নয়। ইতিহাস খুঁজলে এরূপ খাদ্য-বস্ত্র-নিয়ামক আইনেরও সন্ধান পাওয়া যায়।]

সমস্ত প্রকৃতি এবং ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে, তাঁকে মূল্যনির্ণয়ের একটা মাপকাঠি দেয় এবং সমস্ত বস্তুর সামঞ্জস্য দেখতে তাঁকে সাহায্য করে : আধ্যাত্মিক পরিবেশের সঙ্গেও তাঁর নিজেকে খাপ খাওয়ানো প্রয়োজন।

এই পাঁচটি গুণের কোনটিই সহজাত নয়, যদিও সহজাত গুণের সাহায্যে এর প্রতিটিরই উন্নতি বিধান করা যায়। কাজেই নেতাদের পরিকল্পনানুসারে উৎপন্ন শস্য হিসাবে ভাবতে হবে—এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে এর থেকে সুন্দর সুন্দর দু-একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। পশ্চাদবর্তী এবং অলস সমাজ-ব্যবস্থাই হঠাৎ বুনো ফল কিম্বা প্রাকৃতিক রত্নের মত নেতা জন্মানোর আশায় বসে থাকে। কিন্তু নাৎসী জার্মানীতে যেমন নেতা সৃষ্টির জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে নেতারা ভবিষ্যতে যে-সব লোকের উপর নেতৃত্ব করবেন, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের থেকে তাদের যদি বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা যায়, তবে এ সব বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। নেতাদের শিক্ষার এই পদ্ধতিতে তারা নেতৃত্বের একটা অতি প্রয়োজনীয় গুণ থেকে বঞ্চিত হবে : সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে তারা সাধারণ লোকদের বুঝতে পারবে না। আবার শিক্ষা-পদ্ধতি যদি এ রকম হয় যাতে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত নেতা-নির্বাচনের সময় নেতৃত্বের অনেক গুণকে অবহেলা ক'রে শুধু জ্ঞান এবং বুদ্ধির পরীক্ষার উপর বিশ্বাস ক'রে বৃত্তি-পাওয়া ছেলে-মেয়েকে কিংবা যুবক-যুবতীকে বেছে নেওয়া হয়, তবে সে শিক্ষা-পদ্ধতিকেও যুক্তি-সঙ্গত বলা চলে না। নেতা-নির্বাচন এবং বিদ্যালয়-বহির্ভূত কার্য, বুদ্ধিবৃত্তির শৃঙ্খলা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার দ্বারা তাদের শিক্ষাবিধান গণতান্ত্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির আবশ্যক অঙ্গ। শিক্ষা-লভ্য নয় এমন প্রকৃতি-গত অন্যান্য গুণও চাই—অবশ্য প্রত্যেক নেতারই এরূপ গুণের প্রয়োজন নেই,—যে-সব নেতা বিশেষ প্রকারের অভিযানে নেতৃত্ব করে, তাদের এসব গুণের দরকার। উদাহরণ-স্বরূপ, যার হৃদয় এবং ফুসফুস্ নির্দোষ নয়, এরূপ লোক পার্বত্য অভিযানে পথ প্রদর্শক হ'তে পারে না। তেমনি বর্ণান্ধ লোক জাহাজ কিংবা যন্ত্র-চালিত গাড়ী চালাতে পারে না। বড় বড় দুঃসাহসিক অভিযান নেতাদের কাছ থেকে উচ্চস্তরের সাধারণ ক্ষমতা দাবী করে। পার্লামেণ্ট চালিত গণতন্ত্রে রাজনৈতিক নেতাদের পক্ষে কথা বলার সহজ ভাব, বক্তৃতার দ্রুততা, প্রত্যুত্তর দানে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি অত্যাবশ্যক। আর যে কোন গণ-তন্ত্রে লিন্‌কলন্, রুজভেল্ট কিংবা চার্চিলের বিরাট্ নেতৃত্ব হয়ত অসম্ভব হ'ত যদি না তাঁদের স্বাভাবিক বাগ্মিতা-গুণ থাকত—অবশ্য বাগ্মিতাই হোক আর যেতার বক্তৃতাই হোক স্বাভাবিক দোষ সংশোধন করতে অভ্যাস অনেকটা সাহায্য করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নেতাদের সঙ্গে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একনায়কদের দর্শনের দিক থেকে যতটা বিভিন্নতা আছে, নেতৃত্বের অন্যান্য গুণের দিক থেকে ততটা নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বেশীর ভাগ চিন্তাশীল লোকরা কোথায় নীত হ'তে চায় সেটা নির্ধারিত হয় তাদের দর্শন অর্থাৎ ধর্ম-গত নীতি-বোধের দ্বারা। তাদের নেতারা এই সব নীতির দ্বারা আবদ্ধ : তারা ভগবান এবং আইনের অধীনে। কিন্তু স্বৈর-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে একনায়ক সর্বশক্তি-মান। একনায়ক যদি ভাণও করেন যে তিনি ভগবানের সেবা করছেন, তবে তাঁর ভগবানের সংজ্ঞা-নির্দেশ করেন তিনি এবং তিনি একাই তাঁর গন্তব্যস্থান নির্ণয় করেন। এর থেকে এই মনে হয় যে, গণতন্ত্রগুলি যদি আজ সাধারণ আদর্শের বন্ধনে বদ্ধ না হয়, যদি বিশেষ কোন জাতির প্রত্যক্ষ মঙ্গল সাধনের চেয়ে বড় কোন আদর্শ তার না থাকে, তবে গণতন্ত্রের স্বাধীনতা হারানোর বিপদ উপস্থিত। স্বৈরতান্ত্রিক আদর্শের পথে এর গতিকে বাধা দেবার আর কোন উপায় নেই। নীতিহীন সম্প্রদায় নীতিহীন নেতার (Fuhrer) দয়ার উপর নির্ভরশীল হবেই।

আদর্শে আস্থাবান গণতন্ত্রগুলির সামনে এর চেয়ে কম গুরুতর হ'লেও আরেকটি বিপদ সমুপস্থিত। গণতান্ত্রিক নেতারা স্বাধীনতা, ন্যায়, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতি নীতি সম্বন্ধে যতই আস্থাবান হউন না, এই সব অতীন্দ্রিয় ভাবকে প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রয়োগ করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা তাঁদের নাও থাকতে পারে। অবশ্য দার্শনিক রাজনৈতিক নেতার পক্ষে ট্যাংকের পরিকল্পনা করা কিংবা সেতু নির্মাণ করতে জানার আবশ্যকতা নেই

তাই বলে তাঁর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল্য অবজ্ঞা করা উচিত নয়। বাস্তব জগত সম্বন্ধে বেশী কিছু না জানলে, তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই অন্য লোকের শিল্প-বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারবেন না। তাঁর বিশেষজ্ঞরা এরূপ অধীনস্থ থাকেন যে তাঁরা উচ্চতর রাজনীতির সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। তাঁরা যদি লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন না হন, তবে উপায় নির্দেশ সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশে খুঁৎ থাকবে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের যদি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পটভূমিকা থাকে—এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টারা যদি যে দর্শনে সমস্ত বিজ্ঞান এসে মিলিত হয়, তার সম্বন্ধে বেশী আগ্রহ দেখান, তবে আমাদের রাষ্ট্রনীতিবিদ্ ও তাঁদের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ভেদটা অনেক কমে যায় এবং তাঁরা একযোগে আরও বেশী কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেন।

ব্যবসায়ের নেতৃত্বে সাধারণত পরিচালক এবং তাঁর বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাদের মধ্যে এরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় না। সাধারণতঃ ভাবী কর্ম-পরিচালক (Managing Director) কিংবা সভাপতি (Chairman) তাঁর যৌবনের কয়েক বৎসর ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে ব্যয় করেন এবং তার বাস্তব পারিপার্শ্বিকে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন। তিনি কখন দোকানে কিংবা কার্যালয়ে কাজ করেন, তখন তাঁর সামাজিক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেও পরিচিত হন এবং যে-সব লোকের নেতৃত্ব তাঁকে একদিন করতে হবে তাদেরও তিনি বুঝতে শেখেন : এদের মধ্যে কর্ম-সচিব থাকে, পরিকল্পনাকারী থাকে, গবেষক থাকে এবং ফোরম্যান, দোকানের স্টুয়ার্ড ও অন্যান্য কর্মীও থাকে। তিনি তাঁর ব্যবসায়কে প্রধানত নিজের কিংবা তাঁর অংশীদারদের আয়ের পন্থা হিসাবে না দেখে জনগণ যা চায় কিংবা তাদের যা প্রয়োজন তেমনি জিনিস তৈরি ক'রে সামাজিক সেবা-কার্যেও লাগাতে পারেন। তাঁর মানসিক গঠন এরূপ হ'লে প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ের ভাল নেতা হওয়ার উপযুক্ত আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় সংকল্পের অভাব তাঁর মধ্যে হবে না। তবু ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব প্রায়ই এমন লোকের মধ্যে পাওয়া যায় যাঁদের র জন্য বিশেষ কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নি—কিন্তু যারা ছোট থেকে সুরু ক'রে নিজেদের ব্যবসায় গড়ে তুলেছেন। এরূপ লোকদের আত্মবিশ্বাস এবং তাঁদের জয়ী হবার দৃঢ় ইচ্ছা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের নিজেদের ব্যবসায় তাঁরা ক থেকে ৺ পর্যন্ত ভাল ভাবে জানেন বলে, তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের কয়েকটি অত্যাবশ্যক গুণ থাকে।

সামরিক একনায়কত্বের সঙ্গে তুলনায় শান্তির সময় গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সৈন্যদলের নেতৃত্বের অনেক অসুবিধা ; এক নায়কত্বের নিষ্ঠুর সংশোধনের (ruthless purges) দ্বারা যুদ্ধের মত অবস্থারই সৃষ্টি করা হয়, ফলে স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ পদগুলোতে অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্ক তরুণেরা অত্যন্ত শীঘ্র উন্নীত হ'তে পারে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রে বয়সের সম্মান এত বেশী যে শান্তির সময় যে-সব প্রধান সেনাপতি থাকে তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই বিগত-যৌবন : তাঁরা তাঁদের এই সর্বোচ্চ পদের জন্য তাঁদের নেতৃত্বের বর্তমান গুণের কাছে নয়, অতীতগুণের কাছেই দায়ী। এবং বেশীর ভাগ গণতন্ত্রেই সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি এবং বিমান-সেনাপতির নির্বাচন সীমাবদ্ধ থাকে সৈন্যদের শতকরা সেই ৫ জনের মধ্যে যাঁদের জন্ম হয়েছে অফিসার শ্রেণীতে। এই দুটি কারণেই যে-সব একনায়ক শান্তিপ্রিয় গণতন্ত্র-গুলোকে আক্রমণ করেন, তাঁরা যথেষ্ট প্রারম্ভিক সুবিধা উপভোগ করেন। অবশ্য গণতন্ত্রমূলক রাষ্ট্রগুলো যে এই অসুবিধা ভোগ করেই চলবে এমন কোন কারণ নেই। যে-সব লোক নিম্নস্তরের কর্মচারী পদে কিংবা সাধারণ সৈন্যপদে কাজ করেছে প্রধানত তাদের কমিশন দেওয়ার যুদ্ধকালীন রীতি অপরিবর্তিত রাখা উচিত। সৈন্যদলের উচ্চতর কর্তৃত্বে সহজেই বয়সের ফল কমানো যেতে পারে—উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, স্থল-সৈন্যদলে কমিশন প্রাপ্তদের থেকে অন্য শ্রেণীর অফিসারদের যেমন বিভিন্ন ক'রে রাখা হয়, তেমনি সেনাপতি ও বিভাগীয় অফিসারদের মধ্যেও বিভিন্নতার রেখা টানা যায়। তাহলে প্রথমত উচ্চ সামর্থ্য এবং নেতৃত্বের প্রাথমিক গুণের জন্য নির্বাচিত ভাবী সেনাপতি তাঁর যৌবনের কয়েক বছর বিভাগীয় অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে কাটাবেন—তার পর ত্রিশ বছর বয়েস পেরিয়ে গেলে তিনিও একটি

বিভাগের কর্তৃত্ব পাবেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি চলবে এবং বিভাগীয় অফিসারের সঙ্গে তাঁর শিক্ষার ততটাই বিভিন্নতা থাকবে যতটা একজন এন্. সি. ও (N. C. O.—non-commissioned officer) এবং তাঁর মধ্যে থাকে। এই রকম পদ্ধতিতে পরিকল্পনা করলে গণতন্ত্রের সৈন্যদল যুবক সেনাপতিদের নেতৃত্বে যুদ্ধক্ষেত্রে নাম্‌তে পারে।

শান্তিকালীন দুঃসাহসিক অভিযানে, যেমন আবিষ্কার, পর্বতারোহণ কিংবা সামুদ্রিক অভিযানে, নেতৃত্বের অত্যাবশ্যক গুণগুলোর দরকার হয়। জাহাজের ক্যাপ্টেন্ এবং পর্বতের পথ-প্রদর্শকের একই রকম গুণের দরকার। নাবিক যেমন সমুদ্রের প্রকৃতি চেনে তেমনি পর্বত এবং তুষারের রাজ্যে কি পাওয়া যাবে পথ-প্রদর্শকের তা জানা চাই।...

এই রকম শান্তিকালীন দুঃসাহসিক অভিযান যে শুধু নেতৃত্বের বিভিন্ন গুণ দাবী করে তাই নয়—সেগুলোকে পরিবর্ধিতও করে। যে-সব যুবক-যুবতী একদিন জীবনের বিভিন্ন বিভাগে নেতৃত্ব করবে—অথচ এতদিন যারা শুধু নিম্ন পদে তাদের কাজ শিখে এসেছে, এই সব অভিযান তাদের জন্য মূল্যবান্ শিক্ষা বিধান করে। পর্বতে কিংবা সমুদ্র-পথে পথ-প্রদর্শক কিংবা ক্যাপ্টেনের পক্ষে তার কাজ জানা কতটা প্রয়োজনীয়, সার্থক নেতৃত্বে আত্ম-বিশ্বাস এবং দৃঢ়সংকল্প কত বিরাট অংশ গ্রহণ করে, নেলসনের ক্যাপ্টেন্‌দের মত নেতা যদি তাঁর সহানুভূতিশীল বুদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্বের সাহায্যে তাঁর দলকে একটা প্রকৃত ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত করেন, তবে কি বিভিন্নতা হয়, এবং কি ক'রে শ্রেষ্ঠ নেতারা তাঁদের অনুসরণকারীদের সঙ্গে সাধারণ প্রত্যক্ষ অভিযানের চেয়েও বিস্তৃততর দৃষ্টি ভঙ্গীর অংশীদার হন—এ সবই পার্বত্য এবং সামুদ্রিক অভিযান শিক্ষা দিতে পারে। অভিযানকারীরা আরও এমন শিক্ষা লাভ করতে পারে যা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগবে। ধরুন, সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হ'লে বিপদ কেমন সহজেই অন্তর্হিত হয়ে যায়। উপত্যকা থেকে যেমন দেখা যায়, কোন পর্বতই ততটা উচ্চ নয়।

ব্যায়াম-চর্চা এবং উন্মুক্ত মাঠে ক্রীড়া প্রভৃতির চিত্ত-বিনোদনের মূল্য অনেক হ'লেও, নেতৃত্বের গুণগুলো দাবী করা এবং শিক্ষা দেওয়া ব্যাপারে সামুদ্রিক কিংবা পার্বত্য অভিযান কিংবা সামাজিক সেবার সঙ্গে এদের তুলনা হয় না। যারা খেলাধূলো করে তাদের সম্বন্ধে এটা যদি সত্য হয়, তবে যারা শুধু নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্য উপভোগ করে, তাদের সম্বন্ধে আমরা কি বলব? (বাইচ খেলা হয়ত একটা ব্যতিক্রম। বাক্তির চেয়ে দীর্ঘ নৌ-চালনা শিক্ষায় দাঁড়ীদের চরিত্রে আরও অনেক বেশী স্থায়ী ফল সৃষ্টি হ'তে দেখা যায়। নাবিকদের পরস্পরের মধ্যে এবং তাদের শিক্ষকের সঙ্গে সম্বন্ধের উপর কৃতকার্যতা কিংবা ব্যর্থতা অনেকটা নির্ভর করে। বাইচ খেলা শুধু শুধুই অক্সফোর্ড এবং কেম্‌ব্রিজের খেলাধূলোর মধ্যে স্থান লাভের সম্মান পায় নি। কিন্তু অ্যামেরিকায় স্কুল এবং কলেজের ফুটবল ও অন্যান্য টীমের সভ্যরা একই টেবিলে আহার করে এবং সর্বদা একত্র থেকে নাবিকদের মতই সঙ্ঘবদ্ধ মনোবৃত্তি অর্জন করে।)

প্রত্যেক রকমের শিক্ষায় শিক্ষক এবং ছাত্রের সম্পর্ক অংশত নেতা এবং নীতের সম্পর্কের মত। ভাল শিক্ষককে তাঁর ছাত্রদের জান্‌তে হবে; তিনি আত্মবিশ্বাসী এবং নিরভিমান হবেন; তাঁর কার্যের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান থাকবে এবং কৃতকার্যতা লাভের দৃঢ়সংকল্প তাঁর থাকবে; তাঁর ছাত্রদের সম্বন্ধে এবং যে-সব বিষয় তিনি শেখানোর চেষ্টা করেন, সে-সব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়; এবং সর্ববিষয়ে সাহায্যকারী ভাল বন্ধু এবং সহপাঠী হিসাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করাও তাঁর ছাত্রদের কর্তব্য। প্রকৃত পক্ষে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকের সমগ্র জীবন সম্বন্ধে এমন একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী থাকে যেটা তাঁর ছাত্ররা ধীরে ধীরে বর্ধিষ্ণু মাত্রায় অনুসরণ করে। সংক্ষেপে যথেষ্ট আঙ্গিক-জ্ঞান ছাড়াও তাঁর চরিত্রে নেতৃত্বের এমন অন্যান্য গুণ থাকা চাই যাতে তাঁর ছাত্ররা তাঁর মধ্যে একটি মহৎ লোকের সন্ধান পায় এবং জীবনে প্রত্যেকেই তাঁর মত হ'তে চায়।... যে শিক্ষকরা এমনি করে অবিভক্ত মনে যুবক-যুবতীদের শিক্ষা বিধানে সাহায্য করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই অতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) এবং প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেল্টের চার প্রকারের স্বাধীনতার (Four Free-

doms) নীতিতে নূতন সাহসী জগৎ গড়ে তোলায় মূল্যবান্ অংশ গ্রহণ করবেন।*

—

রাশিয়া কি হারিয়েছে

[ডনেজ্‌ এবং ইউক্রেনের যন্ত্র-শিল্প এবং কৃষিকার্যের অঞ্চল হারানোর ফলে এবছরে রাশিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতার কি তারতম্য হবে এ প্রবন্ধে তারই আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটির লেখক ই. এম্. ফ্রাইড্‌ফিল্ড (E. M. Friedfield) নাম-করা সাংবাদিক। প্রবন্ধটি লণ্ডনের La France Libre পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।]

'পোড়া মাটি' নীতি অনুসরণের ফলে জার্মানরা তাদের রাশিয়া বিজয়ের কোন লাভই পাচ্ছে না একথা ভাবতে আমরা ভালবাসি। বর্তমান সম্বন্ধে একথা অবশ্য সত্য; কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, আজ হোক্ কাল হোক্ দক্ষিণের কৃষিকার্য, শিল্প ও খনি অঞ্চল হারিয়ে রাশিয়ার সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হবে। এই দিক থেকেই জার্মানির ইউক্রেন্ এবং ডনেজ্‌ অধিকার এবং ককেসাস্ ও কাস্পিয়ানের দিকে অভিযান বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে।

রাশিয়ার গোলাঘর হিসাবে ইউক্রেনের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা হ'য়ে থাকে; এই প্রদেশের আয়তন গোটা রাশিয়ার পঞ্চাশ ভাগের একভাগ—আর কালো মাটি নামে প্রসিদ্ধ কৃষি-অঞ্চল রাশিয়ার মোট কর্ষিত অঞ্চলের এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু একথা সাধারণত ভুলে যাওয়া হয় যে, ইউক্রেনে তিন কোটি দশ লক্ষ লোকের বসতি—অর্থাৎ রাশিয়ার মোট লোক-সংখ্যার ১৮'২ ভাগ এই অঞ্চলে বাস করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ্‌লে দেখা যায় যে রাশিয়ায় উৎপন্ন মোট গমের মধ্যে শতকরা ২২'৭ ভাগ গম এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। এই পরিমাণটা বেশী বটে —তবু এর মধ্যে 'রাশিয়ার গোলা ঘর' নামের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক গত দশ বছরের মধ্যে রাশিয়ার গোলা ঘর পূর্ব থেকে আরও পূর্বে সরে গেছে।

পক্ষান্তরে ইউক্রেনে চিনি তৈরী হয় সব চেয়ে বেশী—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ায় উৎপন্ন চিনির মধ্যে শতকরা ৬৮ ভাগই ছিল ইউক্রেনের চিনি; খাদ্য-সরবরাহের দিক থেকে আমাদের সোভিয়েট মিত্ররা চিনির অভাব সবচেয়ে বেশী অনুভব করছেন।

কিন্তু এটাও ভুললে চলবে না যে, উত্তর-ককেসাসের যে তিনটি অঞ্চল শত্রুরা নিয়েছে—কৃষ্ণসাগর, আজভ সাগর এবং স্ট্যালিন্‌গ্রাড্‌ অঞ্চল, সে তিনটি অঞ্চল কৃষি-কার্যের দিক থেকে রাশিয়ার সমৃদ্ধতম অঞ্চলের মধ্যে পড়ে; এ সব অঞ্চলের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রায় ইউক্রেনের সমান। কাজেই সবশুদ্ধ সোভিয়েট রাশিয়া তার যুদ্ধ-পূর্ব খাদ্য-সরবরাহের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হয়েছে খনিজ দ্রব্যের দিক থেকে—বিশেষ ক'রে কয়লা এবং লোহার দিক থেকে। যুদ্ধের পূর্বে ডন অববাহিকা থেকে রাশিয়ায় শতকরা ষাট ভাগ কয়লা পাওয়া যেত এবং ধাতু-দ্রব্যের কাজে ব্যবহারের উপযোগী ভাল এক প্রকারের কোক্ কয়লাও এখানে পাওয়া যেত। এই প্রকারের গুণ বিশিষ্ট কয়লা-উৎপাদনকারী আর একটি মাত্র খনি কুজনেট্‌স্কে আছে—এই খনি থেকে যুদ্ধ-পূর্বরাশিয়ায় মোট কয়লার শতকরা ১৪'৪ ভাগ পাওয়া যেত। নিঃসন্দেহে এই পরিমাণ এখন আরও বেড়ে গেছে, কেননা কুজনেটস্কের খনি খুব সমৃদ্ধ এবং এই খনি থেকে শুধু যে কুজবাসের (সাইবেরিয়ার 'কামারের অববাহিকা') শিল্প কেন্দ্রগুলিতেই কয়লা সরবরাহ করা হয় তা' নয়, উরাল-ভল্গা অঞ্চলে—এমন কি সুদূর প্রাচ্যের শিল্পাঞ্চলেও এখান থেকে কয়লা সরবরাহ করা হয়।

পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের এক কোটি আশি লক্ষ টন কয়লার পরিবর্তে দুই কোটি আশি লক্ষ টন কয়লা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার মোট উৎপাদনের পরিমাণ এক হাজার দুইশ সত্তর লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৪২ খৃস্টাব্দে দুই হাজার চারশ ত্রিশ লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ডোনেজের কয়লার পরিমাণ শতকরা ষাট ভাগের পরিবর্তে শতকরা ৪৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল। অন্যান্য কয়লার

* [The Contemporary Review পত্রিকায় প্রকাশিত Maxwell Garnett-এর লেখা Leadership নামক প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ]

খনি আছে কারাকস্থানে, মস্কো অঞ্চলে, উরাল্‌-ভল্গা অঞ্চলে, পূর্ব সাইবেরিয়ায় এবং সুদূর প্রাচ্যে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ কয়লায় কোকের কাজ হয় না এবং ধাতু দ্রব্য গলানোর কাজেও ব্যবহার করা যায় না।

লৌহের সম্বন্ধে বলা যায় যে, যুদ্ধের পূর্বে ইউক্রেনস্থিত ক্রিভোয়া রগের সমৃদ্ধ খনিগুলি থেকে সোভিয়েটের মোট উৎপাদনের শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী লোহা পাওয়া যেত। গুরুত্বপূর্ণ আর যে কয়টি লৌহ-খনি আছে, সেগুলো উরাল-ভল্গা অঞ্চলে—প্রধানত ম্যাগ্‌নিটোগর্স্কে ভার্ড্‌লোভ্‌স্কে এবং চেলিয়াবিনস্কে। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সব খনির উৎপাদনের পরিমাণ আশি লক্ষ টনেরও বেশী হয়েছিল—অর্থাৎ রাশিয়ার মোট উৎপাদনের শতকরা একত্রিশ ভাগ। এখানেও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনানুসারে গত চার বছরে উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন-না এখানকার লৌহখনিগুলি বেশ সমৃদ্ধ এবং ইউক্রেনের খনিগুলির সঙ্গে তুলনীয়। মধ্য রাশিয়ায়, মস্কো এবং টুলার চতুর্দিকে, কুজবসে এবং সুদূর প্রাচ্যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ (মোট সোভিয়েট উৎপাদনের মাত্র ছয় ভাগ পাওয়া যায়) কয়েকটি লৌহ-খনি আছে।

ঢালাই লৌহ এবং ইস্পাত তৈরী কার্যে আরেকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য ম্যাংগানীজ (Manganese)। ম্যাংগানীজ উৎপাদনে রাশিয়াই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করত—পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা চল্লিশ ভাগের বেশীই পাওয়া যেত রাশিয়া থেকে। এই ম্যাংগানীজের প্রায় সবটাই পাওয়া যেত দুটো খনি থেকে: ইউক্রেনের নিকোপোল (শতকরা ৬৫ ভাগ) এবং ট্রান্স-ককেশীয়ার চিয়াটুরী (শতকরা ৬০ ভাগ) থেকে। উরাল এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ায় আর যে সব ম্যাংগানীজের খনি, তাদের গুরুত্ব কম। কিন্তু নিকোপোল খনিগুলি বর্তমানে জার্মানদের হাতে এবং চিয়াটুরীর খনিগুলিও জার্মান সৈন্যরা বিপন্ন ক'রে তুলেছে।

বড় যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে কয়লা, লৌহ এবং ম্যাংগানীজ, অতি প্রয়োজনীয় এবং ঢালা লোহা ও ইস্পাত নির্মাণ ত সম্পূর্ণ রূপে এগুলির উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের পূর্বে যে অনুপাতে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল এই উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করত, নীচে তার একটা তালিকা দেওয়া গেল:

	ঢালাই লোহা শতকরা	ইস্পাত শতকরা
দক্ষিণ-রাশিয়া	৬৩	৫৩
উরাল-ভল্গা	১৮	২০
মস্কো এবং টুলা	৮	১৮
সাইবেরিয়া (কুজবাস ইত্যাদি)	১০	৯

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে দক্ষিণ-রাশিয়ার সঙ্গে তুলনায় পূর্ব-অঞ্চলের আপেক্ষিক অংশের পরিমাণ বেড়ে গেছে, কিন্তু ইউক্রেনে যেমন কোক্‌ কয়লার পাশাপাশি লৌহ এবং ম্যাংগানীজের খনি আছে, এরূপ অনুকূল অবস্থা আর কোথাও নেই। পূর্ব দিকে কোক্‌ কয়লার খনি হচ্ছে কুজনেটস্ক অববাহিকায়—আর প্রায় ১৫০০শ কিলোমিটার পশ্চিমে উরাল-ভল্গা অঞ্চলে হ'চ্ছে লোহা। একা ইউক্রেন একতৃতীয়াংশ, মস্কো-লেনিনগ্রাড অঞ্চল প্রায় অর্দ্ধেক, উরাল-ভল্গা মাত্র শতকরা বারো ভাগ এবং ট্রান্স-ককেসিয়া শতকরা সাত ভাগেরও কম কোক্‌ কয়লা উৎপন্ন করে। এ ব্যাপারেও বিশেষ ক'রে পূর্বাঞ্চলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে নতুন ভাবে উন্নতি করা হয়েছে —তবে নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়লা ও তড়িৎ-শক্তি সীমাবদ্ধ হওয়ায়, বাধ্য হয়ে এ উন্নতিও হয়েছে সীমাবদ্ধ। এলুমিনিয়ামে তড়িৎ-শক্তি প্রয়োগের যথেষ্ট প্রয়োজন বলেই, প্রধানতঃ ইউক্রেনে এলুমিনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্রীভূত (সোভিয়েট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ), যদিও বক্সাইট পাওয়া যায় প্রধানতঃ লেনিন-গ্রাডের পূর্ব দিকে টিখ্‌ভিনে। সম্প্রতি উরাল, মধ্যএশিয়া এবং সাইবেরিয়াতেও বক্সাইট আবিষ্কার করা হয়েছে এবং যুদ্ধের পূর্বে এলুমিনিয়াম শিল্পকে ইউক্রেনের কেন্দ্র থেকে অপসারিত করার উদ্দেশ্যে উরালে এবং ক্যারে-লিয়াতে নূতন এলুমিনিয়ামের ঢালাই কারখানা নির্মাণ করা হচ্ছিল।

এখন তৈলোৎপাদনের কথা আলোচনা করা যাক।

যুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া বৎসরে তিন কোটি টন তৈল উৎপাদন করত—তার মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগই আসত ককেশাস থেকে এবং বাকী দশ ভাগ পাওয়া যেত উরাল-ভল্গা, এম্বা, কাস্পিয়ানের উত্তরাঞ্চল, তুর্কিস্তান এবং সাখালিন দ্বীপের তৈলাঞ্চল থেকে। বাকুর তৈল খনিগুলিই সোভিয়েট উৎপাদনের তিনচতুর্থাংশ দিত; গ্রজ্‌নীর তৈল-খনি থেকে শতকরা ৯ ভাগ এবং মাইকপের থেকে শতকরা ৬ ভাগের কিছু বেশী পাওয়া যেত। যদিও মাইকপ ইতিপূর্বেই জার্মানীর হাতে চলে গিয়েছে এবং গ্রজনীও ভীষণভাবে বিপন্ন, তবু বাকু ককেশাসের প্রবল প্রতিরোধের দ্বারা সুরক্ষিত এবং মাখাচ্‌কালা থেকে বাকু পর্যন্ত কাস্পিয়ানের তীর ধ'রে যে রাস্তা চলে গেছে, সে রাস্তাটি তার বন্ধুর প্রকৃতির জন্য আত্মরক্ষার ব্যাপারে খুব উপযোগী।

বস্তুতঃ রাশিয়ার পক্ষে বাকু হারানোর চেয়ে বাকু থেকে বিচ্ছিন্ন হবারই সম্ভাবনা বেশী অবশ্য যদি জার্মানরা ভল্গা বদ্বীপে অ্যাস্ট্রাখানে পৌছাতে পারে। ককেশাসের পেট্রল চলাচল করে দুটি রাস্তা ধরে; প্রথমত, তেল-নলের (pipe-line) সাহায্যে কৃষ্ণসাগরের বন্দর বাটুম এবং টুয়াপ্‌সেতে এই তেল নিয়ে যাওয়া হয়—পরে ইউক্রেনের কেন্দ্র রস্টভ ও ট্রুভোভায়াতে এই তেল যায়। দ্বিতীয়ত, ভল্গার জলপথে এবং উত্তরে লেনিনগ্রাড পর্যন্ত বিভিন্ন খালের সহযোগে সংযুক্ত নদীপথে এই তেল সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে এই একমাত্র পথ উন্মুক্ত আছে—কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সাধারণত নভেম্বর মাসে এই চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং এপ্রিলের পূর্বে আর সুরু হয় না।

কিন্তু রাশিয়ার সৈন্যদল যদি বাকু থেকে বিচ্ছিন্নও হয়ে যায়, তবু যতটা মনে করা হয় তাদের অবস্থা ততটা বিপন্ন হবে না। সোভিয়েট তৈল-খনিগুলোর সহজ-ভেদ্যতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট সামরিক দিক থেকে আরও বেশী সুবিধাজনক স্থানে নতুন তৈলাঞ্চল সৃষ্টি করতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার করা হয়েছিল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উরাল-ভল্গা জিলার ইসিম্‌বেভোতে (তথাকথিত "দ্বিতীয় বাকু")। শীঘ্রই বোঝা গেল যে, গোটা অঞ্চলটাই তেলের দিক থেকে সমৃদ্ধ এবং কয়েক স্থানে—বিশেষ ক'রে বশুকস্তান, টুইমাজ, সিজ্রান এবং এমন কি পার্মেও তৈল-উত্তোলন সুরু হয়েছিল।

সংরক্ষিত তৈলের পরিমাণ বাকুর মতই মনে হয়, কিন্তু ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে উৎপাদনের পরিমাণ বিশ লক্ষ টনের বেশী হয় নি। এর কারণ এই ছিল যে, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় তৈল-খনন-যন্ত্র কিংবা বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার তৎকালে ছিল না। সেই সময় রুশরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে যন্ত্রাদি পেতে অনেক কষ্ট ভোগ করছিল। যাহা হউক, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে উরাল-ভল্গা অঞ্চল থেকে প্রাপ্য তেলের পরিমাণ ঠিক করা হয়েছিল ৭৩ লক্ষ টন এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে—বিশেষ ক'রে এম্বা, তুর্কমেনিয়া ও সাখালিন থেকে আশা করা গেছিল ৪১ লক্ষ টন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে অনুভূত অসুবিধা আর এখন রুশদের নেই—এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি: পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রাদি সরবরাহ করছে এবং যদি ককেশাসের তৈলখনির কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তবে পূর্বাঞ্চলে কাজ করার জন্য অনেক এঞ্জিনিয়ারকেও পাওয়া যাবে। তা ছাড়া বর্তমানে রাশিয়া যখন ইউক্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তখন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের তুলনায় তার তেলের প্রয়োজন তিন কোটী টনের অনেক নীচে। যদি ককেশাস ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে রাশিয়ার তেলোৎপাদন এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টনের সমান কিংবা তার চেয়ে কমও হয়, তবে রাইখ গভর্ণমেণ্টর চেয়ে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের অবস্থা ভালই থাকবে।

উত্তর-ককেশাসের তৈলাঞ্চল—মাইকপ (Maikop) এবং হয়ত গ্রজনী—হারালে সোভিয়েট সরবরাহ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, কেন-না উল্লিখিত অঞ্চলের তৈলোৎ-পাদন রাশিয়ার মোট তৈলোৎপাদনের শতকরা ১৪ ভাগের বেশী নয়। রাইখ গভর্ণমেণ্টের দিক থেকে মাইকপ্ এবং গ্রজ্‌নী অধিকার খুব লাভজনক। এই দুটি অঞ্চল বছরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন তেল উৎপাদন করে অর্থাৎ যে রুমানিয়ার কাছ থেকে রাইখ গভর্ণমেণ্ট তার

পেট্রল সরবরাহের প্রায় অর্ধেক পায়, তার সমান। অবশ্য প্রধান প্রশ্ন এই যে, জার্মানরা কখন এই তৈলখনিগুলো কাজে লাগাতে পারবে—কেন-না রুশরা পশ্চাদপসরণের সময় এগুলোকে নিয়মিত ভাবে ধ্বংস ক'রে গেছে।

এটাও উল্লেখ করা উচিত যে, রুশরা গত দশ বছরের মধ্যে তৈলোৎপাদনকারী সমস্ত অঞ্চলে—বিশেষ ক'রে উরাল-ভল্গাতে, আধুনিক তৈলসংশোধনাগার নির্মাণ করেছে যাতে তারা বাকু এবং বাটুমের কারখানাগুলোর অভাব না অনুভব করে। পক্ষান্তরে ককেশাসের পেট্রল—বিশেষ ক'রে বাকুর—ইউক্রেনের অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে অপরিহার্য। রাইখ গভর্ণমেণ্ট যে পর্যন্ত ইউক্রেনের কৃষিকার্যে কয়েক লক্ষ টন পেট্রল প্রয়োগ না করতে পারে, সে পর্যন্ত জার্মানদের জন্য বেশী গম কিংবা চিনি পাবার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এ কয়েকটি তথ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার ক্ষতির কিছুটা পরিচয় দিতে পারে। প্রধানত গভর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতা এবং অধিবাসীদের আত্মত্যাগের ফলে, প্রাচ্যে আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত একটা শিল্প গ'ড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং তার ক্ষতি সত্বেও রাশিয়া এখনও যন্ত্র-শিল্পের দিক থেকে একটা বিরাট শক্তি। তবে এখন আর মানবীয় এবং প্রাকৃতিক শক্তির দিক থেকে রাশিয়ার সম্পদকে অ-নিঃশেষণীয় বলা চলে না—কারণ সোভিয়েটের এই শক্তি ভয়ানক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক বছর আগের চেয়ে রাশিয়া আজ দুর্বলতর এবং আর এক বছর পরে যে আরও দুর্বল হ'য়ে পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা থেকে রাশিয়ার সরবরাহ-বৃদ্ধির প্রয়োজন বর্তমান অবস্থার স্বাভাবিক ফল।

—

(দেশী পত্রিকা হইতে)

শিক্ষা সাহিত্য ও সমাজ

[পাটনার বাঙলা মাসিক পত্রিকা 'প্রভাতী' থেকে সঙ্কলিত]

দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলবার দায়িত্ব এবং বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার রাষ্ট্রের যে কর্ত্তব্য আমাদের দেশে তথাকথিত শিক্ষিত-শাসক-সমাজ তা অস্বীকার করেন। শিক্ষার স্বর্ণময় আলোতে দেশ ও সমাজের সূচীভেদ্য অন্ধত্বও জড়পিণ্ডের মত কুসংস্কারের গতানুগতিকতা ছিন্ন হয়ে যাবে, এমন কি দেশের অবচেতন মনের অভ্যন্তরে যে শৈথিল্য ও কদর্য্যতা আছে—শিক্ষার দরবারে তার রেশটুকুও দেখতে পাওয়া যাবে না—যদি আমাদের ছাত্রসমাজ বা শিক্ষক সমাজ তার জন্য প্রস্তুত থাকে। পরাধীন দেশে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে যে অবনতি এসেছে—দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ মূর্খ অনভিজ্ঞ নরনারী গ্রাম্য আবহাওয়ায় মৃত শতাব্দীর পর শতাব্দী পরম্পরের যাত্রায় চলেছে—তাদের অবিরাম দারিদ্র্য-ক্রন্দন উন্মুক্ত প্রান্তরের নৈশ অন্ধকারে প্রেতের রুদ্ধ স্বরের মত শোনাচ্ছে—তার জন্য সর্ব্বতোভাবে দায়ী আমাদের রাষ্ট্র আর শিক্ষিত শোষক সমাজ। এই শিক্ষিত শোষক সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দেশের শিক্ষা ও উন্নতির সোপানে অত্যুচ্চ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দেশের অশিক্ষার জন্য যদি আমাদের রাষ্ট্রই দায়ী হয়—তবে জন্মের পর মুহূর্ত্ত থেকে নিয়ে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দারিদ্র্য ও অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম এবং ধীরে ধীরে বৈতরণীর দিকে দাঁড় টেনে জীবনের বোঝা নিয়ে চলার যে কারুণ্য ও জীবনের এই যে ট্রাজিডি তার জন্যও সম্পূর্ণ দায়ী আমাদের রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র ত কোন বস্তু নয় যাকে আমরা কিছু বলতে পারি অথবা যার উপর আমাদের জোর চলে। ব্যক্তি-সমষ্টিকে নিয়ে আমাদের দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে—তার মধ্যে মাথা গলাতে গেলে মাথাটা সেখানে রেখে আসতে হবে। অথচ আমাদের নিয়েই যখন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে—সেখানে আমাদের জোর থাকবে না কেন? অবশ্য এর খুব সহজ উত্তর আছে—যেহেতু আমাদের দেশ পরাধীন। তাই বিদেশী শাসক সমাজ ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য যেটুকু শিক্ষা ও জ্ঞান

প্রয়োজন সেইটুকু দিয়ে খালাস। দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার যে আবশ্যকতা আছে—আমাদের শিক্ষিত শাসকেরা তা অস্বীকার করেন। তাই এর আগে আমরা দেখেছি সর্বপ্রথম যেদিন 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে' সেদিন ফোর্ট উইলিয়মে ভারতীয় সামান্য অভিজ্ঞ লোকদের কেরানীর কাজ শিখিয়ে নেওয়া হ'ত এবং তার জন্য যেটুকু লেখাপড়া প্রয়োজন শুধু সেইটুকু শিক্ষাই তাঁরা পেতেন। আমাদের দেশে বিদেশী শাসক সমাজ শিক্ষার উন্নতির দিকে দৃক্‌পাত করেন নি; সাহিত্য ও কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে জাতীয় জীবনে প্রবহমান স্রোতকে জীবন্ত রাখবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে—তা তাঁরা ভাবেন না। আমাদের বেশী শিক্ষা দিলে যদি আমরা সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের চাল বুঝে ফেলি—দেশকে ভালবাসি, স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হই—তাই তাঁরা শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা দেখান। একটু বেশী শিক্ষা পেলেই তাঁরা ক্রমাগত মুখ চেপে ধরতে যান।

* * *

আজকের মানব-ইতিহাসে এই যে দুর্দিন এসেছে—সভ্যতার চরম শীর্ষে মানুষের বর্ব্বরতা ও পৈশাচিক অভিযান—যে কৃষ্টি, যে সংস্কৃতি, যে ভাবানুভূতির গভীরতা ও সার্ব্বজনীনতা আমাদের সভ্যতার উত্তরাধিকারী করেছিল—সেই সংস্কৃতি আজ বিচ্ছিন্ন, পদদলিত, বিধ্বস্ত। এই দুর্দ্দিনের আগমনী সাড়া দিয়েছিল পাশ্চাত্য দেশে। তাই সোভিয়েট ও চীন দেশে শিক্ষার যে অভিযান চলেছিল এবং আজকের প্রমত্ত ধ্বংসলীলার মধ্যে ও ট্রেঞ্চে বিধ্বস্ত বাড়ীর নীচে, খোলা মাঠের বুকে শিক্ষার জয়স্রোত চলেছে আজও—তার ইতিহাস যেমন বিস্ময়কর তেমন চমকপ্রদ। সেখানকার রাষ্ট্র দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে বৃহত্তর জগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বমৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ দেশের নরনারী সাম্যের জয়গান গায়, জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে নেয় সম্পূর্ণভাবে। সেটা তাদের যত না দেশের গৌরব, তত শিক্ষার প্রভাব ও বিস্তারের গৌরব।

রোমাঁ রোলাঁ তাঁর "The Soul Enchanted"-এ এক জায়গায় লিখেছেন যে শিশুর মধ্যে আলোর আকাশ ঢেকে যায় ক্রমে অন্ধকারের শাপে :

"There are two beings in him: the light from within and the shadow from without. As the body of the child develops, the shadow increases with it and covers the light."

দেশ-বিদেশের এই অন্ধকারের শাপ যাতে শৈশব ও কৈশোরকে কুঁকড়ে মেরে ফেলতে না পারে তার জন্য যে-সব আয়োজন হয়েছে, আমাদের দেশে তার কিছুমাত্র হয় নি। সেই কথাই আজ বলব।

* * *

মহাচীন-শিক্ষা-সংগঠন প্রণালীর ক্রমোন্নতি এবং বিশ্ব-মানবতার স্বীকৃতি মহাচীনের অতীতের দেশ ও সমাজকে ভেঙেচুরে এক অখণ্ড নতুন চীন জাতি ও সমাজ গড়ে তুলেছে—সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে তার স্থান। ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষী প্রাদেশিক দল মহাচীনের জাতীয়তার জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, ধর্ম্ম ও সংস্কারের বেড়াজাল পেরিয়ে এক হয়ে মিশে গেল। তারা বললে :

"The state comes first: the nation is above all."

দেশের কৃষি, শিল্প ও আর্থিক উন্নতি এবং স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বারা মহাচীন সভ্যতার আর এক আদর্শ দেখিয়ে দিলে। আজকের এই যে ৪৫ কোটি চীনারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম চালিয়েছে, সেজন্য সেখানকার ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ বহু কষ্টে জীবনধারণ করছে—একই ঘরে হয়ত তিন-চার পরিবার বাস করছে, ছাত্রেরা খোলা মাঠে স্কুল চালাচ্ছে। সেখানে এই যে এক নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে সেজন্য প্রশংসা করা যেতে পারে মহাচীনের শিক্ষা-পদ্ধতির—যে শিক্ষার মধ্য দিয়ে নবতর সমাজ গড়ে উঠতে পারে, মরণোন্মুখ জাতি ও দেশ জেগে ওঠে—জীবন্ত হয়, প্রাণবান্ হয়; দেশের অশিক্ষিত নরনারীর জন্য সেখানকার ছাত্র-সমাজ ভীষণ সংগ্রাম চালিয়েছে বাধা ও বিঘ্নের বিরুদ্ধে—এক কথায় চীনের সমগ্র জনসাধারণ দেশ, সমাজ ও জাতির উন্নতিবিধানে সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মকুশলতার মধ্য দিয়ে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মহাচীনকে বাঁচিয়ে তুলছে। সেই

সংগ্রামের কিছু আভাষ পাওয়া যাবে Miss Nancy H. Chang-এর পত্রে :

"Days pass quickly now and still we are struggling onwards : each with his own works and problems. The student fighting against educational and economical difficulties; the farmers fighting for their cows and the poor fighting for their living; but we are not discouraged. In spite of the physical hardships and material insufficiency our venerable university is still going strong, undaunted and undeterred. We are all proud to be her students, though to be her students means suffer."

এই দুঃখ-কষ্টকেই তারা স্বাধীনতার সোনার কাঠি করে তুলেছে।

যুদ্ধের সাময়িক বিপদের সময়ও তারা শিল্পশিক্ষায় অবহেলা করে নি। তারা বইপড়া বিদ্যার চেয়ে practical learning-এর উপর বেশী জোর দেয়, আমাদের দেশের মত কলেজী বিদ্যার মোহে গর্বান্বিত হয়ে শিক্ষার মূল্যকে কমিয়ে দেয় না। তারা পুঁথির চেয়ে কারখানাকে ভাল ক'রে চেনে জানে বোঝে। তাই তারা বলে :

"Turn every school into a factory and every student into a labourer."

মহাচীনের এই industrialisation (যন্ত্রশিল্পের প্রচলন) দেশের আর্থিক উন্নতির বহুল পরিমাণে সহায়তা করেছে। শুধু তাই নয়—মহাচীনের দশ কোটি কিশোর ও তরুণ ছেলেমেয়ে 'বয়স্কাউট' ও 'গার্ল গাইড'-এর শিক্ষা পাচ্ছে প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুলে। আধুনিক পদ্ধতিতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সমাজের উন্নতি ও সেবাকেই তারা আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। National Boy Scout Association-এর ১৫ হাজার ছেলে আজ যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। মহাচীনের এই সামাজিক ও রাষ্ট্রীক উন্নতি শুধু সম্ভব হয়েছে সেখানকার ছাত্রসমাজ ও কিশোর-সমাজের অগাধ উদ্যমের জোরে।

শিক্ষা মানে যে শারীরিক ও মানসিক আনন্দ সেকথা আমাদের দেশের অভিভাবকেরা বুঝতে চান না। স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ ক'রে কলেজের মুখ দেখতে না দেখতেই ছোটলাটের দপ্তরখানায় ত্রিশ টাকার কেরানীর চাকুরী এবং কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে ক'রে দশ-বারটা ছেলেমেয়ে নিয়ে মাত্র ত্রিশ বছরেই বৃদ্ধ হয়ে প'ড়ে চণ্ডীমণ্ডপে সান্ধ্য মজলিস্ কিংবা কাশীবাস—আমাদের দেশের একজন ছেলের এই নিখুঁত ছবি। শৈশবের রঙীন স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আমাদের এই বাঙালী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা—যারা মুড়ি-নারকেল খেয়ে আজীবন কাটায়—হাঁটুর উপর ময়লা কাপড় পরে দারিদ্র্যের বড়াই করে। ছেলেমেয়েদের স্বাধীন ভাবে ভাববার ও বোঝবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, আমাদের দেশের বাপ-মা'রা তা মানতে চান না। ছেলে কোন দিন বাপের মুখের উপর কথা বলতে সাহস করে, না বাপই ছেলেকে কোন দিন বন্ধু ভাবে ভেবে দেখবার স্বপ্ন দেখেন? নিজে যেভাবে তারা মানুষ হয়েছেন, ঠিক সেই ভাবে মানুষ না হয়ে যদি কোন ছেলে নিজের জীবনে কিছু বৈচিত্র্য এনে ফেলে (যেন কত বড় অপরাধ!) তবে সে আমাদের দেশে কুলাঙ্গার, পাষণ্ড ইত্যাদি বলেই গণ্য হবে। চাষার ছেলেকে চাষা হ'তে হবে, নয় ত সে সমাজে স্থান পাবে না। কেরানীর ছেলে ডাক্তার হবে না, জজের ছেলে মাঠে আসবে না লাঙল-কাস্তে হাতে করে, ডোমের মেয়ে দাসী হ'তে পারবে না, ছুতোরের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে না! এ যেন সব জেলখানার কয়েদী, এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে যাবার পাসপোর্ট নেই! জীবনে স্বপ্ন দেখবার জো নেই, ঘুম ভেঙে যাবে। এ দেশে বর্ণ, শ্রেণী এবং জাতি দেখে তবে শিক্ষার পুরস্কার দেওয়া হয়। তাই চাষার ছেলে বি-এ পাশ করে ডিগ্রীর মালা পরে যখন ফিরে আসে—কলেজী বিদ্যার মোহে সে তখন নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে চেষ্টা করে। জন্মভূমির প্রতি তার আসে ঘৃণা, সে চায় পাশ্চাত্য সভ্যতার ফুলকি—কারণ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যমে সেইটেই বেশী করে বলে : মাতৃভাষা ছেড়ে বিদেশী ভাষা শিখতে হবে। অথচ মজা এই যে, আমাদের শিক্ষকরাও ভাল করে ইংরেজী বলতে পারেন না। সেক্সপীয়ার পড়াতে গিয়ে হোমারের কথা বলেন, আর বাইবেল পড়াতে গিয়ে টলস্টয়কে টেনে আসেন। তাই চাষার ছেলে বি-এ পাশ করে যখন কাছারী কিংবা কোন ফার্মে চাকুরী নেয়—স্বাভাবিক ভাবেই সে তখন চাষাদের স্বজাতি বলে মেনে নেবে না। তার বন্ধুরা বলবে এ সব upstartism। কিন্তু এই upstartism-এর জন্য দায়ী কে?

বিশ্ববিদ্যালয়—না তারা নিজে? আমি বলব: বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে পুঁথির মর্যাদাই সব চেয়ে বড়।

* * *

ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, সোভিয়েটে আমরা দেখি যে সেখানকার ছাত্রসমাজ নির্ভীক, বলিষ্ঠ ও কর্মপটু। কারণ সে দেশের বাপ-মা'রা escapist নয়—ধর্মভীরু নয়। আর তা ছাড়া ধর্মের এই যে গোঁড়ামি—এ শুধু সনাতনী কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বলি: আমার আনন্দই হচ্ছে ধর্ম—ঈশ্বর মানে আনন্দ। সুতরাং আমার কাছে আত্মাই সব চেয়ে বড়—সেই পরম ব্রহ্ম—যিনি আমার জীবন-দেবতা, তাঁর আনন্দই আমার আনন্দ। আমাদের পৌত্তলিকতা আমাদের দুর্বলতা মাত্র।

* * *

সোভিয়েট বিশ্ব-মানবতাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলবার ভার রাষ্ট্র নিয়েছে এবং দেশ ও সমাজকে গড়ে তুলছে Communistic basis-এ। সে জন্য সোভিয়েট সাহিত্য অনেক সাহায্য করেছে—টলস্টয়, টুর্গেনিভ, চেকভ, গোর্কি, ডষ্টয়ভস্কী, লেনিন, স্ট্যালিন প্রভৃতি সাহিত্যরথীদের সাহায্যেই আজ সোভিয়েট রিপাব্লিক জগতের সামনে এক নবযুগের সূচনা করেছে।

আমাদের শৈশবের শিক্ষার সঙ্গে সোভিয়েটের শিশু-শিক্ষা-সংগঠনের বহু পার্থক্য আছে। সোভিয়েটের ছেলে মেয়েরা ছোট থেকেই যে জিনিসটা শিক্ষার ভেতর পেয়ে থাকে—সেটা হচ্ছে আনন্দ—নির্মল, উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্মান। কিন্তু আমাদের দেশের শিশু-শিক্ষায় প্রথম বয়সেই পরিচয় হয়—মাস্টারদের বেতের কঞ্চি আর পুঁথির গুরুগম্ভীর কথাসমষ্টির সঙ্গে। ছোট বয়স থেকেই আনন্দ জিনিষটাকে আমরা ভুলে যাই, শিক্ষার পরিবর্তে আমরা পাই ভগ্নস্বাস্থ্য আর দীপ্তিহীন কল্পনা। স্কুলের গণ্ডীর বাইরে যে বাস্তব জগৎ আছে, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে হার মানি আর হা-হুতাশ করি, আমাদের অক্ষমতাকে দোষ দিই। এই Defeatist mentality নিয়ে বড় হ'তে না হ'তেই পুঁথির বুলি আউড়ে, শেলী-কীটসের শ্রাদ্ধ ক'রে পাশ্চাত্য সভ্যতার বুকনি ছাড়তে সুরু করি: ফ্রয়েড থেকে মার্কস পর্য্যন্ত কেউ বাদ যায় না। অথচ দেশের আর্থিক অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বোধ হয় বাজার দর খুলে বসবো। এই ক'রে জীবনের বাস্তবতার সৌন্দর্য্যকে হারিয়ে cynic হয়ে পড়ি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিদ্যাটার প্রতি আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে।" তাই জীবনের প্রতি আমাদের বৈরাগ্য আসে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"আমাদের বিদ্যালয়ে কাজকর্ম, পড়াশুনা, অনুষ্ঠান আয়োজন এবং নীতি-শাস্ত্র-সম্মত কর্তব্যটার টানাটানি থাকতে পারে কিন্তু মাঝখানে তিনি কোথায়—সেই রসস্বরূপ? এই রসের প্রতিষ্ঠা না করলেও কাজ চলে কিন্তু কাজই ত মানুষের শেষ লক্ষ্য নয়—রসং হি লব্ধানন্দী ভবতি—সেই রসকে জানলেই আনন্দ হয়। আনন্দই সকল চেষ্টা, সকল কাজের পূর্ণতা। আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে, অধ্যাপকদের মধ্যে, কাজের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে সেই আনন্দ কবে দীপ্তি পেয়ে উঠবেন?"

আমাদের শিক্ষার আর একটা জীবন্ত ছবি আমরা পাই শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' গল্পটিতে। সেখানে শরৎচন্দ্র বলেছেন: "কার বাগানে আম পাকিতে সুরু করিয়াছে কোন বনে বৈচি অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁঠাল এই পাকিল বলিয়া—এই সব খবর লইতে সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামাস্কাটকার রাজধানী কি এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে কি সোনা মেলে এ সকল দরকারী তথ্য অবগত হইবার ফুরসুৎই মেলে না। কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগলক খাঁ। তার পর প্রমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ী আসিয়া কখনও বা মতলব করি মাষ্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত কখনও বা ঠিক অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।"

এই ত আমাদের অবস্থা। স্কুলের পরিধির বাইরে যাওয়া আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, বইয়ের বাইরের কথা

স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার অধিকার নেই। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন সংযোগ নেই—বাপ-মা-ভাই বোনদের হাসি-কান্নার কথা স্কুলের মাষ্টাররা বলেন না। তাঁরা বলেন, রাণী এলিজাবেথ বিয়ে করেন নি কেন, আওরঙ্গজেব আর আলাউদ্দিনের হারেমে কয়জন সহচরী ছিলেন কিংবা সেক্সপীয়ারের প্রকৃতপক্ষে দাড়ি ছিল কি না। "এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে—তাহা বস্তু জোগায়—প্রাণ জোগায় না।" (রবীন্দ্রনাথ)—শিক্ষকরাও নিয়মের গণ্ডী ধরে সময়ের পরিমাপ করে মুখস্থ বুলি আউড়ে যান—ক্লাসের শেষের বেঞ্চের ছেলেরা ঘুমুচ্ছে কি কবিতা লিখ্‌ছে সে খোঁজ রাখবার দরকার বোধ করেন না। তাই "আজকাল প্রয়োজনের নিয়ম শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়ম শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়।" (রবীন্দ্রনাথ) তাঁদের মনোবৃত্তি গতানুগতিকতার চাপে ভারগ্রস্ত এবং তাঁদের সমাজ সনাতনী। তাই নতুন কোন শিক্ষক এসে তিনি প্রথম দিনেই কম্পিত কণ্ঠে বলেন যে মাস গেলে তিনি মোটা মাইনে পাবেন—অর্থাৎ তাঁর আর কি (পোয়া বারো।)—ছাত্ররাই শেষে পস্তাবে। অথচ তিনিও একদিন ছাত্র ছিলেন। এসব তাঁদের upstartism.। প্রথম বক্তৃতায় তাঁরা বলে থাকেন বইয়ের কোন্ পাতার কোন্ লাইনটা পরীক্ষায় আসতে পারে আর কেমন লিখলে কত নম্বর পাওয়া যেতে পারে। কারণ আমরা পড়তে যাই পাশ করবার জন্য, পড়বার জন্য নয়। আগেই বলেছি যে বিদ্যালয় অন্ন সংস্থানের কথা বলে না, দেশের কথা বলে না, সমাজ ও সাহিত্যের কথা বলতে গেলে স্বাধীনতার কথা এড়িয়ে যায়—এক কথায় বাঁচবার সমস্যা বিদ্যালয় দেখায় না। শিক্ষকরা শুধু আকবর জাহাঙ্গীর আর রবিঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' পড়িয়েই ডিগ্রী দিয়ে বলেন যে—তুমি মানুষ হয়েছ। অথচ আমি যদি বলি: "ছেলে যদি মানুষ করিতে হয়, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না।" (রবীন্দ্রনাথ)—তবে তাঁরা বললেন এ সব আমাদের ধৃষ্টতা। তাই আমরা—

"ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।"

আমরা বুঝি না যে "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"—সেজন্য শিক্ষাকে আমরা স্কুলের ফটকের মধ্যেই আটক রেখেছি। আজ আমাদের বলতে হবে—'সহ বীর্য্যং করবাবহৈ', জোর গলায় চেঁচিয়ে বলব—'তেজস্বি নাবধিনমস্তু।'

কিন্তু চেঁচালেই কি আকাশের চাঁদ পাওয়া যাবে? আমরা জোর করে ত অধ্যয়ন সুরু করতে পারি না, অথবা পিকেটিং করতেও পারি না, তাহলে সেটা শিক্ষাদ্রোহিতা হবে। আমাদের স্বাধীন বিদ্যালয় থাকলেও, স্বাধীন মনোবৃত্তি নেই—সবারই পায়ে শেকল বাঁধা। আর তা' ছাড়া "স্বাধীন বিদ্যালয় এদেশে থাকিবে কি করিয়া? অন্নসংস্থানের উপায় যে বাঁধা। কতকগুলি সংকীর্ণ পথের ভিতর দিয়া সকলেই অগ্রসর হইতে বাধ্য। নূতন প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ কাজেই ঘটিয়া উঠে না। সকলকেই হয় কেরাণী—না হয় উকীল হইতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষার উপর যে ছাপ মারিয়া দেন সেই ছাপ ভিন্ন বিদ্যার অন্য কোন চিহ্ন ভারতবর্ষে স্বীকৃতই হয় না। ইহার জন্য রাষ্ট্রশাসকগণ দায়ী।"—(বিনয়কুমার সরকার)

আমাদের দেশের শিক্ষার মিডিয়ম বিদেশী ভাষা। অবশ্য ইংরেজী যে আন্তর্জাতিক ভাষা (international language) তা' আমি স্বীকার করি। আমার পাশের বাড়ীর কথা—আমাদের দেশের কথা আমি অন্য ভাষায় জানব কেন? আমরা যখন বড় বড় বুকনি ছাড়ি—capitalism, আর socialism কিংবা Darwin এর theory—অথবা মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে—তখন তার অর্দ্ধেক কথা বুঝি না। এর জন্য দায়ী আমরা—মাতৃভাষাকে যেন বিদেশী ভাষা বলে ধরে নিই। তার যে কোন মূল্য আছে তা আমরা বুঝি না। যার মধ্য দিয়ে আমি মানুষ হলাম তাকে ভুলতে চেষ্টা করি।.... ..

মাতৃভাষাকে আমাদের স্কুল কলেজেই পরিহার করা হয়—বাইরের জগতে তার মূল্যও কমে এসেছে তাঁদের জন্য—যাঁরা বাবুর্চ্চি, ডিনার, পার্টি নিয়ে মেতে থাকেন আর

বাংলা পরিচয়ের জন্য আলাদাভাবে টিউটর রাখেন। অথচ ইংরেজীও ত বলতে শিখলেন না। ইংলণ্ডের সমাজের নজির দেখিয়ে তাঁরা দূরে সরে যান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে।" কিন্তু বাঙালী পেটি বুর্জোয়ার দল তা বুঝবেন না কিছুতেই। আমার মনে হয় স্কুল থেকে মাতৃভাষার উপরেই জোর দেওয়া উচিত। কারণ

"The teaching of mother-tongue is the most important part of the school instruction, for language is the most perfect and accurate instrument, which mankind has for the expression of thoughts and ideas, and measure of our power to understand and use them."—(*State and Education* by C. Gordon).

তা হ'লে স্কুল কলেজের শিক্ষা যদি বলে দেশকে ভালবাসা দেশ দ্রোহিতা, তবে সে শিক্ষার মূল্য কোথায়? মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে দশবার জেল থেকে ঘুরে এসে আমরা হই patriot অথচ ত্যাগ স্বীকার করতে principle-এ বাধে।

স্কুলের শিক্ষা যা করতে পারে নি—কাজেই আমাদের প্রগতি সাহিত্যকে তার ভার নিতে হবে। শ্রীঅতুল গুপ্ত মহাশয় তাঁর 'শিক্ষা ও সভ্যতা' পুস্তকে একজায়গায় বলেছেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন এবং আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা। আমাদের শিক্ষা এর কিয়দংশও করে না। তাই আমাদের একাজ করতে হবে সাহিত্যের দরবারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সাহিত্য কি রকম হবে? বিশুদ্ধ সাহিত্য, না প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্য? Art for art's sake, না Art for life's sake? সাহিত্যের কাজ যদি 'To hold up the mirror to life' হয়, তবে সে প্রকৃত সাহিত্য হবে না। কারণ আয়না ত মায়ার ফাঁদ, ওতে ত প্রকৃত রূপ দেখা যায় না, প্রতিবিম্ব দেখা যায়। তবে সাহিত্য কেমন হবে? T. S. Eliot-এর individual's sake, না Bernard Shaw'র life's sake? যাই হোক্, আমাদের মানতেই হবে আর্টই হচ্ছে জীবন আর জীবন হচ্ছে আর্ট। একটি অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না—এরা harmonious. ... ...

... ...

দেশ ও সমাজ যখন মরণোন্মুখ, তখন শেলীর মত ভরত পক্ষীর স্বপ্ন দেখা চলবে না—সূর্য্য অস্তাচলে গেলে দিনের মহিমা কীর্ত্তনে লাভ কি? রোমের চিতায় নেরোর বেহালা শুনে আর্টের হয়ত মর্য্যাদা দেওয়া হবে, কিন্তু দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ত বাঁচানো যাবে না।...আজ শিক্ষার গ্লানি এসেছে—তাকে মুছতে হবে। তার একমাত্র সহায় আমাদের সাহিত্য—কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত গলিত সমাজ নয়—কিংবা ডিগ্রীর ডিপো বিদ্যালয় নয়। সেই জন্যই ত রুশো বলেছিলেন:

"Encourage childhood; O men, be humane! It is your foremost duty; live childhood; encourage its sports, its pleasure, its amiable instincts."

কলমবাজী করেই সমাজের আর এক নবতররূপ দেওয়া যাবে। কেমন করে? সেকথা সাম্যবাদীরা বলবে।

(রঞ্জিত সিংহ)

পুস্তক-পরিচয়

মরা মাটি—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। প্রকাশক: পূর্বাশা, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য বাঙালী পাঠকপাঠিকা সমাজে এতদিন ভাল কবি হিসাবেই বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি গল্প লিখে এবং পর পর দুখানা উপন্যাস রচনা ক'রে তিনি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে সাম্প্রতিক বাংলা গদ্য সাহিত্যেও তাঁর দান কম নয়। 'মরা মাটি' সঞ্জয় বাবুর দ্বিতীয় উপন্যাস এবং স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, এই উপন্যাসটি তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত উপন্যাস 'বৃত্তে'র চেয়ে অনেক দিক থেকে সার্থকতর রচনা। 'বৃত্তে'র কাহিনী গ'ড়ে উঠেছিল আমাদের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যর্থতা নিয়ে। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবন অনেকটা 'বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' গোছের—অনেকটা মূলবিহীন গাছের মত। তাই 'বৃত্তে'র বিষয়-বস্তু ছিল অনেকটা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক—আত্ম-বিশ্লেষণ মূলক। 'মরা মাটি'তে যে আত্ম-বিশ্লেষণের অভাব আছে তা' নয়, তবে 'মরা মাটি' কৃষিজীবী বাংলার কৃষক-জীবনের চিত্র ব'লে সামাজিক সার্থকতার দিক থেকে এর আবেদন আরও বেশী ব্যাপক। তারপর 'বৃত্তে'র মধ্যে বুদ্ধিজীবী জীবনের আত্ম-বিশ্লেষণ-প্রাচুর্যের ফলেই হয়ত লেখকের রচনা-পদ্ধতি হয়ে উঠেছিল কিঞ্চিৎ জটিল এবং ভারী; সেই জন্য সাধারণ উপন্যাস-পাঠকের রসোপভোগে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটা বিস্ময়কর নয়। কিন্তু 'মরা মাটি'র রচনা-পদ্ধতিতে লেখক বিস্ময়কর সরলতা এবং শক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনীটি কোথাও আমাদের উপভোগকে পীড়িত করে না। অথচ 'বৃত্ত' এবং 'মরা মাটি'তে লেখকের গল্প বলার ভঙ্গী একই রকমের। তিনি নিজেকে নেপথ্যে রেখে নায়কের স্মৃতি-কথার রূপে গল্পটি আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

ইতিপূর্বে আমাদের সাহিত্যে দুঃস্থ নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু উপন্যাস যে, না লেখা হয়েছে তা' নয়—তবে বাংলার পল্লীর কৃষকদের জীবন-কথা নিয়ে গল্প-উপন্যাস কমই লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছে তারও বেশীর ভাগের মধ্যে আমরা দেখি যে লেখক-লেখিকা সাধারণত সহানুভূতি এবং করুণার দৃষ্টিতেই সে জীবনের দিকে তাকিয়েছেন। কিন্তু এদিক থেকে সঞ্জয় বাবুর পদ্ধতি সম্পূর্ণ নতুন: একজন কৃষক কি ভাবে তার নিজের জীবন ও সমাজের দিকে তাকায় তিনি তাই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন। শশীদল গাঁয়ের জমিদার বাড়ীর ডাক-সাইটে বরকন্দাজ জয়া মালের ছেলে ভরত কি ক'রে পৈতৃক ব্যবসায় ছেড়ে কৃষিকার্যের দিকে ঝুঁকল এবং শেষ পর্যন্ত কি ক'রে সে সামান্য শ্রমজীবীতে পরিণত হ'ল লেখক তারই চিত্র এঁকেছেন 'মরা মাটি'তে। জমিদার-প্রধান গ্রাম শশীদলের বাসিন্দাদের কৃষিকার্যই ছিল প্রধান উপজীব্য; কিন্তু ধীরে ধীরে গাঁয়ের বাজারে বড় ব্যবসায়ী এসে বাসা বাঁধল—ঋণভার-জর্জরিত, প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল চাষারা ধীরে ধীরে ব্যবসায়ীর খপ্পরে গিয়ে পড়তে লাগল, জমিদারের জমিদারী গেল—ক্রমে কৃষকরা সামান্য শ্রমজীবীতে পরিণত হ'ল। বর্ধিষ্ণু যন্ত্র-শিল্প এবং ব্যবসায়ের কাছে রক্ষণশীল কৃষিকার্য হ'ল পরাজিত। অথচ কৃষকদের মজ্জায় মজ্জায় শিল্প-বিরোধ—যে-মরামাটি তাদের জীবিকানির্বাহের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করতে পারে না, তার প্রতি তাদের কি অসীম মমত্ব-বোধ। ক্ষয়িষ্ণু বাংলার কৃষকদের প্রতীক ভরতের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক এই ব্যর্থতা-বোধ সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। ভরতের স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসা এবং ভরতের বোন বাল-বিধবা দুর্গার গঞ্জের সাহার সঙ্গে পলায়নের যে চিত্র লেখক এঁকেছেন, তার মধ্যে বাস্তব-

বোধের ছাপ এত বেশী সুস্পষ্ট যে তাঁর প্রশংসা না ক'রে আমরা পারি না। তবে টুনীর সঙ্গে ভরতের সম্পর্কটা ধোঁয়াটে—রহস্যময়; এ ধরণের নৈর্ব্যক্তিকতা বোধ হয় নিরক্ষর কৃষকজীবনে সহজ-লভ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আর একটা ত্রুটির উল্লেখ না ক'রে পারি না—অবশ্য এটা ত্রুটি কিনা সেটা বিচার-সাপেক্ষ। ভরতের স্মৃতির রূপ দিয়ে কাহিনীটি আমাদের সামনে উপস্থিত করানো হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভরত নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক। কিন্তু এই নিরক্ষর কৃষকের স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা এবং মাঝে মাঝে তার চিন্তা-সূত্রের জটিলতা আমাদের ভাবিয়ে তোলে; ভরতের চরিত্রের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে লেখকের বুদ্ধিজীবী চিন্তাশীল মধ্যবিত্ত মন যেন পাঠকদের কাছে উঁকি দেয়। তবে মনে হয় যে এ ত্রুটি স্বাভাবিক; কেন-না লেখক কৃষকশ্রেণীর লোক নন—একটি কৃষক কি ভাবে তার বিগত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখে, সেটা পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করা লেখকের পক্ষে খুবই কঠিন। সব দিক দিয়ে বিচার করলে 'মরা মাটি' যে একখানা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলার কৃষকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-অভীপ্সার এমন সুন্দর জীবন্ত চিত্র ইতিপূর্বে আর কোন বাংলা উপন্যাসে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। মুদ্রণ-পারিপাট্য ও অঙ্গ-সজ্জায় পূর্বাশা তার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

'বাংলার ছেলে'—স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত ছোট ছেলেদের নাটিকা। সতীকুমার নাগ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান: অশোক লাইব্রেরী, ১৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম আট আনা।

গ্রন্থকার শিশুসাহিত্যে একেবারে অপরিচিত নন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর একখানা নাটিকা শিশুমহলে বেশ সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমান নাটিকাখানিতে গ্রন্থকার দেখাতে চেয়েছেন যে অর্থাভাবে বাঙলার অনেক কৃতী তরুণ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক তাদের প্রাপ্য সম্মান পায় না; তাদের সৃষ্টি টাকা দিয়ে কিনে নেয় ধনী ব্যবসায়ীরা এবং তাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে এই ধনীরাই সমাজে মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। নাটিকাটির মধ্যে কিছুটা নির্মম সত্য হয়ত আছে—কিন্তু সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও নাটকীয় সংঘাতের অভাবে বইখানি খুব জমে ওঠে নি। মাঝে মাঝে বানান ভুল ও ইংরেজী উচ্চারণের ভুলও পরিদৃষ্ট হয়। তবে ঠিকমত পরিচালিত হ'লে নাটিকাটি মঞ্চে জমে উঠতে পারে। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

'প্রভাতী'—জন-শিক্ষা ক্রোড়পত্র। সম্পাদক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার। কার্যালয়: বেহার হেরাল্ড্ প্রেস, পাটনা।

পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকাখানি মাসিক পত্রিকাজগতে সুপরিচিত। বর্তমানে 'প্রভাত' নিঃসন্দেহে প্রবাসী বাঙালীদের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। আলোচ্য জন-শিক্ষা ক্রোড়পত্রটি 'প্রভাতীর'ই অঙ্গবিশেষ। প্রধানত বিহার প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষার মারফৎ জনশিক্ষার প্রচারের জন্যই এই ক্রোড়পত্রটি প্রকাশিত করা হয়েছে। মুখবন্ধে নারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন: "জনশিক্ষা প্রসার লাভ না করলে জনগণের ও দেশের মঙ্গল হবে না।" একথা যে কত মর্মান্তিক ভাবে সত্য তা' আমরা দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি। আমাদের দেশবাসীদের সর্বব্যাপী অশিক্ষা ও কুসংস্কার যে আমাদের সর্বাঙ্গীন্ জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ দিক থেকে বিচার করলে 'প্রভাতী'র জন-শিক্ষা বিস্তার ও বাংলা ভাষা প্রচারের এই অভিনব পদ্ধতিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন না ক'রে পারা যায় না। বাংলা দেশ, বাংলা সাহিত্য ও বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক ছোট ছোট সহজ সরল প্রবন্ধ পত্রিকাখানিতে প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা এই ক্রোড়পত্র নিয়মিত পড়লে যে অনেক কিছু শিখতে পারবেন, সেবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। 'প্রভাতী' কর্তৃপক্ষের জন-শিক্ষা প্রচারের এই প্রচেষ্টা সার্থকতা মণ্ডিত হোক এই কামনা করি।

গোপাল ভৌমিক

দাবী

(গল্প)

শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল—যেন এই-টুকুর জন্মই উৎকর্ণ হ'য়ে কেউ অপেক্ষা করছিল।

নবীনের রৌদ্রক্লিষ্ট মুখেও যে একটা প্রফুল্ল ভাব জল্-জল্ করছিল, মার দৃষ্টিতে তা এড়ায় নাই। তবু স্পন্দিত বক্ষেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি হ'ল রে নবা?

—হ্যাঁ মা, চাকরী এবার সত্যই ভাগ্যে জুটে গেছে।

ছেলের কথায় মার মনে আবার আশা জেগে ওঠে। স্বামীর মৃত্যুর পর কত কষ্টেই না নবীনকে মানুষ ক'রে বিশ বছরেরটি করেছেন। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের কথা মনে পড়ে তাঁর চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু শিথিল গণ্ডে গড়িয়ে পড়ে।

—চাকরী তো হ'ল মা, কিন্তু মাইনে মাত্র কুড়ি টাকা—আর খাটুনী সেই দশটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা অবধি।

—তা হোক বাবা, এইটুকু যে মিলেছে তা শুধু মা কালীর দয়ায়—আমি মানত ক'রে রেখেছি প্রথম মাসের মাইনে যেদিন পাবি সেই দিনই কালীঘাটে পুজো দিব।

নবীন হেসে বলল—তা দিবে বৈকি মা, নিশ্চয় দিবে—কিন্তু মাইনেটা কি মা-কালী আরও কিছু বেশী ক'রে দিলে পারতেন না?

মা তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বললেন—ও কথা বলতে নেই নবীন, যার যেমন কর্ম্ম, তিনি তো তেমনি দিবেন।

মা-কালীকে নিয়ে নবীন আর কোন উচ্চবাচ্য করল না। শুধু বলল—কাল থেকে কিন্তু আটটার মধ্যে রেঁধে দিতে হবে মা।

—আটটার মধ্যে? এই না বললি দশটা থেকে আপিস—অত সকালে খেয়ে কি করবি?

নবীন হেসে উঠল, বলল—কর্ম্মের কথাটা এরই মধ্যে ভুলে গেলে মা! আমার যেমন কর্ম্ম—চাকরী সেই টালীগঞ্জে—মাইনে কুড়ি টাকা, ট্রামে বাসে তো আর যাওয়া চলবে না, হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে এই তিন মাইল পথ।

অনেক রাত্রেও মার আর চোখে ঘুম আসে না—স্বামীর মৃত্যুর পর দুই বছরের নবীনকে নিয়ে অনেক কষ্টই তিনি করেছেন। কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্যময় অমানিশার বুঝি শেষ হবে! মাত্র কুড়ি টাকা—তা হোক্, মায়ে-পোয়ে কুড়ি টাকাই যথেষ্ট। মার মনে কিন্তু এরই মধ্যেই নবীনের ভাবী বধূর টুক্‌টুকে ছোট মুখখানি ভেসে ওঠেছে। অনেক কষ্ট সংসারে তিনি পেয়েছেন, কিন্তু আর না—ছেলেকে বিয়ে করিয়ে সংসার থেকে তিনি ছুটি নেবেন। না, ঠিক ছুটি নয়—তার মনের কোণে ভেসে উঠে নবীনের ভাবী পুত্র-কন্যার কচি কচি মুখ। ভগবানের নাম আর নবীনের পুত্রকন্যাকে নিয়েই বাকী জীবনটা তিনি কাটিয়ে দিবেন। কিন্তু—মায়ের ভাবনা আবার আরেক দিকে চলে—নবীনকে বিয়ে করালে এই কুড়ি টাকায় চলবে কি ক'রে, তার পর নবীনের ছেলেমেয়ে—তাঁর নাতি-নাতনী—! আবার আশা জাগে মনে, নবীনের মাইনে তো আর চিরকাল কুড়ি টাকাই থাকবে না—বাড়বে নিশ্চয়ই। নবীনের মত অমন সোনারচাঁদ ছেলে কয়জনের হয়—আপিসের সবাই তাকে ভালবাসবে—চাকরীতে তার উন্নতি ক'রে দিবে, মাইনে বাড়িয়ে দিবে।

হায়রে মা! একজনের উন্নতি দেখলে আরেক জনের মন যে হিংসেয় জলে পুড়ে খাক যায়, সে কথা তো তোমার জানা নাই। ভাল কাজ দেখালেই যে উন্নতি হয় না—আরও কিছু তার সঙ্গে চাই—মার তো তা জানা নাই। কত তুচ্ছ কারণে—অন্যের মিথ্যে কান-

ভাঙানো কথায় কত সহজে চাকরী ছুটে যায় মা তা কি ক'রে জানবে!

নবীনের চাকরী সুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যা সময় ছেলেকে জল খেতে দিয়ে মা জিজ্ঞাস করলেন—হ্যারে নবু, কেমন দেখলি আপিস।

নবীনের মুখে একটা আনন্দের জ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছিল, হাসিমুখে বলল—বেশ লাগল মা। আমাদের আপিসের যিনি কর্ত্তা, টিফিনের পরে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার তো ভয়ানক ভয় করছিল। কিন্তু তাঁর খাস-কামরায় ঢুকেই আমার ভয় কেটে গেল। কি সুন্দর চেহারা—হাসি-হাসি মুখ। কত বড়লোক, তার পর বিলাত ফেরৎ, কিন্তু পরেছেন একটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবী। দেখে কে বলবে যে, অত বড় আপিসটার তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

শুনে নবীনের মা-ও খুব খুসী হ'য়ে বললেন—তোকে তিনি কি বললেন তা তো বললি না।

—কাজ-কর্ম্মের কথা কিছুই বললেন না, শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আমার দেশ কোথায়, কে কে আছে এই সব।

—তুই কি বললি?

—বলব আর কি, যা বলবার তাই বললাম। ডাঃ চৌধুরী—আমাদের আপিসের মালিকের নাম হলো ডাঃ চৌধুরী—বললেন, মাকে খুব ভক্তি করো, মার আশীর্ব্বাদ থাকলে দুনিয়ায় কোন কাজই আর অসাধ্য থাকে না।

নবীনের মায়ের দুই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। এই আনন্দাশ্রুতে ধুয়ে তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল, ছেলের প্রদীপ্ত মুখের অন্তরালে ক্লান্তির একটা ম্লানিমা তিনি দেখতে পেলেন, জিজ্ঞেস করলেন—টিফিনের ছুটিটা তো জলখাওয়ার জন্যে, নয় রে?

—হ্যাঁ মা, আমাদের আপিসেই একটা রেষ্টুরেণ্ট আছে, দশটার সময় আপিসের গেট বন্ধ হয়ে যায়। বিকেলে ছুটির আগে আর কেউ আপিস থেকে বেরুতে পারে না কি না, তাই এই ব্যবস্থা।

—তুই কি খেলি?

—টিফিনের সময় জলখাবার খেলে চলবে কেন! আর আপিসের রেষ্টুরেণ্টে সব জিনিষই বাইরের চেয়ে আক্রকারা।

মায়ের মুখে বিষাদের ছায়া নেমে আসে—সকলে খায় আর তার নবু—তিনি যেন আর চিন্তা করতে পারেন না—একেবারেই যে রিক্তা তিনি!

নবীনের চাকরীর একমাস হ'য়ে গিয়েছে—আজ সে মাইনে পেয়েছে। মা বললেন—আজ তুই কিছু খেলেই পারতিস আপিসের রেষ্টুরেণ্ট থেকে!

নবীনের শুষ্ক মুখে হাসি ফুটে উঠল—জিভ বাড়ানো ভাল নয় মা। তার পর তোমার সেই মানত রয়েছে প্রথম মাইনের টাকা পেলে কালীঘাটে পূজো দেবে।

মা যেন কি বলতে চেয়েও বলতে পারেন না, জিভ যেন আড়ষ্ট হ'য়ে আসে।

সেই দিনই সন্ধ্যায় মায়ে-পোয়ে কালীঘাট যেয়ে পূজো দিয়ে আসলেন পাঁচ টাকা খরচ করে। বাকী পনেরটি টাকায় এক মাস চালাতে হবে—মা সারারাত্রি শুধু এই কথাই ভাবলেন।

পরের দিন আপিস থেকে নবীন যখন ফিরল তখন তার মুখখানা যেন ছাইয়ের মত হ'য়ে গিয়েছে। মায়ের মন শঙ্কিত হ'য়ে উঠল—অসুখ করেছে না কি রে নবু?

—না মা অসুখ করে নি, কিন্তু করতে তো পারে?

—ষাট্, ও কথা বলে না—

—কিন্তু অসুখ হ'তেও পারে, হ'লে যে কি হবে তাই ভাবছি।

—মিছে মিছি অসুখের কথা ভাবছিস কেন?

—মিছেমিছি নয় মা, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে আপিসে। আমার বয়সেরই একটি ছেলে কাজ করতো আমাদের আপিসে। তাহার হলো ম্যালেরিয়া—একেবারে ম্যালিগ্‌নাণ্ট টাইপ। কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে এসেছে, কিন্তু শরীর খুব দুর্ব্বল। কিন্তু পেটের গরজ বড় গরজ—এই দুর্ব্বল শরীরর নিয়েই অফিসে এসেছে। ছুটি ফুরিয়ে গেছে, না এলেই বা করে কি? ম্যানেজার বাবু

বললেন—'তোমাকে আর ছুটি দেবার ক্ষমতা তো আমার নেই, কিন্তু তোমার শরীরও যে বড় দুর্ব্বল, কাজই বা করবে কি ক'রে?'

ছেলেটি বলল, 'না করে আর কি করব স্যার।'

ম্যানেজার একটু ভেবে তাকে একটা খুব হাল্কা রকমের কাজে বসিয়ে দিলেন। টিফিনের পর ডাঃ চৌধুরী যখন ঘুরে ঘুরে আফিসের কাজ দেখছিলেন, তখন তাঁর নজরে পড়ল ঐ ছেলেটি। রোগশীর্ণ চেহারা দেখে ডাঃ চৌধুরী তার সঙ্গে একটু কি আলাপ করলেন, তার পর সেইখানেই ডেকে পাঠালেন ম্যানেজারকে। ছেলেটির দিকে আঙুল তুলে তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ রকম রোগা লোককে কেন কাজে বসিয়েছেন?

ম্যানেজারবাবু একটু থতমত খেয়ে বললেন—আজ্ঞে, ওর আর ছুটি পাওনা নেই—

—তা না-ই থাকলো—এই রকম রোগা লোক দিয়ে আফিসের কাজ চলে—মাইনেও দিতে হবে আবার কাজেরও ক্ষতি হবে, তা ভেবে দেখেছেন—যান, এখনই মাইনে চুকিয়ে বিদায় ক'রে দিন!

নবীনের মা জিজ্ঞাসা করলেন—তার পর কি হ'লরে নবীন।

—যা হবার তাই—ছেলেটি চোখের জলে কত কাকুতি-মিনতি করল—বাড়ীতে বিধবা মা, বিয়ের যুগ্যি বোন, একটি ছোট ভাই—নির্ভর এই চাকরীটি। কিন্তু ডাঃ চৌধুরীর মন ভিজল না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছেলেটি বেরিয়ে গেল।

মায়ের চোখেও জল ভরে এসেছিল—মা তো—পরের ছেলে হ'লেও মনে ব্যথা বাজে। ভারী গলায় বললেন—সবই ভগবানের হাত বাবা—তাঁরই নির্দ্দেশ—নইলে ধনী দরিদ্র সৃষ্টি হবে কেন? যতদিন কাজ করতে পারে তত দিনই গরীবের অন্ন জোটে, যখন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়ে তখন কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। হয়ত আর জন্মে কি পাপ করেছিল, এজন্মে তাই এ দশা।

মার কথায় নবীন ম্লান হেসে বলল—কিন্তু ডাঃ চৌধুরী ইচ্ছে করলেই তো ওকে রাখতে পারতেন—ভগবান তো আর তাঁকে বলে দেন নি যে, ও পাপী ওকে চাকরী থেকে তাড়াও।

মা হেসে বললেন—শোন ছেলের কথা—ভগবান কাউকে কিছু বলেন না কি? এ হচ্ছে ব্যবসা—ব্যবসা করতে বসলে একটু নির্দ্দয় হ'তে হয় বৈকি? এও তো ভগবানেরই ব্যবস্থা। তোর নিজের ব্যবসা হ'লে তুই কি কি ক্ষেতি স্বীকার করতিস।

ছেলে মার কথা শোনে, কিন্তু মেনে নিতে পারে না।

ইতিমধ্যে ইউরোপে যুদ্ধ বেঁধে গিয়াছে—সব জিনিষেরই দাম বেড়ে উঠছে হু-হু করে। কুড়ি টাকাতে নবীনের দু'জনের সংসারই আর চলে না। মা বললেন—তোদের মাইনে কিছু বাড়বে নারে নবু এই আক্কারার দিনে—সব আপিসেই নাকি বাড়ছে।

নবীন শুষ্কমুখে বলল—কি করে বলি মা, অপিসে কেউ তো কিছু বলে না।

—দেখ নবু, ভগবান তো আর অন্ন দেন না, মানুষকে চেষ্টা করতে হয়—তিনি দেন শুধু চেষ্টার ফল।

সে-দিন অপিসে নবীন মার কথামত কিছু চেষ্টা করার জন্য চেষ্টা করল। তার একজন সহকর্ম্মী বলল—ও আর হচ্ছে মশায়।

—কেন হবে না, সবাই মিলে আমরা যদি দাবী করি—আর এতো অন্যায় দাবী নয়, অফিসের যখন লাভ হচ্ছে, এই আক্কারার দিনে আমাদের মাইনে না বাড়লে চলে কি ক'রে, ডাঃ চৌধুরী কি একথা বুঝবেন না?

নবীনের এই সহকর্ম্মীটি অনেকদিন এখানে চাকুরী করেন, বললেন—না মশায়, কেউ আপনার কথায় মাইনে বাড়াবার জন্য এক সাথে দাবী করতে যাবে না—সবাই নিজের নিজের পথ দেখছে।

কিন্তু নবীন বুঝতে পারে না, বলে—কেন মশায়, ডাঃ চৌধুরী কেমন অমায়িক লোক—আমাদের জন্য কত তিনি ভাবেন।

—বুঝছেন না মশাই ও হচ্ছে ব্যবসায়ের টেক্‌টিস্—বিজিনেসম্যানদের ঐ ভাবেই চলতে হয়।

সেদিন কথাবার্ত্তা এর বেশী আর এগোল না।

পরের দিন। অপিসে যাবার আগে নবীন খেতে বসেছে, মা বললেন—এইবার শুভ কাজটা শেষ করে ফেল বাবা।

—কি কাজ মা?

মা হেসে বললেন—কি কাজ আবার, আমাকে একটি ছোট্ট মা এনে দে।

নবীন হাসতে চেষ্টা ক'রেও হাসতে পারল না, কে যেন তার মুখ চেপে ধরল, বলল—এই কুড়ি টাকা মাইনেতে বিয়ে করা পোষায় না মা।

—মাইনে কি তোর বাড়বে না? একটু চেষ্টা করলেই বাড়বে।

নবীন আর কিছু বলিল না। নীরবে খাওয়া শেষ ক'রে অপিসে চলে গেল।

নবীন মাত্র কাজ সুরু করেছে—ডাঃ চৌধুরীর খাস বেয়ারা এসে বলল—সাহেবের কামরায় তার ডাক পড়েছে। নবীন কিছু বুঝতে পারল না—কিন্তু তার বুক একটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল।

ডাঃ চৌধুরীর খাস কামরায় ঢুকতেই হাসি হাসি মুখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমারই নাম নবীন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বেশ বেশ, কিন্তু তুমি আমার ছেলেদের কানে ধর্ম্মঘটের মন্ত্র দিচ্ছ কেন?

ডাঃ চৌধুরী তাঁর অপিসের কর্ম্মচারীদের অন্যলোকের কাছে ছেলে বলে উল্লেখ ক'রে থাকেন।

নবীন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, বলল—ধর্ম্মঘট!

ডাঃ চৌধুরী গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—হ্যাঁ, ধর্ম্মঘট, কাল তুমি আমার ছেলেদের মধ্যে প্রচার করেছ—মাইনে বাড়াবার জন্য ধর্ম্মঘট করা উচিত।

নবীন কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—আজ্ঞে না, সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা? ধর্ম্মঘট করতে বল নি তুমি?

—আজ্ঞে না, আমি বলেছি, সকলে মিলে যদি আমাদের দাবী আপনার কাছে জানাই, তাহলে—

নবীনকে তার বক্তব্য শেষ করতে না দিয়েই ডাঃ চৌধুরী গর্জ্জন ক'রে উঠলেন—ঐ একই কথা হ'ল—তুমি নিজেই স্বীকার করছ ধর্ম্মঘট করাবার চেষ্টা করেছিলে—সীতারাম—

খাস বেয়ারা সীতারাম হাত জোড় ক'রে এসে দাঁড়াল। ডাঃ চৌধুরী বললেন—ওকে ঘাড় ধরে সমস্ত অপিস ঘুরিয়ে তারপর অপিস থেকে বের ক'রে দাও। সঙ্গে সঙ্গে বলবে, ধর্ম্মঘট করার চেষ্টার জন্য এই শাস্তি।

* * *

সেদিন দুপুর বেলায় নবীনের মা ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলেন—নবীন বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে ফিরেছে—চারদিকে রোশনাই—ব্যাণ্ড বাজছে—তিনি যেন বউ-এর ঘোমটা খুলে মুখ দেখে বলছেন—বাঃ বেশ বউ—

ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

বণিকনীতির (mercantilism) সমালোচনা হইতেই ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় খুব বেশী ভুল বলা হয় না। বস্তুতঃ জ্ঞানের জন্য নিঃস্বার্থ স্পৃহা কিম্বা মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কল্যাণ ও উন্নতি করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে অর্থনীতিবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে নাই,—গড়িয়া উঠিয়াছে কতকগুলি বিশেষ অর্থনৈতিক সমস্যার কার্য্যকরী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা হইতে। দেশের সম্পদ কি করিয়া বর্দ্ধিত করিতে পারা যায় তাঁহাই ছিল বণিকনীতি-বাদীদের উদ্দেশ্য। তাঁহাদের মতবাদকে কোন সুসংবদ্ধ অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের রূপ প্রদান করা হয় নাই, করিবার প্রয়োজনও তখন ছিল না। কার্য্যকরী সুবিধার জন্য এক এক জন এক-এক ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও সব মিলিয়া মোটামুটি ভাবে বণিকনীতির মূল কথা ছিল বৈদেশিক বাণিজ্য। এই বাণিজ্য এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যে, আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি হয় বেশী এবং বাণিজ্যিক উদ্বর্ত্তন হিসাবে প্রচুর সোনা-রূপা ঘরে আসে। মূল্যবান্ ধাতু হিসাবে সোনা-রূপাকেই তাঁহারা সম্পদের আসন প্রদান করিবেন, ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বর্ত্তমান যুগের অর্থনীতিবিদ্গণ সোনারূপাকেই সম্পদ বলেন না বটে, কিন্তু সোনারূপার আমদানি-রপ্তানির উপর তাঁহারা কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন, তাহা ব্যাঙ্কর বনাম ইউনিটাস্ পরিকল্পনা লইয়া বৃটিশ এবং মার্কিন অর্থনীতিবিদ্দের সমালোচনা ও প্রতি-সমালোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

বণিকনীতিবাদের মূল কথা ছিল শুধু বৈদেশিক বাণিজ্য নয়, নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক বাণিজ্য,—স্পষ্ট কথায় ঔপনিবেশিক বাণিজ্য। শুধু উপনিবেশের সহিত বাণিজ্যেই বাণিজ্যকে মালিক দেশের অনুকূলে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। বণিকনীতিকে অনেক সময় কোলবার্টিজম বলিয়া অভিহিত করা হইলেও, কোলবার্টের ঔপনিবেশিক নীতির পূর্ব্বেই উহার উদ্ভব হইয়াছে। ক্রমওয়েলের নেভিগেশন আইন বণিকনীতিরই একটা রূপ। অবাধ-বাণিজ্য নীতির সমর্থক এডাম স্মিথ উহাকে 'বাণিজ্যিক বিধিসমূহের মধ্যে বিজ্ঞতম'—"The wisest of all commercial regulations" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বণিক-নীতির বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণটা আসিয়াছিল ফিজিওক্র্যাটদের নিকট হইতেই। ফ্রান্সের তৎকালীন অবস্থাই এই মতবাদ সৃষ্টির কারণ তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়া এই মতবাদ এডাম স্মিথের হাতে অর্থনীতি-বিজ্ঞানের রূপ গ্রহণ করিল। এডাম স্মিথ তাঁহার 'ওয়েল্থ অব নেশানসে'র একটি অংশ শুধু বণিক-নীতির সমালোচনাতেই ব্যয় করিয়াছেন। তা ছাড়া বণিক-নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা গোটা বইটাতেই পাওয়া যায়। শুধু এডাম স্মিথই নয় রিকার্ডো, জেমস মিল, সে (Say) প্রভৃতি কেহই বণিক-নীতির দোষগুলি উদ্ঘাটন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বণিকনীতি নিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ ঔপ-নিবেশিক বাণিজ্য। এই বাণিজ্য যে আসলে একচেটিয়া নীতির রূপ বিশেষ, এই বাণিজ্যে যে লাভ হয় তাহা যে প্রকৃতপক্ষে একচেটিয়া লাভ, কাজেই লাভটা যে যায় শুধু অল্পসংখ্যক লোকের হাতে তাহা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি-বিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। বণিক-নীতি দ্বারা যে লাভ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া নিজেদের দেশে কিরূপ ভাবে দেখা দেয় এডাম স্মিথ তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। উপনিবেশে যে-সকল পণ্য রপ্তানি হয় সেগুলি একচেটিয়া বাণিজ্যের অন্তর্গত। এই সকল পণ্যের রপ্তানি হইতে যে-লাভ হয় তাহা একচেটিয়া লাভ বলিয়া লাভের হারটা হয় কিছু বেশী। কাজেই উপনিবেশে যে-সকল পণ্য রপ্তানি হয় সেই সকল পণ্যের উৎপাদন-

শিল্পে বেশী পরিমাণে মূলধন নিয়োজিত হইয়া থাকে। ফলে অন্যান্য পণ্যের রপ্তানি-বাণিজ্যে মূলধন কম নিয়োজিত এবং তাহার ফলস্বরূপ প্রতিযোগিতার তীব্রতা হ্রাস পাইয়া ঐ সকল পণ্যের রপ্তানি-বাণিজ্যেও লাভের হার বর্দ্ধিত হয়। এডাম স্মিথের মতে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য মাতৃদেশের (homeland) লাভের হার দুই দিক দিয়া বর্দ্ধিত করে। প্রথমতঃ, ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া লাভের হারটা স্বাভাবিকই কিছু বেশী বলিয়া এই লাভটা যখন মাতৃদেশের মোট লাভের সহিত মিশিয়া যায় তখন মাতৃদেশের মোট লাভের হারটাও কিছু না বাড়িয়াও পারে না। দ্বিতীয়তঃ, উপনিবেশে রপ্তানির জন্য পণ্যের উৎপাদন-শিল্পে অধিক পরিমাণে মূলধন আকৃষ্ট হওয়ায় বাণিজ্যের অন্যান্য শাখায় প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইয়া ঐগুলিতেও লাভের হার বর্দ্ধিত হয়। লাভ বাড়ে বটে, কিন্তু উহা যায় অল্পসংখ্যক লোকের হাতে। তৃতীয়তঃ, মাতৃদেশে লাভের হার যেমন বাড়ে, তেমনি পণ্যের দামও বাড়িয়া যায়, ইহাই এডাম স্মিথের অভিমত। সুতরাং তাঁহার মতে বণিক-নীতির ফল দাঁড়াইল এই যে,

"To promote the little interest of one little order of men in one country, it hurts the interest of all other orders of men in that country, and of all men in all other countries. . . One great original source of revenue, the wages of labour, the monopoly must have rendered at all times less abundant than it otherwise would have been." (Wealth of Nations, p. 571-572).

'এক দেশের অল্পসংখ্যক লোকের সামান্য স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য ঐ দেশের আর সকল লোকের এবং অন্যান্য দেশের সমস্ত শ্রেণীর লোকের স্বার্থহানি করা হয়।···শ্রমিকের মজুরী আয়ের একটা প্রধান মৌলিক উপায়, কিন্তু একচেটিয়া নীতি উহার প্রাচুর্য্যের হ্রাস করিয়া থাকে।' এডাম স্মিথের মতে বণিকনীতি দ্বারা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য দ্বারা ক্ষতি শুধু উপনিবেশেরই হয় না, মাতৃদেশেরও ক্ষতি হয়।

উপনিবেশের সহিত বাণিজ্যকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব যে, উহা উপনিবেশের পক্ষে কম সুবিধাজনক এবং মাতৃদেশের পক্ষে বেশী সুবিধাজনক হইতে পারে। একথা রিকার্ডোও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এক রকমের বৈদেশিক বাণিজ্য আর এক রকমের বৈদেশিক বাণিজ্যে পরিবর্ত্তিত হইলেই যে লাভের হারেরও পরিবর্ত্তন হইবে তাহা তিনি স্বীকার করেন না। আর লাভের হার যদি বাড়েও, তাহা হইলে পণ্যের দামও যে বাড়িবে এমন কোন কথা নাই, ইহাই রিকার্ডোর অভিমত। কারণ তাঁহার মতে মজুরি অথবা লাভ দ্বারা জিনিষের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় না। বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা লাভের হার বর্দ্ধিত হইবার ক্ষেত্র যে আছে রিকার্ডো তাহা স্বীকার করিয়াছেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে যদি সস্তা খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, তাহা হইলে 'শ্রমের মূল্য' হ্রাসের মধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লাভের হারটা বর্দ্ধিত হয় এই 'শ্রমের মূল্যে'র হ্রাস হইতেই। রিকার্ডো মনে করেন অবাধ বাণিজ্যে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বাজার থাকিলেই শুধু তাহা সম্ভব হইতে পারে।

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে রিকার্ডোর কথা সত্য বলিয়াই মনে হইবে। কোন শিল্পোন্নত দেশ বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে কতকটা সুবিধা পাইলেও এই সুবিধা লাভের হারকে বর্দ্ধিত না-ও করিতে পারে। কারণ লাভের হারের হ্রাস-বৃদ্ধিটা বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। এমনও হইতে পারে যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভ মুদ্রা-ব্যবস্থায় সোনার পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া সকল রকম পণ্যের দামকেই সমান অনুপাতে বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারে। এরূপ হইলে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে দামের অনুপাতটা ঠিকই থাকিয়া যাইবে। কাজেই লাভের হার বর্দ্ধিত হইবার স্থল রহিল কোথায়? নির্ব্জলা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত বৈদেশিক বাণিজ্য এখন পর্য্যন্ত শুধু একটা কাল্পনিক বস্তু, এমন কি যে-যুগটাকে অবাধ বাণিজ্যের যুগ বলিয়া অভিহিত করা হয়, তখনও খাঁটি অবাধ বাণিজ্যের দেখা মিলে নাই। অবাধ বাণিজ্য এবং অধিক বিস্তৃত বাজার না থাকিলেই যে বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লাভের হার বর্দ্ধিত হইবে না একথা কি করিয়া স্বীকার করা যায়! অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশের সহিত বাণিজ্যে উন্নত শিল্প-প্রধান দেশ সস্তায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য এবং কাঁচা-

মাল আমদানি করিতে পারে। এই আমদানির প্রভাব ব্যবহার্য্য পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের মধ্যে যেমন দেখা দেয় তেমনি দেখা দেয় উৎপাদন-যন্ত্র নির্ম্মাণ-শিল্পে উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাসের মধ্যে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে অনুন্নত কৃষি-প্রধান দেশের সহিত বাণিজ্যের ফলে উন্নত শিল্পপ্রধান দেশে লাভের হার যেমন বর্দ্ধিত হয় তেমনি মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে যদি অনুন্নত কৃষিপ্রধান দেশে মূলধনও নিয়োগ করিতে পারা যায় তাহা হইলে লাভের হারটা আরও বেশী বর্দ্ধিত হয়।

বণিক-নীতির যুগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ছিল শৈশব কাল—বিরাট্ যন্ত্র-শিল্পের প্রতিষ্ঠা তখনও হয় নাই। উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের প্রশ্নটাই ছিল তখন অবান্তর। কাজেই বণিক-নীতির যুগে মালিক দেশ এবং উপনিবেশের মধ্যে বাণিজ্য এই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাণিজ্যের সুবিধাটা মালিক দেশের অনুকূলেই হয়। উপনিবেশে মূলধন নিয়োগ একেবারেই করা হইত না তাহা নয়, কিন্তু ধনতন্ত্রের শৈশবে উপনিবেশে মূলধন নিয়োগ শুধু অপ্রধান ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ধনতন্ত্র যখন পূর্ণবিকাশ লাভ করিল—যন্ত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল, কলকারখানা বিরাট্ আকার ধারণ করিল, এক কথায় উৎপাদন-ব্যবস্থায় যখন পূর্ণ বিপ্লব সাধিত হইল তখন ধনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়াইল উপনিবেশে মূলধন নিয়োগ।

বণিক-নীতি দ্বারা অর্জ্জিত লাভকে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি-বিজ্ঞানীরা বিশেষ এক রকমের একচেটিয়া লাভ বলিয়া উহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-শিল্পে অবাধ প্রতিযোগিতার ফল স্বরূপ নূতন আর এক রকমের একচেটিয়া ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতে লাগিল। উৎপাদন-শিল্প হইতে পুঁজিপতিদের যে লাভ হয় তাহার সবটা অনুৎপাদক কার্য্যে—পুঁজিপতিদের খাওয়া, পরা, থাকা, বিলাস-ব্যসন ইত্যাদিতেই ব্যয় হইয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না, উহার বিশিষ্ট একটা অংশ নূতন মূলধন রূপে উৎপাদন-শিল্পে প্রবেশ করে। এইরূপে বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন-শিল্পে মূলধন ক্রমেই বাড়িয়া চলে। উৎপাদন-শিল্পে মূলধনের এই বৃদ্ধিতে একদিকে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া যায় আর একদিকে তেমনি উহাই শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। মূলধনের বৃদ্ধিটা শুধু মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধিতেই পর্য্যবসিত হয় না, মূলধনের সংগঠনেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। মূলধনের প্রসারটা যদি শুধু পরিমাণ-গত হয়, তাহা হইলে কোন একটি পণ্যের বিভিন্ন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানে মূলধনের কম-বেশী পরিমাণ অনুসারে লাভের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু মূলধনের পরিমাণ-গত বৃদ্ধি যদি মূলধনের সংগঠনের মধ্যেও পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহা হইলে বেশী মূলধন হইতে লাভের পরিমাণই শুধু বর্দ্ধিত হয় না, লাভের হারটাও বাড়িয়া যায়। মূলধনের সংগঠনের পরিবর্ত্তন না হইলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যন্ত্রপাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয় বলিয়া শ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায় এবং চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরিও বাড়ে। ফল স্বরূপ লাভের হার হ্রাস পায়। সুতরাং মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের উৎপাদিকা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন-কৌশলেও পরিবর্ত্তন দেখা দিল—আবির্ভাব হইল কলযন্ত্রের। কলযন্ত্রের আবির্ভাবে মূলধনের টেক্‌নিক্যাল সংগঠনে পরিবর্ত্তন সাধিত হইল অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অল্প শ্রমে অপেক্ষাকৃত বেশী যন্ত্রপাতি এবং কাঁচা মাল পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হইল। প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিতে হইলে পণ্যকে অপেক্ষাকৃত সস্তা করা প্রয়োজন। মূলধনের টেক্‌নিক্যাল সংগঠনে পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে পণ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা হয়, কিন্তু মূলধনের পরিমাণ যাহার বেশী তাহার লাভের হারও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার ফলে পুঁজি-পতিদের মধ্যে দেখা দেয় মাৎস্যন্যায়, ছোট ছোট পুঁজি-পতিরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—তাহাদের মূলধন কতক নষ্ট হয় এবং বাকীটা বিজয়ী পুঁজিপতিদের হাতে চলিয়া যায়। ইহাতে সামাজিক মূলধনের মোট পরিমাণ বাড়ে না বটে, কিন্তু কতকগুলি পুঁজিপতির হাতে মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া যায় অর্থাৎ মূলধনের বণ্টনের পরিবর্ত্তন হয়। পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মূলধন বণ্টনের

যখন পরিবর্ত্তন চলিতেছিল, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা তখন আর একটি নূতন শক্তি লাভ করিল—ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়। দেশের বিভিন্ন লোকের হাতে যে-সকল টাকা-পয়সা ছড়ান থাকে তাহা সংগ্রহ করা ব্যাঙ্কের একটি কাজ। এইরূপে সংগৃহীত অর্থ হইতে ব্যাঙ্ক প্রথমে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে ঋণ দিত। কিন্তু ক্রমে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশও ব্যাঙ্ক ক্রয় করিতে লাগিল। এইরূপে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মূলধনের সহিত ব্যাঙ্ক-মূলধনের হইল সংমিশ্রণ বা একীকরণ। এই সংমিশ্রিত বা একত্রীকৃত মূলধনকে হিলফোর্ডিং (Hilfording) ফাইনান্স ক্যাপিট্যাল নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়েও একীকরণ চলিতে লাগিল—ছোট ছোট ব্যাঙ্কের একীকরণে বড় বড় ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিল, আবার বড় বড় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা হইলেন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং বড় বড় শিল্পপতিরা হইলেন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার। প্রতিযোগিতা এবং ফাইনান্স ক্যাপিট্যাল মূলধন-সংহতির প্রধান প্রেরণা। প্রতিযোগিতার ফলে একদিকে যেমন ছোট ছোট মূলধনগুলি বড় বড় মূলধনের কুক্ষিগত হইতে লাগিল তেমনি বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সমবায়ে এবং সহযোগিতায় গড়িয়া উঠিল কার্টেল, সিণ্ডিকেট এবং ট্রাষ্ট প্রভৃতি একচেটিয়া ব্যবস্থা। বস্তুতঃ ধনতন্ত্রের ইহা পূর্ণ যৌবন।

কোন বিশেষ শ্রেণীর শিল্পে অথবা কতকগুলি বিভিন্ন শিল্পে যখন একচেটিয়া পদ্ধতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তখন লাভের হার সত্যই বাড়িতে থাকে। কিন্তু অবস্থা ক্রমে এমন হইয়া দাঁড়ায় যে, শ্রমিকের মজুরি না কমাইলে একচেটিয়া ব্যবস্থাতেও লাভের হার আর বর্দ্ধিত হয় না। সুতরাং একচেটিয়া ব্যবস্থার ফল দেখা দেয় মজুরি হ্রাসের মধ্যে। কিন্তু শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন থাকিলে মজুরি হ্রাস করা সহজ হয় না। দ্বিতীয়তঃ একচেটিয়া পদ্ধতিতে যে বেশী লাভটা আসে তাহা পাওয়া যায় যে-সকল উৎপাদক একচেটিয়া ব্যবস্থার বাহিরে থাকে তাহাদেরই লাভের অংশে ভাগ বসাইয়া। ইহাতে লাভের বণ্টনেই শুধু পরিবর্ত্তন হয় লাভের সীমা বর্দ্ধিত হয় না। ধনতন্ত্রের প্রথম অবস্থায় ধনতন্ত্রবাদী দেশ বিদেশে শুধু পণ্যই রপ্তানি করিত, কিন্তু উৎপাদন-শিল্পে একচেটিয়া পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর দেখা গেল, লাভের হারটা প্রথমে বাড়িলেও পরে উহা হ্রাস পাইতে লাগিল। মূলধনের যে অংশটা শ্রমিকের মজুরির জন্য ব্যয়িত হয় উহা হইতেই লাভের বর্দ্ধিত হার পাওয়া যায়। কিন্তু পুরাতন ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মূলধনের সংহতি (centralisation) এবং উৎপাদন-কৌশলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরির জন্য যে মূলধন নিয়োজিত হইত তাহার পরিমাণ হ্রাস পাইল। পুরাতন ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিরা যখন দেখিলেন নিজেদের দেশে আর লাভজনক উপায়ে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র নাই তখন অন্য দেশে মূলধন নিয়োগের সুবিধাটা তাহারা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই যে কোন দেশে মূলধন নিয়োগ করিতে পারা যায় না, মূলধন নিয়োগের উপযোগী সুবিধা আছে এইরূপ দেশ থাকা প্রয়োজন। উপনিবেশগুলিই এই দেশ। এখানে উপনিবেশ বলিতে বণিক-নীতির যুগের উপনিবেশ-গুলির কথা আমরা বলিতেছি না—কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির কথা বলিতেছি না। এই সকল উপনিবেশ কার্য্যতঃ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডোমিনিয়নগুলি বাদে অন্য যে সকল উপনিবেশ আছে, অধীন দেশ আছে, ম্যাণ্ডেটরী রাষ্ট্র আছে সমস্তই সাম্রাজ্য-বাদী যুগের উপনিবেশ।

ক্রমশঃ

বাংলার নূতন মন্ত্রি-মণ্ডলী

খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রধান মন্ত্রিত্বে বাংলায় নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে। গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখের যে-ঘোষণায় বাংলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনআইনের ৯৩ ধারার বিধান সমূহ বলবৎ করা হইয়াছিল ২৪শে এপ্রিল গবর্ণর উহা বাতিল করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন :

১। খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন—প্রধান মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (অসামরিক দেশরক্ষা বিভাগ সহ) বিভাগ; ২। মিঃ হুসেন সহিদ সুরাওয়ার্দ্দি—অসামরিক সরবরাহ বিভাগ; ৩। মিঃ তুলসীচন্দ্র গোস্বামী—অর্থ বিভাগ; ৪। মিঃ তমিজুদ্দিন খাঁ—শিক্ষা; ৫। মিঃ বরদাপ্রসন্ন পাইন—পূর্ত্ত ও যানবাহন; ৬। খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মুয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন—কৃষি (পল্লী সংস্কার সহ); ৭। মিঃ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—রাজস্ব (লোকাপসরণ ও রিলিফ সহ); ৮। নবাব মুশারফ হোসেন খাঁ বাহাদুর—বিচার ও আইন বিভাগ; ৯। মিঃ খাজা সাহাবুদ্দিন—বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগ (যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সহ); ১০। মিঃ প্রেমহরি বর্ম্মা—বন ও আবগারী বিভাগ; ১১। খাঁ বাহাদুর মৌলবী জালালুদ্দিন আহমদ—জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; ১২। মিঃ পুলিনবিহারী মল্লিক—প্রচার বিভাগ; ১৩। মিঃ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল—সমবায় ঋণদান ও পল্লী-ঋণ বিভাগ।

সর্ব্বদলীয় মন্ত্রি-সভার নামেই মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের নিকট হইতে পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগের তিন সপ্তাহেরও কিছু অধিককাল পরে যে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইল তাহা যে সর্ব্বদলীয় হয় নাই ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাকে পর্য্যন্ত একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে। মুসলমান মন্ত্রীরা সকলেই লীগদলভুক্ত। যে-তিন বর্ণ হিন্দু এই মন্ত্রিসভায় আছেন তাঁহারা কোন দলের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রি-সভায় যোগদান করেন নাই। বরং মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবার জন্যই শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী এবং শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন পাইন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের এবং শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায় জাতীয় দলের সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তফ্‌সিলভুক্ত সম্প্রদায়ের তিনজন মন্ত্রীকে তফসিলভুক্ত সদস্যদের প্রতিনিধি বলা চলে না,—তাঁহাদের একাধিক দল রহিয়াছে। দেখা যাইতেছে, কৃষক-প্রজা দল, প্রোগ্রেসিভ দল, কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল, অফিসিয়াল কংগ্রেস দল, জাতীয় দল, তফসিলভুক্তদের অপর দলের কোন প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নাই। ইউরোপীয় দল হইতে মন্ত্রী গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই এপর্য্যন্ত কখনও উঠে নাই। কাজেই ইউরোপীয় দল হইতে মন্ত্রী গ্রহণের কথাটাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই নূতন মন্ত্রি-সভা যে ইউরোপীয় দলের সমর্থনলাভ করিবেন, ইহা স্বতঃসিদ্ধের মতই সকলে ধরিয়া লইয়াছেন। ইউরোপীয় দল যে লীগ দলকে সমর্থন করিবেন মুসলিম লীগ পরিষদদলের সাধারণ সম্পাদক খান্ বাহাদুর মহম্মদ আলীর বিবৃতিতেও তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বর্ণ হিন্দুর যে তিন জন মন্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন অনুগামী নাই, তাঁহারা কেবল নিজেরাই নিজেদের নেতা। ব্যবস্থা-পরিষদ যেখানে একক সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল থাকে না, সেখানে কোন দলবিশেষের গঠিত মন্ত্রিসভার ঐ দলের বাহিরের কোন অনুগামীহীন মন্ত্রী যদি থাকেন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রিসভার ভার স্বরূপই হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান মন্ত্রি-সভা ইউরোপীয় দল কর্ত্তৃক সমর্থিত লীগ মন্ত্রিসভা ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাংলার অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্যই একটি সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল এবং এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল যে, হক সাহেবের নিকট হইতে পদত্যাগ-পত্র আদায় করা হইলেই স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার আর কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে, তাহা হইল না। বরং পূর্ব্ব মন্ত্রি-সভাই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা ছিল। পূর্ব্ব

মন্ত্রিসভায় ছিল না শুধু লীগদল, আর বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় আছে শুধু লীগদল। কৃষক-প্রজা দল, প্রোগ্রেসিভ দল, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল, অফিসিয়াল কংগ্রেস দল, জাতীয় দলের কোন প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নাই। অফিসিয়াল কংগ্রেস অবশ্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে না। কিন্তু অন্যান্য দলের কোন প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নাই কেন? এই মন্ত্রিসভা সর্ব্বদলীয় না হওয়ার দোষটা ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা অন্যান্য দলের উপর চাপাইয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারা যখন রাজী হইলেন না, যখন গবর্ণর এবং প্রধান মন্ত্রী আর কি করিতে পারেন। কিন্তু অন্যান্য দল সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী ছিলেন না বা রাজী নহেন, এ কথা সত্য নহে। প্রত্যেক দলই সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন একমাত্র সর্ব্বদল-গ্রাহ্য বা সর্ব্বদলের স্বীকৃত নেতার পক্ষেই সম্ভব। কোন ব্যক্তিবিশেষের নির্দ্দেশে কোন সর্ব্বদলীয় নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তিকে নেতা বলিয়া মানিতে সকল দল স্বীকৃত হয়। নেতৃত্বটা বাহির হইতে সকল দলের উপর কেন, কোন দলের উপরেই চাপাইয়া দেওয়া যায় না। ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার উক্তি হইতে এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, গবর্ণর যে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্বে তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল না। ইহার জন্য বিভিন্ন দলগুলি দায়ী নহে। খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন যদি তাঁহার নেতৃত্ব সকল দলকে গ্রহণ করাইতে পারিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার নেতৃত্বে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারিত। স্যার নাজিমুদ্দীন যদি সকল দলকে তাঁহার নেতৃত্ব মানাইয়া লইতে পারিতেন, তাঁহার নেতৃত্বে সকল দলের আস্থা জন্মাইতে পারিতেন, তাহা হইলে যেমন উহাকে আটকাইয়া রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না, তেমনি সকল দলের ঘাড়ে স্যার নাজিমুদ্দীনের নেতৃত্ব চাপাইয়া দিবারও কোন সহজ উপায় নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা সর্ব্বদলীয় নহে, প্রতিনিধিমূলকও নহে। কৃষক-প্রজাদলের কোন প্রতিনিধি এই মন্ত্রিসভায় নাই। তিন জন বর্ণ হিন্দু আছেন বটে, কিন্তু শুধু নিজের ছাড়া আর কাহারও প্রতিনিধি তাঁহারা নহেন। তফ্‌সিল-ভুক্ত মন্ত্রিদ্বয়ও তফ্‌সিলভুক্ত সকল সদস্যের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না। ইহাকে ব্যাপক ভিত্তির উপর গঠিত মন্ত্রিসভাও বলা যায় না। লীগ দল ও ইউরোপীয় দলের ভিত্তি ছাড়া আর কোন ভিত্তি এই মন্ত্রিসভার নাই।

—

২৬ নং বিধি ও নূতন অর্ডিনান্স

ভারতীয় ফেডারেল কোর্ট বিচারে সাব্যস্ত করেন যে, ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬ নং বিধিটি ভারতরক্ষা আইনের ২ (২) ধারায় বিধি প্রণয়নের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে বিধায় উহা অবৈধ। অতঃপর ভারত গবর্ণমেণ্ট উক্ত ২৬ নং বিধিটিকে আইনসিদ্ধ করিবার জন্য নূতন অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গ প্রমুখ আট হাজার লোক এই বিধি অনুসারে আটক আছেন।

ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬ নং বিধি অনুসারে কেশব তালপড়ে নামক এক ব্যক্তিকে আটক রাখার আদেশ রহিত করার জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৪৮১ধারা (হেবিয়াস করপাস অর্থাৎ বন্দীকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ) অনুযায়ী বোম্বাই হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হইয়াছিল। বোম্বাই হাইকোর্ট উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করা হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১০২ ধারা অনুযায়ী বড়লাট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করায় ভারত রক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনের ২ (২) ধারায় ভারতরক্ষা বিষয়ক বিধিপ্রণয়নের ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করা হইয়াছে এবং ভারত রক্ষা বিষয়ক অন্যান্য বিধির ন্যায় উক্ত ২৬নং বিধিটিও প্রণীত হইয়াছে উক্ত ক্ষমতা বলে। যুদ্ধের সময় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টই যে শান্তির সময় অজ্ঞাত ও অচিন্তনীয় ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া থাকেন, ফেডারেল কোর্ট তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। ফেডারেল কোর্ট ইহাও উপলব্ধি করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব যাঁহাদের হাতে তাঁহারা বিপদ ও সঙ্কটের সময়ে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া যে-কাজ করেন, তাহার নির্ম্মম ও কঠোর

সমালোচনা করিতে আদালতের বিরত থাকা উচিত। কিন্তু ফেডারেল কোর্টের সম্মুখে যে প্রশ্নটি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এই যে, আইন-সভার নিকট হইতে শাসন কর্ত্তৃপক্ষ যে ক্ষমতা পাইয়াছেন তাহার অতিরিক্ত ক্ষমতা তাঁহারা প্রয়োগ করিতেছেন কি না? এই প্রশ্নটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যুদ্ধের বিপদ ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও ফেডারেল কোর্ট মনে করেন, আদালত এই প্রশ্নের মীমাংসার দায়িত্ব হইতে রেহাই পাইতে পারেন না।

গবর্ণমেণ্ট যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোন কার্য্য করিতে পারে অথবা তাহার পক্ষে করা সম্ভব, তাহা হইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা ২৬ নং বিধিতে আছে। কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কাজ করিতে বাধা দান করিবার জন্য আটক করা প্রয়োজন বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করিলেই ২৬ ধারা অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করার পক্ষে যথেষ্ট। ফেডারেল কোর্ট মনে করেন, আইন সভা গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ক্ষমতা অবশ্যই দিতে পারেন। কিন্তু ভারত রক্ষা আইনের ২ (২) ধারায় এইরূপ ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হয় নাই। কোন ব্যক্তি কোন কাজ করিতে উদ্যত বলিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে সন্দেহভাজন হইলেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা উক্ত ধারায় গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। এই ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রয়োগের একটি সর্ত্ত আছে। সর্ত্তটি হইল এই যে, কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে উদ্যত বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহভাজন কিনা তাহা স্থির করিতে হইবে।

রায়দান প্রসঙ্গে ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার ২৬নং বিধি অনুসারে গ্রেপ্তারের ক্ষমতার প্রয়োগকর্ত্তা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা কর্ত্তৃপক্ষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন, এমন কোন কথা ভারতীয় আইনে নাই। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন, "কিন্তু আমরা যতদূর দেখি কোন ব্যক্তি বা মণ্ডলী যত নগণ্যই হউক না কেন, তাহার উপর এই সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করা নিবারণের কোন বিধান নাই।" ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, এবং আটকও করা হইয়াছে বহুলোককে। কাজেই ক্ষমতার প্রয়োগকর্ত্তা মনোনীত করা সহজও নয়। বিলাতে স্বরাষ্ট্র সচিবের পক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা সম্ভব। কিন্তু ভারতে বড়লাট, কিম্বা গবর্ণর, কিম্বা তাঁহাদের পরামর্শ দাতাগণের পক্ষে প্রত্যেকটি সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে? প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন, "এই অবস্থায় যাহাদের উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে তাহাদের পক্ষে আটক ব্যক্তি সন্দেহভাজন কি না তাহা স্থির করা সকল ক্ষেত্রে সহজ নহে।"

আমরা দেখিলাম, ফেডারেল কোর্টের রায়ে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ২৬ নং বিধিটি ভারতরক্ষা আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যবস্থাও এমন যে, কোন নগণ্য সরকারী কর্মচারীর হাতেও এই ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই এবং সেই সরকারী কর্ম-চারী এমনও হইতে পারে যে, কি কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য গ্রেপ্তার করা হইতেছে সে সম্বন্ধে সে এবং ধৃত ব্যক্তি উভয়েই সমান অজ্ঞ। ফেডারেল কোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর এইরূপ আশা করাই স্বাভাবিক যে, উক্ত ২৬ নং বিধিটি ভারতরক্ষা আইনের ২ (২) ধারার অনুযায়ী করিয়া সংশোধন করা হইবে। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিয়াছেন। ২৬ নং বিধিকে সংশোধন না করিয়া ভারতরক্ষা আইনের ২ (২) ধারাকেই ২৬ নং বিধির উপযোগী করিয়া সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনের ফলে ২৬ নং বিধিটি অক্ষুন্ন রহিল এবং ইতিপূর্ব্বে উক্ত অবৈধ বিধি অনুসারে যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকেও আর মুক্তি দিতে হইল না। কিন্তু ইহাতে ফেডারেল কোর্টের নির্দ্দেশের মর্য্যাদা কি ক্ষুন্ন হইল না? এ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। এ দেশের গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়তে তবু একটা স-সঙ্কোচ ভাব আছে, কিন্তু বিলাতী কৈফিয়তে বলা হইয়াছে যে, রায়ের মধ্যেই উহা না মানিবার ইঙ্গিত ও প্ররোচনা রহিয়াছে। আমরা কিন্তু উহার কোন সন্ধান পাইলাম না।

এইরূপ কৈফিয়তে আইন ও বিচারালয়ের মর্য্যাদা সত্যই রক্ষিত হয় কি ?

—

মিঃ জিন্নার ঐক্য-প্রচেষ্টা

নয়াদিল্লীতে মুসলিম লীগের অধিবেশনে মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য হিন্দু-সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুরোধটা যে মেকী তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৃটেনের ভেদনীতির ফলে ভারতে ভেদ নীতি সৃষ্টি হইয়াছে, মিঃ জিন্না একথা স্বীকার করেন না। ভারতবাসীরাই এই সাম্প্রদায়িক ভেদ সৃষ্টি করিয়াছে ইহাই তাঁহার অভিমত। বস্তুতঃ ভারতের অনৈক্য সম্পর্কে বিদেশী শাসকরা এতদিন যাহা আমাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছেন মিঃ জিন্না তাহারই সাফাই গাহিয়াছেন নয়াদিল্লীতে। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য আ-প্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু লীগের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির জন্যই এই চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইতে পারিতেছে না। মিঃ জিন্না তাঁহার পূর্ব্বরীতি বজায় রাখিয়া কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রতি বিষোদ্গার করিতেও কসুর করেন নাই। তার পর হিন্দু-সাধারণকে একথাও তিনি শুনাইয়াছেন যে, স্বাধীনতা পাইতে হইলে তাঁহার পাকিস্তানের দাবী এবং দ্বৈতজাতিতত্ত্ব মানিয়া লইতে হইবে। ইহার পরেও মিঃ জিন্নার ঐক্য প্রয়াসকে কিরূপে খাঁটি বলিয়া স্বীকার করা যায় ?

লীগের নয়াদিল্লী অধিবেশনে মিঃ জিন্না বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তেরশত বৎসর পূর্ব্বেই মুসলমানরা সাম্যের কথা জানিয়াছে, সুতরাং কংগ্রেসের গণতন্ত্র নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু হজরত মহম্মদ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী চারিজন খলিফা যে ইসলামী গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন মিঃ জিন্না তাঁহার নিজের জীবনে তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন কি ? হজরত মহম্মদ পাকিস্তানের কথা কোথাও বলিয়াছেন কি ? ইসলামী গণতন্ত্রের সহিত পাকিস্তান খাপ খায় কি ? মিঃ জিন্না ঐক্যের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অভিভাষণের প্রত্যেকটি কথায় শুধু ভেদ সৃষ্টির প্রয়াসই দেখা যায়।

—

মিঃ জিন্নার উষ্মা

বিলাতী পত্রিকাগুলিকে মিঃ জিন্নার শক্তির উৎস বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না। কিন্তু মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশনে প্রদত্ত মিঃ জিন্নার অভিভাষণটি খাঁটি বিলাতী পত্রিকাগুলিরও মুখরোচক হয় নাই দেখিয়া আমরাই বিস্মিত হইয়াছি, কাজেই মিঃ জিন্নার দ্বিতীয় রিপুর প্রকোপ যে বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? টাইমস্ পত্রিকা মিঃ জিন্নার অভিভাষণকে ফ্যাসিষ্টসুলভ চাতুর্য্যও কুচকাওয়াজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এমন কি মিঃ জিন্নার পাকিস্তানের দাবী যে ভারতের সকল মুসলমান সমর্থন করে না, তাহা পর্য্যন্ত টাইমস্ স্বীকার করিয়াছেন। গ্লাসগো হেরল্ড তো মিঃ জিন্নার শক্তির প্রতিই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহাতে রাগ না-ই বা হয় কার ! মিঃ জিন্না চটিয়া যাইয়া বিলাতী পত্রিকাগুলির সমালোচনার উত্তরে বেশ কড়া রকমের একটা বিবৃতি দিয়া ফেলিয়াছেন।

মিঃ জিন্নার এই উষ্মা প্রকাশকে যে বিলাতী পত্রিকাগুলি খুব আমল দিয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তাঁহার এই উষ্মা যে নির্ব্বিষ তাহা তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন। মিঃ জিন্নার উষ্মা তো দূরের কথা লীগের অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্জমান সাহেব যখন বলিলেন যে,মুসলমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতে ফেডারেশন বা কনফেডারেশন প্রবর্ত্তিত হইলে লীগ বলপ্রয়োগের নীতি অবলম্বন করিবে, তখনও ভারত গবর্ণমেণ্ট [illegible]বং বিধি অনুসারে লীগনেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। কারণ তাঁহারা জানেন লীগের এই বীরদর্পের মধ্যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদকে কায়েম রাখিবার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায়।

—

লীগ মন্ত্রী-মণ্ডলী

মিঃ জিন্না দাবী করিয়াছেন, ভারতের চারিটি প্রদেশে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আর একটিতে হইতে চলিয়াছে। উক্ত চারিটি প্রদেশের একটি বাংলা এবং আর একটি পাঞ্জাব। বাংলায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনকে মিঃ জিন্না ওয়াটার্লু যুদ্ধ জয়ের সহিত তুলনা

করিয়াছেন। ওয়াটার্লু যুদ্ধটা আজকাল যেমন খুব সস্তা হইয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর অনশনকেও একখানি বিলাতী পত্রিকা ওয়াটার্লুর পর্য্যায় ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার ওয়াটার্লু-বিজয়ী ওয়েলিংটন খাজা স্যার নজিমুদ্দীন নহেন। আসাম ও সিন্ধুর ওয়াটার্লু লড়াই যেভাবে জয় হইয়াছে বাংলাতেও হইয়াছে অনেকটা সেই ভাবেই। পাঞ্জাবের মন্ত্রি-মণ্ডলীকে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী বলায় পাঞ্জাবের রাজস্ব সচিব স্যার ছোটুরাম তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিবাদের পরেও মিঃ জিন্না তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার করেন নাই। অধিকন্তু স্যার ছোটুরামেরই পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী রাজা গজনফর আলী এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, মিঃ জিন্না পাঞ্জাবের মন্ত্রিমণ্ডলীকে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী বলেন নাই বটে, কিন্তু উহাকে লীগপন্থী মন্ত্রিসভা বলা চলে। অতঃপর স্যার ছোটুরাম কি করিবেন তাহা জানা যায় না। তিনি হয় ত নিজে চোখ বুজিয়া মনে করিতেছেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইতেছে না।

আর একটি লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের কতক সদস্য বন্দী হইলে মন্ত্রিত্ব করার যে কত সুবিধা তাহার পথপ্রদর্শন করিয়াছে উড়িষ্যা। ইহার উপর অনুগ্রহ বিতরণ তো আছেই। মন্ত্রিসভা গঠনের এমন একটা উপায় যখন পাওয়া গিয়াছে তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে?

—

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িকতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও কিরূপে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলযোগ সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। গত ৩১শে জানুয়ারী ঢাকা কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ইউনিয়নের সভায় এক গণ্ডগোল হয়। তার পর ২রা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অট্টালিকায় ও প্রাঙ্গণে আর একটি হাঙ্গামা হয়। এ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ঢাকা বিভাগের কমিশনার একটি কমিটি গঠন করেন। শ্রীযুত পঙ্কজকুমার ঘোষ এবং মিঃ মহম্মদ ইব্রাহিমকে লইয়া কমিটি গঠিত হয় এবং রিপোর্টের সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা একমত হইয়াছেন।

তদন্ত কমিটি সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মূল উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন পৃথক নির্ব্বাচনের মধ্যে। পৃথক নির্ব্বাচনের ফলেই আমাদের দেশের সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনীতি একার্থবোধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও কিরূপে প্রভাব বিস্তার করে কমিটি তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সিষ্টেম সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, "বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য বিভিন্ন হল থাকায় ক্লাসের বাহিরে ছাত্রদের সমস্ত কার্য্যকলাপই সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের নির্ব্বাচন হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। ছাত্ররা খেলাধুলা পর্য্যন্ত করেন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নির্ব্বাচন ও কার্য্যকলাপও সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন বিষয়ে আলোচনা ও ভোট গ্রহণের সময় সাম্প্রদায়িকতার দিক হইতে বিষয়টি বিচার করা হইয়া থাকে।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতার একান্ত অভাবের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কমিটি মনে করেন, যদি নিয়মানুবর্ত্তিতা থাকিত, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ৩১শে জানুয়ারী ও ২রা ফেব্রুয়ারীর গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে পারিত না। নিয়মানুবর্ত্তিতার না থাকার কারণ ভাইস্ চ্যান্সেলারের হাতে ক্ষমতার অভাব—তিনি সব সময়ই নিজেকে কমিটির মুখাপেক্ষী মনে করেন। এ জন্য তাঁহাকে দোষ দিয়া লাভ নাই। তাঁহাকে যখন চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে, তখন স্বাধীন মনোবৃত্তি দেখাইতে গেলে চলিবে কেন? প্রকৃত ক্ষমতা যদি দেওয়া না হয় তাহা হইলে ভাইস চ্যান্সেলারের কতক দায়িত্ব রেজিষ্ট্রারের হাতে ছাড়িয়া দিলেও কোন

জন হইবে না। কমিটি সুপারিশ অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির গঠনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রতিষ্ঠার উপায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট যে ভাবে কার্য্যে পরিণত করিবেন, তাহারই উপরে এই রিপোর্টের সুপারিশগুলির সাফল্য নির্ভর করিবে।

—

শাসন-পরিষদে নূতন নিয়োগ

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে: স্যার আজিজুল হক সি-আই-ই; ডাঃ এন, বি খারে এম-এল-এ; স্যার অশোককুমার রায়। মহাত্মা গান্ধীর অনশনের সময় স্যার হোমী মোদী, শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এবং শ্রীযুত আণে শাসন-পরিষদের সদস্য পদ পরিত্যাগ করায় তিনটি আসন শূন্য হয়। উল্লিখিত তিন জন সদস্যের নূতন নিয়োগ দ্বারা শূন্য আসন পূর্ণ করা হইল। এই নূতন নিয়োগ উপলক্ষে দপ্তর বণ্টনেরও কিছু অদল-বদল করা হইয়াছে। সমর পরিষদে ভারতীয় সদস্য দেওয়ান বাহাদুর স্যার রামস্বামী মুদালিয়র সরবরাহ সদস্য হইলেন। স্যার রামস্বামী মুদালিয়র সমরপরিষদের সদস্যপদেই বহাল থাকিবেন, আপাততঃ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের কোন প্রশ্ন উঠে নাই। স্যার আজিজুল হক বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হইলেন। তিনি লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন; তাঁহার স্থলে বর্ত্তমানে ভারত সচিবের উপদেষ্টা স্যার এস, রঙ্গনাথনকে ভারতের হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্যার অশোক কুমার রায় স্যার সুলতান আহমদের স্থলে আইন সচিব হইলেন এবং স্যার সুলতান আহমদ হইলেন প্রচার ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

নবনিযুক্ত তিন জন সদস্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। তাঁহারা সকলেই যোগ্য ব্যক্তি। স্যার অশোককুমার বাংলার এডভোকেট জেনারেল, সুতরাং এই দিক দিয়া তাঁহার আইন সচিব হওয়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু বাংলা অথবা ভারতের রাষ্ট্রনীতির সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি নিজেও বোধ হয় দাবী করেন না। স্যার আজিজুল হককে আমরা মুসলিম লীগের সদস্য বলিয়াই জানি, কিন্তু তিনি মুসলিম লীগের সদস্য পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। তিনি এই নূতন কাজ গ্রহণের পূর্ব্বে মিঃ জিন্নার সম্মতি লইয়াছিলেন তো? ডাঃ খারে ছিলেন কংগ্রেস-সেবী, কিন্তু শাস্তিবিধানের অস্ত্রে তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রসারিত শাসন পরিষদ সম্পর্কে নূতন করিয়া আমাদের কিছু বলিবার নাই। এই সম্প্রসারণ নীতি যে ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই, কর্ত্তৃপক্ষও তাহা অবগত আছেন। ভারতগবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান নীতির সামান্য পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতাও ভারতীয় সদস্যদের নাই, অধিকন্তু ভারতীয় স্বার্থের হানিকর অনেক কিছুই তাঁহাদের সমর্থন করিতে হয়। প্রতিক্রিয়াশীল বিধিব্যবস্থার সহিত তাঁহাদের নাম যুক্ত হইয়া দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে।

—

মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ আমেরী

বিলাতের ডেইলী হেরল্ড পত্রিকা আবিষ্কার করিয়াছেন, "মিঃ আমেরী এবং তাঁহার প্রধান শত্রু মিঃ গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গী একই প্রকার......আমেরী এবং গান্ধী জাতীয় আশাআকাঙ্ক্ষাকে বিশ্বের ভবিষ্যতের ভিত্তিস্বরূপ বলিয়া মনে করেন।" এই রকম একটা আবিষ্কার যে মৌলিকতার পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই। সাম্রাজ্যবাদী মিঃ আমেরী আর নিজের দেশের স্বাধীনতাকামী জননেতা মহাত্মা গান্ধী উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী এক না হইয়া যায় কোথায়! কিন্তু দুঃখের বিষয় পার্লামেণ্টে ওয়েলসের শ্রমিকসদস্য মিঃ কোভ ডেইলী হেরল্ড পত্রিকার বুদ্ধির তারিফ না করিয়া তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন। ডেইলী হেরল্ড পত্রিকা এই প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিয়া যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা সাম্রাজ্যবাদী যুক্তিরই প্রতিধ্বনি মাত্র। মিঃ কোভের প্রতিবাদের উত্তরে ডেইলী হেরল্ড লিখিয়াছেন:—

"যুদ্ধের পর ভারত স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহিলে

ক্রিপসের প্রস্তাবে তাহাকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসী দল ইহাতে আপত্তি করেন। কংগ্রেস এই বিষয়ের জন্ত শুধুমাত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই; যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত করিবার জন্য একটা আন্দোলনেও প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিশ্বের সমস্ত জাতিগুলির স্বাধীনতার জন্তই এই যুদ্ধ চালানো হইতেছে এবং প্রতিপক্ষ এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ভারত চিরদাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে; ইহা জানিয়াও কংগ্রেস এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদে অন্ধ, আমাদের এই উক্তির ইহা অপেক্ষা স্পষ্টতর প্রমাণ আর কিছুই থাকিতে পারে না।"

ক্রিপস্-মিশন কেন ব্যর্থ হইল, তাহা লইয়া বহু আলোচনা এপর্য্যন্ত হইয়াছে। নূতন করিয়া এ সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই। ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে বৃটেনের অনিচ্ছাই এই ব্যর্থতার কারণ। কংগ্রেস যুদ্ধ প্রচেষ্টা কখনও ব্যাহত করিতে চায় নাই, বরং যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহযোগিতাকে অধিকতর শক্তিশালী করাই ছিল কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। সুতরাং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে-সকল দোষারোপ উক্ত পত্রিকা করিয়াছেন, একমাত্র সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষেই তাহা করা সম্ভব। কারণ কংগ্রেস অক্ষশক্তির পরাজয় যেমন চায় তেমনি চায় ভারতের স্বাধীনতা, আর সাম্রাজ্যবাদী অক্ষশক্তির পরাজয় চায় বটে, নিজের সাম্রাজ্যবাদ ছাড়িতে চায় না। বিশ্বের সমস্ত জাতির স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ কি না, তাহা আজও প্রমাণিত হয় নাই। অধীন দেশগুলি শাসনের দায়িত্ব যে বৃটেন ত্যাগ করিতে চায় না মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরী প্রভৃতির উক্তিতেই তাহা প্রকাশ।

—

ভারতের স্বাধীনতা

মাদাম চিয়াং কাইশেক গত ১৪ই এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার প্রশ্নকে পৃথিবীর বর্ত্তমান সমস্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "যুদ্ধের পরে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, রাশিয়া এবং চীন এই চারিটি বৃহৎ রাষ্ট্রকে একটি বিশ্বপরিষদ গঠনে উদ্যোগী হইতে হইবে। যে-সকল দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে সেই দেশগুলির নিঃস্বার্থ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকিবে এই বিশ্ব পরিষদের হাতে।" মহাত্মা গান্ধীর চিন্তাশক্তি অস্পষ্ট তাঁহার আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টি নাই, তাঁহার এই সকল উক্তি ভ্রান্তিমূলক হইলেও পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা খুবই সত্য। তিনি বলিয়াছেন, "আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত নেহরুকে মুক্তি দেওয়া উচিত। তিনি ভারতের মুক্ত রাজনৈতিক চেতনাকে মিত্রশক্তির অনুকূলে নিয়োজিত করিতে পারিবেন।" চীন ভুক্তভোগী দেশ, তাই ভারত ও অন্যান্য পরাধীন দেশের প্রতি মাদাম চিয়াং কাইশের সহানুভূতি থাকিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে প্রধান দুইটি শক্তি বৃটেন এবং আমেরিকা ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে কিরূপ দৃষ্টিতে দেখে তাহা মাদাম চিয়াং কাইশেকের অজ্ঞাত না থাকিবারই কথা।

ভারতবর্ষ বৃটেনের অধীন। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ ইডেন, মিঃ আমেরীপ্রমুখ বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদগণের অভিমত আমরা জানি। কোন কোন চিন্তাশীল বিশিষ্ট ইংরাজ এবং বিলাতী সংবাদপত্র যে ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করেন তাহাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। বিলাতের নবগঠিত কমনওয়েলথ দলের নেতা স্যার রিচার্ড অকল্যাণ্ড বলিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতির কর্ত্তব্য ভারতীয় অচল অবস্থা দূর করিবার জন্ত বৃটিশের উপর চাপ দেওয়া, বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যাপার হস্তক্ষেপ করা। সম্মিলিত জাতিবর্গের মধ্যে চীনের অভিমত মাদাম চিয়াং কাইশেকের উক্তিতেই প্রকাশ, কিন্তু বৃটেনের উপর চাপ দেওয়ার কোন সামর্থ্য চীনের নাই। রাশিয়া নিজের আত্মরক্ষা লইয়াই বিব্রত। তারপর ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তিতে এক পক্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অপর পক্ষের কোন কথা বলিবার অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। বাকী রহিল শুধু মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র। মিস্ পার্ল বাক নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে ইংরেজদিগের দৃষ্টিভঙ্গী আমেরিকায় আমাদের তুলনায় অনেক উদার ও সহজবোধ্য।" কিন্তু ভারত সম্পর্কে মিঃ চার্চ্চিলের সহিত মত-পার্থক্য জানাইয়াও বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ আবার মিঃ

চার্চিলকেই যে সমর্থন করেন তাহা মিস্ পার্লবাকের দৃষ্টিকে এড়ায় নাই। ইহার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "কারণ তাঁহারা ভালভাবেই জানেন যে, অবশেষে মিঃ চার্চিল না হইলেও অন্য ব্যক্তিগণ ভারত সম্পর্কে এমন কর্মপন্থা অনুসরণ করিবেন যাহার ফলে সাম্রাজ্যের স্বার্থ সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকিবে।" মিস্ পার্লবাকের উক্তি হইতে কি ইহাই বুঝা যায় যে, সাম্রাজ্যের স্বার্থ অব্যাহত থাকিবে বলিয়াই ইংরাজগণ ভারত সম্পর্কে উদার দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় দিয়া থাকেন?

অনেক আমেরিকাবাসী আছেন যাহারা ভারতের জাতীয় দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল। ভারতীয় সমস্যায় আমেরিকার হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী আমেরিকায় যে নাই তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের অভিমত মার্কিন গবর্ণমেণ্টের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাল্‌ফ বার্টন পেরীর সমালোচনার উত্তর দান প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ সামনার ওয়েলস যে-সকল উদারনৈতিক আমেরিকাবাসী ভারতীয় সমস্যায় মার্কিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকরী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী তাঁহাদিগকে কঠোর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কিন্তু হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে উদারনীতি বলিতে কি বুঝায় তাহাই জানা প্রয়োজন। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, উহা আমার ধারণার বাহিরে।" আমেরিকা যদি ভারতীয় ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতে না চায়, তাহা হইলে উদার নীতি কথাটা মিঃ সামনার ওয়েলসের কাছে দুর্ব্বোধ্য তো হইবেই। উদারনীতি তাঁহার কাছে দুর্ব্বোধ্য, আর ভারতের শাসন তান্ত্রিক সমস্যা তাঁহার কাছে অত্যন্ত জটিলও সমস্যা অর্থাৎ উহাও দুর্ব্বোধ্যের নামান্তর। তবে ভারতীয় সমস্যার সমাধান ব্যাপারে সাহায্য করিতে মার্কিন গবর্ণমেণ্টের আগ্রহের কথা জানাইতে তিনি ভুলেন নাই। এই কথা পড়িয়া আমাদের মনে হয়, আমরা কোন বৃটিশ রাষ্ট্র নীতিবিদের লেখা পড়িতেছি। বস্তুতঃ মিঃ সামনার ওয়েলসের উক্তি পড়িয়া মনে হয়, ভারতের শাসন তান্ত্রিক প্রশ্ন সম্পর্কে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে কোন মতানৈক্য ঘটে নাই।

ভারতীয় ব্যাপারে মিত্রশক্তির হস্তক্ষেপ করিবার কতটুকু আশা আছে, উল্লিখিত আলোচনা হইতে তাহা কি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না? মিস্ সোনিয়া টোমরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে হেরল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিবর্গের নিকট হইতে ভারতবর্ষ কতখানি সাহায্য পাইবার আশা করিতে পারে সে-সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,

"Thinking Indians have realised at last that the cannot be helped by any allied nations but must rel only on themselves."

চিন্তাশীল ভারতীয়গণ অবশেষে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিবর্গের কাহারও নিকট হইতে তাঁহারা সাহায্য পাইতে পারেন না, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু কেন সাহায্য পাইতে পারে না? ভারতীয় সমস্যাকে বৃটেনের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া সম্মিলিত জাতিবর্গ অর্থাৎ আমেরিকা মনে করে, এই জন্যই কি?

—

সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান

দক্ষিণ আফ্রিকার আইন সভায় অতি দ্রুতগতিতেই ভারতীয় স্বার্থ সঙ্কোচ আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে উহার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এই আইন সম্পর্কে পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর হইতে এই বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উদাসীনতাই প্রকাশ পাইয়াছে। গত ৪ঠা মে মঙ্গলবার কমন্স সভায় প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, এই আইন পাশ হওয়ার পূর্ব্বে এবং পরে এই আইন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের মধ্যে পত্রালাপ এবং আপোষ-আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ শ্বেতপত্র দ্বারা কিম্বা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করা হইবে কিনা? উত্তরে মিঃ এটলী জানাইলেন, প্রস্তাবিত ধরণের কোন পত্রালাপ ও আপোষ আলোচনা হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলিলেন, ব্যাপারটা আন্তঃ-ঔপনিবেশিক ধরণের, কাজেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতের

হাই কমিশনারের মারফৎ ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে আলোচনা হইতেছে। এতখানি কৈফিয়ৎ দেওয়ার পরেও শ্রমিক সদস্য মিঃ এ্যামন জিজ্ঞাসা করেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে দক্ষিণ আফ্রিকার নিকট হইতে কোন আলোচনা বা পরামর্শ পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? মিঃ এটলী উত্তর দিলেন, না মহাশয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রকম একটা ভারতীয় স্বার্থ বিরোধী আইন পাশ হইয়া গেল, অথচ দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একবার আলোচনা করিবারও প্রয়োজন অনুভব করিলেন না, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এ বিষয় উদাসীন রহিলেন। আর ব্যাপারটা যদি আন্তঃ-ঔপনিবেশিক ধরণেরই হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের আপত্তিটা একেবারে উড়াইয়া দিলেন কিরূপে? ইহার কারণ কি ইহাই যে ভারত গবর্ণমেণ্ট শক্তিহীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলে শক্তির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে পারে? ভারত শাসনে ভারতের জনমত যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত না হইবে, ততদিন ভারত গবর্ণমেণ্টের এই দুর্ব্বলতা থাকিবেই। প্রতিবাদ নিষ্ফল হওয়ায় আর কোন কার্য্যকরী প্রতিবাদ করার উপায় আছে কি না, ভারত গবর্ণমেণ্ট সে-সম্বন্ধে কোন চিন্তা করিয়াছেন কি? ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এ সম্পর্কে একটি নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাবে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের সহিত কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ভারতীয় হাই-কমিশনারকে স্বদেশে আহ্বান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। মিঃ এটলীর কথিত মত ব্যাপারটি যদি আন্তঃ-ঔপনিবেশকই হয়, তাহা হইলে কার্য্যকরী প্রতিবাদের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট এই পন্থা গ্রহণ করিতে না পারার কি কারণ থাকিতে পারে? ট্রান্সভাল কংগ্রেসের এই প্রস্তাবটি ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

পঞ্চম স্বাধীনতা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চারি প্রকারের স্বাধীনতার কথা আমরা শুনিয়াছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ সামনার ওয়েলস এই চারি প্রকারের স্বাধীনতার সহিত আর একটি অধীনতা জুড়িয়া দিয়াছেন। এই পঞ্চম স্বাধীনতাটি হইল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হইতে মুক্তি বা আর্থিক প্রভুত্বের অবসান। অতীতে বৃটেন এবং আমেরিকা অর্থনৈতিক প্রভুত্ব রক্ষার দোষে দোষী ছিলেন, এ কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি মনে করেন, এই স্বার্থপরতাটা আন্তর্জ্জাতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত হয় নাই, উহা অজ্ঞতাজনিত। তিনি আরও মনে করেন, বৃটেন এবং আমেরিকা এই নীতির ভুল বুঝিতে পারিয়াছে।

আর্থিক প্রভুত্বের অবসান কথাটা শুনিতে বেশ। পরাধীন দেশগুলির ইহাতে আনন্দিত হইবার কথা। অজ্ঞতা হইতে অর্থনৈতিক প্রভুত্বের সৃষ্টি হইয়াছে ভুক্তভোগী পরাধীন দেশগুলি এ কথা স্বীকার করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার কথা আমরা কিছু না জানিলেও বৃটেন অর্থনৈতিক প্রভুত্ব রক্ষার নীতি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার কোন আভাষ পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। বৃটেন যে সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিতে রাজী নয়, মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরী, মিঃ ষ্ট্যানলী প্রভৃতি সকলেই তাহা বলিয়াছেন। মিঃ সামনার ওয়েলসেরও তাহা না জানিবার কোন কারণ নাই।

অজ্ঞতা হইতে যে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বরং ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুচিন্তিত ও সুনির্দ্ধারিত পথেই উহা গড়িয়া উঠিয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। আর্থিক প্রভুত্বের ক্ষেত্র যাহার যতখানি বিস্তৃত সেই অনুপাতেই তাহার আন্তর্জ্জাতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অর্থনৈতিক প্রভুত্ব রক্ষা নীতির ভুল আমেরিকা বুঝিতে পারিয়াছেন তাহার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমেরিকার ইউনিটাস পরিকল্পনা দ্বারা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কাই বিলাতী সংবাদপত্রসমূহ

করিয়া থাকে। অক্ষশক্তির পরাজয়ের পরেও যে বৃটেন সাম্রাজ্যবাদ পরিত্যাগ করিবে, তাহারও কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কাজেই মিঃ সামনার ওয়েলসের পঞ্চম স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভরসা করিবার এখনও কিছু দেখা যাইতেছে না।

—

ডাঃ আম্বেদকারের হিতোপদেশ

ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম-সচিব ডাঃ আম্বেদকার গত ৯ই মে বোম্বাইয়ে তফশীলভুক্ত শ্রেণী ফেডারেশন কর্ত্তৃক আহূত এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্নাকে কার্য্যকরী রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছেন এবং গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা এক বিরাট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-পঁচিশ বৎসর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অত্যুজ্জ্বল যুগ—যে-পঁচিশ বৎসরে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, ডাঃ আম্বেদকার তাহাকেই ব্যর্থতার যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গীর তীক্ষ্ণতা কি কংগ্রেসের সাফল্যেরই পরিচায়ক নহে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিবার জন্য ধন বল এবং জনবল দুই-ই প্রয়োজন। এইগুলি অর্জ্জন করিতেই বহু রাজনীতিকেরই জীবনের বেশীর ভাগ কাটিয়া যায়। মহাত্মা গান্ধী জনবল ও ধনবল দুই-ই অনায়াসে পাইয়াছেন মনে করিয়া ডাঃ আম্বেদকার অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর সাফল্যের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার সাধনার দিকটা তাঁহার লক্ষ্যের মধ্যেই পড়িল না। আরও একটা কথা, ডাঃ আম্বেদকার ভাবিয়া দেখেন নাই যে, রাজনৈতিক পন্থা যদি ঠিক ঠিক ভাবে ধরা না যায়, তাহা হইলে জীবনের বেশীর ভাগ ব্যয় করিয়াও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা অর্জ্জন করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী যদি অনায়াসেই তাহা পাইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যথার্থ পথটিই তিনি ধরিয়াছেন। ভারতবাসী কংগ্রেসের অনুসরণ করে একথা ঠিক কিন্তু, অন্ধভাবে করে ডাঃ আম্বেদকারের এই উক্তি ঠিক নহে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিয়াছে বলিয়াই ভারতবাসী কংগ্রেসের অনুসরণ করে।

মহাত্মা গান্ধী যদি ডাঃ আম্বেদকারের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজনৈতিক বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে রাজীও হন, তাহা হইলে ভারতবাসী তাহাতে রাজী হইবে কেন? ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব যেমন এক মুহূর্ত্তও টিকিতে পারে না, তেমনি ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব ত্যাগও করিতে পারেন না। ডাঃ আম্বেদকার যদি ভারতবাসীকে তাঁহার স্বমতে আনিতে পারেন, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃত্ব একদিনে ধূলায় লুণ্ঠিত হইবে, অবসর গ্রহণের জন্য হিতোপদেশ দিতে হইবে না। ডাঃ আম্বেদকার একবার সেই চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন?

—

আমেরী সাহেবের অপূর্ব্ব কৈফিয়ৎ

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিঃ উইলিয়ম ফিলিপস ভারতবর্ষে আসিয়া সকল দলের নেতাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন, করেন নাই শুধু মহাত্মা গান্ধীর সহিত। সকলের কাছেই উক্ত এক রহস্যজনক ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মিঃ ফিলিপস স্বয়ং এই রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলাপ-আলোচনা করিবার আগ্রহ তাঁহার ছিল এবং ইহার জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি অনুমতিও চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা মিঃ ফিলিপসকে প্রার্থিত সুযোগ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এই উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ যিনিই হউন, মহাত্মা গান্ধীর সহিত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়ার কারণ সকলের কাছেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য বলিয়া মনে হইয়াছে। সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগিয়াছে, এই 'অর্দ্ধনগ্ন বিদ্রোহী ফকিরে'র সহিত মিঃ ফিলিপস

কারাগারে সাক্ষাৎ করিলেও ভারতের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গের কিম্বা যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবার আশঙ্কা ছিল কি ?

লণ্ডনে এক দল মার্কিন সাংবাদিক মিঃ ফিলিপসকে মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিতে না দিবার কারণ সম্বন্ধে মিঃ আমেরীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। উত্তরে মিঃ আমেরী বলিয়াছেন,

"The fact that the British Government regarded Mr. Gandhi as an instigator of criminal acts against the security of India made it impossible for permission to be given to Mr. William Phillips to see Mr. Gandhi."

অর্থাৎ 'বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মিঃ গান্ধীকে ভারতের নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার বিরুদ্ধে অপরাধজনক কার্য্যের প্ররোচনা-দাতা বলিয়া মনে করেন, এই জন্যই মিঃ গান্ধীর সহিত মিঃ উইলিয়ম ফিলিপসকে সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে।' মহাত্মা গান্ধী অপরাধজনক কার্য্যের প্ররোচনা দেন, মিঃ আমেরীর এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও আমেরিকাবাসীরা এ কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে না যে, মিঃ ফিলিপস ও মহাত্মা গান্ধীর অপরাধ-জনক কার্য্যের প্ররোচনা দ্বারা প্ররোচিত হইয়া পড়িবেন। আমেরিকাবাসীরা যদি তাঁহাদের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, মিঃ আমেরী মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার দল (gang) সম্বন্ধে লর্ড নর্থও অনুরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কীর পৃথিবী ভ্রমণের পথে ভারতে আসিবার কারণের কথাও উল্লেখযোগ্য। মিঃ উইল্কীর ভ্রমণ-তালিকা হইতে ভারতবর্ষ বাদ পড়ার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এইরূপ ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, এই সময়ে তাঁহার ভারতে না যাওয়াই সমীচীন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অস্বীকার করায় মিঃ উইল্কী এ বিষয়ে নীরবতা ভঙ্গ না করিলে বিষয়টি পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে না।

—

ওয়াশিংটন-বৈঠক

উত্তর-আফ্রিকায় যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক বিজার্ত্তা ও টিউনিসিয়া অধিকৃত হওয়ার পর এক্সিস সৈন্যবাহিনী বন উপদ্বীপে আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু সেখানেও তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। রোমেল বোধ হয় পূর্ব্বেই উত্তর-আফ্রিকা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

উত্তর-আফ্রিকায় মিত্রশক্তির এই বিজয় যুদ্ধের আর এক অধ্যায় সূচনা করিল। কাসাব্লাঙ্কার বৈঠকে হিটলারকে প্রথমে উত্তর-আফ্রিকায় এবং পরে ইউরোপে পরাজিত করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উত্তর-আফ্রিকায় মিত্রশক্তির সাফল্যের পর ইউরোপের জন্য সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। মিত্রশক্তিবর্গের সমর-পরিকল্পনা সম্পর্কে পরামর্শ করিবার জন্যই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল ওয়াশিংটনে গিয়াছেন। ওয়াশিংটন বৈঠকের আলাপ-আলোচনার ধারা কোন্ খাতে বহিতেছে মার্কিন পত্রিকা-সমূহে সেই বিষয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। জেনারেল ওয়েভেল এবং তাঁহার সহযোগীদের ওয়াশিংটনে উপস্থিতি হইতে ওয়াশিংটন পোষ্ট অনুমান করেন, এই বৈঠকে সুদূর প্রাচীতে অভিযানের বিষয়ও আলোচিত হইবে। ইউরোপে হিটলারকে আক্রমণ এবং প্রাচীতে জাপানকে আক্রমণ দুই-ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ষ্ট্যালিন অনেক দিন হইতেই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাশিয়ার উপর হইতে জার্ম্মানীর গ্রীষ্মাভি-যানের চাপ হ্রাস করার জন্য ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি অপরিহার্য্য। এদিকে আরাকান রণাঙ্গনের সংবাদে প্রকাশ, ১১ই মে রাত্রিতে বৃটিশ সৈন্য মংদ হইতে বিনা বাধায় সরিয়া আসিয়াছে এবং উত্তরে অধিকতর সুবিধাজনক ঘাঁটিতে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। জাপান অতঃপর কি করিবে তাহা কিছু অনুমান করিতে না পারা গেলেও জাপানীরা মংদ পর্য্যন্ত আসায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠার আশঙ্কা আছে। চীন এখনও জাপানের চাপে নিষ্পেষিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াও জাপানী আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্ত হয় নাই। সুতরাং জাপানের সহিত যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আফ্রিকায় মিত্রশক্তি সাফল্য লাভ করায় ভূমধ্যসাগর মিত্রশক্তির পক্ষে নিরাপদ হইয়াছে। অনেক যুদ্ধ-জাহাজ

এবং বাণিজ্য-জাহাজ এখন প্রাচীর যুদ্ধে নিয়োগ করা যাইতে পারে। ওয়াশিংটন বৈঠকে কি স্থির হইবে তাহা এখনও অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু আফ্রিকা বিজয়ের পর হিটলার এবং জাপান দুই শত্রুকেই একসঙ্গে আক্রমণ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষার বিষয় নয়।

—

খাদ্য-সমস্যা

১৩ই মে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ভারত-সরকারের বাণিজ্য- ও খাদ্য- সচিব স্যার আজিজুল হক, বাংলার বেসামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুরাওয়ার্দ্দি ও ভারত সরকারের খাদ্য-বিভাগের সেক্রেটারী মেজর জেনারেল উড দেশের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহারা মানসিক বিপর্য্যয়কেই খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু আগে মানসিক বিপর্য্যয় তারপর খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি, না আগে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি পরে মানসিক বিপর্য্যয়, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয় বটে। শুধু শুধুই মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, মনোবিজ্ঞানে এরূপ কোন পরিস্থিতির বিষয় পাওয়া যায় না। মানব-মনের যত কিছু পরিবর্ত্তন হয় সমস্তই হয় বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক যে, মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিল কেন? এবং কোন্ শ্রেণীর লোকের এই মানসিক বিপর্য্যয় প্রথম ঘটিয়াছে। দেশের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণটা বাস্তব বস্তু হইলেও সে সম্বন্ধে কাহারও প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। দেশের খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও অবস্থা প্রতিফলিত হয় মূল্যের মধ্যে। এই মূল্যই সাধারণ মানুষের কাছে একমাত্র উপায় যাহা দ্বারা দেশের খাদ্য-দ্রব্যের অবস্থা তাহার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত জনসাধারণের মানসিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবার কি কারণ থাকিতে পারে? এখন দেখা দরকার কোন শ্রেণী-বিশেষের মনে মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিবার মত কোন কারণ সৃষ্টি হইয়াছে কিনা?

ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় এবং শত্রুকে [illegible]রিবার নীতির ফলে একশ্রেণীর লোকের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে এবং তাহাদের মনে চাউল মজুদ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ইহারা কাহারা? নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর লোক নিশ্চয়ই নয়। তাহাদের মাসিক যাহা আয় তাহা দিয়া মাসিক খরচই চলে অতিকষ্টে। চাউল মজুদ করা তাহাদের কর্ম্ম নয়। কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশেরই চাষের জমি সামান্য, বৎসরে কয়েক মাস তাহাদিগকে কিনিয়া খাইতে হয়। তাহারা চাউল বা ধান মজুদ করিয়া রাখিবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণই নাই। আর মজুদ করিয়া রাখিলেও এই দুর্ম্মূল্যের বাজারে মজুদ ভাঙ্গিয়া খাওয়া ছাড়া তাহাদের উপায়ান্তর কি? বাস্তবিক পক্ষে বেশী দাম দিয়াই তাহাদিগকে কিনিয়া খাইতে হইতেছে। ঘরে চাউল মজুদ রাখিয়া বেশী দাম দিয়া কিনিয়া খাইতে পারে এরূপ অবস্থা নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী বা কৃষকদের নয়।

চাউল যদি কাহারা মজুদ করিয়া রাখিয়া থাকেন তবে হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ মণ চাউল মজুদ করিবার মত সঙ্গতি যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই রাখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই দুর্ম্মূল্যের বাজারেও মজুদ চাউল তাঁহারা বাজারে ছাড়িতেছেন না কিসের আশায়? আরও বেশী লাভ করিবার আশায় কি? এমনও হইতে পারে তাঁহারা কিছু কিছু চাউল বাজারে ছাড়িতেছেন, কিন্তু একসঙ্গে বেশী ছাড়িতেছেন না, দাম হঠাৎ কমিয়া যাইবার আশঙ্কায়। যদি মানসিক বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে তবে এই সকল বৃহৎ মজুতকারীদেরই ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাই বা বলা যায় কি করিয়া! মানসিক বিপর্য্যয়ের ফলে নিজেদের লোকসান ঘটিতে পারে, এমন কিছু তাঁহারা করিতেছেন না তো? লাভের হারের কিঞ্চিৎ হ্রাসও যাহাতে না হয়, তাঁহারা কি সেই পথেই চলিতেছেন না? ইহা তো মানসিক বিপর্য্যয়ের লক্ষণ নয়। যাহা হউক, এই সকল বৃহৎ বৃহৎ মজুদকারীদের মজুদ চাউলের সন্ধান করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু এই দিক দিয়া সরকারী অভিযান এখনও আরম্ভ হয় নাই।

উক্ত সাংবাদিক বৈঠকে জনসাধারণকে সাহসের সহিত

বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহার প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছি। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি তাহা জানা প্রয়োজন। মেজর-জেনারেল উড হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, ১৯৩৬-৩৭ সাল হইতে ১৯৪০-৪১ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে বাংলায় প্রতি বৎসর গড়ে ৮১ লক্ষ ৮১ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের উৎপাদনের সহিত যুদ্ধকালীন দুই বৎসরের উৎপাদন মিলাইয়া গড়-পড়তা উৎপাদনের হিসাব করা অর্থশাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। কারণ ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে খাদ্য-উৎপাদন সম্মেলনে বাংলায় প্রতি বৎসর গড়ে ১ কোটি ২ লক্ষ ১৭ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয় বলিয়া ধরা হইয়াছে। তার পর ব্রহ্মদেশ হইতে যে চাউল আমদানী হইত তাহাও এই সঙ্গে বিবেচনা করা আবশ্যক। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় প্রকৃত অভাবটা খুব বেশী নয়, একথা স্বীকার করার পরও আর একটা বাস্তব অবস্থা থাকিয়া যায়, চাউলের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি। খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা মূল্যের এই অত্যধিক বৃদ্ধি সমর্থনযোগ্য নয়। ইহাই যদি বাস্তব অবস্থা হয়, তাহা হইলে প্রতিকারের উপায় কি? জনসাধারণই বা কি ভাবে এই বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে? মূল্য বৃদ্ধির ফলে লোকের মনে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে, মূল্যকে স্বাভাবিক অবস্থার কাছাকাছি নামাইয়াই এই আতঙ্ক দূর করা সম্ভব। মজুদকারীরাই যদি দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ম্মূল্যতার জন্য দায়ী হয়, তাহা হইলে অবিলম্বে এবং অতি দ্রুত মজুদ চাউলের সন্ধান করিয়া উহা বাজারে ছাড়িতে হইবে।

শহীদ আল্লাবক্স

সিন্ধুর ভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয় প্রধান মন্ত্রী নিখিল-ভারত আজাদ সম্মেলনের সভাপতি মিঃ আল্লাবক্স ৩১শে বৈশাখ সকাল নয়টার সময় শিকারপুরে বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছেন, এই নিদারুণ সংবাদে সমগ্র দেশবাসী ব্যথাকাতরচিত্তে স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে, পুলিশ লাইনের সম্মুখে আততায়ীর গুলীতে তিনি নিহত হইয়াছেন। প্রতিহিংসা কিরূপ প্রবল হইলে মানুষ এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

মিঃ আল্লাবক্স স্বাধীনতার আদর্শেই তাঁহার রাজনৈতিক জীবনকে গঠিত করিয়াছিলেন। পরাধীন দেশে এরূপ খাঁটি লোক খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁহার তেজস্বিতা ও আদর্শনিষ্ঠা অতুলনীয়। এই আদর্শনিষ্ঠার জন্যই তিনি অবিচলিত চিত্তে পদচ্যুতিকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার পদচ্যুতির পর সিন্ধুতে লীগ-মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই মন্ত্রি-সভা এখনও ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মুখীন হয় নাই। এই অবস্থায় মিঃ আল্লাবক্স নিহত হওয়ায় সিন্ধুর গুরুতর ক্ষতি হইল। এই হত্যা-কাণ্ডের মূলে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকুক আর না-ই থাকুক, আততায়ীরা একজন জনপ্রিয় দেশপ্রাণ নেতাকে নিহত করিয়া ভারতের যথেষ্ট অকল্যাণ সাধন করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আততায়ীদিগকে গ্রেফতার ও দণ্ডিত করার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, সমগ্র দেশবাসী অধীর আগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিবে।

মিঃ আল্লাবক্সের এই মৃত্যু সাধারণ মৃত্যু নয়, ইহা দেশের সেবায় আত্মোৎসর্গকারী বীরের মৃত্যু—মিঃ আল্লাবক্স আজ হইতে শহীদ আল্লাবক্স। তাঁহার এই আত্মোৎসর্গ ভারতের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। রক্তগঙ্গা বহাইবার ভয় যাঁহারা প্রদর্শন করেন, শহীদ আল্লাবক্সের এই আত্মোৎসর্গ কি তাঁহাদিগকেও এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিবে না যে, ভারতের জাতীয় লক্ষ্য স্বাধীনতা লাভের পথ ইহাতে শুধু ব্যাহতই হইয়া উঠিবে?

বাংলা হইতে চাউল সরাইবার কাহিনী

বাংলা দেশ হইতে চাউল সরাইবার যে কাহিনী এত দিন অপ্রকাশিত ছিল, পদত্যাগের পর মৌলবী ফজলুল হক কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

চাউল সম্পর্কিত নীতি লইয়া লাটসাহেবের সহিত

তাঁহার মতানৈক্যের বিষয় মিঃ হক বলেন যে জাপানী সৈন্যদল কর্তৃক গত ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হইবার পর তিনি দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন তিনটি জেলা হইতে চাউল সরাইয়া ফেলার আয়োজন হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে কৃষি বিভাগের গড়পড়তা ফসলের হিসাব দেখিয়া লাটসাহেব জানিতে পারিয়াছেন যে, উক্ত তিন জেলায় নাকি বাড়তি চাউল আছে। আর সেই জন্যেই যাহাতে সেগুলি শত্রুহস্তে না পড়ে তাহার জন্য লাটসাহেব তাঁহার সেক্রেটারীকে ডাকিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই তিন জেলা হইতে ৩০ লক্ষ মণ চাউল সরাইয়া ফেলিবার জরুরী আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর লাটসাহেব এ বিষয়ে প্রধান মন্ত্রীর মতামত জিজ্ঞাসা করেন। মিঃ হক বলেন, তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে তথ্যাদির দ্বারা ঐ তিন জেলায় বাড়তি চাউলের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাতে গত বৎসরের ফসল বৃদ্ধি, বর্ত্তমান বৎসরের লোকবৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ জরুরী অবস্থায় চাহিদার পরিমাণ প্রভৃতি কোন বিষয়ই কোনরূপ হিসাব করা হয় নাই। কিন্তু লাটসাহেব পুনর্বার হুকুম দিলেন "আগামী কল্যের মধ্যেই জাপানীরা আসিয়া পড়িবে, সুতরাং ১০ ঘণ্টার মধ্যেই চাউল সরান চাই-ই।" তখন মিঃ হক নিরুপায় হইয়া বলিলেন যে তিনি চাউল সরান বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু এইরূপ কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। তখন বিনা কাগজপত্রেই কোন একটি কোম্পানীকে পাকড়াও করা হইল আর চাউল সরাইবার জন্য ২০ লক্ষ টাকা আগাম দেওয়া হইল। এইভাবে ছিনিমিনি খেলিতে খেলিতে বাংলায় চাউল সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আমার সতর্কবাণীতে কেহই কর্ণপাত করে নাই। মিঃ হক বলেন, আজ প্রচার করা হইতেছে বাংলায় প্রচুর চাউল মজুদ রহিয়াছে। কিন্তু একথা আদৌ সত্য নহে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশে যে চাউল থাকা উচিত ছিল তাহার সিকি চাউলও বর্তমানে এদেশে নাই। পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও প্রচুর চাউল এদেশ হইতে রপ্তানী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মিঃ হক আরও বলেন যে, অবশেষে যখন চাউলের অভাবে দেশে হাহাকার লাগিল তখন লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে এত দুঃখ বাজিয়াছিল যে তিনি স্বেচ্ছায় লাটসাহেবকে জানাইলেন যে, দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য যদি মন্ত্রিসভাকে সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভায় পরিণত করিবার প্রয়োজন হয় তবে তাহার জন্য তিনি পদত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত। দেশের লোকের জীবন-মরণের সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি যে কোন কাজ করিতে প্রস্তুত। লাটসাহেব তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াই তাঁহার নিকট হইতে পদত্যাগপত্র আদায় করিলেন। জাপান কর্তৃক ব্রহ্মদেশ অধিকারের পর লক্ষ লক্ষ বাড়তি লোক আসিয়া আশ্রয় লাভ করিল বাংলায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি চাউল উঠিয়া যে কোথায় গেল তাহার সন্ধান আজও মিলিল না। ব্রহ্মদেশ হইতে সরিয়া আসিবার সময় জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল আ[illegible] হইয়াছিল কি না, হইয়া থাকিলে সেই চাউলই বা গেল কোথায় হক সাহেব এই সংবাদটিও দিলে ভাল করিতেন।

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

পঞ্চম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৫০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সংস্কৃতির বিবর্তন

শ্রীরবীন্দ্রবিনোদ সিংহ

বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে দুনিয়াটাকে বিচার করলে একথা আজ আর বলতে বাধে না যে অর্থনৈতিক কাঠামোই সভ্যতার বনিয়াদ। বনিয়াদ বলতে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বিলিব্যবস্থাই বুঝতে হবে। এই সম্পর্ক ও বিলিব্যবস্থা কখনও চিরন্তন হতে পারে না। মানুষের জীবিকার সংস্থানেই তার পরিবর্তনের কারণ মেলে। জীবিকা সৃষ্টির আদি প্রয়োজন। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-যুগ সম্বন্ধে যদি একথা সত্য হয়, তবে আজকের দিনের পুঁজিবাদী শিল্প-যুগেও তা মিথ্যে হওয়ার কারণ ঘটেনি। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতে প্রয়োজন হয় বিপুল চেষ্টার, কারণ ক্ষুধার তাড়নায় মানুষকে উন্মাদ হতে হয়। অথচ সে চেষ্টা নির্ভর করছে কতগুলি বাস্তব পারিপার্শ্বিক ও প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উপর। এই প্রাকৃতিক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকের উপর অধিকার বিস্তার করতে গিয়েই মানুষ গড়ে তুলেছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতিরচনায় মানুষের এই যে সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মূলে আছে কতগুলি বাস্তব উপকরণ (material means) আর তার শিকড়ের টান প্রধানতঃ সমাজ-ব্যবস্থার ভিজে মাটিতে। প্রত্যেক যুগের বাস্তব উপকরণ নিয়ে গড়ে ওঠে তার পরবর্তী যুগের বাঁচবার সম্ভাবনা, আর সে বাঁচবার সম্ভাবনা থেকে একদিন সমাজ ও সংস্কৃতি নবজন্ম লাভ করে।

ভবিষ্য সমাজ ও সংস্কৃতির এই ভ্রূণ-সম্ভাবনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের রঞ্জন-রশ্মিতেই সমাজবিবর্তনের কারণ ধরা পড়ে। জগত সৃষ্টির আদিতে দেখি বস্তুময় বিরাট বিশ্বের জঠরে অগ্নিময় এক বিশাল ঘূর্ণি বস্তুনিচয়কে প্রতিনিয়ত সঞ্চালিত করছে। এই ঘূর্ণির কাণ্ডারী ইলেকট্রন ও প্রোটন্। ইলেকট্রন ও প্রোটনের নিরন্তর সংঘর্ষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে নব নব বাস্তব জীব-কোষ। ঘাত-প্রতিঘাতের পরম্পরায় (interaction of the germs of combination) এই জীবকোষ থেকে জন্ম নেয় বস্তু-পুঞ্জ। যে দ্বন্দ্বের সমবায়ে বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি হলো, তার অভ্যন্তরও এই দ্বন্দ্বের বাষ্পে ভরা। বিরোধ থেকে জন্ম নিয়ে সৃষ্ট বস্তু সেই বিরোধের ধর্মকে এড়াতে পারে না। সে নূতন নূতন সৃষ্টির পথে বিরোধেরই সমধর্মী হয়ে ওঠে। বিরোধটা চিরন্তন, আর চিরন্তন বলেই বাস্তব জগত এত পরিবর্তনশীল। পারস্পরিক অন্তর্বিরোধ মাটির পৃথিবীকে তাই একঠাই দাঁড়িয়ে থাকতে দিচ্ছে না। স্বাভাবিক পরিবর্তনের সংগে হাত মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সমাজের রূপান্তর হচ্ছে, আর সামাজিক পরিবর্তন শুধু সংস্কৃতির রূপান্তরই সূচনা করে।

'History repeats itself' এই কথাটা তাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা-প্রসূত নয়। সভ্যতার ইতিহাস চলে বাস্তব জগতের পারিপার্শ্বিককে কেন্দ্র করে সমাজের বিচিত্র সমস্যার স্বভাব-ধর্মী দ্বন্দ্ব-মূলক (Dialectical)

পরিস্থিতির তাগিদে। সমাজের একটা বিশেষ ব্যবস্থার আওতায় বর্ধিত পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে সেই পারিপার্শ্বিক-সৃষ্ট আরেকটা অসন্তোষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী মন গড়ে ওঠে। চলতি সমাজ-ব্যবস্থার জঠরে আরেকটা ব্যবস্থার ভ্রূণ দানা পাকায়। এই ভ্রূণের বহিপ্রকাশ হিসেবে দেখা দেয় নূতনতর সমাজ ও সংস্কৃতি। এই সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্বতন সমাজ কিংবা তার প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজ-মনের আর সন্ধান পাওয়া না'ও যেতে পারে। এই মতবাদের (Dialectic materialism) প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্ক্স্ (Karl Marx) হলেও আদর্শ ও ভাবগত গুরু দার্শনিক হেগেল (Hegel)। হেগেল বলেন—'Thesis and the anti-thesis—out of this comes out Synthesis. হেগেলের এই মতবাদ ভাবকে ভিত্তি করে তৈরি। Primacy of ideaকে ভিত্তি করেই হেগেলীয় দর্শন—ভাবজগতের পরিবর্তনের সংগে সংগে বস্তুজগত পরিবর্তনের পথে এগিয়ে যায়। মার্কস্ হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক ভাববাদকে ভাবজগত থেকে বাস্তব জগতে টেনে আনেন। মার্ক্সের মতে বাস্তবের পরিবর্তনের সংগে সংগে ভাবের পরিবর্তন আরম্ভ। বস্তুই জগত সৃষ্টির আদি—সুতরাং সমাজ-সংস্কৃতিরও। ইতিহাসের জড়বাদী বিশ্লেষণ (Materialistic interpritation of History) দ্বারা মার্ক্স্, ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে, এ তথ্যের সারবত্তাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। যে সমাজ ও সংস্কৃতি ইতিহাসের পাতায় আজ প্রাচীনত্বের দাবী নিয়ে বেঁচে আছে, সে সমাজ ও সংস্কৃতি পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে, মানুষের জড়বাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি একথা স্বীকার করে না। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও তার অংগাংগী পারিপার্শ্বিক নিয়ে সংস্কৃতির যখন মূল উৎপাটিত হয়ে যায়, তখন সে সমাজ পুনরুত্থিত হবে একথা যেমনি অসম্ভব, সে সমাজ-সৃষ্ট সংস্কৃতির মৃত্যু হবে, সেও অনিবার্য। সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস বাস্তববাদীর চোখে আজ এমনি করে ধরা দিয়েছে।

সংস্কৃতির একটা স্তর ধরা যাক্। পশুচারণ (Pestoral) যুগের যাযাবর বৃত্তির প্রভাব-মুক্ত হয়ে মানুষ সংস্কৃতির যাত্রাপথে যেখানে এসে কৃষিযুগে পৌঁছালো, সেদিন থেকেই সামাজিক মানুষের গৃহনির্মাণ সুরু। কৃষিবিস্তারের সংগে সংগে গৃহনির্মাণ করে যাযাবর মানুষ হলো গৃহী, অনাবাদী জমি হলো কর্ষিত উর্বর, কৃষক হলো জমির মালিক অথচ মালিকানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পশুকে বশ করে অস্ত্রের সাহায্যে লভ্য হলো নিশ্চিত খাদ্য, কিন্তু এই নিশ্চিত খাদ্যও প্রকৃতি-অনপেক্ষ নয়। কৃষির প্রয়োজনে পশুচারণটা মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। অথচ পশুচারণের তাগিদে চারণ-ক্ষেত্রের সন্ধানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে পরস্পরের সংগে সর্বদা দ্বন্দ্বে রত থাকতে হতো। বিজেতা ও বিজিতের অনুরূপ দ্বন্দ্বের ফলে দেখা দিয়েছিলো মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তার। বিজিত শত্রুকে বিজেতার অধীনে জীবিকার সংগ্রহ করতে হতো। দাস-প্রথা ও সার্ফ্-প্রথা (Serf system) সেদিনের মাটির রসে তৈরি। পরবর্তীকালে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়লো তখন এই সার্ফপ্রথা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর দাসদের ক্রীত-শ্রমে যে অর্থের উৎপাদন হতো সে উৎপাদনের ফল ভোগ করতো জমির মালিক, দাস-শ্রমিক পেতো কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন। তাই ক্রীতদাস ও ক্রেতার সম্পর্ক কোন মতেই মধুর থাকতে পারেনি। শোষক ও শোষিতের এই অর্থনৈতিক সম্পর্কের সংঘর্ষকে গ্রাসাচ্ছাদন ও ধন-সঞ্চয়ের সংঘর্ষ (struggle between subsistance and income) বলা যেতে পারে। মানুষের ইতিহাস এই [illegible] বণ্টন ও শ্রেণীবৈষম্যেরই ইতিহাস। ক্ষমতাপিষ্ট নিম্নশ্রেণীর শ্রমলব্ধ উৎপাদনের মোটা অংশ আত্মসাৎ করেই ধনিক ক্ষমতাশালীর সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে।

এই ত ছিল প্রাচীন সমাজের সংস্কৃতির একটা অনুন্নত স্তর। দৈনন্দিন জীবিকা ও আধিপত্য-বিস্তারী সংঘর্ষে বিজিত মানুষগুলি সেদিনও বিজেতার পরাক্রমে সন্ত্রস্ত থাক্তো। সন্ত্রস্ত থাকতো অথচ একটা ধূমায়িত বিদ্রোহ তাদের মনের আকাশে সময় সময় উকিঝুঁকি মারতো। আজকের দিনে শোষণের ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শ্রমিক ও অন্যান্য শোষিতের পক্ষে যতটা স্বভাবধর্মী, সেদিনের ক্রীতদাসদের পক্ষে সে বিদ্রোহ ততটা ছিল না।

এই থেকে কি একথা বলা চলে না যে সংস্কৃতির চাকা আজ ঘুরে গেছে? কৃষিজীবী শ্রমিকের পক্ষে যে বিদ্রোহটা শুধু ধোঁয়ার আকার ধারণ করেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিলো, সে বিদ্রোহই আজ শিল্পজীবী শ্রমিকের হাতে পড়ে ধোঁয়ার মায়া ত্যাগ করে আগুন হয়ে দেখা দিয়েছে। যে বিদ্রোহ সেদিন একটা সামন্তনৃপতিকে গদিচ্যুত করতে পারে নি, সে বিদ্রোহই আজ একটা রাষ্ট্রকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারছে। কেমন করে এ জিনিষ সম্ভব হলো? সমাজের গতিপথে আজ যে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছে সেখানে শ্রমিকের শক্তি দেখি অসামান্য। সমাজ-কাঠামোটাই আজ একদম বদলে গেছে। যে জ্বলন্ত ফার্ণেসের আগুনে আজ পৃথিবীর শিল্পবিপ্লব দেখা দিয়েছে আর পুঁজিবাদীর ধনাগার পরিবর্ধিত হচ্ছে, সেই ফার্ণেসেরই পারিপার্শ্বিকে শ্রমিকের বিদ্রোহ ঘনায়। এটা শিল্প-বিপ্লবেরই ফল। কৃষি প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে কৃষিজীবীরাও প্রকৃতির কাছে মাথা নত করে স্বভাবতই আত্ম-প্রত্যয়হীন হয়ে পড়ে। কৃষিজীবী মানুষ প্রকৃতির আদর্শেই সহনশীল। তাই সেদিনের কৃষি-সমাজের কৃষিশ্রমিকের পক্ষে যে বিদ্রোহ সম্ভব হয় নি, আজ শিল্পের আওতায় শ্রমিকশ্রেণী সে বিদ্রোহই সম্ভব করে তুলেছে। ভারতবর্ষ এখনও কৃষির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীল বলে শ্রমিকজাগরণ এখনো পিছিয়ে আছে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি তাই পরনির্ভরশীল। শিল্প-বিপ্লব ও শ্রমিকজাগরণের পরেও কি একথা বলা যেতে পারে যে প্রাচীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক আবার ফিরে আসবে? সমাজের পক্ষে আবারও কি সেদিনের নপুংস আবেষ্টনের দিকে পশ্চাৎ ফিরে তাকানো সম্ভব? সত্যিই কি সমাজটা একটা নূতনতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না? এর পরও কি বলতে হবে যে ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে? তাই যদি বলি, তবে এও বলতে হবে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রশ্মি-রেখা আমাদের গণ্ডার-দেহের অভ্যন্তরে পৌঁছতে পারে নি।

হব্‌সের (Hobbes) "ষ্টেট অব নেচার" (State of Nature) আজ গবেষণার জিনিষ। তার মূল্য ইতিহাসের অন্তর্গত। জোর যার মুল্লুক তার—এই মতবাদ অরাজক "ষ্টেট অব্ নেচারে"র ক্ষেত্রে সত্যি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিবেকের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আজ ব্যষ্টির অনুশাসনকে সমষ্টির উপর বসাবার প্রয়োজন দেখি নে। কূপমণ্ডুকতা আজ আর বিচারকে আশ্রয় করবে না। উনিশ শতকের আদর্শবাদী ছোট গণ্ডিকে পশ্চাতে রেখে বিংশ শতকের জড়বাদী ঘোড়-দৌড় চলছে। সংস্কৃতির চক্রপথে আজ সাম্যবাদের আবির্ভাব। কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড শক্তি এসে মানুষের পুরনো মরচেপড়া মনকে যেন আঘাতের পর আঘাত দিয়ে ঝকঝকে করে তুললো। মানসলোকের এই পরিবর্তনের ফলে আগের দিনের কাঠামোয় তৈরি সমাজ যেন হালের আমদানী নূতন সমাজটাকে আর ধরে রাখতে পারছে না। মানুষের কলাকৌশলকে অভিনবের দিকে তীব্র এক ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে চলেছে সমাজ, আর সংগে সংগে সমাজ-সৃষ্ট সংস্কৃতি। এর জন্যে দায়ী জড়বাদী বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে এখানেই বিজ্ঞানের সামাজিক সার্থকতা। এই দিক থেকেই বিজ্ঞান সমাজ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

সমাজের সংগে সংস্কৃতির নাড়ির টান। অতএব সমাজের পরিবর্তন হলে সংস্কৃতিটাও দাঁড়িয়ে থাকে না। এ কথাটা নিয়ে ইদানীং কালে বোঝা-পড়া চলছে। সবার মুখে সাম্যবাদের লাল অক্ষর। সূর্যোদয়ের আগের আভাষ। কিন্তু শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণীপুষ্ট আজকের সংস্কৃতি বাঁচবে কিনা এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা সাম্য-বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের নেই। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য নিয়েই সংস্কৃতি। প্রতিভাশালী সাহিত্যিকের সাহিত্য-সৃষ্টি তার নিজের সমাজের পারিপার্শ্বিককে ডিঙিয়ে পরবর্তী শ্রেণীহীন সমাজে তুল্য সার্থকতা নিয়ে বেঁচে থাকবে না মরে যাবে এ নিয়ে তর্কের অন্ত নেই। কেন? সমাজের বর্তমান পুঁজিবাদী আদর্শের বাণী বহন করে আজকের সাহিত্য সংস্কৃতির সাম্যবাদী দরবারে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সাম্যবাদী সমাজের জন্ম হবে পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব থেকে—এর লক্ষ্যে আছে শ্রেণীহীন সাম্য। সুতরাং শ্রেণীর বাণী নিয়ে আজকের

শ্রেণী-সাহিত্য সে অনাগত সমাজে দাঁড়াতে পারে না। একথা সেক্স্পীয়ার সম্বন্ধে যদি সত্যি হয় তবে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও মিথ্যে হওয়ার কারণ নেই। কালিদাস বাংলা দেশে আজও বেঁচে আছেন, কারণ বাংলা দেশ আজও কৃষিগত প্রাণ। যে কালিদাস বেঁচে আছেন সে সেদিনের কৃষিসভ্যতা পুষ্ট কবি কালিদাস, কালজয়ী কালিদাস নয়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী আদর্শে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সাম্যবাদ নিজেকে জাতীয়তাবাদের স্পর্শ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে বিশ্বশক্তির উপাসনায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। সে প্রগতি সম্ভব অগ্রসারী বন্ধনহীন মন নিয়ে। অগ্রসারী মন ফেলে-আসা দিনের ঐশ্বর্যকে ঐতিহাসিক মূল্য দেয়, কিন্তু সেদিনকে ফিরিয়ে আনে না। কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও তাই। মহেন-জো-দড়োর প্রতিভা বিরাট শক্তির পরিচয় দেয়, কিন্তু আমরা মহেন-জো-দড়োর ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে আনতে চাই নে।

"ধীরে বহে ডন্"

(অনুবাদ-উপন্যাস)

[পূর্বানুবৃত্তি]

মিখেল্ শোলকভ্

পঞ্চম অধ্যায়

(১)

—"পিয়োত্রাকে তার ঘোড়াটা আর ঘুড়ীটাকে গাড়ীতে জুড়তে বল !"

উপাসনাকালীন গীর্জ্জার ওয়ার্ডেনের মত গম্ভীর ভাবে প্যান্টালীমন আদেশ ক'রে দ্রুত বাকী ঝোলটুকু শেষ করে ফেললে। সতর্ক দৃষ্টিতে দুনিয়া গ্রীগরের প্রতিটি ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করছিল। কমলালেবু রঙের শালটাতে ইলিনীস্‌নাকে বেশ ভারিক্কি বলে মনে হচ্ছিল। দরদী কণ্ঠে বৃদ্ধকে বললে—'আর একটু ঝোল দিচ্ছি, খেয়ে ফেল! না খেয়ে খেয়ে কি চেহারা হয়েছে দেখেছ ?'

—'খাবার অবসর নেই !'—বৃদ্ধ উত্তর দিল। চৌকাঠের পাশে দাঁড়িয়ে পিয়োত্রা বললে—'গাড়ী প্রস্তুত, আসুন !' তার ভাব দেখে দুনিয়া হেসে, অঞ্চলে মুখ লুকাল।

ঘটক হিসাবে ইলিনীস্‌নার সুচতুর বিধবা মাসতুতো বোন ভ্যাসিলিসা ওদের সঙ্গে যাবে ঠিক হয়েছে। সর্ব্বাগ্রে সে-ই গাড়ীতে বসল গিয়ে। আনন্দের আতিশয্যে হাসি আর তার ধরে না। প্যান্টালীমন তার ভাব দেখে বিরক্ত ভাবে বললে—'অমন দাঁত বার ক'রে আর হেসো না ভ্যাসিলিসা। তুমিই সব পণ্ড ক'রে দেবে! আর যে সুন্দর দাঁত! একটা এদিকে, একটা ওদিকে, [illegible] সবগুলি পাড় মাতাল।'

—'আমি তো আর বর নই !'

—'না-ই বা হ'লে, তবু তুমি অমন ক'রে হাস্‌তে পারো না।'

ভ্যাসিলিসা বিমর্ষ ভাবে বসে রইল। পিয়োত্রা ইতিমধ্যে ফটক খুলেছে। কাঁচা চামড়ার রাশটা ধরে গ্রীগর ড্রাইভারের আসনে উঠে বসল। প্যান্টালীমন এবং ইলিনীস্‌না তরুণ যুগলের মত পশ্চাতের আসনে উপবেশন করলে। ঠোঁট কামড়ে গ্রীগর চাবুক চালাল—হেলে দুলে। ঝাঁকানি খেয়ে ঘড়্‌ঘড় শব্দে রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছুটে চলল। বাঁকা হয়ে গ্রীগর পিয়োত্রার ঘোড়াটার পিঠে বাড়ি মারলে। বাতাসে আঁচড়ান-দাড়ি উস্কখুস্ক হ'য়ে

বাবে এই আশঙ্কায়, এক হাতে দাড়ি ধরে বৃদ্ধ গ্রীগরের দিকে ঝুঁকে বললে—'বুড়ীটাকে চাবকো না।' বাতাসের ঝাপটায় চোখের কোণে জল জমেছে, জ্যাকেটের প্রান্তে মুছে ইলিনীস্না পুত্রের উড়ন্ত নীল শার্টটা লক্ষ্য করতে লাগল। কনাকরা পথ ছেড়ে দিয়ে, উৎসুক নয়নে তাদের পানে চেয়ে রইল। ঘেউ ঘেউ ক'রে কুকুরগুলি এগিয়ে আসে; পরক্ষণেই ঘোড়ার চাটি খেয়ে কেঁউ কেঁউ শব্দ ক'রে পালায়।

মিনিট দশেকের মধ্যেই গ্রীগর গ্রাম ছেড়ে করশুনভের তক্তার-বেড়া দেওয়া প্রাঙ্গণের সম্মুখে এসে হাজির হ'ল। সে গাড়ীতেই রইল। প্যান্টালীমন্ খুঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলল, পশ্চাতে এলো ইলিনীস্না এবং ভ্যাসিলিসা। পথে সংগৃহীত সাহস পাছে গুলিয়ে যায়, এই আশঙ্কায় বৃদ্ধ দ্রুতপদে অগ্রসর হ'তে লাগলো।

একসঙ্গেই প্যান্টালীমন ও ইলিনীস্না রান্নাঘরে ঢুকলো। কিন্তু স্ত্রীর চেয়ে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা বলে, তার পাশে না দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ এক পা এগিয়ে দাঁড়ালো। অতঃপর মাথার টুপী খুলে, ক্রশ ক'রে বৃদ্ধ হেসে জিজ্ঞাসা করলো—'সব ভাল তো!'

—'ধন্যবাদ!'—বেঞ্চি ছেড়ে উঠে গৃহস্বামী প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বললে।

—'আপনার জনাকয়েক অতিথি এসেছে, মীরণ গ্রীগরী ভিচ্!'

—'ভালই তো! মেরিয়া, এঁদের বসবার কিছু দাও!'

ধুলো নেই তবু হাত দিয়ে ঝেড়ে মেরিয়া তিনখানি টুল এগিয়ে দিলো। প্যান্টালীমন একখানি টুলের প্রান্তে বসে, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, ভনিতা না করেই বললে—'আমরা একটা দরকারে এসেছি।' এই সময়ে ইলিনীস্না এবং ভ্যাসিলিসা স্কার্ট টেনে বসে পড়লে।

—'বলুন কি দরকার!' হেসে গৃহস্বামী বললেন।

গ্রীগর ঘরে ঢুকে, এদিক ওদিকে চেয়ে করশুনভদেরে সম্ভাষণ জানালে। গ্রীগরকে দেখে আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে তাঁর একটুকু বিলম্ব হ'ল না। স্ত্রীকে বললেন, 'ঘোড়া কটাকে ভেতরে এনে খেতে দাও।'

দাড়ি চুলকে বৃদ্ধ আবার বললেন—'কথাটা খুব বেশী কিছু নয়। আপনার একটি কুমারী কন্যা আছে, আমাদেরও ছেলে আছে একটি—একটা কোন যোগাযোগ করা যায় নাকি? মেয়ের বিয়ে এখন দেবেন তো? সেই কথাই আমরা জানতে এসেছি। একটা আত্মীয়তা হয়ে যেতো!'

—'কে তা বলতে পারে বলুন!'—টাকে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ মীরণ বললেন—'সত্যি কথা বলতে কি, মেয়ের বিয়ে দেবার কথা আমরা এখনও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। অনেক সব কাজ পড়ে রয়েছে, তা ছাড়া বয়স তো এমন বেশী হয় নি। এই আঠারোয় পড়ল বুঝি। না মেরিয়া?'

—'ঐ রকমই হবে।'

—'তা হোলে বিয়ের ঠিক বয়সই হয়েছে।'—আলোচনায় যোগদান ক'রে ভ্যাসিলিসা বললে—'মেয়েরা বুড়ী তো তাড়াতাড়িতে হয়ে পড়ে।' বারান্দা থেকে চুরি ক'রে যে সম্মার্জনীটা সে জ্যাকেটের তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, তার খোঁচা লেগে ভ্যাসিলিসা টুলের উপর উসখুস্ করতে লাগল। প্রবাদ আছে যে, যে-ঘটক কনের ঝাঁটা চুরি ক'রে নিতে পারে, তার উদ্দেশ্য কখনও ব্যর্থ হয় না।

—'বসন্তের প্রথম দিকে আর একটা সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু মেয়েকে একটা যা' তা' ঘরে তো আর দেওয়া যায় না। ঘরে-বাইরের সব কাজই সে করতে পারে।'—মেরিয়া উত্তর দিলেন।

করশুনভ-পত্নীর অনাবশ্যক কথার মধ্যেই প্যান্টালীমন বলে উঠল, 'ভাল লোক আসলে আপনারা নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দিতেন না।' মাথা চুলকে গৃহস্বামী বললেন—'না, ফিরিয়ে দেবার কোন কথা নয়। যে কোন সময়ই আমরা ওর বিয়ে দিতে পারি।'

প্রস্তাব ফেঁসে যাবার উপক্রম হ'ল। প্যান্টালীমন ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু সুযোগ বুঝে সুচতুর ভ্যাসিলিসা এমনি মোলায়েম ভাষায় করশুনভের গুণকীর্ত্তন করলে যে মুহূর্ত্ত মধ্যে ফাটল জোড়া লাগল।

—'দেখুন। এই রকম একটা কথা যদি ওঠে তা

হ'লে ভেবেচিন্তে সব দিক দেখে তার সমাধান করা দরকার। মেয়ের সুখশান্তি ভেবে করা উচিত। সত্যিই নেতালিয়ার মত কাজকর্মে অমন মেয়ে কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়? কাজে যেন আগুন জ্বলে। আর কাজ কত সুন্দর!' তার পর গ্রীগরকে দেখিয়ে, মীরনের পানে চেয়ে বললে—'তার পর ছেলের দিক যদি দেখেন তো অমন বর পাওয়া বরাতের কথা! ওর দিকে যখন তাকাই, আমারই লোভ হয়, হাঁ দেখতেও অনেকটা আমার কর্তার মতই। তা' ছাড়া ওদের ঘরে কাজকর্মে সবাই পটু। এ অঞ্চলে যে কারও কাছে প্রোকোফিভিচের কথা জিজ্ঞেস করলে, জানতে পারবেন। সবাই লোক ভাল। অমন সৎ লোক,··· নিজের সন্তানের কোন অমঙ্গল হোক্, কোন বাপ-মা কি তাই চায়?'

ভ্যাসিলিসার মৃদু ভর্ৎসনা প্যাণ্টালীমনের কানে মধু বর্ষণ করলে। আনত দৃষ্টিতে, নাকের লোম আঙুল দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে তিনি ভ্যাসিলিসার মুখনিঃসৃত করশুনভের ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষের গুণকীর্ত্তন শুনতে লাগলেন।

—'বালাই, মেয়ের অমঙ্গল চাইব কেন?'—মেরিয়া বললেন।

—'কিন্তু কথা কি জানেন, তেমন বড় হয় নি তো, তাই বিয়ে দিতে চাই না!'—প্রশান্ত হাসি হেসে মীরন উত্তর করলেন।

—'না, তেমন ছোট আর কই!' প্যাণ্টালীমন বললে।

—'আজ হোক, কাল হোক তাকে পরের বাড়ী পাঠাতে হবেই!'—নাটকীয় উচ্ছ্বাস ভরে কেঁদে করশুনভ-পত্নী বললেন।

—'মেয়েটিকে তা হ'লে একবারটি ডাকুন না গ্রীগরী-ভিচ্, দেখি!'

—'নেতালিয়া!'

সশঙ্কিতা একটি মেয়ে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াল এসে। —'আয়, ভেতরে আয়! ও একটু লাজুক!'—কন্যার উৎসাহ সঞ্চার করবার জন্য অশ্রুসজল চোখে হেসে মেরিয়া বললেন।

ক্রেতা যেমন কিনবার আগে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পণ্য ঘুড়ীটাকে পর্য্যবেক্ষণ করে, গ্রীগরও তেমনি ভাবে এই লাজুক মেয়েটিকে লক্ষ্য করতে লাগল। চোখ দুটি কটা হ'লেও শান্তশ্রীমণ্ডিত; নিটোল গালে ঈষৎ গোলাপী আভা; হাত দুখানি শ্রম-মলিন। দৃঢ় সংবদ্ধ উদ্ভিন্ন যৌবন-কিশলয়ের প্রকাশ আজিও সঙ্কুচিত। আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ ক'রে গ্রীগর মনে মনে সিদ্ধান্ত করল,—'চলতে পারে।'

মেয়েটি চোখ তুলে চাইলো গ্রীগরের পানে। তার সেই সরল, অকপট এবং ঈষৎ বিব্রত চাহনি দেখে মনে হয়, সে যেন বলছে—'যেমন দেখছ এই-ই আমার সব। নিজের পছন্দ মত বিচার ক'রে নাও।' গ্রীগরের মুগ্ধ দৃষ্টি বললে—'চমৎকার!' ঠোঁটের প্রান্তে হাসিরেখা দেখা দিল।

হাত নেড়ে নেতালিয়ার বাবা বললেন—'হয়েছে, যাও।'

দরজা বন্ধ ক'রে দিতে গিয়ে নেতালিয়া তার হাসি এবং আগ্রহ না চেপেই চাইল গ্রীগরের পানে।

গৃহিনীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ক'রে করশুনভ বলতে সুরু করলেন, 'শুনুন, প্যাণ্টালীমন প্রোকোফিভিচ, আপনারা এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করে দেখুন, আমারাও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। তার পর ঠিক করা যাবে, এ সম্বন্ধ হবে কি, হবে না—কেমন?

যাবার বেলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্যাণ্টালীমন বলে গেলেন—'পরের রবিবারে আবার আসবো তা হ'লে!' যেন শোনেন নি এই ভাণ ক'রে করশুনভ ইচ্ছে ক'রে জবাব দিলেন না।

* * *

(২)

এই ঘুণে-ধরা দাম্পত্য জীবন সত্ত্বেও স্টীফান্ যেদিন তোমিলিনের কাছ থেকে একসিনিয়ার সম্বন্ধে শুনল, সেই দিন থেকে সে বুঝল—একসিনিয়াকে সে ভালবাসে। নিষ্করুণ এবং তিক্ত হ'লেও তা ভালবাসা। কোট মুড়ি দিয়ে গাড়ীতে শুয়ে সে সারা রাত ভেবেছে, বাড়ী গেলে একসিনিয়া তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা করবে। রুদ্ধরোষ ও যন্ত্রণায় সে ঘুমোতে পারে নি। চোখ বুজে পড়ে কি ক'রে প্রতিশোধ তুলবে বিস্তারিত ভাবে তার খুঁটিনাটি ভেবেছে।

স্টীফান্ বাড়ী ফিরবার পর দিন থেকে এস্টাকভদের বাড়ীতে একটা সন্ত্রস্ত ভীতি নেমে এসেছে; মনে হয় ভূতের বাড়ী বুঝি। একসিনিয়া সন্তর্পণে পা টিপে টিপে হাঁটত, বলত ফিস্‌ফিস্ ক'রে; তবু তার ভয়-চকিত দৃষ্টির মধ্যেও গ্রীগর যে বহ্নি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, তার পুলক জ্যোতির ছিটে তখনও লেগেছিল।

একসিনিয়ার পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়েও স্টীফানের মনে হ'ত, সে ওকে দেখতে পাচ্ছে না। তার কাছে একসিনিয়া এখন অনুভূতি মাত্র। মানসিক যন্ত্রণায় স্টীফান্ ছটফট্ করত। রাত্রিতে মক্ষিকার দল কড়িকাঠে আশ্রয় গ্রহণ করলে একসিনিয়া বিছানা পাতত। মুখ চেপে ধরে স্টীফান্ তাকে প্রাণভরে প্রহার ক'রে যন্ত্রণার লাঘব করত। গ্রীগরের সঙ্গে যা-কিছু হয়েছে খুঁটিনাটি সব তাকে খুলে বলতে হবে! একসিনিয়ার শ্বাসরোধ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ত, যন্ত্রণায় সে বিছানার পর গড়াগড়ি দিত। অবশেষে স্ত্রীর কোমল শরীরে প্রহার ক'রে স্টীফানের হাত যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন চোখে জল এসেছে কিনা দেখবার জন্য মুখের উপর সে হাত বাড়াত। কিন্তু একসিনিয়ার উত্তপ্ত গালে অশ্রুর লেশমাত্র নেই।

—'বলবে কি না?'

—'না।'

—'খুন ক'রে ফেলে দেবো।'

—'তাই ভাল, দোহাই তোমার, দোহাই যীশুর, আমাকে খুন ক'রে ফেল। এ জীবনের চাইতে আমার···'

দাঁত কড়মড় ক'রে স্টীফান্ একসিনিয়ার স্বেদসিক্ত স্তনের চামড়া মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করত। একসিনিয়া তীব্র যন্ত্রণায় 'মাগো' ক'রে আর্তনাদ ক'রে উঠত।

—'খুব লাগছে, না?' শ্লেষ কণ্ঠে স্টীফান্ জিজ্ঞাসা করত।

—'হাঁ।'

—'ভেবেছ কি, আমিও ব্যথা পাই নি?'

এইভাবে অনেকক্ষণ কাটবার পর গভীর রাত্রে স্টীফান্ ঘুমিয়ে পড়ত। ঘুমের মধ্যেও সে দাঁত কড়মড় করে ঘুষি বাগাত। কনুইয়ে ভর ক'রে স্থিরদৃষ্টিতে একসিনিয়া নিদ্রিত স্বামীর মুখের পানে চেয়ে থাকত। তার পর বালিশে মাথা রেখে একান্তে মনে মনে কথা বলত।

গ্রীগরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আজকাল প্রায়ই হয় না। সেদিন ডনের কাছে একবার মাত্র দেখেছিল তাকে। গ্রীগর ষাঁড়গুলিকে জল খাইয়ে উপরে উঠে আসছে, আর একসিনিয়া জল আনতে যাচ্ছিল। তাকে দেখেই একসিনিয়ার ধমনীতে রক্ত টগ্‌বগ্ ক'রে উঠল; মনে হ'ল বালতির ভাঁড়টা হাতে হিম-শীতল হয়ে গেছে।

পরে যখন এই সাক্ষাতের কথা মনে পড়ত, একসিনিয়া বিশ্বাস করতে পারত না, এমনতর সাক্ষাৎ একটা ঘটেছিল। পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা বালতির শব্দ শুনেই গ্রীগর চোখ তুলে চেয়ে দেখে একসিনিয়া। কৌতুকোজ্জ্বল নয়নে তার পানে চেয়ে গ্রীগর ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বোকার মত হেসে উঠল। একসিনিয়া তার মাথা-সোজা একদৃষ্টে ডনের সুনীল তরঙ্গের পানে চেয়ে রইল। গ্রীগর ডাকল—'একসিনিয়া!'

কয়েক পা এগিয়ে একসিনিয়া আনত মস্তকে থমকে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধভাবে পশ্চাতের একটা ষাঁড়কে চাবুক মেরে মুখ না ফিরিয়েই গ্রীগর বলল—'স্টীফান্ রাই কাটতে কখন যাবে?'

—'জোগাড় কচ্ছে দেখে এলাম।'

—'তাকে রওনা করিয়ে দিয়ে আমাদের সূর্য্যমুখী ফুলের ঝোঁপটার কাছে যেও, আমি পরে আসবো।'

একসিনিয়া বালতিতে শব্দ করতে করতে ডনে নামল গিয়ে। সর্পিল ফেনরাশি অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দে ঢেউয়ের মাথার উপর দিয়ে মালার মত নদীর কিনারে বেয়ে উঠছে। সামুদ্রিক চিলগুলি নদীবক্ষে উড়ে বেড়াচ্ছে। চুনোপুঁটি মাছগুলি ইতস্তত জলের উপর লাফিয়ে উঠছে। ও পারে চড়ার ও ধারে প্রাচীন পপলার-শীর্ষ উদ্ধতভাবে আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বালতি ভরতে গিয়ে সহসা থেমে একসিনিয়া হাঁটু জল অবধি নেমে পড়ল। স্নিগ্ধ জলরাশি তার পায়ের চারি ধারে পাক খেয়ে তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে চলে যেতে লাগল। স্টীফানের বাড়ী ফিরবার পর স্নিগ্ধ আমেজে একসিনিয়ার ঠোঁট দুখানি

এই-ই সর্ব্বপ্রথম এক অর্থহীন হাসির উল্লাসে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

পশ্চাতে ঘাড় ফিরিয়ে চাইতেই দেখে গ্রীগর তখনও উপরে উঠছে। দৃঢ় পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলেছে সে। ঢিলা পাজামাটার অন্তরাল থেকে মাঝে মাঝে সাদা উলের মোজা-জোড়া দেখা যায়। একসিনিয়ার দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এ'ল। অন্তরে সে দৃঢ় আলিঙ্গনে গ্রীগরের সবল পদদ্বয় জড়িয়ে সোহাগ করতে লাগল। পেছনে ঘাড়ের কাছে তার ময়লা সার্টটা ছেঁড়া ছিল। বাতাসে সেই ছিন্ন টুক্‌রাটি উড়ে গ্রীগরের বলিষ্ঠ দেহের অংশ অবারিত ক'রে ধরেছে; একসিনিয়া তার প্রিয় দেহের অংশটুকু দৃষ্টি-চুম্বনে অস্থির ক'রে তুলল। একদিন ঐ দেহ ত তারই ছিল। টপ্‌টপ্‌ ক'রে তার সহাস, বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

জোয়ালের আঁকড়ায় লাগিয়ে দেবার জন্য বালতি দুটো মাটিতে রেখে নীচু হ'তেই, বালির উপর গ্রীগরের বুটের দাগ চোখে পড়ল। শঙ্কিতভাবে সে এদিক ওদিকে চেয়ে দেখল। কাছে কেউ নেই। দূরে নদীর কিনারে কয়েকটা ছেলে স্নান করছে মাত্র। আসনপিড়ি হয়ে বসে, দু-হাতে সে পদ চিহ্নটি চেপে ধরল। তার পর জোয়ালটা কাঁধে তুলে আপন মনে হাস্‌তে হাস্‌তে দ্রুতপদে বাড়ী ফিরল।

স্বচ্ছ মুসলিন-অবগুণ্ঠনাবৃত হয়ে সূর্য্য গ্রামদিগন্ত পাড়ি দিচ্ছে। কুঞ্চিত, খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের অন্তরালে আকাশের বুকে একটা স্নিগ্ধ আরক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে, ঘরের চালে, ধূলিমলিন পথচারীহীন রাস্তায়, ফার্ম্মের প্রাঙ্গণের শুক্‌নো ঘাসের উপর এক অসহ্য গুমট্ নেমে এসেছে।

একসিনিয়া সিঁড়ি অবধি গিয়ে দেখে স্টীফান ফসল কাটবার যন্ত্রটার মধ্যে ঘোড়াটা জুড়ে দিচ্ছে। আসনের সাম্‌নে কোটটা রেখে, এক লাফে স্টীফান চড়ে ব'সে একসিনিয়াকে ডেকে বললে—'ফটকটা খুলে দিয়ে যাও।'

আদেশ পালন করতে করতে, শঙ্কিত দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে একসিনিয়া ভরসা করে জিজ্ঞেস্ করল—'কখন ফিরবে আবার?'

—'সন্ধ্যার মুখে। এনিকুশ্‌কার সঙ্গে একত্র হয়ে কাটব ঠিক করেছি। কামারের ওখান থেকে কাজ সেরে, বাড়ী এসে সে মাঠে যাবে, তার সঙ্গে আমার খাবারটা দিয়ে দিও।'

কচ্‌মচ্‌ শব্দে গাড়ীর চাকা রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলল। ঘরে এসে একসিনিয়া খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; অবশেষে মাথায় রুমালখানা বেঁধে নদীর দিকে ছুটল। কিন্তু যদি সে ফিরে আসে? তবে?—বিদ্যুৎ-চমকে কথাটা মাথায় খেলতেই একসিনিয়া থম্‌কে দাঁড়াল। মনে হয় পাশে একটা গর্ত্ত দেখে ভয় পেয়েছে বুঝি। কিন্তু এ দ্বিধা ক্ষণিকের। পিছনে এদিক ওদিক চেয়েই, সে আবার রুদ্ধশ্বাসে ছুটল।

বেড়া, বাগান, রৌদ্রকরোজ্জ্বল সূর্য্যমুখীর দিগন্তস্পর্শী ক্ষেত হরিৎ সাগরের সৃষ্টি করেছে। সবুজ আলুর চারা গাছ। ভুঁইয়ে বসে শ্যামীলদের বউয়েরা আলুর চারার গোড়া খুঁড়ছে। তাদের গোলাপী স্কার্টের সামান্য কিছু দেখা যায়। মেলেকভদের বাগানের কাছে এসে একসিনিয়া কয়েক বার এদিক ওদিক চেয়ে ফটক খুলল। সূর্য্যমুখীর কুঞ্জটার কাছে এসে দু-হাতে সবুজ গাছগুলি ফাঁক ক'রে সে ভুঁইয়ে ভেতরে ঢুকল। ফুলের রেণু মুখ থেকে মুছে একসিনিয়া মাটির ওপরে বসে পড়ল। চারিধার নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। কাণ পেতে সে নিঃসঙ্গ ভ্রমরের মৃদু গুঞ্জন শুনতে লাগল।

আধ-ঘণ্টাখানেক বসে থাকবার পর, [illegible]র সন্দেহ হ'তে লাগল। আসবে কি? চলে যাবে মনস্থ ক'রে সে মাথার রুমালখানা ঠিক করছে, এমনি সময়ে বাগানের ফটক খুলবার আওয়াজ হ'ল। পরক্ষণেই ডাক শুনল—'একসিনিয়া!'

—'এই দিকে এস।'

—'থাক্, তা হ'লে এসেছ তুমি।' ভেতরে ঢুকে গ্রীগর তার পাশে বসে পড়ল। দু'জনের চোখাচোখি হ'ল। গ্রীগরের মৌন-জিজ্ঞাসার উত্তরে একসিনিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে—'আমার এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট নেই গ্রীস্‌কা, আমি গেছি।'

—'কেন, সে কি করে?'

ক্ষোভে জ্যাকেটের কলার খুলে সে গ্রীগরকে দেখালো। তার দৃঢ়-সংবদ্ধ, পরিস্ফীত গোলাপী স্তনদ্বয়ে অসংখ্য কাল-শিটার দাগ।

—'বুঝলে? রোজ সে মারে আমাকে। আমার রক্ত চুষে খাচ্ছে।...আর তুমিও বেশ! কুকুরের মত আমায় কলঙ্কিত ক'রে, এখন সরে পড়েছ!...সবাই তোমরা ঐ একই...'। কম্পিত হস্তে বোতাম আট্‌কে একসিনিয়া তার পানে চাইল। গ্রীগর মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চেয়েছিল।

একটা ঘাসের শীষ দাঁতে চিবোতে চিবোতে ধীরে সে বললে—'তা হলে আমার ঘাড়েই তুমি দোষ চাপাতে চাও, না?'

—'অপরাধী তুমি নও?'

—'একসিনিয়া, অনিচ্ছুক কুকুরীকে কুকুর কখনও উত্যক্ত করে না।'

এই পূর্ব্ব-পরিকল্পিত সরাসরি অপমান একসিনিয়ার বুকে শেলের মত বাজল। দু-হাতে সে চোখ চেপে রইল। ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে গ্রীগর দেখে তার তর্জ্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দিয়ে এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। একটু বিচ্ছিন্ন মলিন রৌদ্রের ফালি সেই স্বচ্ছ অশ্রুকণার উপর টলমল ক'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভিজা দাগটি মুছে দিল। চোখের জল গ্রীগর সইতে পারল না। অন্তরে এক তীব্র অস্বস্তিতে সে উশখুশ করতে লাগল। একটা লাল পিঁপড়ে তার পা-জামার উপর বেয়ে উঠেছিল, আর কিছু না পেয়ে অবশেষে সেইটেকেই পিষে ফেললে। একসিনিয়ার পানে চেয়ে দেখে সে ঠিক্ তেমনি ভাবেই বসে আছে। কিন্তু এবারে তার হাতের পিঠে তিনটি ক্ষীণ অশ্রুধারা।

—'হলো কি? তোমাকে ব্যথা দিয়েছি? একসিনিয়া! দেখ! একসিনিয়া, শোনো, একটা কথা শোনো।'

চোখ থেকে হাত নামিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে একসিনিয়া বললে—'আমি তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছিলাম; আর তুমি?...ভয় নেই, তোমার ঘাড়ে চাপ্‌তে আসি নি।'

তখন সে সত্যিই তাই ভাবছিল; কিন্তু ডনের দিকে ছুটে আসবার বেলা ভেবেছে—'আজকে ছাড়াছাড়ি নেই, আজ কথা আদায় করবই। তাকে ছেড়ে আর কার সঙ্গে আমি থাক্‌বো?' স্টীফানের কথা মনে জাগ্‌তেই জোর ক'রে মাথা ঝেঁকে সেই কণ্টকিত কল্পনা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেছে।

কনুইয়ে ভর ক'রে অবনত মস্তকে গ্রীগর বসেছিল। চুপ ক'রে মুখ থেকে চিবানো গোলাপী পাপড়িটা ফেলে ধীরে সে জিজ্ঞেস করল—'তাহ'লে এইখানেই আমাদের ভালবাসা শেষ?'

গ্রীগরের চোখের পানে চাইবার চেষ্টা ক'রে শঙ্কিত ভাবে একসিনিয়া বললে—'কি ক'রে শেষ হ'ল? কি কোরে?'

গ্রীগর অন্য দিকে চেয়েছিল।

বিশুষ্ক ক্লান্ত মৃত্তিকা থেকে একটা আর্দ্র গন্ধ আসছে। পবন সূর্য্যমুখীর সবুজ-পত্রের মধ্যে প্রলাপ বকে চলে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য একখণ্ড মেঘ সূর্য্যকে আড়াল ক'রে দাঁড়াল। প্রান্তরে, গ্রামে এবং একসিনিয়ার মনেও সেই কৃষ্ণমেঘের ছায়া পড়ল।

মাটির উপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্রীগর বললে—'শোনো, একসিনিয়া! একটা কথা আমি ভাবছি! বাগানের ফটকের কাছে বামাকণ্ঠ ও গাড়ীর শব্দ শোনা গেল,—'ওঠ, টেকো!' ডাকটা একসিনিয়ার এত কাছে মনে হ'ল যে সে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ল। মাথা তুলে গ্রীগর অনুচ্চ স্বরে বললে—'রুমালটা খুলে ফেল, না হ'লে দেখা যায়। ওরা হয় ত আমাদের এখনও দেখে নি।"

একসিনিয়া রুমালখানা খুলে রাখলে। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে কৌতুকরত পবন অমনিই ছুটে এসে, তার সোনালী কেশগুচ্ছের সঙ্গে অশোভন রঙ্গে মেতে উঠল। গাড়ীর শব্দ ক্রমে দূর দূরান্তে মিলিয়ে গেল।

—'দেখ আমি ভাবছি', গ্রীগর আবার বলতে সুরু করল, 'যা হ'য়ে গেছে, তা আর ফেরান যাবে না। দোষারোপ ক'রে কোনও লাভ নেই। কিন্তু যে কোরেই হোক আমাদের বাঁচতে হবে তো।'

একটা ফুলের ডাটা ভেঙে একসিনিয়া অধীর আগ্রহে গ্রীগরের কথা শুনতে লাগল। তার পানে চেয়ে দেখে, চোখে চাঞ্চল্যের অণুমাত্র নেই।

—'আমি ভাবছি, এস আমরা…'

একসিনিয়া চঞ্চল হ'য়ে উঠল। দেহ আর মনে একাগ্র উৎকণ্ঠা নিয়ে সে কথাটির সমাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। ঠোঁট দুখানি ভয় ও অধীর আগ্রহে উৎসুক হ'য়ে উঠল। মুখ শুকিয়ে এল। ভাবলে গ্রীগর হয় ত বলবে—…'এ ব্যাপারটার একটা শেষ ক'রে ফেলি,—তুমি স্টীফানকে ছেড়ে চলে এস।' কিন্তু হায় স্থির অচঞ্চল ভাবে ঠোঁট কামড়ে গ্রীগর বলে বসল—…'এ ব্যাপারটার এইখানেই যবনিকা ফেলে দিই, কি বলো?'

একসিনিয়া চমকিত ভাবে উঠে দাঁড়াল! কোন কথা না বলে, আনত সূর্য্যমুখীর হরিৎ-শীর্ষটা ফাঁক ক'রে সে সোজা ফটকের দিকে এল। সন্ত্রস্ত ভাবে গ্রীগর ডাকল —'একসিনিয়া।' একসিনিয়া বধির! সাড়া দিলে ফটকের কর্কশ শব্দ।

পাছে দেখা যায় এই ভয়ে, টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে গ্রীগর একসিনিয়ার পানে চেয়ে রইল। কিন্তু যাকে দেখছে সে ত একসিনিয়া নয়! তার স্বাভাবিক ব্রীড়া-চঞ্চল দোলায়িত চলনভঙ্গী কোথায়? না, এ আর কেউ। সম্পূর্ণ অপরিচিতা বিদেশিনী হবে হয় ত।

* * *

(ক্রমশঃ)

ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

বণিক-নীতির যুগে পণ্য রপ্তানিই ছিল ধনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—উপনিবেশে মূলধন রপ্তানির কোন প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমোন্নতিতে একচেটিয়া নীতি এবং ফাইনান্স ক্যাপিটালের প্রাধান্য যখন প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনই দেখা দিল মূলধন রপ্তানীর প্রয়োজনীয়তা। লেনিন বলিয়াছেন,

"Under the old type of capitalism when free competition prevailed, the export of goods was the most typical feature. Under modern capitalism in which monopolies prevail, the export of capital has become the typical feature." (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, p. 59).

'পুরাতন ধনতন্ত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলিত ছিল এবং পণ্য-রপ্তানিই ছিল উহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আধুনিক ধনতন্ত্রে একচেটিয়া পদ্ধতির প্রতিপত্তি এবং উহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়াছে মূলধন রপ্তানি।" অবশ্য এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, পণ্য-রপ্তানির পরিবর্ত্তে মূলধন রপ্তানি আরম্ভ হইল। পণ্য-রপ্তানি ও মূলধন-রপ্তানি দুই-ই চলিতে লাগিল একসঙ্গে। এই সময় হইতেই ধনতন্ত্রে দেখা দিল নয়া বণিকনীতি। ইহারই নাম ধনতান্ত্রিক যুগের সাম্রাজ্যবাদ। ইহাকে আমরা নয়া ঔপনিবেশিক নীতিও বলিতে পারি।

ক্রমবর্দ্ধমান একচেটিয়া ব্যবস্থায় ক্রম-হ্রাসমান লাভের হার পুরাতন ধনতান্ত্রিক দেশের পুঁজিপতিদিগকে মূলধন রপ্তানির প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। উপনিবেশের আদিম উৎপাদন-ব্যবস্থা, সস্তা শ্রমশক্তি এবং মূলধনের জন্য আধা-একচেটিয়া সুবিধা হইতে উপনিবেশে মূলধন নিয়োগ করিয়া মালিক দেশের পুঁজিপতিদের দুই দিক দিয়া লাভের হার বর্দ্ধিত হয়। নিজেদের দেশে ঐ মূলধন নিয়োগ করিলে তাঁহারা যে হারে লাভ পাইতেন, উপনিবেশে তাহা অপেক্ষা অধিক হারে লাভ পাইয়া থাকেন। লাভের এই অধিক হারটা নিজেদের দেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে প্রাপ্ত লাভের সঙ্গে মিশিয়া মোট লাভের হারটা বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। তা ছাড়া আরও একটা উপায়ে লাভের হার বর্দ্ধিত হয়। কতক মূলধন উপ-

নিবেশে রপ্তানিহ ওয়ায় মালিক দেশে মূলধনের প্রতিযোগিতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ইহার ফল দেখা যায় মালিক দেশে শ্রমিকের চাহিদা হ্রাসের মধ্যে—বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া 'সংরক্ষিত শিল্পী-শ্রমিক বাহিনী' (industrial reserve army) পরিপুষ্ট হয়। কাজেই মালিক দেশের পুঁজিপতিরা নিজেদের দেশেও অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে শ্রমশক্তি ক্রয় করিতে সমর্থ হন। ইহাতেও তাঁহাদের লাভের হার বর্দ্ধিত হয়। উপনিবেশে কতক মূলধন রপ্তানি করিয়া মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশেও অধিক হারে লাভ অর্জ্জন করেন, আবার নিজেদের দেশেও বাড়তি মূল্য (surplus value) পাইয়া থাকেন অধিক হারে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা কেন যে সাম্রাজ্য-বাদী নীতি পরিত্যাগ করিতে পারে না, এইখানেই তাহার কারণের সন্ধান পাওয়া যায়।

উপনিবেশে নানা ভাবেই মূলধন নিয়োগের সুবিধা থাকে। উপনিবেশগুলি প্রধানতঃ অনুন্নত দেশ—আদিম উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রচলিত। মালিক দেশের মূলধন উপনিবেশের এই আদিম উৎপাদন-ব্যবস্থাকে শোষণ করিবার জন্য নিয়োজিত হয়। সুদের লাভজনক হারে প্রচুর পরিমাণে মূলধন ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে। অনুন্নত দেশে শ্রমশক্তি সস্তা বলিয়া উপনিবেশের সস্তা শ্রমশক্তি শোষণের জন্য মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানও গড়িয়া তোলেন। উপনিবেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাকেই অনুন্নত দেশকে শিল্পায়িত করিয়া তুলিতেছেন বলিয়া মালিক দেশের পুঁজিপতিরা জোর গলায় প্রচার-কার্য্য চালাইয়া থাকেন। কিন্তু মালিক দেশের মূলধনে উপনিবেশগুলি কি ভাবে শিল্পায়িত হইয়া উঠে তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। উপনিবেশের সস্তা শ্রম শোষণ করিবার জন্য মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশে কতকগুলি শিল্প গড়িয়া তোলেন এবং পণ্য চালান দেওয়ার সুবিধার জন্য রেল-ষ্টীমার প্রভৃতি উন্নততর সরবরাহ-ব্যবস্থা গঠন করেন বটে, কিন্তু উপনিবেশে পূর্ণ মাত্রায় শিল্প-বিপ্লব সাধিত হইতে দেন না। উপনিবেশ পূর্ণ মাত্রায় শিল্পায়িত হইয়া উঠিলেই মালিক দেশের শিল্পের প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইবে এবং উপনিবেশে নিয়োজিত মালিক দেশের মূলধন নিজের দেশে নিয়োজিত মূলধনের প্রতিযোগী হইয়া মূলধন-রপ্তানির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করিয়া দিবে। মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশে সেই সকল শিল্পই গড়িয়া তোলেন যেগুলি নিজেদের দেশের শিল্পের প্রতিযোগী নয়, বরং নিজেদের দেশের শিল্পের অনুসঙ্গী। মালিক দেশের শিল্পের প্রতিযোগী নয়, উপনিবেশে এইরূপ শিল্প গড়িয়া তুলিলে মালিক দেশের কলযন্ত্র-নির্ম্মাণ-শিল্পের সুবিধা হয়—মালিক দেশ যে সকল কলযন্ত্র নির্ম্মাণ করে উপনিবেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়া তাহার চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়। উপনিবেশকে পূর্ণমাত্রায় শিল্পায়িত করিয়া না তুলিলেও মালিক দেশের মূলধন উপনিবেশে রপ্তানি হইয়া উহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আংশিক বিপ্লব আনিয়া থাকে সে কথা ঠিক। উপনিবেশে ধনতান্ত্রিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলেই স্বীয় শ্রম বিক্রয় করিতে সমর্থ স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন। এই স্বাধীন শ্রমিক সৃষ্টি করিতে যাইয়া উপনিবেশের প্রাচীন অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। ফলে উপনিবেশেও মালিক দেশের অনুরূপ শ্রেণীবিভাগ গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মালিক দেশের মূলধন উপনিবেশে যে শুধু স্বীয় শ্রমশক্তি বিক্রেতা শ্রমিক-শ্রেণীই গড়িয়া তোলে তাহা নয়, নূতন বুর্জ্জোয়া শ্রেণীও গড়িয়া তোলে। উপনিবেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতে ইহার ফল দেখা দিতে বিলম্ব হয় না। উপনিবেশের এই নূতন-গড়া বুর্জ্জোয়াগণকে নিজেদের মূলধনে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িতে যাইয়া মালিক দেশের মূলধনের অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। কোন শিশু-শিল্পই রক্ষণমূলক ব্যবস্থা ছাড়া টিকিয়া থাকিতে পারে না। শুধু রক্ষণমূলক সুযোগ-সুবিধার অভাবের জন্যই উপনিবেশের বুর্জ্জোয়াদের শিল্প-প্রচেষ্টা অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়া যায়। সুবিধাপ্রাপ্ত বৈদেশিক মূলধনের প্রতিযোগিতা তাঁহাদের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে—তাহারা বৈদেশিক পুঁজির অসম প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত হইয়া রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশকে শিল্পায়িত করিতে চান। উপনিবেশগুলিতে এই ভাবে ক্রমেই জাতীয়

আন্দোলন প্রসার লাভ করিতে থাকে, স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী দেখা দেয়।

বণিক-নীতির যুগে উপনিবেশে শুধু পণ্যই রপ্তানি করা হইত। কাজেই এই রপ্তানি-বাণিজ্যটা যাহাতে মালিক দেশেরই অনুকূল হয় তাহারই জন্য বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের নানা রকম বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মূলধন রপ্তানি করিলে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণটা গৌণ ব্যাপার হইয়া পড়ে, উহার প্রয়োজনীয়তা আর তেমন থাকে না, থাকিলেও খুব সামান্যই থাকে। উপনিবেশে মূলধন নিয়োগ করিলে বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণের তেমন প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু উপনিবেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আধিপত্য রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা হয় খুব বেশী। এই আধিপত্য রক্ষার জন্য এবং উপনিবেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষেধকরূপে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থাকে সমর্থন করা ও প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। ঔপনিবেশিক আধিপত্য অতি সামান্য পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কাও কোন মালিকদেশ সহ্য করিতে পারে না। মালিকদেশের পুঁজিপতিদের মধ্যে স্বার্থের সজ্ঘাত যতই থাকুক, ঔপনিবেশিক আধিপত্য রক্ষায় তাঁহারা সকলেই একজোট হইয়া থাকেন। এমন কি, মালিকদেশের শ্রমিকরা পর্য্যন্ত তাহাদের স্বশ্রেণী ঔপনিবেশিক শ্রমিকদের স্বার্থের কথা বিস্মৃত হইয়া ঔপনিবেশিক প্রাধান্য রক্ষার জন্য নিজেদের দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীকেই সমর্থন করিয়া থাকে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা খুবই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইবে। মালিকদেশের শ্রমিকরা তাঁহাদের বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীকে সমর্থন করিবে কেন? বিশেষতঃ উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের ফলে তাঁহাদের নিজেদেরই যখন মজুরি হ্রাসের সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন মালিকদেশে পুঁজি এবং শ্রমের বিরোধটা প্রবল হওয়াই তো স্বাভাবিক! কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উহা সম্ভাবনা মাত্রই রহিয়াছে, উহাকে ব্যাহত করিবার মত কারণের অভাব এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

মূলধন রপ্তানি দ্বারা মালিকদেশের পুঁজিপতিদের লাভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকরাও কতকটা সুবিধা পাইয়া থাকে বইকি! প্রথমতঃ, অনুন্নত দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আসে সস্তা। দ্বিতীয়তঃ অনুন্নত দেশে রপ্তানি-পণ্যের নূতন বাজার সৃষ্টি হওয়ায় কতগুলি উৎপাদন-শিল্পেও যথেষ্ট লাভ হইয়া থাকে। ফলে ঐ সকল শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও কতকটা সুবিধা হয়। শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নও কতকটা সাফল্যের সহিত মজুরি হ্রাস করার বিরুদ্ধে বাধা দিতে পারে। মালিক দেশের কতক মূলধন যদি উপনিবেশে খাটাইবার সুযোগ পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থা মোটেই লোভনীয় হইত না। গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মানীর শ্রমিকদের ঠিক এই অবস্থাই হইয়াছিল। উপনিবেশ শোষণ যদি বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে মালিকদেশে 'সংরক্ষিত শিল্পী শ্রমিকে'র অর্থাৎ বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে, যে মূলধন উপনিবেশে নিয়োগ করিতে পারা যাইত তাহাকে বেকার বসিয়া থাকিতে হয় আর খাটাইতে গেলেও খাটাইবার ক্ষেত্র পাওয়া যায় খুব সঙ্কীর্ণ; কারণ অন্য মূলধন আগেই প্রায় সব স্থান দখল করিয়া রাখিয়াছে। উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের পথ রুদ্ধ হইলে ঐ মূলধনের নিজের দেশের শ্রমিকদের শোষণ এবং ছোট-খাটো উৎপাদক ও নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর ঘাড় ভাঙ্গিয়া লাভ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। ফ্যাসিষ্ট মতবাদের উৎপত্তির কারণের সন্ধান এইখানেই পাওয়া যায়। বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে শ্রমিকদিগকে শোষণ করিতে পারে তাহার জন্যই হিটলারের অভ্যুদয়ের পর জার্ম্মানীর শ্রমিক সঙ্ঘগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পর চলিল জার্ম্মান জাতির মাথা গুঁজিবার স্থান সংগ্রহের নামে রাজ্য বিস্তারের জন্য সামরিক আয়োজন। জার্ম্মানী কি সত্যই বাড়্‌তি লোক সংখ্যার বাসের জন্য রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিল? ইটালী ও জাপানের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টার মধ্যে কি দেশের বাড়্‌তি লোকের জন্য স্থান সংগ্রহের আকাঙ্ক্ষাই দেখিতে পাওয়া যায়? জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপান আরও একটা ধ্বনি তুলিয়াছিল —প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব? এই ধ্বনির মধ্যে কি তাহাদের সত্যিকার উদ্দেশ্যই পরিস্ফুট দেখা যায়? শান্তির সময় কোন মালিকদেশই তাহার উপনিবেশ-

গুলিতে উৎপন্ন কাঁচামাল অন্যান্য দেশের নিকট বিক্রয় করিবার পথে কখনও কোন বাধা সৃষ্টি করে না তো! উপনিবেশে উৎপন্ন কাঁচামাল রপ্তানির উপর রপ্তানি-শুল্ক কখনও ধার্য্য করা হয় না, ধার্য্য করা হয় অন্যান্য দেশ হইতে উপনিবেশে আমদানি দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক। মালিক দেশ উপনিবেশে উৎপন্ন কাঁচামাল শুধু নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখিতে কখনও চায় না। মালিকদেশ যাহা চায় তাহা উপনিবেশে পণ্য বিক্রয়ের এবং মূলধন খাটাইবার বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অধিকার রক্ষা করা। সুতরাং প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবের যুক্তিটা মোটেই টিকিল না। তার পর বাড়্তি জন-সংখ্যার কথা। বাড়্তি জন-সংখ্যার জন্যই যদি উপনিবেশ প্রয়োজন, তাহা হইলে যে-সকল অঞ্চল বাসোপযোগী এবং জনসংখ্যা কম সেইগুলির দিকেই কি দৃষ্টি পড়িত না? ১৯১৪ সালে জার্ম্মানীর আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশের আয়তন ছিল ৯ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ছিল মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ। তন্মধ্যে শ্বেতকায়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ২০ হাজার।* বস্তুতঃ মূলধনের অনুপাতে বাড়্তি লোক অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, শ্রমশক্তির অনুপাতে মূলধনের বাড়্তিই উপনিবেশের জন্য অত্যুগ্র ক্ষুধা জাগ্রত করিয়া থাকে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে একমাত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য মালিক-দেশের শ্রেণী সম্পর্কের মধ্যে একটা নূতনত্ব আনয়ন করিয়া থাকে। উপনিবেশের শোষণ হইতে যে-লাভ হয় তাহার অতি সামান্য অংশ হইলেও মালিক দেশের শ্রমিকদের ভাগে কিছু পড়ে—সকল শ্রমিকের ভাগে না পড়িলেও তাহাদের কতকের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকের তুলনায় তাহারা খায়, পরে এবং থাকে ভাল—এক কথায় তাহারা শ্রমিক অভিজাত (aristocracy of labour) বনিয়া যায়। মালিক দেশের শ্রমিকদের এই আভিজাত্যের জন্যই পুঁজিপতিদের স্বার্থের সহিত তাহারা নিজেদের স্বার্থ কতকটা অভিন্ন বলিয়া মনে না করিয়া পারে না। অন্ততঃ তাহাদের এই আভিজাত্যটুকু বাঁচাইয়া রাখিতে হইলেও ঔপনিবেশিক আধিপত্য রক্ষা করা প্রয়োজন। মালিক দেশের নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর অবস্থাও শ্রমিকদের মতই। উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের ফলে যে শিল্প-বাণিজ্য গড়িয়া উঠে শুধু তাহাতেই নয়, উপনিবেশের শাসন পরিচালন ব্যাপারেও ছোট, বড়, মাঝারি অনেক রকম চাকুরী হইতে তাঁহাদের জীবিকার সংস্থান হইয়া থাকে। এই জন্য উপনিবেশগুলিতে রাষ্ট্র-নৈতিক প্রাধান্য রক্ষায় মালিক দেশের পুঁজিপতি, নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী এবং শ্রমিকদের মধ্যে কোন মতভেদ সৃষ্টি হইতে দেখা যায় না।

উপনিবেশে মূলধন রপ্তানি করিবার জন্য বণিকনীতি-সুলভ বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করিবার। এই রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য হইতে উপনিবেশবাসীদের শিক্ষা, সভ্যতা এবং রুচিতে এমন একটা পরিবর্ত্তন আসে যাহার ফলে উপনিবেশে পণ্য-রপ্তানির ব্যাপারেও বণিক-নীতি অনেকাংশে নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। অনুন্নত দেশে অন্য কোন উন্নত দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, রীতি এবং রুচির প্রচলন ও প্রসারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। মালিক দেশ তাহার উপনিবেশ-গুলিতে এই রকম শিক্ষা, সভ্যতা, রীতি ও রুচির প্রচলন করে যেগুলি মালিক দেশে উৎপন্ন পণ্য কাটতি হওয়ার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। অর্থাৎ যে-মালিক দেশ যে-শ্রেণীর বা যে জাতীয় পণ্য তৈয়ার করে না, উপনি-বেশের মধ্যে ঐ জাতীয় পণ্যের জন্য স্পৃহা বা রুচি গড়িয়া উঠিতে দিতে চায় না। বৃটিশ উপনিবেশগুলি বৃটিশ ধরণ-ধারণ, বৃটিশ পোষক-পরিচ্ছদ, বৃটিশ কলকব্জা, বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার, বৃটিশ বিশেষজ্ঞই বেশী পছন্দ করে। ফরাসী বা মার্কিন উপনিবেশগুলির অবস্থা আবার অন্য রকমের। উপনিবেশে এইরূপ পছন্দ ও রুচি সৃষ্টির ফলে মালিক-দেশের পুঁজিপতিরা তাঁহাদের দেশে তৈয়ারী পণ্য উপনি-বেশে বেশী দামে বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। রুচি বা পছন্দের পরিবর্ত্তন না হইলে, নির্জ্জলা অবাধ প্রতিযোগি-তার সম্মুখে এরূপ হইত না তাহা নিঃসন্দেহেই অনুমান করা যায়। ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান যুগের বাণিজ্য চুক্তি-

* Woolf, Economic Imperialism, p. 54.

গুলিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই চুক্তিগুলি আসলে নূতন ছাঁচে ঢালা পুরাতন বণিকনীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স আসলে সাম্রাজ্যের চারিদিকে শুল্ক-প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে একটা অর্থনৈতিক 'ইউনিটে' পরিণত করিবার চেষ্টা মাত্র। কবডেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত ফ্রান্সের সহিত যে-বাণিজ্য চুক্তিগুলিকে অবাধ বাণিজ্যযুগের প্রথম প্রভাত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, বিখ্যাত রাষ্ট্র-নীতিবিদ্ গ্লাডষ্টোনের যে-সকল আইনকে অবাধ বাণিজ্যের বিজয়-স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল সেগুলি প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে খুব বেশী দিন যায় নাই যোসেফ চেম্বারলেন 'কলোনিয়াল প্রফারেন্সে'র ধ্বনি তুলিয়া সাম্রাজ্যিকভাবে চিন্তা করিবার জন্য প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যিক ভাবে চিন্তা করাই পূর্ণবিকশিত ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্সের মধ্যে মুদ্রানীতির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তুতঃ রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য মুদ্রানীতি একটি প্রধান সহায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৩-৪৪ সনের বাজেট আলোচনার সময় যুদ্ধের পরে ভারতকে শুধু ইংলণ্ড হইতে ক্রয় করিতে হইবে কি না স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতগবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান বলিয়াছিলেন যে, ভারতের ষ্টার্লিং তহবিলের উদ্দেশ্যকে সীমাবদ্ধ করিবার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই, কিন্তু তিনি এ কথাও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই তহবিল সঞ্চিত ষ্টার্লিং-এর এবং ডলার-অঞ্চল এবং ষ্টার্লিং-অঞ্চল সম্পূর্ণ আলাদা। বস্তুতঃ ষ্টার্লিং-অঞ্চল ডলার-অঞ্চল প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের জন্য সংরক্ষিত বাজার ছাড়া আর কিছুই নয়। মালিক দেশের প্রাইভেট বাজার হিসাবে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে উপনিবেশগুলির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই রকম প্রাইভেট বাজার সংখ্যায় যাহার যত বেশী এবং বিস্তৃতিতে যত বড় হইবে তাহারই লাভের হার তত বেশী হইবে। পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যে তাহার প্রাধান্যও হইবে তাহারই অনুপাতে। কারণ সাধারণ বাড়্‌তি মূল্য অপেক্ষা একচেটিয়া লাভটা স্বতন্ত্র রকমের। কার্ল মার্কস ইহাকে অতিলাভ (super-profit) নামে অভিহিত করিয়াছেন। পুঁজিপতিদের লাভের হার হ্রাস হওয়া যদি প্রতিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে উপনিবেশ না হইলে চলে না এবং উপনিবেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যও রক্ষা করিতে হইবে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতিলাভের (super-profit) একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা আছে। প্রত্যেক পুঁজিপতিই যতভাবে পারেন তাঁহার লাভ বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি যে পণ্য উৎপাদনে মূলধন নিয়োগ করেন সে তো শুধু লাভ করিবার জন্যই! কাজেই যত রকমে লাভ বৃদ্ধি করিতে পারা যায় সে-চেষ্টা তাঁহার না করিলে চলিবে কেন! কি কি উপায়ে লাভ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, পুঁজিপতিদের কাছে তাহা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। লাভ বাড়াইবার একটা সোজা উপায় আছে—বেশী সংখ্যায় শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা। মূলধনের ইহা শুধু পরিমাণ-গত বৃদ্ধিমাত্র—মূলধনের সংগঠনে (composition-এ) কোন পরিবর্ত্তন উহা দ্বারা সাধিত হয় না। এই উপায়ে বেশী মূলধন নিয়োগ করিয়া বেশী পরিমাণ লাভ করা যায় সত্য, কিন্তু লাভের হার বর্দ্ধিত হয় না। মূলধনের পরিমাণের সহিত লাভের যে অনুপাত তাহারই নাম লাভের হার। প্রচলিত বাজার-দরে অথবা উহা অপেক্ষা সামান্য কম দরে বিক্রয় করিয়াও যদি বেশী লাভ পাওয়া যায়, তবে হইলেই লাভের হার বর্দ্ধিত হয়। ইহা সম্ভব হয় শুধু উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিয়াই। কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত মূলধনের যদি শুধু পরিমাণগত বৃদ্ধিই হয়, তাহা হইলে বেশী পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করা সত্ত্বেও উৎপাদন-ব্যয় একটুকুও কমিবে না। সুতরাং ঐ শিল্পের আর একটি প্রতিষ্ঠানে একজন অল্প মূলধন-নিয়োগকারীর তুলনায় বেশী মূলধন নিয়োগকারীর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বেশী বাড়ে এবং নিয়োজিত মূলধনের বেশী পরিমাণ অনুসারে লাভের পরিমাণ যে বেশী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু হয় না শুধু লাভের হার বর্দ্ধিত। কিন্তু প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করিতে হইলে পুঁজিপতিকে প্রচলিত বাজার দরে

এমন কি উহা অপেক্ষা সামান্য কম দরে বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করা চাই। নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া লাভের হার বর্দ্ধিত করাই উৎপাদনের ব্যয় হ্রাসের উপায়। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত করিয়াই শুধু উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করা যায়।

শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হইলে অপেক্ষাকৃত কম সময়েই বেশী পণ্য উৎপন্ন করা যায়। উৎপাদন-কৌশলের উন্নতি (technical improvement) দ্বারা অর্থাৎ কলযন্ত্রের ব্যবহার দ্বারা শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কল-যন্ত্রের নিয়োগ মূলধন-সংগঠনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে অর্থাৎ নিয়োজিত মোট মূলধনের বেশীর ভাগ কলযন্ত্র ও কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয় এবং শ্রমিকের মজুরির জন্য নিয়োজিত হয় কম অংশ। ইহারই নাম higher organic composition of capital—মূলধনের উন্নততর সংগঠন। কোনও একটা বিশেষ শিল্পে কোনও একজন পুঁজিপতি যখন শ্রমসাশ্রয়কারী উন্নততর নূতন কলযন্ত্র প্রথম ব্যবহার করেন তখন ঐ কলযন্ত্রের ব্যবহারটা থাকে তাঁহার একচেটিয়া—ঐ শিল্পের অন্যান্য পুঁজিপতিরা ঐ কলযন্ত্র ব্যবহার করিবার সুযোগ পান না। এই রকম অবস্থায় শ্রম-সাশ্রয়কারী উন্নততর নূতন কলযন্ত্রের ব্যবহারকারী পুঁজিপতির শিল্প-প্রতিষ্ঠানে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, সেগুলির উৎপাদন-ব্যয় হয় কম, কিন্তু তিনি বাজার দরে এমন কি বাজার দর অপেক্ষাও সামান্য কম দরে বিক্রয় করিয়াও ঐ শিল্পে নিয়োজিত অন্যান্য পুঁজিপতি অপেক্ষা বেশী লাভ করিয়া থাকেন। এই বেশী লাভটার যে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। এই যে অতিরিক্ত লাভটা তাহার নাম super-profit বা অতিলাভ। কোন একটি নূতন আবিষ্কার সমস্ত শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে কোনও একজন শিল্পোদ্যোগী ঐ নূতন আবিষ্কারের দ্বারা যে বেশী লাভ অর্জ্জন করেন তাহাই অতিলাভ। কিন্তু এই অতিলাভের সুবিধাটা বেশী দিন তাঁহার থাকে না। নূতন আবিষ্কারের সুযোগে একজন অতিলাভ করিতে থাকিবেন, আর তাঁহারা চুপ করিয়া তাহাই দেখিবেন, এমন পাত্র শিল্পোদ্যোগীরা নন। অন্যান্য পুঁজিপতিরাও নূতন আবিষ্কারকে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করেন—ঐ শিল্পের সমস্ত প্রতিষ্ঠানেই উহার প্রচলন হইয়া পড়ে! সুতরাং বেশী লাভ করিবার সুযোগ আর বেশী দিন উক্ত পুঁজিপতির থাকে না।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই উৎপাদনের প্রেরণা যোগাইয়া থাকে। কাজেই প্রতিযোগিতার ফেরে পড়িয়া লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, লাভের হারকেও তাঁহারা বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক পুঁজিপতিই চান তাঁহার উৎপাদিত পণ্যকে সস্তা করিয়া নিজের লাভের হার বর্দ্ধিত করিতে। প্রত্যেকেই শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বর্দ্ধিত করিতে মনোযোগী হন। শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি বর্দ্ধিত করার অর্থ হইল মূলধনের সংগঠনকে উন্নততর করা—শ্রমিকের মজুরির জন্য নিয়োজিত মূলধনের (variable capital) তুলনায় কলযন্ত্র কাঁচামাল ইত্যাদিতে নিয়োজিত মূলধনকে (constant capital) বর্দ্ধিত করা। কিন্তু পরিণামে উৎপাদন-কৌশলের ক্রমোন্নতির ফল দেখা দেয় লাভের হার হ্রাস হওয়ার প্রবণতার মধ্যে। লাভের হার হ্রাস হওয়ার অর্থ ইহা নয় যে, মোট লাভের পরিমাণ কমিয়া যায়। মোট লাভের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াও লাভের হার হ্রাস পাইতে পারে। পণ্যের দাম অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে বাঁধিয়া রাখিয়া লাভ বৃদ্ধি করিবার এবং লাভের হার হ্রাস হওয়া নিবারণ করিবার জন্য পুঁজিপতিরা কার্টেল, সিণ্ডেকেট এবং ট্রাষ্ট প্রভৃতি এক-চেটিয়া ব্যবস্থা গড়িয়া তুলেন। কোন পণ্যের দাম যাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে না নামে তাহার জন্য ঐ পণ্যের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ যখন চুক্তিবদ্ধ হন, তখন তাহাকে বলা হয় কার্টেল। এইরূপ চুক্তিতে যে-সকল শিল্প-পতি আবদ্ধ হন, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে পরস্পরের ক্ষতি নিবারণের জন্য তাহাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে নামান না। পণ্যের দাম হ্রাস করার ব্যাপার ছাড়া, কাঁচা মাল ক্রয়, পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয় বিষয়ে কার্টেলের অন্তর্গত প্রত্যেক পুঁজিপতিই স্বাধীন। সিণ্ডিকেটের অন্তর্গত পুঁজিপতিরা নিজ নিজ ফ্যাক্টরীতে স্বাধীনভাবেই পণ্য উৎপাদন

করেন বটে, কিন্তু কি পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা হইবে তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন সিণ্ডিকেট। পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থাও সিণ্ডিকেটের মারফতেই হয়, এমন কি অনেক সময় সিণ্ডিকেটের মারফতেই কাঁচামাল পর্য্যন্ত ক্রয় করা হইয়া থাকে। ট্রাষ্টের অন্তর্গত ফ্যাক্টরীগুলির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলেও উহাদের পরিচালন-কার্য্য একই সাধারণ পরিচালক সমিতি দ্বারা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর মালিকরা ট্রাষ্টের অংশীদারে পর্য্যবসিত হন।

কার্টেল, সিণ্ডিকেট, ট্রাষ্ট প্রভৃতি দ্বারা লাভের হার হ্রাস হওয়া নিবারিত হয় বটে, কিন্তু এই সকল একচেটিয়া ব্যবস্থার ফলে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর হইয়া উঠে। একচেটিয়া লাভের ফলে মূলধনের যে বৃদ্ধি হয় তাহা খাটাইবার স্থলাভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া ব্যবস্থার ফলে পণ্যের দাম কিছু স্ফীত হয় এবং পরিণামে নিজেদের দেশে উহার কাটতিও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং মূলধন এবং পণ্য দুই-ই দেশের বাহিরে রপ্তানি করিবার প্রয়োজনীয়তা ধনতান্ত্রিক দেশের শিল্পপতিরা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু দেশের বাহিরের বাজারগুলিতে পণ্য রপ্তানি করিবার অসুবিধা আছে—শুল্কপ্রাচীর ডিঙ্গাইয়া পণ্য রপ্তানি করিতে গেলে লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাইবার সম্ভাবনা। মূলধনও সকল দেশে রপ্তানি, করা সম্ভব নয়। উপনিবেশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এইখানেই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে অনেকগুলি যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, উপনিবেশ সংগ্রহ-ই তাহার মূল কারণ। ওয়াটার্লুর যুদ্ধ এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিল বটে, কিন্তু বৃটেনকে ঔপনিবেশিক শক্তির অদ্বিতীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেল। কিছুদিন পরেই ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি বুঝিতে পারিল, বৃটেনের শক্তির মূল তাহার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। অতঃপর আফ্রিকার ভূভাগকে ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে কিরূপ কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকাদের নিকট তাহা অজ্ঞাত নয়।

মূলধন নিয়োগের জন্য মালিক দেশের পুঁজিপতিরা উপনিবেশে আধা একচেটিয়া সুবিধা পাইয়া থাকেন। তারপর উপনিবেশে শ্রমিক পাওয়া যায় যেমন সস্তা তেমনি প্রচুর। উপনিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যেমন প্রাচুর্য্য আছে, দামেও তেমনি সস্তা। কাজেই উপনিবেশে মূলধনের সংগঠনটা (composition) হয় নিম্নস্তরের (lower organic composition of capital)। উন্নত ধরণের কলযন্ত্র ইত্যাদি সর্ব্বপ্রথম ব্যবহার করিবার সুযোগে একজন পুঁজিপতির যে বাড়্‌তি লাভটা হয়, উপনিবেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে অনুরূপ বাড়্‌তি লাভ পাওয়া যায়। উপনিবেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে প্রাপ্ত এই বাড়্‌তি লাভটা মালিক দেশে নিয়োজিত মূলধন হইতে প্রাপ্ত লাভের সহিত মিশিয়া মালিকদেশে লাভের হার হ্রাস হওয়া নিবারণ তো করেই অধিকন্তু লাভের হার বৰ্দ্ধিত করিয়া দেয়। উপনিবেশে মূলধন খাটাইতে হইলে উপনিবেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রাধান্য রক্ষা করিতে হয় বলিয়া মালিক দেশে তৈয়ারী পণ্য উপনিবেশে রপ্তানি করিবার কিরূপ সুবিধা হয় তাহা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। উপনিবেশের সহিত মালিক-দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কটা কিরূপ তাহা এই অতিলাভ দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি। সেই দেশকেই আমরা অন্য দেশের উপনিবেশ বলিতে পারি যে-দেশে উক্ত অন্য দেশের অনুকূলে অতিলাভ সৃষ্ট হয়। এই অতিলাভ একচেটিয়া পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য দ্বারাও হইতে পারে অথবা অধিকতর লাভের হারে মূলধন খাটাইয়াও হইতে পারে। অবাধ বাণিজ্য দ্বারা কোন দুইটি দেশের মধ্যে যে-অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ঔপনিবেশিক সম্পর্কটা তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মরিস ডোব (Maurice Dobb) তাঁহার Political Economy and Capitalism গ্রন্থে উপনিবেশের অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন :

"....... the most convenient and satisfactory *economic definition of Colony* and *Colonialism* seems to consist in a relation between two countries or areas involving the creation of super-profit for the benefit of one of them, *either* by means of some form of monopolistically regulated trade between them *or* by an investment of capital by one of them in other at a higher rate of profit than that prevailing in the former. (P. 228).

উপনিবেশ এবং ঔপনিবেশিকতার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং সন্তোষজনক সংজ্ঞা হইতেছে এই যে, উহা দুইটি দেশ বা অঞ্চলের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক যে, কোন রকম একচেটিয়া নীতিতে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য দ্বারা অথবা লাভের অধিকতর হারে নিয়োজিত মূলধন দ্বারা উক্ত দেশ দুইটির একটিতে অপর দেশের অনুকূলে অতিলাভ সৃষ্ট হইয়া থাকে।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

চতুর্থী

(গল্প)

শ্রীসুরুচিবালা সেনগুপ্তা
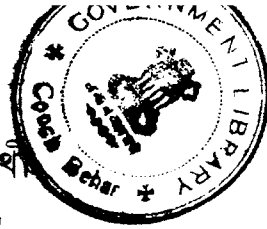
(১)

কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রি; বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র গৃহস্থের নাতি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে অতি ক্ষুদ্র একখানা চালা ঘরে স্বর্ণলতার চতুর্থ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইল। কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে জানিয়া প্রসূতি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কাছে বসিয়া গ্রাম্য ধাত্রী রাসির মা নাড়ি কাটিয়া শিশুকে স্নান করাইতেছিল, দীর্ঘশ্বাস তাহার কানে পৌঁছিল। সাবধানে শিশুকে তাহার মায়ের পাশে শোয়াইয়া দিয়া সে বলিল, 'ছেলে-মেয়ে সবই সমান মা, সবই বিধাতার দান। একে কাছে টেনে নাও মা, দেখ, কি খাসা মেয়ে হয়েছে।'

বাড়ীর কেহই জাগিয়া ছিল না, বাড়ীর কর্ত্তা সমস্ত দিন খাটুনীর পর গৃহে আসিয়া মায়ের আদেশে রাসির মাকে ডাকিয়া দিয়া কর্ত্তব্য সমাপনান্তে আহারাদি করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। শ্বশ্রূমাতা বংশের প্রদীপের আগমন আশায় কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়াছেন, শেষে আর জাগিয়া থাকিতে না পারিয়া বিছানায় গড়াইয়া পড়িয়াছেন। স্বর্ণলতার চতুর্থ কন্যাকে স্বাগতোক্তি জানাইবার জন্য সারা গ্রামে আর কেহ জাগিয়া ছিল না, শুধু সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অসংখ্য ঝিল্লী নহবৎ বাজাইতেছিল।

শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শাশুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি কমানো হারিকেনের পলিতাটি বাড়াইয়া দিয়া ধড়্-মড় করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। যথাসাধ্য স্পর্শ বাঁচাইয়া আঁতুর ঘরের সম্মুখে আসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন' 'কি হোলো রাসির মা, গলা যেন মেয়ের বলেই মনে হচ্ছে না?'

রাসির মা গ্রামের লোক, শাশুড়ীকে ভালো করিয়াই জানে, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, 'তিন বার উলু দাও মা, নাড়ি কাটা হ'য়ে গেছে।'

গ্রাম্য প্রথামত পুত্র সন্তান জন্মিলে সাত বার ও কন্যা সন্তান জন্মিলে তিন বার হুলুধ্বনি দেওয়া হইয়া থাকে।

শাশুড়ী ছিট্‌কাইয়া একেবারে বারান্দায় উঠিয়া পড়িলেন। 'বয়ে গেছে আমার উলু দিতে, যার মেয়ে সে-ই কেন দিক্ না উলু। মা গো মা, এই এক পাল মেয়ে আমার শিবুকে পথে বসালে গো!' বলিতে বলিতেই তিনি গৃহের দরজা দুম্ করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

শিশুর নবনী-কোমল দেহ বুকের উপর তুলিয়া লইতেই স্বর্ণলতার চোখের জল ঝরিয়া পড়িল।

২

স্বর্ণলতা শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পিতামাতা উভয়েই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পিতার অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না হইলেও পুত্র-কন্যার শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অকুণ্ঠ ব্যয় ছিল। কিশোর বয়সে স্বর্ণলতা সহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া ও সঙ্গীত শিক্ষালয়ে গিয়া সঙ্গীত শিখিত। সেই বয়সে সে একটু আধটু কবিতাও লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মানকুমারী, অম্বুজা সুন্দরী প্রভৃতি মহিলা কবির কবিতা পড়িয়া তাহার মনে কত উচ্চাকাঙ্ক্ষাই না সঞ্চিত হইয়াছিল। কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাহাদের জীবন দুর্ভাগ্যের বেড়াজালে জড়াইয়া পড়িল। বিধবা মাতা পুত্র-কন্যাগণসহ মধ্যবিত্ত ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

স্বর্ণলতা তখন কিশোরী, কিন্তু সকলের পরামর্শে মাতা কন্যাকে পাত্রস্থা করিতে দেরী করিলেন না। জামাতা শিবনাথ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য লেখা-পড়া করিয়া জমীদার-কাছারীতে কাজ করেন, বাড়ীতে বাস্তুভিটায়

টিনের ঘর আছে, কিছু জোত-জমিও আছে, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব নাই। শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া গ্রাম্য প্রথায় অনভ্যস্ত স্বর্ণলতা কত বিষয়ে শাশুড়ীর কাছে, স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হইয়াছে! তরকারী কুটিতে কুটিতে সে যদি কোনো দিন একটু গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিত, উঠানে ধান কড়াই নাড়িতে নাড়িতে শাশুড়ী বলিতেন, *'হ্যাঁ বৌমা, তোমার মা কি তোমাকে শুধু বিবিয়ানা কোর্‌তেই শিখিয়েছিলেন, আর কিছুই শেখান নি? ঘরের বৌ গান গাইলে সে সংসারে কি আর শ্রী ছাঁদ থাকে মা?'*

সমস্ত দিন সংসারের কাজ করিয়া রাত্রে দুই-একখানা বই পড়িবার চেষ্টা করিলে স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিতেন, মিথ্যা তেল পোড়াইয়া লাভ কি? বিশেষ মেয়েলোকের বেশী লেখা পড়া তাঁহারা পছন্দ করেন না, যেহেতু তাহারা তো আর চাকুরী করিতে যাইবে না।

স্বামীর গ্রাম্য স্বভাব, শাশুড়ীর রূঢ় প্রকৃতি স্বর্ণলতার তরুণ জীবনকে ঠেলিয়া প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় লইয়া গেল। উপর্য্যুপরি কন্যা প্রসব করিয়াও সে সংসারে অপরাধিনী হইয়া পড়িল। অবাঞ্ছিত কন্যা সন্তানের প্রতি স্বামী, শাশুড়ীর বিরাগের অবধি ছিল না, সেই অবহেলা, অনাদরের অন্তরালে তাহাদের প্রতি স্বর্ণলতার স্নেহের অন্ত ছিল না।

বড়মেয়ের পিতামহী-প্রদত্ত নাম হইল খাঁদি। 'কানা-ছেলের নাম পদ্মলোচনে'র মত এ নামের কোনো সার্থকতা ছিল না। কারণ খাঁদির অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে নাসিকাটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর। মা লুকাইয়া নাম রাখিল 'দেয়া'। এইরূপে ঠাকুরমার দেওয়া 'পেঁচি' 'ভুতি' প্রভৃতি নামকে আড়াল করিয়া মায়ের দেওয়া 'দেয়া', 'কেয়া' 'চুয়া' নামগুলিই কায়েমী হইয়া বসিল। চতুর্থ কন্যার নাম হইল খেয়া। এইরূপে স্বর্ণলতার ব্যর্থ কবি-হৃদয় মেয়েদের নামকরণের মধ্য দিয়া কতকটা তৃপ্তিলাভ করিল।

খেয়া যখন জন্মিল তখন দেয়ার বয়স সাত বৎসর। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের গৃহিণীপণা করিতে সাত বৎসরই যথেষ্ট বয়স, সুতরাং খেয়াকে পালন করিবার ভার দেয়ার উপরেই পড়িল। মা সংসারের কাজে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, স্তন্যপান ব্যতীত মায়ের সহিত খেয়ার অন্য সম্পর্ক রহিল না। প্রাণের অসীম স্নেহ-মমতা ঢালিয়া দেয়াই ছোট বোনটিকে বড় করিয়া তুলিল।

৩

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া দেয়া কলসী করিয়া পুকুর ঘাট হইতে জল আনিতেছিল। খেয়াও ছোট একটা ঘটিতে করিয়া জল লইয়া বড়দিদির পশ্চাতে আসিতেছিল। তাহার ঘটির জল প্রায় পড়িয়াই গিয়াছে, পাজামা ও ফ্রক ভিজিয়া সপ্‌সপে হইয়া গিয়াছে, তবু সে ঘটিটিকে যত্ন করিয়া ধরিয়া আছে; বড়দিদির সকল কাজের অংশই তাহার গ্রহণ করা চাই।

তখন অপরাহ্ণ। ঘাটের পথে একটা বৃহৎ আমগাছের ডালে বসিয়া একটা কোকিল ক্রমাগত ডাকিতেছিল, কেয়া তাহার কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া রঙ্গ করিতেছিল। আমের মুকুলের গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা আমগাছের আড়াল হইতে একটি যুবক বাহির হইয়া গাহিয়া উঠিল—পিছনে ঝরিছে বারি ঝর ঝর, গুরু গুরু দেয়া ডাকে—। নিমেষে দেয়ার মুখ সিন্দূরের মত লাল হইয়া উঠিল, হর্ষোৎফুল্ল হইয়া খেয়া চেঁচাইয়া উঠিল 'প্রদীপদা!'

'হ্যাঁ, একেবারে জীবন-প্রদীপ', দেয়ার দিকে একটা অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া প্রদীপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রদীপের দৃষ্টির সহিত দেয়ার চকিত চ[illegible]নি মিলিত হওয়া মাত্র দেয়ার মস্তক আনত হইয়া [illegible]ল, কিন্তু সেই এক পলক দৃষ্টিতেই কত অকথিত ভাষা প্রকাশ হইল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন কেহ জানিল না।

সাধের ঘটিটি মাটিতে রাখিয়া খেয়া ছুটিয়া গিয়া প্রদীপের হাত ধরিল, 'গানটা আবার গাওনা প্রদীপ-দা, বেশ গানটা, আমার বড়দির নাম রয়েছে ওতে।'

'তোমার বড়দির নাম র'য়েছে ব'লেই ও গান আর গাইতে ইচ্ছে নেই, অন্য গান শুনবে?'

না, না, ঐটেই গাও। আচ্ছা প্রদীপ-দা, তুমি আমাদের বাড়ী যাও না কেন? তুমি ভা-রী দুষ্টু।'

'কেন যাবো? তোমার বড়দি কি যেতে বলেছে আমাকে?' খেয়া প্রদীপের হাত ছাড়িয়া বড়দিদির হাত

ধরিল, 'বল না বড়দি, তুমি না ব'ললে প্রদীপদা যাবে না।' খেয়ার ঘটি হইতে জল লইয়া দেয়ার মুখে ছিটাইয়া দিয়া প্রদীপ বলিল, 'দেখ্‌লেতো, তোমার বড়দি কিছুতেই যেতে বোল্‌বে না, ওর সঙ্গে যে আমার আড়ি।'

'আড়ি না কচু; ভাব খুব ভাব, আমি বুঝি জানিনে?' খেয়া হাসিয়া উঠিল।

—আচ্ছা বেশ তোমার বড়দিকেই জিজ্ঞেস কর, ও আমাকে ভালোবাসে কি না।'

খেয়া বড়দিদির কোমর জড়াইয়া ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, 'সত্যি বড়দি, তুমি প্রদীপদাকে ভালোবাসো না?'

ভগিনীর মুঠা হইতে সিক্ত অঞ্চল টানিয়া নিয়া জড়িত স্বরে দেয়া বলিল 'ধ্যেৎ'—

হাতে তালি দিয়া খেয়া বলিল 'বাসে, বাসে, নয়তো রেগে উঠে আমাকে মারতো। বাসো বড়দি?'

নিঃসন্দেহ হইবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ দেখা গেল।

দেয়া আনত নেত্রে পায়ের নখে মাটি খুঁড়িতেছিল, মুগ্ধ নেত্রে প্রদীপ সেই লজ্জারক্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রদীপ উহাদের প্রতিবেশী। বাল্যকাল হইতেই দেয়ার সহিত তাহার সখ্য ছিল। প্রদীপের প্রতিবেশী বহু বালিকার মধ্যে দেয়ার সহিতই তাহার প্রীতির সৌধ গড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রীতি প্রণয়ে পরিণত হইল। এখন দেয়া প্রদীপকে লজ্জা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কাহারও সম্মুখে সে প্রদীপের নামও উচ্চারণ করিতে পারে না। ছুটির দিনের জন্য অন্তরে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেও ছুটিতে প্রদীপ বাড়ী আসিলে তাহার সহিত দেখা হওয়ার সঙ্কোচে সে লুকাইয়া বেড়ায়। দেখা হইলে প্রদীপের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে দৃষ্টি তুলিতে পারে না, আরক্ত মুখে পলাইতে পারিলে যেন বাঁচে।

দেয়া গ্রাম্য মেয়ে, মায়ের কাছে সামান্য লেখা-পড়া শেখা ভিন্ন সে কখনো স্কুলে পড়ে নাই, নাটক-নভেল কাহাকে বলে সে জানে না, কাজেই আয়েষা, কুন্দনন্দিনী কাহারো সহিত তাহার পরিচয় নাই। পল্লীগ্রামে, থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দেখিবার কোনো সুযোগ নাই, কালে ভদ্রে দুর্গা পূজার সময় কোনো যাত্রার দল আসিয়া কংশ বা রাবণ বধের পালাই গাহিয়া থাকে। কাজেই প্রেমাস্পদের কাছে প্রথম প্রেম নিবেদন সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।

প্রদীপ কলিকাতার কলেজে-পড়া ছেলে, প্রেম নিবেদনের অনেক ভাষাই তাহার জানা ছিল। কিন্তু এই, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকার সরম-রাঙ্গা মুখ, আনত মুগ্ধ দৃষ্টি তাহার মুষ্টিবদ্ধ শীতল ভীরু করতলের মৃদু কম্পন, তাহার এত ভালো লাগিত যে, ভাষার আঘাতে এই মৌন আত্মনিবেদনকে সে আঘাত করিতে পারিত না। কাজেই নাটকীয় ভঙ্গীতে তাহাদের প্রেম নিবেদন না হইলেও উভয়ে উভয়ের অন্তরের পরিচয় লাভ করিয়াছিল।

এই মাধুর্য্য উপভোগ করিত খেয়া। সে সর্ব্বদাই দেয়ার সঙ্গে থাকিত আর প্রদীপের সঙ্গে দেয়ার সাক্ষাৎ হইলেই পুলকে অধীর হইয়া উঠিত। এ আনন্দ কেন, বালিকা তাহা বুঝিত না, শুধু বুঝিত প্রদীপ দেয়াকে ভালোবাসে, দেয়া প্রদীপকে ভালোবাসে, সে প্রদীপ আর দেয়া দুইজনকেই ভালোবাসে।

৪

দেয়ার বিবাহের জন্য ঘটক আনাগোনা করিতে লাগিল। মায়ের অশেষ গঞ্জনা সত্ত্বেও কন্যার বিবাহে শিবনাথের তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি একটু কৃপণ স্বভাবের লোক। বিবাহে অধিক ব্যয় করা তাঁহার মতবিরুদ্ধ। বিশেষ চারিটি কন্যাকে যখন পার করিতে হইবে তখন অর্থব্যয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। সুতরাং শস্তা দামের পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে আরো দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। আর দেরী করা সম্ভব নয় বুঝিয়া তিনি এবার বিবাহ ব্যাপারে তৎপর হইলেন।

খেয়া দেখে, যখন তখন বড়দিদিকে আল্‌তা টিপ্‌ পরাইয়া চুল বাঁধিয়া মায়ের চুড়ি চিক্‌ দিয়া সাজাইয়া বাহিরের ঘরে কতকগুলি অচেনা লোকের সম্মুখে আনিয়া বসানো হয়। সে-ও বড়দিদির কাছ ঘেষিয়া তাহার কোলের উপর একখানা হাত রাখিয়া ডাগর চোখ দুটি আরো ডাগর করিয়া বসিয়া থাকে। প্রথমে না বুঝিলেও, ইহা

যাহার অকরুণ রূঢ় ব্যবহারে বড়দির জীবন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, তাহারই হাতে নির্ব্বিচারে তাহাকে উঠাইয়া দিতে পিতামাতার এতটুকু দ্বিধা নাই? গহনা আর কোঠা বাড়ীর মূল্যই এত বেশী হইল! দরিদ্রের চতুর্থ কন্যা বলিয়া খেয়ার অন্তরের কি কোনই মূল্য নাই?

কিন্তু উপায়ই বা কি আছে? কেয়ার বিবাহে শ্যামাপদই উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়াছে, সেই ঋণের চিন্তায় পিতা তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন; খেয়ার দেহের পরিবর্ত্তে সে সব ঋণ মাপ করিবে! কি নীচ! কী হৃদয়হীন! স্ত্রীকে হারাইয়া দুই মাস পরেই তাহার সমস্ত স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া যে অন্য নারীকে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাকে পশু ছাড়া অন্য কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে? যে যূপকাষ্ঠে খেয়ার বড় দিদিকে বলি দেওয়া হইয়াছে, সেই যূপকাষ্ঠে খেয়াকেও বলি দেওয়া হইবে ইহাই সমাজের বিধান!

তাহার অন্তর যখন এই সব চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় পিতা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া হাট হইতে লাল সাড়ী শাঁখা কিনিয়া আনিলেন। মা চাল বাটিয়া বরণডালা সাজাইতে বসিল।

অনেকদিন পর খেয়া আবার মায়ের পিঠের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িয়া পিঠের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, 'ওর হাতে আমাকে দিয়ো না মা—'

মা চোখের জল মুছিল, তার পর সমস্ত অবস্থা কন্যাকে বুঝাইয়া বলিল, 'এ ছাড়া আর উপায় কি মা?'

খেয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল, কিন্তু অসম্ভব কিছু করিল না। লেকের পরিবর্ত্তে পল্লীগ্রামে বড় বড় পুকুর ছিল, পটাসিয়াম সাইনাইডের পরিবর্ত্তে করবীর পুষ্ট গোটা ছিল, সে সব কথা চিন্তা না করিয়া সে সমাজের শাণিত কৃপাণ-তলে নিজের গ্রীবা অগ্রসর করিয়া দিল।

করুণস্বরে রসুন চৌকী বাজিতে লাগিল, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইলেন, শুভদৃষ্টি হইল, মালা বদল হইল, বিবাহ হইয়া গেল।

মায়ের চোখের জল অঝোরে ঝরিতে লাগিল, সে কি জীবিতা কন্যার জন্য না মৃতা কন্যার জন্য তাহা ঠিক বুঝা গেল না। পিতামাতার পায়ের ধূলা লইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত খেয়া স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

খেয়ার বড়দিদির হাতে গড়া সংসার! তুলসী-তলার প্রদীপে আধখানা সলিতা পুড়িতে বাকী আছে, তাহার বড়দিদিই শেষ প্রদীপ জ্বালাইয়াছিল, আঙিনার এক পাশে যে সন্ধ্যামণি গাছটি ফুলে ফুলে ছাইয়া আছে, এ গাছও বড়দিই লাগাইয়াছিল! কার্পেটের আসনখানি, জানালার পরদাগুলি, সবই তার বড়দির হাতের তৈয়ারী! পত্রিকার সামান্য ছবিগুলি কতযত্নে বাঁধাইয়া ঘর সাজানো হইয়াছে। প্রদীপকে হারাইয়া ঐ ক্রূর প্রকৃতি স্বামী পাইয়াও তো তাহার সন্তোষের অভাব ছিল না, কত সাধ করিয়া সে সংসার সজাইয়াছিল, সব ফেলিয়া কোথায় গেল? আর কি ফিরিয়া আসিবে না?

বড়দিদিকে খেয়া আজ নতুন করিয়া হারাইল। শ্যামাপদ বাড়ী ছিল না, সে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ছেলেমেয়ে দুটিও বিষণ্ণ মুখে কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরিয়া শ্যামাপদ দেখিল ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই, খেয়া মাটিতে শুইয়া কাঁদিতেছে। দেয়ার মৃত্যুর পর তাহার রুক্ষ স্বভাব অনেকটা কোমল হইয়াছিল, তা' ছাড়া নবপরিণীতা সুন্দরী পত্নীর সহিত ভাব করিবার জন্য সে মনে মনে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছি[illegible]। জামা জুতা না ছাড়িয়াই সে খেয়ার কাছে আসিয়[illegible]লল, তাহার পিঠের উপর হাত রাখিয়া যথাসাধ্য কোমল স্বরে বলিল, 'কাঁদ্‌ছ কেন! যে গেছে তাকে—'

বিষধর সর্পের শীতল দেহে অঙ্গ স্পর্শ হইলে লোকে যেভাবে সরিয়া যায়, সেই ভাবে দূরে সরিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে খেয়া বলিল, 'সাবধান, আমাকে ছুঁয়ো না—'

সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহার চক্ষু দুটি অগ্নিকণার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

নতুন সাধ-আশায় শ্যামাপদের প্রাণ পূর্ণ ছিল। পত্নীর এই ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্য সে হতভম্ব হইয়া গেল, তাহার পর হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'সারাদিন বাড়ী

ছিলুম না, তাই রাগ করেছ? বড্ড কাজ ছিল আজ। আর কখ্‌খনো এমন হবে না।'

সে অগ্রসর হইয়া স্ত্রীর হাত ধরিতে গেল। আরো দূরে সরিয়া গিয়া খেয়া বলিল 'না, রাগ করি নি। আমার বাবাকে মুক্ত করবার জন্যই এ বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সাবধান, আমার কাছে কখনো তুমি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আশা করো না, করলে ভালো হবে না।'

বলিয়াই সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তিনদিন পর খেয়া পিত্রালয়ে আসিল, আসিয়াই মাকে জানাইল যে, বিবাহের প্রয়োজন ছিল, হইয়া গিয়াছে, অতঃপর সে আর শ্বশুরবাড়ী যাইবে না, মায়ের কাছেই থাকিবে।

মা ম্লান হাসিয়া বলিল, 'তাকি হয়রে পাগ্‌লি, মেয়েদের যে স্বামীর ঘর কর্‌তেই হয়।'

মাসখানেক পর শ্যামাপদ স্ত্রীকে নিতে আসিলে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়া গেল। খেয়া তাহার সংস্পর্শ এড়াইয়া মায়ের কাছে আসিয়া শুইয়া রহিল এবং যাত্রার সময় জেদ্‌ করিয়া বলিল, 'বাবা ঋণমুক্ত হয়েছেন, কন্যাদায় থেকেও উদ্ধার হ'য়েছেন; আর কেন? ওখানে আর আমি যাব না মা, গেলে দম্‌ আটকে মরে যাব। তোমরা যদি দুটি খেতে না দাও, আমি বরং খেটে খাব, তবু ওর বাড়ীতে যাব না। ওকে আবার বিয়ে করতে বল, হিন্দু সমাজে মেয়ের অভাব নেই, ওরও বিয়েতে অরুচি নেই।'

যতই আপত্তি করুক, খেয়াকে শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর সঙ্গে যাইতেই হইল। গৃহে আর কেহ না থাকায় গৃহিণীর কর্ত্তব্যও ধীরে ধীরে হাতে তুলিয়া লইতে হইল। যথাসাধ্য যত্ন করিয়া সে ছেলেমেয়ে দুটিকে প্রতিপালন করিতে লাগিল, স্বামীর কাপড় কোঁচাইয়া আল্‌নায় রাখা, অসুস্থ হইলে বালিতে নুন্‌ লেবু মিশাইয়া দেওয়া, সবই করিতে লাগিল, পারিল না শুধু স্বামীর শয্যার অংশ গ্রহণ করিতে। ছেলেমেয়ে নিয়া সে অন্য গৃহে খিল দিয়া শয়ন করিত।

শ্যামাপদ ধৈর্য্য ধরিয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত তরুণী সুন্দরী পত্নীর মনস্তুষ্টি সাধনে নিযুক্ত রহিল। রং-বেরঙের ডুরে শাড়ী, আল্‌তা, কুমকুম, স্নো, পাউডার, নিত্য সে সরবরাহ করিতে লাগিল। এমন কি, হাল্কা দুই-একখানা স্বর্ণাভরণ আনিয়াও সে পত্নীর মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিল। সে নিতান্ত হিসাবী মানুষ, দায়ে পড়িয়া নানা অপব্যয় করিয়া পত্নীকে উপহার দিতে লাগিল। খেয়া জিনিসগুলি তুলিয়া লইয়া আলমারীতে গুছাইয়া রাখে, সময় মত সপ্রতিভ-ভাবে ব্যবহার করে; অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াও কিন্তু পূজারীর প্রতি প্রসন্ন হয় না।

অবশেষে শ্যামাপদ ক্রুদ্ধ হইল, দরিদ্র পিতার কন্যার এত অহঙ্কার কিসের জন্য? এত করিয়াও তাহার মন পাওয়া যায় না কেন? কেন সে এত সহ্য করিবে? এত পরাজয় সে কিছুতেই স্বীকার করিবে না। সে লেখনীতে বিষ ছড়াইয়া শ্বশুরকে চিঠি লিখিতে লাগিল।

পিতামাতা কত সদুপদেশ দিয়া কন্যাকে চিঠি লিখিতে লাগিলেন। পতিই যে সতীর একমাত্র গতি সে বিষয়ে কত উদাহরণ দিয়া লিখিলেন, পড়িতে পড়িতে খেয়ার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়, ওষ্ঠাধর কঠিন হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার ব্যবহারের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না।

ক্রমে শ্যামাপদর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া খেয়া পিত্রালয়ে পলাইয়া গেল। মা কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'এ যে জন্মান্তরের বাঁধন মা, ও তোর সাত জন্মের স্বামী। চাইলেই কি বাঁধন কাট্‌তে পারিস্‌? মিথ্যে কেন দুঃখু বাড়াস্‌ মা!' মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া খেয়া বলে, 'সব বুঝি মা, তোমরা দুঃখ পাবে বলেই ওর ঘরে স্থান নিয়েছি, কিন্তু ওকে স্বামী বলে অন্তরে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি নে মা। যাকে স্বামী বলে ভাবতে পারি নে, তার স্পর্শ কেমন ক'রে সইব, তুমিই বল মা!'

মায়ের চোখের জলে মেয়ের চুল ভিজিয়া গেল। পিতামাতার চোখের জল সহিতে না পারিয়া খেয়া আবার স্বামীর গৃহে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু স্বামীর প্রতি ব্যবহারের কোনো ব্যতিক্রম হইল না। শ্যামাপদ ক্রোধে অধীর হইয়া ছেলেমেয়েসহ হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া খেয়ার আহার বন্ধ করিয়া দিল।

খেয়া উনবিংশতীবর্ষীয়া যুবতী, তাহার অনিন্দ্য দেহে যৌবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার চোখে জল আসে,

বড়দির সহিত তাহার চেহারার কি অদ্ভুত সাদৃশ্য! সে দেখে অযত্নে তাহার দীর্ঘ চুলে জট বাঁধিয়াছে। অনাহারে, অযত্নে সেই অম্লান সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে।

কেন সে নিজেকে এত নিপীড়িত করে? তাহার পূর্ণ যৌবন, অনুপম সৌন্দর্য্য সবই কি নিরর্থক? আজ সে অন্তরে যৌবনের তৃষ্ণা অনুভব করিল। আজ সে বুঝিল তাহার যৌবন অকারণ, সৌন্দর্য্য অকারণ, তাহার জীবন ব্যর্থ। প্রদীপকে না পাইয়া বড়দির জীবন অকালে নষ্ট হইয়াছে। এই নিষ্ঠুর লোকটি বড়দির জীবন নষ্ট করিয়া ধূমকেতুর মত খেয়ার জীবনেও আবির্ভূত হইয়াছে। কিন্তু খেয়া তাহার জীবন নষ্ট হইতে দিবে না, সে নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিবে। কিন্তু তাহার অন্তর যাহাকে বরণ করিয়া গ্রহণ করিবে, সে কোথায়? খেয়া তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে?

শ্যামাপদ দেখে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে, ছিন্ন মলিন বস্ত্রেও খেয়ার যৌবনশ্রী যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, সে যেন এ জগতের নয়, এই জগতের বাহিরে, সে যেন কোন্ অমৃত-লোকের সন্ধান পাইয়াছে। একদিন অকস্মাৎ সে সন্দেহ করিল ওদিকের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া খেয়া পাশের বাড়ীর একটি কিশোর-কান্তি যুবকের সহিত গল্প করিতেছে। পানে ঠোঁট লাল করিয়া, কপালে কুমকুমের টিপ পরিয়া সে যে যখন তখন গিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়ায়, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে খেয়াকে একটা ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিল, কিন্তু খেয়ার অধরের পরিতৃপ্ত হাসিটুকু ম্লান হইল না।

অবশেষে একদিন দেখা গেল খেয়া গৃহে নাই—শ্যামাপদর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িলে মাঝে মাঝে সে পিত্রালয়ে পলাইয়া যাইত; তাহাই অনুমান করিয়া সে কঠোর ভাষায় শ্বশুরকে লিখিল যে তাঁহার কন্যাকে আর পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সে পুনরায় বিবাহ করিবে। তিনি যেন সুদসহ শ্যামাপদর সমস্ত প্রাপ্য মিটাইয়া দেন, নতুবা শ্যামাপদ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

শিবনাথবাবু ব্যাকুল হইয়া জানাইলেন যে খেয়া তাঁহার সেখানে যায় নাই। তখন সম্ভব অসম্ভব অনেক স্থানে খোঁজ করা হইল, খেয়াকে পাওয়া গেল না। সুতরাং সে গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে মনে করিয়া সকলেই শোক করিতে লাগিল।

তিন মাস পর শিবনাথবাবু একখানা চিঠি পাইলেন, চিঠিখানা খেয়ার :—

তোমরা আমাকে যার হাতে দিয়েছিলে, তাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারি নি, অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। সে আমার দোষ নয়, দোষ তোমাদের সমাজের, আর আমার ভাগ্যের। মন্ত্র প'ড়ে তোমরা আমাকে যার হাতে দিয়েছিলে সে আমার স্বামী নয়, আমার অন্তরাত্মা যাঁকে বিনা মন্ত্রে গ্রহণ করেছে, তিনিই আমার স্বামী। কুলত্যাগিনী কন্যাকে তোমরা গ্রহণ করবে না জানি, কিন্তু বিধাতার বিধানে আমি নিষ্পাপ, এ বিশ্বাস আমার আছে।

ঘৃণায় পিতার দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠি . চিঠিখানা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আর সেই অভাগিনী নারী সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে সত্যই কূল পাইল কিনা কে জানে?

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অভিজ্ঞতা অতি অল্প বলিয়াই প্রবন্ধের নাম দিয়েছি অন্ধকারের আফ্রিকা। আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লেখকগণ যে-সব প্রবন্ধ লিখে থাকেন সেগুলোর গোড়ায় রয়েছে চর্বিত-চর্বন-বৃত্তি। বৃটিশ লেখকদের লেখা থেকে যতটা নিতে পেরেছেন তাকেই নিজের ভাষায় আরও একটু বাড়িয়ে আফ্রিকাকে আরও একটু কালো ক'রে তুলেছেন। ইউরোপীয় সংবাদপত্র-সেবিগণ আফ্রিকাকে বলেন Dark Continent। এখানে ইউরোপীয় বলতে বৃটিশ লেখকদের কথাই আমি বলছি। বৃটিশ লেখকগণ নিরপেক্ষ ভাবে কিছু লেখতে গেলেই তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সে জন্যেই তাঁরা সকল দিক বজায় রেখে লেখবার চেষ্টা করেন। কিন্তু আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, বাংগালী লেখকরা বৃটিশ লেখকদের কেতাব না ঘেটে আফ্রিকা সম্বন্ধে কিছুই লিখতে সক্ষম হন নি। তাঁদের কাছে বৃটিশ লেখকদের কেতাবমালা অথরিটি বলেই গণ্য হয়ে থাকে। আমি তা মোটেই স্বীকার করি না, কারণ আমি জানি, আমারও তাদের মতই বিবেক বুদ্ধি আছে। এখানে যদি বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে এসব চতুর লেখকদের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করি, তবে আমার মূর্খতার অবধি থাকবে না। সেজন্যই আজ প্রকাশ্যেই বলছি, আফ্রিকা Dark Continent নয়, আফ্রিকা আলোতে ভর্তি। আফ্রিকার লোকের শরীরের রং যেমন বদলাচ্ছে, আচার-ব্যবহার এবং শিক্ষারও তেমনি উন্নতি হচ্ছে। আফ্রিকা একদিন সভ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করবেই। কিন্তু ঐ যে বর্তমানের ভারতীয় পঁচা সভ্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর দালাল অশিক্ষিত ভারত-বাসী, তারা হয়ত একদিন আফ্রিকানদের উন্নতির সমূহ ক্ষতি করবে যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অটুট থাকে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া ভাল, নতুবা একটানা কথাই হয়ে যাবে।

মবিলীতে ফিরে এসে আমি দু'দিন ধরমশালা থেকে মোটেই বের হই নি। তৃতীয় দিন বের হয়েই পথে এক দুর্ঘটনা পড়ল চোখের সামনে। কতকগুলি নিগ্রো ঘাড়ে ক'রে কাঁচা মুগের ডালের মতই এক রকম ডাল বস্তায় ক'রে নিয়ে আসছে বাজারে বিক্রি করার জন্য। তাদের কেউ কিছু বলছে না, হঠাৎ কোথা থেকে একজন পুলিশ এসে এদের পিটুতে সুরু ক'রে দিল। সংবাদ নিয়ে জানলাম ডান দিকে চলাটাই তাদের একমাত্র অপরাধ। তার জন্য যেমন ক'রে ওদের নির্য্যাতন করা হলো তা বাস্তবিকই মর্মান্তিক। নিগ্রোদের প্রতি আরবদের অত্যাচারের কথা আমিও লেখেছি, ইউরোপীয়গণও লিখেছেন, কিন্তু ইউরোপীয় অত্যাচারের কথা কেউ লেখেন না। অথবা ভারতবাসীরা নিগ্রোদের প্রতি ব্যবসাক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে যে অত্যাচার করছে তার কথাও কেউ মুখে আনেন না। অথচ এই সাহিত্যরত্নদের সাহিত্য আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ চর্বিত-চর্বন ক'রেই সুখী হন। হয়ত তাঁরা ভাবেন এর বেশি তাদের কিছুই করার নেই। সাহিত্য করতে হ'লে পুরাতন পুঁথি যেমন ঘাটতে হয় তেমনি নূতন সংবাদও সংগ্রহ করতে হয়।

শুধু পিটান ত মামুলী ধরণের কথা। ইণ্ডিয়ান, ইউরোপীয়গণ এবং এশিয়ার অন্যান্য জাত ইথোপিয়ার যুদ্ধের সময় পুরাতন সংবাদ-পত্র আগুনে জ্বালিয়ে দিতেন এই ভয় ক'রে যে, কি জানি একটু লেখা-পড়ায় যারা অভ্যস্ত তারা সংবাদপত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ ক'রে ফেলবে এবং উত্তেজনার বসে

কিছু করেও ফেলতে পারে। নিগ্রোরা তখন কি পারত? তারা একটি কাজ করতে পারত.সেই কাজটি হলো দলে দলে লোক আবিসিনিয়ায় গিয়ে আবিসিনিয়ার সৈন্যদলে যোগদান ক'রে তাদের সাহায্য করা। কিন্তু তা যাতে না হয় তারই জন্য সকলে একমত হয়ে নিগ্রোদের অন্ধকারে রেখেছিলেন আবিসিনিয়াকে ইতালীর হাতে তুলে দেবার জন্য। এসব কথা কেউ লেখে না, লেখতে পারে না, কারণ এতে লেখকদের স্বার্থে আঘাত লাগে। আমার সেরূপ স্বার্থ কিছু নেই। আমার দেশবাসী আফ্রিকাতে যে সকল অন্যায় কাজ করছে, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং আমার মনে হয়, যেদিন ভারত স্বাধীন হবে সেদিনই ভারতবাসীর দুর্বল হৃদয় সতেজ হয়ে উঠবে এবং এখন যে সকল অন্যায় কাজ করেছে তার জন্য অনুতপ্ত হবে এবং সেজন্য প্রায়শ্চিত্ত করবে। সেই প্রায়শ্চিত্ত হবে নিগ্রোদের স্বাধীনতা পাবার সাহায্য ক'রে, তাদের দেশে গণতন্ত্রবাদের পতাকা ঘাড়ে ক'রে বয়ে নিয়ে।

মবিলী শহরে নিগ্রোদের বসবাস করার অধিকার নাই। তারা থাকে শহরের বাইরে ছোট ছোট গ্রামে। রাত্র হবার বহু পূর্বেই তারা শহর ত্যাগ করতে বাধ্য। শহরে থাকে ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়গণ। এখানকার ইণ্ডিয়ানদের নিগ্রোদের প্রতি বড়ই অশ্রদ্ধা। দেখে মনে হলো, কায়েতরা যেমন তাদের নিম্নতর জাতকে ঘৃণা করে এবং ব্রাহ্মণকে পূজা করে, ইণ্ডিয়ানদেরও এখানে সেই অবস্থা। ইণ্ডিয়ানরা শ্বেতকায়দের পূজা করে আর নিগ্রোদের করে ঘৃণা।

মবিলীর পাশেই একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানে কয়েক জন আবিসিনিয়াবাসী নিগ্রো বসবাস করে। স্বাধীনতার এতই গুণ যে তাদের সংগে কথা বলে আমার বেশ আনন্দ হয়েছিল। তারা তিনটি বিদেশী ভাষা ভাল করেই জানে। গ্রীক, ইংলিশ এবং ফরাসী ভাষা সমানভাবে তারা বলতে পারে। আর আমরা বিদেশী ভাষা শিখতে যখন যাই তখন আমাদের জ্বর এসে যায়। এর একমাত্র কারণ হলো ব্যাকরণের বেশি ব্যবহার। যেখানে লোক ব্যাকরণের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে সেখানেই আসল জ্ঞান হ'তে দূরে সরে গিয়ে একটা নোংড়া সং সাজে। ভারতের ঘরে ঘরে এরূপ নোংরা সং-এর অভাব নেই। এটাও আমার একটা অভিজ্ঞতা যদি বলি তবে মোটেই ভুল হবে না।

মবিলী থেকে বিদায় হয়ে আমি ঝিনজার দিকে রওয়ানা হই। ঝিনজাতে যাবার জন্য আমার একটা প্রবল বাসনা জেগে উঠেছিল, তাই পথে এমন কিছু লক্ষ্য করি নি যা এখানে পাঠককে উপহার দিতে পারি।

ঝিন্‌জাতে পৌছে বার্কলী বেংকের একজন সিন্ধি কেরানীর অতিথি হই। বিদেশে এসে একজন সিন্ধি যুবককে কেরানীর কাজ করতে এই প্রথম দেখলাম। যুবক সজ্জন এবং অমায়িক। সন্ধ্যার পর এসেছিলাম বলেই সেদিন ঝিন্‌জা-প্রপাত দেখতে যেতে পারি নি। পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই সর্বপ্রথমই গেলাম ঝিন্‌জা-প্রপাত দেখতে।

ভিক্টোরিয়া প্রপাত, নায়গ্রা প্রপাত আমি দেখেছি, এখন এই বড় বড় দুটা পৃথিবীর প্রকৃত প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য দেখার পর তৃতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তারই কথা বলতে সুরু করেছি। ঠিক্ করে উঠতে পারছি না আমার কি বলা উচিত। বলে যাব যা আমার মনে আসে, তবে ভয় হয় ভাষার অভাবে ঠিক ক'রে সকল কথা বলতে পারব কি না?

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় আফ্রিকার মিষ্টি জলের হ্রদ ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে একটি মাত্র মুখ খুলে তার জল বাইরে চলে যাচ্ছে। এই যে একটি মা. মুখ তাকেই আমি ঝিন্‌জা প্রপাত বলব। এই প্রপাতের আর একটি নামও আছে। তাকে বলা হয় ষ্ট্যানলী প্রপাত। আমি কিন্তু সেদিকে মোটেই কান দিব না, কারণ মিঃ ষ্ট্যানলীর বহু পূর্বে অনেক আরব এবং ইণ্ডিয়ান এই প্রপাত দেখেছে এবং তার কথা লিখেছেও। তাদের নাম না হয়ে মিঃ ষ্ট্যানলীর নাম হয়ে গেল একটা প্রপাতের তা আমি স্বীকার করব না। আমি এটাকে ঝিন্‌জা প্রপাতই বলব, কারণ ঝিন্‌জা শহর এই প্রপাত থেকে একশত হাত দূরে অবস্থিত। গ্রামের নাম হলো ঝিন্‌জা আর প্রপাতের নাম হলো ষ্ট্যানলী তা বৃটিশ-ঘেষা লেখকগণ স্বীকার করেন, কিন্তু আমি তা না ক'রে ঝিন্‌জা গ্রাম এবং ঝিন্‌জা

প্রপাত বলেই বলব। আফ্রিকার বিশেষত্ব বজায় থাকবে।

শহরের ঠিক্ মধ্য দিয়ে একটা পথ দক্ষিণ দিকে বেঁকে একেবারে প্রপাতের কাছে চলে গেছে। প্রপাতের ডান দিকটা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে ক'রে স্রোত ডান দিকে আর ভাংতে না পারে। প্রপাতের উভয় দিকেই শক্ত পাথর। আমি যদি এখানে শুধু শক্ত পাথরই বলি তবে নৃতত্ত্ববিদগণের পক্ষে কথাটা একদম মামুলী হয়ে যাবে, হয়ত বুঝতেই পারবেন না। কোয়ট, গ্রেনেট এবং মসৃণ সেণ্ড ষ্টোন ডান তীরে দেখতে পাওয়া যায়। অপর তীরে কি আছে আমি দেখি নি, তবে অনুমানে মনে হয় এই তিন ধরণের পাথরই অপর তীরেও হবে।

প্রপাতের মুখ তিন চেনের বেশি হবে না। একস্থানের মুখের অনুমানিক গভীরতা দশ থেকে পনের ফুটের বেশি হবে বলে মনে হয় না। এখানকার স্রোতের পরিমাণ নির্ণয় আজ পর্য্যন্ত হয় নি। তবে ইন্‌জিনিয়ারদের ধারণা, এখান থেকে যে বিজলী পাওয়া যাবে তা দিয়ে সমুদয় আফ্রিকাকে আলোকিত করতে কষ্ট হবে না। অথচ ঝিন্‌জাতে বিজলীর স্রোত কয়লা হতেই তৈরী করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রবাদকে গালি দিতে ইচ্ছা হয়। এখানে প্রত্যেক ইউনিট পঁচিশ থেকে তিরিশ সেণ্ট করে বিক্রি হয়। যদি এখানে জলস্রোত থেকে বিজলী তৈরী হতো তা হলে ঝিন্‌জাবাসীকে এক পাই (তিন পাই-এ পয়সা) করে ইউনিট বিক্রি করলেও বেশ মুনাফা থাকতো। এখানকার পুঁজি-বাদীরা কত ছোট প্রকৃতির তা তাদের কাজই বলে দেয়।

যে স্থানটা থেকে জল বের হয়ে আসে সেই স্থানটা সকল সময়ই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে কোনরূপ জলজীব আসতে সাহস করে না। যদি কোন জলহাতী ভুলে-চুকে এখানে এসে পড়ে তবে তার আর রক্ষা থাকে না। তৎক্ষণাৎ জলহাতীকে স্রোত টেনে নিয়ে পাথরে ফেলে দেয় এবং নীচের মাছ জলহাতীর মাংস খেতে থাকে। নীচের মাছ যখনই নেচে উঠে তখনই বুঝতে হবে কোনও জলজীব জলের স্রোতে নিহত হয়েছে এবং তার মাংস জলে ভেসে আসছে।

অনেকে এই স্থানটাকেই নীলনদীর জন্মস্থান বলে থাকেন। আমিও তাদের কথায় সায় দিতে বাধ্য হবই। জলের দুটি স্রোত। একটি উপরে আর অন্যটি নীচে। উপরের স্রোত অনেক সময় নীচে চলে গিয়ে নীচের স্রোতের সংগে মিলে যায়। এখান থেকে যে জল বের হয় তার গতি মাত্র দুদিকে যেতে পারে : উত্তর এবং পশ্চিম দিকে। যদি উত্তর দিকে জল না যেত তবে পশ্চিম গিয়ে নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে জমা হতো। দক্ষিণ দিকে জল যাবার একটি স্থান আছে, সেই স্থান হলো সাহারার মধ্যস্থল। সাহারার মধ্যস্থল এখান থেকে তিন হাজার ফুট নীচে। যদি এখানের জল সাহারায় যেত তবে আজ সাহারা মরু না হয়ে সাহারা সাগরই হতো। কিন্তু তা হয় নি। অতএব আমার অটুট ধারণা এটাই নীলনদীর জন্মস্থান। অনেক সময় নদীর গতি পাহাড়ের নীচ দিয়েও যায়। আমার মনে হয় ঐরূপ কোন পাস (pass) আছে, নতুবা আফ্রিকার ভৌগলিক আকৃতি অন্যরূপ হয়ে যেত। ভ্রমণ-কথা ভৌগলিক হয়ে যাবে বলেই এখানে এই বিষয়ে আর আলোচনা করা গেল না, শুধু মতামতটাই লিপিবদ্ধ করা গেল।

ঝিন্‌জাকে যদি প্রপাত বলা হয় তবে অনেক সময় অনেকের ভুলও হ'তে পারে। আমাদের পুকুর যখন জলে ভরে যায় তখন উৎলিয়ে গিয়ে প্রবল স্রোতে জল বের হ'তে থাকে, ঝিন্‌জারও অবিকল সেই ব্যবস্থা। ভিক্টোরিয়া হ্রদে ছোট বড় অনেক নদী এসে পড়েছে, সেই জলের একটা পথ চাই। ঝিন্‌জা প্রপাতই একমাত্র জল বের হয়ে যাবার পথ। পুকুরের জল অল্প, জল বের হবার সময় স্রোতের বেগও হয় অতি সামান্য। কিন্তু ঝিন্‌জা থেকে যে জল বের হয় তা নায়গ্রা অথবা ভিক্টোরিয়া থেকে অনেক বেশি। ভিক্টোরিয়া এবং নায়গ্রা প্রপাত থেকে অনেক সুবিধা পেয়েছে, কিন্তু ঝিন্‌জা প্রপাত থেকে কোন সুবিধা পায় নি পাবেও না। কারণ তার মুখে এমন সব পাথর রয়েছে যা তার ভাংবার ক্ষমতা নাই।

ঝিন্‌জা জলপ্রপাতের থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ-পূবে অনেক জলজীব দেখতে পাওয়া যায়, তার মাঝে জলহাতীই বেশি। মাঝে মাঝে এমন সব জলজীব দেখা যায় যার নাম এবং অবয়বের কথা ঠিক্‌ভাবে বর্ণনা করা যায় না।

সেই জলজীবগুলির শরীর সম্পূর্ণ দেখবার সুযোগ এখনও কারো হয়ে উঠেনি। আমিও অনেক দিন চুপ ক'রে বসে রয়েছিলাম এই জলজীবদের দেখবার জন্য, কিন্তু শুধু জলহাতীই দেখেছি অন্য জীব দেখার সুযোগ হয় নি।

যে স্থানে প্রপাত সুরু হয়েছে তার এক চেইন নীচে নানা রকম বড় বড় মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ সব মাছ কেউ ধরে না। ইচ্ছা ক'রে একদিন আমি একটি মাছ ধরিয়ে এনেছিলাম, কিন্তু খেতে পারি নি। মাছ মোটেই সিদ্ধ হয় না। যে সকল মাছ প্রবল জল-স্রোতে থাকে তাদের চামড়া আপনি শক্ত হয়ে যায় এবং তাদের শরীরে ভেতরটাও শক্ত হয়ে বারের মত হয়।

প্রায় আড়াই মাইল নীচে একটি সেতু আছে। সেই সেতু তৈরী করতে অনেক লোকের প্রাণ হানি হয়েছিল বলেই শুনা যায়। সেতুটি প্রস্তুত হওয়ায় কাম্পালাতে (Kampala) যাতায়াতের বেশ সুবিধা হয়েছে। প্রথম দিন অনেকক্ষণ প্রপাতের কাছে কাটিয়ে ঘরে ফিরে আসি এবং তার পর থেকে রোজই একবার সেখানে গিয়ে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতাম। এতে মনের বেশ পরিবর্তন হতো।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা বলা আমার পেশা নয়, আমি মানুষ। মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলতেই আমার একমাত্র আনন্দ। এখানে দু'জন ভারতীয় কোটি-পতি আছেন। একজন চিনির রাজা (Sugar king of Uganda) অন্য-হলেন তুলার রাজা (Cotton king)। উভয় ভদ্রলোকই কাথিওয়ার-এর পোরবন্দর হ'তে এসেছেন। এ দু'জন কোটিপতি ছাড়া কয়েকজন লক্ষপতিও আছেন। তাদেরও অনেকেই পোরবন্দর হ'তেই এসেছেন। পোরবন্দর হ'তে আগত ধনীদের সম্বন্ধে অনেক সত্যিকারের ঘটনা আছে। তাই এখন আমি বলব।

আমরা অনেক সময় ভাবি, আমাদের মনের অথবা শরীরের শক্তি দেখাবার কিছুই নাই। তা কিন্তু সত্য নয়। আমরাও মানুষ, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে অন্যান্য সভ্য এবং কর্মঠ লোকের মত যে কোন কাজ ক'রে লাভবান হ'তে পারি। বেশি দিনের কথা নয়, পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে পোরবন্দরে কয়েকজন যুবক বেকার হয়ে কি করবে তাই ভাবছিল। তারা বসেছিল সমুদ্র-তীরে। সমুদ্র-তীরে তখন চন্দ্রালোক পড়ে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। সমুদ্রে কয়েকখানা বড় বড় পালের নাও দাঁড়িয়েছিল। নৌকা-গুলি কোন্ দেশের কোন বন্দরে যাবে যুবকগণ জানত না। একজন যুবক প্রস্তাব করল, এরূপ ক'রে যদি বসে বসে জীবন কাটাতে হয় তবে তার চেয়ে মরণই ভাল। এই যে দেখছ বড় বড় নাও লংগর ক'রে রয়েছে তারা বিদেশে যায়, এসব নৌকায় বিদেশে গেলে হয় না? একজন প্রতিবাদ ক'রে বলল, এতে জাত যাবে, সমাজ আমাদের পরিত্যাগ করবে। চারজন যুবক এতে প্রতিবাদ করল এবং বলল, সমাজ টাকার গোলাম, যদি টাকা আনতে পারি বিদেশ থেকে তবে সমাজকে কিনে ফেলব, গোলাম বানাব।

পোরবন্দরের মাঝিরা যদিও সমাজে নিম্নস্তরেই অবস্থান করছে, তবুও তারা তাদের মানসিক এবং সামাজিক উন্নতি বেশ ভালরূপেই করেছে। যুবকদের কথা শুনে একজন মাঝি বলল, আমরা যাব এমনই একদেশে যেখানে সোনার খনি আছে। তোমরা আমাদের সংগে যাবে? চারজন যুবক যেতে রাজি হলো, কিন্তু তাতে মাঝি একটি সর্ত হাজির করল। মাঝি বলল, যদি পথে আরবদের নৌকার সঙ্গে দেখা হয় এবং আরবরা যদি আক্রমণ করে তবে তোমাদেরও লড়াই করতে হবে। সব জী-গোজী বেনের ছেলেরা তাতে রাজি হ'ল এবং দেওয়ালীর দিন তারা নৌকা পোরবন্দর হ'তে ছেড়ে দিল।

কম্পাসের সাহায্য না নিয়ে শুধু ধ্রুবতারার ওপর নির্ভর ক'রে তারা চলতে লাগল এবং তিন মাস পর আফ্রিকার মোম্বাসা নামক বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হলো। মাঝিরা মাল বোঝাই ক'রে দেশে আসল আর ঐ চারজন যুবক তীরে গিয়ে তাদের কর্ম-ক্ষমতা ব্যবসায়ে লাগিয়ে আজ কেউ কোটিপতি, আর কেউ লক্ষপতি হ'য়ে ঝিনজাতে প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করছে। এরা কি কম সাহসী? এদের কথা আমরা মনেও যে আনিনা। বারান্তরে এদের কথা বিশেষভাবে বলব। ক্রমশঃ

শাদা কালো

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অসিত বলল: "কিন্তু 'ঘরোয়া' বিশেষণটি ভুলিস নি মিলি। যোগাশ্রমে অনেক সুখই সইতে পারে হয়ত—সয় না কেবল ঐ ঘরোয়া জাতীয় সুখ—কি না যাকে সাহেব-পুরাণে বলে—'হোম-লাইফ'। তাই কোনো ঘরোয়া অন্তরঙ্গতাই টেঁকে না আশ্রমজীবনে। আমারও টিঁকল না। এই সময়ে হঠাৎ দাদুর এক চিঠিও আর আমাকে ছুটতেও হওয়া মোটরে আবটাবাদ।"

প্রমীলা বলল: "আবটাবাদ?"

অসিত বলল: "মুরেল থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে—পেশোয়ারের পথে। প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু। সুন্দর জায়গা। অনেকেই যায় সেখানে চেঞ্জে। সেখানে আমি আগে একবার গিয়েছিলাম পেশোয়ার যাবার পথে—একটা অসুখের পর। কিন্তু সেকথা থাক—দাদুর চিঠির কথাটা আগে সেরে নিই—যদিও এটা হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে গল্পের মধ্যে গল্প—যেমন নাটকের মধ্যে স্বপ্নদৃশ্য—Wheel within wheels আর কি।

"হয়েছিল কি, কয়েক বছর আগে পাহালগাঁও থেকে দাদু আমাকে একটি তার করেন—তাঁর এক বন্ধুর মেয়ের অসুখ করে অমরনাথের পথে যেতে। আমি পাঠিয়ে দিই গুরুদেবের মন্ত্রপূত একটি ফুল। তার পর দাদুর তারে খবর পাই ফুলটি পেয়েই মেয়েটির সংকট কেটে যায়। কিন্তু ব্যস। ঐ অবধি—আর কিছু না। তার পরে কয়েক বছর ধূমকেতু দাদুর কোনো পাত্তাই পাই নি আর। তার পর হঠাৎ এই দীর্ঘ পত্র।"

ব'লেই অসিত ওর নম্বর করা চিঠির 'রক্ষণী' থেকে বার করল একটি মোটা লম্বা খাম।

প্রমীলা বলল: "ওমা! কী মস্ত মস্ত চিঠিই তুমি পাও ভাই!"

নির্মল বলল: "আর কী বিচিত্র! কত রকমের লোকের কাছ থেকে সেটাও বলো।"

অসিত হেসে বলল: "চিঠিটা পড়লে আরও বিচিত্র লাগবে। দাদুর ভাষায়—'প্রায় সচিত্রেরই কাছাকাছি।' তাই শোন্।"

* * *

অসিত পড়ে দাদুর চিঠিখানি মৃদুকণ্ঠে ওরা শোনে একমনে:

দাদা,

তোমাকে চিঠি লিখি নি যে কতদিন দাদা! কিন্তু লিখব কী বলো! চিঠি লেখা কি সহজ? তোমার রমেন মামার গান গাইতেন কলকাতার এক রসিক যুবক—তাঁর সাকরেদ। তিনি আমারই অনুরোধে একদিন গাইলেন তাঁর বিখ্যাত "রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে মুঠো মুঠো।" গাওয়ার পরে তাঁকে আমি বললাম: "ভালো হ'ল না তো।" রসিক যুবকটি বলল: "ভালো হবে কোত্থেকে—ভালো গান গাওয়া কি সহজ?"

চিঠি লেখার বেলায়ও ঐ কথা। যে পারে সে আপনি পারে—যেমন শ্রীমান্ অসিতবরণ। আর যে পারে না তার হাতের লেখনী ইচ্ছে থাকলেও নববধূর মতন "স্তব্ধ অর্ধরাতে"-ও চলে বড় জোর থেমে থেমে "দ্বিধায় জড়িত পদে সলজ্জিত বাসর শয্যাতে।"

কিন্তু তবু তাকেও যেতে হয় ফুলশয্যার রাতে—একেবারে অচেনা বঁধুয়ার বাহুবন্ধের মধ্যে। নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে, দাদা! আমারও তাই চিঠি লিখতে হ'ল। কিন্তু আর প্রগল্‌ভতা নয়। শোনো অবহিত হও। এ একেবারে দারুণ কেজো চিঠি।

তোমাকে শেষ চিঠি লিখি যতদূর মনে পড়ছে পাহালগাঁও থেকে। সেই? মনে আছে? সেই ফুল পাঠানো? তোমাকে খবরটা তখনই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হ'য়ে উঠল না—অপরাধ নিও না দাদা। আর যাই কেন সহজ হোক না চিঠি লেখা সহজ নয়—নয়—নয়। কিন্তু এখন না লিখলেই নয়। কারণ ক্রমশ প্রকাশ্য। আগে শোনো ব্যাপারটা ঘটেছিল যেভাবে—যথাপরম্পরায়।

সে বছর আমি তো গিয়েছিলাম অমরনাথ বেড়াতে? সেখানেই না ওদের সঙ্গে দেখা। ওরা মানে ধনকুবের বণিক রূপচাঁদ আর ওর মেয়ে রমা। অমরনাথের পথে বরফ জলে স্নান ক'রে মেয়ের হ'ল খুব জ্বর। ওরা তো ওকে নিয়ে এনে তুলল পাহালগাঁয়। কিন্তু সেখানে দেখা গেল নিউমোনিয়া। বাপ তো ভেবে অস্থির। ওদের ওখান থেকে পাহালগাঁয় নিয়ে আসার পথে আমাকে ধ'রে আনল রূপচাঁদ। বলতে ভুলেছি সে ছিল আমার বাল্যবন্ধু। বহুদিন বাদে দেখা। তার উপর মেয়েটির 'পরে কেমন যেন মায়া হ'ল। মাতৃহারা মেয়ে—তার উপরে কী সুন্দর যে দেখতে! "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। বয়স তখন ষোল কি সতের। ধনী পিতার একমাত্র সন্তান—চোখের মণি, বুকের নিশ্বাস, শিরার রক্ত। এহেন মেয়ের নিউমোনিয়া—আর কোথায় ভাবো একবার!—বিদেশে বিভূঁয়ে—অমরনাথে ভগবদ্দর্শন করতে গিয়ে!! মহামায়া!

নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম রূপচাঁদের কাতর অনুরোধে। তুমি তোমার গুরুদেবের মন্ত্রপূত একটি ফুল পাঠিয়েছিলে হয়ত মনে থাকতে পারে? ফুলটি পেয়ে ওদের যে কী আনন্দ! শুধু বাপের নয়—মেয়েরও। আর এইতেই হয়ত কাজ হ'ল অত ত্বরিৎ। বাবা ফুলটি মেয়ের মাথায় ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে ওর সংকট গেল কেটে। ফলে ওরা আমাকেই ঠাওরালে একটা কেষ্ট বিষ্টু। কত বললাম ওদের যে এ-কাজ আমার নয়—ভারতের একজন মহাযোগীর। কিন্তু উঁহু: শুনল না—আমাকেই ধরল চেপে, কিছুতে গেল না তাঁকে দর্শন করতে যাঁর প্রসাদে আধমরা মেয়ের হ'ল নবজন্ম। কারণ রূপচাঁদের বড় ভয় তোমার গুরুদেবকে, বলে ওখানে গেলে মেয়ে আমার পর হয়ে যাবে—হয়ত আর সংসারে ফিরবেই না। হায় মহামায়া! এম্নি ক'রেই কি বাঁধতে হয় মা? রমা কত কাকুতি মিনতি করল—কিন্তু বাপ একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং—এতটুকু ভিজল না।

সে যাই হোক, এর পর থেকে রমা আমার ভারি অনুগত হ'য়ে পড়ল। তাতে আমার খুব আপত্তি ছিল না। কিন্তু ওমা! শেষটায় বলে কিনা—গুরুদেব, দীক্ষাং দেহি!—সর্বনাশ!

আমি বললাম: 'মা, গুরুগিরির দীক্ষাং আমার কাছে পাইবে না এই ভিক্ষাং-ই আগে দেহি, নৈলে আমি চম্পট দেব। কারণ যাকে মা ব'লে ডেকেছি তার তো আর না-জনৈব নায়মানা যথাজ্ঞা হাল ক'রে ছেড়ে দিতে পারি নে। তবে যদি দীক্ষা সত্যি চাও তো যাও ভুমেলে গুরুদেবের কাছে। কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, বটেই তো: রূপচাঁদ সুমেরুবৎ অচল অটল, বললে সেটি হচ্ছে না। অগত্যা আমিই রমাকে বলতাম আপোষে সাধনার কথা, মানে আমার যতটুকু দৌড়।

"কিন্তু কী আশ্চর্য দাদা! তাইতেই ওর কুমারী হৃদয়ে জেগে উঠল সেই পরম দুর্লভ দেবাদিদেবের চরণে 'ভক্তিরসভাবিতা মতিঃ' যাকে বলেছে—'জন্মকোটি-সুকৃতৈর্নলভ্যতে'—কি না কোটি জন্মের পুণ্যেও মেলে না। সত্যি দাদা, এই ষাট বছরে দুনিয়াটাকে তো নিতান্ত কম দেখি নি নেড়েচেড়ে, কিন্তু এরকম অভাবনীয় ভক্তিভাবিতা মতি ক'টা মানুষের মধ্যেই বা দেখেছি? বিশেষ—সংসারের গারদখানায়।

রূপচাঁদকে যদি দেখতে তো বুঝতে গারদখানা বলতে কি বোঝায়। এই আটান্ন বৎসরে দুনিয়ায় চিনল ও শুধু একটা জিনিষ—দুনিয়াদারি। অথচ দেখ দেখি সেই ব্যোমভোলার বেভুল: কোত্থেকে তাঁর জটাবাহিনীর ভক্তির আকাশগঙ্গা কি না নামল এই লোকটারই মরু-অন্তঃপুরে! তোমার পণ্ডিতমুখ্যু বিজ্ঞানের হেরেডিটিই বা কী বলে আর এনভাইরনমেন্টই বা কী বলে?—বিশেষ ক'রে এ-হেন বাপের দুলালীর এহেন ভাগবত বুদ্ধি সম্বন্ধে?—হুঁ, একেই তো বলব বুদ্ধি দাদা, 'যা লোকদ্বয়-সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী' যে-বুদ্ধি ইহলোক

পরলোক দুই লোকের মহড়া নিতে পারে তাকেই তো বলব সব্যসাচী। নৈলে কী হবে বলো সে একপেশো বুদ্ধিতে যার আহরণী প্রতিভায় মেলে শুধু সংসারী ভোগের আমড়া—আঁটি আর চামড়া ?

এ আমার কথার কথা না দাদা! রমাকে দেখলে পেতে ভাগবত বুদ্ধির জীবন্ত ডেফিনিশন। ধনুর্ধরের তীর যেমন সোজা গিয়ে এ ও তা বাদ দিয়ে আসল জিনিষটার লক্ষ্য ভেদ করে ওর ভাগবত বুদ্ধি ঠিক তেম্‌নি সোজা বিদ্ধ করে জীবনের সার সিদ্ধান্তকে—অসার তর্কের ফাজলামির বুক চিরে। একেই শাস্ত্রে বলে ভক্তিরস-ভাবিতা মতি—কি না সেই মতি যার তাগিদ এসেছে অনাবিল ভক্তিরসের ভাবগোমুখী থেকে। তাই সাধনা সম্বন্ধে ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে কী যে সুখ মেলে দাদা যে সে কী বলব ? সত্যি, চোখে না দেখলে ও আমি বিশ্বাসই করতাম না—যে, কৈশোরেই কলেজে-পড়া কোনো মেয়ের মধ্যে এই ধরণের ধীশক্তি এত সহজে ফুটে উঠতে পারে! কিন্তু স্বচক্ষে দেখেও ভাবি প্রায়ই—কেমন ক'রে ইহ-সর্বস্বতার পাষাণকারায় এই পারলৌকিক বৈরাগ্যের ঝরণা ফেটে পড়ল—জেগে উঠল অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এই আশ্চর্য পশ্যন্তী বুদ্ধি—বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে! প্রহ্লাদের ক শুনেই কৃষ্ণবোধ! অথচ একেই কি না তোমাদের সায়েন্স বলল 'রূপকথা'! কিন্তু যাই বলো দাদা, আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে সায়েন্সের বিজ্ঞ বুলির আধশিশুভায় শুনতে বড় মিষ্টি। যেখানে এঞ্জেলরাও এগুতে ডরায় সেখানেই তো একদল লোকের হুড়মুড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া চাই—বেচারি এঞ্জেলরাও তো মাঝে মাঝে হাসতে চান! তোমাদের সাহেব পুরাণেও বলে নি কি—'There is laughter in Heaven, though there is no marriage there ?'

কিন্তু রমার এই অসামান্য ভক্তি ও ভাগবত বুদ্ধিই আমাকে ফেলল এক নতুন ফ্যাসাদে। যে-আমি কখনো তেরাত্তির কোনো গৃহীর ঘরে থাকি নি সে-আমি ওদের সঙ্গে র'য়ে গেলাম কি না তিন তিনটি মাস কাশ্মীরেই! ভাবো দাদা ভাবো—তোমাদের অনিকেত স্থিতপ্রজ্ঞ বৈদান্তিক দাদুও কি না শেষটায় প'ড়ে গেল পরের মেয়ের মায়ায়—vicarious অপত্যস্নেহে—না কী যেন বলে তোমাদের সাহেব পুরাণে ? আমরা টোলে পড়া মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ দাদা—ভুল হ'লে শুধ্‌রে দিও কিন্তু।

তখন আবিষ্কার করলাম যে কোথায় যেন আমাদের অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে সংসারের টান। তাই যতই কেন না কৌপীনপঞ্চক আওড়ে বলি যে 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ' কেন-না ভোগপ্রমত্ত ভূভারতে কেবল তারাই হ'ল 'ভিক্ষান্নমাত্রেণ খলু তুষ্টিমন্তঃ'—কিন্তু জাঁক করলে হবে কী বলো ? রসনা জয় করা তো আসল কথা নয় দাদা—এমন কি 'সংশয়গ্রন্থি' ছিন্ন করাও তত দুরূহ নয়—এখানে acid test হচ্ছে 'হৃদয়গ্রন্থি' ছিন্ন করা। কিন্তু হৃদয় কি কম ফিচেল ভাবো তুমি ? নিজের মেয়েকে এড়ালে না হয় কত কষ্ট ক'রে গৃহী না হ'য়ে, কিন্তু পরের মেয়েকে ঠেকাবে কী ক'রে শুনি—বিশেষ যদি রমার মতন মেয়ে হয়, আর মন তোমাকে প্রবোধ দেবার পথ খুঁজে পায় যে, এ-টান হ'ল অধ্যাত্মেরই টান—নাড়ীর টান নয় ? একচক্ষু হরিণের মৃত্যুবাণ এসেছিল কানা চোখটার দিক থেকেই—না জানে কে ?

তাই একদিন ভোরবেলা উঠেই মায়া কাটাতে হ'ল। কেন-না দেখলাম ধ্যানে বসলেই ইষ্টদেবীর জায়গায় রমার মুখই ওঠে ভেসে—আর হৃদয়ে উথ্‌লে ওঠে বাৎসল্যরসের জোয়ার। 'ন তাতো ন মাতা ন পুত্রো ন পুত্রী' জপ করতে করতে না ব'লে ক'য়ে চম্পট—একেবারে সোজা দ্বারকা। দুবছর কাটালাম সেখানে। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা সবে ধুনী জ্বেলে বসেছি আসনে, সাম্‌নে কে ও ? আর কে!

রূপচাঁদ কান্নাকাটি করল কত যে! মেয়ে আমার পর হ'য়ে যাচ্ছে যে দাদু! হায়রে মানুষ! স্রোতের জলে বাঁধতে চাও বাসা—নিভন্ত কিরণকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চাও বেঁধে। গুরুদেবের কাছে যেতে না দিয়েই ভাবলে মেয়ে থাকবে সংসারী!

কিন্তু গর্ব হ'ল দেখে রমাকে। সত্যি, ওকে যেন আর চেনাই যায় না! রূপসী ও ছিল বরাবরই, কিন্তু এবার সে-রূপে নিয়েছে কান্তি—তাপসীর দীপ্তি। হ্যাঁ গর্ব হ'ল বই কি—অন্ধ অন্ধকে চালাতে পারে না তো কি ? এই

তো আমিই পেরেছিলাম—সত্যস্বরূপকে না পেয়েও ওকে সত্যের দিকে রওনা ক'রে দিয়েছিলো আর কে! সত্যি দাদা, তোমার দাদু—যুধিষ্ঠির জীবনে বহু পাপ করেছে—মানি। কিন্তু এই একটি মাত্র পুণ্যের জন্যেও তার স্বর্গ দর্শন হবেই অন্তত একটিবার—মিলিয়ে নিও যখন সেখানে তোমার আরতি বান্ধবীর সঙ্গে সুধার পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ দেখবে সাম্‌নে শ্রীমৎ দাদু সেই স্বর্গেও তোমার কাছে 'ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত বিদিত্বা'র ধান ভানতে শুরু ক'রে দিয়েছে!

কিন্তু কারো পোষ মাস কারো সর্বনাশ—বেদেই রয়েছে যে দাদা। বেদবাক্য কখনো মিথ্যে হয়—তুমিই বলো না? কাজেই মেয়ের তপস্বিনী কান্তির জৌলুষ যতই বাড়ে বাপের সংসারী বুকের রক্ত যে ততই শুকিয়ে যাবে এ আর বিচিত্র কী বলো? একদিন বললাম ওকে হেসে: "টাকার কুমীর টিকটিকি হ'তে চলল কী দুঃখে ভায়া?"

ভায়া বলল কপাল চাপড়ে: "কুমীরেরো যে শিরে কৈল সর্পাঘাত দাদু কোথায় বাঁধবে তাগা? ঐ মেয়েই যে হ'ল আমার কাল। এখন ধরেছে মানস সরোবর যাবেই।—সর্বনাশ! সেবার ঐ সাংঘাতিক অসুখ থেকে আপনিই বাঁচালেন—কিন্তু তবু কি মেয়ের আক্কেল হ'ল এতটুকু?—আপনি সঙ্গে থাকলেও বা ভর্সা পেতাম—কিন্তু সর্বনেশে মেয়ে বলে কি জানেন? বলে: আমি ওকে সেখানে নিয়ে না গেলে ও পালিয়ে যাবে—ওকে না কি কৈলাসপতি ডেকেছেন! বলুন তো দাদু," বলতে বলতে বুড়োর চোখে ধারা ব'য়ে গেল: "ওর কিসের অভাব যে এই বয়সে ও সোনার সংসার ছেড়ে ধাওয়া করতে চায় শ্মশান বাগে? —ধর্মই যদি করে—সংসারে কি ধর্ম হয় না। তা ছাড়া এই কি ওর ত্যাগের বয়েস?"

আমি হেসে বললাম: "মিছে চেষ্টা ভায়া! শ্মশানে ঐ যে ভিখিরিটা ষাঁড়ে চ'ড়ে ঘুরে বেড়ায় সে যাকে একবার পাকড়াও করে তার হয় বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা অবস্থা। ধ্রুবকেও ঐ-ই ডেকেছিল যদিও গাল বাজিয়ে না—বাঁশি বাজিয়ে। তাই সে রাজার ছেলে হ'য়েও কচি বয়সেই গেল ছুটে বনে তপ করতে। ওর মা এল ধাওয়া করে কত বোঝালো:—

"কালঃ ক্রীড়নকানাং তে তদন্তেঽধ্যয়নস্য চ
ততঃ সমস্তভোগানাং তদন্তে চেষ্টতে তপঃ।

ধ্রুব! এখন তোমার খেলার বয়েস, তার পর পড়াশুনোর, তার পরে ভোগটোগ শেষ ক'রে তবে তোমার তপ করার কথা। কিন্তু উঁহুঃ যাকে একবার ঠোকরায় এ বৈরিগি ভূষণ্ডী কাক সে-বেয়াড়া আর সংসারের সেবায় লাগে না যে। ধ্রুব শুনবে কেন?"

রূপচাঁদ আমার পা জড়িয়ে ধরল "আপনি একটিবার বোঝান ওকে দাদু! অন্তত মানস সরোবরে যাওয়া থেকে ঠেকান। যদি নিতান্তই না শোনে বেশ ওর ঠাকুরঘর ক'রে দিচ্ছি কাশ্মীরে বা আলমোরায় অন্য কোনো ভদ্র শহরে—কিন্তু বেয়াড়া মানস সরোবর?—সেখানে যেতে গেলে যে পথেই ও মারা যাবে নির্ঘাৎ!"

আমার দয়া হ'ল। বললাম: "আচ্ছা আমি ওকে বোঝাতে পারি যদি ওর বাড়িতে বসে ধর্মকর্মে তুমি বাধা দেবে না কথা দাও।" রূপচাঁদ অগত্যা বলল: "সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ!"

রমাকে ডাকলাম পর দিন একলা আমার কুটীরে।

বললাম: "মানস সরোবর কেন মা?"

ও কেঁদে ফেলল, বলল: "বাবা বিয়ে বিয়ে ক'রে বড় বিরক্ত করেন যে দাদু। বিয়ে করলে আমি বাঁচব না।"

আমি ওকে আদর ক'রে বললাম: "তুমি বিয়ে না করলে কেউ কি তোমার বিয়ে দিতে পারে মা জোর করে? ভয় কি?"

ও চোখ মুছে বলল: "দাদু! ভয় যে একটুও নেই এমন কথা কে জোর ক'রে বলতে পারে বলুন? কখনো কি আর ইচ্ছে হয় না একটা নীড় বাঁধতে? জানেন তো আপনি, ও দিকে যত ঝুঁকি এ দিকের পিছুটানও তো ততই বাড়ে। সেই জন্যেই চাই সব বিলাস ছাড়তে, সব আত্ম-প্রশ্রয়ের ফাঁক বুঁজিয়ে দিতে। যদি বিলাসে মন কোনো সুখই না পেত—বাঁধা পড়বার কোনো ভয়ই না থাকত তাহ'লে কি সংসার ছেড়ে শ্মশানের দিকে ধাওয়া করতাম?" ব'লে একটু থেমে: "আমার আরও একটা ভয় রয়েছে কিনা—বাবার জন্যেই। এইখানেই যে আমি

সব চেয়ে দুর্বল দাদু! বাবাকে আমি খালি দুঃখই দিয়ে এসেছি। কোনোদিন চলতে পারি নি তাঁর মতে। তাই আমাকে আরও বাজে—কেন না বাবা আমাকে আদর যত্নে তো ঘিরেই রেখেছেন। এই জন্যেই দাদু শাস্ত্রে অপ্রতিগ্রহের বিধান দিয়েছে। নিচ্ছি অথচ দিচ্ছি না ওতে মন খুঁৎ খুঁৎ করে যে। কিন্তু না নিয়েই বা করি কী বলুন? বাবাকে একেবারে ছেড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়—অথচ বাবার কাছে থেকেও তাঁকে তো শুধু দুঃখই দিই—সুখী করতে তো পারি নে। কী করে করব বলুন? —বাবা সুখী হ'তে পারেন এক আমি সংসারী হ'লে, অথচ আমার ভয় করে সংসারী হবার কথা ভাবতেও।—আপনি দাদু, জ্ঞানী, সাধু, মহাত্মা—আপনিই আমাকে রক্ষা করুন। বাবাকে বোঝান। আমি সংসারে থাকতে পারছি নে। তার ওপরে বাবার কী যে হয়েছে—এত টাকা হ'ল তবু ব্যবসা ফাঁদবেন রোজ। মিশবেন শুধু বিষয়ীদেরই সঙ্গে। মালাবার পাহাড়ের প্রাসাদের খাঁচায় থাকাই চাই! অথচ তাঁকে বলতেও পারি না ত সাদাসিদে ভাবে থাকবে—বাবা সুখী মানুষ, অজস্র বিলাস ছাড়া থাকতে পারবেনই বা কেন বলুন? স্বার্থপর হব কী ক'রে? কী ক'রে বলব তাঁকে আমার জন্যে বিলাস ছাড়তে! অথচ…যত দিন যায় দাদু, মনে হয় মিথ্যে এ সংসার ফাঁপা—অসার—শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন কি সাধে: 'অনিত্যম্ অসুখং লোকং ইমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্!' ও অনিত্য দুঃখের জগতে ভগবানকে ছাড়া আর কাকে আশ্রয় করবই বা বলুন!—কিন্তু আমার ঐ এক বন্ধন—বাবা! তাঁকে কষ্ট দিতে প্রাণ চায় না। অথচ কী যে করব—তা-ও বুঝতে পারি নে! একি সত্যিই আমার স্বার্থপরতা হচ্ছে দাদু?—বিয়ে ক'রে সংসারী হয়ে তাঁকে সুখী করাই কি আমার কর্তব্য? —তা ছাড়া দাদু, সর্বদা যে সব কথা আমাকে শুনতে হয় তা-ও যে হয়ে উঠছে আমার অসহ্য। সবাই বলে কী জানেন? বলে: ভগবানের জন্যে ঘরছাড়া না কি অন্যায়—নিজের মুক্তি নিয়ে কী হবে—জানেনই তো এই ধরণের সব কথা। দাদু, এ কথা কি সত্যি? তা হ'লে গোপীরা কৃষ্ণের জন্যে ঘর ছেড়েছিল বলে সবাই আজো তাদের জয়ধ্বনি করে কেন? ওটা কি শুধুই কবিত্ব?"

বললাম: "না মা, কবিত্ব গোপীরা যে ডাক শুনে ঘর ছেড়েছিল সে ভাব যে একবার শুনবে ডাক ঘর ছাড়তেই হবে। তা ছাড়া দেশের জন্যে গৃহসুখ ছাড়া যদি নিন্দনীয় না হয় তবে দেশের চেয়ে লক্ষ গুণে বড় যিনি তাঁর জন্যে ও সুখ ছাড়া নিন্দনীয় হবে কেমন করে?—তবে তোমার ঘর ছাড়ার দরকার তো নেই মা এখনো। বাবা তো তোমাকে ঘরে ব'সে সাধনায় বাধা দিচ্ছেন না।"

"না কিন্তু বিয়ে দিতে চান যে!—তাই তো আমাকে আরো বাজে তাঁর মনে ব্যথা দিতে।—ছেলেবেলা থেকে তিনি যে আমার বাপ-মা দুই-ই। আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটলে তিনি সারা রাত ঘুমুতে পারেন না। অথচ এ হেন ভালোবাসার যে কোনো প্রতিদানই আমি দিতে পারি না দাদু! আমি কি সত্যই পাষাণী? নৈলে তাঁকে ভালোবেসেও তাঁকে সুখী করতে চাই না কেন? কেন চাই সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হ'তে?—কেন সংসারের নামে আমার দেহমন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়? জানেন দাদু, আমি স্বপ্নেও মাঝে মাঝে কী শুনি?—শুনি কে যেন বলছে:

"আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গ চপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা।"*

মনটি দাদা, যেমন এক দিকে গৌরবে ফুলে উঠল… হায় রে আত্মাভিমান!…তেমনি অন্য দিকে ভাবনা এল— কী গতি হবে এ মেয়ের? কোন্ পথে এ দোটানার গ্রন্থি খুলবে? ভেবে পেতাম না। অগত্যা ডাকতাম ওর জন্যে তাঁকেই যিনি একমাত্র কাণ্ডারী সংসারের ঝড়-তুফানে। কিন্তু ডাকতে ডাকতেও দেখি ফের মমতা এসে বাঁধে! নিজেকে ধমকাই তখন: ওর মুক্তির সহায় হ'তে গিয়ে নিজে আবার ও মমতায় জড়িয়ে পড়লে তো ওর পথের দুর্গমতা দূর হবে না। তাই ফের বিদায় নিলাম। গেলাম কন্যা-

* দিনে দিনে আয়ু যৌবন ক্ষয় হয়…যে বেলা ব'য়ে যায় সে আর ফিরে আসে না কালগ্রাসে সবই বিলুপ্ত হয়…লক্ষ্মী তরঙ্গভঙ্গের মতন চপলা… জীবন বিদ্যুতের মতন চঞ্চল…তাই হে শরণদাতা, শরণাগত আমাকে এখনই রক্ষা করো।

কুমারীতে। না বলেই অবশ্য—কেন না ওর ম্লান মুখের বোবা মিনতির সামনে বিদায় নেওয়া তো সম্ভব হ'ত না।

সেখানে ছমাস পরে হঠাৎ ওর এক তার: বাবা আমাকে নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন—কলম্বোয় আমি যদি দেখা করি অমুক জাহাজে।

কলম্বো ওখান থেকে কাছেই। গেলাম। জাহাজে উঠে দেখি রমার সাথী এক অতি সুদর্শন যুবক: রতিলাল চৌধুরী, ডি-এস-সি। রমা আমাকে ওর কেবিনে ডেকে নিয়ে গিয়ে যা কান্না কাঁদল! শুনলাম নাকি বাগদত্তা হয়েছে—তবে ঠিক বাগদত্তাও নয়। ও বলতে যাচ্ছিল সব কথা খুলে, কিন্তু আমি বিরক্ত হ'য়ে চ'লে এলাম—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং বলতে বলতে।

ছ'মাস বড় কষ্টে ছিলাম দাদা! এ আর এক কী খেলা বলো তো? কোথাকার কে একটা মেয়ে এল পথের মাঝে আমার সামনে···তাকে ভগবানের পথে একটু এগিয়ে দিতে গিয়েও এ কী মমতা! কোথাও কি রক্ষাকবচ নেই ঠাকুরের? যদি থাকবে তবে ভগবানকেও আর তেমন ভাবতে পারি না কেন?

"তখন এল এই চেতনা দাদা, যে মানুষ কত দুর্বল। এত দিন সন্ন্যাস নিয়েও যদি আমি এ ভাবে মায়ায় আবদ্ধ হই তবে পূর্ণ যৌবনে যে যোগিনী হয়েছিল তার স্খলন হবে এর মধ্যে আশ্চর্য কী আছে? কিন্তু তবু মনের ব্যথা গেল না—যদিও বুঝলাম ওর প্রতি রূঢ় হ'য়ে ভালো করি নি।

তার পর এর মাঝে আর দেখা হয় নি ওদের সঙ্গে। জানতামও না ওরা কোথায়—খবর নিতে ইচ্ছা হ'ত না যে তা নয় অবশ্য—তবে মনকে বোঝাতাম—কেন আর মায়া বাড়ানো যখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন করতেই হবে?—কিন্তু নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে দাদা! ফের ধরা পড়েছি নিজেরই বোনা জালে। রমার তার পেয়ে থাকতে পারলাম না—তাই আলমোরা থেকে এখানে এসেছি সোজা—এই পাণ্ডববর্জিত আবটাবাদে। এখানে এসে দেখি যে আর এক শোকাবহ কাহিনী। শোনো, যা সব শুনলাম বলি সংক্ষেপে।

ক্রমশঃ

রেখা-চিত্র

শ্রীরত্না দেবী

ছিলাম বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলের প্রান্ত সীমানায়। কর্ণফুলীর তীরে ছোটখাটো সহরটি। বেশ ছিলাম। আর পাঁচ জনের মত সুখেদুঃখে কাটছিল দিন। এমন সময় কালবৈশাখীর দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মত কি একটা এসে সমস্ত বিশৃঙ্খল, ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিল।

এতদিন আরাম-কেদারায় বসে বেতারযোগে যুদ্ধের আলোচনা উপভোগ করেছি। আর খবরের কাগজে যুদ্ধের প্রসঙ্গ পড়েছি। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তা এমন কিছু ব্যাঘাত ঘটায় নি। ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের বাস্তবতার কিছু কিছু রেশ এসে পৌঁছতে লাগল।

দরজায় কে কড়া নাড়ছে। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম। দেখি, একটি রুগ্ন, জীর্ণ, শীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ধুঁকছে। দুই পায়ে তা'র ঘা। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—"ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুন সহরের ওপর তার ভাতের হোটেল ছিল। উড়িষ্যায় তার দেশ। হোটেল আগুনে বোমা পড়ে ভস্মীভূত। সে দিন সকালে ছেলে গিয়েছিল কিছু বাকী-বকেয়া আদায় করতে। কোথায় গেল কে জানে? বেঁচে আছে, না, মরে গেছে! আমি পায়ে হেঁটে কোনও প্রকারে এসেছি। এখন কপর্দ্দকহীন হ'য়ে দেশে ফিরে গিয়ে কি করব! আমাকে একটা রান্নার কাজ দিন। আর আমাকে দুটো পেট ভরে খেতে দিন।"

* * *

বড় বড় ব্যবসাদাররা পালিয়েছেন গ্রামে। কারও ছিল চালের কল, তেলের কল বা সুতার কল; কারও বা মস্ত মনোহারী দোকান।

সহর নিঝুম, নিস্তব্ধ। কাজের তাড়নায় সবাইকে এক বার আসতে হয় সহরে। আবার দিনান্তে ভেড়ার পালের মত "ডেলি প্যাসেঞ্জারে"র গাড়ী বোঝাই হ'য়ে কেউ বা ইঞ্জিনের ওপর ব'সে বাড়ী ফিরে যায়। কেউ কেউ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পরিবারবর্গ বাংলাদেশের নিরাপদ অঞ্চলে।

* * *

সামান্য একজন কেরাণী, সে-ও স্ত্রী, ছেলে-পুলে পাঠিয়েছে গ্রামে। গ্রামে বহু লোকের সমাবেশ হয়েছে। অন্ন-জলের ব্যবস্থা নেই। বাসস্থানের অসঙ্কুলান।

গ্রামে গ্রামে কেবলই লাগছে মহামারী। কেরাণীর একমাত্র ছেলেটি মারা গেল কলেরায়। সে যখন খবর পেয়ে ছুটে দেখতে গেল, তখন তার সৎকার পর্য্যন্ত হ'য়ে গেছে।

* * *

সরকারের আদেশে অপ্রত্যাশিত ভাবে সহরের থেকে একুশ মাইল দূরে আমরা বদলী হ'য়ে এলাম। মনে করলাম শাপে বর হ'ল। কর্ণফুলীর তীরে পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট একটি গ্রাম। আছে শুধু একটি দেওয়ানী আদালত। ওপারেও ছোট ছোট শৈলশ্রেণী; আর তার ওপর গ্রাম; বনবিভাগের কর্ম্মচারীদের আপিস ও কাঠের বাংলো। চৈত্রমাস, দূরে দূরে পাহাড়ে পাহাড়িয়া কৃষকরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। আগুনের ফুলকি এদিক ওদিক ছিটকিয়ে পড়ছে। পাহাড়ের আগাছা, জঙ্গল পুড়িয়ে পরিষ্কার ক'রে পঞ্চশস্যের চাষ করবে। পাহাড়িয়া ভাষায় একে বলে জুন চাষ। পাহাড়িয়া চাষীদের এই না কি প্রথা।

শান্ত পার্ব্বত্য গ্রামটি। যুদ্ধের কোনও কল-কোলাহল এখানে এসে পৌঁছয় না। মনটা যেন অনেকখানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সে আতঙ্ক নেই। দিনে দুখানি ছোট্ট লঞ্চ সহর থেকে যাতায়াত করে। পাড়ের থেকে অনেকে চীৎকার ক'রে সহরের খবর জিজ্ঞাসা করে।

* * *

নদীবক্ষে অপূর্ব্ব সন্ধ্যা, সকলে উপভোগ করেছি দিনের পর দিন; একটুও ক্লান্তিকর মনে হয়নি। কেবলই মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের 'নদী' কবিতা। সোনালি রংয়ের গুচ্ছ গুচ্ছ সোঁদালি ফুলে ভরা গাছটি ঝুঁকে প'ড়েছে নদীর ওপর; নদীর পাড়ে ঘন শরের বন; কত রকম পাখীর ডাক; কত বিচিত্র পশুপাখীর পায়ের চিহ্ন কাদার ওপর, মস্ত বড় এক ঝাউগাছ। দিনের বেলায় তার ছায়ায় কত রকমারি লোকের ভীড়; সব মামলা করতে আসে। সন্ধ্যে বেলায় নীরব, নিস্তব্ধ। নদীর স্নিগ্ধ হওয়া তার মধ্যে দিয়ে সন্‌সন্ শব্দে ব'য়ে যায়। দিন নেই, রাত নেই, নৌকার দাঁড়ের সেই এক শব্দ—ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্, ছল্ ছল্, ছপাৎ ছপাৎ; কতকগুলো বাঁশকে একত্র ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কতদিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে, কে জানে। তার ওপর একটা সাময়িক খড়ের ছাউনী ক'রে তার মধ্যে মাঝি রান্না ক'রছে, ঘুমোচ্ছে, গতি তার খুবই শিথিল।

* * *

বটতলায় হাট বসেছে। তারই কলরব এসে পৌঁছুচ্ছে। চৈতালী হাওয়া পাহাড়ের গায়ে সেগুন বনকে তোলপাড় ক'রে তোলে। মাইল কয়েক দূরে, মহামুনি গ্রামে পয়লা বৈশাখ ভগবান বুদ্ধের পূজা হবে। চাক্‌মা বৌদ্ধ ভক্তরা দলে দলে পাহাড় ডিঙিয়ে তীর্থযাত্রায় চলেছে।

* * *

আমাদের বাড়ীর পাশেই, দরমার বেড়া দেওয়া খড়ের ছাউনীর পোষ্টাপিস্‌টি। সামনে তার কাঠমল্লিকার গাছ। তার ওপর ছোট ছেলেদের অত্যাচার। সবচেয়ে মজা ছিল এই, পোষ্টাপিসে কেউ খাম, পোষ্টকার্ড কিনতে গেলে, পোষ্টমাষ্টার মশায় বলতেন,—"এখন সময় নেই, খেতে বসেছি।" কিম্বা মাষ্টার মশায়ের ছেলেটি অনেক ডাকের পর বলত—"বাবা স্নানে যাবে, তেল মাখছে। অন্য আর এক সময় এস।" আমাদের বাড়ীর থেকে কথা-গুলো সব শুনতে পেতাম। আর ভারি হাসি পেত।

* * *

ছোট্ট লঞ্চটা ভোঁ দিয়ে হুস্‌হুস্ ক'রে জল কেটে চলে যেত—জানলা দিয়ে চোখে পড়ত। পথ চলতে চলতে

লোকরা জিজ্ঞাসা করত--"ও মাষ্টার মশায়, ডাক বাছা হয়েছে নাকি?" বিকাল বেলায় মাষ্টার মশায় পোষ্টাপিসের বারান্দায় ভাঙ্গা চেয়ারে ব'সে গড়গড়া টান্‌তে টান্‌তে আড্ডা দিতেন। পোষ্টাপিসের খোড়ো চাল বেয়ে উঠেছে একটি চালকুমড়োর লতা।

* * *

দিনের পর দিন সেখানকার একমাত্র সঙ্গী নদীকে দেখে দিন কাটছে। এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে একদিন সরকারের আদেশ এল—আমাদের অর্থাৎ স্ত্রীলোক ও শিশুদের সরে যেতে হবে। হাতে আর সময় নেই। সবাই সরে গেছে। বাকী শুধু আমরাই। কোনও প্রকারে, কিছু ফেলে, কিছু নিয়ে, চট্টলের শৈলাবেষ্টন থেকে বেরিয়ে এলাম।

* * *

এসে পড়লাম বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রতপ্ত রাঢ়ভূমের প্রান্তরে। শুধুই মাঠের পর মাঠ; যেন মরুভূমি। সবুজ বড় একটা দেখা যায় না। আমার মত বহু পলাতকের ভীড় এখানে। বাড়ীর অভাব; খাওয়ার জিনিষের অভাব, জলের অভাব। গ্রীষ্মের উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তবু সকলের ক্ষীণ আশা বোমার থেকে যদি প্রাণটা বাঁচে, পরে সবই জুটবে। এক-একটা বাড়ীতে লোক ধরে না। কলকাতার থেকে নানানরকম গুজবের আমদানি হচ্ছে। গুজব রটানোর মত এমন মুখরোচক জিনিষ বোধ হয় বাঙ্গালীর পক্ষে আর কিছুই নেই।

* * *

বীরভূমের প্রান্তরে বৈশাখের রুদ্রমার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ-চোখ তৃষিত হয়ে ওঠে, খাঁ-খাঁ করছে।

মাঠের ঘাসগুলো পর্য্যন্ত রোদে ঝল্‌সে তামাটে রং হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে যেন আগুন বর্ষণ হচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই মৃত্যুর আশঙ্কা। লু বইছে, কলকাতা প্রত্যাগত "ইভ্যাকুয়ি"র দল বলছেন—এর চেয়ে বোমা খেয়ে মরা শ্রেয়।

রাত্রে মাটির তল থেকে গরম তাপ উঠতে থাকে। কারও ঘুম নেই। প্রতিবেশীরা গরমে ছটফট করেন, আর অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ সম্পর্কীয় আলোচনা করেন, বাড়ীতে বাড়ীতে কুয়োর জল শুকিয়ে গেছে। ১১৮ ডিগ্রী গ্রীষ্মের উত্তাপে স্নান করা সবদিন কপালে জুটছে না।

একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী। তার মধ্যে এক পাত-কুয়ো—জল নেই। নতুন কচি-কচি পাতায় ভরা এক বেলগাছ। স্নিগ্ধ শ্যামল বর্ণ এক নিমগাছ। কাঠ-বিড়ালীরা ল্যাজ পিঠে তুলে ডালপালার ওপর দিয়ে দৌড়ে বেড়ায়। শিশু আতাগাছ; তার ডালে শালিকেরা দোল খায়। বহুরূপীরা পিঠের কাঁটা খাড়া ক'রে শুক্‌নো পাতার মধ্যে দিয়ে খড়মড়্ শব্দে ভাঙ্গা বাড়ীটার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়।

* * *

মস্ত এক খাদ। ছাগল ও ছাগশিশুরা চরতে চরতে তার মধ্যে নামে, দুটি খালি কচি ঘাসের আশায়। বৃষ্টির অল্প একটু জল জমেছে ঐ খাদের মধ্যে। তাতে ব্যাঙ্ লাফাচ্ছে। আমবনের নিবিড় ছায়া, শিশুরা তার মধ্যে খেলাধূলো করে। আমের ডালে দোল্‌না বেঁধে দোলে। কোথা থেকে এক ময়ূর এসে কেকারব করে; একটা ছাগশিশু সেই আমের ছায়া উপভোগ করে তার তলে শুয়ে। আর করুণ নয়নে তাকিয়ে থাকে তার মার দিকে। মা হয়তো আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

* * *

গরুর গাড়ী একটার পর একটা সারাদিন ধ'রে লাল ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে, গাড়োয়ান জীর্ণ, শীর্ণ, রোদে সমস্ত পৃথিবী যেন ঝামরে পড়েছে।

* * *

প্রতিবেশী আমাদেরই মত এক পলাতক পরিবার। বাড়ীর কর্ত্তা হচ্ছেন হাওড়া ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক। বউটিই বাড়ীর কর্ত্রী। অনেকগুলি ছেলেপিলে। আর থাকে বউটির দেওর, তার স্ত্রী। দেওরই সম্প্রতি অভিভাবক। বাড়ীর বড়গিন্নী দেওরটিকে নিজের ছেলের মত মানুষ ক'রে তুলেছেন। দুই জায়ে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। ছোট জা কিছু বললে বড় জা সইতে পারেন না। বড় জা উদয়াস্ত কেবল খাটেন।

* * *

গ্রীষ্মের খর মধ্যাহ্নে রাঢ়ভূমিকে দেখলে মনে হয়—

এখানকার প্রকৃতি যেন রুদ্রলীলার পটভূমি। কিন্তু দিগন্ত প্রসারী মাঠের ওপর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না যখন নেমে আসে মনে হয় এ বুঝি পরীর রাজ্য!

ছবির মত লাল রাস্তাগুলি এঁকেবেঁকে চলে গেছে! কঠিন মাটি তার ওপর কাঁকর আর নুড়ী বিছানো। দুধারে ধানের ক্ষেত। সুদূর প্রসারী মাঠ; খাদ; তাতে আবার বৃষ্টির জল জমে ছোট ছোট জলাশয়ের মত হয়েছে। ঘন সন্নিবিষ্ট কতকগুলো তালগাছ; পথের দুধারে আম, জাম, সেগুন, শিরীষের গাছ। অপরাহ্নের মুক্ত বাতাস জলের ওপর মৃদু তরঙ্গের সৃষ্টি করছে। নতুন বর্ষার জল পেয়ে কচি কচি ঘাস হয়েছে। কোথা থেকে পাখীর ডাক ভেসে আসছে। চাষীরা দিনান্তে এই খাদের জলে স্নান ক'রে বাড়ী ফিরে যায়। জলের ধারে একটা গাছ—সম্পূর্ণ রিক্ত, না আছে ফল, ফুল বা পাতা। শুধু কতকগুলো কালো কালো ডালপালা; তার ওপর অনেকক্ষণ একটি কালো পাখী বসেছিল।

শিশুর দল জমাট জলের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ে কতকগুলো চক্রের সৃষ্টি করছে। কিছুই না শিশুসুলভ কৌতুক-প্রিয়তা! এখানকার প্রকৃতির মধ্যে ভারী সুন্দর একটা গোছানো ভাব! বনের প্রত্যেকটি গাছ যেন গোনা যায়। মাঠ, ঘাটগুলো দেখলে মনে হয় কে যেন, ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রেখেছে। কতকগুলো অনাবশ্যক ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, দৃষ্টিকে পদে পদে বাধা দেয় না।

* * *

পথের একধারে পদ্মপুকুর। পাতায়, কুঁড়িতে, ফুলে ভরে আছে। জল দেখা যায় না। ঘাটটি বাঁধান। বোধ হয় অতীত যুগে কোনও রাজারাজড়া শরতের জ্যোৎস্না রাত্রে প্রমোদ বিহারে আসতেন—এই কমল বনে! চারিদিকে কোনও লোকালয় নেই। কেবল একটানা ঝিঁঝিঁর ডাক! সাঁওতালদের একটা ছোট ছেলে জলে নেমে পদ্ম তোলার চেষ্টা করছে।

* * *

আজ দিনটা মেঘলা! মাঝে মাঝে সূর্য্যদেবও প্রচণ্ড মূর্তিতে মেঘের আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। লাল পথটি দিয়ে চলেছি দুবরাজপুরের দিকে। কোথাও দিগন্ত প্রসারী প্রান্তর; তালশ্রেণী; মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট খেজুর গাছ; শাল গাছ; তালবন দিয়ে ঘেরা জলাশয়। ছোট ছোট ছবির মত গ্রাম। খড়ের ছাউনীর লাল মাটির কুটিরগুলি! বটতলায় কতকগুলো গরুর গাড়ী, গরুগুলো ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কুমোরের বাড়ীর সামনে মাটির তৈরী ঘটে, কলসী রোদে শুকচ্ছে, গ্রামের মেয়েরা কূয়োর থেকে জল তুলছে।

একটানা সুরে ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া হচ্ছে। গেঁয়ো মুদীর ছোট্ট দোকান পথের ধারে। চাল, ডাল, নুণ, তেল, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষ তো আছেই। তা ছাড়া কাঁচের চৌকোণা কৌটোয় বিস্কুট, মিশ্রী, বাতাসা, লাল নীল লজেঞ্জ, গুলিসূতো, রং-বেরংয়ের সাবান, বালির কৌটো—আরও কত কি! আর আছে অনাবশ্যক একটা গরম চায়ের বিজ্ঞাপন।

* * *

বিরাট কালো কালো শিলাখণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত!—এই তো দুবরাজপুর!

প্রকৃতির এ বৈচিত্র্য নাকি ভারতবর্ষের মধ্যে এক জব্বলপুরেই দেখা যায়। মাঝে মাঝে দু-তিনটে শিলাখণ্ডের মধ্য দিয়ে মাথা জাগিয়ে উঠেছে,—সপ্তপর্ণী, জাম, আর পিঠুলীর গাছ। একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ডের ওপর গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসে রইলাম।

কতকগুলো ছাগল আর বুনো শুয়োর আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও মেঘের ছায়া শিলারাশির ওপর, কখনও প্রখর রৌদ্রের ঝলকানি! চারিদিকে অদ্ভুত নীরবতা! দূর থেকে পাখীর একটানা মিষ্টি ডাক ভেসে আসছে। ভারী সুন্দর ধ্যানগম্ভীর জায়গাটি!

উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এক অতি জীর্ণ প্রাচীন দেবালয়। গোপাল তা'র বিগ্রহ। পূজারীও প্রবীণ হয়েছেন। দেখলে মনে হয়, এর সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে। মন্দিরের আয় বলতে গেলে কিছুই হয় না। কে-ই বা যায় অত দূরে পুণ্য কামনায়! অতি বৃদ্ধ পূজারী কোনও মতে গোপালের ভোগ দেন, আর

সন্ধ্যায় মাটির একটী ক্ষীণ-শিখার প্রদীপ জ্বালান। মনে হয় বৃদ্ধের জীবন ঐ গোপাল-সেবায় নিবেদিত!

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম "মৌরাক্ষীর" ধারে। মৌরাক্ষী রাঢ়ভূমের জননী—মৌরাক্ষী—ক্ষীণস্রোতা নদী। জল খুব অল্প। দুই তীরে বালুর চর। ওপারে দীর্ঘ এক রকম জলা ঘাসের বন, শরের বন, আমবন, তালকুঞ্জ। আর মাথার ওপরে সুরমার রংয়ের আষাঢ়ের মেদুর আকাশ। সজল হাওয়া! কাছেই গ্রাম, গ্রামের মেয়েরা বালুর চর খুঁড়ে খাওয়ার জল নিচ্ছে। আমাকে এক অদ্ভুত জীব মনে ক'রে, কৌতূহলী হ'য়ে আমার পিছনে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখছে। জেলে বাঁশের তৈরী মাছ ধরার এক রকম জিনিষ জলের মধ্যে পুঁতে রেখে যাচ্ছে—রাত্রে মাছ ধরা পড়বে এই আশায়।

গ্রামের মেয়েরা জল নিতে এসে গত রাত্রে কি রকম ঝড় উঠেছিল এবং তার সঙ্গে হঠাৎ নদীতে কি রকম বান ডেকেছিল—তার ফলে তাদের উঠোন, ঘর-দো'র জলে ডুবে গিয়েছিল—সেই গল্পই করছিল।

আকাশের কোলে দু-একটা বক উড়ে যাচ্ছে। এপারে বনের ওপর মেঘের ছায়া। জলের রং তামাটে। বোধ হয় মেঘের আড়ালে প্রচ্ছন্ন অস্তগামী সূর্য্যের রশ্মিপাতে। এপারে ছোট একটি গ্রাম। ওপারে দূরে নিবিড় বনানী। রং তার দোয়াতের কালির মত। বোধ হয় কাজলা রংয়ের মেঘের ছায়াপাতে। নদীটি কি শান্ত। এরই নাকি বর্ষায় বিষম আস্ফালন হয়।

নদীতে একটি নৌকো বাঁধা আছে। এত অল্প জল যে হেঁটে পার হওয়া যায়। আমার সঙ্গের শিশুর দল ভারি আনন্দ পাচ্ছে, জলে পা ডুবিয়ে ক্রীড়াচ্ছলে পার হয়ে যাচ্ছে। দু-একটা বক নদীর ধার দিয়ে, মাছের প্রত্যাশায় সন্তর্পণে বিচরণ করছে।

সন্ন্যাসী

(গল্প)

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

একরাত্রির অতিথি আমি।

সমস্ত রাত্রিটা কেটে গেল আমার গভীর শান্তিতে। কত কালের শ্রান্তি অন্তর-বাহিরে জমা হয়েছিল এক নিমেষে তা কোথায় যেন দূর হয়ে গেল। এই সন্ন্যাস জীবনে কত স্থানেই গিয়েছি, কিন্তু কই এমন আদর-যত্ন আপ্যায়ন ত কোথাও পেলাম না। এমন স্নিগ্ধ ব্যবহার আমার সম্পূর্ণ অজানা ছিল। এক রাত্রির স্নেহ-স্পর্শ যেন আমাকে আবার সংসারের ভেতর টেনে আনতে চায়। পৃথিবীর কোলের উপরকার নানা রীতিনীতি দিয়ে ঘেরা গৃহীদের এই গৃহসংসারকে টেনে আমি দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারি নি—তাই নিজেই পৃথিবী থেকে সরে যাচ্ছি, পৃথিবীর কোন দানকে আমি স্বীকার করি না, তবুও সেই পৃথিবীর মানুষদের একি স্নেহ মমতা এই অকৃতজ্ঞ লোকটার উপর। বেশী দিনের সন্ন্যাসী আমি নই; তাই স্নেহমমতার গভীরতা আমি এখনও উপলব্ধি করতে পারি। আজ যাঁর বাড়িতে উঠেছিলাম তাঁর নাম শ্রীপতি

শ্রীপতি আমারই সমবয়সী হবেন, বিদ্বান লোক, অথচ সহজে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। রাত্রে গল্প ক'রে দেখেছি ধর্ম্মতত্ত্ব তিনি কম জানেন না। কিন্তু তা নিয়ে তিনি তেমন মাথা ঘামান না। লোকটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হয়। তবু তাকে 'বাবাজী' বলেই সম্বোধন করি, কতকটা আমি প্রাচীনপথ অবলম্বন ক'রে প্রাচীন হয়ে পড়েছি ব'লে আর কতকটা ধর্ম্মোপলব্ধির প্রবীণতা হয়ত আমার ভেতর

তাঁর চেয়ে বেশী আছে বলে। শ্রীপতি বাবাজীর ধর্ম্মে-কর্ম্মে তেমন আস্থা নেই, অথচ আমাকে প্রণাম করেছিলেন। কেন করেছিলেন তা তিনিই জানেন।

ভোরবেলা আমি আবার যাত্রার উদ্যোগ করলাম—খুব ভোরেই উঠেছি—বহু দূর যেতে হবে, কোথায় যাব তা জানি না: আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দিনমান পূর্ণভাবে হেঁটে রাত্রে কোথাও আস্তানা খোঁজা। এমনি ক'রে আজ মাস ছয়েক আমার কেটে গেল। গুরুদেব বলেছিলেন, যত বেশী লোকের সঙ্গে পরিচয় করবে তত বেশী তোমার নিজের সত্যকার পরিচয় পাবে। সেদিন কথাটা বড় অদ্ভুত ঠেকেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ যেন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।

শ্রীপতির ছেলে সুনন্দ এক পেয়ালা চা আর খানকতক লুচি রেখে গেল। আমার আহার-বিলাসিতা দেখে অনেকে আমার সন্ন্যাসীগিরিতে সন্দেহ করতো, কাজেই আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম এই বিষয়ে অধিকতর সংযত হ'তে। চা আমি চিরকাল ভালবাসি, কিন্তু এখন সে রুচি অনেকটা ভুলে এসেছি। কোথাও গেলে কেউ আমাকে এ বস্তুটি দেয়ও না, আমিও চাই, না অথচ চায়ের উপর আমার এখনও মমতা আছে। কিন্তু শ্রীপতিরা কি ক'রে জানলেন আমার এ বিষয়ে রুচি আছে আর এত ভোরে উঠে এ সব করবারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

সুনন্দ বললে—'কই সন্ন্যাসীমামা, খেলেন না চা—'

সুন্দর শান্ত ছেলে সুনন্দ, কিন্তু আমাকে মামা বলে কেন ডাকে? কালও ত আমার গেরুয়া দেখে সে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়িয়েছিল, আর আজ সে মামা বলে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—আশ্চর্য্য শিশুর মন!

বেশ ছেলে সুনন্দ—বছর আট-নয় বয়েস হবে: একমাত্র ছেলে শ্রীপতির, কিন্তু বেশ ছেলে—শত পুত্রের সমান।

চা-পর্ব্ব শেষ হয়ে গেল। শ্রীপতি বাইরে এলেন আমাকে বিদায় দিতে। তাঁকে বললাম, 'শ্রীপতিবাবু, আপনাদের আদর-যত্নের কথা আর ভুলব না, আমার একটা মাপকাঠি হয়ে থাকল অতিথি-সৎকারের।'

অজ্ঞাতসারে শ্রীপতিকে 'বাবু' ব'লেই ডাকলাম। নাঃ, সন্ন্যাসীর আদব-কায়দায় এখনও দেখছি তেমন অভ্যস্ত হয়ে উঠি নি—নিজের পরিচয় ঠিকই পাচ্ছি যা হোক। সুনন্দর মামা বলাতেই আমি এমন ভুল করলাম কিনা তা কে জানে!

শ্রীপতি হেসে বললেন—'জীবনের কত কথাই আপনারা ভুলে যান সে সবের হিসাবও বোধ হয় আপনারা রাখেন না: আজকের কথাও ভুলে যাবেন সে আমি জানি—কিন্তু দুঃখ করব না—আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে অন্ততঃ এটুকু অনাসক্তি আমরা লাভ করতে পেরেছি—আপনাদের ধর্ম্মকথা আর উপদেশ খুব বৃথা যায় না স্বামীজী!'

শ্রীপতির কথার ভেতর বেদনা আছে—হয়ত আমার কাছ থেকে তিনি এমন কিছু চান যা আমি দিতে পারি নে: শ্রীপতির কথা কয়টা নতুন, কিন্তু শ্রীপতি নতুন নয়: এই সন্ন্যাসী-জীবনে এমন মনের পরিচয় আমি যথেষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তাদের দিকে মনোযোগ দিতে পারি নি। আমাকে সংসারে টেনে আনবার জন্যে এঁদের এমন আগ্রহ! এক-এক সময় মনে হয়, এই ঝুলিসম্বল জীবন ছেড়েছুড়ে দিয়ে আবার এঁদের মাঝে এসে বাস করি।

শ্রীপতি আমাকে প্রণাম করলেন, পা সরিয়ে নিলাম না; যখন মন দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তখন মানুষের এই শ্রদ্ধা আমার মনের বল ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

সুনন্দ এসে প্রণাম করল—সুনন্দকে কোলে তুলে একটি স্নেহচুম্বন দিলাম তার কপালে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে আমি চিরদিনই ভালবাসি, সে অভ্যাসটা হয়ত আজও ছাড়তে পারি নি। নিজের পরিচয় রীতিমতই পাচ্ছি—নির্জ্জনে সাধক সেজে বসে থেকে মনে করেছিলাম, কত বড় নির্ব্বিকার যোগীই না আমি হয়েছি, কিন্তু এখানে এসে দেখি কত দুর্ব্বলই না আমি এখনও।

শ্রীপতির স্ত্রী এসে গলায় আঁচল জড়িয়ে গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করলেন—সে প্রণাম যেন আর শেষ হয় না। আমার পায়ের ধূলি অতি সন্তর্পণে, যেন তাঁর হাত আমার পায়ে স্পর্শ পেল কি-না পেল এমনভাবে গ্রহণ করলেন। বাংলা দেশের মেয়েরা দেবদ্বিজে ভক্তি

করতে জানে। কিন্তু তাঁর হাতের স্পর্শে আমার অনেক ভুলে-যাওয়া কথা মনে-প্রাণে জেগে উঠল যেন!

শ্রীপতির স্ত্রীকে আমি কাল রাত্রে ক্ষণিকের জন্যে দেখেছিলাম—বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়েস হবে—কিশোরীর মত রূপ। রাত্রে আহার যখন সমাধা ক'রে উঠেছি তিনি আমার জন্যে পান নিয়ে এলেন—আমি বললাম, 'সন্ন্যাসীর ত পান খেতে নেই মা।' তিনি বলেছিলেন, 'আপনি কি একেবারে সত্যি সত্যিই সন্ন্যাসী ব'নে গেছেন?' তাঁর কথাটা শুনে কিংবা তাঁর কথার ধরণে আমার এমন মনে হ'ল যেন ইনি আমার কত কালের চেনা! কত পরিচয়ের স্বরই ভেসে এল যেন সেই সাথে।

আমি হেসে বলেছিলাম—'আমার ভেতর কি কোন ফাঁকি রয়ে গেছে মা!'

আদর-যত্নকে এমনি ভাবে উপেক্ষা ক'রে যাওয়াই আমার রীতি।

তিনি এই উপেক্ষার একটি বেদনা চেপে গিয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে শুধু বললেন, 'না, তা নয়—তবে—' আর কিছু বলেন নি।

আমি লক্ষ্য করেছি বাংলার মেয়েরা সাধুদের ভক্তি করে, কিন্তু তাদের ঐ সন্ন্যাসীগিরি ভালবাসে না: আমি এত অল্প বয়সে কেন সন্ন্যাসী হয়েছি তার জন্যে অনেকের কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে, অনেকে আমার হাত ধরে বলেছিলেন—'বাবা, আমার একটা কথা রাখ—তুমি আবার সংসারে ফিরে যাও।' আমি তাঁদের কাছ থেকে হেসে বিদায় নিয়েছি। শ্রীপতির স্ত্রীর ভিতরেও তার কোন ব্যতিক্রম দেখলাম না। কোথাকার কে একটা লোক এক বেলার জন্যে এসেছি—সে সত্যিকার সন্ন্যেসী হ'য়ে গেল বলে তাঁর কতই না দুঃখ।

তিনি যখন প্রণাম ক'রে একটু আড়ালে গেলেন আমি তাঁকে শুনিয়ে বললাম—'সুনন্দ আমাকে মামা বলে ডেকেছে—সুনন্দ যখন তাই ডেকে আনন্দ পেল তখন আমিও আপনাদের সন্ন্যাসীদাদাই থাকলাম।'

শ্রীপতি হাসতে থাকেন।

তাঁর স্ত্রীর মুখমণ্ডল যেন এক মুহূর্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—আনন্দদীপ্তি তাঁর সারা মুখে যেন ছড়িয়ে পড়ে। হয় ত তিনি মনে করলেন আমি এখনও স্নেহ-মমতা গৃহ-সংস্কারকে একেবারে ভুলতে পারি নি—আমি সন্ন্যাসধর্ম ছেড়ে দিলে যাঁরা আনন্দ পান হয় ত ইনিও তাঁদেরই দলের একজন। কিন্তু এবারও এঁর মুখটা যেন আমার অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হয়। সাহস ক'রে এক সময় বলেই বললাম—'আপনাকে কোথায় দেখিছি যেন মনে হচ্ছে—'

'কোথায় আর দেখবেন।' উত্তর এল উদাসীন ভাবে। তাই হবে—কোথায় আর দেখব—হয় ত এই দীর্ঘ দিনের ভ্রমণ-পর্ব্বে আর কারও সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছি—তাই মনে হচ্ছে।

তিনি বললেন—'আজকে না গেলেই পারতেন স্বামীজী—'

'কেন?'

'আজ ভরা পূর্ণিমা—'

'ও:, কিন্তু অতিথিদের ত তিথি নেই, আর তা ছাড়া সন্ন্যাসীদের দিনগত ত তিথি নয়, তাদের তিথি তাদের পরমায়ু: তা ছাড়া তারা তো গৃহহীন, ঘরছাড়া—তাদের আবার যাওয়া না যাওয়া কি?'

'তবুও পূর্ণিমাটা মানলে এমন কি ক্ষতি আছে—'

এবার একটু এড়িয়ে যাবার জন্যেই ব[illegible]ম—'দেখুন আমরা সংসারকে উপেক্ষা করবার জন্যেই এমন ভাবে ঘর ছেড়েছি—কাজেই সংসারের কারুর ডাক আমাদের কানে তেমন বাজে না। আমাকে এমন ভাবে আদর ক'রে আপনাদের মমতার আর অমর্য্যাদা করবেন না দিদি—'

শ্রীপতিই এবার আমাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন—'ঠিক বলেছেন স্বামীজী; কিন্তু কথা হচ্ছে কি, আমরা গৃহী, কিন্তু মানুষ; তাই মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সেটা আমরা সন্ন্যাসীর বেলাতেও ভুল করে বসি নে।'

'তা বটে, তবুও আমি থাকতে পারি নে।'

এমনি ভাবে এই সব গৃহীরা আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করছে—আমি তাদের আত্মীয় নই—তাঁদের স্নেহের স্থল নই আমি, তবুও আমার এই উদাসী ভাবে তাঁরা যেন

গভীর মর্ম্মযাতনাই বোধ করেন, পথের একটা লোকের প্রতিও এঁদের মমতার অন্ত নেই, এঁরা যদি দুঃখ না পান তবে দুঃখ পাবে কে? হয় ত এই দলছাড়া আমি বলে এঁদের একটা ঈর্ষাই আছে আমার প্রতি। কে জানে?

শ্রীপতি আর সুনন্দ আমাকে গাঁয়ের পথটা এগিয়ে দিতে এল।

আমার কেবলই মনে পড়ছে সুনন্দর মায়ের কথা। কোথায় যেন এঁকে দেখেছি—অথচ এই গাঁয়েও ত কোন দিন আসি নি—অনেক ভাবতে ভাবতে একটু যেন ক্ষীণ আভাস পেলাম। না—তা কি সম্ভব। কিন্তু অনেক দিন ত তার খবর জানি না—আজ প্রায় নয়-দশ বছর হবে। হয়ত সে নয়—কিন্তু কথা বলার ধরণধারণগুলো অনেকটা যেন সেই রকমের। আমি শ্রীপতিকে জিজ্ঞাসা করলাম—সুনন্দর মামাবাড়ী কোথায়?

—'কালিকাপুর।'

—কালিকাপুর! আপনার শ্বশুরমশায়ের নাম কি ভবতারণ মৈত্র?'

শ্রীপতি হেসে বললেন—'আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার নাম ত শিবদাস লাহিড়ী ছিল, কেমন?'

শ্রীপতি যে কি ক'রে আমার নাম জেনেছে বুঝতে পারলাম। আমি বললাম—'সন্ন্যাসীর ত অন্য নাম থাকে না—আমার নাম চৈতন্যানন্দ।'

শ্রীপতি বোধ হয় একটু অপ্রতিভ হলেন—'আপনি ভবতারণবাবুর মেয়ে কল্যাণীকে জানতেন ত—সেই কল্যাণীর সঙ্গেই আমার বিবাহ হয়েছে, তার কাছেই শুনলাম আপনার কথা।'

কল্যাণীর কথা মনে হ'লে আজও একটু উল্লসিত হয়ে পড়ি—সেই উল্লাসময় জীবনকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে আর ভাল লাগে না—কিন্তু ভালও ত লাগে কল্যাণীর কথা ভাবতে। হ্যাঁ, কল্যাণীর কথা মনে হ'লে এখনও কষ্ট হয়। আমার মনে হয়, আজকের পূর্ণিমা তিথিটাকে না হয় মানলামই। এত দূরে এসে পড়েছে কল্যাণী, ইচ্ছে হ'ল আবার ফিরে যাই—গিয়ে তার খবরটা ভাল করে নিয়ে আসি। কিন্তু যে ভুলে গেছে তাকে আর এই উদাস জীবনটাকে দেখিয়ে কি-ই বা হবে!

কল্যাণী আমাকে চিনেছে—এমন কি আমার নামটিও তার মনে আছে—আশ্চার্য্য কেবল আমিই ভুলে গিয়েছিলাম! অথচ কল্যাণী আমাকে একটুও ত জানতে দিল না যে সে আমাকে চিনেছে—সে আমাকে পুরোনো দিনের মত শিবুদা বলে ডাক দিতেও ত পারত!

কিন্তু কল্যাণীর কোন দোষ নেই! আমার ভেতর হয়ত শিবদাসের কোন লক্ষণই নেই অথচ এই কল্যাণী কালিকাপুরের কল্যাণী আর আমি শিবদাস!

কত দিনের কথাই না হয়ে গেল।

খুব শৈশবের কথা মনে নেই, কিন্তু আমার ইস্কুল-জীবনের কথা মনে পড়ে।

কল্যাণী, খুকী কল্যাণী সময় সময় আমার কাছে এসে বকর বকর করে গল্প করত, সে সবের কোনটার হয়ত মানে থাকত—কোনটার কোন মানেই ছিল না, ও আমার ভারী বাধ্য ছিল। একটা ডুরে শাড়ী পরে ঘুর-ঘুর করে বেড়াত কল্যাণী। কল্যাণীর ডাকনাম ছিল কনে—অন্য কোন গ্রামের মেয়ে তার সাথী ছিল না বা পুতুল-খেলাও সে পছন্দ করত না—ছোটবেলা থেকেই সে ঐ রকমই; আমার চেয়ে বছর চার-পাঁচের ছোট ছিল: আমি হয়ত বাঁশের খোলায় যাব—কনেও চলবে আমার সঙ্গে, কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারতুম না—সে যাবেই; সে যেন আমারই দলের এক পুরুষ ছেলে; শেষে এমন হ'ল সে না থাকলে আমিও কোথায় যেতাম না।

সেবার ছিল বোশেখ মাস—খুব ভোর বেলা উঠেছি—কনের তখনও ঘুম ভাঙে নি। বাড়ী থেকে তাকে ডেকে নিয়ে ঘোষপাড়ায় অষ্টক শুনতে গেলাম: চার-পাঁচটি ছেলে মেয়ে সেজে মেয়ের মত চোখমুখ ঘুরিয়ে মুখ রঙ মেখে দিনের আলোতে নাচছে আর গান করছে, পেছনে মাঝে মাঝে বেহালাদার খুব জোরে জোরে বেহালা বাজিয়ে তার অস্তিত্ব প্রকাশ করে—দেখতে বেশ সুন্দর। ওরা ছেঁড়া রুমাল হাতে জড়িয়ে কি চমৎকার নাচতেই না পারে। আমি যদি অমনই নাচতে পারতাম! হঠাৎ সামনের ঐ বাঁশের খোলা থেকে গোলমাল কানে এল,

ঘুরে চেয়ে দেখি খোলার আগুনের ধারে লোকগুলো জড়ো হয়েছে আর বলদগুলো গিয়েছে থেমে। কে যেন বললে, ভবঠাকুরের মেয়ে আগুনে পুড়ে এখনই মরত! তাই ত, কনে ত এখানে নেই, আমি ছুটে চললাম।

খোলার ধারে বসেছিল নথাতুল্লা, বছর ষাটেক বয়স হবে—তার কাছে ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা ক'রে শুনলাম—খুব বেঁচে গেছে খোকাবাবু।

—কি হয়েছিল?

কনের দিকে নজর গেল—কনের পরনে কাপড় নেই, কাপড়খানা পুড়ছে দূরে।

গরুগুলো ঐ কল ঘুরুতে ঘুরুতে হঠাৎ দৌড় মারে—কনে অতটা বুঝতে পারে নি, দিশাহারা হয়ে ঐ খোলার আগুনের একেবারে ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়, আগুনে জ্বাল দিচ্ছিল কাতু বিশ্বাস—সেও অতটা লক্ষ্য করে নি, হঠাৎ দাউ দাউ ক'রে কনের কাপড়ে আগুন লেগে যায়। যাই হোক্, মেয়েটার বুদ্ধি আছে মানতে হবে—নিমেষের মধ্যে কাপড়খানা খুলে ফেলে দিয়ে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, না হ'লে যে কি হ'ত।

এ ব্যাপার বাড়ীতে ত শুনতে পাবেই—আমার কপালেও মার আছে যা দেখছি!

—'তুই এখানে এইচিস্ কেন?' আমি রেগে বললাম।

—'এমনিই।'

কনে রীতিমত হাঁপাচ্ছে, এখনও ওর ভয় কাটে নি। ওর আড়ষ্ট মুখখানা দেখলে মায়া হয়।

'চল এখন অমনভাবেই চল', বলে পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলাম। মেয়ে দোষ করবেন আবার পেটভরা রাগ আছে দেখ। মেরেছি বলে বলছেন কিনা ছেড়ে দাও, আমি তোমার কাছে যাব না, আমি একলাই যাব।

পিঠে আর একটা কিল বসিয়ে দিলাম।

এবার আর রাগ করলে না, কাঁদলেও না, দুই চোখ মেলে আমার দিকে অভিমানভরে তাকিয়ে রইল। সে চাউনি আমি আজও ভুলি নি। আজকে যখন চলে আসি, আজও সেই ভাবেই চোখ তুলে সেই ব্যথামাখান দৃষ্টি দিয়েই আমাকে আজকে থাকতে অনুরোধ করেছিল। কোন দিনই আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মারতে পারি নে। সেদিন অতি কষ্টেই তাকে মেরেছিলাম—কিন্তু ওর চাউনিতে আমি পরক্ষণেই ভাবলাম—'সত্যি ও নিজেও ত কম কষ্ট পাচ্ছে না, ওর সাধের ডুরেখানি পুড়ে গেল! কত কষ্ট করেই না ডুরেখানি আদায় করেছে ওর মায়ের কাছ থেকে—নইলে এই বয়সে কি কেউ কাপড় পরে, না পরতে পারে—কনের সবই সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু কাপড় আর হয়ত পাবে না। কনেকে আদর ক'রে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম—'লক্ষী বোনটি আমার, কাঁদে না—আমার রাগ হয়েছিল বলেই ত মেরেছি!'

আমার আদরে প্রথমে ওর ঠোঁট দুখানা থর্-থর্ ক'রে কেঁপে উঠল, তার পর কান্নায় সে ফেটে পড়ল। কনেকে থামাতে গিয়ে সেদিন আমিও কেঁদেছিলাম। আহা কেনই বা মারলাম ওকে, ছেলেমানুষ বইত নয়! সত্যি এমন দিনও ছিল যেদিন কনের কান্না সইতে পারতাম না।

আমি সহরের হাই স্কুলে পড়ছি—পড়ছি সেকেণ্ড ক্লাসে। কনে এখন বেশ বড় হয়েছে—ঠাকুরমার রূপকথা, ঠাকুরদার ঝোলাঝুলি সব পড়ে ফেলেছে, সেই চঞ্চলতা অনেকটা নিভে এসেছে। আমি কনেকে মাঝে মাঝে ভাল বই এনে দিতাম, যেসব গল্প ভাল লাগত সেগুলো ওকে পড়িয়ে শুনাতাম। কাউকে পড়ে শুনাতে আমার চিরকালই ভাল লাগে। কিন্তু কনে আমার পড়া যত না শুনত আমার দিকে এক ভাবে তাকিয়ে থাকত তার চেয়ে বেশী—আমার এমন লজ্জা হ'ত: আমার বয়স তখন ষোল কি সতের। কনের তাকিয়ে থাকাতে আমি যেন কেমন হয়ে যেতাম। কিন্তু ও এমন সরল ছিল। একদিন একখানা ছবি দেখিয়ে বললাম—'তোর মত দেখতে কনে—'

কল্যাণী মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, শেষে বলে —'কই, দেখি দেখি—সত্যিই শিবুদা',—কল্যাণী খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

ওর কানটা একটু টেনে দিয়ে বললাম—তোর একটু লজ্জা নেই কনে, নিজের চেহারা কি অমন ভাবে দেখতে হয়; যাঃ যাঃ, সর বাড়ী যা।'

কনে একটু লজ্জা পেয়েই গেল। কল্যাণী যখন লজ্

ক'রে মুখচোখ রাঙা ক'রে চলে যেত—তখন আমার চোখে এক অপূর্ব্ব মুগ্ধতা জড়িয়ে পড়ত।

নানা কাজের ফাঁকে কনে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসে; আমাদের বাড়ীতে এসে কোন সময় বা আমার চোখ টিপে ধরে, কোন সময় বা আমার বইপত্তর গুছিয়ে দেয়।

কল্যাণী আজকাল বড় দুষ্টু হয়েছে—আমাকে বলে কি যে, 'আমাকে কনে বলে ডেকোনা, আমার নাম কল্যাণী।' আরও একদিন বলে, 'দেখ, ও রকম তুই মুই করে আমাকে ডাকলে আমি কথা বলব না।' কল্যাণীর এই কথাগুলি শুনতে আমার ভারী ভাল লাগত—কথা বলার সময় ওর চোখদুটো এমন সুন্দর নাচত! তবুও ওকে আমি সরিয়ে দিতাম—যা যা, ভারী লজ্জা হয়েছে—তোর কত বড় আমি জানিস্।'

'এঃ ভারী বড়।'

'না, বড় না, তোমার কাছে আমি হিসেব নেব। আচ্ছা কল্যাণী, কল্যাণী কল্যাণী এই ত ডাকলাম—যাও দিকিন এবার দিদিমার কাছ থেকে এক বাটি মুড়ি নিয়ে এস।'

এখানকার পড়া আমার সাঙ্গ হ'ল, কলকাতা যাব কলেজে পড়তে—আর কারও জন্য তেমন ভাবি না, ভাবতাম কেবল কল্যাণীর জন্যে। হয়ত আর মামার বাড়ী আসব না—বাবা বদলী হয়ে যাচ্ছেন কলকাতা—কাজেই সেখানেই থাকব।

সেটা ছিল আষাঢ় মাস, সন্ধ্যা থেকে অশ্রান্ত জল ঝরছে, এতটুকু বিশ্রাম নেই। আকাশে ভীতিপ্রদ মেঘের আর্ত্তনাদ নেই বটে, কিন্তু এই অবিরাম ধারাপাতও আর ভাল লাগে না। বাইরের ঘরের বারান্দায় বেঞ্চের উপর গিয়ে বসলাম। ঘরের ভেতরকার আলোটা নিভিয়ে দিলাম। এই অন্ধকারের ভেতর থেকে গ্রামটাকে দেখতে বেশ লাগে। সামনের পথটা চলে গেছে ঘাটধার পর্য্যন্ত, পথে দুধারের কিশোর গাছপালাগুলো এসে জড়াজড়ি ক'রে পড়েছে। কোথাও আলোর চিহ্ন নেই—কেবল কোথাও কোথাও জলের ধারা সেই অন্ধকারের মধ্যেও চিক্‌মিক করে ওঠে। কোনও বাড়ীর সাড়াশব্দ নেই।

বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমাদের বাড়ীর ভেতর চলে গেল কল্যাণী। এমন ক'রে বৃষ্টিতে কেউ বেরোয় নাকি! কনের সবই সৃষ্টিছাড়া, মাথায় তার একখানা লাল গামছা জড়ানো, আঁচলটা জড়িয়ে কোমরে পরেছে, মাথায় বেঁধেছে ঐ গামছার ওপরেই কিষাণদের টোকা। কনেকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু! বাড়ীর ভেতরকার কাজটা সেরে কনে চলে যায়—আমাকে একটুও লক্ষ্য করে না। ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপনমনে বললাম—'যাক্, কাল আমি কলকাতা চলে যাব—'

—'তা মানুসে জানে' কনের জবাব এল—কিন্তু কনে থামে না। আমিও এর শাস্তি দিতে জানি, আমি বললাম,—'মানুষে টের পাবে মজাটা যখন আর আসবো না ফিরে।'

কনের পা বোধ হয় বৃষ্টির জলে আটকে গেল, সে পেছনে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'ইস্।'

'ইস্ বৈকি—মামাবাড়ী বুঝি কেউ চিরকাল থাকে, তা ছাড়া বাবা কলকাতা যাচ্ছেন তা বুঝি আর মানুষে জানে না।'

কল্যাণী এবার আর অবিশ্বাস করতে পারে না: সে ফিরে এসে টোকাটা মাথা থেকে নামিয়ে কাঠের খুঁটিটার গায়ে তার বাঁ গালটা রেখে বলে, 'আমি ত আর সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছিলাম না, আমি কেবল দেখছিলাম—'

—'থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না—পাজী মেয়ে—' আমি রেগে ওখান থেকে উঠে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলাম।

সে ওখানে কতক্ষণ একা একা দাঁড়িয়েছিল জানি না: যেমন কাঁদুনে মেয়ে, হয়ত খানিকক্ষণ কেঁদেই ছিল। কনে ভয়ঙ্কর অভিমানী—সকালে আমি যখন চলে আসি তখন সবাই ঘাটের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু কনে আসে নি। একবার মনে হ'ল, যাই ওকে ডেকে নিয়ে আসি—কিন্তু তারও যেমন রাগ আমারও তেমন রাগ আছে। ও ঐরকমই—জানছে হয়ত ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না, তবুও শেষবারটির জন্য দেখা করবে না: ওকে বুঝে উঠতে পারলাম না অথচ ছোটবেলা থেকে আমার সঙ্গেই ও বেশী মিশেছে।

রেগে আমিও দেখানা ক'রে এলাম বটে, কিন্তু পথে মনস্থির করতে পারিনে: কালকেপুর থেকে ষ্টেশন প্রায় তিন মাইল হবে—হেঁটেই আসতে হয়। এই সারাটা পথ কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি—হে ভগবান্, ট্রেনটা আমার ফেল করে দাও। কি জানি কেন ভগবান্ প্রার্থনাটা শুনলেন। গাড়ীটা আমি সত্যিই ধরতে পারলাম না। ওঃ সেদিন গাড়ী ধরতে না পেরে কী আনন্দই যে হয়েছিল আমার। সেদিন দুপুরে আর রাত্রে কল্যাণীদের বাড়ী আমার নিমন্ত্রণ ছিল: আমার সামনে কল্যাণী বসে বসে গল্প করে, পাখার হাওয়া করে আর এটা খেয়ো না, ঐটা খাও, ওটা খেয়ো না অমুকটা খাও, বলে কতকালের বুড়ীর মত আমাকে নির্দ্দেশ দিতে লাগল তা আর কি বলব—কালকের রাগের সুদশুদ্ধ শোধ দিয়ে তবে ছাড়ল। কনে সত্যিই আশ্চর্য্য ধরণের: এই জন্যেই গ্রামের লোকে ওকে বলে—'পাগলী মেয়ে।'

কলকাতায় কলেজে ভর্ত্তি হলাম। আমাদের কলেজে সহশিক্ষা ছিল। প্রথম প্রথম আমার ভারী অসুবিধা হ'ত, কিন্তু ক্রমশঃ সেটা সামলে নিলাম: কলেজে এক কোণে বসে প্রফেসরের পড়াশুনা শুনে বাড়ী যেতাম, ব্যাস্। অত মেয়ে ত দেখতাম, কিন্তু কই একজনকেও ত কল্যাণীর মত দেখতাম না। আমাদের সঙ্গে পড়ত একটি মেয়ে, তার নামও কল্যাণী, নাম শুনে তাকে আমার প্রথম প্রথম ভাল লাগত—কিন্তু দূর ছাই কল্যাণীর নাম কি এদের মানায়! নিতান্ত জোর ক'রে নাম দেওয়া, আর কিছু নয়। দেখে আসুক কালকেপুরে আমাদের কল্যাণীকে—ভুল ভেঙে যাবে।

দশমীর দিন।

চন্দনার ভেতর কত নৌকো চলেছে প্রতিমা নিয়ে। কত দূর-গ্রাম থেকে এসেছে লোকে মেলা দেখতে। একটা হল্লার ভেতর দিয়ে নৌকো ভেসে চলেছে। কিন্তু এক নিমেষে সমস্ত কল-কোলাহল নিভে গেল—যখন প্রতিমা-গুলো বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। নদীর সেই মুহূর্ত্তের জলটুকু স্পর্শ করবার জন্য মানুষের কি সুন্দর ব্যাকুলতা। কত পবিত্র এই নদী এখন। নদী শুব্ধ, কিন্তু প্রতিটি জলকণার ভেতর কি অসম্ভব চঞ্চলতা আর গতিবেগ, সেখানে যেন প্রত্যেকটি অণু নেচে নেচে চলেছে। তারপর আরম্ভ হ'ল আলিঙ্গনের পালা—কোলাকুলি। আজকের দিনে শত্রু নেই, সকলেই সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরছে—কী চমৎকার প্রথা! সব মানুষের মন যেন এক হয়ে গেছে। পৃথিবীর হিসাব নিকাশ প্রাত্যহিকের দেনা-পাওনা মন-কষাকষি সব ভুলে গেছে মানুষ। গৃহে গৃহে উৎসবের ঢেউ। মায়েরা দিদিরা আশীর্ব্বাদ প্রদানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। তাঁদের অতি যত্নে তৈরী করা নাড়ু, মুড়কি, মোয়া দিয়ে মুখ মিষ্টি করালেন। নিতান্ত দিন চলে না যার, তার বাড়ীতেও এমনি আড়ম্বর। সহর থেকে ফিরে এসে গ্রামকে যেন আবার নতুন ক'রে চিনতে পারলাম।

জ্যোৎস্না ফুট্ ফুট করছে, সেই সন্ধ্যা রাত্রের উচ্ছ্বাস এখন আর ততটা নেই। আমার তখনও কনেদের বাড়ীতে যাওয়া হয় নি, মাসীমাদের তখনও প্রণাম করা হয় নি—ইচ্ছে ক'রেই কনেদের বাড়ীতে যেতে দেরী করলাম।

কনেদের বাড়ীর সামনে একটা ছোট মাঠ আছে—আমরা সেখানে ফুটবল খেলতাম। খুব সবুজ আর নরম ঘাস, খেলতে খেলতে কতদিন যে ঐ ঘাসের ওপর লুটোপুটি খেয়েছি! সেই মাঠে একা দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী, যেন কার প্রতীক্ষায় আছে সে! এমন জ্যোৎস্না রাত্রে অমন সুশ্রী মেয়েকে এই শ্যামল ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী যে ভাল লাগে চোখে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে অভিমানের সুরে অথচ ধীরে ধীরে বলে 'এতক্ষণে তোমার আসবার সময় হ'ল বুঝি!'

আমি বললাম—'এই চুপ, রাগ করবার দিন আজ নয়

কনে হেসে আমাকে প্রণাম করে। এই প্রথম কনে আমার পায়ে মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। কী অপূর্ব্ব তার প্রণাম করবার ভঙ্গি! আমি তার হাত ধরে তুলে বললাম—'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মেয়ে, দাঁড়া তোর জন্যে এবার একটা ভাল বর খুঁজে নিয়ে আসব, কেমন?'

'আচ্ছা আচ্ছা, থাক, এখন চল বাড়ীর ভেতর, মা ব'সে আছেন—বার বার ক'রে বলছেন তোমার কথা।'

কল্যাণী আজকাল খুব চমৎকার কথা বলতে পারে আগে কথা বলত, তখন কথার ভেতরই সে ডুবে থাকত

আর আজকালকার কথা বলার ভেতর তার অন্যমনস্কতা এত বেশী যে মনে হয়, সে কথা বলছে না ; এই অন্যমনস্কতা এত ভাবিয়ে তোলে মানুষকে!

আমার হাতে একটি সোণার আঙটি ছিল, কী দুর্ব্বুদ্ধি হ'ল, ধীরে ধীরে সেটাকে আঙুল দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিলাম—মাটিতে।

'তোমার আঙটিটা যে পড়ে গেল, বলেই কল্যাণী আঙটিটা তুলে আমার হাতটা তার হাতের ভেতর নিয়ে ধীরে ধীরে আঙটিটা পরিয়ে দেয়।

কল্যাণীকে বললাম 'তোমার মনে পড়ে কনে এই মাঠে ছোট বেলায় একবার একটা বল আমার মুখে লাগে আর রক্ত পড়তে থাকে—তুমি তাই দেখে কেঁদেকেটে কী কাণ্ডই না করেছিলে!'

'হ্যা তেমন ছোটও আর হতে পারব না—তাই কথায় কথায় লোকের জন্যে চোখের জলও আর ফেলতে পারব না ; তুমিও তো আর চোখের জল মুছিয়ে দেবে না—

কিছুক্ষণ চুপ থেকে কনে বলে—'সে যাকগে, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না—চল মাকে প্রণাম করবে চল।'

সেবার এসে সেই যে গেলাম আর কোনদিন কাল-কেপুর যাই নি—তার পর বি-এ, এম্-এ পড়লাম, সন্ন্যাসী হলাম, কিন্তু কল্যাণীকে আর খুঁজে পাইনি জীবনে। তাই মনে হয় এতদিন পর যদি বা দেখা হ'ল—কল্যাণী যদি বা আমাকে চিনল তবুও এমন ক'রে গোপন থেকে গেল কেন—সে ত জানে জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না। আমি না হয় সাধু মানুষ—অনায়াসে অতীতকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু কল্যাণী কী ক'রে তার শিবুদাকে অনায়াসে ভুলে যেতে পারে—

কিন্তু তার দোষ দিই কি ক'রে। সে সন্ন্যাসীর সামনে ভুল ক'রে পান সেজে এনেছিল—তাকে যা বলেছিলাম বলে দুঃখ পেয়েছিল—সুনন্দাকে সে-ই শিখিয়ে দিয়েছিল আমাকে 'মামা' বলে ডাকতে। আমি যখন সেই সম্বন্ধই গ্রহণ করলাম তাতে তার কি আনন্দ। আমি সত্যকার সন্ন্যাসী হয়ত হইনি মনে ক'রে সে কত সুখ পায়ঃ সে ত সন্ন্যাসীর জন্য অত ভোরে উঠে চা তৈরী করেনি, সে করেছে তার শিবুদা'র জন্য। শিবুদাকেই সে বারণ করেছিল ভরা পূর্ণিমায় পা' না বাড়াতে। আশ্চর্য্য! অথচ আমাকে বলে কিনা 'কোথায় আর দেখবেন।'

মন চমকে ওঠে, এ কি, আমি না সন্ন্যাসী।

বেলা বেশ বেড়ে উঠেছিল। পথের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় বসে যোগবাশিষ্ঠের ডোর খুললাম।

দাঁত

(গল্প)

শ্রীভবেশ দত্ত

কি ঝড় কি বৃষ্টি সব কিছু অগ্রাহ্য ক'রে যে লোকটি রোজ সকাল-বিকাল বড় রাস্তার পাশে বুড়ো-বট গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে কৃত্রিম দাঁড়ি-গোঁফ লাগিয়ে যাত্রাদলের রাজার মত পোষাক প'রে একটা আধা-ভাঙা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে দাঁতের মাজন বিক্রী করে সে চিন্তাহরণ।

চিন্তাহরণের পৃথিবীতে দুটি মানুষ আছে। একটি তার স্ত্রী বকুল আর তার তিন বছরের ছেলে দুঃখহরণ।

তার অর্থ নেই, সামর্থ্য আছে। ঐ মাজন বিক্রীর ওপরেই তার এই ছোট্ট সংসারের পাতার নৌকো তিনটে যাত্রী নিয়ে ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলে বেড়ায়।

ভগবানকে সে বিশ্বাস করে না। তার ধারণা,

পৃথিবীতে হাত-পা-ওয়ালা ভগবান নামে কোন লোক নেই। তার মতে ভগবানও যা ভূতও তাই। ভগবানও অত্যাচার করে, ভূতও অত্যাচার করে। ও ছুটোই সমান। তাই রাগের মাথায় মাঝে মাঝে ভগবানকে হতভাগা ও রাস্কেল ব'লে গালাগালি দেয়।

উপায় নেই। পাতার নৌকো। তিনটে যাত্রী। পথে ঝড়। পাল নেই।

সেদিন চিন্তাহরণ বাড়ী এসে দাড়ি-গোঁফ খসাতে খসাতে বললে—রাস্কেলটার জ্বালায় আর পারি নে; হতভাগাটা এত কষ্টও দিতে পারে।

বকুল তার কথা শুনে তাড়াতাড়ি এসে বললে—আবার কি হোল!

সে মুখ বিকৃত ক'রে বললে—কিছু নয়, তোমার ঐ বেকুব ভগবানটাকে একটু ওয়ার্নিং দিচ্ছিলাম।

—দিন দিন তোমার যে কি হচ্ছে, ঠাকুর-দেবতার নামে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সে বলে ওঠে—চুপ্! আচ্ছা বকুল, তোমার ঐ কাচে আঁটা লক্ষ্মীঠাকরুণ আর ওই নেকেড্ কালী আমাদের খেতে দিতে পারে? পারে একটা ভাল কাজ জুটিয়ে দিতে যাতে আমি তোমাদের নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কোরতে পারি. তা পারে না ওরা—

বকুল কথা বলে না—শুধু বলে—এসো নেয়ে খাবে এস।

—বা রে! তুমি কি রান্না কোরলে! চাল পেলে কোথায়?

—তুমি এস তো তার পর বলছি।

খেতে ব'সে চিন্তাহরণ বোলে ওঠে—সে রাস্কেলটা কোথায়?

—কে!

—তোমার দুঃখহরণ গো! তার কি ক্ষিদে তেষ্টা নেই—

—সে খেয়েছে—

—যাক! পরে থেমে বলে—বকুল, মাঝে মাঝে তোমার ঐ প্রেমিক ভগবানকে গালাগাল্লি দেই বলে তুমি আমার ওপর রাগ করো। কিন্তু কি কোরব বলো। সহরের লোকগুলো একেবারে হতচ্ছাড়া। সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে যে এত চীৎকার করি—একটা লোকও কি এক কৌটো মাজন নিতে পারে না? একটা মাজন নিলে এমন কি ক্ষতি তাদের হয়—শুধু আমাকে সাহায্য করা ছাড়া তো আর কিছুই নয়? আমাদের ব্যথা কেউ বুঝবে না। কিন্তু তুমি দেখে নিও সব বেটার পাইওরিয়া হবে।

বকুল অতি দুঃখেও একটু হাসলো।

খাওয়া হয়ে গেলে বকুল পান দিতে দিতে বললে—আজ ক' দিন থেকে বলছি দাঁতের ব্যথাটা আবার বেড়েছে, একটু ভাল ওষুধ দাও, তা তোমার কানেই যায় না।

চিন্তাহরণ বললে—ঐ মাজনটা দিয়ে দাঁতগুলো বিকেলে একবার মেজে ফেলো। বলো কি, সকলের সারছে আর তোমার সারছে না?

বলতে বলতে সে আবার সেজেগুজে বেরিয়ে গেল।

পাড়ার মেয়েরা এসে বিকেলে জটলা করে বকুলের কাছে—

সবাই এসে নালিশ জানায় যে তার স্বামী যে মাজন বিক্রী করে, তা একেবারে বাজে, কোন কা[illegible] হয় না।

একজন বললে—একটা নয়, দুটো নয়, আট-আটটা কৌটা কিনলাম তাও যদি একটু সারে।

বকুল লজ্জিতা হয়।

বলে—কেন ভাই, আমার তো একেবারে সেরে গেছে, কি যন্ত্রনাই যে আগে হোত, কিছু খেতে পারতাম না। তার পর ঐ ওষুধেই তো সেরে গেল।

বকুল মিথ্যে কথা বলে।

আর একজন বললে—ফাঁকি দিয়ে পয়সা নিয়ে কি যে লাভ তা বুঝি নে। পয়সার যদি এতই অভাব ভিক্ষে করলেই হয়, অমন মানুষ ঠকানো কেন।

বকুল কাঁদে—

দুঃখহরণ দুঃখ বোঝে না—

অদূরে চিন্তাহরণের গান শোনা যায়—

চিন্তামণি দাঁতের মাজন
দাঁত মাজিবেন স্মরণ করি—
এ মাজনের এমনি মজা
কড়মড়িয়ে মটর ভাজা
কাজ ফেলে খায় বুড়োবুড়ী।

বকুলের চোখের জলে সারা বিকেল ধুয়ে যায়।

নামে সন্ধ্যা—

চিন্তাহরণ আসে—

সে কেঁদে ওঠে।

চিন্তাহরণ জিজ্ঞেস করে—দাঁতের ব্যথাটা কি সত্যিই বাড়লো বকুল?

বকুল কাঁদতে কাঁদতে বলে—সবাই বলে তুমি লোকের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে পয়সা নাও!

—কে বলেছে? পাড়ার লোক তো? ওদের আমি সবাইকেকে চিনি—ওরা এক-একটা খুনে ডাকাত।

কিন্তু কথাটা ক্রমে ক্রমে এ পাড়া ও পাড়া ক'রে সমস্ত সহরটা ছড়িয়ে পড়লো যে চিন্তাহরণ ফাঁকি দিয়ে পয়সা নেয়।

বকুল শুধু বলে—লোকে বলে তুমি চোর!

—বেশ আমি চোর, তুমি চোরের বৌ! বকুল, লোকের কথায় কান দাও কেন? তুমি জানো আমার মাজনের বড় বড় সার্টিফিকেট আছে। ওর ভেতর কত জিনিষ আছে লোকে তা জানে? এ যুদ্ধের বাজারে লোকসান তো আমারই, তা তো আর লোকে বুঝবে না!

—আহা! আজ আমায় দেখাতে হবে তুমি কি কি দিয়ে মাজন তৈরী করো। চলো আমি দেখবো।

—না বকুল, ঘরে তুমি যেতে পারবে না—সে সব মস্ত ব্যাপার, কত রকম জিনিষ—শেষে তারটার ছুঁয়ে একটা সর্ব্বনাশ বাধাবে।

—দাঁতের মাজন তৈরী করতে বুঝি তারের দরকার হয়?

—এটা বিজ্ঞানের যুগ, চুপ করে থাকো।

বকুল চুপ করল।

পাতার নৌকো এইবার বুঝি ডুবলো—

পাড়ার লোকে তাকে ভয় দেখালো, তাকে পুলিশে দেওয়া হবে।

কিন্তু তার সংসার আছে, ব্যবসা বন্ধ হোলে সবাইকে অনাহারে মরতে হবে। তাই সে নিত্যই মাজন বিক্রী করে।

দিন দুই পরে পাড়ার লোকে যখন দল বেঁধে তার বাড়ী এলো তখন সে সত্যিই ঘাবড়ে গেল।

সে বাইরে যেতেই সবাই তাকে গালাগালি দিতে লাগল।

একজন এসে ঠাস্ করে তার গালে একটা চড় মারলে—

মুখ থেকে দুপাটি বাঁধানো দাঁত মাটিতে পড়ে গেল।

যে যা পারলো দু-এক ঘা বসিয়ে দিয়ে শাসিয়ে গেল, এবার মাজন বিক্রী কোরলে সত্যি সত্যিই তাকে পুলিশে দিয়ে দেবে।

বকুল ইত্যবসরে তার ঘর খুলে দেখলে যে ঘরের মধ্যে তারটার কিছুই নেই। ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে একঝুড়ি কাঠকয়লা আর কতকগুলো কাগজের বাক্স। সে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখে চিন্তাহরণ মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সামনে পড়ে আছে দুপাটি দাঁত।

বকুল বোললে:—এসো ঘরে যাই!

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে:—বকুল, তোমার দাঁতগুলো কাল একবার ডাক্তারকে দেখাতে হবে।

বকুল তাকে নিয়ে ঘরে বসাতেই দুঃখহরণ কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেঁদে উঠে বললে:—মা আমার সেই পোকায় খাওয়া দাঁতটা পড়ে গেছে, কি হবে মা, আর দাঁত উঠবে না?

বকুল চিন্তাহরণের দিকে চেয়ে শুধু বললে:—উঠবে বৈকি—দাঁতটা ইঁদুরের গর্ত্তে রেখে এসো—

কবিতা

নিউ রোমান্তিক

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নসহর কথা ক'য়ে ওঠে অনেক রাতে,
আদিম রাত্রি আনে অরণ্য অভিজ্ঞান,
নিঝুম নিশীথে ঘুম মেয়েদের বাজে নূপুর।
শুন কান পেতে :
অবচেতনায় নব প্রভাতের ঐক্যতান।

ম্লান গ্যাস আলো মৃত রাজপথ প্রেত প্রহর,
মধুর স্বপ্নে পেশীরা ঘুমায় বস্তিনীড়ে,
নীল শেড্-এ কাঁপে সোফায় শায়িত নরম বুক।
দেখ চোখ চেয়ে :
কুটিরে কুটিরে সাত মহলায় মিতালি চলে।

শবরী শয্যা যদি এনে দেয় জাগর চোখ,
দেখবে তখন প্রাক্তনী সেই প্রতিফলন :
সীমিত পৃথিবী হলো সমতল সীমানা নেই,
লোভের প্রাচীর শোষণের সেতু গিয়েছে ভেঙে
বিভেদ লীন।

স্বপ্নসহরে স্বর্গ নেমেছে :
মানবসংঘ পারিবারিক।
দিনের সহর প্রাক্-ইতিহাস :
দুঃস্বপন ভাব্‌বে ধিক।

পাখী*

শ্রীমঞ্জু দাশ

নীল আকাশেতে পাখী উড়ে যায়।
পৃথিবীর পানে সে তো ফিরিয়া না চায়॥
কোন সাগরের পারে বুঝি যাবে।
আপনার মনে আপনি গাহিবে॥

কেহ না জানিবে, কেহ না শুনিবে।
আপনার মনে আপনি গাহিবে॥
সন্ধ্যা বেলায় ফিরে চলে যাবে।
আপনার ঘরে নীরবে॥

---

*[এই কবিতাটি আধুনিক যুগের খ্যাতনামা কবি জীবনানন্দ দাশের দশ বৎসর বয়স্কা কন্যার লেখা প্রথম কবিতা। সম্পাদক 'মাতৃভূমি']

নীল বন

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার চোখেতে যদি নেমে আসে চুপে চুপে
সেদিনের মেঘনীল বন,
রাত্রির ছায়া-ঢাকা অন্ধকারে,
যদিই আঘাত আসে বন্ধ দ্বারে,
তুমি কি ফেরাবে তারি বন্ধনারে,—ঠিনিকি ঠনন্;
বাজায়ে কাঁকন দুটি ঠিনিকি ঠনন্,
যদি নামে মেঘনীল বন?

দূর অতীতের পথে চলতে কেন যে তুমি
আল্‌গা চরণরেখা আঁকলে
আমার সকল মোহ ঢাক্‌লে;
আজ বুঝি বৃথা করা শোক
সেই ক্ষণিকের নেশালাগা চোখ,
সেই অগনিত জনতার লোক
সেই মিথ্যার ঘন নির্মোক
শেষ হোক আজ শেষ হোক,
যদি নামে মেঘনীল বন,
তোমার চোখের কোণে শিথিলিত ইসারায়
যদি নামে মেঘনীল বন!

ধূসর পাহাড়ে কবে সন্ধ্যার রাঙা রঙে
অস্তরবির হোল মিতালী
তুমি গেয়েছিলে তারি গীতালি
অকরুণা গেয়েছিলে গীতালি

আজ সেই স্মৃতিগুলি, ছোট ছোট হাত খুলি
আমারি দুয়ারে কর হানে যে
বুঝি না তো এর কোন মানে যে!
যে-জীবন গ'লে গেলো ধবলা গিরির শিরে,
যে-জীবন হ'রে গেলো 'গোবি'তে
অক্ষম হাত তুলি, কেন উঠি চঞ্চলি'
ব্যর্থ আশায় তারে লভিতে,
এ-যেন তোমার চিঠি—,আঁকাবাঁকা কতো লেখা
কিন্তু কোথাও নাম সই নাই,
এ-যেন বিপুল খোঁজা মরু মেরু পার হ'য়ে
কিন্তু কোথাও খোঁজ লই নাই!

তোমার চোখেতে যদি নেমে আসে চুপে চুপে
সেদিনের মেঘনীল বন;
রাত্রির ছায়াঢাকা প্রান্তরেতে
যদিই আবার গান ওঠেই জেগে,
তবুও কি বাতায়ন বন্ধ হ'বে,
অন্ধ নিয়তি আরো অন্ধ হ'বে
ঝ'রে-যাওয়া শেফালীর গন্ধ রবে
ম'রে-যাওয়া পবনের বক্ষ 'পরে,
—বাজবে কি বজ্রের ঝননো ঝনন্?
যদিই তোমার চোখে নেমে আসে চুপে চুপে
সেদিনের মেঘনীল বন,
জ্যোৎস্না জড়ানো নীলবন,
আমাদের ছোট নীলবন?

সঞ্চয়ন

(বিদেশী পত্রিকা হইতে)

১৯৪২ খৃস্টাব্দের বল্কান

গত নবেম্বর মাসে মিশর এবং লিবিয়ায় রোমেলের মত একজন বিখ্যাত সমর-কৌশলী জার্মান সেনাপতির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ ও সাম্রাজ্যিক অষ্টম বাহিনীর দ্রুত সাফল্যে সারা বল্কানে এবং অন্যত্রও গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল। হিটলারের সেনানায়কদের মধ্যে জনগণের কাছে তিনি যে সব চেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন, তার মধ্যে হয় ত অস্বাভাবিক কিছু নেই। বল্কান্ রাষ্ট্রগুলোর ভৌগোলিক সংস্থিতির ফলে মিশরের এই বিশেষ যুদ্ধটির ফলাফলের সঙ্গে তাদের কম বেশী প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল; কিন্তু ইতিপূর্বেও এই মরু অঞ্চলে আমরা শব্দ-বহুল (যদিও কিছুটা ব্যর্থ) বিজয় লাভ করেছিলাম, বল্কানবাসীদের চোখে সাম্প্রতিক অভিযানের মধ্যে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছিল—তার কারণ বোধ হয় এই যে, ঠিক একই সময়ে ফরাসী উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় সামরিক উপকরণে সুসজ্জিত বহু সহস্র অ্যামেরিকান সৈন্য অবতরণ করেছিল। এই ঘটনাটাই সকলের চোখ খুলে দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে অন্যায় আনন্দ এবং আত্ম-সন্তুষ্টি যাতে উৎসাহিত না হয়, সেজন্য আমাদের স্মরণ রাখা উচিত গত তিন বছর ধ'রে নেতিবাচক অর্থ ছাড়া বল্কানে আমাদের কূটনৈতিক, সামরিক কিংবা অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা খুব প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—এই নির্মম সত্য দিয়ে বল্কানের বিস্তৃত অঞ্চলে এখনও যে বিশ্রী অবস্থা আছে তার অর্থ করা যায় বটে, কিন্তু কোনক্রমেই তার সমর্থন করা যায় না। সরল পরিস্থিতিটা এই যে জার্মানরা ১৯৪১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকের মত এখনও তুরস্ক ছাড়া আর সব রাষ্ট্রেরই কর্তা; প্রকৃত পক্ষে আর কোন পরিবর্তন হয় নি—অন্তত উপরে ত দেখা যাচ্ছে না। আমরা মোহ-মুক্ত কুইস্লিংদের কথা শুনি—বিশেষ করে গ্রীসে এবং ভীষণ স্থানীয় বিভেদের কথাও শুনি—যেমন ক্রোসিয়ায়, কিন্তু এর ফলে জার্মানদের দৃঢ়-মুষ্টি শিথিল না হয়ে বরং দৃঢ়তর হবে।

জাপানের অতর্কিত তীব্র আক্রমণে অ্যামেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের যুদ্ধে প্রবেশ এই যুদ্ধের একটা অর্থপূর্ণ ঘটনা; তখন থেকেই এ যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর হাওয়াইয়ের পার্ল-হার্বারে অ্যামেরিকানদের উপর জাপানের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণে অ্যামেরিকান্ ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পরদিনই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। তার পরেই নববর্ষের প্রথমে এসেছিল কখনও কখনও ওয়াশিংটনের ঘোষণা নামে পরিচিত ঘোষণা-পত্র। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী হোয়াইট হাউস্ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, চীন এবং অন্য বাইশটি অক্ষশক্তি-বিরোধী সেই ঘোষণা-পত্রে সই করেছিল এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল যে জার্মানী, ইটালী, জাপান এবং তাদের সাহায্যকারীদের বিরুদ্ধে তারা তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করবে; তারা পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং শত্রুর সঙ্গে ভিন্ন শান্তি কিংবা যুদ্ধ-বিরতি করবে না—এমন প্রতিশ্রুতিও তারা দিয়েছিল। ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে "সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহ" এই চুক্তি সম্পাদন এবং সই করেছে—তার পরে এই নামটি যথেষ্ট চালু হয়েছে—নিঃসন্দেহে এই নামটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে, যদিও বর্তমানের অনিশ্চিত অবস্থায় কত দিন এই ঐক্য টিঁকে থাক[illegible] সে বিষয়ে প্রশ্ন ওঠার আশঙ্কা আছে। তখন এই ঘোষণাটি অতলান্তিক সনন্দের (Atlantic Charter) মূল্য বাড়িয়েছিল; এই সনন্দ সদিচ্ছা-প্রণোদিত এবং সুন্দর শব্দবহুল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছুটা অস্পষ্ট। ভাবী জগতের পরিকল্পনা[illegible] আরও পরিপূর্ণতা ও সারবত্তা যোগের প্রয়োজন আছে।

উল্লিখিত ওয়াশিংটন ঘোষণায় অংশ গ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বল্কানের দুটো রাষ্ট্রও ছিল—গ্রীস এবং যুগোস্লাভিয়া। এই উভয় রাষ্ট্রেরই লণ্ডনে কার্যকরী অক্ষ শক্তি-বিরোধী গভর্ণমেণ্ট ছিল (এখনও আছে)—যদিও তাদের দেশ ছিল (এবং এখনও আছে) জার্মানী এবং অথবা ইটালীর অধিকারে। অন্যান্য বল্কান রাষ্ট্রের মধ্যে রুমানিয়া পুরোপুরি জার্মানদের অধীনে ছিল এবং এখন

আছে—শুধু উপরে একটু ছদ্মবেশ আছে; অক্ষ-শক্তির মধ্যে রুমানিয়ার স্থান হাঙ্গেরীর মত তত ভাল নয়। গতবছরের প্রথম থেকেই দুটো রাষ্ট্রই খোলাখুলিভাবে পরস্পরের শত্রু ছিল এবং ট্রান্সিলভিনিয়া ঘটিত বিবাদের ফলে এখনও তাদের শত্রুতা আছে। রুমানিয়ার চেয়ে হাঙ্গেরী কিছুটা বেশী স্বাধীনতা (অবশ্য একথাটা যদি প্রয়োগ করা যায়) ভোগ করত—কিন্তু সৈন্য, সমরোপকরণ এবং খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যাপারে উভয় রাষ্ট্রই জার্মান প্রভুদের আদেশ মেনে চলত—অবশ্য তার প্রতিবেশীদের চেয়ে রুমানিয়াকেই ত্যাগ স্বীকার করতে হ'ত বেশী। রুমানিয়ার জন-সংখ্যার আপেক্ষিক হিসাবের তুলনায় রুশ রণাঙ্গনে ১৯৪২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তার সৈন্য-সংখ্যা ছিল আশ্চর্যরকম বেশী—খুব সম্ভব তার বর্তমান সৈন্য-সংখ্যার চেয়ে ছয় ডিভিসন্ বেশী সৈন্য ছিল এবং গোটা ১৯৪২ খৃস্টাব্দ ধরে তার সৈন্যক্ষয়ও হয়েছিল প্রচুর। গত বৎসরের প্রথম দিকে এবং তার পরের কয়েকমাসও বল্কান-বাসীরা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল; অন্যান্য দেশবাসীদের মত তারাও রুশ-গভর্ণমেণ্টের সমর-শক্তি-বৃদ্ধি কিংবা সমর-শক্তির বহিঃপ্রকাশ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—সোভিয়েটের সমর-শক্তি সর্বপ্রকার ধারণাকেই ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এদিক থেকে বুল্গেরিয়ার অবস্থা কিন্তু অদ্ভুত রকমের; সে ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি গ্রেট ব্রিটেন্ ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল—কিন্তু সে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি—আজ পর্যন্ত এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। বুল্গেরিয়ার আন্তর্জাতিক রেকর্ড বিশেষ ভাল নয়—তবু আজও ইংলণ্ডে তার অনেক সমর্থক আছে বলে মনে হয়—আর কোন কারণ না থাকুক, ইংলণ্ডস্থিত ভূতপূর্ব বুল্গেরীয় রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিনিধিদের মনোরম ব্যক্তিত্বের আভাস এর মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও ভালুক ধরে হত্যা-করার আগে তার চামড়া ভাগ করার মতই এটা আমার কাছে মনে হয়, তবু যখন বর্তমান মহাযুদ্ধের গতি ফিরেছে বলে মনে হয় তখন এই মুহূর্তে প্রত্যেক বিবেচক লোকেরই বিচার করে দেখা দরকার এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে কি করে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং "নব বিধান" সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। সন্তোষজনক কোন প্রকার শান্তি স্থাপন কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে এবং আলোচনা ও মীমাংসার জন্য যে-সব কঠিন সমস্যার উদ্ভব হবে, তার মধ্যে বল্কান্ সমস্যাই প্রধান স্থান দখল করবে। পূর্ব-ইউরোপের প্রশ্ন মানেই এই বল্কান প্রশ্ন—বহুদিন ধরে ইউরোপকে এ প্রশ্ন উদ্বিগ্ন করে রেখেছে এবং যতদিন এ প্রশ্নের কোন স্থায়ী সমাধান না করা হয়, ততদিন এ উদ্বিগ্নতা থাকবেই। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটা বল্কান্ রাষ্ট্র-সঙ্ঘের (Balkan Union) কথাও বলা হয়ে থাকে। গত বৎসর এই অঞ্চলের ভিতরে, কিংবা আরও ভাল হয় যদি বলি এই অঞ্চল সম্বন্ধে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, তার আলোকে এ বিষয়ের বিচার করে দেখা ভাল। আগেই বলে রাখা ভাল যে, সেখানকার বেশীর ভাগ ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হচ্ছে আংশিক এবং সত্যকে সহজভাবে দেখা কিংবা তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করা সহজ নয়। মোটামুটি বলতে গেলে, কয়েকটি দিক থেকে আলবেনিয়া হচ্ছে বল্কানের প্রতীক স্বরূপ; কিন্তু এই দেশটি এরূপ সম্পূর্ণভাবে ইতালীয় ভাবাপন্ন হয়েছে যে, একে ১৯৪২ খৃস্টাব্দের দৃশ্যপট থেকে বাদ দেওয়া চলে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বল্কান সম্বন্ধীয় এবং বল্কান থেকে প্রেরিত সংবাদ সম্বন্ধে বলতে হয় যে, 'দি টাইম্স্' পত্রিকার ইস্তাম্বুলস্থিত কঠোর পরিশ্রমী সংবাদ-দাতার প্রেরিত সংবাদ খুব সাহায্য করেছে—শুধু তুরস্ক নয়, সমস্ত বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে—এমন কি মাঝে মাঝে হাঙ্গেরী ও স্লোভাকিয়া সম্বন্ধেও তিনি সংবাদ পরিবেশন করেন। বল্কান দেশ-প্রেমিকদের নির্মম প্রাণদণ্ড ও নির্যাতন ছাড়াও, গত বছরের বল্কানের ইতিহাসে দেখা যায় যে বল্কান রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠনের জন্য গ্রীস্ ও যুগোস্লাভিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধি (কারণ একে সন্ধিই বলতে হয়—বিশেষ করে এর সাধারণ ভাবধারা বিচার করলে) ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী লণ্ডনে সই করা হয়েছিল এবং এই উপলক্ষে ডরচেস্টার হোটেলে একটি ভোজের অনুষ্ঠান হয়েছিল; হেলেনিসের (গ্রীসের) রাজা এবং

যুগোশ্লোভিয়ার রাজা উভয়েই ভোজে উপস্থিত ছিলেন এবং যে-বক্তৃতা করেছিলেন সেটা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে নি। গ্রীক রাজা বলেছিলেন যে, এই চুক্তি "বল্কানের শান্তিপূর্ণ বিবর্তনে" একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং "গভীর ও অবিচল ভাগ্যবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ" বল্কান-বাসীদের ঐক্যপূর্ণ অনুভূতির পূর্ণ সমর্থন আছে এর পিছনে। যুগোশ্লোভিয়ার পক্ষ থেকে যুবক রাজা পিটার বলেছিলেন যে, পারস্পরিক অতি প্রয়োজনীয় স্বার্থ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে রচিত এই যুক্তিটি হচ্ছে গ্রীক ও যুগোস্লাভদের অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের প্রমাণ। তিনি আরও বলেছিলেন যে, প্রস্তাবিত বল্কান রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠিত হয়ে গেলেও এই চুক্তির স্রষ্টাদের ধারণা অনুসারে, এই চুক্তির কাজ ততদিন সম্পূর্ণ হবে না—যতদিন বাকী ইউরোপ একটা "প্রকৃত নতুন আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা"র অধীনে না আসে। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দর্শক ও লেখকের কাছে এ কথা সাধারণ বলে মনে হবে—তবে রাজা পিটার একটি স্মরণীয় বক্তৃতায় আরও অধিকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। বক্তৃতার এই অংশটুকু সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করার যোগ্য: "বল্কান রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ছাড়াও চেকোশ্লোভাক-পোলিশ চুক্তির ভিত্তিতে একটি মধ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গঠিত হবে, আমাদের এরূপ বিশ্বাসের পিছনে যুক্তি আছে। আমাদের ধারণা অনুসারে একই নীতি এবং ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই দুটি রাষ্ট্র-সঙ্ঘের যদি একটি শক্তিমান সাধারণ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা থাকে, তবে এমন একটি বৃহৎ সঙ্ঘ গঠিত হবে যার ফলে ইউরোপের শান্তি ও সমৃদ্ধির বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব হবে।"

এই দ্বিধা-বিভক্ত চুক্তির সর্তগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করার মত স্থান আমার নেই—তবে মতবাদের দিক থেকে এই চুক্তিতে যোগদানকারী দুটি রাষ্ট্র তাদের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ বিষয়ে কার্যত এক হয়ে যাবে। প্রায় এক বছর হ'ল এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল; কার্যত বল্কান রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা আগের মতই আছে। চুক্তিতে যে-মনোভাবের প্রকাশ হয়েছিল, সেটা প্রকৃতই প্রশংসনীয়—তবে হিটলারের অধীনে সাধারণ কঠোর দাসত্বের ফলে প্রকৃত বল্কানবাসীদের পক্ষে ১৯৪২ খৃস্টাব্দ যে একটি ভীষণ পরীক্ষার বৎসর ছিল—সে কথা গোপন করে লাভ নেই। প্রকৃতপক্ষে গত বৎসর গ্রীষ্মকালে একজন সুপরিচিত অ্যামেরিকান রাষ্ট্রনেতা এমন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে মিত্রপক্ষ এ পর্যন্ত যে কৃত-কার্যতা লাভ করেছে, তার চেয়ে বেশী সাফল্য যদি তারা যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখাতে পারে—তবে দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতিদের সহ্য শক্তি ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা আছে। ক্লান্ত বল্কানবাসীদের কাছে এই চুক্তি ভালই লেগেছিল—তবে এত দূরে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যে সে-স্থান প্রায় তাদের দৃষ্টি-চক্রের বাইরে ছিল। রাশিয়াসহ মিত্র-পক্ষের বড় বড় শক্তির গভর্ণমেণ্টগুলির কাছে বিবেচনার জন্য এই চুক্তিটি উপস্থাপিত করা হয়েছিল—অবশ্য সকলেই এ চুক্তিকে আশীর্বাদ করেছিলেন; এই চুক্তিতে যে-সব ভাব প্রকাশ করা হয়েছিল, তার মূল্য বাড়াতে—বিশেষ করে বল্কানবাসীদের চোখে—আরও কিছুর দরকার ছিল; খুব সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দক্ষিণ-ভূমধ্যসাগরে তারও আয়োজন চল্‌ছিল এবং সেখানে মিত্রপক্ষের বিজয়ের এই ফলটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সামগ্রিক দিক থেকে বল্কান-বাসীরা এখন একটা মহত্তর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে; আশা করা যায় যে, কোনরূপ মোহ না নিয়েই তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে। গত ১২ই নভেম্বর লণ্ডনে চেকোশ্লোভাক স্টেট কাউন্সিলে চে[illegible]শ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বেনেস্ যে-বক্তৃতা দি[illegible]লেন তার সঙ্গে এই বিষয়ের যথেষ্ট সম্বন্ধ আছে; মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের রাজনীতি এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে আর কো[illegible] লোকের এত বেশী জ্ঞান নেই।

এ পর্যন্ত ইউরোপে বাস্তব আকৃতিতে কোন যুক্ত রাষ্ট্রীয় কিংবা রাষ্ট্র-সঙ্ঘীয় নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করা হ[illegible] নি, এই কথা বর্ণনা করে ডাঃ বেনেস্ বলেছিলেন "প্রয়োজনীয় অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি—বিশেষ ক[illegible] মধ্যইউরোপে (দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, অর্থাৎ বল্কানেও এমন সব অজানা কারণ আছে যার ফলে যুদ্ধশেষে পূর্বে ধরা-বাঁধা সমাধান করা অসম্ভব। অষ্ট্রীয় হাঙ্গেরী, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়ার ভাগ্যে কি ঘটে

বলা অসম্ভব। অষ্ট্রীয়া ছাড়া, মিত্রপক্ষের সঙ্গে এবং এদের পরস্পরের মধ্যেও ভয়ঙ্কর বিবাদ আছে—এই সব বিবাদের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত এদের সঙ্গে কোনরূপ বোঝাপড়া করা যেতে পারে না। কাজেই এক পক্ষে থাকে শুধু পোলাণ্ড ও চেকোস্লোভিকিয়া এবং অপর পক্ষে থাকে গ্রীস আর যুগোস্লাভিয়া। এদের যুদ্ধোত্তর সম্বন্ধে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের নীতি প্রয়োগ বিষয়ে এই দুটি দলই আলোচনার চেষ্টা করেছে।"

রুমানিয়া এবং ক্রোসিয়ার সঙ্গে এক প্রকারের ছোট আঁতাৎ (little entente) গঠন করে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে স্লোভাকিয়ার আত্ম-রক্ষা-প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য ক'রে স্থানীয় নাৎসী সংবাদপত্র ঘোষণা করেছিল যে "শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলো যখন এবং যেরূপভাবে সুবিধাজনক মনে করে, সেইরূপ ভাবেই দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের জাতিগুলোর সমস্যা সমাধান করা হইবে।" এ কথা মোটামুটি নিঃসন্দেহে সত্য—তবে জার্মান বিবৃতিতে যাঁদের "শ্রেষ্ঠ শক্তি" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা এর মধ্যে থাকবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু কি ভাবে কখন এ সমাধান হবে? ডাঃ বেনেস্ বহুদিন ধরেই অতিরিক্ত আশাবাদের জন্য প্রসিদ্ধ—কিন্তু পরের ঘটনাবলী তাঁকে সমর্থন করে না। যে বক্তৃতা থেকে ইতিপূর্বেই উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই বক্তৃতাতেই কিছু পরে তিনি শান্তি-স্থাপন এবং তার অব্যবহিত পরে যে-সব কঠিন সমস্যা দেখা দেবে, তাই নিয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। প্রকৃতির দিক থেকে তিনি নৈরাশ্যবাদী নন, তবু তিনি মনে করেন যে, এই যুদ্ধের পরে ইউরোপ এবং বাকী পৃথিবীটা "১৯১৪-১৯১৮র মহাযুদ্ধের চেয়ে অনেক বেশী বিশৃঙ্খলা ও বিপদের মধ্যে পড়বে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, কয়েকটি রাষ্ট্রে "আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং অন্তর্বিপ্লব দেখা দেবে।" এই প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদের অঙ্কিত চিত্রটি মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়—তবে এ চিত্রটি হয়ত ঘটনা প্রবাহের দিক থেকে সত্য। আমার মনে হয় চতুর্দিকে যে-সব স্বপ্ন-দ্রষ্টা ছড়িয়ে আছেন—তাঁদের এটা সন্তুষ্ট করবে না—কিন্তু যাঁরা গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি তাঁরা এর মর্ম গ্রহণ করবেন।

* * *

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ২৬শে মে অনুষ্ঠিত অ্যাংলো-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তির ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মত এ অঞ্চলেও নিঃসন্দেহে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি হয়েছে—মিঃ কোডাক্স্ যতটা বলেছেন ততটা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। তিনি যেন আনন্দের সঙ্গেই "ফরাসী ও ইটালী সাম্রাজ্যের অবনতি এবং মহাদেশে (ইউরোপে) ব্রিটিশ শক্তির অবলুপ্তি"র কথা বর্ণনা করেছেন। যাই হোক, আমি স্যার্ ফ্রেডেরিক হোয়াইটের কতকটা আশা-ধারণার পরিপূরক হিসাবেই তাঁর অভিমত দিলাম; এতে বল্কান পরিস্থিতির ভীষণ অনিশ্চয়তাও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই সব অঞ্চলে যুদ্ধের পরে কি ঘটবে তাও কেউ জানে না। কিংবা যুদ্ধ শেষ হবার পূর্বেই বা কি ঘটবে তাও কেউ ঠিকভাবে অনুমান করতে পারে না। ভবিষ্যদ্বাণী করা বৃথা। অক্ষশক্তির প্রবল চাপ সত্ত্বেও এই মুহূর্তে প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তিগত উচ্চাশা এবং আকাঙ্ক্ষার কিছুটা প্রভাব বল্কানে দেখা যায়—কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন নির্ভুল পথনির্দেশ মেলে না। সব কিছুই জল্পনাকল্পনা মাত্র।*

গরম জল আর নয়

[এই সর্বব্যাপী মারাত্মক যুদ্ধ কি ভাবে ইংলণ্ডের সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে নানাদিক দিয়ে আক্রমণ করেছে, তারই একটি সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির লেখক D. L. Hobman এবং প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে World Reivew নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকা থেকে।]

বায়ুনিয়ন্ত্রণের পরে এল ইন্ধন-নিয়ন্ত্রণ; বন্ধনাগার আক্রান্ত হবার পরে আক্রান্ত হ'ল অগ্নিকুণ্ড; আমরা কম আলো ও কম উত্তাপ পাব এবং গরম জলের যে আশীর্বাদকে রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke) তাঁর প্রিয় দ্রব্যের তালিকায় স্থান দিয়েছিলেন, তা' আর অপরিমিত প্রাচুর্যে আমাদের উপর বর্ষিত হবে না। আমরা উপলব্ধি

*[Robert Machary লিখিত এবং The Contemporary Review পত্রিকায় প্রকাশিত "The Balkans in 1942 প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ]

করতে পেরেছি যে, বহুদিক দিয়ে আমাদের সভ্যতা ছিল কৃত্রিম গ্রীষ্মের মতন; আমাদের মোহ-ভঙ্গের পূর্বে আমরা অনেকেই বিশ্বাস করতাম যে, মানুষ দেহ এবং মনের দিক থেকে, তুষার-যুগ থেকে এমন একটা যুগে এসে পড়েছে যার আবহাওয়া হচ্ছে সর্বদা মৃদু মধুর এবং নাতিশীতোষ্ণ। প্রাকৃতিক দিক থেকে প্রকৃতই আশ্চর্যজনক বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং বিংশ শতাব্দীর নলের দৌলতে শীত পরাজিত হয়েছিল। নিজের ছাদের নীচে শীতের ছোট দিনকে ইচ্ছানুযায়ী বাড়িয়ে নিয়ে আরাম-দায়ক উষ্ণতার মধ্যে উপভোগ করা সম্ভব ছিল। অ্যামেরিকায় আবার ইউরোপের চেয়ে এই কৃত্রিম গ্রীষ্মকাল সৃষ্টির পদ্ধতি আরও এগিয়ে গেছে। Who are the Americans? নামক চমৎকার প্রবন্ধে উইলিয়ম ডোয়াইট হুইটনি বলেছেন: "অ্যামেরিকায় শীতের প্রকোপে এমন কেন্দ্রীয় উত্তাপ-সৃষ্টির পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেটা ইংলণ্ডের উত্তাপ-সৃষ্টির প্রচেষ্টাকেও ছাড়িয়ে গেছে···অ্যামেরিকানরা চায় যে তাদের শীতকালীন উত্তাপ গ্রীষ্মকালীন উত্তাপের সমানই থাকুক; এবং তারা এটা সম্পাদনও করেছে--কোন ইংরেজ শীতকালে অ্যামেরিকায় গেলেই সেটা হাড়ে হাড়ে টের পায়। এ রকম ব্যাপার যে মাঝে মাঝে ঘটে থাকে কিংবা উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেই এটা সীমাবদ্ধ—তা' নয়। যারা একেবারে গরীব তারা ছাড়া সর্বশ্রেণীর অ্যামেরিকান-দেরই এমন উত্তাপ-সৃষ্টির পদ্ধতি আছে যেটা পেলে ইউরোপের যে কোন রাজা গর্ব অনুভব করবেন; এবং তারা এই পদ্ধতিকে কাজে লাগায়।..সুখের জন্য অ্যামেরিকানরা ধীরে ধীরে আরাম এবং বিলাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে···অতি শৈশব থেকেই তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা প্রকৃত শীতের সংস্পর্শে আসে খুবই কম—এমন কি শয্যাগ্রহণ কিংবা শয্যাত্যাগের সময়ও নয়।"

প্রাচীন সভ্যতার বিবর্তন হয়েছিল আমাদের চেয়ে উচ্চতর আবহাওয়ায়—প্রধানত ভূমধ্যসাগরের গরম জলের ধারে; কঠিন নর্ডিক্ (Nordic) আবহাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে না হওয়ায়, সেখানকার অধিবাসীরা তাদের শক্তিকে অন্যদিকে নিযুক্ত করতে পেরেছিল।

তাদের বহুমুখী সংস্কৃতির বিচার করলে দেখা যায় যে, এই প্রাচীন জাতিরা কিন্তু গরম জলের আশীর্বাদকে অবহেলা করে নি। উদাহরণ স্বরূপ রোমানদের কথা বলা যেতে পারে; বেঁচে থাকার শিল্প-জ্ঞানে তারা ছিল ওস্তাদ—তাদের ভাল জলের নল পরিষ্কারক (Plumber) যেমন ছিল, তেমনই ছিল ওস্তাদ রাঁধুনী এবং ভাল ঔপনিবেশিক শাসনকারীও ছিল। তাদের ধনী লোকদের বাড়ীতে কেন্দ্রীয় উত্তাপক পদ্ধতি ছিল; গৃহের প্রধান কামরাগুলির ফাঁপা মেঝের নীচেস্থিত একটা কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ড থেকে নলের সাহায্যে গরম বাষ্প সরবরাহ করা হ'ত। আমাদের বর্তমান যুগের পথের পার্শ্বে নির্মিত গৃহাভ্যন্তরস্থিত স্নানাগারগুলো সে-যুগের সাধারণ স্নানাগারকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। সেগুলো ছিল সামাজিক কেন্দ্রবিশেষ; সেখানে নাগরিকরা পরিপূর্ণ ভাবে স্নান করে শিথিল ভাবে শুয়ে শুয়ে রোমান প্রদেশ-সমূহের শাসন-পদ্ধতি, রাজপ্রাসাদের নতুন কেলেঙ্কারীর কাহিনী কিংবা কলোসিউমে পরবর্তী মল্লযুদ্ধে প্রিয় মল্ল-যোদ্ধার সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারত।

রোমান সভ্যতার পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য-চর্চা কয়েক শত বৎসরের জন্য বিলুপ্ত হয়েছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপ যে নিজস্ব শিল্পকলা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল তার মধ্যে আরাম এবং স্বাস্থ্য—কোনটাই ছিল না এবং কয়েক শ' বছর ধরে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা কঠিন শীতে তাঁদের ঠাণ্ডা ও ময়লা বাস-গৃহে কষ্ট পেয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় বাড়ীগুলো—এমন কি সব চেয়ে ভাল বাড়ীও! আমাদের কাছে কত নিরানন্দ বলে মনে হ'ত সে কথা আজ আমরা ভাবতেও পারি না। "যে-সব জিনিস আমাদের সব চেয়ে বেশী কষ্ট দিত, তার মধ্যে থাকত শীত; ঘরের বেশীর ভাগ দরজা-জানালাই ছিল কুৎসিত এবং প্রায়ই সেগুলোর মধ্যে কাচ বসানো থাকত না; ফলে মুক্ত বায়ু এবং অন্ধকারের মধ্যে উপায়ান্তর ছিল না। সাধারণ ঘরের মধ্যস্থলে একটা অগ্নিপাত্রে আগুন থাকতো, যতটা সম্ভব ছাদের মধ্য দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যেত···ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডের মত ফরাসী দেশেও ঘরের মধ্যে বাইরের চেয়ে বেশী

গরম পোষাকের দরকার হ'ত।" [কুল্‌টনের (Coulton) Medieval Panorama থেকে উধৃত।] রাত্রিতে এইরূপ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসে থাকার লোভই হত না—কিংবা এই বসে থাকার ইচ্ছাকে কোন প্রকারে উৎসাহিত করা হ'ত না; সারা পৃথিবীর পক্ষে শীঘ্র শয্যাগ্রহণ এবং শীঘ্র শয্যাত্যাগই ছিল রীতি—ছোট শীতের দিনকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করা হ'ত—কৃত্রিম উপায়ে তাকে বাড়ানো সম্ভব ছিল না। নিঃসন্দেহে এই দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক শীতকালের ফলেই ঋতু পরিবর্তনকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এই কবিতা লেখা হ'ত। 'গ্রীষ্ম এসেছে'—এ কথাটা মধ্যযুগের কবিরা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘোষণা করতেন; বসন্তকাল ফুলের উৎসব কিংবা পাখীর সঙ্গীতের অর্কেষ্ট্রা ছাড়াও বড় কিছু ছিল; বসন্তকাল নিয়ে আসতে উষ্ণ ঋতুর প্রতিশ্রুতি যখন পোকা-পরিবৃত গাত্রাবরণ ফেলে দিয়ে অবশেষে কঠিন এবং বেদনা-জীর্ণ দেহকে মধুর রৌদ্রে ছড়িয়ে দেওয়া যেত।

অনেক শতাব্দী ধরে কাঠ-কয়লাই ছিল সাধারণ ব্যবহারের ইন্ধন। কয়লা ছিল মূল্যবান্ এবং সরবরাহেরও অসুবিধা ছিল। ১৬৬৪ খৃস্টাব্দে ওবার্ণ অ্যাবেতে কয়লার বিল হয়েছিল ৭৩ পাউণ্ড, ৮ শিলিং ৪ পেন্স। গ্ল্যাডিজ স্কট টমসনের (Gladys Scott Thompson) Life in a Noble Household 1641-1700 নামক বইয়ে বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক ব্যয়ের একটা চমৎকার হিসাব আছে। এখানে ইন্ধনের বিস্তৃত হিসাব দেওয়া হ'ল: "প্রতি চল্‌ড্রন (কয়লার পরিমাণ বিশেষ, ৩৬ বুসেলে এক চল্‌ড্রন) ১৭ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে ৫৫ চল্‌ড্রনের দাম, চল্‌ড্রনগুলো কেনা হয়েছিল সেণ্ট সিয়টসে; সেখান থেকে ওবার্ণ অ্যাবেতে নিয়ে যাবার জন্য প্রতি চল্‌ড্রন ১০ শিলিং হিসাবে ২৫ পাউণ্ড ভাড়া; বোঝাই করার জন্য ৮ শিলিং ৪ পেন্স ভাড়া, জেটির ভাড়া প্রতি চল্‌ড্রনে ২পেন্স হিসাবে—মোট ৭৩পাউণ্ড ৮শিলিং ৪পেন্স।" খুব ধনী ছাড়া আর কারও পক্ষে এরকম বিল শোধ করা সম্ভব ছিল না—কিংবা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী গৃহকর্তারা এত সহজে চালান দেবার ব্যবস্থাও করতে পারত না। উত্তাপ-সৃষ্টির সুবিধা যেমন কম ছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার সুবিধা ছিল আরও কম—সে গৃহের ব্যাপারেই হোক আর ব্যক্তিগত দেহের ব্যাপারেই হোক্। কুলটন ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে চিকিৎসক উলসিকে লেখা ইর‍্যাস্‌মাসের একটা চিঠি উধৃত করেছেন; তার মধ্যে দেখি যে ইর‍্যাস্‌মান্ তৎকালীন ইংলণ্ডের বড় বড় বাড়ীর আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিয়েছেন: "প্রায় বেশীর ভাগ মেঝেই কাদা এবং জঙ্গলাবৃত জলা জায়গার ঘাসে (এক রকমের উদ্ভিদ্) তৈরী; এগুলো এত অসতর্কতার সঙ্গে তৈরী যে অনেক সময় বিশ বছর ধরে ভিত্তির নীচে থুথু, বমি, কুকুর এবং মানুষের প্রস্রাব, ফেলে-দেওয়া মদ, মাছের ভুক্তাবশিষ্ট এবং অন্যান্য প্রকারের এমন ময়লা থাকে, যার নাম করা যায় না। কাজেই আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা গন্ধ বেরোয় যা আমার মতে মানব-দেহের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।" বড়লোকের প্রাসাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এই যদি নমুনা হয়, তবে গরীবের কুটিরের অবস্থা কল্পনা করেই নেয়া যায়। আজকের দিনে আমরা যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কথা জানি তার অস্তিত্ব ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে দাঁত পরিষ্কার করার রেওয়াজ প্রবর্তিত হয়েছিল; দাঁত পরিষ্কার করতে পারত তারাই যাদের সামাজিক পদ-মর্য্যাদা উচ্চ ছিল এবং যারা দাঁত পরিষ্কারের জন্য পুডিংয়ের পাত্রের মত ছোট ছোট পাত্র ব্যবহার করতে পারত; এখনো প্রাচীন দ্রব্যের দোকানে এই সব ছোট ছোট পাত্র মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের দ্বারাও অনুল্লেখ্য যে একপ্রকার দৈহিক দুর্গন্ধের কথা বিজ্ঞাপিত করা হয়, তখনকার দিনে তার হয়ত এত বিস্তৃতি ছিল যে দুই-চারটি চূড়ান্ত অবস্থায় ছাড়া সেটা হয়ত নজরেই পড়ত না। সূর্য-রাজা চতুর্দশ লুইয়ের কাছে যে যাওয়া যেত না, তার কারণ কি তাঁর ব্যক্তিগত মহিমা—না তাঁর দেহ থেকে যে দুর্গন্ধ বেরত সেইটা?

ব্যক্তিগত অভ্যাসের পরিবর্তন ধীরে ধীরে হয়েছিল; আমাদের সময়ে এসে এই পরিবর্তন চূড়ান্তে পৌঁছেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাথরুম্ ছিল দুষ্প্রাপ্য এবং এমন কি বড় বড় পল্লী-গৃহেও লোকেরা শোবার ঘরে একটা সংকীর্ণ টব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত। অবশ্য আরামদায়ক অগ্নিকুণ্ডের

সামনে এই জাতীয় টবে স্নান অসুবিধাজনক ছিল না; চেয়ারের পিঠে ছড়ানো পশমী তোয়ালে অগ্নিতাপে উত্তপ্ত হ'ত এবং গরম জলের বৃহৎ পিতলের পাত্রে আগুন প্রতিফলিত হ'ত। The Pasquier Chronicle-এ জর্জেস্ ডুহামেল (Georges Duhamel) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্যারীতে একটি অসুস্থ লোকের স্নান-ব্যবস্থার বর্ণনা করেছেন। "কোয়ে দ্য অস্তারলিজের ফ্ল্যাটে সুসজ্জিত কোন বাথরুম ছিল না। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের সময় বাথরুমটা ছিল বিলাস-দ্রব্য। আমরা বড় একটা স্নানের টব চেয়ে পাঠালাম। ডোরা-কাটা জার্সিপরা দুটি লোক একটা বড় লোহার ট্যাংকে বড় বড় তাম্রপাত্রে গরম জল নিয়ে এল। আমার বাবা অবশ্য স্নান করতে অসম্মত হলেন না—কিন্তু তিনি রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে গালিগালাজ করতে থাকলেন।" ১৯১৩ খৃস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের সহরতলীর বাড়ীতে স্নানের জল যথেষ্ট গরম করার জন্য স্নান-পাত্রের মধ্যে ঘেরাও করা ছোট কাঠকয়লার অগ্নিপাত্র বসিয়ে দেওয়া হ'ত। এই সময়ে ইংলণ্ডে দৈনন্দিন স্নানটা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছিল। প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধ বাধবার পূর্বে সামাজিক জীবনের কোন উপন্যাসে নায়ক যদি বাথরুমে গান না করত কিংবা নায়িকার দাসী যদি এসে খবর না দিত যে তাঁর স্নানের সব তৈরী, তবে সে উপন্যাস সম্পূর্ণ হ'ত না। তখন প্রধান প্রধান চরিত্রের সামাজিক পদ-মর্যাদা নির্দেশের জন্য এটা ছিল একটা সর্বজন স্বীকৃত রীতি। বর্তমান যুদ্ধ এবং গত যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই রীতি বিলুপ্ত হয়েছিল—কেননা পরিমাণ এবং গুণের দিক থেকে দৈনিক স্নানের সুবিধা বেড়েই চলেছিল। যত ছোটই হোক্ না কেন প্রত্যেক আধুনিক ফ্ল্যাটেই বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাদি-সমন্বিত বাথরুম্ থাকৃত এবং সর্বোপরি থাকৃত আশ্চর্যজনক ও বিরাম-হীন গরম জলের স্রোত।

বর্তমানে আমাদের জীবনের আরও অনেক ভাল জিনিসের মত এই গরম জলের প্রবাহও শেষ হয়ে গেছে। প্রকৃত পক্ষে আমরা একে এতটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলাম যে, একে আর আমরা ভাল জিনিস মনে করতাম না—মনে করতাম্ প্রয়োজন। গরম জলের স্রোত বন্ধ হতে চলেছে; ব্ল্যাক্-আউটের পর্দার পিছনে আলো মৃদুতর হয়ে আসছে এবং সূর্য-কিরণের মত সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে আমাদের শীতকালীন-গ্রীষ্ম শুধু একটি ঘরের আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হবে। এই শীতকালীন গ্রীষ্ম যতটা সঙ্কুচিত হবে ততই আমরা আমাদের সভ্যতার একটা বিশেষ দান হারাব; এই দানটিকে আমরা স্বাস্থ্য কিংবা আরামের চেয়েও বেশী মূল্য দিতে শিখেছি—এই দানটি হচ্ছে গোপনীয়তা (privacy)। একটা কেন্দ্রীয় হলকে খারাপভাবে গরম করার পরিবর্তে বিভিন্ন ঘরগুলোকে গরম করা সম্ভবপর হয়েছিল ব'লে গার্হস্থ্য-জীবনের গঠন-পদ্ধতি গেছিল সম্পূর্ণ বদ্‌লে; একমাত্র অত্যন্ত দরিদ্র ছাড়া অন্যান্য সবাই যখন খুসী একাকিত্ব উপভোগ করতে পারত। যখন আমরা উদ্বিগ্ন কিংবা বিষণ্ণ হতাম, তখন নির্জনে গা এলিয়ে দিতে পারতাম; গরম জলের ধারা যেমন আমাদের ক্লান্ত দেহের চারদিকে আরামদায়কভাবে ঝরে পড়ত, তেমনি নির্জনতাও আমাদের উদ্বিগ্ন মনকে শান্তি দিত; বর্তমানে আমরা সেই গোপনীয়ত্বের আশীর্বাদ সাময়িকভাবে হারালাম।

আজ গোপনীয়তা কোথায় পাওয়া যেতে পারে? মস্কো কিংবা অস্‌লো-র শীতল গৃহাভ্যন্তরে—যেখানে ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মকালে সংগৃহীত সামান্য কাঠের সঞ্চয় করুণ-ভাবে সহরের বাইরে পড়ে থাকে ... যেখানকার অধিবাসীদের এই একমাত্র ইন্ধন? কিংবা এথেন্সের রাজপথে যেখানে জীবিত অধিবাসীরা অনাহারে মৃত অধিবাসীদের শীর্ণ কঙ্কালের সঙ্গে হোঁচট খায়? বন্দী-শিবিরে? দাস-বহনকারী গো-মহিষাদি-চালিত শকটে? রাশিয়ার ট্রেঞ্চে কিংবা লিবিয়ার মরুভূমিতে? মানব-জাতির দুঃখ-দুর্দশা দেখে কেউ হয়ত দৈনন্দিন সভ্যজীবনের ছোটখাট আশীর্বাদের ক্ষতির কথা—এমন কি গোপনীয়-তার ক্ষতির কথাও—উল্লেখ করার সাহস পেত না—যদি না এর প্রতিটি ক্ষতি কোন-না-কোন অর্থে আমাদের শতাব্দী বর্তমানে যে ভয়ঙ্কর তুষার-যুগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার প্রতীক হ'ত। যেমন সব জিনিসের শেষ হয়, তেমনি এরও অবশ্য শেষ হবে এবং শান্তির উষ্ণতায় বড়

ছোট সব জিনিসেরই নতুন সৃষ্টি হবে: স্বাধীনতা, সদিচ্ছা এবং ছোট ছোট আনন্দ আবার ফিরবে; এই সব জিনিস সম্বন্ধেই বড় প্রেমিক কবি রুপার্ট ব্রুক লিখেছিলেন: "shall I not crown them with immortal praise?"

—

কথার বই

[আজকাল সংবাদপত্রে স্থানাভাবে পার্লামেণ্টের বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। তাই লোকেরা খুজাখুজি 'হ্যানসার্ডে'র (Hansard) দ্বারস্থ হয়। এই হ্যানসার্ডের কাহিনীই এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রবন্ধটির রচয়িতা জর্জ ক্রাইস্ট। The Bermudian নামক পত্রিকায় প্রকাশিত The Book of Words নামক প্রবন্ধের এটি সার সঙ্কলন]

প্রতিদিন সকালবেলা প্রাতরাশের সময় পার্লামেণ্টের যে-সব সভ্য লণ্ডনে কিংবা তার কাছাকাছি থাকেন, তাঁরা শান্তিকালীন দিনের মতই প্রত্যেকে একটি নীল মলাট দেওয়া পুস্তিকা পান; এর মধ্যে পূর্ব দিন হাউস্ অব্ কমন্সে যে-সব প্রশ্ন করা হয়েছে, যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে এবং অন্য যা কিছু কাজ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির পূর্ণবিবরণী থাকে। প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য বড় বড় মন্ত্রীর কাছে বিশেষ দূতেরা প্রাতরাশের পূর্বেই এই পুস্তিকা বহন করে নিয়ে যায়।

বেশীর ভাগ ইংরেজরাই 'হ্যান্সার্ডে'র কথা শুনেছে এবং বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে তারা এর পৃষ্ঠায় ডুব দেবার জন্য প্রলুব্ধ হয়। প্রকৃত পক্ষে হ্যান্সার্ড যে আজ পঞ্চাশ বছরের বেশী কাল ধরে প্রকাশিত হচ্ছে না—এ ঘটনাটা পার্লামেণ্টের সভ্যরা এবং জনসাধারণ অবহেলা করে থাকেন। নেল্সন্ যখন সমুদ্রে ব্রিটেনের আধিপত্য প্রমাণ করছিলেন, সেই সময় যে-মুদ্রাকর এই রিপোর্ট প্রকাশ করা সুরু করেছিলেন, তাঁরই নামে আজও এই রিপোর্ট অভিহিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইংলণ্ড শেষ কালে বিতর্কের একটা সরকারী বিবরণ প্রকাশ করা সুরু করেছিল। 'হ্যানসার্ডে'র প্রকৃত নাম হচ্ছে "পার্লামেণ্টের বিতর্ক—সরকারী বিবরণ;" সবে মাত্র ১৯০৯ খৃস্টাব্দে এই নীল মলাট দেওয়া পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

গবর্ণমেণ্ট এইচ. এম্. স্টেশনারী অফিসের মারফৎ 'হ্যান্সার্ড' মুদ্রিত করেন এবং পোষ্ট অফিসের মধ্যস্থতায় এটা বিলি করার ব্যবস্থা করেন। অন্যথা এর প্রকাশের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আর কোন সংযোগ নেই। শেষ পর্য্যন্ত হাউস অব্ কমন্স যখন সরকারী বিবরণ প্রকাশে সম্মতি দিয়েছিলেন, তখন তাঁরা দাবী করেছিলেন যে, প্রকাশের পরিপূর্ণ অধিকার তাঁদের হাতেই থাকবে। সেই নিয়ম এখনও ভঙ্গ হয় নি। প্রকৃত পক্ষে স্পীকার (হাউস অব্ কমন্সের সভাপতি) হচ্ছেন 'হ্যান্সার্ডে'র প্রধান সম্পাদক। তাঁরই মধ্যস্থতায় হাউস্ দাবী করেন যে সব বক্তৃতাই পুরোপুরি প্রকাশ করতে হবে—তা সে মন্ত্রীদের বক্তৃতাই হোক্ আর পিছনের বেঞ্চের সভ্যদের বক্তৃতাই হোক্। সমালোচনার কোন কথাই বাদ দেওয়া চলবে না। যে কোন বক্তা সরকারী সংবাদদাতাদের ব্যাকরণের ভুল কিংবা উধৃতির ভুল শোধরাতে বলতে পারেন; কিন্তু এটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম যে কোন অনুচ্ছেদের অর্থ বদলিয়ে দেয় এমন কোন কথা যোগ দেওয়াও যাবে না কিংবা বাদ দেওয়াও যাবে না।

যদিও তাঁরা প্রেস গ্যালারীতে বসে কাজ করেন, তবু বারোজন সরকারী সংবাদদাতা হাউসেরই কর্মচারী। সভ্যদের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত পাশের গ্যালারীতে বসবার অধিকার চ্যাপলেনেরও (Chaplain) যেমন আছে, সম্পাদকেরও তেমনি আছে। পার্লামেণ্টের অন্য কোন কর্মচারী এত বেশী কাজ করে না। প্রতি বৎসর নব্বই লক্ষ কথা ধরে এমন দশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; কত রকমের প্রাদেশিক ভাষায় এই সব কথা বলা হয়ে থাকে এবং এই বলবার গতি অনেক সময় মিনিটে দুইশ কথার উপরে চলে যায়। সম্প্রতি অবশ্য একটি মাইক্রোফোন্ এবং কয়েকটি হেডফোন পাওয়া গেছে—একশ বছর আগে পিছনের সাধারণ দর্শকদের অন্ধকার গ্যালারীতে বসে হাঁটুর উপর লিখবার কাগজ রেখে 'হ্যানসার্ডে'র সংবাদদাতাদের যে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে হ'ত, তার চেয়ে অবশ্য অনেক বেশী উন্নতি হয়েছে।

যুদ্ধের প্রথমে কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল যে হ্যানসার্ডের প্রচার পৃথিবী-ব্যাপী এবং শত্রুরা পরিশ্রম করে এটা পড়বে। কোন অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা কিংবা এরোড্রোমের স্থান নির্দেশ, সৈন্যদলের শক্তি ও মনোভাব, জাহাজের গতি, বিমান হানায় ক্ষতির পরিমাণ এবং এমন কি আবহাওয়া সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাওয়া যায় কি না সে উদ্দেশ্যে 'হ্যানসার্ডে'র প্রতিটি পংক্তি বিশ্লেষণ করে দেখা হবে। কতকগুলো ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবশ্য গোপন অধিবেশনে আলোচনা করা হয় এবং এই সব অধিবেশনে সরকারী বেসরকারী কোন রকম সংবাদ-দাতাকেই থাকতে দেওয়া হয় না। তাঁরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন যদিই কোন গোপন তথ্য লিখে নেবার জন্য তাঁদের ডাকা হয় কিংবা যদি কোন বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা স্থির হয়। ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে গোপনীয়তা এত চূড়ান্তে উঠেছিল যে সংবাদদাতার তালাবদ্ধ দরজার পাশে দাঁড়ানোর কর্তব্য শেষ হ'লে, তাঁর কাছ থেকে শূন্য নোটবুক নিয়ে সম্পাদকের ঘরে একটা সিন্ধুকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখা হ'ত।

আপেক্ষিক হিসাবে গোপন অধিবেশন কম এবং প্রশ্নাদি সাধারণ্যেই করা হয়ে থাকে। সভ্যদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি কথাই শত্রুর শ্রবণ সীমার মধ্যে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটে এবং কেউ হয়ত একটা প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়ে বসেন। যখন এরূপ ব্যাপার ঘটে তখন স্পীকার সেই সভ্যের সঙ্গে দেখা করেন এবং 'হ্যান্সার্ড' থেকে সেই অংশটুক্ বাদ দেবার আদেশ দেন। এই রেকর্ড শুধু এই জাতীয় সেন্সরশিপের অধীন। খুব কম ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজন হ'য়ে থাকে এবং এই কর্মপদ্ধতির কোন অভিযোগই হয় নি। এই ব্যাপারেও হাউস্ অব কমন্স স্পীকারের দায়িত্ব সংরক্ষণ সম্বন্ধে যত্নবান হয়েছে এবং গভর্ণমেন্টের কোন কর্মচারীর হাতে এই কার্যের ভার দেয় নি।

স্বাধীনতার এই সুস্থ মনোবৃত্তিই হাউস্‌কে সরকারী বিবরণ প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছিল। হাউসের এই কাজের ভার নেবার কারণ এই যে ১৯০৯ খৃস্টাব্দের পূর্বে যে আধা-সরকারী বিবরণ প্রকাশ হ'ত তাতে সভ্যদের চেয়ে মন্ত্রিদের বক্তৃতার প্রাধান্য দেওয়া হ'ত এবং প্রকাশকরা কিছু কিছু সরকারী সাহায্য পেত ব'লে সমালোচনাকে চেপে যেতেও তারা প্রলুব্ধ হ'তে পারত। 'হ্যান্সার্ডে'র প্রকৃত জনকের নাম উইলিয়াম কবেট (William Cobbett); তাঁর লেখায় গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইংলণ্ডের পল্লীজীবনের সুন্দর বর্ণনা আছে। তিনি ১৮০৩ খৃস্টাব্দে বিভিন্ন স্থান থেকে পার্লামেণ্টের দৈনন্দিন কার্যবিবরণী সংগ্রহ করা সুরু করেছিলেন। তার জন্য এটা মুদ্রিত করেছিলেন টমাস্ কুর্জন হ্যানসার্ড (Thomas Curzon Hansard) নামে একজন লণ্ডনের মুদ্রণ-ব্যবসায়ী; এঁর পরিবার প্রায় নব্বই বৎসর ধরে এই মুদ্রণ ব্যাপারটির সঙ্গে সংস্রব রেখেছিলেন। বিভিন্ন ধরণের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও এটা শীঘ্রই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিচিত এবং বেশী নির্ভরযোগ্য বিবরণীতে পরিণত হয়েছিল; ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্স্ এদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর সংবাদদাতারূপে কাজ করতেন।

আধুনিক মাপকাঠিতে বিচার করলে উনবিংশ শতাব্দীতে যে 'হ্যানসার্ড' প্রকাশিত হ'ত, তাকে অতি সাধারণ বল্‌তে হয়। এটা প্রকাশিত হ'ত দেরীতে এবং এর বেশীর ভাগ সংবাদ সংগৃহীত হ'ত সংবাদপত্র থেকে। গভর্ণমেণ্ট থেকে তিন হাজার পাউণ্ড বা[illegible] সাহায্য দানেও এর অবস্থার কোন উন্নতি হ'ল না। বিভিন্ন পার্লামেণ্টারী কমিটি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেছিলেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দের পরে 'হ্যান্সার্ড'-পরিবার যখন এর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিলেন, হাউস্ তখন চুক্তিতে এই কাজটার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা ভীষণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। কোন চুক্তি-গ্রহণকারীই এটাকে লাভজনক কার্যে পরিণত করতে পারে নি। কেউ কেউ দেউলিয়া হয়ে গেছিলেন; একজন আবার বিজ্ঞাপন গ্রহণ করার ফলে কলঙ্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অবশেষে পার্লামেণ্ট 'হ্যান্সার্ড' প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের অনুতাপ করতে হয় নি।

জার্মানরা ১৯৪০ খৃস্টাব্দের আগষ্ট থেকে ব্রিটেনের

বিমান আক্রমণ সুরু করেছিল, তাতে 'হ্যানসার্ড' প্রতিষ্ঠানের কর্মকুশলতাই প্রমাণিত হয়েছিল। 'হ্যান্সার্ডে'র প্রত্যেক কর্মচারীই এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করেছিল; পার্লামেণ্টের কণ্ঠস্বর থামানো চলবে না। একটি বিমান আক্রমণে ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাবার সময় একজন সংবাদ-বাহক নিহত হয়েছিল। তার পর সমস্ত কপিই ছুটি করে করা হ'ত। তার পর 'হ্যান্সার্ড' যখন যন্ত্রস্থ, তখন ছাপাখানা বিমান আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল। তখনই 'হ্যান্সার্ডে'র কাজ অন্য ছাপাখানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছিল. এবং পরদিন সকাল বেলায় অপরিচিত অক্ষরে কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা দেরীতে হ্যান্সার্ড প্রকাশিত হয়েছিল। পুরানো পার্লামেণ্ট গৃহ ধ্বংস হবার ফলে পার্লামেণ্টকে বাধ্য হয়ে সাময়িক ভাবে নূতন নূতন স্থানে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে এবং সরকারী সংবাদদাতাদের অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়, কিন্তু তার ফলে কপি পেতে খুব দেরী হয় না। 'হ্যান্সার্ড' গণতন্ত্রের মেরুদণ্ড এবং রক্ষক হিসাবে ঠিকই রয়েছে।

—

(দেশী পত্রিকা হইতে)

সোভিয়েট ইউনিয়নে নারী

[ঢাকার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মুখপত্র 'গতি'র বৈশাখ সংখ্যা থেকে সঙ্কলিত]

বর্তমান জগতে নারীদের অবস্থিতির ন্যায় কৌতুক-প্রদ ও দরকারী খুব কম বিষয়ই আছে। আবার সোভিয়েট রাশিয়া ভিন্ন খুব কম দেশই আছে যেখানে এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য দ্রুত ক্রমোন্নতি দেখা গিয়েছে। ২৫ বছরের মধ্যে ইউনিয়নের নারীরা এত উন্নত হয়েছে যে তারা আজ সমাজের কোণঠাসা অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সর্ব্বপ্রকার কাজে অংশ গ্রহণ করেছে। সোভিয়েট ও ফ্যাসিষ্ট প্রথার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃশ্যমান পার্থক্য দেখা যায় সমাজ-গঠনে নারীদের কর্ত্তব্য নিয়ে। সোভিয়েট মনে করে নারী রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যপালন করবে, অপর পক্ষে ফ্যাসিষ্টরা মনে করে যে নারী শুধু শিশুপালন ও গৃহস্থালীর মধ্যেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবে। ইউনিয়নের শাসন-প্রণালীর ১২২ ধারায় লিখিত আছে :—

"ইউনিয়নের নারীরা রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে পুরুষদের সমানাধিকার পেয়ে থাকে। পুরুষের সঙ্গে সকল কাজে সমান অধিকার, সমান মাহিনা, বিশ্রাম ও অবসর; সামাজিক শিক্ষা; রাষ্ট্রকর্ত্তৃক মা ও শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণ; মাতৃত্বের পূর্ব্বে ও পরে মাহিনাসহ ছুটি; অসংখ্য মাতৃমঙ্গলালয় ও শিশু-পালনাগার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাগুলি কার্য্যকরী হবার সম্ভাবনা এনে দিয়েছে।" ১৩৭ ধারায় লিখিত আছে :—

"পুরুষদের সাথে নারীদেরও একই নিয়মাধীনে ভোট দিবার অথবা ভোটপ্রার্থী হবার অধিকার আছে"

ইউনিয়নের নারীরা আইন অনুযায়ী তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়ে থাকে। আজকাল বহু সোভিয়েট নারী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কাজে নিযুক্ত আছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজে (১৯২৮-৩৭) নারীদের সংখ্যা ত্রিশ লক্ষ থেকে বেড়ে নব্বই লক্ষে দাঁড়ায়। অধিকন্তু ইতিমধ্যে নারীদের কাজের রূপও অনেক বদলে গিয়েছে। ১৮৯৭ সনের গণনা অনুসারে দেখা যায় শতকরা ৫৫ জন নারী বড় জমিদার, বুর্জ্জোয়া, বড় ব্যবসায়ী অথবা ধনী রাজকর্ম্মচারীদের অধীনে কাজ, ২৫ জন ভূসম্পত্তির জোতের কাজ, ৪ জন শিক্ষা ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ এবং ১৩ জন শিল্পবিভাগে অথবা দালান সংস্কারের কাজ করত। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৩৯ জন নারী বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে, ১৫ জন দোকান, সরবরাহ ও জনসাধারণের খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ছিল, এ ছাড়া শতকরা ২০ জন ছিল ডাক্তার, নয় শিক্ষক—আর পুরাতন প্রথার রক্ষক হিসাবে শতকরা মাত্র ২ জন গৃহস্থালী অথবা বাড়ীর চাকরাণীর কাজ করত। অবশিষ্ট ২৪ জন শিল্পের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার, বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার কাজ করত।

লেলিনগ্রাদের স্কোয়াখণ্ড জুতোর কারখানার ন্যায় এমন অনেক বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র রাশিয়ায় আছে যেখানে শতকরা ৬০ জনই নারী-কর্ম্মী।

সাধারণ খাবার ঘর এবং সর্ব্বদা রান্না ও পরিবেশনের জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকায় নারীরা তাদের গৃহকার্য্য থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে। রাশিয়ায় ত্রিশ হাজারের উপর খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করার প্রতিষ্ঠান আছে। পুরুষের ন্যায় সোভিয়েট নারীদেরও দিনে ৭ ঘণ্টা ক'রে কাজ করতে হয়—আবার অনেক কাজে ৬ ঘণ্টা ক'রে খাটলেও চলে। নরনারী উভয়কেই এক কাজের জন্য একই মাহিনা দেবার মূলসূত্র খুব কঠোরতার সহিত পালন করা হয়। পুরুষদের মত সোভিয়েট নারীরাও বেতনসহ বাৎসরিক ছুটি পেয়ে থাকে। এবং যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক হয়, তবে কোন স্বাস্থ্যনিবাসে অথবা বিশ্রামাগারে বিনা খরচে থাকতে পারে।

মেয়েরা তাদের গুণাবলী এবং অর্জ্জিত দক্ষতা ও বুদ্ধির জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হয়ে থাকে। যে-সব বৃত্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষদেরই একচেটিয়া ছিল এখন তা মেয়েরাই অধিকার ক'রে নিয়েছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে নারীদের রেলওয়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে রাশিয়ার পাঁচ লাখেরও বেশী নারী রেলওয়ের কাজ করছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই প্রধান পদ অধিকার করে আছে। নারীদের মধ্যে ৪০০ জন স্টেশন মাস্টার, ১৪০০ জন সহকারী স্টেশন মাস্টার এবং প্রায় দশ হাজার জন ব্যবহারিক শিল্পী।

উচ্চাকাঙ্ক্ষাবতী যে কোন সোভিয়েট নারী মজুর অথবা সমবায়ী নারী-কৃষক দক্ষতার পরিচয় দিতে পারলে সোভিয়েটের যে কোন উৎপাদনকেন্দ্রের পরিচালনার সুযোগ পেয়ে থাকে। ইউনিয়নে অনেক নারী এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, বিমানচালক ও বিচারক আছে। সেখানে কোন শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা অথবা রাজকীয় বিভাগের কার্য্য নাই যেখানে মেয়েরা কাজ না করে। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত দেশ মিলে প্রায় দশ হাজার নারী-এঞ্জিনিয়ার কিন্তু এক সোভিয়েটেই দশ হাজারের উপর নারী-এঞ্জিনিয়ার বড় বড় শিল্পকেন্দ্রে অথবা দালান সংগঠনের কাজে নিযুক্ত আছে। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাশিয়ায় মাত্র দুই হাজার নারী-ডাক্তার ছিল। আজ কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার জন ডাক্তার—আবার তার মধ্যে অর্দ্ধেকই নারী।

কৃষিকার্য্যে নারীদের নিয়োগের ব্যবস্থাও অনেক বদলে গেছে। প্রায় ১৯,০০০,০০০ নারী সমবায়ী অথবা রাষ্ট্রীয় কৃষিক্ষেত্রে এখন কাজ করছে। তারা গোর্কির বর্ণনা অনুযায়ী পুরাতন রাশিয়ার অত্যাচারিত, পদদলিত এবং অচেতন কৃষক নারীদের মত নয়। সমবায়ী কৃষিপ্রথা তা থেকে নারীদের সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে। বিপ্লবের পূর্ব্বে কৃষকেরা সূর্য্যোদয় হতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কাজ করেও কত উপার্জ্জন করত তা কখনও জানত না। এখন প্রত্যেক সমবায়ী নারী-কৃষক ঠিক ক'রে বলতে পারে তারা পরিবারের জন্য কত আনছে।***** বিপ্লবের পূর্ব্বে মনে করা হ'ত যে মেয়েরা শুধু সাধারণ কাজ করতেই সমর্থ, তাই তাদের কোদাল ও কাস্তে ছাড়া অন্য কোন জটিল যন্ত্র ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ত না। আজ সোভিয়েটে ১,৫০০,০০০ উপর কৃষি-যন্ত্রাদির চালক আছে—তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাও একেবারে কম নয়।

সোভিয়েটের শ্রমিক আইন নারীদের শারীরিক শক্তির সীমা সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ এবং নারীদের কখনও শক্তির অতিরিক্ত কাজে যোগদান করতে দেয় না। ১৮ বছরের কম যুবক-যুবতীদের বিপদ-সঙ্কুল কাজে যোগ দেওয়া আইন অনুসারে নিষিদ্ধ।

সোভিয়েটের বিবাহ ও পরিবার সম্বন্ধীয় আইন বিবাহকে দুইটি স্বাধীন ও সমকক্ষ ব্যক্তির মিলন বলেই মনে করে। রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থে, এবং স্ত্রী ও সন্তানাদির ব্যক্তিগত ও সম্পত্তির অধিকার রক্ষার সুবিধার্থেই বিবাহকে নথীভুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। নথীভুক্ত ও ঘরোয়া এই উভয়বিধ বিবাহকেই সোভিয়েট আইনে সমান মনে করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নে কোন শিশুকেই আইন-নিষিদ্ধ মনে করা হয়

না এবং প্রত্যেক শিশুই সমান অধিকার পায়। স্ত্রী ও স্বামীর সাধারণ স্বীকৃতিতে অথবা তাদের যে কোন একজনের ইচ্ছায়ওবিবাহ-বিচ্ছেদ হ'তে পারে। বিবাহ-বিচ্ছেদ নথীভুক্ত করার সময় শিশুর সংরক্ষণের জন্য কে কতটুকু অংশ গ্রহণ করবে আর কার সাথে শিশু বাস করবে রাষ্ট্রই তা নির্দ্ধারণ ক'রে দেয়। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট একটি আইনের খসড়া রচনা করে। তাতে মা ও শিশুদের রক্ষা করার,অকালে ইচ্ছাকৃত সন্তান-প্রসবজনিত বিষময় ফল থেকে নারীদের রক্ষা করার, পিতার দায়িত্ব পালনের যে কোন প্রকার গাফিলতিকে নিরুৎসাহ করার এবং সর্ব্বতোভাবে পরিবারকে শক্তি-শালী করার উদ্দেশ্য ছিল। এই খসড়ার বিষয়গুলি দেশব্যাপী আলোচনার পর সর্ব্বসাধারণের মত নিয়ে আইনে পরিণত হয়। এই আইনে মাতার নিরাপত্তার উদ্দেশ্য ভিন্ন স্বেচ্ছায় অকাল প্রসবকে নিষিদ্ধ করা হয় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনকে কঠোরতর করা হয়। বেকার সমস্যা সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ায়, নারীদের আর্থিক স্বাধীনতা থাকায়, সমস্ত জনসাধারণের সুখ বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন নিরাপদ হওয়ার দরুণই এই আইনের সুফল হয়েছিল অনেক। আইন লিপিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে।

* * *

সোভিয়েট নারীরা জ্ঞানার্জ্জন ও শিক্ষার জন্য ব্যাকুল এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টও সর্ব্ব বিষয়ে তাদের সাহায্য করছে।...রাশিয়ায় আজকাল বহু নারী কলেজে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হচ্ছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৬০১০০০; তার মধ্যে শতকরা ৪৩ জনই নারী। শিক্ষা এবং চিকিৎসা বিভাগে ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমোন্নতির দিকে যাচ্ছে।

সোভিয়েট নারীদের ক্রীড়া এবং ব্যায়ামের দিকেও উৎসাহ আছে। পাঁচ লাখেরও বেশী যুবতী ব্যায়াম বিষয়ক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে G. T. O. ব্যাজ পরিধান করেছে। ১০০,০০০ জনেরও উপরে নারী সুনিপুণ লক্ষ্য-বেদ্ধার চিহ্নস্বরূপ 'ভরশিলভ' ব্যাজ পরিধান ক'রে গর্ব্ব বোধ করে। সোভিয়েট নারীরা নানাপ্রকার ক্রীড়ায়—বিশেষ ক'রে প্যারাসুটে ওঠা-নামায়, পৃথিবীব্যাপী রেকর্ড করেছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সোভিয়েট নারীদের যা দিতে পারে নি, দেশের গঠনমূলক কার্য্যে অংশ গ্রহণ করার অধিকার তাদের তা দিয়েছে। ইহা নর-নারীকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সমানাধিকার দিয়েছে। রাশিয়ার সর্ব্বপ্রধান সোভিয়েট সভ্যদের মধ্যে ১৮৯ জন, ইউনিয়ন রিপাব্লিকের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট সভ্যদের মধ্যে ৮৪৮ জন এবং স্বায়ত্ত শাসনমূলক রিপাব্লিকের সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েটের সভ্যদের মধ্যে ৫৭৮ জনই নারী। ১,৫০০,০০০ জনের বেশী নারী গ্রাম ও সহরের সোভিয়েটগুলিতে কার্য্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করেছে।

শিল্পে নূতন ও উন্নততর কার্য্যপ্রণালী আবিষ্কার ক'রে দশ হাজার নারী ষ্টাখানোভিট উপাধি লাভ করেছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে এডভোকিয়া ও ম্যারিয়া ভিনে গ্রেভোভার তন্তুবায় কর্ম্মীরা নিজেদের কারখানায় নূতন নূতন প্রণালীর সাহায্যে অধিকতর উৎপাদন করার জন্য সমস্ত দেশবাসীর দ্বারা সম্মানিত হচ্ছে। একজন সমবায়ী নারী-কৃষকই সব চেয়ে বেশী চিনি জাতীয় উদ্ভিদ্ উৎপন্ন করার সম্মান পেয়েছে। চিনি জাতীয় উদ্ভিদ বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করার সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা একটি সমবায়ী কৃষক-মেয়ে ডেমচেন মেন্ কর্ত্তৃক আরম্ভ হয়েছিল। এখন সোভিয়েট ইউনিয়নে এরূপ সমবায়ী নারী-কৃষক আছে যারা প্রতি হেকটার জমিতে একশত টন চিনি জাতীয় উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। পূর্ব্বে ৫০ টনের জন্যই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছিল।

যান্ত্রিক লাঙ্গল-চালক পাশা এঞ্জেলস্ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নারীকে অধিকতর ভাল চালকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করে। সহস্র সহস্র নর-নারী আজ এই সম্মান পাবার জন্য প্রতিযোগিতা করছে। ফলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চালকেরা বর্ত্তমানে দ্বিগুণ জমি চাষ করতে পারে।

ভেলেনটিনা, গ্রিজদুবোভা, মৃত পৌলিনা, অশিনেনকো এবং মেরিনায়াশ কোভার প্রভৃতি নারীরা মস্কো হতে সুদূর প্রাচ্যে অবিরত বিমান চালিয়ে যে সাহস ও বীরত্ব

দেখিয়েছে তা নিয়ে সোভিয়েটদের গর্ব্ব করবার অধিকার আছে। অবিরাম বিমান চালনায় সোভিয়েট নারীর চলাফেরা পৃথিবীর নারীদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে।

সমস্ত ইউনিয়নের মৎস-শিল্পের প্রতিনিধি নেলিশ ঝেম চুঝিনা, আজারবাইজানের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি কুব্রা ভেরাড্ এবং তুর্কমেনিস্তানের বিদ্যুৎ-শিল্পের প্রতিনিধি বাঘতা আলন্টি বায়েভা প্রভৃতিকে নিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিনিধি সভায় ১২ জন নারী আছে। ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি সভার সহ-প্রতিনিধি য়োসানিয়া জেমলামা নামে একটি নারী।

ইউনিয়নে ১২৫০০ নারী বৈজ্ঞানিক আছে। কিছু দিন আগে জীবতত্ত্ব ও বায়ো-কেমিষ্ট্রি সম্বন্ধে ৩০০ প্রবন্ধ লিখে ডাঃ লেনা স্টার্ণ সোভিয়েট রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক সংঘের সভ্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিজ চেষ্টাতেই একজন অশিক্ষিতা শ্রমজীবিনী থেকে সোভিয়েটের সর্ব্বোচ্চ সভাপদে উন্নীত হয়েছিলেন।

জেলা সোভিয়েটের সভাপতির কাজ সুষ্ঠুভাবে চালান সহজ নয়। সে কাজ করতে হলে সভাপতিকে গঠন-ক্ষম, পরিচালনা-ক্ষম ও তীক্ষ্ণ অর্থনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে হয়। সোভিয়েট জেলার আনুমানিক ব্যয় ৮৭,০০০,০০০ রুব্‌ল্। জেলা সোভিয়েটের উপর ভ্রমণোদ্যান সমূহের তত্ত্বাবধান, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও পরিষ্কার রাখা, আবর্জ্জনা দূরীকরণ, স্থানীয় শিল্প প্রভৃতির তত্ত্বাবধান এবং নানা-প্রকার জনহিতকর কাজের ভার ন্যস্ত। আজকাল সোভিয়েট ইউনিয়নে এরূপ অনেক নারী আছেন যাঁরা সভাপতির কাজ ছাড়াও জিলা শিল্প-পরিকল্পনা বিভাগ, জিলা শিক্ষা বিভাগ ও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ করছেন। ভবিষ্যতে এঁদের সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বেড়ে যাবে।

"নারীরা শুধু শিশু-পালন ও গৃহকার্য্য তত্ত্বাবধান করারই উপযুক্ত"—ফ্যাসিস্টদের এই মতবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় নারীদের উন্নতির কথা অকাট্য যুক্তিস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

— (মণিকা দেবী)

সমাজ-সচেতন সাহিত্য

[হাওড়ার ত্রৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'অভিবাদন' থেকে সঙ্কলিত।]

সাহিত্যিকদের সমাজ-সচেতন হবার তাগাদাটা আজ-কাল জোর চলেছে। পাঠকরা তাগাদা দেন 'সমাজ সচেতন সাহিত্যিক চাই'—সে-তাগাদায় পড়েই সাহিত্যিকরা সবাই সমাজ-সচেতন হবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছেন। তার জন্য অবশ্য রাতারাতি অনেককেই মুখোস বদলাতে হচ্ছে। কেননা পাঠকের দাবী পূরণ না করলে বাজার মাটি হয়।

আজকের দিনে যে-সব কবিতা গল্প বাংলা সাহিত্যের কলেবর স্ফীত করে চলছে ওতে একবার চোখ বুলিয়ে আনলেই আমরা এই অনুরোধে ঢেঁকি গেলার দৃশ্যটা দেখতে পাই। পাঠকরা প্রায় বাইবেলের ঈশ্বরের মত হয়ে উঠেছেন—Let there be light বলা মাত্র চন্দ্র-সূর্য্য জোড় হস্তে এসে উপস্থিত হয়। তাঁরা সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক চাইলেন, আর অমনি সাহিত্যিকরা সমাজ-সচেতন হয়ে উঠলেন। তাঁরা একবার ভেবেও দেখলেন না সমাজ-সচেতনতাটা অর্ডারী মাল নয় যে অকাতরে তাঁরা তা' সরবরাহ করে যেতে পারবেন।

সাহিত্যিকদের আচরণের প্রসঙ্গ তোলবার আগে আমাদের বুঝতে হবে পাঠকরা সমাজ-সচেতন সাহিত্য বলতে কি বুঝেন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপরই যখন সমাজ গঠন নির্ভর করে তখন আমরা দ্বিধাহীন হয়ে বলতে পারি যে বাংলাদেশের যারা ধনোৎপাদক সেই চাষীরাই সমাজ-দেহের একটা বড় অংশ জুড়ে বসে আছে। আর আছে মুষ্টিমেয় শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের মুষ্টিমেয় মজুর, গত-গৌরব জমিদার, মহাজন, ধনোৎপাদনকারী কলকারখানার মালিক আর এদের সবার চেয়ে সংখ্যায় বেশী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ ব্যবস্থায় সমাজ যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তার বিশদ রূপ বর্ণনা না করে এই একটি মাত্র কথা বললেই চলে : সমাজে ভাঙন ধরেছে। তার স্পষ্ট পরিষ্কার মানে চাষীদের অনেকেরই চাষ করবার মত জমি নেই—ক্রমেই বৃত্তিহীন হয়ে মধ্যবিত্তের ছেলেরা মজুরের দল ভারি করছে আর মেয়েরা করছে দেহ বিক্রয়। এখন প্রশ্ন

হবে সমাজ-সচেতন সাহিত্য কোন্ বিশেষ শ্রেণী বা ঘটনা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে পাঠকের দাবী পুরণ করতে পারে। যে শ্রেণীর দাবী এগিয়ে আসছে তাদের কথায়ই কি সাহিত্য হয়ে উঠবে মুখর, না যারা অস্তমান তাদের ট্র্যাজেডিতে সাহিত্য হবে করুণ। উভয়পক্ষেই সমাজ-সচেতন সাহিত্যের কাছে দাবী জানাতে পারে। তৃতীয় দাবীও একটি আছে—ধনোৎপাদন যন্ত্রের যাঁরা মালিক তাঁদের জীবন-যাত্রার সংগ্রাম বা শান্তিও বা বাদ যাবে কেন? তাঁরাও ত সমাজেরই প্রাণী!

কিন্তু পাঠকরা যে-সমাজ-সচেতন সাহিত্যের দাবীতে এই তিন দলকেই রূপায়িত দেখতে চান এমন নয়। তাঁরা চান ভবিষ্যৎ সমাজের দাবীদার শ্রেণীর কথাই শুনতে। মানে তাঁরা সমাজ-সচেতন সাহিত্য চান না, চান একটা বিশেষ শ্রেণী-সাহিত্য—যে-শ্রেণী আজকের নির্যাতন উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যৎকে হাতের মুঠোয় নিতে পারবে। যে-সব সাহিত্যিক এ ধরণের সাহিত্য তৈরী না করে দেশী বুর্জোয়া সমাজ কিম্বা মধ্যবিত্তের ফাঁকা হতাশাময় জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস তৈরী করছেন, সমাজের প্রতি অতি উৎসাহী পাঠকরা তাঁদের সমাজ-সচেতন বলতেও নারাজ। বিপ্লবের আগুন লেখকের মগজেই জ্বলে ওঠে জানতাম, এখন দেখছি বাংলাদেশে পাঠকরাই হয়ে উঠেছেন বিপ্লবী।

ইতিহাসের গতি যদি পাঠকদের আজ সচেতন করে দিয়ে থাকে তা সমাজের পক্ষে সত্যি আনন্দের বিষয়। কিন্তু এ পাঠক কারা? নিশ্চয়ই চাষী-মজুর শ্রেণী থেকে এঁরা উঠে আসেন না—নেহাৎই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক যাঁরা এমন কি শ্রেণীসুলভ দাদাগিরি স্বার্থ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারেন নি। এঁরা নিজেদের চাকরি, বাজার, বংশ-বৃদ্ধি এবং ঘুম পুরোপুরি বজায় রেখে সাহিত্যের মারফৎ শুনতে চান চাষী-মজুরদের জীবন-কাহিনী। এর পেছনে ফাসন ছাড়া যদি মনস্তত্ত্ব কিছু থেকে থাকে সে যে কতদূর বিকৃত ও অসুস্থ তা হয়ত চোখে আঙুল দিয়ে না দেখালেও চলে। চাষী-মজুররা কি করবে না করবে, কি করছে না করছে তা শুনে এই পাকা চাকরিজীবীর দল কি পরমার্থ লাভ করবে?

কিন্তু সে বিচার কে করে? পাঠকের এই ঘোষণা শুনতে পেয়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে—কতকগুলো বাঁধা-ধরা বুলি রচনায় ঠেসে দিয়ে সবাই তাঁরা সমাজ-সচেতন বা শ্রমিক-চেতন সাহিত্য তৈরী করতে লেগে গেছেন। শোনা গেছে শ্রমিক রাজ্য সোভিয়েট রাজ্য, দেখা গেছে শ্রমিকেরা লাল ঝাণ্ডার জয় ঘোষণা করে চলে—ততঃ কিম্? কল্পনা-বিলাসী সাহিত্যিকদের আর কিছু প্রয়োজন ত নেই। রচনার পট পরিবর্ত্তন হয়ে গেল বালীগঞ্জ রাণীগঞ্জে বদলে গেল, লেকের বদলে বসল এঁদোপুকুর, নায়ক-নায়িকার নামের হ'ল হেরফের—কিন্তু যা তাঁরা বলছিলেন তাই বলে চললেন—দিব্যি শ্রমিক-সচেতন সাহিত্য তৈরী হয়ে গেল। পাঠকরা বললেন: তোফা। কারণ এর চেয়ে বেশী শ্রমিক-সচেতন তাঁরা নন বা হ'তে চান না। পাঠক-লেখকের বোঝাপড়ায় বাংলা সাহিত্য সমাজ-সচেতনতার পরমার্থ লাভ করল।

জীবনে অনেক বিকৃতিই আমাদের সহ্য করতে হয়, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে অজ্ঞতার জোয়ার শুধু ব্যক্তির জীবনে নয়, সমাজ-জীবনের পক্ষেও মারাত্মক। সত্যি বলতে কি, বাংলা দেশের সমাজ সম্বন্ধে পাঠক বা লেখক কেউ ওয়াকিবহাল নন। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে নিজেদের জীবন যুক্ত সে সম্বন্ধেও স্পষ্ট বা সত্য ধারণা এঁদের নেই। উর্ব্বশীকে মধ্যবিত্ত রক্তে আহ্বান জানালেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেহারা ফুটে ওঠে না। নিজের জীবনের ভিত্তির চেহারা যাঁদের কাছে অপরিচ্ছন্ন তাঁদের কাছ থেকে শ্রমিক-সচেতন বিপ্লবী সাহিত্য ত দূরের কথা, সমাজের স্থিতাবস্থার অথবা মধ্যবিত্ত সচেতন সাহিত্যেরও আশা বৃথা। সহরের ফিকে জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়া তার কোন গভীর অভিজ্ঞতা যাঁদের নেই, তাঁরা নিজের কান কেটে সমাজের যাত্রা ভঙ্গ করতেই ওস্তাদ। পাঠকরা যদি বাংলা দেশের সত্যিকারের সমাজ-রূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের দাবী জানাতেন—তা হ'লে আজ লেখকদের মধ্যে এই সুবিধাবাদ তৈরি হ'ত না, বেরিয়ে আসতেন দলে দলে সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক যাঁদের মধ্যে বিপ্লবী সাহিত্যিকেরও উঁকিঝুঁকি থাকত।

কিম্বা লেখকরা যদি কারও প্ররোচনার অপেক্ষা না ক'রে সমাজের দিকে ফিরে তাকাতেন, তার পর তাঁদের সেই অভিজ্ঞতাকে ফুটিয়ে তুলতেন সাহিত্যে, তা হ'লেও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ভাবনার কিছু ছিল না। কিন্তু লেখকদের কাছে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আমরা আরো কিছু পেতে চাই—চাই সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অভ্রান্তিক ধারণা—নইলে যে কোন সময় তিনি উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে কেলেঙ্কারী ক'রে বসতে পারেন। এ ধরণের লেখকদের প্রচারিত সাহিত্যের দরুণই সমাজ ভুল পথ ধরে ভাবতে সুরু করে।

আজকের দিনে প্রাণহীন অনুভূতিহীন যে মেক্যানিকাল শ্রমিক-সচেতন সাহিত্য তৈরী হচ্ছে তার পরিবর্ত্তে যদি লেখকরা নিজ শ্রেণীর ধ্বংসোন্মুখ অবস্থার চিত্রও স্পষ্ট করে আঁকতে পারতেন তাতেও বরং সমাজের ঢের বেশী উপকার হ'ত। বর্ত্তমানের বিরোধ আর সঙ্কট দেশের মনে প্রখর, পরিচ্ছন্ন না হয়ে উঠলে ভবিষ্যৎ জন্ম নিতে পারে না, বর্ত্তমান অনিশ্চিত কাল পর্য্যন্ত নিজের পঙ্গুতারই জের টেনে চলে। "শ্রমিকের জীবনের শরীক" যে না হবে তার পক্ষে শ্রমিক-সাহিত্য তৈরী করা শুধু সত্যকে মিথ্যার রূপ দেওয়া। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে এমন কেউ হয়ত নেই যিনি নিজের শ্রেণীকে ভুলে শ্রমিকের আশা-আকাঙ্ক্ষার সামগ্রিক চেহারাটা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে পারেন। এমন দুর্লভ লোক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলোতেই বিরল, বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনাবির্ভাব অস্বাভাবিক নয়। তার চেয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকরা যদি সমাজের একটা দিকের ভাঙন-ধরা ইতিহাসও বর্ণনা করে যেতে পারেন, আন্তরিকতার রং-এ শিল্পেরও তাতে মান বাঁচবে, সুস্থ পাঠক সম্প্রদায় তাঁদের বলবে যে মানুষ সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন।

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য)

—

পুস্তক-পরিচয়

শতাব্দী—শ্রীরণজিৎকুমার সেন। প্রকাশক: সংহতি পাবলিশিং হাউস, ৭নং মুরলীধর সেন লেন।

প্রত্যেক যুগে এমন কয়েক জন কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়, যাঁহারা বর্ত্তমানের শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহেন এবং অনাগতের আহ্বানে সাড়া দেন। তাঁহাদের কাব্য ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতের বাণী স্পন্দিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশ দুঃখ-দারিদ্র্য-নিপীড়িত। এখানকার সাহিত্যে এই জাতীয় কাব্যের বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে, কারণ অনাগতের উপরে বিশ্বাসই বর্ত্তমানের দৈন্যকে সহনীয় করিয়া তুলিতে পারে। শ্রীরণজিৎকুমার সেনগুপ্তের 'শতাব্দী' কাব্যগ্রন্থে এই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আহ্বান আবেগময় অভিব্যক্তি পাইয়াছে। যে যুগ-দেবতা সাম্যের বাণী প্রচার করিবেন, যিনি আমাদের বন্ধনপাশ মুক্ত করিবেন, যিনি নৈরাশ্যক্লিষ্ট জাতিকে নূতন আশায় উদ্বোধিত করিবেন, তিনি এই কাব্যগ্রন্থে নানারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। শুধু যে বিষয়বস্তুর অভিনবত্বই এই কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দিয়াছে, তাহা নয়; এই কাব্যের প্রত্যেকটি চিত্র উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি অকুণ্ঠিত দৃঢ়তার সহিত স্বীয় অনুভূতিকে রূপ দিয়াছেন। তবুও নিছক প্রচারধর্মী রচনার মত এই কাব্য শুধু মতের প্রকাশেই পর্য্যবসিত হয় নাই; পদলালিত্যে ও ছন্দো-বৈচিত্র্যে প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই বিশিষ্টতা দাবী করিতে পারে। কোথাও অনুকরণপ্রিয়তার আভাষ নাই, কোথাও জড়িমা নাই, কোথাও অনাবশ্যক বাহাদুরী নাই। প্রত্যেকটি কবিতা সরল ও স্বচ্ছন্দ-গতি, তাই অনায়াসেই মনের উপর রেখাপাত করিতে পারে।

আমি নবীন কবিকে প্রতিভা-স্বাতন্ত্র্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

মানুষের প্রেম—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মজুমদার (গল্পসমষ্টি) মূল্য ১৲।

বইখানি চারিটি প্রেমের গল্পের সমষ্টি। প্রেমের যে চিরন্তন লীলাবিলাস সমগ্র যুক্তিকে ছাপিয়ে মানব-মানবীকে বস্তু-জগতের ঊর্দ্ধে এক অপূর্ব্ব রহস্যালোকে টেনে নেয়, আলোচ্য গল্পগুলি সেই আদিমকামনার (Primordial instinct) মোহময় মুহূর্ত্তগুলির পরিভাষা।

উদগ্র বাস্তববাদে সাহিত্যের আসর যখন ভারাক্রান্ত তখন বীরেনবাবুর এই সরস গল্পকটি একঘেয়েমি ক্লান্তি দূর করে।

লেখকের ভাষায় প্রতিজ্ঞা আছে, দৃশ্য-বিচারেও আছে সবল দৃষ্টিভঙ্গি। তবে স্থানে স্থানে গল্পের কলেবর অনীপ্সিত দৈর্ঘ্যে অপ্রয়োজনের বাহুল্যে পুষ্ট।

গল্পগুলির সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে লেখকের অন্তরঙ্গ অনুভূতি। গভীর ভাবাবেগে স্বপ্নবিহ্বলতা তাঁর বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার পরিচয় দেয়। আর সেই কারণেই বোধ করি সাহিত্য-সংযমের শাসন তার ভাবাকুতিকে দমাতে পারে নি স্থানে স্থানে।

দেহের দাবীকে ছাড়িয়ে কল্পলোকের অনুভূতি-প্রধান অপার্থিব মুহূর্ত্ত আর দেহসর্ব্বস্ব যৌন সম্ভোগের আবেগময় অনুভূতি—উভয়ের রূপায়নেই পুস্তকখানা সমৃদ্ধ।

কাগজের দুর্ম্মূল্যতার জন্যেই বোধ করি দু-রকমের কাগজ দেওয়া হয়েছে।

লেখকের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে—তাঁর ভবিষ্যত নিঃসঙ্কোচে আশাপ্রদ।

শ্রীঅম্বিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক: সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ, ২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিকাতা। দাম পাঁচসিকা।

অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে, ভারতের রাষ্ট্র-চিন্তার জন্ম হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে। এ ধারণার মধ্যে কিঞ্চিৎ সত্য যেমন আছে, তেমনি কিঞ্চিৎ মিথ্যার ভেজালও রয়েছে। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস রূপ পরিগ্রহ করার পর থেকে রাষ্ট্র চিন্তা ব্যাপক ভাবে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—এ কথা সত্য; কিন্তু তারও বহু পূর্ব্ব থেকে, রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে, ভারতবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্র-চেতনা জেগেছিল। এই রাষ্ট্র-চেতনার রূপ হয়ত বিক্ষিপ্ত ছিল—কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই রাষ্ট্র-চেতনারই বিক্ষিপ্ত প্রকাশ আমরা দেখি নীল-আন্দোলন, রায়ত-আন্দোলন, কুলি-আন্দোলন প্রভৃতির মধ্যে। সব আন্দোলনই কংগ্রেস-পূর্ব যুগের ঘটনা। ভারতের এই রাষ্ট্র-বোধকে সজাগ করতে রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্ম যে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, সে কথাকেও কোন ক্রমে অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান পুস্তকে ভারতের এই রাষ্ট্র-চিন্তার জাগরণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রধানত রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকে সুরু করে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত প্রধান ঘটনাগুলো বর্ত্তমান পুস্তকে আলোচিত হয়েছে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গ্রন্থকার ভারতের রাষ্ট্র-জীবনের এই ৭০ বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী এবং নামকরা সাংবাদিক। ভারতের রাষ্ট্র-জীবনের ঘটনাবলীর তিনি শুধু নীরব দর্শক নন—প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারীও বটে। সাংবাদিক হিসাবেও তিনি সুপরিচিত; তিনি "দৈনিক ভারতের"র সম্পাদক ছিলেন এবং ইতিপূর্বে প্রাচীন বাঙ্গলার সম্বন্ধে অনেক গবেষণা-মূলক প্রবন্ধও তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। অতএব 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া' নির্মাণে তিনি যে সুযোগ্য শিল্পী সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রায় ১১০ পৃষ্ঠার এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি যে নিরপেক্ষতা, সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সমাজ-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। তাঁর দৃষ্টি প্রধানতঃ বাঙলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির উপর নিবদ্ধ হ'লেও, তিনি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জাতীয় নেতাদের উপর অবিচার করেন নি। তবে রাষ্ট্রিক আন্দোলনে বাঙলা দেশই ছিল প্রধান অগ্রদূত; তাই বাঙলার কথা তাঁর বইয়ে প্রাধান্য পেয়েছে। এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া রচনায় প্রভাত বাবু কোন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দেন নি এটাও সুখের বিষয়। আমাদের রাষ্ট্র-চিন্তার জাগরণে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি যার যতটুকু দান আছে, প্রভাতবাবু নিঃসঙ্কোচে সেটা স্বীকার করেছেন।

গ্রন্থখানি মোটের উপর সুলিখিত হ'লেও মাঝে মাঝে প্রকাশভঙ্গী আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে নি। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক ব্যক্তির পক্ষেই বর্তমান পুস্তকখানি পড়ে দেখা উচিত। বহু তথ্যপরিপূর্ণ এই পুস্তকখানির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

গোপাল ভৌমিক

গান্ধী-জিন্না-গবর্ণমেণ্ট-সংবাদ

মহাত্মা গান্ধী মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিকট একখানি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট পত্রখানি মিঃ জিন্নার নিকট পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই। এই সরকারী সিদ্ধান্তের কথা মহাত্মা গান্ধী এবং মিঃ জিন্না উভয়কেই জানান হয় এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ বিবৃত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি ইস্তাহারও প্রকাশ করেন। এই পত্র আটক করিবার যে-কারণ সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ইস্তাহারে জানান হইয়াছে :—

"সঙ্কটাপন্ন মুহূর্তে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা গুরুতররূপে ব্যাহত করিয়া যাহার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অস্বীকার করেন নাই এইরূপ এক বে-আইনী গণ-আন্দোলনের জন্য যে ব্যক্তিকে আটক রাখা হইয়াছে, তাঁহার সহিত রাজনৈতিক পত্রলিপি বা সংযোগস্থাপনের সুযোগ দিতে তাঁহারা (ভারত-সরকার) প্রস্তুত নহেন।"

ইতিপূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য অনুমতি প্রার্থনার ফল যাহা হইয়াছে তাহার আলোক-সম্পাতে গবর্ণমেণ্টের এই অস্বীকৃতিকে বিবেচনা করিলে বিস্মিত হইবার কিছু ইহাতে পাওয়া যাইবে না। ইহা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়। কিন্তু মিঃ জিন্নার নিকট মহাত্মা গান্ধীর পত্র লেখা ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। ২৪শে এপ্রিল মুসলিম লীগের নয়াদিল্লী অধিবেশনে মিঃ জিন্না ঘোষণা করিয়াছিলেন :

"গান্ধীজী যদি সত্যসত্যই মুসলিম লীগের সহিত আপোষের জন্য ইচ্ছুক হইয়া থাকেন তাহাতে আমা অপেক্ষা কেহই অধিকতর আনন্দিত হইবে না। আপনারা জানিয়া রাখুন, তাহাই হইবে হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। ইহাই যদি গান্ধীজীর ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আমার নিকট সরাসরি পত্র লিখিতে তাঁহার বাধা কোথায়? (উল্লাসধ্বনি) পত্র লিখিতে তাঁহাকে কে বাধা দিতে পারে? (পুনরায় উল্লাসধ্বনি) বড়লাটের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কি? এই গবর্ণমেণ্ট এদেশে শক্তিশালী হইতে পারেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, আমার নিকট প্রেরিত পত্রকে তাঁহারা আটকাইয়া রাখিতে সাহস করিবেন। (আরও উল্লাসধ্বনি)। এইরূপ পত্র যদি আটক করা হয় তাহা হইলে ভয়ানক কিছু ঘটিয়া যাইবে।"

সমগ্র ভারতে মিঃ জিন্নার মত শক্তিশালী যে আর কেহ নাই, এই গর্ব্বিত ঘোষণায় স্পর্দ্ধার সহিত তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ঘোষণার পরিণতি কি ভাবে হইতে পারে মিঃ জিন্না হয়তঃ তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির জন্য মিঃ জিন্না কিছু করিলেন না এই প্রশ্নটা অনেকের মনেই শুধু উঠে নাই, প্রকাশ্যেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। মিঃ জিন্নার কাছে এই প্রশ্নটা মোটেই প্রীতিকর হয় নাই, তাহা অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। বোধ হয় এই জন্যই মিঃ জিন্না এই পথটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। নিজেরও বাহাদুরী বজায় রহিল, অথচ মহাত্মা গান্ধীর মুক্তির জন্য তিনি কিছুই করিলেন না, এ কথা বলিবারও আর পথ রহিল না। কারণ মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আহ্বানে সত্য সত্যই সাড়া দিবেন, ইহা হয়তঃ মিঃ জিন্নার ক[illegible]রও বাহিরে ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সত্যই তাহা ঘটিয়া গেল এবং ঘটিলও মিঃ জিন্নার পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক ভাবে। মিঃ জিন্নার আহ্বানে সাড়া দিয়া মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট মিঃ জিন্নার গর্ব্বিত উক্তির খাতির না করিয়া পত্রখানি করিলেন আটক। এইরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ লোকের মনে যেরূপ ধারণা হওয়া উচিত তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। সকলেরই বোধ হয় মনে হইয়াছিল, এইবার মিঃ জিন্না বুঝি সত্যই ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবেন। এই পত্র আটক রাখা ব্যাপার সম্পর্কে মিঃ জিন্না যে-বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা অপ্রত্যাশিত ভাবেই সকলকে নিরাশ করিয়াছে। কিন্তু মুসলিম লীগের

নীতির স্বরূপ সম্পর্কে সত্যিকারের পরিচয় যাঁহার আছে তিনি মিঃ জিন্নার নিকট হইতে অনুরূপ বিবৃতি আশা করিতে পারেন না।

মিঃ জিন্নার বিবৃতির মূলকথা এই যে, মহাত্মা গান্ধীর পত্রখানি আসলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত লীগকে এক সংঘর্ষে জড়িত করিবার চেষ্টা মাত্র। এখানে মিঃ জিন্না একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার নেতৃত্ব যে বৃটিশ প্রশ্রয়ে পরিপুষ্ট তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং অন্যের প্ররোচনায় তিনি সেই আশ্রয়ের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবেন, এরূপ নির্ব্বোধ তাঁহাকে কেহ-ই মনে করে না। তবে তাঁহার গর্ব্বিত উক্তি যে জলবুদ্বুদের শূন্যগর্ভ এবং ক্ষণভঙ্গুর মহাত্মা গান্ধীর পত্রে তাহাই শুধু প্রমাণিত হইয়াছে।

মিঃ জিন্না মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শুধু দোষারূপ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরোক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করিয়া সাফাই-ও গাহিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন :

"কিন্তু তথাপি কোন কোন দায়িত্বশীল হিন্দুনেতা এই বলিয়া আমার উপর চাপ দেন যে, মিঃ গান্ধী যে একটা ভুল করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাকে সুযোগ দিলে তিনি যে-নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে এবং উহা প্রত্যাহার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। পাকিস্থান সম্পর্কেও তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পাকিস্থানের ভিত্তিতে একটা মীমাংসা করিতেও তিনি ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদিগকে মিঃ গান্ধীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে না দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই হিন্দু-মুসলমান মিলনে বাধা দিতেছেন। এই জন্যই আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, মিঃ গান্ধী যদি আমাকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব নীতি এবং ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখের প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য্যতালিকা বাতিল করিয়া এখনো পাকিস্থানের ভিত্তিতে মুসলিম লীগের সহিত মিটমাট করিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে আমরাও অতীতকে বিস্মৃত হইতে প্রস্তুত আছি। আমার এখনো বিশ্বাস আছে যে, গবর্ণমেণ্ট কখনও আমার নিকট লিখিত মিঃ গান্ধীর ঐ ধরণের চিঠি আটক রাখিতে সাহসী হইবেন না।"

মিঃ জিন্না সকলকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধীর নিকট হইতে যেরূপ পত্র তিনি চাহিয়াছিলেন, সেরূপ পত্র তিনি লিখেন নাই বলিয়াই ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্র আটকাইয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তিনি যেমনটি পত্র চাহিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী যদি তেমনটি পত্র লিখিতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের সাধ্য কি ছিল উহা আটকায়! মিঃ জিন্নার মনের ভাবটা বুঝিতে পারিয়াই যেন ভারত গবর্ণমেণ্ট ঐ পত্র আটকাইয়াছেন—অর্থাৎ কার্য্যটি মিঃ জিন্নার অভিপ্রায় অনুযায়ীই হইয়াছে।

এখানে একটা প্রশ্ন অবশ্যই উঠিতে পারে যে, পত্রই যখন আটক করা হইল তখন মিঃ জিন্না কিরূপে জানিলেন, তিনি যেমন চাহিয়াছিলেন পত্রখানা তেমন হয় নাই? এই পত্র আটক ব্যাপারে একটা নূতনত্ব এই যে, গবর্ণমেণ্ট পত্র আটক করিলেন বটে, পত্রের বিষয়বস্তুটা সেই সঙ্গে জানাইয়া দেওয়া হইল। মিঃ জিন্নাও এমন বিবৃতি দিলেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে লীগের বিরোধ বাঁধা তো দূরের কথা, উহা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মতের অনুকূল হইয়াছে। বরং মিঃ জিন্নার দাবী গবর্ণমেণ্টের দাবী অপেক্ষাও অনেকখানি চড়া। বোম্বাই প্রস্তাব বর্জ্জন করিলেই মহাত্মা গান্ধী গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মুক্তি অর্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু মিঃ জিন্নার দাবী, বোম্বাই প্রস্তাব বর্জ্জন এবং পাকিস্থান স্বীকার। তাহা হইলেই তিনি মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে পারেন। মিঃ জিন্না যদি মনে করিয়া থাকেন, গবর্ণমেণ্টের এই আদেশে তাঁহার অসম্মান হয় নাই, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। সম্মান ক্ষুন্ন হইল কি হইল না, তাহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। সকলের অসম্মান বোধ সমান নয়।

—

সপ্তরথী-বেষ্টিত মিঃ জিন্না

মিঃ জিন্না তাঁহার বিবৃতিতে শূন্যগর্ভ বীরত্ব প্রকাশ

করিয়া বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর উপর তিনি এক হাত লইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বতঃপ্রকাশ বিবৃতির স্বরূপ কাহাকেও ফাঁকি দিতে পারে নাই। পাকিস্তানের অনুরাগী শ্রীযুত রাজাগোপাল আচারী পর্য্যন্ত মিঃ জিন্নার বিবৃতিতে দুঃখিত হইয়া বলিয়াছেন, মিঃ জিন্না এমন একটা মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহা লীগের নীতি ও মর্য্যাদার দিক হইতে আত্মঘাতী নীতি। তবে রাজাজী সহজে দমিবার পাত্র নহেন বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই বিবৃতির পরেও জাতীয় চুক্তি করিবার পথে গবর্ণমেণ্ট যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দূর করিবার উপায় নির্দ্ধারণার্থ জেলের বাহিরে যে সকল নেতা আছেন, তাঁহাদের সম্মেলন আহ্বান করিতে মিঃ জিন্নার পক্ষে কোন বাধা নাই। দেখা যাইতেছে রাজাজী এখনও পাকিস্তানী গোলক ধাঁধার মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতেছেন।

মিঃ জিন্নার বিবৃতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কুমার স্যার জগদীশ প্রসাদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ সামসুল উলেমা কামালুদ্দিন যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। স্যার জগদীশপ্রসাদ বলিয়াছেন, "ভারতীয়েরা মিঃ জিন্নার এই বিবৃতিকে কোন আমল না দিলেও মিঃ আমেরী কমন্স সভায় পরম শ্রদ্ধার সহিত উহার পূর্ণ ব্যবহার করিবেন তাহা সকল ভারতীয়ই অবগত আছেন।" মিঃ কামালুদ্দিন বলিয়াছেন, মিঃ জিন্না গবর্ণমেণ্টকে খোস-মেজাজে রাখিতে চান, বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার মন্ত্রীরা গবর্ণরের সমর্থন লাভ করিয়া বেশ ভাল ভাবে চলিতে পারেন সম্ভবতঃ ইহাই এই বিবৃতির উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন কংগ্রেস দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় লীগ উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে, মিঃ জিন্না তাঁহাদের সেই ধারণাটা নষ্ট করিয়া দিলেন। হায়দরাবাদের ডাঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ বলিয়াছেন,

"লীগ যে উচ্চাবস্থায় অবস্থান করিতেছিল, তথা হইতে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা সমাধানের পক্ষে একটা সুযোগ আসিয়াছিল এবং সে সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করিলে লীগের প্রতিষ্ঠা আরও বর্দ্ধিত হইত। এই চমৎকার সুযোগ মিঃ জিন্না এমন কি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সহিত বিবেচনা না করিয়াই উপেক্ষা করিলেন।"

মিঃ জিন্না সত্যই ভুল করিয়াছেন, না লীগের আদেশ অনুযায়ীই তিনি বিবৃতি দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু লীগপন্থীদের মধ্যেও সকলে তাঁহার এই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। মাদ্রাজ প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সেক্রেটারী মিঃ এ, এম আল্লা পিচাই মহাত্মা গান্ধীর প্রতি মিঃ জিন্নার মনোভাবের প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। মিঃ জিন্নার নিকট পত্রে তিনি লিখিয়াছেন,

"আপনি যে ভাবে গান্ধীজীর পত্রের অর্থ করিলেন, তাহা আমার নিকট অবোধ্য। এই চিঠির পর আপনি যদি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন তবে আপনার বা মুসলিম লীগের কোন ক্ষতি হইত না। আপনার সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থায় একটা বিপ্লব সৃষ্টি করিত এই আমার বিশ্বাস। ভারতের দুর্ভাগ্য, তাহার দুঃখের বোঝা বোধ হয় আরও ভারী হওয়া উচিত। একমাত্র আল্লার দয়ায় ভারত রক্ষা পাইতে পারে। ভারত আজ ভারতীয় এবং বৃটিশ উভয়ের নিকট শুধু প্রতারণা পাইয়াছে।"

মুসলীম লীগের অন্যতম মুখপত্র লাহোরের উর্দ্দু পত্রিকা 'জমিদারে'র সম্পাদক মৌলানা জাফর আলি খাঁ একজন বিশিষ্ট লীগ-নেতা। এই পত্রিকায় মিঃ জিন্নার বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে।

"দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে কায়েদে আজম মিঃ জিন্না যে সব কথা বলিতেছেন তাহা তাঁহার পদোচিত নহে এবং মুসলমান জাতির নেতার যোগ্যও নহে। এক্ষেত্রে সত্য কথা বলিলে যদি অপরাধ না হয়, তবে আমরা নিঃশঙ্ককণ্ঠে বলিব যে আসন্ন সময়ে আমাদের কায়েদে আজম এমনই ভীরুতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার আশ্রয় লইয়া সহসা পশ্চাদপসরণ করিয়াছেন যাহার নজির খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর। বলিতে কি, কায়েদে আজমের এই ভীরুতা ও পশ্চাদপসরণ মুসলিম লীগের ইতিহাসে একটি অতিরিক্ত অপমানকর অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছে।"

'জমিদার' পত্রিকাকে কায়েদ-ই-আজম কি শাস্তিবিধান

করিবেন জানি না, তবে এ কথা সত্য যে অতখানি কড়া মন্তব্য লীগ-বিরোধীরাও করিতে পারেন নাই। খাকসার নেতা আল্লাকা মাস্‌রিকিও মিঃ জিন্নার আচরণ সমর্থন করেন নাই। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আমন্ত্রণরক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া মিঃ জিন্নাকে এক পত্র দিয়াছেন এবং একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন :

"পাকিস্তানের সাদা চেক দিয়া মহাত্মাজী তাঁহাকে চিঠি লিখিবেন—কায়েদে আজমের এই দাবী সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার মনে হয়, কায়েদে আজম আপনার সৃষ্ট গণ্ডগোলে আপনি জড়াইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ভারতের মুসলমানেরা যদি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান কামনা করে এবং বিশ্বাস করে তাঁহারা উহা লাভ করিবে, তাহা হইলে তাঁহাদের জানা উচিত যে কংগ্রেসের সহিত একটি বোঝাপড়ার পরই উহা সম্ভব হইতে পারে। মিঃ জিন্নার এখন যে কোন উপায়ে হউক মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব অঙ্গীকার রক্ষা করা উচিত।"

এই সকল পত্রাঘাত এবং সংবাদপত্রের মন্তব্যে মিঃ জিন্না যদি মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারেন, তবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নহে। মেজাজ সত্যই তিনি ঠিক রাখিতে পারেন নাই। করাচীতে প্রেস কনফারেন্সে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "আমি কি এখানে কাঠগড়ার আসামী যে তোমরা এই ভাবে আমাকে জেরা করিতেছ?" কায়েদ-ই-আজমকে জেরা করিবার দুঃসাহস যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা ইহা ছাড়া আর কি উত্তর পাইবেন? অতঃপর প্রেস কনফারেন্সের মায়া পরিত্যাগ করাই কায়েদ-ই-আজমের যোগ্য হইবে। এই সমালোচনার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার মধ্যে মিঃ জিন্না একমাত্র তাঁহার অনুকূলে পাইয়াছেন কম্যুনিষ্ট নেতা মিঃ যোশীকে। মিঃ যোশী বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "গান্ধীজী যখন মিঃ জিন্নার নিকট পত্র লিখেন, তখন সত্য সত্যই আমরা আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু উহাতে ফাঁক ছিল—তিনি লিখেন নাই যে, কংগ্রেস-লীগ মিলনের জন্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করিয়া আলাপ চালাইবেন।" ঐ ফাঁকটুকু না থাকিলে আমাদের জাতীয় ঐক্য হইয়া গিয়া[illegible]ল আর কি? কিন্তু ঐ ফাঁকটুকু! মিঃ জিন্না মনে করিলেন, উহা ফাঁক নয় ফাঁদ, কাজেই ফাঁদে আর তিনি ধরা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার ওকালতিতে মিঃ জিন্না যে ফাঁকে আর ফাঁদের পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম নাবালক বনিয়া গেলেন, সে কথাটা বোধ হয় মিঃ যোশীর মনে হয় নাই: মিঃ জিন্নাও তাঁহাকে ওকালতির নগদ দক্ষিণা দিতে ভুলেন নাই—তিনি মিঃ যোশীকে হিন্দু-নেতা বানাইয়া ছাড়িয়াছিলেন।

—

দুইটি নূতন বিধান

ভারত গবর্ণমেণ্ট মুদ্রাস্ফীতি (inflation) নিবারণের জন্য একটি নূতন অর্ডিনান্স এবং 'ব্যাঙের ছাতার মত' ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা নিবারণ কল্পে ভারতরক্ষা বিষয়ক একটি নূতন বিধি (৯৪নং বিধি) জারী করিয়াছেন। এই দুইটি নূতন বিধান সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেরেমী রেইসম্যান গত ১৭ই মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, উক্ত ব্যবস্থা দুইটির ফলে দেশের দ্রব্যমূল্য সন্তোষজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া আশা করা যায়।

নূতন অর্ডিনান্স দ্বারা অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৬৬⅔ ভাগ ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত অংশ সরকারী তহবিলে আনিবার এবং বোনাস ও কমিশনের পরিমাণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। লাভের উপর ইতিপূর্ব্বে যে ট্যাক্স ধার্য্য আছে তদ্দ্বারা শতকরা ১৩⅓ ভাগ আয়কর এবং সুপার ট্যাক্স বাবত আদায় করা হইয়া থাকে এবং শতকরা ৬৬⅔ ভাগ আদায় করা হয় অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে। লাভের শতকরা ৮০ ভাগই গবর্ণমেণ্ট আয়কর, সুপার ট্যাক্স এবং অতিরিক্ত লাভকর হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত আয়করের এক পঞ্চমাংশের অনধিক গবর্ণমেণ্টের নিকট আমানত করার স্বেচ্ছামূলক বিধান ছিল। নূতন অর্ডিনান্স দ্বারা উহাকে বাধ্যতামূলক করা হইল। এই অর্ডিনান্সের বলে গবর্ণমেণ্ট লাভের শতকরা ৯৩⅓ ভাগ গ্রহণ করিবেন। উহা হইতে ২০ ভাগ করদাতার স্বার্থের জন্য রাখা হইবে। তন্মধ্যে ১৩⅓ অংশ করদাতার নিজস্ব

অর্থ। উহার উপর শতকরা দুই টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং আমানতের তারিখ হইতে দুই বৎসরের অথবা যুদ্ধ শেষ হওয়ার চারিমাসের মধ্যে (উভয়ের মধ্যে যে তারিখ পরবর্ত্তী হইবে সেই তারিখে) করদাতাকে উহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। ৬ষ্ঠ অংশ করদাতার সুবিধার জন্য রক্ষিত হইবে। উহাও তিনি ফেরৎ পাইবেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে উহা ফেরৎ দেওয়া হইবে। উহার পূর্ব্বেও ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারিবে যদি করদাতা প্রমাণ করিতে পারেন যে, তিনি উহা সুবিধাজনক উপায় নিয়োগ করিতে পারিবেন।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের জন্য এই নূতন অর্ডিনান্স দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইলেন যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে এ পর্য্যন্ত কথাটা স্বীকার করিতেছেন না কেন? বাধ্যতামূলক সঞ্চয় যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সময় যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িবে তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সমস্যার সমাধানের জন্য গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন কি? যদি পূর্ব্ব হইতে কোন পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সঞ্চয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের জনাই যদি বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে একটা কথা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন, অতিলাভ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা সম্ভব কি না? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে কোন বিবেচনা করিয়া নূতন অর্ডিনান্স এবং ভারতরক্ষা বিষয়ক ৯৪ নং বিধি জারী করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

নূতন অর্ডিনান্সের উদ্দেশ্য মুদ্রাস্ফীতি নিবারণ করা হউক কিম্বা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে সহায়তা করাই হউক ভারতরক্ষাবিষয়ক ৯৪ নং বিধি উভয় উদ্দেশ্যেরই প্রতিকূল। এই নীতি নূতন বিধি অনুসারে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বৃটিশ ভারতে মূলধন নিয়োগ করিতে, ষ্টক, শেয়ার প্রভৃতি বাজারে ছাড়া যাইবে না, কিম্বা বৃটিশ ভারতে বা বৃটিশ ভারতের বাহিরে কোন মূলধন নিয়োগ করিতে পারা যাইবে না। এই ব্যবস্থা দ্বারা মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইয়া মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের ব্যবস্থা ব্যর্থ করিয়া দিবে এবং ভারতে শিল্পবাণিজ্য প্রসারের পক্ষেও বাধা সৃষ্টি হইবে। এই সুযোগে ভারতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়ার আশঙ্কাও যে নাই তাহাও নহে। ভারতে বিদেশী মূলধনের নূতন নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার পূর্ব্বে ভারতীয় মূলধনের নূতন নিয়োগে কড়াকড়ি ব্যবস্থা ভারতীয় শিল্পোন্নতির পক্ষে অতিশয় প্রতিকূল।

—

ন্যায় বিচারের দাবী

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং ডাঃ এম, আর জয়াকর প্রমুখ ছয়জন বিশিষ্ট ভারতীয় নেতা একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এক তরফা অভিযোগ সমূহ একটি অবিসংবাদিত মর্য্যাদা এবং নিরপেক্ষতা সম্পন্ন একটি ট্রাইবুনাল দ্বারা তদন্ত করাইতে এবং কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত না হইলে অন্যান্য প্রধান প্রধান দলগুলির সহায়তায় অচল অবস্থা অবসানকল্পে তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়ার দাবী করিয়াছেন। ট্রাইবুনাল গঠনের বিরুদ্ধে যে-দুইটি আপত্তি গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, এই বিবৃতিতে তাহাও তাঁহারা খণ্ডন করিয়াছেন। প্রথম আপত্তি এই হইতে পারে যে, যুদ্ধের সময় এই সব অভিযোগের তদন্ত করা সুবিধাজনক হইতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, জগদ্বাসীর নিকট নেতৃবৃন্দের নিজদিগকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করার যে সম্ভাব্যতা আছে মহাত্মা গান্ধীর নিকট ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে বড়লাট নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং এই সম্ভাব্যতাকে বর্ত্তমানে কার্য্যে পরিণত না করিবার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা করিলে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে। ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন যে, নেতৃবৃন্দকে

এতদিন আটক রাখার ফলে ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মনে গভীর অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে।

ভারত রক্ষা বিষয়ক ২৬নং বিধি সম্পর্কে ফেডারেল কোর্টের রায়ের কথাও এই বিবৃত্তিতে উল্লেখ করিয়া নেতৃবৃন্দ বলিয়াছেন, "ভারতের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের পরিবর্ত্তে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক অর্ডিনান্স দ্বারা উহা আইনসিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন দেশ-হিতৈষী ব্যক্তিই উদ্বেগানুভব না করিয়া পারে না।"

নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের বিবৃতিতে যে দাবী করিয়াছেন তাহা মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের জন্য কোন সুবিধার দাবী নহে অথবা ইহা তাঁহাদের পক্ষ হইতে অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য আবেদন-নিবেদনও নহে। ইহা তাঁহাদের ন্যায় বিচারের দাবী। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে এই ন্যায় বিচারের দাবীতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। নেতৃবৃন্দের এই দাবীর ফলাফল সম্বন্ধে কমন্স সভায় প্রশ্ন করা হইয়াছিল। উত্তরে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলেন, মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য আটক-বন্দী কংগ্রেসী নেতাদিগকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস-নেতাদের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। একটি অভিযোগ তাঁহারা জাপানীদের পক্ষপাতী। দ্বিতীয় অভিযোগ গত আগষ্ট মাস হইতে দুই তিন মাস ধরিয়া ভারতে যে হিংসাত্মক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছে তজ্জন্য কংগ্রেসী নেতারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে দায়ী। প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে কমন্স সভায় মিঃ আমেরী বলিয়াছেন হোয়াইট পেপার আকারে পুনঃ প্রকাশিত ভারত গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে জাপানের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করার কোন অভিযোগ করা হয় নাই।' কিন্তু এইরূপ অভিযোগের মূলে যে কোন সত্য নাই তাহা মিঃ আমেরী বলেন নাই কেন? দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে এই কথা বলা যায়, হিংসাত্মক কার্য্যাবলীর সঙ্গে তাঁহার যে কোনও সম্পর্ক নাই, তাহা মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বেই বলিয়াছেন। তথাপি ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে বিচারার্থ আদালতেও উপস্থিত করিবেন না, অথচ শুধু অভিযোগের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগকে আটক রাখিবেন, এই সরকারী নীতির উদ্দেশ্য কি? কংগ্রেসের স্বাধীনতা ও জাতীয় গবর্ণমেণ্টের দাবী পূরণ না করিবার অজুহাতই সৃষ্টি কি উহার উদ্দেশ্য?

—

শাসন বনাম বিচার

ফেডারেল কোর্টের বিচারে ভারতরক্ষাবিষয়ক ২৬নং বিধি অসিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার পর উহাকে আইন-সিদ্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন অর্ডিনান্স জারী করেন। কলিকাতা হাইকোর্টে নয়জন রাজবন্দীর পক্ষ হইতে 'হেবিয়াস করপাস'-এর দরখাস্ত সম্পর্কে শুনানী চলিতেছিল। গত ৩রা জুন স্পেশাল বেঞ্চের তিন জন বিচার পতির মধ্যে দুই জন একমত হইয়া উক্ত নয় জন বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার নির্দ্দেশ দেন। নয় জন বন্দীর মধ্যে সাত জনকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল।

'হেবিয়াস করপাস' আবেদনের এই বিচার সম্পর্কে দুইটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিচার-পতিদ্বয় সাব্যস্ত করেন যে, কেন্দ্রীয় আইন-সভা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কোন আইন সরাসরি ভাবে সংশোধন করিবার বা বাতিল করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আইনে বড়লাটকে প্রদান করা হয় নাই। সুতরাং ১৯৪৩ সালের ১৪নং অর্ডিনান্সের ২ ধারা গবর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা বিবেচনায় বিধিবহির্ভূত। দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, হাইকোর্ট যে অবিলম্বে মুক্তির আদেশ দিলেন, পুলিশও তেমনি অবিলম্বে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন অনুসারে হাইকোর্টের গৃহেই পুনরায় তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিবার অনুমতির জন্য ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসলী দরখাস্ত করিয়াছেন। দেশবাসী আগ্রহের সহিত ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করিবে। অবিলম্বে মুক্তির আদেশের পাল্টা জবাব হিসাবে হাইকোর্টের গৃহেই

মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করায় হাইকোর্টের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কিনা, হাইকোর্টই তাহা নির্দ্ধারণ করিবেন। এ সম্পর্কে পুলিশ কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে রুল জারীর জন্য আবেদন করা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ গ্রেপ্তারে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতার সম্মুখে বিচার বিভাগের ক্ষমতা লোক-চক্ষুতে বিরূপ দেখায় শাসন কর্ত্তৃপক্ষের কি তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল না?

—

স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্স

স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্সের কয়েকটি ধারা বিধি-বহির্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া কলিকাতা হাইকোর্ট যে রায় দেন, বাংলা গবর্ণমেণ্ট সেই রায়ের বিরুদ্ধে ফেডারেল কোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। ফেডারেল কোর্টের তিন জন বিচারপতির মধ্যে দুইজন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যর্ বরদাচারিয়ার এবং বিচারপতি স্যর্ মহম্মদ জাফরউল্লা খাঁ উক্ত আপীল ডিসমিস করিয়াছেন। তৃতীয় বিচারপতি মিঃ রোল্যাণ্ড ইঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

বিচারপতি মিঃ রোল্যাণ্ডের অভিমত এই যে, কলিকাতা হাইকোর্ট আইনের প্রকৃতি ও নীতি সম্পর্কে ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অপর বিচারপতিদ্বয় মনে করেন, উহা আইনের নীতির সমালোচনা নহে, আসলে অর্ডিনান্সের ৫, ১০ এবং ১৬ ধারা অনুসারে শাসন কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যে অনির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য আইন কোন নীতি নির্দ্ধারণ করে নাই। রায়ে তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন, "আলোচ্য বিষয়ে ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, কোন্ মোকর্দ্দমাগুলির বিচার সাধারণ ফৌজদারী আদালতে হইবে এবং কোনগুলি স্পেশ্যাল কোর্টে হইবে সে-সম্পর্কে কোন নীতি বা নিয়ম নির্দ্ধারণ করা অর্ডিনান্স-প্রণেতা কর্ত্তৃপক্ষ এড়াইয়া গিয়াছেন এবং সমস্ত বিষয়টি শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের অনিয়ন্ত্রিত কার্য্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।" বিচারপতিদ্বয় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কার্য্যতঃ শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীর আদেশেই হাইকোর্টের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ কোন্ মোকদ্দমা অর্ডিনান্সের ২৬ ধারা অনুসারে স্পেশ্যাল কোর্টে বিচার হইবে তাহা শাসন বিভাগের কর্ম্মচারীদের ঐরূপ আদেশ বা নির্দ্দেশে নির্দ্ধারিত হয়।

এই মোকদ্দমায় যে-প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা রাষ্ট্র এবং প্রজাবৃন্দ উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইজন্য তাঁহাদের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের জন্য তাঁহারা অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ফেডারেল কোর্টের রায় প্রদানের পর একটি নূতন অর্ডিনান্স জারী করিয়া স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্স বাতিল করা হইয়াছে। অতঃপর প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করা হইবে কিনা বাংলা গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিবেন।

—

সীমান্তে মন্ত্রি-সভা

২৫শে মে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে: (১) সর্দ্দার মহম্মদ আওরঙ্গজেব খাঁ (প্রধান মন্ত্রী), (২) সর্দ্দার আবদুর রব নিশ্তার, (৩) খাঁ সামিনজান খাঁ, (৪) সর্দ্দার অজিত সিং এবং (৫) রাজা আবদুর রহমান।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা-পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা ৪২ জন। তন্মধ্যে কংগ্রেসী সদস্যদের ৮ জন বন্দী, পরিষদের অধিবেশনে তাঁহাদের উপস্থিত হইবার উপায় নাই। হিন্দু-মহাসভা দল নূতন মন্ত্রিসভার সমর্থক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের দুইজন সদস্য মৃত, তাঁহাদের স্থানে নূতন নির্ব্বাচন হয় নাই। এই দুইটি আসন শূন্য থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার সমর্থক দল অপেক্ষা মন্ত্রিসভার বিরোধী দলের সদস্য সংখ্যা বেশী। তবে কংগ্রেসী দলের আট জন সদস্য জেলে থাকায় নূতন মন্ত্রিসভার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত মন্ত্রিসভাকে নিয়মতান্ত্রিক বিধি অনুসারে গঠিত মন্ত্রিসভা বলা যায় কি?

—

বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পর মাদ্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ এবং বোম্বাই

প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসী দল একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু অনেক কংগ্রেসী সদস্য বন্দী। এই সুযোগে এই কয়েকটি প্রদেশেও যদি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতে অচল অবস্থা নাই একথা অবশ্যই বলা চলিবে। গান্ধী-জিন্না-গবর্ণমেণ্ট প্রসঙ্গে বিলাতের টাইমস্ পত্রিকা ভারতে নূতন নেতৃত্বকে উৎসাহ দিবার পরামর্শ দিয়াছেন। বিভিন্ন প্রদেশে যে মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টা চলিতেছে, ইহাই নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নাকি? কিন্তু কংগ্রেসী নেতারা মুক্তিলাভ করিলে এই নেতৃত্ব সামলান কঠিন হইয়া উঠিবে। নিয়মতান্ত্রিক রীতি রক্ষা না করিয়া মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে উহার অন্তঃসার-শূন্যতা চিরদিন অপ্রকাশিত থাকিবে না।

—

বীর সাভারকারের ফতোয়া

বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠনের যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাকে সমর্থন ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া এবং হিন্দুমহাসভা দলীয় সদস্যদিগকে উহাতে যোগদানের অনুমতি দিয়া হিন্দু-মহাসভার প্রেসিডেণ্ট বীর সাভারকর এক ফতোয়া জারী করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃবর্গকে মুক্ত করিয়া ভারতের অচল অবস্থা সমাধানের চেষ্টা করা অপেক্ষা সমাধানের নূতন পথটা তাঁহার খুব মনঃপূত হইবে ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবীও লীগ-হিন্দু মহাসভা কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনে কোন বাধা আর সৃষ্টি করিতে পারিবে না। বীর সাভারকর নির্দ্দেশ দিয়াছেন, মুসলিম মন্ত্রীরা পাকিস্তানের সমর্থনে যাহা করিবেন মহাসভাপন্থী মন্ত্রীরা প্রকাশ্যে তাহার বিরোধিতা করিবেন। প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভাও হিন্দুবিরোধী কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবেন। পাকিস্তান ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের মিতালী করিবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা বটে।

এখন প্রশ্ন এই যে, বীর সাভারকরের এই ফতোয়া দ্বারা বাংলার বর্ত্তমান অর্থসচিব শ্রীযুত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ কি সমর্থিত হইতেছে? যদি হয়, তাহা হইলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ অতঃপর কি করিবেন? ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া শ্রীযুত তারক বাবুকে পুনরায় দলে গ্রহণ করিবেন, না নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবেন? সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের স্ববিরোধটা বীর সাভারকরের ফতোয়াতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

—

আগামী পুরুষের মধ্যে

লণ্ডনে ভারতীয় চিত্রশালার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, "ভারতে বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দিয়াছে বিগত পুরুষ হইতে তাহার উদ্ভব হইয়াছে। তবে পরবর্ত্তী পুরুষে যাহারা আসিতেছে তাহারা বর্ত্তমান থাকিতেই যে এই সমস্যার নিঃশেষে মীমাংসা হইয়া যাইবে সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নাই।" বৃটেন এবং ভারত যে একই পরিবার-ভুক্ত এই ধারণা কিরূপে সৃষ্টি করিতে হইবে তাহার উপায়ও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পথটি হইতেছে এই: ভারতবর্ষকে স্বীয় স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াই বৃটেনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত থাকিতে হইবে, আর বৃটেনের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বৃটেনকেও ভারতের প্রাচীন শিল্প, সাহিত্য এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতি লাভের জন্য ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝিতে হইবে।

বর্ত্তমান পুরুষে ভারতীয় সমস্যার যে সমাধান হইবে না, সে-সম্বন্ধে আমেরী সাহেব নিশ্চিন্ত। তবে আমাদের পরে যাহারা আসিতেছে তাহাদের জীবন-কালের মধ্যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইবে, আমেরী সাহেব ভারতবাসীকে এই আশ্বাস-বাণী শুনাইয়াছেন। বোধ হয় আগামী পুরুষের মধ্যেই বৃটেন এবং ভারত এক পরিবার ভুক্ত হইয়া যাইবে। একশত বৎসরে যদি তিন পুরুষ হয়, তাহা হইলে বৃটিশের অধীনে ভারতের ছয় পুরুষ কাটিয়া গিয়াছে, বাকী শুধু একপুরুষ। সুতরাং শুভদিন আগত ঐ ভাবিয়া ভারতবাসী এবার নিশ্চয়ই আনন্দে নৃত্য করিবে। শ্রাবণ

রাজা নাকি রামচন্দ্রকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন 'অশুভস্য কাল হরণম্।' সেটা ছিল ত্রেতাযুগ। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে 'শুভস্য কাল হরণম্'টাই শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। তারপর বৃটেন ও ভারতের পরস্পর পরস্পরের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচিত হওয়ার কথা। বৃটেন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত কতটুকু পরিচিত হইয়াছে মিঃ আমেরীই তাহা ভাল করিয়া জানেন। ভারতও কি বৃটেনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পায় নাই? মিঃ চার্চ্চিল যখন বলিয়াছিলেন, "আমরা আমাদের সাম্রাজ্য দখলে রাখিতে চাই, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন দেখিবার জন্য আমি সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হই নাই,"—তখনও কি বৃটিশের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় আমরা পাই নাই? বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অবসান হইবে না এই সুনিশ্চিত বিশ্বাসের কথা লর্ড ক্র্যানবোর্ণ যখন লর্ড সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, তখনও কি আমরা বৃটেনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় পাই নাই? গত মার্চ্চ মাসে অক্সফোর্ডে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলী যখন বলিয়াছিলেন, বৃটিশ উপনিবেশগুলি সম্পর্কে শুধু বৃটেনেরই পূর্ণ দায়িত্ব থাকে, তখনও কি বৃটেনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় আমরা পাই নাই?

—

খাদ্যান্বেষণ আন্দোলন

৭ই জুন হইতে এই প্রদেশে 'খাদ্যান্বেষণ আন্দোলন' সুরু হইয়াছে। (১) সারা প্রদেশব্যাপী একসঙ্গে খাদ্য-শস্য মজুদের বিরুদ্ধে সাধারণ ভাবে একটা আন্দোলন চালাইবার, (২) এই প্রদেশে মোট কি পরিমাণ খাদ্য-শস্য আছে এবং প্রদেশের জন্য প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রয়োজন তাহার পূর্ণ তথ্য জানিবার, (৩) প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য কমিটি গঠনের এবং (৪) যেখানে প্রয়োজন বোধ হইবে সেখানে উপরিউক্ত কমিটি-গুলির মারফৎ অধিকতর সমতার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য বণ্টন করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা এই খাদ্যান্বেষণ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কলিকাতা ও হাওড়াকে বর্ত্তমানে এই আন্দোলনের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটি অর্ডিনান্স জারী করিয়া এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে নিজ নিজ মজুদ চাউলের পরিমাণ প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে বলিবেন।

যদি কাহারও নিকট বীজ ধান ছাড়া মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমাণ ঐ ব্যক্তির এবং তাঁহার পরিবারবর্গের ১৯৩১ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সত্যসত্যই যাহা প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য এবং আগামী মরসুমে বপনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ শস্যের অতিরিক্ত বীজশস্য হস্তান্তর না করার জন্য মালিকদিগকে লিখিতভাবে বা অন্য প্রকারে আদেশ দেওয়া হইবে। প্রত্যেক পরিবারে কি পরিমাণ চাউল লাগিতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট জনপ্রতি চাউলের নিম্নলিখিত হার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন:

(১) যে-সকল চাষী এবং মজুরের বাড়্‌তি খাদ্যশস্য আছে: —দৈহিক শ্রমকারী প্রতি বয়স্ক পুরুষ দশ ছটাক, অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ জনপ্রতি আট ছটাক, বয়স্কা স্ত্রীলোক জনপ্রতি সাত ছটাক, চৌদ্দ বৎসর বয়সের নিম্ন বয়স্ক বালকবালিকা ছয় ছটাক চাউল।

(২) যে-সকল চাষীর এবং মজুরের পর্য্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ নাই তাহাদের এবং সহরবাসীদের জন্য: দৈহিক শ্রমকারী বয়স্ক পুরুষ জনপ্রতি সাড়ে সাত ছটাক, অন্যান্য বয়স্ক পুরুষ জনপ্রতি সাড়ে ছয় ছটাক, বয়স্কা স্ত্রীলোক জনপ্রতি সাড়ে ছয় ছটাক। চৌদ্দ বৎসর কম বয়স্ক বালক-বালিকা জনপ্রতি সাড়ে পাঁচ ছটাক।

(৩) যাহাদের অবস্থা একরূপ উপবাসের কাছাকাছি গিয়াছে:—যে-সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের বয়স চার বৎসরের কম নয় তাহাদের প্রত্যেককে প্রতি ১৫ দিনের জন্য চারি সের চাউল অথবা ছয় সের ধানেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। চার বৎসরের কম বয়স্ক বালক-বালিকার জন্য কোন চাউলের বরাদ্দ ধার্য্য করা হয় নাই। খাদ্য-কমিটি উল্লিখিত হারে তাহাদিগকে চাউল বা ধান দিবার ব্যবস্থা করিবেন—উহার বেশী নয়।

মজুদ খাদ্যশস্য হইতে যাহা গ্রহণ করা হইবে তাহা হয় ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা হইবে, না হয় নায্য মূল্যে ক্রয় করা হইবে। ঋণস্বরূপ লওয়া হইলে ঐ খাদ্যশস্যের

১২ ভাগ অর্থাৎ যে পরিমাণ ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা এবং তাহার এক-চতুর্থ অংশ ঋণদাতাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে আদায় করা হইবে ১২ ভাগ অর্থাৎ যাহা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল তাহা এবং তাহার অর্দ্ধেক।

মন্ত্রিমণ্ডলীর বিশ্বাস, এই প্রদেশে প্রকৃত পক্ষে চাউলের কোন অভাব নাই। মজুদকারীদের সঞ্চয়ের জন্যই এই কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলীর আরও ধারণা এই যে, মজুদকারী শুধু ব্যবসায়ীরাই নয়, গ্রামেও অনেক গৃহস্থের ঘরে মজুদ ধান চাউল আছে। এই বিশ্বাস অনুযায়ীই খাদ্য অন্বেষণ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে ভাবে চাউলের বরাদ্দ ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে দেশে চাউলের অভাব নাই তাহা মনে করা কঠিন। ৬ই জুন রবিবার কলিকাতা টাউন হলের জনসভায় সভাপতি ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব খাদ্যসচিব শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, "প্রদেশে যে চাউলের অনটন হইয়াছে তাহা প্রমাণ করিতে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করার ও সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। চাউলের অভাব যদি না থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার কোন অর্থই হয় না।" যুদ্ধ পূর্ব্বকালের তুলনায় ভারতে খাদ্যদ্রব্যের দাম অন্ততঃ দশ গুণ বাড়িয়াছে, কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ শ্লোন এই অভিযোগ করায় ভারত সচিব মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, "চাউলের অবস্থা এখনও উদ্বেগজনক এবং যতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল পাওয়া না যাইবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলিবে। বর্ত্তমানে বাংলা দেশ বিশেষ করিয়া কলিকাতার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে চাউলের যে দর ছিল বর্ত্তমানে সেখানে আট গুণেরও অধিক হইয়াছে। অবশ্য ভারতের সব স্থান সম্বন্ধে একথা সত্য নহে।"

খাদ্যান্বেষণ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দেশবাসীই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দেশের মোট খাদ্যের পরিমাণ অবশ্যই জানা প্রয়োজন। শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন, "দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যূনতম খাদ্যও সরবরাহ করিবার দায়িত্ব যে গবর্ণমেণ্ট লইবেন, তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা উক্ত পরিকল্পনায় করা হয় নাই। এই দায়িত্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সচেতন তাহারও কোন ইঙ্গিত উক্ত পরিকল্পনায় দেওয়া হয় নাই।" বস্তুতঃ সমাধানের দায়িত্বটা দেশের লোকের উপরেই আরোপ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। যেখানে চাউল বেশী তথা হইতে যেখানে চাউল কম সেখানে সাহায্য করিবার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। সরকারী পরিকল্পনায় ঐরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

গ্রামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রচুর ধান-চাউল যাহারা মজুদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের কাজ যে সমাজ-কল্যাণ বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রামে এইরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। যে-সকল ব্যবসায়ী বহু টাকার কারবার করেন তাহারাই কেবল বহু টাকার চাউল মজুদ করিতে পারেন। কলিকাতা এবং হাওড়াতেই এইরূপ ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেশী। তাঁহাদের এই মজুদও সমাজ-কল্যাণ বিরোধী। এই সকল মজুদ চাউল খালাস করিয়া এবং যাহা কম পড়িবে অন্য প্রদেশ হইতে তাহা আমদানি করিয়া চাউল সমস্যার সমাধান করা একমাত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব।

পৃথিবীর সকল লোকের খাদ্যের সংস্থান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ভার্জিনিয়ার 'হটস্প্রীং' সহরে সম্মিলিত জাতিবর্গের খাদ্যসম্মেলন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পরে পৃথিবীর লোকদিগকে কিরূপে ভালভাবে খাদ্য সরবরাহ করা যায়, তৎসম্বন্ধে এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। যুদ্ধের পরে এক্সিস শক্তির কবল হইতে মুক্ত দেশ-গুলিকে পর্য্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ করার কথাই এই সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে খাদ্যসমস্যা পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা দিয়াছে তাহার সমাধানের প্রশ্ন এই সম্মেলনে আলোচিত হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধিরা সম্মেলনের প্রথমেই বলেন, যুদ্ধজয়ের পূর্ব্বে দূরবর্ত্তীকালের খাদ্যসমস্যা লইয়া গবেষণা করা শুধু একটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা হইতে পারে মাত্র।

এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে স্মারকলিপি দাখিল

করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, শুধু কৃষিজাত পণ্যই নয়, সমস্ত প্রাথমিক পণ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে হইলে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত অর্থনৈতিক নীতি অনুসারেই তাহা কার্য্যকরী করা দরকার। এই নীতি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব এবং এই প্রতিষ্ঠানের পর্য্যবেক্ষণের পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। আমেরিকার এই যুক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বজায় রাখিয়া এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন সম্ভব কি? এবং সম্ভব হইলেও উহা কি সাম্রাজ্যিক আন্তর্জ্জাতিকতারই নামান্তর হইবে না? পৃথিবীর লোকের ভালভাবে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রত্যেক লোককেই কাজের সংস্থান করিয়া দিতে হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আজও তাহা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

—

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বর্দ্ধিত

প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অষ্টসপ্ততিবর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়ায় গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতঃকালে ভারতীয় সংবাদপত্রসঙ্ঘের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। বিগত অর্দ্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া রামানন্দ বাবু সংবাদপত্র সেবার মধ্য দিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার বলিষ্ঠ এবং স্বচ্ছ স্বাধীন চিন্তাধারার বিশ্লেষণ শক্তি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি বিশ্লেষণলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করিবার ভাষা নিরাড়ম্বর ও সহজ, এবং নির্ভীকতা অকুণ্ঠ। সংবাদপত্রসেবীর এই সকল শ্রেষ্ঠতম গুণে তিনি বিভূষিত বলিয়াই রাজরোষের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে অবিচলিতভাবে তিনি সংগ্রাম করিতে পারিয়াছেন। বাংলার সংবাদপত্রগুলি তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত—তাঁহার সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রত্যেক সংবাদপত্র-সেবীর অনুসরণীয়।

আজ তিনি গৌরবময় কর্ম্ম-জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তিনি শতায়ুঃ হইয়া সুস্থদেহে ও সবলমনে দীর্ঘকাল স্বদেশ ও স্বজাতির সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করুন ভগবানের কাছে আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি।

—

পলতা জলের কলে কি হইয়াছিল?

গত ১৮ই মে প্রাতে ৮টার পর কলিকাতা সহরে পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায় এবং ৩২ ঘণ্টাকাল পানীয় জলের সরবরাহ বন্ধ থাকে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতার নাগরিকদের ভয়ানক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কলিকাতার জলের কলের ইতিহাসে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষের মুখে আমরা শুনিতে পাই, পলতা জলের কলের বয়লার বিগড়াইয়া যাওয়ার ফলেই এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু কর্পোরেশনের সভায় মেয়র বলেন যে, পলতার শ্রমিকদের অভিযোগ সম্পর্কে বিবেচনা করার সুনির্দ্দিষ্ট আশ্বাস দিয়া ১৮ই মে রাত্রিতে তাহাদিগকে কাজ করিতে অনুপ্রাণিত করা হয়। এই সঙ্গে আরও একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ৭ই মে মেয়র যখন পলতা জলের কল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রমিকরা তাঁহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইয়াছিল। তখন কোন গোলযোগের আশঙ্কা তিনি দেখিতে পান নাই, তাহা মেয়র নিজেই বলিয়াছেন।

অতঃপর ২৩শে মে একটি বিবৃতিতে মেয়র বলিয়াছেন, ১৭ই মে প্রাতঃকালে পলতার কর্ম্মচারিগণ কার্য্য ত্যাগ করে, কিন্তু শিক্ষানবীশদের দ্বারা কল চালান হয়। মধ্য রাত্রিতে কল বিগড়াইয়া যাওয়ায় শিক্ষানবীশ দ্বারা আর কলচালান সম্ভব হয় নাই। স্থায়ী কর্ম্মীরা ১৯শে মে প্রাতে সাড়ে নয়টায় কাজ আরম্ভ করে এবং বিকালে পরিস্রুত জল পাওয়া যায়। কল বিগড়াইয়াছিল কেন, তাহার কারণ কিছু জানা যায় না। কিন্তু ১৭ই মে প্রাতঃকালে পলতা জলের কলের কর্ম্মীদের ধর্ম্মঘট করা বন্ধ করা কি সম্ভব ছিল না? করদাতারা এই প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

—

পরলোকে ডাঃ স্যার নীলরতন

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ স্যার নীলরতন সরকার ৮২

বৎসর বয়সে গিরিডিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। শুধু প্রথিতযশা চিকিৎসক হিসাবেই নয়, ত্যাগী দেশ-সেবক রূপেও তাঁহাকে পাইবার সৌভাগ্য দেশের হইয়াছিল। বাংলার জাতীয় আন্দোলন তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছে। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা। বাংলার শিল্পোন্নতিরও তিনি একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের পদও তিনি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন এবং যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সভাপতি ছিলেন। অমায়িক সরল ব্যবহারে তিনি ছিলেন আদর্শস্থানীয়। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই বাক্যটি তাঁহার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

স্যার নীলরতন সরকার পরিণত বয়সেই ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীকে তাঁহার বিয়োগ দুঃখ গভীর ভাবেই ব্যথিত করিয়াছে। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

—

কোমিণ্টার্ণের বিলোপ

কোমিণ্টার্ণ অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যালের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের আদেশে কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যাল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ বর্ণনা করিয়া কোমিণ্টার্ণের সভাপতি-মণ্ডলী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যাল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে পৃথিবীর অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং এই ধরণের আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক প্রতিষ্ঠান আর পৃথিবীর অবস্থার সহিত, বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যেরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সহিত খাপ খায় না বলিয়া এই প্রস্তাব করা হইয়াছে।" ষ্ট্যালিনও বলিয়াছেন যে, কোমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দিবার ফলে প্রথমতঃ এক্সিস পক্ষের বিরুদ্ধে সমর-প্রচেষ্টা অবিলম্বে অধিকতর শক্তিশালী হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ 'সাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির সহযোগিতা'র ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত হইবে।

কম্যুনিষ্ট ইণ্টার ন্যাশন্যাল ভাঙ্গিয়া দিবার কারণ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলি গোড়া হইতে উহাকে ভাল চক্ষে দেখিত না। হিটলার এই সাম্যবাদ-ভীতির সুযোগেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া তথাকথিত গণতন্ত্রগুলির আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীকেই এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্র পরিণত করিয়াছে। অতঃপর ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হইলেও কোমিণ্টার্ণই ছিল এই মৈত্রীর নিবিড়তার পক্ষে অন্তরায়। এদিকে জার্ম্মানী হইতেও এইরূপ প্রচার-কার্য্য চলিতেছে যে, রাশিয়া জার্ম্মানীকে পরাজিত করিতে পারিলে কোমিণ্টার্ণের প্রভাবে সমগ্র ইউরোপ সাম্যবাদের দ্বারা প্লাবিত হইয়া যাইবে। এইরূপ প্রচার-কার্য্য যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতা কার্য্যকরী করিবার জন্য কোমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়ত অপরিহার্য্যই হইয়া উঠিয়াছিল।

কোমিণ্টার্ণ রাশিয়া হইতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিপ্লব রপ্তানি করিবে এরূপ আশঙ্কা কেহ না করিলেও, সকলেই উহার প্রভাবকে সন্দেহ ও ভয়ের চক্ষেই দেখে। কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাম্যবাদী দলের বন্ধন-সূত্র ছিল কোমিণ্টার্ণ। এই বন্ধন-সূত্রই পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদী দলকে একটি অখণ্ড শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। আজ এই সংযোগ-সূত্র ছিন্ন হওয়ার অর্থ এই হইতে পারে যে, রাশিয়া সাম্যবাদের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে অথবা রাশিয়া বিশ্ববিপ্লব চায় না। কিন্তু কোমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় সাম্যবাদী রাশিয়ার আদর্শের কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ রাশিয়া বিশ্ববিপ্লব চাহিলেই বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, প্রত্যেক দেশে উহার উপযোগী অবস্থার সৃষ্টি না হইলে। সুতরাং এই দুইদিক হইতে কোমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলাফল বিবেচনা করার কোন অর্থ হয় না। কোমিণ্টার্ণই যদি ফ্যাসিষ্ট বিরোধিতার ভিত্তিতে গঠিত মৈত্র নিবিড়তর হওয়ার পক্ষে অন্তরায় হইয়া থাকে তবে কোমিণ্টার্ণ ভাঙ্গিয়া দেওয়া একটা

উৎকৃষ্ট কর্ম্মকৌশল সন্দেহ নাই। তবে যুদ্ধের পরে কোমিণ্টার্ণের বিলুপ্তি শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্ম কিরূপে সাম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার সৃষ্টি করিবে, তাহা এখনই অনুমান করা কঠিন। 'সাম্যের ভিত্তি' কথাটার অর্থ লইয়া এখনও কিছু গোল আছে। কোমিণ্টার্ণ বিলোপের একটা শুভফল ভারতীয় সাম্যবাদী দলে দেখা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। সমস্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শ ও কর্ম্মনীতি অভিন্ন হইলেও নিজের দেশের জনগণ হইতেই যে উহাকে জীবনী শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়, কর্ম্মকৌশল যে নিজের দেশের পরিস্থিতির উপরেই নির্ভর করে কোমিণ্টার্ণের বিলোপ এই কথাটাই বিশেষ-ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

—

ট্রেণ-দুর্ঘটনা

গত ১৭ই মে শেষরাত্রে জলেশ্বর ষ্টেশনে ডাউন হাওড়া-পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সহিত একখানি মালগাড়ীর সংঘর্ষ ঘটে। ফলে ১৪ জন নিহত এবং ৩৪ জন আহত হয়।

৩রা জুন বোম্বাই হইতে কলিকাতাগামী ১ নং ডাউন মেলে এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ট্রেনখানি বোম্বাই হইতে নাগপুর হইয়া কলিকাতা আসিতেছিল। আকোলা ও বোরগাঁয়ের মধ্যে একখানি মালগাড়ীর সহিত উক্ত মেলের সংঘর্ষ হয়। মৃতের সংখ্যা ৮৩ জন এবং ১৪০ জন আহত হইয়াছে। ট্রেন দুর্ঘটনা আমাদের দেশে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু প্রতিকার কিছুই হইতেছে না। দেশের ইহা আর এক দুর্ভাগ্য। নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনকে এবং আহত ব্যক্তিদিগকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

—

মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচন

মাদ্রাজ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেস দলীয় প্রার্থী শ্রীযুত গাড্ডে রঙ্গিয়া নাইডু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জষ্টিস পার্টির মনোনীত প্রার্থী মিঃ টি, এস, আর নাইডু অপেক্ষা ৩১৫০ ভোট বেশী পাইয়া সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। জষ্টিস পার্টির প্রার্থী পাইয়াছেন মাত্র ১৫০৮ ভোট।

এই উপনির্ব্বাচন সম্পর্কে একটি উল্লেখ যোগ্য কথা এই যে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী সভা ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু জষ্টিস পার্টির মনোনীত প্রার্থী গোখলে হলে নির্ব্বাচনী সভা করিয়া-ছিলেন। তথাপি কংগ্রেস দলীয় প্রার্থী জষ্টিস পার্টির প্রার্থী অপেক্ষা তিনগুণেরও বেশী ভোট পাইয়াছেন।

—

মিঃ লুইফিসারের লেখা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ

মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার মিঃ লুইফিসারের ভারতবর্ষ সম্পর্কিত প্রবন্ধ বা বক্তৃতা নয়াদিল্লীস্থিত চীফ প্রেস এডভাইসরের দ্বারা পরীক্ষা না করাইয়া ভারতবর্ষে মুদ্রিত করা যাইবে না, এই মর্ম্মে ভারত রক্ষাবিষয়ক ৪১ নং বিধি অনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশ ভারত রক্ষা বিধানের অপপ্রয়োগ কিনা, তাহা লইয়া আলোচনা করা নিষ্প্রোজন। এই আদেশ হইতে বুঝা যাইতেছে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহাদের পছন্দ মাফিক মতামত ছাড়া আর কোন মতামত ভারতীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তৃপক্ষ পছন্দ করেন না। অন্যান্য আমেরিকাবাসীর ন্যায়ই মিঃ লুইফিসার মিত্র শক্তির বিজয় ইচ্ছা করেন। আমেরিকায় তিনি বক্তৃতা দিতেছেন, তাঁহার প্রবন্ধও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। মিত্রশক্তিবর্গের যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যাহত বা দুর্ব্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে মার্কিন সরকার নিশ্চয়ই তাহা করিতে দিতেন না। সুতরাং ভারতে প্রকাশিত হইলেও যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত বা দুর্ব্বল হওয়ার কোন কারণ নাই। কিন্তু ভারত সম্পর্কে মিঃ লুইফিসারের উক্তিগুলি এমন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ঐগুলি খণ্ডন করিতে না পারিয়া আমাদের শাসন-কর্ত্তরা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করেন।

—

খোদার উপর খোদ্‌গারী

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বিল সম্পর্কে স্যার মরিস গয়ারের রেডিও যোগে এক প্রবন্ধ পাঠ করিবার কথা ছিল। উক্ত

প্রবন্ধের কোন অংশ মানহানিকর বলিয়া দিল্লী বেতার ষ্টেশনের ডিরেক্টার উহা ছাঁটিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু স্যার মরিস গয়ার উহাতে সম্মত হইতে না পারিয়া প্রবন্ধটি ফেরৎ লইয়া চলিয়া আসেন। ভারতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতিকে কিরূপ উক্তি মানহানিকর তাহা বুঝাইতে যাওয়াকে দিল্লীর বেতার ষ্টেশনের ডিরেক্টরের পক্ষে খোদার উপর খোদগারী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? ইহা কি 'স্থানে স্থিতে'র গুণ না কি?

—

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির দাবী

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্ব্বে বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে অন্যতম লীগনেতা মিঃ আব্দার রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, প্রধান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের পক্ষে এখন এই প্রতিশ্রুতি পালনের সময় আসিয়াছে। এই প্রতিশ্রুতি যে কোন দিকে প্রতিপালিত হইতেছে হাইকোর্টের বিচারে ৯জন মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীকে ৩ আইনে গ্রেফ্‌তার করায় তাহা বুঝা যাইতেছে। বন্দীমুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রীদের অসহায় অবস্থা কাহারও অজ্ঞাত নয়। তথাপি বন্দীমুক্তির ব্যাপারে স্যার নাজিমুদ্দিন কতটুক কি করিয়াছেন, দেশবাসীকে তাহা জানান তাঁহার কর্ত্তব্য।

—

যুদ্ধ-পরিস্থিতি

প্যান্টেলারিয়া ও লাম্পেডুসা দ্বীপ মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করায় খাস ইটালীর ভূমি মিত্রশক্তিবর্গের দখলে আসিয়াছে। ইহা মিত্রশক্তিবর্গের ইউরোপ অভিযানের পূর্ব্বাভাষ। হিটলার ইটালীকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন কি না, তাহা জানা যায় না, কিন্তু আনকারার এক সংবাদে প্রকাশ, তথায় গুজব যে, মস্কো অধিকারের জন্য হিটলার ৭০ ডিবিসনে দশ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক ভবিষ্যাণী করা হইয়াছে যে, চুংকিংকে পশ্চিম চীন ও সোভিয়েট রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য শীঘ্রই জাপান অন্তর্ম্মঙ্গোলিয়ার মধ্য দিয়া এক অভিযান সুরু করিবে। জাপান সাইবেরিয়া আক্রমণের সিদ্ধান্তও করিতে পারে বলিয়াও উক্ত পত্রিকায় বলা হইয়াছে।

—

আমাদের বস্ত্র-সমস্যা

কাপড়ের দাম কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। গরীব মার্কা কাপড় দিয়া আমাদের বস্ত্র-সমস্যার কতক সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু এই আশা সার্থক হওয়ার কোন লক্ষণ এখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। গবর্ণমেন্ট কাপড়ের উৎপাদন, বণ্টন এবং দাম নিয়ন্ত্রণ করিবার যে-ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাতে কাপড়ের দাম যে কমিবে এরূপ ভরসা করিবার মত কিছু আমরা পাইতেছি না। একজন ইউরোপীয়কে ক্লথ কমিশনার নিযুক্ত করাও সমর্থন যোগ্য নহে। ১৫০০০ লক্ষ গজ কাপড় মধ্য ও নিকট প্রাচীতে রপ্তানী করা হইলে ভারতবাসীর কাপড়ের অভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে।

বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন হইয়াছে তাহাতে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এক বিবৃতিতে কাপড়ের দাম বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের দায়িত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন, ১৯৪২ সালে দশ লক্ষ গজ কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিয়া এবং দেশরক্ষা বিভাগের প্রয়োজনীয় কাপড় সরবরাহ করিয়া দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য কাপড় ছিল মাত্র আঠার হাজার লক্ষ গজ। উক্ত বিবৃতিতে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৪৩ সালে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই বৎসরে কাপড়ের উৎপাদন ৪৮ হাজার লক্ষ গজ পর্য্যন্ত পৌঁছিবে এবং ৩৬ হাজার লক্ষ গজ দেশবাসীর ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইবে। কিন্তু পাওয়া গেলেই যে কাপড়ের দাম কমিবে সে ভরসা করিবার মত কিছুই দেখা যাইতেছে না। কারণ বিদেশেও ন্যায্য মূল্যে কাপড় রপ্তানী করা হইবে আবার দেশবাসীও সস্তা কাপড় পাইবে, কিরূপে তাহা সম্ভব? প্রথমেই যদি রপ্তানীর কথা চিন্তা করা

যায়, তাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে সস্তা কাপড় জুটিবার আশা করা সম্ভব নহে। ভারতবাসীর কাপড়ের চাহিদা মিটিবার পূর্ব্বে রপ্তানীর কথা চিন্তা করা উচিত নহে।

—

রবীন্দ্র-পুরস্কার

নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি কমিটি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করিতেছেন তন্মধ্যে নোবেল প্রাইজের অনুকরণে 'ঠাকুর-পুরস্কার' প্রদান এবং বিশ্ব-ভারতীর সংগঠন ও উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'ঠাকুর-পুরস্কার' বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার উন্নতি সাধনে এবং ভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায় হইবে। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠন এবং উন্নতি দ্বারাই সমগ্র দেশ এবং জাতিকে রবীন্দ্র-আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব। ইহাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা।

—

আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার ফল

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান বৎসরের আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষায় যথাক্রমে শতকরা ৫১.৭ জন এবং ৫১.৯ জন পাশ করিয়াছে। গত বৎসর পাশের হার ছিল যথাক্রমে ৬২.১ এবং ৬০.২৫ জন। গত কয়েক বৎসরের তুলনায়ই এবার আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ সম্পর্কে বিশ্ব-বিদ্যালয় মহলের অভিমত নাকি এই যে, ছাত্রছাত্রীদিগকে গত বৎসর অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়াশুনা করিতে হইয়াছে। এই জন্যই পাশের হার কম হইয়াছে।

ছাত্রছাত্রীদিগকে অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে পড়াশুনা করিতে হইয়াছে, ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু এই অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই দায়ী নয়। প্রশ্নপত্র রচনা এবং পরীক্ষার কাগজ দেখার ব্যাপারে এই অস্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা করা হইলে, পাশের হার নিশ্চয়ই এত কম হইত না। ইহাতে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাবত্তা হ্রাস হইত, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ আছে কি?

—

জনসাধারণের জন্য কাগজ

গবর্ণমেণ্ট ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগের পরিবর্ত্তে শতকরা ৭০ ভাগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় ভারতে উৎপন্ন কাগজের শত করা ৩০ ভাগ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইবে। গত ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট ভারতে উৎপন্ন কাগজের শতকরা ৯০ ভাগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। জনসাধারণের দিক হইতে তখনই উহার প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ভারতে এক লক্ষ টন কাগজ উৎপন্ন হয়। বে-সরকারী কাজের জন্য শতকরা ৩০ ভাগ পাওয়া গেলে ৩০ হাজার টন কাগজ পাওয়া যাইবে। জনসাধারণের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অতি সামান্য। ভারতে উৎপন্ন কাগজের অন্ততঃ অর্দ্ধেক যদি জনসাধারণের জন্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে কাগজের এই দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে জনসাধারণের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে।

—

কেন্দ্রীয় পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ দেখিতেছি ব্রহ্মার পরমায়ুলাভ করিতে চলিয়াছে। ১৯৩৮ সালে উহার স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পর পর ছয়বার ইন্‌জেকশন করিয়া উহার আয়ুষ্কাল ১৯৪ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয়। সম্প্রতি বড়লাট আগামী ১লা অক্টোবর হইতে আরও এক বৎসর উহার আয়ু বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ এই পরিষদ আরও দুইটি পরিষদের আয়ুষ্কাল লাভ করিল। ডাঃ আম্বেদকর ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম-সচিব হওয়ার পর কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন উক্ত পরিষদকে ব্যাধি-গ্রস্ত বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি উহাকে প্রতিনিধি-মূলক বলিয়াও স্বীকার করেন না। বড়লাট যে পরিষদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ডাঃ আম্বেদকার তাহাতে আপত্তি করিয়াছেন তো? তাঁহার আপত্তি যদি বড়লাট না শুনেন, তাহা হইলে তিনি কি করিবেন?

—

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

পঞ্চম বর্ষ | শ্রাবণ, ১৩৫০ | ৭ম সংখ্যা

রবীন্দ্র-পরিচয়

শ্রীজগজ্জিৎ সরকার

যে-অনন্তকে মানুষ বিরাট বলিয়া জানিয়াছে, যাহাকে দূরে ঠেলিবার উপায় নাই, নিকটতম বলিয়া কাছে টানিবারও সাধ্য নাই, তাহাকে যে-কোন নামে ডাকা যায়। কোন্ সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করিলে তাহার সত্য পরিচয়টি পাওয়া যায় তাহা ভাবিতে বসিলে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, প্রগাঢ় অনুভূতির আবেগে কূলহারা তরঙ্গের মত দিগন্ত-প্রাবী নিস্তব্ধতায় বিলীন হইতে হয়। ইহার নাম দিবার জন্য যুগে যুগে মানুষ কত প্রচেষ্টাই না করিয়াছে। এই অনন্তকেই ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিতে গিয়া মানুষ কত নামেরই না আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; কত বিচিত্র নামে রূপে অনন্তের পূজা চলিতেছে :—কখন স্রষ্টা বলিয়া, কখন প্রভু বলিয়া, কখন দাতা বলিয়া, কখন পাতা বলিয়া। তবু যেন তৃপ্তি নাই। ইহাকে মানুষ কখন ডাকিতেছে জনক বলিয়া, কখন ডাকিতেছে জননী বলিয়া, কখন বা সখা, দেবতা বলিয়া, কখন বা প্রিয়, প্রিয়তম বলিয়া। আস্তিক ডাকিতেছেন 'অস্তি' বলিয়া, নাস্তিক ডাকিতেছেন, 'নাস্তি' বলিয়া, ধার্মিক ডাকিতেছেন 'শুদ্ধম্' বলিয়া। নামেরও নাম আছে, তাহার তো শেষ নাই। আমরা ভুলিয়া যাই, অনন্তকে অনন্ত বলিয়াই ডাকিতে হইবে, কোন বিশিষ্ট নামকরণ চলিবে না।

রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানিয়াছি তেমনি বিরাট বলিয়া। তাই তাঁহার নাম দিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠি। কেহ ডাকিতেছি ঋষি রবীন্দ্রনাথ, কেহ ডাকিতেছি কবি রবীন্দ্রনাথ, কেহ ডাকিতেছি মহাগুরু রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক, রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রেমিক, রবীন্দ্রনাথ নাট্যাচার্য, রবীন্দ্রনাথ ভাষাতত্ত্ববিদ, রবীন্দ্রনাথ সমালোচক। কত নামেই না তাঁহাকে ডাকিতেছি। তিনি সংগীত-বিশারদ, তিনি সমাজ-সংস্কারক, তিনি চিত্রশিল্পী, তিনি ভূপর্যটক, তিনি বৈরাগী, তিনি কর্মী ইত্যাদি। কত নামে ডাকিব? কোন্ নামে ডাকিব? অজস্র সম্বোধন-ধারায় প্রকৃত রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে আমাদের বিচারবুদ্ধির সম্মুখে নিতান্ত ঝাপসা হইয়া গেছেন। অজস্র আলোকবর্ষণ আমাদের দৃষ্টিকে যেমন করিয়া অন্ধ করিয়া দেয়, অজস্র শ্রাবণ-ধারা যেমন করিয়া সারাটা প্রকৃতিকে অস্পষ্ট করিয়া তোলে, প্রবল প্লাবন-স্রোত যেমন করিয়া তটভূমিকে অতলে পরিণত করে, ঠিক তেমনটি করিয়াই আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের নিকট হইতে অদৃশ্য দূরত্বের মধ্যে ঠেলিয়া দিতেছি। যে বিচিত্র গুণাবলী রবীন্দ্রনাথকে বিচিত্র করিয়াছে, সেগুলি মিথ্যা বলিতেছি না, এগুলির প্রয়োজনও যে নাই এমন কথা বলি না। কিন্তু প্রাচুর্য যেখানে প্রয়োজনকে ছাপাইয়া ওঠে, সেখানে নিয়মবিহীন অনাসৃষ্টি, সেখানে কেবলমাত্র প্রলয়লীলা। প্রাচুর্য যেখানে প্রয়োজনের পরিধিতে আপন সত্তা মিশাইয়া দেয়, সেখানে প্রাচুর্য মহান এক হইয়া ওঠে—সেই অপূর্ব-মিলন-সন্ধিক্ষণে

পাই প্রকৃত পরিচয়। প্রাচুর্য সেখানে কেবলমাত্র অসংখ্যের সমষ্টি নয়, তাহা প্রয়োজনীয় প্রাচুর্য, তাহা অন্বিত প্রাচুর্য।

অজস্র নামে রবীন্দ্রনাথকে ডাকি না কেন, তবু মনে হয় যেন ডাকা হইল না, হৃদয় তৃপ্ত হইল না, কল্পনা আশ্রয় পাইল না। অজস্র নামের অন্ধকারে নীড়-ভাঙ্গা দিশেহারা ভীরু পাখীর মত কাঁদিয়া ফিরিতেছি, সেখানে আশীর্বাণী বহন করিয়া স্নিগ্ধ অরুণোদয় হয় না, আলোক আসিলেও মধ্যাহ্নের চোখ-ধাঁধানো শর-বিঁধানো তীব্র কিরণ ধারায় আচম্বিতে উপচাইয়া পড়ে, কিছুই স্পষ্ট হয় না; কেবল অনুভব করি একটা অনুভূতি—রবীন্দ্রনাথ ইহাই হইবেন।

এমনিই হয়। যখন আমরা কোন বিশ্লিষ্ট বিশেষণে বিরাটকে বাঁধিতে যাই, তখন দেখি বিরাট আপন বৃহত্ত্বে আপনিই ধরা দিয়াছে সেই বিশিষ্ট বিশেষণের সীমানায়। বার বার করিয়া দেখি, বার বার করিয়া বলি, পাইয়াছি। জানি, জানিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি পরম অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সংকীর্ণ গুহামুখ শ্যামল সমতলে বিস্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে, নদী জলে গলিয়া গলিয়া গ্রামে গ্রামান্তরে, দূরে-দূরান্তরে, দেশে দেশান্তরে প্রতিটি তৃণে, প্রতিটি লতায়, প্রতিটি তরুতে, ফলে-ফুলে, পাতায় পাতায় সরসিত হইয়া উঠিতেছে, গেহে-গেহে জীবনে-জীবনে চিন্তায়-কল্পনায় বাহু মেলিয়া উধাও হইতেছে,—ধরিবার জো নাই। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে তাহাকে আমরা হারাইলাম। তখন ফিরিয়া আসি। কাঁদিয়া বলি যাহা জানিয়াছিলাম তাহা ভুল জানিয়াছিলাম, যাহা বুঝিয়াছিলাম তাহা ঠিক বুঝি নাই। অনন্ত সময়কে আমরা পাইয়াছিলাম খণ্ডক্ষণের ভিতরে; পাই নাই বলিতে পারি না, কিন্তু সে পাওয়া কেবলমাত্র একটা দিক দিয়া পাওয়া, বিদায়ের বেদীমূলে সে পাওয়াকে পাইতে শিখি নাই; তাই বলিয়াই সে পাওয়া চরম পাওয়া হইয়া উঠিল না। বিচ্ছেদের মধ্যে পাই নাই; সে পাওয়ার পুলক হাসির মধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অশ্রুজলে তাহার অভিষেক করি নাই বলিয়াই এমনি করিয়া হারাইলাম। আজ তাই বেদনার ক্রন্দন; আনন্দের ক্রন্দন নাই।

আবার ধরিতে যাই বিরাটকে ভিন্ন রূপে ভিন্ন বিশেষণে; কিন্তু তখনই দেখি তাহা অভিন্ন। একই অভিন্ন পরিণাম। আবার ফিরিয়া আসি কাঁদিতে কাঁদিতে। যাহাকে ধরি ধরি করিয়া পাইবার আনন্দে মাতিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল তাহার স্নিগ্ধ স্পর্শ পাইয়াছি, মনে করিয়াছিলাম কল্পনায় তাহাকে লাভ করিয়াছি, কিন্তু হায়, তাহা স্পর্শাতীত হইয়া গেল, কল্পনাতীত হইয়া গেল। এ দুঃখের শেষ নাই তো। প্রেমের কথা বলি। প্রেমকে আমরা পাইতে চাই। পুরুষ নারীকে চাহিয়াছে, তাহার রূপকে চাহিয়াছে, তাহার ক্ষণভঙ্গুর নারীত্বকে চাহিয়াছে—য . কৈশোরের মুকুল কেবলমাত্র পাপড়ি মেলিতেছে—তাই তো প্রেমকে হারাইতে হয়। প্রেমকে অখণ্ড রূপে চাহি নাই বলিয়াই প্রেম খণ্ডিত হইয়া গেল।

অখণ্ড নারীত্বকে চাহি নাই বলিয়াই মুকুলের পাপড়ি মেলিবার লগ্ন পার হইলে তাহা ঝরিয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন সমষ্টিতে চাহিলেও তাহা পাইতাম না। মাতা রূপে, দুহিতা রূপে, বধূ রূপে, বন্ধু রূপে—তাহা হইলেও পাইতাম না। সমস্ত রূপ ও গুণের সমষ্টি করিয়া—যদি এক করিয়া অখণ্ড নারীত্বকে পাইতে চাহিতাম, তাহাকে কিছুতেই হারাইতে হইত না। তখন সে পাওয়া চরমতম হইত, নারী সর্বস্ব হইত, প্রেম সার্থক হইত। এমনি করিয়া কাঁদিতে হইত না।

তেমনি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমরা কেবলি কাঁদিতেছি। ঋষিরূপে রবীন্দ্রনাথকে পাইতে চাহিয়াছিলাম, ঋষিত্বের সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য খুঁজিতে খুঁজিতে যখন খোঁজা সার্থক হইতে চলিল, সম্পূর্ণ হইতে চলিল, তখন এক খণ্ড সত্য হইতে আর এক খণ্ড সত্যে উপনীত হইলাম, বুঝিলাম তিনি কবি, মহাকবি। কবিত্বের মূর্ত প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। তাঁহার কবি-সত্তা ঋষি-সত্তাকে অতিক্রম করিয়া ম্রিয়মাণ করিয়া ধূসর সন্ধ্যার আকাশে একটি মাত্র নক্ষত্রের মত দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। চন্দ্রের ঋণগ্রস্ত জ্যোৎস্নালোকে তিনি কলঙ্কিত হন নাই, আপন আলোকে আপনি আলোকিত। তাঁহারই আলোক সম্পাতে পৃথিবী আলোকিত, তাঁহারই আলোক সংস্পর্শে আমাদের জীবন আলোকিত। অস্বীকার করবার উপায় নাই। রবীন্দ্রনাথকে কেবল কবি বলিয়া জানিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতিভাকে দেখিয়াছিলাম কেবল মাত্র একটি

সমুজ্জ্বল সন্ধ্যা-তারার মত। সেই একটি তারাকে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণের খণ্ড আকাশে নিবিড় করিয়া পাইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষণ পরেই গৃহের পরিধি ছাড়িয়া উদার দৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে গেলাম —দেখিলাম অনন্ত আকাশে অগণিত নক্ষত্রের মেলা বসিয়াছে। নিকট বলিয়াই সন্ধ্যাতারাকে একটি বলিয়া জানিয়াছিলাম, উজ্জ্বলতম বলিয়া জানিয়াছিলাম, নক্ষত্র বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। আজ বাহির-আকাশ দেখিয়া সে সংশয় ঘুচিল, অসংখ্য জ্যোতিষ্করাজি দেখিয়া আকাশের বিরাটত্ব অনুভব করিলাম, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলাম।

এমনি করিয়া আর আমরা তাঁহাকে গৃহের খণ্ডিত আকাশে ধ্রুব অচঞ্চল করিয়া বৈশিষ্ট্যের বন্ধনে বাঁধিয়া একটি বিশেষণে বিভূষিত করিয়া পাইতে চাহিব না। রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট করিয়া স্বতন্ত্রভাবে পাইতে চাহি না, স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র করিয়াও পাইতে চাহি না, তাঁহাকে 'এক' করিয়া পাইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ করিয়াই পাইতে হইবে। তাই বলিব, রবীন্দ্রনাথ কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথই ; যে রবীন্দ্রনাথ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্বরূপ, যে রবীন্দ্রনাথ ঋষিত্বের মধ্যে অঋষি, যে রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের মধ্যে অ-কবি, যে রবীন্দ্রনাথ গৃহের মধ্যে বৈরাগী, সম্পদের মধ্যে দরিদ্র, স্বদেশের মধ্যে বিশ্বের, পৃথিবীর মধ্যে নিখিলের, অন্তের মধ্যে অনন্তের, সেই রবীন্দ্রনাথকে জানিব। সেই রবীন্দ্রনাথকে পাইব, আপনার করিয়া পাইব। সেই জন্যই বলিতেছিলাম কোন বিশিষ্ট নামের বন্ধনে তাঁহাকে বাঁধিতে গেলে আমাদের ভুল হইবে। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি কেবলমাত্র কবি।" তিনি বলিয়াছেন বলিয়াই কি তিনি কেবলমাত্র কবি? কবি যখন আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন, তখন তো তিনি কেবলমাত্র কবিত্বের অনুভূতি দ্বারাই উদ্বুদ্ধ, তাঁহার নিখিল সত্তা তখন সেই অনুভূতির অন্তরালে সুষুপ্ত, প্রকাশের ব্যাকুলতা যে নাই তাহা বলিতেছি না, কিন্তু তন্দ্রাসক্ত বিভোরতাই যে সেখানে প্রবল। ঠিক যেমনটি করিয়া শতদলের অঙ্কুর উদ্গমের সময়, এবং তাহার পূর্ণ দল মেলিবার লগ্নে নিখিল পুষ্পত্বের স্বরূপটি আমাদের চোখে পড়ে না; বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য বলিয়াই তাহাকে জানি। স্থূলরূপের অন্তরালে যে নিখিল-রূপটি আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহাকেই যদি দেখিতাম, যদি সকল পুষ্পের মাঝখানে ঐ একটি মাত্র পুষ্পই দেখিতে শিখিতাম, তবে পুষ্পের বিভিন্নতার মধ্যে এক অখণ্ড অভিন্নতা দেখিয়া ধন্য হইতাম। তখন আর তাহাকে শতদল বলিয়া ভাল লাগিত না, ভাল লাগিত তাহার নিখিল সত্তাকে। বিশেষ রূপ ছাড়িয়া তাহার পুষ্পত্বটুকুই অপরূপ হইয়া উঠিত। ঠিক যেমনটি ঘটে মানবজাতির বেলায়। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত জাতির বাহিরের রূপ ঘুচাইয়া দাও, দেখিবে নিখিল-মানবত্ব আপন গৌরবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে মানবত্বকে ভৌগলিক বা জাতীয় বন্ধন-সীমায় কিছুতে খুঁজিয়া পাইব না। বিশিষ্ট রূপগুলিকে মিথ্যা বা মায়া বলিতেছি না, কিন্তু তাহাকেই চরমতম বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিব না। অনন্ত যেমন অন্তের মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রতিভা কখন ঋষি রূপে, কখন কবি রূপে, কখন প্রেমিক রূপে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে। অনন্ত যেমন সকল অন্তের মধ্যে পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে না, মানব-অন্তরই যেমন ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ-উদ্যান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রতিভা ঋষিরূপ, প্রেমিকরূপ অপেক্ষাও কবিরূপের মধ্যে পূর্ণ উন্মেষ লাভ করিয়াছে। তাই বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। অবশ্য একথা বলিতেছি না যে রবীন্দ্রনাথের কবিত্বানুভূতি অনড় অচল, ইহা একই সাথে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী। মৃত্তিকারাশি যেমন স্তরে স্তরে শিখর হইতে শিখরে উঠিয়া বাহির-বিশ্বে সংযোগ স্থাপন করিতে ব্যাকুল হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, স্পর্ধিত গর্বে যেমন বিরাট্ আকাশের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিতে চাহিতেছে, ঠিক সেই সঙ্গে দেখিতেছি মৃত্তিকারাশি আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া অতল গহ্বরের সৃষ্টি করিতেছে। এই বহির্গমন ও অন্তর্গমন যেখানে সম্পূর্ণ ভাবে আপন আপন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিতেছে, যেখানে গতি স্থিতিতে পর্যবসিত, সেখানেই দেখি সমতলক্ষেত্র আপন শস্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানকে পাই তখনই যখন

দেখি অতীত ও ভবিষ্যৎ এক মিলন-সন্ধিক্ষণে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, শম্পগতি সময়ের ক্ষণের মধ্যে স্থৈর্য লাভ বলিয়া যাহাকে অভিহিত করিতে পারি—। ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী অনুভূতি যখন মুহূর্তের জন্য স্থৈর্যলাভ করিতেছে তখনই দেখি তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ধরিয়া লইলাম—এই বিশেষ রূপটিই তাঁহার কবিরূপ। কিন্তু সমতল ক্ষেত্রটি আপন সীমার মধ্যে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে, আপন স্থির পরিধির মধ্যে অস্থির হইয়া উর্ধ্ব ও অধঃ স্থানের সৃষ্টি করিতেছে; বর্তমান আপন সীমার মধ্যে মুখর হইয়া উঠিতেছে, সচল হইয়া উঠিতেছে, আপন সীমাকে চূর্ণিত করিয়া আপনি অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হইতেছে; রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তাও আপন সীমাকে লঙ্ঘন করিয়া যাইতেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহার কবিসত্তাকে-আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে পারিব না—দুকূল-প্লাবী জোয়ার-জলের মত তাহা—তটভূমি নদ নদী, সমতল ক্ষেত্রকে উপছাইয়া উদ্দাম বহিয়া যাইবে। সেই উদ্দাম জলধারা যখন নিঃশেষিত হইবে তখন তাহা আপাতদৃষ্টিতে নিশ্চিহ্নও হইবে। জোয়ার-জলের সে উদ্দামতা-ধর্মকে তবুও ফিরিয়া পাইব বলি কেমন করিয়া! চিহ্ন অবশ্যই রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাকে আর জোয়ার বলিয়া ভুল করিব না। কবি-সত্তার সীমা-ধর্মকে তেমনি ভাবেই উল্লঙ্ঘন করিয়া হয়ত দেখিব রবীন্দ্রনাথের ঋষি-সত্তাই শস্যে শস্যে, ফলে ফলে, ফুলে ফুলে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের ভিতরে হয়ত উর্বরতারূপে কবি-সত্তার পুনর্প্রকাশ দেখিব, কবিসত্তার-প্রাবল্য ও প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহার ঋষি-রূপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। তখন বিনা বাধায় বিনা দ্বিধায় অকুণ্ঠ চিত্তে বলিব, হৃদয়কে মেলিয়া ধরিয়া বলিব, রবীন্দ্রনাথ ঋষি মহাঋষি, ঋষি-কুলপতি। কী আনন্দ, রবীন্দ্রনাথকে ঋষিরূপে পাইলাম। তাঁহার সৌম্যশান্ত শুভ্র মূর্তি যে ঋষি-ধর্মের প্রতীক স্বরূপ—তাহা বুঝিলাম বলিয়াই তাঁহার এই মুখশ্রী কী অপূর্ব চির নবীন হইয়া উঠিল। তাঁহার কোমল কণ্ঠধ্বনি কী উদাত্তবাণী বিঘোষিত করিল।

তিনিই কবি যিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন, যাহা দেখিতেছি; তাহাই সৌন্দর্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। তিনিই ঋষি যিনি জানিতেছেন ও জানাইতেছেন। কিন্তু এই সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ জানিতেছেন ও জানাইতেছেন। তাঁহাকে কি করিয়া কেবল মাত্র কবি বলিব? কি করিয়াই বা বলিব তিনি কেবলমাত্র ঋষি? এই জন্যই বলিতেছিলাম বিশেষণের প্রাচুর্য ধারায় অভিষিক্ত করিতে গেলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে হারাইব। স্বতন্ত্রভাবে অজস্র বিশেষণ দিয়াও আমরাও এই অদ্বিতীয় পুরুষটিকে চিনিতে পারিব না। প্রাচুর্যের ঐক্যতন্ত্রীকে স্পর্শ করিতে পারিলেই রবীন্দ্র-সুর বাজিয়া উঠিবে, তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে। অজস্র ভাবধারার আবরণের অন্তরালে যে রবীন্দ্রনাথ একান্ত গোপনে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকেই বাহির বিশ্বে উদ্ঘাটিত করিতে হইবে। তখন দেখিব রবীন্দ্রনাথ ঋষি নহেন, রবীন্দ্রনাথ কবি নহেন, রবীন্দ্রনাথ কোন বিশিষ্টগুণে বিভূষিত নহেন। তখন দেখিব তিনি অসংখ্য গুণের কেবলমাত্র সমষ্টি স্বরূপও নহেন; তিনি বিশিষ্ট হইতেও স্বতন্ত্র, নিছক সমষ্টি হইতেও স্বতন্ত্র। তিনি সমষ্টির ঐক্য স্বরূপ। ইনিই রবীন্দ্রনাথ।

হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্যই তিনি প্রধানতঃ কবি। কিন্তু যেখানেই প্রকাশ দেখি, সেই-খানেই ত কাব্য, সেইখানেইত প্রয়োজনীয়ত্ব সেইখানেইত ছন্দ, সঙ্গীত, এবং সৌন্দর্য। যেখানে প্রকাশ নাই, সেখানে কাব্যও নাই, সেখানে সৃষ্টিও নাই। যে পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হইল, যে ঝর্ণাধারা ঝরিয়া পড়িল, যে বনানী বিক্ষুব্ধ হইল তাহারা যে বিপুল কাব্য সৃষ্টি করিল, বিপুল ছন্দ, বিপুল সঙ্গীত সৃষ্টি করিল, ভাষাও সৃষ্টি করিল; যে অরুণালোক প্রভাতের স্নিগ্ধ ললাটে সস্নেহ চুম্বন আঁকিয়া দিল, যে আবেগ-আকুল জ্যোৎস্না রাশি মহা-সাগরের বুকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল, যে প্রেমিক একান্ত গোপনে নীরব অশ্রু ফেলিল, তাহারা কি মহাকাব্য রচনা করিতেছে না? যেখানে আনন্দ সেইখানেই কাব্য। কাব্য নাই কোথায়? আনন্দের মধ্যেই বিশ্ব-সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে, আনন্দের মধ্যেই আমাদের জীবন স্পন্দিত

হইয়াছে, আনন্দের মধ্যেই মরণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। সর্বত্রই কাব্য, কারণ সর্বত্রই আনন্দ :—

মধু বাতা ঋতায়তে,
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ

সহজ স্বতঃস্ফূর্তির মধ্যে আনন্দ, চৈতন্যের মধ্যে আনন্দ, সকলই কাব্য। তাই ঋষিগণ কবিও ছিলেন। বেদকেও মহাকাব্য বলিতে পারি। চেতনহীন প্রতিটি প্রকাশের মধ্যেও অচেতন কবিসত্তা রহিয়াছে; প্রতি সম্ভূতি এক একটি কবিরূপ। যে বিশিষ্ট গুণাবলী প্রতি চেতন ও অচেতন পদার্থকে কবিরূপে প্রকাশ করিতেছে, তাহাকে বলিব আনন্দ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহাদের সমাবেশ নিগূঢ় ও বিরাট। একথা স্বীকার করি। কিন্তু এই কবিসত্তার প্রকাশ সহজ স্বতঃস্ফূর্ত নয় যেমন সহজ উষাকালে আলোকের অভ্যুদয়, যেমন সহজ আলিঙ্গন আকুল সাগরতরঙ্গ, যেমন সহজ ফুলের ফুটিয়া ওঠা। তাহা যদি হইত তবে রবীন্দ্রনাথকে নিছক কবি বলিতে পারিতাম। কিন্তু এ সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখি একটি সোন্নত সমতলে, যাহা অবাস্তব চিন্তার (abstract thought) দ্বারা ওই অসীম পরিধির মধ্যে বিস্তৃত হইতেছে। এখানেই তাঁহার কবি-সত্তা ঋষি-সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। কবি-সংজ্ঞাকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ না করিয়া যদি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর করিতে থাকি, তবে তাহা যে ঋষি-সংজ্ঞায় পর্যবসিত হইয়া যাইবেই। তখন তাঁহার কবি-সত্তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইবে। তবে কি করিয়া বলি রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি? তাঁহাকে ঋষি বলিতে আপত্তি কোথায়? কিন্তু অসুবিধা হইতেছে এই যে, কেবলমাত্র ঋষি বলিলে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কতটুকু পাইব? পর মুহূর্তেই যে ঋষি-সত্তারও মৃত্যু ঘটিতেছে, তাঁহাকে পাইতেছি প্রেমের প্রতীক রূপে। তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, তিনি প্রেমিক, বিশ্ব-নিখিলের নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছেন,—ধর্মের ভিতর দিয়া, কর্মের ভিতর দিয়া, কাব্যের ভিতর দিয়া, অজস্র উপায়ে তাঁহার নিগূঢ় অন্তরের অনন্ত প্রেম ঢালিয়া দিতেছেন। তিনি আদর্শ প্রেমিক, প্রেমিক ছাড়া তিনি আর কিছু নহেন। কিন্তু কতক্ষণ? কতক্ষণ তাঁহাকে প্রেমিকরূপে ধরিয়া রাখিতে পারিব? তিনি কি আমাদের সাবধান করিয়া বলেন নাই—

"মনে হয় অজস্র মৃত্যু রে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নব প্রভাতের শিখর চূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।"

তাই তো বলিতেছি কোন বিশিষ্ট নামকরণের দ্বারা অখণ্ডকে খণ্ডিত করিব না। কেবলমাত্র বৃক্ষরাজিই দেখিতে থাকিলে বনানীর অনির্বচনীয় রূপ চোখে পড়িবে না। সমগ্রভাবে দেখিতে গেলেও দেখা সার্থক হইবে না। তরুলতা-গুল্মের মধ্যে, অসংখ্য বিহগকুলের সঙ্গীতের মধ্যে, নির্ঝরিণীর মর্মরধ্বনির মধ্যে, কালবৈশাখীর রুদ্র আলোড়নের অন্তরালে, সহসা-বাতাসে ঈষৎ কম্পিত আলোছায়ার মাঝখানটিতে যে অজানা বনরাণী বিচিত্র রূপরস ও গুণের বসনাঞ্চলে অবগুণ্ঠিতা হইয়া আছেন, তাহাকে জানিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ। তাই ত তিনি বলিতেছেন,

"বাহির হইতে দেখোনা এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথায় সে নাহি রে।"

কিন্তু কী করিয়া তাঁহার সত্য স্বরূপটি খুঁজিয়া বাহির করিব? তাঁহার তো একটি রূপ নাই? আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীর ছত্রে ছত্রে যে বিচিত্র বাণী ধ্বনিত হইতেছে, ইহাদের সমষ্টির মধ্যে যে ঐক্যরূপী রবীন্দ্রনাথ একান্ত গোপনে অধিষ্ঠিত হইয়া আছেন, প্রতিক্ষণের পরিবর্তনশীল রূপগুলির মধ্যে যে অপরি-বর্তনীয় রূপটি ফুটিয়া আছে, যাহা মানুষ কেবলমাত্র আপন মানসের মধ্যে কল্পনার বিচিত্র তুলিকাস্পর্শে চিত্রিত করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাহাই। কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল যে, রবীন্দ্রনাথের সেই 'ঐক্যরূপ' যখন প্রতিভাত হইবে

মানুষের মানসে, তখন স্পষ্ট দেখা যাইবে যে তাহা কোন, কুহেলিকাময় সৃষ্টিছাড়া মূর্তি নয়। তাহা চির পরিচিত, চির দেখাশোনা জানা একান্ত নিভুর্ল নির্মল ছবি। প্রতিদিনকার প্রতিমুহূর্তের সহমানব ব্যতীত তিনি আর কিছু নহেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, সার্বজনীন মানবত্বের অবাধ ছাপ লইয়া বিশেষ মানুষরূপে, আমাদের ঘরের মানুষ, আমাদের মনের মানুষ রূপে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত হইবেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট আপনার, তিনি সকলের নিকট আপনার। তিনি সকল দেশের, তিনি সকল যুগের আপন জন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন,

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক—
আমি তোমাদেরি লোক ;
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।"

রবীন্দ্র-কাব্যে স্তোত্রম্

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

রবীন্দ্র-কাব্যে স্তোত্রম্—রবীন্দ্র-প্রতিভার একটি অন্যতম ব্যাপকতর সৃষ্টি। অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক সুর, ঈশ্বর-প্রার্থনা, ঈশ্বর-বন্দনা এবং ঈশ্বরের প্রতি আবেগ-উচ্ছ্বসিত প্রেম-ভক্তি যে-কাব্যগুলির প্রতি ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে, অন্তঃসলিলার মত অন্তরালবর্তী হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে সেই কবিতাগুলোই কবি-কল্পনার স্তোত্রম্ পর্যায়ভুক্ত। এই স্তোত্রমের সঙ্গে শিশুর উন্নত চিত্ত বিকাশের একটি অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। কেননা ঈশ্বরানুরাগ, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি একনিষ্ঠতা শিশুর সমৃদ্ধ নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রথম সোপান এবং ব্যক্ত ঈশ্বর আরাধনাই সেই সোপানকে আয়ত্তাধীন করতে সমর্থ হয় এবং শিশুর সম্মুখে আদর্শের জয়পতাকা তুলে ধরে ভাবী কালের উন্নত পথের সীমানা নির্দেশ ক'রে দিতে পারে।

কিন্তু অত্যন্ত শোচনীয় কথা এই যে আমাদের সমাজের ছেলেমেয়েদের প্রয়োজনে সেই নৈমিত্তিক ব্যক্ত ঈশ্বর স্মরণের নির্দিষ্ট কোনও ব্যবস্থারই প্রচলন নেই। বারো মাসের তেরো পার্বণ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার যে পূজা অর্চনার অনুষ্ঠানাদি হয়ে থাকে শিশু-মনে প্রভাব বিস্তার করার সঙ্গে সে আড়ম্বরাদি প্রায় নিঃসম্পর্কিত। একমাত্র সরস্বতী পূজা শিশুমনে আনন্দ বিতরণ ও সাড়া দিতে সমর্থ হয়, কিন্তু একবার মাত্র বাৎসরিক সে অনুষ্ঠান ক্রিয়াশীল হয়ে স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে না। উপবীত গ্রহণের পর ব্রাহ্মণ-পুত্রেরা ঈশ্বর আরাধনার কতকটা সুযোগ হয়তো বা পায়, কিন্তু তখন তারা প্রায় অনেকেই শৈশব ও কৈশোর জীবন অতিক্রম ক'রে আসে, এবং যারা না ক'রে গায়ত্রী মন্ত্রের নীরস সংস্কৃত সে শ্লোক তাদের শিশু-মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাছাড়া মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ-পুত্র নিয়ে বৃহত্তর সমাজ নয়, ভাবীকালের আদর্শ মেয়ে, বালিকা ও কিশোরী রয়েছে। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক শিশুর উপযোগী হয়তো বা কিছু আছে, যেমন "ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায়চ," "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্", "জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ" প্রভৃতি, কিন্তু এ শুষ্ক ও কঠিন ভাষণ শিশুরা আয়ত্তাধীন করতে না পারায় স্তোত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে বাধা পায়, তাই ওদের মনে তা কার্যকরী হ'য়ে উঠতে পারে না। দুর্ভাগ্য বই কি—! আজকের যে শিশু-সমাজ—ভাবী দিনের নাগরিক এবং ভাবীকালের অধিনায়ক এবং শক্তিরূপিনী—তাদের চিত্তবৃত্তি স্ফুরণের প্রধানতম দিকটাই ফাঁকা থেকে যায়—, বিরাট সৃষ্টির অধিকারীকে জানবার বোঝবার তারা সুবিধে সুযোগ পায় না। এই দিক থেকে রবীন্দ্র-কাব্যে স্তোত্রম্ বিশেষভাবে কার্যকরী, শিশুর উন্নত মানসিক বৃত্তির স্ফুরণের এবং সমৃদ্ধ নৈতিক চরিত্র গঠনের পক্ষে একান্ত ভাবে সহায়তাকারী। তাই ছেলেমেয়েদের

উপযোগী স্তোত্রগুলি শিশু-সমাজে প্রচলন হওয়া একান্ত ভাবে প্রয়োজন; সন্ধ্যা-আহ্নিকের অনুকরণে প্রত্যহ সন্ধ্যায় ও সকালে প্রার্থনা-ভঙ্গিতে আবৃত্তি করাই সব চেয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা। শৈশব থেকে সুরু ক'রে কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যৌবন আসন্ন, এই বয়সের ছেলেমেয়ে পর্যন্ত শিশু পর্যায়ভুক্ত, কেবল বয়সের স্তর বিভেদে, ওদের হৃদয়ঙ্গম করবার শক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে স্তোত্রম্‌গুলি বিভিন্ন শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক।

ধ্যান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন—

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি,
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি,"

কথায় বলে "আবৃত্তি সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরিয়সী", তাই এই রবীন্দ্র-স্তোত্রম্ আবৃত্তির ফলে শিশু-মনে প্রভাব বিস্তার করবেই।

"তুমি যেন ওই আকাশ উদার
আমি যেন এই অসীম পাথার—"

ইত্যাদি প্রার্থনা করতে করতে শিশু-কল্পনা ঈশ্বরের বিরাটত্বের মহিমায় মুগ্ধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, এবং এই উচ্ছ্বাসই ঈশ্বরপ্রেমকে আয়ত্তাধীন করার প্রথমতম সোপান।

কবি বলেছেন—

"আমি সুখ বলে দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।
করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে
সহসা নয়ন মেলিয়া দেখিনু এনেছ তোমারই দুয়ারে"

আমাদের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের করণীয় কার্য যে মঙ্গলের নিমিত্তেই এই প্রচলিত বাক্যটি এই পংক্তি কয়েকটির জীবন্ত চিত্র যেন—এবং এই স্তোত্রম্ই ছেলেমেয়েদের বেদনা-আর্ত মুহূর্তে অসীম বল সঞ্চার করবে মনে, নৈরাশ্য-ব্যাকুলিত প্রাণে আশার উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়ে দিতে পারবে।

বিশ্বকবি লিখেছেন,

"নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে
সবাই ছেড়েছে যার নাহি কেহ, তুমি আছ তার আছে
তব স্নেহ
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ, সেও আছে তব ভবনে।"

এই স্তোত্রম্ বন্দনায় শিশু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও অনুরাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, মুকুলিত জীবনে মহত্তর প্রেরণা আনবে।

কবি বলেছেন—

"তোমার ইচ্ছা হউক হে পূর্ণ করুণাময় স্বামী
তোমারই প্রেম স্মরণে রাখি চরণে রাখি আশা
দাও দুঃখ, দাও তাপ সকলি সহিব আমি"

এই প্রার্থনাই অন্ধকার মুক্ত করবে শিশু-মনকে কৃতজ্ঞতায় ঈশ্বর-অনুরক্ত করবে।

কবি গেয়েছেন—

"তোমারই নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি
তোমারই নামে খুলিল হৃদয়-শতদল-দল-রাজি।"

এই স্তোত্রম্ই ঈশ্বর-করুণায় শিশুকে পুলকিত এবং ভক্তিতে উদ্বেলিত ক'রে তুলবে। এইগুলি ছাড়াও রবীন্দ্র-স্তোত্রম্ আরও অনেক রয়েছে—প্রত্যহ ছেলেমেয়েরা সেগুলি প্রার্থনা করতে পারে, যেমন—

"তব অমল পরশরস তব শীতল শান্ত
পুণ্যকর অন্তরে দাও।
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি হৃদয়
মাঝে মম চাও।
তব মধুময় প্রেমরসে সুন্দর সুগন্ধে
জীবন ছাও,
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব শ্রী
আনন্দ জাগাও"

* * *

"বিমল প্রভাতে মিলি এক সাথে বিশ্বনাথে কর প্রণাম
উদিল কনক রবি রক্তিম রাগে
বিহঙ্গকুল সব হরষে জাগে
তুমি মানব নব অনুরাগে পবিত্র নাম তাঁর করহে গান"

* * * *

"আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার-কাজে
তুমি আমার নয়নে নয়ন রেখো অন্তর মাঝে।

হৃদয়-দেবতা রয়েছ প্রাণে, মন যেন তাহা নিয়ত জানে
পাপের চিন্তা মরে যেন দহি দুঃসহ লাজে—"

*   *   *   *

"অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর-তর হে
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে"

*   *   *   *

"আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে—"

এই শ্রেণীর স্তোত্রম্ রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিস্তর,—এবং স্তোত্রম্গুলি শিশুর নবীন মনে যে ঈশ্বরের প্রভাব বিস্তার করতে পারে এ বিষয় নিঃসন্দেহ। "জন্মদিনের গান" কবিতাটিও স্তোত্রম্ পর্যায়ভুক্ত। জন্মদিন উপলক্ষে এই স্তোত্রম্টি ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

"ভয় হ'তে তব অভয় মাঝারে নূতন জনম দাও হে
সংশয় হতে সত্য সদনে, দীনতা হইতে অক্ষয় ধনে
জড়তা হইতে নূতন জীবনে, নূতন জনম দাও হে।"

*   *   *   *

এই সঙ্গে—

"তোমারই গৃহে পালিছ স্নেহে তুমি ধন্য—ধন্য হে
আমারই প্রাণ তোমারই দান তুমি ধন্য ধন্য হে"—

এই কবিতাটিও সুন্দর।

নিঃসংশয়ে এ কথা স্বীকার্য যে, মানব-আত্মার উন্নত-বিকাশের সঙ্গে সার্বজনীন প্রেমের একটি অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ রয়েছে, কেননা এই সার্বজনীন প্রেমই মহত্তর হৃদয় প্রেরণায় মানব-আত্মাকে সমৃদ্ধ করে, মনকে অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ক'রে দেয় এবং ঈশ্বর-প্রীতিই তার মূলে প্রধান অবলম্বন। এবং রবীন্দ্র-স্তোত্রম্ই সেই ঈশ্বর-প্রেমকে আয়ত্ত করবার প্রথম সোপান, তাই ভাবীকালের অধিনায়ক যারা, যারা ভাবী দিনের শক্তিরূপিণী, আজকের সেই ছেলেমেয়েদের নৈতিক চরিত্র গঠনের নিমিত্ত এই স্তোত্রমের ব্যাপক প্রচলন বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও রবীন্দ্র-স্তোত্রম্ প্রার্থনা করবে। এবং এই প্রাত্যহিক স্তোত্রম্ বন্দনের মধ্যেই রবীন্দ্র-স্মরণ চির-জাগ্রত হয়ে চির-অমরতা লাভ করবে।

প্রকৃতি-দুলাল রবীন্দ্রনাথ

শ্রীহীরেন সেন

জাগতিক সভ্যতার ইতিবৃত্তের প্রথম স্তরে মানুষ আর প্রকৃতির সম্বন্ধ গৃহী আর গৃহের মতোই নিবিড় ও অচ্ছেদ্য হয়ে গড়ে উঠেছিল! আরণ্য-জগতের চলমান জীবন-ধারাকে কেন্দ্র ক'রে যে সমাজ-জীবন রূপ পেল ঋষির পুণ্য তপোবন হ'তে,—যুগের পরিবর্তনশীল আওতায় তার বহিরাবরণ খসে পড়লেও আভ্যন্তরীন বেগধারা প্রশমিত হয়নি। আজো সে পথ ক'রে নিয়ে চলেছে মানব-মনের গভীর অন্তঃপুরে সলিল-পুষ্টা ফল্গু-ধারার মতই।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার বাঁশীতে সুর তুলেছেন বিভিন্ন-রূপের; তাঁর রূপান্বিত সুরের রেওয়াজ কখনো চলেছে ডিঙিয়ে-চলা বাস্তবের বুকে পরিচয়ের কলরোল জাগাতে—কখনো বা অতল জলধির শেষ কল্লোল-গীতে আপনার হারানো প্রতিধ্বনিকে ফিরে পেতে। আবার কখনো বা সে ভিজে মাটির গন্ধ-ভরা সবুজ শষ্প-তৃণের রাজ্যে মিতালি জানাচ্ছে কাঁপনের শিহরণ জাগিয়ে; চিরসবুজের এই শ্যাম-সমারোহের পাশা-পাশি চলেছে কবিচিত্তের একটা জানাজানি কানা-কানির কূলছাপানো জোয়ার-ভাঁটা। কবি-দৃষ্টির এই যে ছুটাছুটি, প্রান্ত থেকে প্রান্তান্তরে এই যে একটা অতৃপ্ত আবেগ, আর না পাওয়ার আনন্দ-বেদনা—এর ভেতর রয়েছে মানব-সমাজের শাশ্বত ইতিবৃত্ত।

রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব—তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃতিকে মানবের সুখ-দুঃখের সাথী হিসাবে। জননী বসুন্ধরার হৃদয়-স্পন্দনে তিনি অনুভব করেছেন বিশ্ব-

বাসীর হৃদয় স্পন্দন। তার কাছে প্রকৃতি মূর্ত হয়ে উঠেছে একটা চৈতন্যময় আনন্দ ঘন সত্তা নিয়ে। তাই শান্তির সস্নেহ স্পর্শ আর জীবনের বাধাহীন সহজ প্রকাশকে ধরে রাখতে হ'লে প্রকৃতির সুনিবিড় সাহচর্য যে আমাদের একান্ত ভাবে প্রয়োজন এ ধারণা কবিচিত্তকে গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করেছে। কবির প্রাণস্পর্শী ভাষায় তার আভাষ ফুটে উঠেছে—"মনের বাইরে যে পরিদৃশ্যমান মূক প্রকৃতি রয়েছে কে জানে তার বেদনার নাড়ী কি টন্‌টন্ করে উঠছে না? মনে হয় যেন এক দক্ষ শিল্পী কালের পরপার থেকে নীরব ইংগিত জানিয়ে দিচ্ছে মানুষের। ইট পাথর আর বর্বরতার চরম জঘন্যতা মানুষকে যে তিক্ত অভিজ্ঞতার মাঝখানে এনে ফেলেছে এথেকে মুক্তি নিতে হ'লে উদার অনন্তের প্রতি যেতে হবে। এর জন্য আবার প্রকৃতির বুকে ফিরে যেতে হবে—সন্দেহ অবহেলা প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই পেতে হবেই। সব চেয়ে বড় কথা মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ সাধন ইট পাথরের রাজ্যে নেই। শান্তির নীড়ে যদি আমাদের বাসা বাঁধতে হয় তবে প্রকৃতির ছায়া শীতল আঙিনায়ই তার স্থান। প্রাণ যেখানে হয় সংকুচিত, মানুষ যেখানে নিঃসঙ্গ—নির্যাতীত, নীরস খাঁচায় বাস করে শান্তি নেই, সে খাঁচার যতই মূল্য হোক্ না কেন।"

শতাব্দীর এ অভিজ্ঞতা-বিজড়িত তথ্য থেকে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করতে পারি, তা হচ্ছে একটা পরিচয়-পূর্ণ নিবিড়তর সহজাত সম্পর্ক যা আদিমের গুহাগর্ভ থেকে মানবের মনে জাগিয়েছে একটা সবুজের নেশা, পরিয়েছে একটানা বয়ে-চলা স্মৃতির ছাপ। তাই মানুষ আর প্রকৃতি দুয়ের পরিচয়পত্র অন্তরের রসে অভিষিক্ত হয়ে উঠেছে।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ জগতের চিন্তার রাজ্যে যে অভূতপূর্ব তথ্যের পরিবেশন করেছেন, তা বহু শতাব্দীর চিন্তা-ধারাকে পরিচালিত করবে আগামী যুগের দিকে। মানুষের তরফ থেকে যে রণ-নেওয়া অভিযান লতাপাতার রাজ্য থেকে সুরু হয়েছিল প্রবৃত্তির অনুশাসনে, কালের একটানা গতিপথে এসে সে পরিবেশিত হয়েছে যুগের ছাঁচে ঢালাই হোয়ে। দ্রৌপদীর ক্রমবর্দ্ধমান বস্ত্র-খণ্ডের অন্তরালে গ্যাটাপাশ্চারের কোন্ শিল্পী আত্ম-গোপন করেছিলেন—তাই-ই হয়েছে এ যুগের গবেষণার বিষয় বস্তু। আজ দুঃশাসনের দুঃশাসন যৌবনের পরি-পূর্ণতায় এসে পাশ ফিরছে সৃষ্টির রংগমঞ্চে। ফল কথা সাহিত্যকে চলার পথ কাটতে হলে যুগের পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যেই তার উপযুক্ত চারণ-ভূমি। যে কোন প্রচার-সভায়ই তার ভোজ দেওয়া হোক্ না কেন, যুগের সামিয়ানার তলেই তাকে বসতে হবে। তাই পাচকের খবর না নিয়েও সাহিত্যিক লুচি কেমন হলো তা বলা চলে। শুধু মাত্র প্রস্তুতির মূলাকর্ষণে তাকে অস্পৃশ্য বা অপাংক্তেয় বলা যায় না। রবীন্দ্র-যুগের সাহিত্য এ থিওরি অস্বীকার করেনি, আলিংগন করেছে।

বিংশ শতাব্দীর হট্টগোলে সাহিত্য চলেছে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী থেকে বণিক আবেষ্টনে। তার হাতিয়ার 'ফোটাফুল', দখিনাবায় আর বিরহীর রাত-জাগা শয্যা রূপান্তরিত হয়েছে পাউডার, কাঁদুনে গ্যাস্ আর স্টেচারে। কামান বেয়নেট আর বোমার গোঙানীসুরও তার মধ্যে মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে। তাই ও যুগের বিন্ধ্য-ডিঙানো অগস্ত্য এ যুগের ব্রেনারের হিটলার আর ওদিনের সংঘারাম এদিনের রাস্ট্রসংঘ।

রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল মধ্যাহ্নে আত্ম-প্রকাশ করলেও তার প্রাণশক্তির তথা সাহিত্যশক্তির মূল শিকড় প্রচ্যের মাটিতেই বসানো রয়েছে। কবির কাব্য-সৃষ্টিকে একটা ফল-ফুল ভূষিত বৃক্ষের সাথে তুলনা দিলে বলা চলে যে, উহার মূল ভারতের আদর্শ-কেন্দ্রিক, শাখা-প্রশাখা বৈদেশিক আওতার ছোঁয়চ-রঙা,—মধ্যে তার নোতুন সৃষ্টির টিপসহি জল্‌জ্বল্ করছে।

প্রত্যেক কবির সাহিত্য সৃষ্টির একটা মূল সুর আছে যা অন্য সকল সুরকে অতিক্রম ক'রে প্রধান হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির মূল সুর কি? এর উত্তরে বলা চলে প্রকৃতিকে সুখ-দুঃখ ওঠা-পড়ার সত্তা সম্বলিত পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে কবি তাকে বরণ করে ঘরে তুলেছেন অবিচ্ছেদ্য মানব-মনের সাথী হিসেবে। তার মধ্যে বিশ্বপ্রেমও যে দিগন্তের বুকে দোল্‌না না টাঙিয়েছে তা নয়। তবে পরিদৃশ্যমান বা লুকানো সত্তার প্রতি যে দৃষ্টি-বাটকারার পক্ষ-পাতিত্ব একই থাকবে এমন কথা হলপ ক'রে বলা চলে না। তাই অসমতার ফারাক সাহিত্যে ও জগতে ঘটছে ও ঘটবেও।

"ধীরে বহে ডন্"

(অনুবাদ-উপন্যাস)

[পূর্বানুবৃত্তি]

মিখেল্ শোলকভ্

পঞ্চম অধ্যায়

(৩)

রাই কাটা সারা হ'তে না হ'তেই গম পেকে উঠলো। রাইগুলো গোলাজাত করবার ফুরসুৎ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। কর্দ্দম-সিক্ত প্রান্তর পাটল পাতায় পরিপূর্ণ; কোন কোনটা আবার বটের নলের মত হয়ে গেছে। ডাঁটাগুলি শুষ্কপ্রায়। 'ফসল ভালই হয়েছে।' পল্লীর আবালবৃদ্ধ-বনিতার আনন্দদীপ্ত মুখে ঐ এক কথা। মঞ্জরিগুলিতে শস্য বেশ ভারী এবং বড় বড় হয়েছে। কিন্তু বসন্ত কালে কিছুদিন অনাবৃষ্টির জন্য গাছগুলি তেমন বাড়তে পারে নি। খড় দিয়ে কোন কাজই হবে না।

ইলিনীসনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে প্যান্টালীমন ঠিক করল যে করশুনভ যদি সম্বন্ধে রাজি হয় তবে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বিয়ে স্থগিত থাকবে। জবাব আনবার জন্য করশুনভের কাছে এখনও সে যেতে পারে নি। ফসলের হাঙ্গামা সর্ব্বাগ্রে মিটাতে হবে তো! তার পর আর সব। তা ছাড়া সুবিধামত একটা ছুটীর দিনও পাচ্ছে না।

শুক্রবারে মেলেকভরা ফসল কাটা আরম্ভ করে। প্যান্টালীমন গাড়ী ঠিকঠাক ক'রে রাখল। পিয়োত্রা ও গ্রীগর কাটবার জন্য চলল মাঠে। পিয়োত্রা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল; গ্রীগর পায়ে হেঁটে সঙ্গে চলল। আজ গ্রীগরকে দেখে বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ বলে মনে হচ্ছে। তার চিবুকের নিম্নে একখণ্ড মাংস ঈষৎ কাঁপছে। এর অর্থ পিয়োত্রা বেশ ভাল ভাবেই জানে। রুদ্ধ রোষে গ্রীগর গড়্‌গড়্ করছে। একটু কিছু বললেই ঝগড়া সুরু হয়ে যাবে। তবু পিয়োত্রা লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। ইন্ধন জোগাবার অশোভন কৌতূহল নিয়ে সে বললে—'সত্যি বলছি গ্রীগর, সে নিজে আমাকে বলেছে।'

—'বলুক না, তাতে কি হয়েছে!'—কাটা কাটা ভাবে গ্রীগর উত্তর করল।

—'বললে 'আমি যখন সহর থেকে আসছিলাম, মেলেকভদের ওই সূর্য্যমুখীর কুঞ্জের কাছে কথার শব্দ পেলাম।'

—'পিয়োত্রা, এখনও থাম বলছি!'

—'হাঁ কথা শুনলাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি ...'

ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে গ্রীগর তাকে শাসিয়ে বললে—'ভাল হবে না পিয়োত্রা, এখনও থাম বলছি!'

—'আচ্ছা লোক তো? কথাটা শেষ করতে দে।'

—'এখনও বলছি, ঘুসোঘুসি হবে কিন্তু!'

পিয়োত্রা ঘাড় ফিরিয়ে আবার বললে—'বেড়ার ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখি প্রেমিকযুগল আলিঙ্গনাবদ্ধ আছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কারা? সে বললে—আর কে? তোমার ভাই আর একসিনিয়া! আমি বললাম....'

ফসল কাটবার যন্ত্রটার পেছন থেকে পিচ্‌ফর্কটা নিয়ে গ্রীগর পিয়োত্রার দিকে লাফিয়ে এগুলো। রাশ ছেড়ে দিয়ে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পিয়োত্রা বললে—'দেখ, জানোয়ারটার কাণ্ড দেখ। এতেই ক্ষেপে গেছে। মুখের চেহারা কেমন হয়েছে দ্যাখো না!'

নেকড়ের মত দাঁত বার ক'রে গ্রীগর পিচফর্কটা ছুঁড়ে মারলে। পিয়োত্রা উপুড় হয়ে পড়তেই সেটা তার পিঠের ওপর দিকে গিয়ে কয়েক ইঞ্চি ঘুরে মাটিতে পুঁতে বসল। ভীত ঘোড়াটার বল্গা ধরে পিয়োত্রা বললে—'লাগলে মরে যেতাম না! জানোয়ার কোথাকার!'

—'হাঁ, মারবার জন্যই ত ছুঁড়েছিলাম।'

—'হুঁ মারবার জন্যই ছুঁড়েছিলাম! গাধা কোথাকার। আচ্ছা বাপ্‌কা বেটাই হয়েছিস্!'

বাঁট ধরে পিচফর্কটা টেনে তুলে গ্রীগর আবার পেছন পেছন হাঁটতে লাগল। আঙুল দিয়ে ইসারা ক'রে পিয়োত্রা

বললে—'দে আমার হাতে পিচফর্কটা দে!' বাঁ হাতে রাশ ধরে—গ্রীগরের হাত থেকে উল্‌টো ভাবে পিচফর্কটা নিয়ে বাঁটটা দিয়েই গ্রীগরের মেরুদণ্ডের উপর সপাং ক'রে মারলে এক ঘা। গ্রীগর লাফ মেরে সরে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তার পানে চেয়ে পিয়োত্রা বললে—এই এক ঘাতেই হবে!'

সামান্য কিছু পরে দুজনেই বসে সিগ্রেট ধরিয়েছে। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে উভয়েই হো হো ক'রে হেসে মাটিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বাড়ী যাবার পথে ক্রিস্তোনিয়ার স্ত্রী এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব দেখে গেছে। গাড়ী ভর্ত্তি রাইয়ের পাঁজার উপর কোন মতে আঙুলে ভর ক'রে দাঁড়িয়ে দেখে, গ্রীগর সক্রোধে পিচফর্কটা হেঁকেছে। ফলাফল ঠিক ঠাহর করতে পারল না। ওদের গাড়ীটা মাঝখানে ছিলো, তাই ভাল ক'রে ওপাশের ব্যাপারটা দেখা গেল না। কিন্তু সংবাদটা প্যাণ্টালীমনের কাছে না দিতে পারলেও স্থির থাকা যায় না। গাঁয়ে পৌছুতে না পৌছুতেই এক প্রতিবেশিনীকে ডেকে বললে —'ও, ক্লিমোভ্‌না, শীগ্‌গির তুই যা প্যাণ্টালীমনের কাছে। টার্টার বাঁধের কাছে তার ছেলে দুটো পিচফর্ক নিয়ে মারামারি ক'রে শেষ হ'ল। গ্রীগরটা ফর্কটা দিয়ে পিয়োত্রার পেটে মেরেছে এক ঘা; পিয়োত্রাও দিয়েছে ভাল করে। রক্তে রক্তাকার হয়ে গেছে!'

ভ্রাতৃদ্বয় ততক্ষণে ফসল কাটতে সুরু ক'রে দিয়েছে। পিয়োত্রা ক্লান্ত ঘোড়া দুটোকে অকথ্য গালিবর্ষণ করছে; আর গ্রীগর ফর্কটা দিয়ে কাটা শস্যগুলি গুছিয়ে পাঁজা ক'রে রাখছে। মাঠ জুড়ে ফসল কাটা চলেছে। সর্ব্বত্রই শস্যের পাঁজা আর ফসলকাটা যন্ত্রের কর্কশ শব্দ। চালকদের নকল ক'রে পাহাড়ে ইঁদুরগুলি গর্ত্তের ভেতর থেকে শিস্ দিচ্ছে।

—'আর কিছুটা কেটেই তামাক খেয়ে নেবো।' —যন্ত্রের কর্কশ শব্দ ভেদ ক'রে উচ্চঃস্বরে পিয়োত্রা বললে। গ্রীগর মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ঘেমে সে এক-সা হয়ে গেছে। বেনী ক'রে শস্য তুলে সে তাড়াতাড়ি কাজ সারবার চেষ্টা করছে। ঘোড়া দুটো থামিয়ে তারা বসলে এসে। হাতে চোখ আড়াল ক'রে পিয়োত্রা বললে—'কে যেন খুব জোর ঘোড়ায় চড়ে আসছে গ্রীস্‌কা!'

স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে সবিস্ময়ে গ্রীগর বলে—'বাবা নাকি?'

—'পাগল নাকি? কি চড়ে আসবেন তিনি। দুটো ঘোড়াই তো আমরা নিয়ে এসেছি।'

—'আমি বললাম, দেখ, নিশ্চয়ই বাবা!'

অশ্বারোহী ক্রমে নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল। দুজনেই সে দিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে রইল। একটু পরেই তাকে দেখা যেতে লাগল। উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে পিয়োত্রা বললে—'সত্যিই তো!'

—'বাড়ীতে একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়!'

এ শঙ্কা দুজনের মনেই ছিল, কিন্তু গ্রীগর বলে ফেললে।

শ' খানেক হাত দূরে অশ্বের গতি সংযত ক'রে মাথার ওপর চাবুকটা ঘুরিয়ে প্যাণ্টালীমন ক্রোধোন্মত্ত স্বরে বললে—'আজ দুটোকেই শেষ করবো, খান্‌কির ছেলে কোথাকার।'

পিতার এই শাসানিতে পিয়োত্রা স্তম্ভিত হয়ে গেছে; বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে গ্রীগরের পানে চেয়ে সে জিজ্ঞেস করল—'হোলো কি গ্রীস্‌কা!'

—'শীগ্‌গির গাড়ীটার ওপাশে চল, আজ বরাতে ভোগ আছে! দেখেছো কশা, তলায় গিয়ে সারতে না সারতেই চাব্‌কে পেটের নাড়ীভূঁড়ি বার করে দেবে।' হেসে গ্রীগর গাড়ীটা ঠেলে তাদের ও বাপের মাঝখানে এনে রাখলো।

কাটা শস্যের ওপর দিয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে লাফিয়ে অগ্রসর হ'ল। নগ্ন পিঠে চড়েই প্যাণ্টালীমন এসেছিল, ঘোড়াটার পেটের উপর পা ঠুকে জিজ্ঞেস করল—'কি হচ্ছিল এখানে বসে?'

সত্রাসে কশাটার পানে চেয়ে পিয়োত্রা বললে—'দেখছেনই তো ফসল কাটছি।'

—'ফর্ক দিয়ে মেরেছে কে? কিসের জন্য মারামারি করছিলি?'

পিতার দিকে পেছন ফিরে গ্রীগর আকাশ পানে চেয়ে মেঘ গুনছিল।

—'কিসের ফর্ক? কে মারামারি করছিল?'

অভিনীত বিস্ময়ে বাবার পানে চেয়ে পিয়োত্রা জিজ্ঞাসা করল।

—'কেন, ইয়ে বললে যে! ছুটে এসে বললে—তোমার ছেলেরা ফর্ক নিয়ে মারামারি করে মরছে দেখগে। ও মিথ্যা কথা বলেছে?'

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে মাথা নেড়ে প্যাণ্টালীমন প্রশ্ন করল—'আমি একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে ছুটে এলাম।'

—'কে বলেছে আপনাকে?' পিয়োত্রা জিজ্ঞাসা করল।

—'ঐ ক্লিমোভ্‌নাটা!'

—'মিথ্যে কথা, বাবা! গাড়ীতে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখেছে।'

—'দাঁড়া, দেখাচ্ছি তাকে! চাব্‌কে আমি ঠাণ্ডা করব!'

প্রাণপণে হাসি চেপে গ্রীগর অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল। পিয়োত্রা প্যাণ্টালীমনের কাছথেকে মুহূর্ত্তের জন্যও চোখ ফেরায় নি। প্রাণভরে কিছুক্ষণ ছুটাছুটি ক'রে প্যাণ্টালীমন গায়ের ঝাল মিটাল। তার পর কিছুটা ফসল কেটে, ঘোড়ায় চড়ে আবার গ্রামে ফিরল। কশাটা মাটিতে পড়েছিল—মনে ক'রে নিয়ে আস্‌তে পারে নি। পিয়োত্রা সেটাকে তুলে এদিক ওদিকে পরীক্ষা ক'রে ভাইকে বললে—'জব্বর বেঁচে গেছি গ্রীস্‌কা! দেখছিস্ কি জিনিষ! ভাল এক ঘা বসালে, আর দেখতে হবে না, মুণ্ডটি কেটে ব্যস্ দুভাগ!'

* * *

(৪)

অবস্থাপন্ন পরিবার বলে করশুনভ্‌দের একটা খ্যাতি ছিল। তাতারস্ক গ্রামে তারাই নাকি সবচেয়ে পয়সা-ওয়ালা। হবেই বা না কেন? চৌদ্দ জোড়া ষাঁড়, ঘোড়া, ঘুড়ী পনরটা গাই, আরও অনেক গৃহপালিত পশু, কয়েক শ' ভেড়ার পাল, এত সব আর কার আছে। তাছাড়া তাদের টিনের ঘর, মোখবের বাড়ীর চাইতে এতটুকু খারাপ নয়! ছয় ছয়টা ঘর আছে! প্রাঙ্গণ নূতন দামী টালী দিয়ে মোড়া; বাগানটাও প্রায় একর তিনেক—একটা লোকের আর কত চাই?

প্যাণ্টালীমনও এসব জানত। কাজেই সম্বন্ধ করতে যেতে প্রথমে তার মন সরছিল না। 'না' বলে বস্‌তেও তো পারে! মেয়ের জন্য গ্রীগরের চাইতে ভাল বর খুঁজে নেওয়া করশুনভের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। এই সব ভেবেই করশুনভের করুণা ভিক্ষা করতে যাবার ইচ্ছে তার আদৌ ছিল না। কিন্তু মরচে যেমন লোহাকে ক্ষইয়ে দেয়, ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ইলিনীস্‌নাও তেম্‌নি প্যাণ্টালীমনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। স্ত্রীর হাত এড়ান আর সম্ভব হ'ল না। কাজেই আর একদিন তাকে জবাবটা শোনার জন্যও করশুনভের বাড়ী যেতে হ'ল। পথে পথে স্ত্রী, গ্রীগর, সারা দুনিয়ার সে মুণ্ডপাত করেছে।

এদিকে করশুনভের বাড়ীতেও মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। মেলেকভরা চলে যাবার পর নেতালিয়া বলে বসেছে গ্রীগর যদি তাকে ভালবাসে, তা'হলে তাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিয়ে করবে না। কি বিপদ! বাবা রেগে বললে—'এই, এতদিনে একটা গো-মূর্খকে উনি খুঁজে বার করেছেন! জিপসির মত কালো রঙ! না ওসব হবে না, ওকে আমি জামাই করতে পারবো না!'

নেতালিয়া কান্না শুরু ক'রে সলজ্জ কম্পিত স্বরে বললে—'আমি আর কাউকেই চাই না, বাবা, তা'হলে আমায় আপনি মঠে রেখে আসুন।'

—জানিস্ রাস্তায় রাস্তায় টো টো ক'রে বেড়ান, আর যে সব মেয়েদের স্বামী বিদেশে আছে তাদের পেছু নেওয়াই ওর কাজ?'

—তা হোক্!

নেতালিয়া মিরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা। সন্তানের মধ্যে মিরণ ওকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসে। এতদিন শুধু এই কারণেই নেতালিয়ার বিয়ে হয়ে যায় নি। না হ'লে বহু দূর থেকে বেশ ভাল ভাল ঘরের ছেলেদের জন্য ওর সম্বন্ধ এসেছে; সবাই তারা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু, প্রাচীনপন্থী

কসাক্। কিন্তু হ'লে কি হবে, দুলালী মেয়ের তার কোনটাই পছন্দসই হয় নি।

প্রাণে প্রাণে গ্রীগরের কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চাষ-আবাদের পর লক্ষ্য, তার কসাক সুলভ পারদর্শিতা মিরণের ভালই লাগত। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় সেদিন গ্রীগর ঘোড়দৌড়ে জিতেছে, সেইদিন থেকেই তার পর মিরণের নজর ছিল। কিন্তু হ'লে কি হবে? মেয়েকে একটা গরীবের ঘরে বিয়ে দিতে কিছুতেই যেন মন সরছিল না। তা' ছাড়া পাত্রটিও ইদানীং নেহাৎ সুনাম কেনেন নি তো!

রাত্রে শুয়ে স্ত্রী ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেছে—'ছেলেটি বেশ কঠোর পরিশ্রমী, দেখতে শুনতেও ভাল। তাছাড়া ওকে দেখে নেতালিয়ার মাথা একেবারেই বিগড়ে গেছে।'

স্ত্রীরদিকে পেছন ফিরে শুয়ে মিরণ বিরক্তির সুরে বলেছে—'হাঁ, হাঁ হয়েছে যাও! দেখতে শুনতে ভাল! চোখের মাথা খেয়েছ নাকি? ভাল লেগে থাকে জামাই করগে। তুর্কীদের কাছে মেয়ে দিয়ে আমি কুল খোয়াতে পারবো না।'

স্বামীর আরও কিছুটা কাছে এসে পায়ের উপর হাত রেখে মেরিয়া ফিস্ ফিস্ করে বললে—'ওদের ঘরে সবাই বেশ খাটিয়ে, তা'ছাড়া খেয়েপরেও তো বেশ ভালই আছে।'

—'যাও যাও, সরো! গায়ের ওপর আস্‌ছো কি! জানো, তোমার নেতালিয়া কি মেয়ে? ব্যাটাছেলে দেখলেই ওর মাথা বিগড়ে যায়।'

—'রাগ না ক'রে সুস্থ ভাবে মেয়েটার কথা একবার ভাবো?'—এবারে একেবারে কানের কাছে এসে মেরিয়া বললে। নিরুপায় হয়ে মিরণ দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে ঘুমের ভাণ করে নাক ডাকাতে আরম্ভ ক'রে দিল।

জবাব নেবার জন্য মেলেকভদের আগমনে করশুনভরা বেশ কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ল। প্রাতঃ-প্রার্থনার পরই তারা এসে হাজির। ইলিনীসনা গাড়ী থেকে নাম্‌বার বেলা উলটে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু প্যাণ্টা-লীমন চট ক'রে তাকে ধরে ফেলে।

জানালা দিয়ে ওদের দেখে বিরক্তিব্যঞ্জক সুরে মিরণ বললে,—'ওরা আজ আবার এসেছে কি করা করতে?'

চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে প্যাণ্টালীমন ঘরে ঢুকে বললে —'ভাল আছেন তো!' নিজের স্বরের অশোভন উচ্চতার জন্য প্যাণ্টালীমন নিজেই তেমন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল। কাজেই ব্যাপারটা ঢাকবার জন্য গোঁফের আধ-খানা মুখের মধ্যে নিয়ে মুদিত নয়ানে, ইকন'টার সামনে অকারণ ক্রশ করলে।

—'আসুন!'—বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে মিরণ বললে।

—'ভগবানের কৃপায় আবহাওয়াটা বেশ ভালই আছে।'

—'হাঁ এ রকম থাকবে কিছুদিন।'

—'লোকের কিন্তু খুব উপকার হবে।'

—'ও, নিশ্চয়!'

—'হাঁ…আ।'

—'হুঁ…ওউ।'

—'তার পর মিরণ গ্রীগরীভিচ্! কি ঠিক করলেন আপনারা—হবে, না হবে না?'

মেরিয়া তখন ঘরে ঢুকেছে, ওদের দেখেই এক গাল হেসে বললে—'আসুন, আসুন, বসুন!'

ইলিনীসনা তার পপলিনের কোটটা খস্‌খস্ ক'রে বসে পড়ল। টেবিলের উপর বিছান নতুন ক্লথটার পর কনুইয়ে ভর ক'রে মিরণ নীরবে বসে ছিল। ক্লথখানার এক প্রান্তে জার ও জারিণার ছবি চিত্রিত। মাঝখানে রাজকুমারী এবং জার নিকোলাস আলেক-জেন্দ্রোভিচের ছবি। নীরবতা ভেঙে অবশেষে মিরণ বললে—'দেখুন, আমরা মেয়েকে বিয়ে দেবো ঠিক করেছি, যৌতুকের ব্যাপারটা ঠিক ঠাক হয়ে গেলেই এ সম্বন্ধ হয়!'

ঠিক এই মুহূর্তে ইলিনীসনা তার জ্যাকেটের কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রকাণ্ড একখানা রুটি বার করে গন্ধ শুঁকে টেবিলের 'পর রাখল। নিশ্চয়ই ওর পিঠের কাছে ছিল। প্যাণ্টালীমন কি ভেবে ক্রশ করবার চেষ্টা করল; কিন্তু তার বিশুষ্ক আঙুলগুলি সুষ্ঠু ভাবে ক্রশের ভঙ্গী শেষ না করেই, কোটের মধ্যে ঢুকে, বেহায়ার মত একটি বোতল টেনে বার করল। উত্তেজিত ভাবে চোখে টিপ মেরে প্যাণ্টালীমন মিরণের কুঞ্চিত মুখের পানে চেয়ে, সাদরে বোতলটির তলায় কয়েকটি চাপড় দিলে। 'বন্ধুগণ,

আসুন এইবারে ভগবানের কাছে আমরা একবার প্রার্থনা জানাই। তার পর ছেলে-মেয়ের মঙ্গলার্থে একটু পান ক'রে পরে দেনা-পাওনার কথা ঠিক ক'রে ফেলবো, কি বলেন।'

প্যাণ্টালীমনের এই নির্দোষ প্রস্তাবে অ-রাজী হবার কোনই কারণ নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিরণের আধপাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি প্যাণ্টালীমনের কোঁকড়ান দাড়ির মধ্যে মিশে গেল। এই ভাবে বসে তারা বিয়ের যৌতুকাদির কথা ঠিক করতে লাগল। কর্কশকণ্ঠে প্যাণ্টালীমন বললে—'দেখুন আপনি যা চাইছেন, আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ভেবে দেখুন তো বেয়াই, গোলোশ শুদ্ধ গেইটার, ফারকোট, তার পর পশমের পোষাক, রেশমী রুমাল, এত সব দিতে হ'লে আমাকে সাবাড় হ'তে হবে! এগুলি আপনার মেয়েকে এখন তো আমাদের বলতেও পারি, আমাদের বউকে যদি দিতে হয় তা'হলে হাটে গিয়ে একটা গরু বিক্রী করা ছাড়া আর উপায় দেখি না!'

—'কেন, তাতে কি আপনার আপত্তি আছে নাকি?' —টেবিল ঠুকে মিরণ বললে।

—'না আপত্তির কোন কথা নয়, তবে… ..'

—'আপত্তি আছে কি না, স্পষ্ট বলুন।'

—'দেখুন.........'

—'যদি আপনার আপত্তি থাকে ··চুলোয় যাক্ সব!'

মিরণের উত্তেজিত হস্তের ধাক্কা লেগে গ্লাস ক'টা মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

—'গোয়াল থেকে একটা গাই বেচতে হবে?'—নিরুপায়ের মত হতাশ কণ্ঠে প্যাণ্টালীমন বললে।

—'কিন্তু বিয়েতে যৌতুক দিতেই হবে তো! নেতালিয়ার নিজের একটা যৌতুকের বাক্স আছে! যদি তাকে নিতে হয়, তা'হলে আমার কথা মনে রাখবেন, এ কসাকদের প্রথা। আগের কালেও এই প্রথাই ছিল। আর আমরা তা' এখনও মেনে চলি'।

—'তা ত' বুঝলাম!'

—'হাঁ মনে রাখবেন!'

—'আচ্ছা!'

আবার হবু-বৈবাহিকদের শ্মশ্রু মিলিত হ'ল।

ওপাশে বৈবাহিকাদ্বয় বাক্সের পর আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বসে বগ্‌বগ্ ক'রে একে অন্যের কান ঝালা-পালা ক'রে তুলেছে। আনন্দে ইলিনীসনার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে। মাত্রাহীন ভোড্‌কা পানে মেরিয়ার মুখ বিবর্ণ, শীতকালের ঘাসপাতির মত পাংশুটে।

'এমন একটি জোড়া সংসারে কোথাও দেখবেন না আপনি। মেয়ে আমার এত কথা শোনে, যা বলবেন, না করবে না।'

—'আমিও তো পাজীটাকে হাজারবার তাই বলেছি।' বাধা দিয়ে ইলিনীসনা বললে।—'একদিন রবিবার সে বাইরে যাচ্ছিল, ডেকে বললাম—কবে তোর এই বদ-খেয়াল যাবে। এই বুড়ো বয়সে কতকাল আর আমায় এই কেলেঙ্কারী সইতে হবে? ওই স্টীফান্ একদিন তোমার ফাজলামি বার ক'রে দেবে।'

কপাট ফাঁক ক'রে মিট্‌কা এক দৃষ্টে ভেতরে চেয়ে ছিল। নেতালিয়ার ছোট বোন দুটি ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি যেন বলাবলি করছিল। নেতালিয়া তার বাবার শোবার ঘরে বসে জ্যাকেটের হাতায় চোখ মুছছে। অজানা নতুন জীবনের শঙ্কিত অনুভূতি তাকে অভিভূত ক'রে ফেলেছে।

বাইরের ঘরে ভোড্‌কার তৃতীয় বোতল শেষ হয়ে ঠিক হ'ল পয়লা আগষ্ট বর-কনের মিলন হবে।

* * *

(৫)

বিবাহের উদ্যোগ আয়োজনে করশুনভের গৃহ গুঞ্জন-মুখর হয়ে উঠল। কনের অন্তর্বাস কয়েক দিনের মধ্যেই চট্ ক'রে সেলাই করা হয়ে গেল। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে নেতালিয়া রোজ সন্ধ্যায় বসে বরের দস্তানা ও ভেড়ার লোমের রুমাল বুনত। মেরিয়া একজন ভাড়াটিয়া সীবন-নিপুনা স্ত্রীলোকের সাহায্যে সন্ধ্যে অবধি সেলাইয়ের কলের ওপর ঝুঁকে বসে থাকত। মাঠ থেকে বাবা এবং মজুরদের সঙ্গে বাড়ী এসে, হাত মুখ না ধুয়েই মিট্‌কা ছুটত' নেতালিয়ার কাছে। বোনকে ক্ষেপিয়ে মিট্‌কা বেশ আনন্দ উপভোগ করত।

—'বুনছিস্?'—রুমালখানা নাড়া চাড়া ক'রে সংক্ষেপে সে জিজ্ঞাসা করত।

—'হাঁ, কেন কি হয়েছে তাতে?'

—কেন! আরে বোকা! এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকা তো দূরের কথা, দেখবি ও তোর নাক চেপ্টে দেবে।'

—'কেন?'

—'হুঁ গ্রীগরকে আর আমি চিনিনে! বহুকাল ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব! সে ঐ রকম মেজাজেরই। কোন কিছু না বলে দেখবি হাঁ ক'রে কামড়ে দেবে।'

—'বাজে মিথ্যে কথা বলবিনি' মিট্কা! ভাবছিস্ একা তুইই চিনিস্ আমি চিনিনে'!'

রাগে নেতালিয়ার গলা বন্ধ হয়ে আসত। কোনমতে অশ্রু সম্বরণ ক'রে সে রুমালখানার ওপর আরও ঝুঁকে বসত।

—ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু কি বিশ্রী রোগ আছে ওর জানিস্—যক্ষ্মা! যক্ষ্মা! একেবারেই বোকা তুই নেতালিয়া! এখনও বলি অস্বীকার কর যদি বাঁচতে চাস। বল, এখুনি ঘোড়া চড়ে আমি তাদের বলে আসি গে।'

দাদার এই অত্যাচার থেকে সে যাত্রা ঠাকুর্দা গ্রীসাকাই তাকে বাঁচালে। লাঠি ভর ক'রে ঠুক্ঠুক্ ক'রে এসে মিটকার পেছনে খোঁচা মেরে বৃদ্ধ বলে—'এই, এখানে তুই কি চাস্?'

—'আমি নেতালিয়াকে দেখতে এসেছিলাম একবার!' সানুনয়ে অপরাধীর মত মিট্কা উত্তর দেয়।

—'দেখতে এসেছিলাম! যাও, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়, কুইক্ মার্চ্চ!'

গ্রীসাকা দাদু আজ পুরো উনসত্তরটি বছর পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৮৭৭ সালে তুর্কী অভিযানের সময়ে ইনি জেনারেল গুর্কোর আর্দালী ছিলেন। কিন্তু এ সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী। কি কারণে কর্ত্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হয়ে তাকে আবার নিজের রেজিমেণ্টে ফিরে যেতে হয়। তবু প্লেভনা এবং রোসিৎস্ অবরোধের সময়ে তার অসীম বীরত্বের জন্য তাকে দুটো ক্রশ এবং সেণ্টজর্জ্জের মেডেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা, নিষ্কলঙ্ক সাধুতা এবং আতিথেয়তা গুণে গ্রামের সকলেই গ্রীসাকাকে সম্মান করত। অতীত স্মৃতির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ক'রে, স্বচ্ছন্দে পুত্রের গৃহে বৃদ্ধ জীবনের অবশিষ্ট সংক্ষিপ্ত পরমায়ুটুকু কাটিয়ে দিচ্ছিল।

গ্রীষ্মকালে বৃদ্ধ যখন প্রাঙ্গণে চুপ ক'রে বসে ঝিমুত, পেছন থেকে নেতালিয়া এসে জিজ্ঞাসা করত—মরতে কি তোমার ভয় করে দাদু?'

—'তার অভ্যর্থনার জন্য যে আমি উৎসুক হয়ে আছি দিদি, অনেকদিন তো বাঁচলাম! সাধ কামনাও অপূরণ নেই—জারের সেবা করতে পেরেছি, প্রাণভরে ভোড্কা খাবার সুযোগও জুটেছে।' ম্লান হাসি হেসে বৃদ্ধ উত্তর করত।

দাদুকে ছেড়ে নেতালিয়া চলে যেত। তেম্নি আনত-মস্তকে বসে নীরবে বৃদ্ধ লাঠি দিয়ে মাটি খুঁড়ত।

নেতালিয়ার বিয়ের সংবাদে বাইরে কিছু না বললেও ভেতরে বৃদ্ধ রেগে আগুন হয়েছে। খাবার টেবিলে ভাল ভাল খাবার নেতালিয়া তাকেই দিত। জামা কাপড় সাফ ক'রে দেওয়া, মোজা, পাজামা, সার্ট প্রভৃতি বুনে দেওয়া, সবই তো নেতালিয়া ক'রে দেয়! কাজেই সংবাদটা যেদিন বৃদ্ধের কানে পৌছাল, তার পর থেকে দিনকয়েক বৃদ্ধ নেতালিয়ার পানে বক্রদৃষ্টিতে ছাড়া তাকায় নি।

—'মেলেকভরা বেশ নামকরা কসাক। আমি ঐ প্রোকোফীর রেজিমেণ্টেই ছিলাম। কিন্তু তার নাতিগুলো কেমন কে জানে?'

—'খুব খারাপ নয় বাবা!' মিরণ উত্তর দেয়।

—'না, ঐ গ্রীগর ছোক্‌রাটা ভাল না, মানীর মান রাখতে জানে না। সেদিন গীর্জ্জা থেকে ফিরবার সময় আমার সঙ্গে দেখা, একটা কথা পর্য্যন্ত না বলে চলে গেল। আজকাল আর বৃদ্ধদের তেমন সম্মান কেউ করে না! তা হোক গে, নেতালিয়ার যদি তাকে পছন্দ হয়...'

বৃদ্ধ এ সম্বন্ধের মধ্যে একেবারেই ছিল না। একদিন রান্নাঘর থেকে এসে টেবিলের পাশে বসল, গেলাস দুয়েক ভোড্কা শেষ ক'রে নেশা হয়েছে বুঝে, আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল। দিন দুয়েক নেতালিয়ার ভাব গতি লক্ষ্য ক'রে যখন বুঝল সত্যিই সে খুশী, তখন তাকে কাছে ডেকে বৃদ্ধ আদর করে বললে—'নেতালিয়া, তুই খুব খুশী হয়েছিস, না দিদি?'

—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না দাদা!' দাদুর কানে কানে নেতালিয়া বলে।

—'ভাল, ভাল, ভগবান তোর সহায় হউন। ভাগবান যেন তোকে……'দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পৌত্রীকে কোলের কাছে টেনে, বিষাদ-কম্পিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে—'আমি ভাবতে পারিনি দিদি, আমি বেঁচে থাকতেই তুই আমাকে ছেড়ে যাবি…তোকে ছেড়ে আমার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে দিদি!'

আড়ি পেতে মিট্‌কা সবই শুনছিল। বৃদ্ধের কথা শুনে বলে উঠল—'তুমি ত আরো একশো বছর বাঁচতে পারো, ততদিন ও বিয়ে করবে না! আচ্ছা লোক তো!'

ক্রোধে বৃদ্ধের মুখ চোখ প্রায় লাল হয়ে উঠল, হাত পা ছুঁড়ে চীৎকার ক'রে সে বলল—'দূর হ' খান্‌কির বাচ্চা! যা এখান থেকে পাজী কোথাকার! কে তোকে এসব শুনতে ডেকেছে রে?'

* * *

এসাম্পসনের দিনে গ্রীগর ভাবী বধূকে দেখতে এল। সুসজ্জিত একটি কক্ষে তাকে বসতে দেওয়া হয়েছে। সহসা মেয়ের একদল বান্ধবী এসে তাকে ঘিরে ফেললে। তাদের সঙ্গে কিছুকাল ফুল ছোঁড়াছুঁড়ি ক'রে গ্রীগর বাড়ী ফিরল।

নেতালিয়া তাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানাল। অশ্বশালায় ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। নেতালিয়া বুকের কাছ থেকে একটি পুষ্পস্তবক তুলে নিয়ে দ্বিধা-কম্পিত সলজ্জ হস্তে গ্রীগরের হাতে তুলে দিল। স্তবকটি তার দেহের স্পর্শে তখনও উষ্ণ। হেসে গ্রীগর জিজ্ঞাসা করে—'এর মানে?'

সপ্রতিভভাবে নেতালিয়া বলে—'তোমার জন্য একটা ভাল তামাক রাখবার থলি তৈরী করেছি দেখো!'

জোর ক'রে তাকে চুমু খাবার জন্য গ্রীগর টেনে ধরে। কিন্তু দুহাতে গ্রীগরের বুক ঠেলে ধরে, পেছন বেঁকে, কোনমতে নেতালিয়া আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করতে লাগল। লজ্জায় তখন তার কপোলখানি লাল হয়ে উঠেছে।

—'ওকি?'

সন্ত্রাসে জানালার পানে চোখ রেখে নেতালিয়া উত্তর করে—'ওরা দেখবে।'

—'দেখুক না।'

—'না, আমার লজ্জা করে।'

গ্রীগর ঘোড়ায় চড়বার সময় নেতালিয়া ঘোড়ার বল্গা ধরেছিল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে রেকাবে পা রেখে, একলাফে গ্রীগর ঠিক হয়ে জিনের উপর উঠে বসল। সদর খুলে দিতেই ঠকাঠক্ শব্দে গ্রীগরের ঘোড়া বালি উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল্। অপলক দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে রইল নেতালিয়া। মনে মনে হিসেব করলে—'আর মাত্র এগার দিন।' দীর্ঘশ্বাসের ফাঁক দিয়ে অলক্ষ্যে অধরপ্রান্তে হাসির রেখা ফুটে উঠল।

* *

ক্রমশঃ

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ঝিনজার মিডল-ম্যান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। বি-এ, এম-এ পাশ করলেই শিক্ষিত হয় না, ইংলিশ বললেই শিক্ষিত হয় না, বর্ত্তমানের সংগে যাঁরা পা ফেলে চলতে পারেন তাঁরাই শিক্ষিত। অবশ্য বি-এ, এম-এ পাশ করাটা মোটেই অন্যায় নয়, বরং অবশ্য কর্ত্তব্য! কিন্তু যাঁরা এম-এস-সি পাস ক'রে চন্দ্রগ্রহণের সময় গামছা কাঁধে গংগা স্নান করেন তাঁদের শিক্ষিত বলে কোন মতেই মনে হয় না। ডিগ্রি নিয়েও যদি বর্ত্তমানের চিন্তাধারাকে অবহেলা ক'রে কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকা যায়, তা হ'লে সে ডিগ্রির কোন মূল্য নেই। আমার নতুন পরিচিত ভদ্রলোক একদিকে যেমন বি-এ, অন্য দিকে তেমনি বর্ত্তমানের সংগে পা ফেলে চলেছেন। তাঁর অনুকম্পায় আমি উগানডা এবং বাগানডা নামক দুটি উপজাতির সংগে মিশবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এদের সংগে যখন কথা বলতাম তখন আমাকে বেশ সংযত হয়েই কথা বলতে হতো। এরা একের নম্বর বিদ্রোহী। বিদ্রোহের মনোবৃত্তি নিয়েই এরা জন্মেছে, আর মরছে বিদ্রোহ নিয়েই। মরণকে এরা ভয় করে না। কিন্তু আফ্রিকাতে যত জাত কোলনী করেছে তারা সবাই বিপদ-আপদে একমত হয়ে কাজ ক'রে থাকে। বেলজিয়ম কব্জা ক'রে রেখেছে কংগো। ফরাসীর অধীনে সাহারা, বৃটিশের অধীনে মধ্য এবং পূর্ব-আফ্রিকা, পর্তুগীজের অধীনে পূর্ব-আফ্রিকা, তার পর আছে অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্য। এসব রাজ্য নগণ্য, কিন্তু নিগ্রোদের উন্নতিতে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর সবাই। এক দিকে যদি বিদ্রোহ হয় আরেক দিক যদি থাকে অন্ধকারে, তা হ'লে অনেক সময়েই সেই বিদ্রোহ সার্থক হ'তে পারে না। কাউকে সামনে আগিয়ে দিয়ে পেছনে সরে পড়া আমার কাজ নয়। তাই এই সামরিক জাতের সংগে পৃথিবীর সভ্যতার কথাই বলতাম, পলিটিক্স কখনও আলোচনা করতাম না। এরা উন্নতি চায়, কিন্তু জানে না তার জন্যে কি করতে হয়। এদের মধ্যে ভগবানের প্রাধান্য এখনও আসে নি, এখনও কোন উপদেবতার আশ্রয়ও এরা নেয় নি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে ভয় থেকেই ভগবানের সৃষ্টি। কিন্তু এদের মধ্যে সে রকম ভয় কেন যে আসে নি, উপদেবতা কেন যে এরা মানে না তার একমাত্র কারণ হলো শুধু যুদ্ধ করতে করতেই এদের জীবন কেটে যেত। শুধু হালে এরা শান্তিতে আছে। বৃটিশের সংগেও এরা খুব লড়েছিল। বৃটিশের আসার পূর্বে আরবদের সংগে সর্বদাই এদের লড়াই করতে হতো। আরবদের আসার পূর্বে নাকি এরা বনে জংগলে পশু শিকার করেই দিন কাটাতো। এই ত হলো এদের অতীত ইতিহাস। কিন্তু আমি সেই ইতিহাস শুনে সন্তুষ্ট হইনি। আমাকে আরও অনেক কথা ভাবতে হতো। কিন্তু আমার নতুন মতবাদী, শিক্ষিত গুজরাতী বন্ধুটি ভগবানের ভক্ত। তিনি কোন মতেই স্বীকার করতে রাজি নন যে, ভয় থেকেই ভগবানের সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্য তিনি আমার অনেক প্রশ্নের বাগানডা (Baganda) উগানডাদের (Uganda) না জিজ্ঞাসা ক'রেই তাঁর নিজের মনগড়া উত্তর দিয়েছেন। এতে আমার জানবার অনেক কিছু বিষয়ই অপূর্ণ রয়ে গেছে।

উগানডা এবং বাগানডাদের গ্রামে অনেক পুরাতন ইমারত দেখতে পাওয়া যায়। এ সকল ইমারতের সংগে গ্রীক এবং ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় সভ্যতারও অনেক স্তর আছে। আমি যে সকল ইমারতের কথা বলছি সে সকল ইমারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় ইমারতের সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রীক স্থাপত্যের সংগে উত্তর ভারতের আদিম যুগের স্থাপত্যের কিছু সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়। আমি উত্তর ভারতে অনেক আদিম যুগের ইমারত দেখেছি। এই জন্যেই বিষয়টি আমার মনে অনেক রকম চিন্তা জাগিয়ে তুলেছিল। একই গ্রামের বিভিন্ন ইমারতে দুই দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন কি সত্যই মনকে ভাবিয়ে তোলে না? এসব মনের কথা শুধু মনের মধ্যেই রাখা ভাল, একদিন এই ধারণা আমারও ছিল, কিন্তু এখন সে ধারণা মন থেকে মুছে ফেলেছি। তাই স্বাধীন ভাবে আমার মনে যা আসে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করি না। কিন্তু একটা বিষয়ে আমি মন্তব্য করতে পারি না। সেটা হলো কি ক'রে গ্রীক এবং দ্রাবীড়ী স্থাপত্য একই স্থানে স্থান পেতে পারে। সেজন্য রিসার্চ স্কলারদের মাথা ঘামানো দরকার। আমার মত লোকের দ্বারা তা সম্ভব নয়। যদি কখনও ভারত স্বাধীন হয় এবং ভারতীয় রিসার্চ স্কলার ভারতের বাইরে গিয়ে স্বাধীন ভাবে গবেষণা করতে পারে, সেদিন বেরুবে আফ্রিকার প্রকৃত তথ্য। অর্থ-নীতির চাপে পড়ে নিকৃষ্ট প্রকৃতি পুঁজিবাদীরা পৃথিবীর ঐতিহাসিক তথ্য বের করতে দিচ্ছে না দেখে দুঃখ হয় না, রাগ হয় এবং বলতে ইচ্ছা হয় পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক। এসব কথা বলা সহজ, কিন্তু পর্যটক একদিকে বড়ই অজ্ঞ, সে জানে না কি করে এসব অসৎ নিয়ম-কানুন পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা যায়। পলিটিক্স যারা করেন, তাঁরাই এর সমাধান করবেন। উগানডা এবং বাগানডা জাতের প্রকৃত তথ্য আমার দ্বারা কিছুই জানা হলো না। যা অবগত হলাম তা অতি মামুলী এবং অতি আধুনিক।

ঝিন্‌জা প্রপাত আমার দেখা হয়েছে, উগানডা এবং বাগানডাদের সংগে আমার অনেক কথাবার্তা হয়ে গেছে, স্থানীয় লোক আমাকে চাঁদা দিয়েছে। আমার করার মত কিছুই আর ছিল না, তবুও কয়েকদিন এমন সুন্দর স্থানে বাস করতে ইচ্ছা হলো। যেখানে কোনরূপ সংক্রামক রোগ নেই, খাদ্যের অভাব নেই সেস্থান ত্যাগ করতে আমার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। ভারতের লোক শুধু জানে চর্বিত চর্বন করতে, তাই তারা আজও ঝিন্‌জার সংবাদ পায়নি, যা পেয়েছে তা বিকৃত এবং বিপথগামী।

ঝিন্‌জাতে আরও কয়েকদিন থেকে আমি কাম্‌পালার দিকে রওয়ানা হবার বন্দোবস্ত করছি, তখন সিদ্ধি কেরাণীটি আমার সংগে ৩২ মাইল পথ যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমি তার সেই ইচ্ছাতে বাদ সাধলাম না। সকাল বেলাই আমরা রওয়ানা হয়ে পড়লাম। পথে অনেক ধনীলোকের সংগে নানা কথা বলে বেলা দশটার সময় আমরা প্রকৃত High Wayতে এসে পড়লাম। প্রথম আমাদের দুপাশে আকের ক্ষেত পড়ল। তার পর এল জংগল। এদিকের জংগলে হিংস্র জন্তুর কোন ভয় নেই। আমরা বনে প্রবেশ ক'রে জংলী ওরেনজ গাছ থেকে পেড়ে খেলাম, তারপর গাছের নীচে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম।

যখন আবার রওয়ানা দিলাম তখন আসল পাহাড়ে পথ। পাহাড়ে পথে দু'দিকে ছোট ছোট প্রস্রবণ। আমরা একটা বড় প্রস্রবণের কাছে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। এখানে ফিলিম কোম্পানী এসে প্রায়ই ছবি উঠায়। যেখানে পাহাড় হ'তে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল প'ড়ে সেখানে পালা কুমীর ছেড়ে দিয়ে ছবি উঠান হয়। আমার সঙ্গী যখন এই ডোবাতে স্নান করবে বলল তখন আমি রাজি হলাম না। কি জানি ভুল ক'রে ওরা হয়ত একটা কুমীর উঠিয়ে নেয়নি, সেটা যদি জলে লুকিয়ে থাকে তবে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ? কিন্তু কতক্ষণ পরই দেখলাম, একদল নিগ্রো এখানে এসেই ঝুপ ঝাপ করে জলে নেমে গেল। তাদের সংগে আমার সঙ্গীটি কথা কয়ে জাগলেন, যখনই কোন সিনেমা কোম্পানী এখানে কুমীর ছেড়ে দেয় তখন পুলিশের সামনে তাদের এই কাজটি করতে হয়। পুলিশ কুমীরের সংখ্যা ঠিক রাখে এবং যখন উঠান হয় তখন ঠিক ঠিক উঠান হলো কি না তাও গুনে দেখে। কুমীরকে একদম ছেড়ে দেওয়া হয় না। প্রথমত লোহার জাল তাতে বিছান হয়, তারপর

কুমীর ছাড়া হয়। এই পর্যন্ত শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম এবং জলে ঝাঁপ দিতে আর ভয় হলো না। এখানের জলে গন্ধক থাকায় অনেকেই জলে অনেকক্ষণ বসে থাকে, কিন্তু আমার ভয় হলো যদি আবার শরীরের কোন অংশ ফুলে যায় তবে সমূহ বিপদ হবে। তাই জল হ'তে উঠে গা মুছে ঝরণার উৎপত্তি স্থান দেখতে গেলাম। এতে আমাদের প্রায় আড়াই ঘণ্টা কেটে গেল। তার পর যখন রওয়ানা হলাম যখন পূর্বের সূর্য পশ্চিমে চলে গিয়ে হেলে পড়েছে। আমরা অতিক্রুত সাইকেল চালিয়ে গন্তব্য স্থানে গিয়ে এক কোটিপতির বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। এই কোটিপতি জাপানে গিয়েছিলেন এবং জাপান সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখেছেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি আমাদের তাঁর বাড়ীতে দেখলেন তখনই তার মনে হলো আমাকে একটি প্রশ্ন করতে। সেই প্রশ্নটি হলো, 'আপনার পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্য কি?' আমি বুঝলাম, লোকটি জাপান গিয়েও ভারতীয় বৈষয়িক দৌর্বল্য দূর করতে পারে নি। তাই এরূপ গোমূর্খের সংগে কথা না বাড়িয়ে চলে যাবার জন্যই উঠে দাঁড়ালাম। এই কোটিপতির বাড়ীতে আসার পূর্বে একজন মামুলী দোকানী আমাদের তার বাড়ীতে থাকতে বলেছিল। কোটিপতির বাড়ীতে বেশি সুখে থাকব বলে এসেছিলাম, কিন্তু প্রকারান্তরে গলাধাক্কা খেয়েই ফিরতে হলো। এতে আমার মোটেই রাগ হয় নি। কারণ আমি ভাল করেই জানি, আমাদের গলদ কোথায় রয়েছে। এমনও শুনেছি, কংগ্রেসের নাম ক'রে, স্বদেশ স্বাধীন করার কথা বলে এই বাংলা দেশেই অনেক টাকা জমা ক'রে যখন বুঝলে জমানো টাকায় তার বাকী জীবন সুখেই কাটবে তখন কোন সে কোনরূপ দ্বিধা না ক'রে যারা তাঁকে চাঁদা উঠাতে সাহায্য করেছিল তাঁদেরই ধরিয়ে দিয়েছে। এরূপ যাদের পেছনের ঘটনা তাদেরই একজনা যদি আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় তবে দুঃখ করার কি আছে? বরং প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে-টাকার মোহে লোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সেই টাকাই যেন আর কেউ না পায় তার ব্যবস্থা করা। এর বেশি আর কি এ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে? কিন্তু ঐ যে গরীব লোকটি ডেকে আনল রাত্রে খাবার এবং থাকার জন্যে তার কথা এখনও কিছু বলা নি। সেই কথা এখন বলছি।

লোকটি যখন দেখল আমরা তাকে অবহেলা ক'রে সাইকেল ঠেলে টাকার মালিকের বাড়ী চলছি তখন সে আমাদের পেছন নেয় এবং ধনীর বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। যখন আমরা গলাধাক্কা খেয়ে বেড়িয়ে এলাম, তখন সে আবার আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানায়। আমরা দরিদ্র, আমরা চললাম দরিদ্র দোকানীর বাড়ীতেই। দরিদ্রের নিবেদন আর অগ্রাহ্য করা চললো না।

গরিব লোকটির পদবী পেটেল। গুজরাতে পেটেলরা কৃষিকর্ম করে। আফ্রিকাতে যারা এসেছে তারা বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পেটেলের একখানা খাবারের দোকান আছে। খাবারের দোকানের পাচিকা পেটেলের স্ত্রী, চাকরের কাজ করে পেটেল নিজে। আমাদের বসিয়ে পেটেল চলে গেল তার স্ত্রীর সংগে পরামর্শ করতে। পরামর্শ ক'রে যখন ফিরে এল তখন তার হাতে ছিল দু পেয়ালা চা। আমরা আগ্রহের সঙ্গে তার হাত থেকে চা নিয়ে খেতে লাগলাম। ধনী লোকটি এতই ছোট প্রকৃতির যে, সে বসতেও বলে নি. আমাদের শুষ্ক মুখ দেখে এক গ্লাস জল দেওয়ার কথাও তার মনে আসে নি। আমাদের দেশের ধনীরা আর কিছু না পারুক বৃটিশ ধনীদের কাছ হ'তে এইটুকু বেশ ক'রে শিখে নিয়েছে। কিন্তু বৃটিশ ধনীদের অন্যান্য সদ্‌গুণ তারা কোন মতেই গ্রহণ করতে রাজি নয়। ধূর্তামিতে কৃতকার্য হবার জন্য যতটুকু বিদেশী বদখেয়ালীর দরকার ততটুকুই আমাদের দেশের ধনীরা গ্রহণ করে, এর বেশী নয়!

আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেলে আমাদের একটু বিশ্রাম করতে বলেই পেটেল আবার ঘরে চলে গেল। এবার পেটেল ফিরে এসে আমাদের জানালো, স্নানের বন্দোবস্ত হয়েছে। স্নানের জন্য গরম জলের ব্যবস্থা হয়েছিল। খেতে বসে অনেক রকম সুখাদ্য অন্ন-ব্যন্জন খেয়ে রসনা যেমন তৃপ্ত হলো, উদরও তেমনি ভর্তি হলো। তার পর আসলো আবদুল্লা সিগারেট। আবদুল্লা সিগারেট ইংলণ্ডের ধনীরাই সাধারণত ব্যবহার ক'রে থাকে।

আজ আমরা গরিবের বাড়ীতে ধনীদের ব্যবহার্য স্নানাগার, খাদ্য এবং সিগারেট পেয়ে দরিদ্রবেশী ধনীর বাড়ীতেই এসেছি বলে মনে হলো।

কথাপ্রসংগে পেটেল জানালো, এখানের ধনী মহাশয় মিঃ যোশীর মত মেনেই চলেন। আমি জানতাম, গুজরাতী যোশীরা মন্দলোক হয় না, কিন্তু এই যোশী দিক্ষিত শ্রেণীর লোক। এরা ভারতের সংযুক্ত প্রদেশের উত্তর ভাগে বসবাস করে। এদের যন্ত্রণায় অনেক পাহাড়ী এখনও খৃষ্ট এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'রে দিক্ষিত তথা যোশী প্রথার হিন্দুধর্মের অক্টোপাশের কবল হ'তে মুক্তি পাচ্ছে। দিক্ষিত শ্রেণীর যোশীরা লোক ঘরে বাইরে সমান। এদের যা কিছু কাম্য তা হলো অপরের অনিষ্ট করা। অতএব আমাদের ধনী মহাশয়ের মন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা যে সুব্যবহার পাব তা কখনও সম্ভব নয়। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগুলি প্রায়ই ভীতু এবং কাপুরুষ হয়ে থাকে এবং যারই ঘাড়ে আশ্রয় করে তারই করে সর্বনাশ। কি ক'রে আমাদের উগাণ্ডা প্রসিদ্ধ Suger King এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোককে উপদেষ্টা রূপে রেখেছেন তিনিই জানেন। ধনীর নাম এবং স্থানের নাম ইচ্ছা ক'রেই গোপন রাখলাম।

রাত্রের প্রচুর আহার এবং দিনের পরিশ্রমে সুন্দর সুকোমল শয্যায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়লাম। পর দিন প্রাতে আটটায় আমাদের ঘুম ভাংলো। চটপট ক'রে পোষাক পরে দুজন দুদিকে বেড়িয়ে পড়লাম। আমি চলছিলাম কাম্পালার দিকে আর আমার সাথী ফিরে চলল ঝিন্‌জার দিকে। এখানেই চিরতরে আমাদের কয়েক দিনের বন্ধুত্ব হঠাৎ বিলুপ্ত হলো। মনে এখনও ভেসে আসে সেই সিদ্ধি যুবকের মুখখানি। [ক্রমশ:

পরিধি

(গল্প)

শ্রীশুদ্ধসত্ব বসু

একটি বড় এবং বিখ্যাত মেস। সাধারণ সকলের মেলামেশার জন্যে অর্থাৎ সারাদিনের বিরক্তিকর চাকরগিরির পর আড্ডা দেবার প্রশস্ত একটি কক্ষ সে মেসে আছে—যে কোনো কলেজের কমনরুমের কায়দায় সেটার ব্যবহার চলে। সেখানে সন্ধ্যার একটি বিরাট্ জগত রচিত হয়। পরচর্চ্চা শব্দটির প্রত্যয়গত কোনও গূঢ় অর্থ আছে কিনা জানি না, ব্যবহারগত অর্থে ওটিতে জানতাম স্ত্রীজাতির একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু এই মেসে তার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সন্ধ্যার পর এখানকার পৃথিবী রঙে রসে মসগুল হয়ে ওঠে। মহামনীষীদের কার্য্যাবলীর বিশ্লেষণ থেকে শুরু হয়, যথাক্রমে তাঁদের ভুল কি এবং সংশোধনের উপায় নির্দ্ধারণ চলে। পাঁজীপুঁথি দেখে ——— [illegible] বিচার ——— ভক্তির ওপর নির্ভর করে বহু হাস্যকর ভবিষ্যৎ গবেষণা, নিজের ভা[illegible] কোনো মহাত্মন্ ব্যক্তির নাম করে চালানো এবং সর্ব্বোপরি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ—এ দৈনন্দিন কার্য্য-তালিকা। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সম্পর্কে একটু বলবার আছে, যখন যিনি অনুপস্থিত থাকেন, "কই, আজ অমুককে দেখছি না, তার আবার হ'ল কি ?" "আরে অমুক ত ? ছ্যা ছ্যা—ওর কথা আর বলো না ভায়া"—দিয়ে তার কথা অত্যন্ত সচেতনতা এবং সাবধানতার সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মত স্বভাবত: উত্থিত হয়। এখানের প্রায় সকলেই নিজেকে বুদ্ধিমান বলে মনে করেন। তাই অসার তাস দাবা পাশা খেলে অবসরের বাজে খরচ করবার মূঢ়তা পোষণ করেন না।

যবনিকা উঠতেই দেখা গেল কক্ষখানি স্বল্পআলোকিত। ব্ল্যাক আউটের জন্যে বাতিতে টুপি লাগানো হয়েছে।

নীল একটি ডুমে বৈদ্যুতিক বাতি প্রতিফলিত হচ্ছে—তার ওপর ঘোমটা থাকায় একটি স্বচ্ছ নীল আভা দেখা গেল, মনে হয় যেন এই মাত্র ভোর হ'ল, এখনও রাত্রির পরিবেশ সম্পূর্ণ শেষ হয় নি। দেয়ালের জীর্ণ চুনবালির মধ্যে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই দেখা যাবে যেন ভুতুরে মূর্ত্তির ঝিকিমিকি। ঘরে বসে-থাকা মানুষগুলোর পায়ের কাছে তাদের স্বচ্ছ অথচ ছোট একটি করে ছায়া পড়েছে। সকলে এখন বসে না থাকলেও অনেকেই আছেন—ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি। এইমাত্র তাঁরা যথাক্রমে নিম্নোক্ত আলোচনাগুলি শেষ করেছেন: (১) হিটলারের পতনের অনিবার্য্যতা, (২) আজকাল শিক্ষার পদ্ধতির দোষাবলী এবং তার প্রতিকার, (৩) বাল্যবিবাহের উপকারিতা, (৪) চৌর্য্যবৃত্তি এবং অভাব, (৫) পৃথিবীতে কম্যুনিজমের সম্ভাবনা কতদুর, (৬) হাওড়া ব্রীজে ট্রামওয়ে লাইন সম্প্রসারণের ফলে জনগণের সুবিধা এবং অসুবিধা, (৭) মহাত্মা গান্ধীর অনশনে রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি (৮) জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বাহুল্য, (৯) জীবনধারণে বাঙালীর অসামর্থ্যতা (১০) চালের দর, (১১) পাজী-প্রণেতার জুয়াচুরি, (১২) কলিকালের আয়ু এবং চেতাবনী-কথা, (১৩) কাগজের মূল্যবৃদ্ধি এবং সংবাদপত্র থেকে আইন-আদালত শীর্ষক সংবাদ স্তম্ভ প্রকাশিত না হওয়ার জন্য বিক্ষোভ (১৪) আগামী মৌসুমী বাতাস এবং ফসল (১৫) ডিটেক্‌টিভ পুস্তকের গুণাবলী এবং সিনেমা-অভিনেত্রীর জীবন-নীতি ইত্যাদি। এইবার ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের সুরু: এবং এ সময়ই যবনিকা উঠলো।

ক। নারাণবাবুকে দেখছি না যে আজ—মাইনে পেয়েছেন কাল, ইতস্ততঃ অভিসারে বেরোলেন না—ত?

খ। কি যে বলেন দাদা,—সে বয়েস কি আর ওঁর আছে। কলঘরে হাতমুখ ধুচ্ছেন। এখনই আসবেন আসরে।

ক। আমি বলছিলাম তাঁর যে আজ এত দেরী হ'ল, সভাভঙ্গের সময় হয়ে এল, অথচ তিনি উপস্থিত হলেন না।

গ। আচ্ছা দাদা, আমাদেরই সভাকক্ষের সামনের ঘরে কে এসেছেন—তাঁর ত কোন দিন দেখা মিললো না!

ক। তুমি দার্শনিক লোক—তোমার আবার এসব কৌতূহল কেন?

গ। দেখা জানাতেই ত দার্শনিকের প্রকৃত আনন্দ। প্রতি মুহূর্ত্তের নতুন কোণ থেকে নতুন লোকের সঙ্গে দেখাশোনা হোক এই ত আমি চাই, ওই দেখার পটভূমিকায় আছে জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতা—এবং ওরই আলোয় বাহ্যিক সমস্ত বস্তু উদ্ভাসিত হয়ে ঝলমল করে ওঠে, স্পষ্ট আকার নেয়—যা থাকে ভাব, তা হয়ে ওঠে রূপ।

খ। তুই থাম্ ভাই, তোর দর্শন, তোর কবিত্ব আর এখানে চালাস নি। সারাদিন আপিসে খেটে এসে তোর দর্শন আমাদের পক্ষে বিশেষ রুচিকর ঠেকছে না।

গ। (ঈষৎ লজ্জিত হয়ে) সেই জন্যেই চুপ করে এসে আপনাদের আসরের একটি কোণে বসে থাকি, পর্য্যবেক্ষণ করি এবং অনুভূতির সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল মিলিয়ে নিয়ে নিজস্ব পৃথিবী রচনা করি। মনের সচেতনতাকে, হৃদয়ের সংবেদনাকে জীবনক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিল্প।

খ। হ্যালো শিল্পী! প্লিজ চুপ করো।

ঘ। অবশ্য আমিও ভেবেছি ওই লোকটির সম্বন্ধে। দুপুরে স্নানাহার করতে বেরোয় একবার—ঠিক পনেরো মিনিটের জন্যে; তার পর ছোট্ট একটি সুটকেশ হাতে করে কোথায় বেরিয়ে যায়—সন্ধ্যার পর ফিরে এসে দরজায় খিল আঁটে। কারো সঙ্গে আলাপ করবার স্পৃহা নেই—আমাদের এই বৈঠকে কোন দিন যোগ দিয়েছে ও—দেখেছো?

ক। সত্যিই—লোকটাকে আমার ভীষণ অদ্ভুত ঠেকছে। সি, আই, ডি, নয় তো? আমাদের এখানে রাজনীতির তুমুল আলোচনা হয়, হয় তো সে জন্যেই ব্যাটা এখানে এসে জুটেছে।

গ। এসে জুটেছে বলবেন না দাদা, বলুন এসে শিকড় গেড়েছে, সুতরাং চট করে সরানো যাবে না। যদি ভুঁই-চাঁপা ফুলের মত সৌন্দর্য্য-বিলাসীর মত বসতো এসে,—মাটির মধ্যে শিকড় না চালাতো, দমকা বাতাসের মতো

আমরাই সরিয়ে দিতে পারতাম ওঁকে ; কিন্তু উনি এখানে শিকড় গেড়েছেন !

ক। ও নিশ্চয়ই সি, আই, ডি। আমাদের ওপর চোখ রাখবার জন্যে এই মেসে এসে উঠেছে। এখানে আর পলিটিক্যাল আলোচনা কিছু করবো না আমি। বুড়ো বয়সে কি শেষে জেল খেটে মরবো ?

ঘ। আমার মনে হয় ও বিজ্‌নেস্‌ম্যান। স্যুট পরে ঘোরে, স্যুটকেশ হাতে নিয়ে বেরোয়।

খ। ইন্সিওরেন্সের দালাল ও। বিশ্বাস না হয়— ডেকে জিজ্ঞাসা করো।

চ। আমি কিন্তু একদিন আলিপুর পুলিশ কোর্টে ওকে দেখেছিলাম,—মনে হয় ও কোর্টের দালাল !

ঘ। রেসেরও হতে পারে।

ক। কিন্তু যেই হোক, লোকটি যে খুব সুবিধের—তা আমার মনে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত নারাণবাবু এলেন। বয়সে এদের সবায়ের চেয়ে বেশ প্রবীণ, প্রৌঢ়োত্তীর্ণ। চুলে পাক ধরেছে। অতি বয়সের ভারে কিছু স্থৈর্য্য এসে নারাণবাবুকে গম্ভীর করে তুলেছে। তাই যখন-তখন যে কোনো বিষয়ে তাঁর চিত্তবিক্ষেপ ঘটে না। নারাণবাবুকে 'ন' ধরা যাক।

ঘ। এই যে নারাণবাবু—আসুন। আপনার কথাই হচ্ছিল।

ন। সে ত শুনতেই পাচ্ছিলাম,—সি, আই, ডি, না রেসের দালালের কথা হচ্ছিল—না ? আমি কি তাই ?

ক। সত্যি নারাণবাবু, আমরা বড় শঙ্কিত হয়ে উঠেছি !

ন। শঙ্কিত হয়েছো কেন ? কিসের শঙ্কা ?

খ। আমাদের সামনের ঘরের ভদ্রলোকটি শুনলাম সি, আই, ডি—এই মেসের ওপর নজর রাখছেন।

গ। নানা লোক নানা ভাবের মত পোষণ করছেন। আমি কিছুই বলি নি। আমাদের এই নানা অনুভাব নিয়ে মনোদ্বন্দ্ব সুরু হোক, পরে যখন বোঝা যাবে—লোকটি কে, এবং ওর সত্যকার পরিচয় কি—তখন আমাদের সঠিক প্রজ্ঞা স্থির হবে এবং অতিরিক্ত অবাঞ্ছিত অনুভূতিগুলো পালাতে পথ পাবে না।

ঘ। শিল্পী খুসীমত বকে যাক—ওর সুবিন্যস্ত চিন্তায় ব্যাঘাত করা ভালো নয়। আপনার যে এত দেরী হ'ল আজ ?

ন। আফিস থেকে বেরিয়ে ভাবলাম—ধর্ম্মতলা পর্য্যন্ত হেঁটে যাই, প্রায়ই ওটুকু পথ হেঁটে আসি—একটা পয়সা বাঁচাই। গড়ের মাঠে এসে দাঁড়িয়ে বায়ুসেবন করছি, দেখি মাঠের এক পাশে ভীষণ ভিড় হয়েছে। একটি লোক, ইয়া লম্বা-চওড়া চেহারা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে— নানাবিধ ব্যাধির ওষুধ। এবং সব চেয়ে আমার ভালো লাগলো, লোকটির বলবার ভঙ্গিমা দেখে ; সমস্ত ব্যাধি নিরাময় হবে সে ওষুধে। এমন কি আধি—মানসিক বিকার, সমস্তই সেরে যাবে। তাই দেখছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—

ক। কেনেন নি আপনি এক প্যাকেট ওষুধ।

খ। ঢিলে প্রকৃতির সাদাসিধে লোক আপনি— আপনাকে বিক্রী করতে পারলো না ওষুধ !

ন। অমনভাবে বলো না হে তোমরা, ওষুধওয়ালা ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ শিক্ষিত, দেখলে তোমাদেরও শ্রদ্ধা হতো। তা ছাড়া নানারকম কল-কৌশল দেখালে, বললে ওষুধের প্রক্রিয়া ওসব ; আশ্চর্য্য রকমের সাফল্য আনে সব ব্যাধিতে। আমিও কিনলাম এক প্যাকেট।

ঘ। কিনেছেন তাহলে ?

ন। যখন কিছু ঠিক করে ফেলি আমি [illegible] ভালো-মন্দ বিচার করবার পরিশ্রম স্বীকার করবার সাধ্য আমার থাকে না। তাই কিনে ফেললাম ঝোঁকের মাথায় !

খ। চুপ, চুপ,—সামনের ঘরের ভদ্রলোকের দরজা ঠেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উনি যে এতক্ষণ ঘরেই ছিলেন।

ক। তাই নাকি ? আমি যে সি. আই. ডি, ফি. আই. ডি—কত কি বলেছি ; নারাণবাবু—আমাকে বাঁচান এবার।

গ। আমি জানতাম উনি ঘরের মধ্যে আছেন। বাইরের দরজায় তালা লাগানো নেই—ভিতর দিক থেকে খিল দেওয়া রয়েছে। সাধারণ বোধ থাকলেই বুঝতে পারতেন—ভদ্রলোক ভেতরেই রয়েছেন।

ঘ। তাহলে- আমরা যা-যা বলেছি ওঁর নামে—বোধ হয় সবই শুনেছেন।

খ। বোধ হয় নয় নিশ্চয়ই শুনেছেন। আর আমার মনে হয়—তারই প্রতিবাদের জন্য ভদ্রলোক বেরিয়েছেন এ সময়! অন্য কোনদিন ত' এমন সময় বেরোন না।

সকলেই অল্পবিস্তর শঙ্কিত হয়ে উঠলো। সামান্য অপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সামনে মুখ উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস নেই কেরাণীকুলের। সেই ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন—স্যুটপরা, হাতে স্যুটকেশ। অত্যন্ত শান্ত নিরীহ বলিষ্ঠ যুবক। যে শক্তিমান্ মন মুক্তির পরিপূর্ণতাকে ভোগ করতে পারে নির্জ্জনতার এবং অনুভাবের মধ্যে জীবনে নব নব দর্শনের সম্মুখীন হয়—সে ধরণের মন এই যুবকের। আর পাঁচজন কেরাণী ভদ্রলোকের থেকে তাই পৃথক। এঁকে 'য' বলা থাক।

য। নারাণবাবু আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের আসরে আমি ধূমকেতুর মত এলাম বটে, কিন্তু কোন উৎপাত করবো না, আপনারা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। এই নিন আপনার টাকাটি। আপনি যখন এই মেসে থাকেন, তখন নিশ্চয়ই আমার প্রতিবেশী আপনি। প্রতিবেশীকে ঠকাবার মত শিক্ষা এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি; অন্ততঃ এম-এ পাস করবার পরও সে মনোবৃত্তিটা এল না। সুতরাং ওষুধের প্যাকেটটা আমায় ফিরিয়ে দিন—আপনার টাকা রইলো।

ন। কিন্তু—

য। কিন্তুর কিছু নেই নারাণবাবু। মনে করুন এও এক ধরণের ম্যাজিক। যেমন দেখেছিলেন ইস্কাবনের বিবি একটা মিনিটের মধ্যে হরতনের সাহেব হয়ে গেল, তেমনি ধারা মনে করুন গড়ের মাঠে দুশো মেডেল ঝোলানো ঈষৎ বৃদ্ধ ভিষগরত্ন আপনার সামনে বলিষ্ঠ যুবকের চেহারায় এসে হাজির হয়েছে।

ন। অর্থাৎ?

য। এখনও অর্থাৎ? এই বিংশ শতাব্দীর জীর্ণ সংস্কার-রসের জারকে আমরা জরেছি। জীবনের অতিদীর্ঘ পথ পেরিয়ে সহসা দেখলাম সমস্ত সঞ্চয় ফুরিয়ে গেছে বিদ্যার্জ্জন করতেই। অথচ টিঁকে থাকবার অবলম্বন চাই—জীবন বাঁচানোর একান্ত তাগিদ—এটা বিলাস নয়, প্রয়োজন বোধ করলাম। তাই এই খোলস নিলাম, শিল্পীর ভাষায় থাকে রূপ বলে। আপনারা কলমপেশা কুলী সেজে শ্রমেই আনন্দ বোঝেন, আমি তারস্বরে নিজের বিজ্ঞাপন আউড়ে জীবন বাঁচাই। আমাদের বঞ্চিত সম্প্রদায়ের নীতি মূলতঃ এক—বেঁচে থাকার ধরণটাই আলাদা। একই পরিধিতে সঞ্চরণ করছি আমরা, কেউ আগে, কেউ পিছে। আসলে কিন্তু আমাদের কেন্দ্র এক, একই বৃত্তের মধ্যে আমরা চলাফেরা করি। তাই আপনাকে নিতান্ত আপনার জন ভেবে, নিতান্ত বন্ধু ভেবেই ওষুধের দামটা ফেরৎ দিচ্ছি—চোখের ওপর এতবড় লজ্জার ক্লেশ সহ্য করতে পারবো না বলেই!

শাদা কালো

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অসিত একটু থেমে ফের প'ড়ে চলে: "রমা রতি-লালকে বিবাহ করেছিল বুঝি লণ্ডনে। ভেবে পাই নে ওকেও বিয়ে করতে হ'ল কেন? কে বুঝবে দাদা কোন্ মরণের পথ বেয়ে নিয়ে চলেন মা আমার মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্রদীক্ষা দিতে? যাক, মন্তব্য রেখে বক্তব্যেই ফিরে আসি।

"কী ভেবে যে ও বিয়ে করেছিল প্রশ্নটা প্রথমে ও এড়িয়েই গিয়েছিল। শুধু বলেছিল বিবাহ হবার রাত্রেই ও টের পেয়েছিল কত বড় ভুল ও করেছে। তোমার সে স্বপ্ন মনে আছে দাদা? বলেছিলে আমাকে—একবার স্বপ্ন দেখেছিলে বুঝি বিলেতে যে কোন্ উর্বশীর গলায় মালা দিয়ে সে কী—বালিশ-ভেজা কান্না তোমার? ও-ও সেই কান্নাই কেঁদেছিল? কেবল হায় রে, বিয়েটা যদি ওর তোমার মতন স্বপ্ন হ'ত দাদা।

কিন্তু কর্ম করেছে ফল ফলবে না এতো হয় না। কাজেই স্বামীও ওর কাছে দাবি ক'রে বসলেন যা স্বামী মাত্রেই ক'রে থাকেন। তখন মেয়ে একেবারে বসল বেঁকে। বলল 'কৌমার্যং হি পরিত্যজ্য পদমেকং ন গচ্ছামি'—স্বামী ওকে ছুঁয়েছে কি ও বিষ খেয়ে ব'সে আছে। কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হওয়া—ওর দেহের প্রতি অণু দেয় ওকে ধিক্—বলল ও শুধু অম্লানবদনে নয় এমন বদনে যা দেখে যে কোনো বাপ ভয়ে হিমশিম খেয়ে যেতে বাধ্য।

"অবশ্য ব্যাপারটা এইখানেই চরম ব'লে স্বামী বেচারি মেনে নেন নি। প্রথমটা তিনি যা হয়েছিলেন সেটা আমাদের বর্ণমালার সতেরো হরফ—অর্থাৎ থ। কিন্তু অতঃপর তাঁর পৌরুষ উঠল রুখে। তিনি একদিন নাকি ঢুকেছিলেন নববধূর শয়ন-কক্ষে কিন্তু প্রায় ওর ছিন্নমস্তা মূর্তি দেখে 'যখন পরাজয় খলু অনিবার্য তখন কি যুদ্ধটি বুদ্ধির কার্য' মন্ত্র জপতে জপতে রণে দিলেন ভঙ্গ। এ খবর অবশ্য আমি পরে শুনেছি। আরো কিছু শুনেছি কিন্তু সে বিবাহ-কথামৃত দাদা ভবাদৃশ ব্রহ্মচারীর কর্ণস্থ না করাই ভালো। কাজেই এ অশান্তি পর্ব ছেড়ে টি-টিক্কার পর্বে আসি এবার।

"আর টিটিক্কার ব'লে টিটিক্কার দাদা! সে একেবারে স্ক্যাণ্ডালের জয়জয়কার যাকে বলে! সমাজ কর্তব্য পাতিব্রত্য দায়িত্ব বিবাহের মন্ত্র পাণ্ডা পুরুত বন্ধুবান্ধব মাসিপিসি—সবাই দাঁড়াল ঐ একরত্তি মেয়েটার বিরুদ্ধে। সে সব বলা সম্ভব নয়। শেষটা ও কথা রাখল: বিষ খেল।—বলতে ভুলেছি—ইতিমধ্যে ওরা ফিরে এসেছিল দেশে। আর বলাই বেশি মেয়েকে তাঁরা পুনরায় পাঠিয়েছিলেন ঠেলে—পাতিব্রত্য কী সটার স্বাদ পেতে।

"রমা বেঁচে গেল ঘস ঘেঁষে। তখন রূপচাঁদের চৈতন্য হ'ল। কারণ এতদিন রমা যতই কেন না কান্নাকাটি করুক ব্যাপারটা যে সত্যিই এতদূর গড়াতে পারে ও ভাবতে পারে নি। ওর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবও ওকে বুঝিয়েছিল—দুদিন সংসারের খাঁচায় বদ্ধ থাকলেই বন-হরিণী পোষ মানবে। তারপরেই ঐ বিবাহসিন্ধু মন্থনে গরলের অভ্যুত্থান।

"রূপচাঁদের চৈতন্য হ'ল বটে, কিন্তু সমাজ এমনিই যে তবু তিনি জামাতৃ বর্জ্জন করতে ভরসা পেলেন না। তাছাড়া তিনি ছাড়লেও রতিলাল ছাড়বে কেন—এও বুঝলে না? বিশেষ যখন নিষিদ্ধ ফল বেশি মধুর বলেন

না সাহেবরা? ও-ও তো সাহেব হয়েছে, সত্য যাকে বলে! তাই ভয় দেখালো আইনের।—ফলে আপোষ হ'ল তখন কার মতন—

"রূপচাঁদ জামাইকে ফের জোর ক'রে পাঠাল বিলেত—রিসার্চ করতে ডাক্তারি সায়েন্সে।

"বছর খানেক বাদে আর এক তার এল, জামাই কি এক সাংঘাতিক ডিগ্রী পেয়েছে। হ্যাঁ ফের বলতে ভুলেছি—ইতিমধ্যে রমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুণ রূপচাঁদ এই আবটাবাদ পাহাড়েই বাড়ি কিনেছিলেন—সেখানেই ওরা ছিল যখন তার এল।

"রমা ফের অধীর হ'য়ে উঠল—বলল রতিলালের সঙ্গে আর ও দেখা পর্যন্ত করবে না। রূপচাঁদ মহামুশকিলে প'ড়ে আমাকে ডেকে পাঠাল আলমোরা থেকে।

"আমি আসতেই রমা আমার কোলে লুটিয়ে প'ড়ে কেঁদে বলল: 'দাদু, আমি আর মানব না—কিছুতে না। যা হ'য়ে গেছে তার আর চারা নেই, কিন্তু সংসারের সঙ্গে আপোষ আর না। ভগবান ছাড়া আর কারুর সেবিকা হ'তে পারব না আমি। আমি চাই না—চাই না—ঘর-সংসার টাকাকড়ি ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন কিছু না। এক বাবার জন্যে দুঃখ হয়। তাঁকে খুশি করতে আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টাও করেছিলাম ভগবান্ জানেন! কিন্তু এখন বুঝেছি ভুল করেছিলাম। বুঝেছি যে ভগবানকে যে চেয়েছে তার সংসারের প্রতি—কারুর প্রতিই—কোনো কর্তব্য থাকতে পারে না।'

"এই তো ব্যাপার দাদা! ওদিকে রতিলালের অভ্যুদয় আসন্ন। এদিকে রমা বলেছে স্বামীর সে মুখদর্শন পর্যন্ত করবে না। অথচ স্বামী ভয় দেখিয়েছে রমাকে না পেলে কোর্টের সাহায্য নেবে। রূপচাঁদ দুর্ভাবনায় অসুস্থ! রমা সেজন্যেও যথেষ্ট দুঃখ পাচ্ছে—কিন্তু ওর সংকল্প থেকে আর ও নড়বে না এ নিশ্চয়। কাল সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ কথা হ'ল ওতে আমাতে। ও বলল: 'দাদু! সংসারে সবাইকে এক ছাঁচে ঢালাই করতে গেলে সুফল ফলে না। আমি স্বীকার করছি যে বাবার কথা ভেবে বিবাহ করতে গিয়ে আমি অন্যায় করেছিলাম। কিন্তু স্বামীকে তার স্বামীর অধিকার দিলে যে এ অন্যায় ন্যায় হ'য়ে যাবে একথা তো সত্যি নয়। তা ছাড়া এটা তো ঠিক ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন নয়—পারা না পারার প্রশ্ন: স্বামীর ঘর করবার কথা আমি ভাবতেও পারি না যে। আমার অন্তর বলে সংসারের সঙ্গে আপোষ করতে সে আর পারবে না—ঘর ছাড়ার ডাক তার কাছে এসে পৌঁছেছে। এ আমার রোখের কথা নয় দাদু, বড় দুঃখেই বলছি আমার এ অক্ষমতার কথা। কিন্তু কে বুঝবে বলুন?—আমি বড় দুঃখেই বুঝেছি মানুষ হাজারই ভালোবাসুক বুঝতে পারে না মানুষের ব্যথা—নইলে বাবাও কি আমাকে বুঝতে এত বেগ পেতেন? না দাদু, মানুষের একমাত্র আশ্রয় ভগবান্—আর সে আশ্রয় যে চায় মানুষের সঙ্গে কোনো ছোট রফা সে করতে পারে না। এতে যদি দোষ হয়ই তবে সে দোষ আমার নয়—তাঁর, কেন না আমার এ মতি তিনিই দিয়েছেন।' বলতে বলতে ওর চোখ জলে ভ'রে এল, বলল: 'তাই আমার নিত্য প্রার্থনা কি জানেন?

যন্ত্রস্য গুণদোষৌ হি ক্ষম্যতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মম দোষো ন বিদ্যতে॥'

"এত কথা তোমায় লিখছি কেন তা হয়ত এখন বুঝতে পেরেছ। তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করবে! তিনি ব্রহ্মবিৎ—আর উপনিষদে বলেছে ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রহ্মপদই পান। একমাত্র তিনিই রমাকে ব'লে দিতে পারবেন কী ওর করা উচিত। যদি তিনি বলেন তো ওকে নিয়ে যাব। আমি জানি অবশ্য তিনি রমাকে কখনই বলবেন না ওর স্বামীর ঘর করতে। জানি, কেননা জীবন্মুক্ত যিনি তিনি মুক্তির আলোয় দেখতে পেয়েছেন এই শাশ্বত সত্য যে, কোনো বাসনার সম্বন্ধ, কোনো মমত্ব-বোধই মুক্তিপন্থীর কাছে মঞ্জুর হ'তে পারে না। এ-ও জানি যে ঘরছাড়া বাঁশির ডাক একবার যে শুনেছে সে অন্য কোনো ছোট সুরে সাড়া দিলে তাতে ক'রে কারুরই মঙ্গল হ'তে পারে না। কিন্তু তবু আরো নিশ্চিত হবার জন্যে রমা গুরুদেবের মুখ থেকেই শুনতে চায় একথা যদিও ও-ও জানে যে গুরুদেব কখনই ওকে বলবেন না ভাগবত সত্য ছেড়ে সাংসারিক মিথ্যাকে বরণ করতে। কালই ও বলছিল ও দেখেছে তাঁকে স্বপ্নে ও

জেনেছে অন্তরে যে তাঁর চেতনার অসত্য বা অর্ধসত্য কখনো ছায়াপাতও করতে পারে না।

"আরও একটা কথা আমার মনে হয় দাদা! কেন জানি না আমার মনে হয় রমা একমাত্র গুরুদেবের চরণেই শান্তি পাবে। ও বলছিলও আমাকে কালই যে একসময়ে ওর মনে এই অভিমান এসেছিল যে ভগবানের পথে ও একলাই চলতে পারবে—কিন্তু এই বিবাহ ওর সে-অহংকারকে দিয়েছে গুঁড়িয়ে। ও বুঝতে পেরেছে আজ যে এ দুর্গম পথে ও সংসারকে তুচ্ছ করতে পারবে না যদি গুরুর আশীর্বাদ না পায়। একথা আমি জানতাম অবশ্য বরাবরই, কারণ ওর মধ্যে জ্ঞানের দৈন্ত না থাকলেও ওর আসল স্বভাবটা হ'ল ভক্তিপ্রবণ। কিন্তু হ'লে হবে কি, সংসারে স্নেহ ও অনেককে করলেও গুরু হিসেবে কাউকেই ভক্তি করতে পারে নি। তাই ওকে আমি গুরুদেবের চরণেই সঁপে দিতে চাই কারণ এখন হয়ত রূপচাঁদও আর আপত্তি করবে না। সাজা তো তারও কম হয় নি।

"কেমন একটা দুঃখ হয় দাদা থেকে থেকে: যারা সত্যি ভগবানকে চায় তারা কেন সংসারের সঙ্গে রফা করতে যায়? শ্যাম ও কূল দুই-ই যারা রাখতে চায় তারা যে শুধু শ্যামকেই হারায় তাই তো নয়—কূল হারায় যে সব আগে! কেন অকারণ সাধ ক'রে শিকল পরতে যাওয়া? শিকল যদি সোনার হয় দাদা,তাতে কি একটুও কম বাজে?

"ও প্রশ্নের জবাব নেই বলেই বোধ হয় বলেছে, শোক ক'রে কী হবে বলো, বন্ধন যে চায় সে আকাশেও গড়বে গোলকধাঁধা: যেমন মতি গতি তো তেমনই তো হবে:

কিংবদন্তীহ সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ

তোমার দাদু।

"পুনশ্চ। কাল ডাকে দেওয়া ঘটে নি কেননা ইতিমধ্যে ঘটে গেল মহাকাণ্ড।

"বলেছি বিলেত থেকে জামাই বাবাজি কয়েকদিন আগে তার করেছিলেন আসছেন বলে। কিন্তু হঠাৎ কাল বিকেলে তিনি এসে হাজির এয়ারোপ্লেনে। এমনিই আর রিসার্চ করলেন না। তাঁর মনে হ'ল—ভারতবর্ষে কী হবে বেশি রিসার্চ করে—তার চেয়ে প্র্যাক্‌টিস সুরু করাই

"রতিলালকে প্রথম দেখলাম এখানে—আবটাবাদে। সত্যের খাতিরে এ কথা আমি বলতে বাধ্য যে রতিলালকে চোখে তত খারাপ লাগে নি যত কানে শুনে লেগেছিল। অবিশ্যি বিলিতি বাঁদরামি ও শিখেছে বৈ কি বেশ চুটিয়েই যার নাম ক্যলচর। কিন্তু তবু এ আমি বলব যে লোকটা একেবারে চাষা নয়। আর কালচার্ড চাষাদের সঙ্গে ক্রমাগত মিশেও যে পুরো চাষা ব'নে যায় নি তাকে একেবারে হেনস্থা করা চলে কি?

"তবে মুস্কিল হয়েছে—ও সত্যিই রমাকে ছাড়ার কথা ভাবতে পারছে না। এ জন্যে ওকে খুব দোষ দেই না: নারীর রূপে যখন সোনার লঙ্কা পুড়ে ছাই হ'ল তখন বেচারি রতিলালের মানুষী রতিকে দূষলে হবে কী বলো? শিখামরীকে সর্বনাশী ব'লে সনাক্ত করলেই কি পতঙ্গের পার আছে? না দাদা, রতিলালকে নেকনজরে দেখতে আমি পারি নি—পারবও না কোন দিন—ওর জন্যেই যে রমার এই হাল। তবু রমা যখন ওকে বিবাহ করেছে সাধ ক'রে তখন একা ওকেই বা দুষি কেমন ক'রে বলো?

"বলতে কি, সব শুনে রাগ হ'ল আমার বেশি ঐ বুড়োটারই ওপর। কিন্তু না, মন শান্ত হও—অশান্তস্য কুতঃ সুখম? 'বুড়ো' বলো না ওটা অন্‌-পার্লামেন্টারি পরিভাষা। গড়পড়তা সন্তানবৎসল বাপ যেমন হয় ও গড়পড়তা হ'য়ে তার বেশি কিছুই বা হবে কি ক'রে? সব বুঝি দাদা, তবু রাগ হয়ই যখন ভাবি—বু—খুড়ি বৃদ্ধ রমার বিয়ে দিল জোর করে। তোমরা বাপ মা নিয়ে বড় উচ্ছ্বাস করো দাদা, বলো এমন স্নেহ আর হয় না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? যে স্নেহের মূল আশ্রয়—আসক্তিতে, তার ঢেউ শুধু বন্ধনের আবর্তই সৃষ্টি করে—মুক্তির উচ্ছল প্রবাহ না। যে লোক নিজের উচিত-অনুচিত ধারণার খাড়ায় সন্তানের সুখশান্তিকে বলি দেয় তাকে বড় জোর অজ্ঞান ব'লে কৃপা করতে পারা যায় কিন্তু 'পিতা ধর্ম পিতা সর্বঃ' বলে পূজা করা চলে কি? আর এই রকম বাপই তো পনের আনা। না দাদা, এই সূত্রে আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি যে, মুক্তি নেই মমতায়—মুক্তি শুধু জ্ঞানে। নইলে রূপচাঁদ এমন জালে নিজেকেই বা জড়াবে কেন—মেয়ে জামাইকেই বা চাইবে কেন ভোগাতে? শোনো, কী

"রতিলাল বেশ স্পষ্টবক্তা দেখলাম। দুঃখও পেয়েছে বই কি। তাই বললাম ওকে—যেটা সত্যি কথা—যে ওর ট্রাজিডিতে কষ্ট কি আর হয় না একটুও? হয়—কিন্তু উপায় কি বলো? এ আশ্বাস তো আর দেওয়া চলে না যে, যেহেতু রমা আর ও দুটো সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছে সেহেতু রমা ওর দাসী ব'নে গেছে রাতারাতি? বলে না ধ'রে বেঁধে প্রেম আর ঘ'ষে মেজে যৌবন হয় না? তাতে ও বলল: যে রমা নাকি ওর প্রতি একটু আকৃষ্টই হয়েছিল প্রথমে—যদিও বিবাহ করতে চায় নি। কিন্তু চতুর রূপচাঁদ বৃদ্ধ তো—ভাবলেন যে 'প্রেমস্য সূক্ষ্মা গতিঃ,' কাজেই আগুন আর ঘিকে ক্রমাগত কাছাকাছি রাখো—তার পর যেটা ঘটবার সেটার ভার ঐ হুঁহুঁ-ই নেবে। (কথাটা অবশ্য রতিলাল এ ভাবে বলে নি। তবে যা বলল তাকে খাঁটি বাংলায় বললে দাঁড়ায় এই-ই।)

"বৃদ্ধ একেবারে ভুলও ভাবেন নি। ঋষিদের উপমাটাও ছিল অমোঘ। কিন্তু হ'লে হবে কি, মানুষ কিন্তু সবাই একছাঁচে ঢালা নয়। তাই রমা প্রথমটায় রতিলালের দিকে ঝুঁকলেও ও একটু বাড়াবাড়ি করতে যেতেই পেছিয়ে যায়। বলে বাপকে যে না, বিয়ে নয়। সেই সময়ে বুড়ো ফের এক চাল চালল। বলল মেয়েকে আচ্ছা বিয়ে কর—ঘর করতে হবে না। রমা সরল মেয়ে বিশ্বাস করল। বুড়ো ভিতরে কিন্তু জামাইকে দিল টিপে। জামাইও শিক্ষিত ক্যালচার্ড তো, কাজেই সাগ্রহেই সম্মতি দিল, বলল রমাকে যে তাকে ও কর্মসঙ্গিনী ভাবেই চায় শয্যাসঙ্গিনী ভাবে নয়। সংসারের কিছুই জানে না যে মেয়ে সে এ কথা বিশ্বাস করবে বিচিত্র কি?

"বিয়ে হ'ল—লণ্ডনেই। হিন্দু মতেই অবশ্য। রতিলালের এতে আরও জোর হ'ল। তার পরে যা ঘটল বলেছি।

"এখন সে চায়—কি বলো তোমরা restitution of conjugal rights নাকি ঐ জাতীয় নোংরা কথা? ছি ছি, এ সব শুনলেও আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়—অথচ এতেই নাকি কালাপানি পেরুতে-না-পেরুতে সবাই বলে পৌরুষ! কোন এক বিলিতি সিনিনের কথা মনে পড়ে নাকি যে 'the more we see dogs the less we like men?'

"তখন রূপচাঁদের এল অনুতাপ। কোর্ট! ছি ছি! অতটা সভ্য সে এখনো হ'তে পারে নি তো। ডি-এস-সি তো নয়। কাজেই রতিলালকে অনেক বাপুবাছা ক'রে তোয়াজ করতে যায়। কিন্তু ও যে রমার রূপ দেখে পাগল হয়ে গেছে, বলে কি এ হেন রূপসম্পত্তি বেদখল হ'লে দখলি পেতে কোর্টে যাবেই। এখানেও বলল। আমি ওকে বোঝালাম অনেক। বললাম তুমি তো হিন্দু মতে বিয়ে করেছ, ওকে ছেড়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে করলেই পারো। কিন্তু ও শুনলে না। বলে রমার সঙ্গে এ নিয়ে একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে ছাড়বে না।

"তার পরে সংক্ষেপেই বলছি—হ'ল আর এক মজা। রূপচাঁদ এ দিকে কিন্তু জাতের বেলায় নিষ্ঠাবান হিন্দু—শালগ্রাম পূজা না ক'রে জলগ্রহণ করতেন না বিলেতেও। কাল বিকেলে এই সব কেলেঙ্কারিতে কেঁদে প্রার্থনা সুরু করলেন। হঠাৎ ওমা, একটা স্বর শুনলেন—কে বলছে জলদগম্ভীর স্বরে: 'রমাকে জোর কোরো না—ও তা হ'লে বাঁচবে না।'

"বৃদ্ধ তো তক্ষুনি আমার কাছে এসে হাজির! (একেবারে বদলে গেছে বুড়ো এই একটা দৈববাণীতে তবু তোমরা দু-পাতা ইংরেজি প'ড়ে দাদা আওড়াবে the age of miracles is past!) কেঁদে কেটে গলবস্ত্র হ'য়ে বলে কি: 'ভাই ও দায় থেকে উদ্ধার করো আমাকে—রতিলালকে কোনোমতে বোঝাও। নইলে মেয়ে আমার বাঁচবে না।' বলে সে কী কান্না—'আমি মহাপাপ করেছি' বলে। আমি কোনোমতে তো ওকে শান্ত ক'রে রতিলালকে পাঠালাম ডেকে। রতিলাল আসতেই রূপচাঁদ তার দু হাত ধরে কেঁদে বলল: 'বাবা, রমাকে ছেড়ে দাও আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি—তুমি ফের বিয়ে করো। তোমার অশান্তির জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো বাবা।... ইত্যাদি ইত্যাদি।

'পঞ্চাশের ওপর হাজার প্রত্যয় হ'তে রতিলাল একটু নরম হ'ল বই কি। কিন্তু তবু এ ও তা ব'লে প্যাঁচ কষতে থাকে আরো। শেষে যখন রূপচাঁদ পঞ্চাশকে দুই দিয়ে গুণ ক'রে অতি অপরূপ দাঁড় করালেন তখন ও বলল: আচ্ছা, রমা যদি এক বছর বিলেতে থাকে ও তার পরেও না বদলায়

তাহ'লে ও রমাকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য বিয়ে করবে। কিন্তু অন্ততঃ অর্ধেক টাকা অগ্রিম চাই—বলল অম্লান-বদনে। হবে না দাদা? সোজা ক্যালচর হয়েছে ছেলে-বেলা থেকে। তার ওপর সাংঘাতিক ডিগ্রি পেয়েছে। গোদের ওপর বিষফোড়া!

"যাহোক ও চলে গেল মোটরে হোটেলে—যখন বুড়ো পঞ্চাশ হাজার টাকার এক চেক লিখে দিলো। রফা হ'ল যে বাপই রমাকে ফের নিয়ে যাবে বিলেতে—অবশ্য রতিলাল যাবে না।

"রমা প্রথমটা রাজি হয়েছিল এ আপোষে, রতিলাল বিলেত যাবে না শুনে! কিন্তু রতিলাল বিদায় নিতে-না-নিতে মেয়ের সে কী কান্না! বিলেতে যাবে ও কেমন ক'রে? কার সঙ্গে কথা কইবে ওদেশে—যেখানে ভগবানের নাম করলেও সবাই হাসাহাসি করে—যেখানে মানুষ মানুষের ভয়ে গর্তে ঢুকে প্রাণ বাঁচায়? বিলিতি কালচারকে ও মনে করে ভালচার—স্পষ্টই বলল।

"কী করি? ফের রতিলালকে তলব করতেই হ'ল। রমার কান্না শুনে এক গাল হেসে বলল আমাকে ওর সামনেই যে ওর ধর্ম-টর্ম সবই একটা সেকেলে কুসংস্কারের কুয়াশা—বিলিতি সূর্য-বিজ্ঞানের আলোয় কেটে যাবেই যাবে—আজ না হোক দুদিন বাদে। বলেই একমুখ ক্যালচর্ড সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে বলল: 'সার, এ সব হিঁদুয়ানির ভূত নামে অজ্ঞানেরই অন্ধকারে—আর ছাড়াতে হয় বিজ্ঞানের beef গিলিয়ে।'

"তখন বললাম আমি মুচকে হেসে: 'যা বলেছ দাদা! কেবল ভূতের তবু যাহোক একটা ওঝা আছে—কিন্তু এই বিলিতি বাঁদরামির দাঁতখিঁচুনি বোধ হয় ক্রনিক স্বভাব-মুদ্রা—বিশেষ যদি বেচারা শ্বশুর দাঁত খিচুতে না পেরে পঞ্চাশ হাজারী কলার ব্যবস্থা করে সাত তাড়াতাড়ি। সংসারে মানুষ হ'য়ে জন্মাবার গোটাকতক অসুবিধেও তো আছে। নবী দস্তীর আছে বৈ কি কম্পেন্সেশন।

"'How dare you!' বলেই ও লাফিয়ে উঠল। কিন্তু মরুক গে—মানুষের বাঁদরামি দেখতে শুধু তো হাসিই পায় না দাদা, কান্না পায় যে আরো বেশি বিশেষ যদি সে আসে জামাই হ'য়ে।

"রাতে শুয়ে এই সবই ভাবছি এমন সময়ে হঠাৎ পাশের ঘরে চাপা কান্নার শব্দ! বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। থাকতে পারলাম না কোনো মতেই। গেলাম পা টিপে ধীরে ধীরে।

"আহা! সে-দৃশ্য কি কোন দিনও ভুলব দাদা? জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখে। কৃতাঞ্জলি মেয়ে প্রার্থনা করছে কেঁদে কেঁদে। সামনে ওর ইষ্টদেব—শ্বেত-পাথরের শিব।

"হঠাৎ গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল—পাষাণ চোখেও জল ভরে এল—স্পষ্ট দেখলাম পাথরের শিবের মুখে আলোর হাসি…সে কী করুণার হাসি যে দাদা—যে দেখে নি কী ক'রে বুঝবে সে?…আর শুনলাম ওর প্রার্থনা! সে তো প্রার্থনা নয়…সে যে অশ্রুর-সমুদ্র-মন্থন-ক'রে ওঠা আলোর নিধি শুধু সেই আলোতেই বুঝি দেখা যায় জীব ও শিবের আংটিবদল!

"রমা বলল:

'তুমি তো জানো সবই অন্তর্যামী! জানো—আমি চেয়েছি তোমাকে, জানো—আমি চাই নি সংসার, জানো—আমি খুঁজেছি। কিন্তু পাই নি কেন ঠাকুর? আলো তো চেয়েছিলাম তবু আঁধারের পাকে পড়তে হ'ল কেন? তোমার আকাশের বাঁশি যে একবার শুনল তাকেও পরতে হ'ল কেন এ বাসনার ফাঁসি? কেন কেউ বুঝিয়ে দিল না যে তোমাকে যে চেয়েছে তার কাছে অন্য সব চাওয়াই আত্মহত্যার সামিল? তোমাকে যে দিয়েছে মালা তার মালা অপরে চাইল কেমন ক'রে? সংসারের ডাক? সে ডাক তো পৌঁচয় নি আমার কুমারী অন্তরে। অথচ তবু কলুষ এল কোন্ ছিদ্র দিয়ে? কেন এল বাসনা কর্তব্যের ছদ্মবেশে? কেন তুমি ফিরিয়ে দিলে আমার ফুল?—কেন ঠাঁই দিলে না পায়ে? কেন কাঁটাপথে ধরলে না আলো? তুফানে ফুটল না কেন তোমার ধ্রুবদীপের দিশা ঠাকুর! তোমাকে যে চেয়েছে তুমি কি তাকে ঠাঁই না দিয়ে পারো? আমার হৃদয় বলে—পারো না। কিন্তু তবু এ-সাড়ায় ভুবন আমার ছেয়ে গেল না কেন?…আঁধারে যদি তোমার আলো না পাই, বিদেশে যদি তোমাকে স্বজন বলে না চিনি তবে কোন্ নীড়ে ফিরবে পথহারা পাখি?

সংসারের? কিন্তু সে নীড় তো আমার আপন মনে হয় নি কোনো দিনও। তবুও সে দাবি করতে পারল আমাকে কেমন ক'রে ঠাকুর? আজ ফের আমাকে যেতে হবে কোথায়? তোমাকে ছেড়ে? কেন? কার হুকুমে? তুমি আমাকে গ্রহণ করো নাথ···আমাকে দিও না যেতে···দিলে আমি আর পারব না সইতে। শুধু তুমি প্রভু···শুধু তুমি··· আর কেউ নেই আমার আপন তিন ভুবনে। সেই তোমাকে আজ আমি ডাকছি তেমনি সুরে যেমন সুরে বিন্দু ডাকে সিন্ধুকে, নিশার বেদনা ডাকে উষার চেতনাকে, নিভন্ত দীপশিখা ডাকে ধ্রুবতারাকে, আর্ত ডাকে ত্রাতাকে। রুদ্র! তবু কি আসবে না তুমি শিব হ'য়ে? নেবে না আমাকে তটবন্ধন থেকে তোমার অকূলের মোহানায়?···রক্ষা করবে না?···ব'লে সেই নিশুত রাতে কুমারী মেয়ে ডাকল আকুল কণ্ঠে:

'হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতভয়সূদন মামনাথং
সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ॥

শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ
ভস্মাঙ্গরাগ নৃকপালকলাপমাল
সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ॥

হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রমথনাথ নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ
সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ॥

বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিত বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাধিবাস
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখগহনাৎ জগদীশ রক্ষ॥

আমারি শেখানো স্তব দাদা, ওকে শিখিয়েছিলাম অমরনাথে···অথচ এমন সুরে ও গাইল এ স্তব যে সুর আশৈশব শিবপূজা ক'রেও বাজে নি কোনোদিন আমার কণ্ঠে। ভুলব না ওর সে মুখ···সত্যি চারদিকে এক অপরূপ গোলাপী আলো উঠল জেগে···স্বচক্ষে দেখলাম পাথরের শিব উঠলেন কেঁপে···তাঁর ত্রিনয়ন থেকে ঝরে পড়ল নীললোহিত রশ্মি সোজা এসে স্পর্শ করল ওর সোনার-রাঙা কপালে···দিল ওকে একটি চন্দ্রবিন্দুর টিপ পরিয়ে···কত আদরে যে!···

"ভাবছ হয়ত বুড়ো পাগল হয়ে গেছে, না? কিন্তু পাগল আমি হই নি দাদা, পাগল তারাই যারা ভাবে এসব উপকথা, যারা জানে না তিনি আছেন ব'লেই আমরা আছি, তিনি ডাকান ব'লেই আমরা ডাকি···নৈলে আমরা কি তাঁকে ডাকতে পারি দাদা? অন্নময়কোষের জীবের সাধ্য কতটুকু বলো?"

"এ আমার মুখের কথা নয় দাদা। আমি যে স্বকর্ণে শুনেছি সেদিন—বিশ্বেশ্বর নিজেই ডাকছেন নিজেকে ওর আর্তকণ্ঠের মধ্যে দিয়ে—যে-সুরে পার্থিবতার লেশও রইল না আর শুনেছি দেবদেবের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠতে অভয়বাণী:

পাশবদ্ধস্তথা জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।

সত্যি দাদা, ওই ছোট্ট মেয়েটাকে দিয়েছিলাম দীক্ষা আমি এ অভিমান রইল না আর: ও-ই দিল আমাকে দীক্ষা বুঝিয়ে দিল—কেমন সুরে ডাকতে হয় তাঁকে, বুঝিয়ে দিল বাসনায় বদ্ধ হ'য়ে যে থাকে জীবরূপে বাসনামুক্ত হ'লে সেই হয় শিব যেমন 'তুষেণ বদ্ধো ব্রীহি স্যাৎ তুষাভাবেন তণ্ডুলঃ': তুষের মধ্যে যে থাকে ধান্য তুষ মুক্ত হ'লে সে-ই হয় অন্ন।"

"আর সেই সঙ্গে এল এক আলোভরা চেতনা। বুদ্ধি দিয়ে এ-চেতনার বিস্ময়তাকে বোঝাবোই বা কেমন ক'রে আর বুঝবেই বা কে? এ যে দেখেছে সে-ই দেখেছে। যে দেখে নি সে জানে নি যা না জানলে বৃথা মানবজন্ম: যে যুগে যুগে জীবের এক বই দুই লক্ষ্য নেই···তার কণ্ঠে এক বই দুই গান নেই···চোখে এক বই দুই আলো নেই যে-আলোর যে-গানের বীজমন্ত্র হ'ল :

জীবঃ শিবঃ শিবোজীবঃ সোজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।

অথচ এ কী লীলা বলো তো দাদা, যে আমরা সবই চাই কেবল তাঁকে ছাড়া—যাঁকে বিনা আমাদের চলে না এক মুহূর্তও!

কেন?

কেউ কি জানে দাদা?

দাদু।

* * *

ক্রমশঃ

বরফাবৃত বহ্নি

শ্রীফণীন্দ্রমোহন দাস

বিস্ময় মানব-প্রকৃতির এক চিরন্তন ধর্ম। মানবের অভ্যস্ত গতানুগতিক যাত্রাপথে কত অপ্রত্যাশিত ঘটনা যে তাহার বিস্ময় সৃষ্টি করে কে তাহার খোঁজ রাখে! সমাজতান্ত্রিক রুশিয়া যেদিন ফ্যাসিষ্টবাদী জার্ম্মানীর সহিত দশ বৎসরের অনাক্রমণ চুক্তি করে সেদিন মানুষ অনেকখানি বিস্মিত হইয়াছিল। তার পর সমগ্র ইউরোপের শক্তি করায়ত্ত করিয়া হিট্‌লার যেদিন পূর্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই এই দেশটিকে আক্রমণ করেন সেদিনও জগৎবাসী কম বিস্মিত হয় নাই। কিন্তু প্রায় দুই বৎসর কাল যাবত জগতের এক শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েট রুশিয়া যে দানবীয় সংগ্রামে লিপ্ত আছে, তাহার প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা একদিকে যেমন যুদ্ধের বীভৎস রূপকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, অপরদিকে মাত্র পঁচিশ বৎসরেরও অনধিক কালের মধ্যে একটা অত্যাচারজর্জরিত, পঙ্গু, জরাজীর্ণ, অশিক্ষিত দেশ কি ভাবে আপন অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে তাহাই আজ জগৎবাসীকে অনেকখানি স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। রুশিয়ার যুদ্ধে আজও পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নাই,—জাগ্রত জনশক্তির সম্মুখে ফ্রান্সজয়ী হিটলার-বাহিনী আজ অনেকটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সমগ্র রুশিয়াকে করায়ত্ত করা অথবা তাহার নৈতিক বলের মূলোৎপাটন করা আজও জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ষ্ট্যালিনগ্রাদের অপূর্ব প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং রুশবাহিনীর বীর বিক্রমে জার্ম্মানবাহিনীকে পুনরাক্রমণ দৃষ্টে মনে করা স্বাভাবিক যে, হয়ত রুশিয়ায় জার্ম্মানীর সে আশা অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। কিন্তু এই ভয়াবহ যুদ্ধের ফলাফল যাহাই দাঁড়াক না কেন, ইহার পরিণতি ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে যে কোন যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক ভিত্তিতে গঠন করিয়া তুলিবার পক্ষে সহায়ক হউক না কেন, রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের এ পর্য্যন্ত পরিণতি যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতে রুশিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে মানব-সমাজের কতখানি কল্যাণ-সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এবং পৃথিবীর ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভাগ্যবিধাতাগণ যদি মানবের স্থায়ী কল্যাণ-চিন্তার কিছু মাত্রও ধার ধারেন তবে হয়ত সোভিয়েট গণতন্ত্রের এই গৌরবময় ইতিহাস তাহাদিগকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করিলেও করিতে পারে।

তথাপি মাত্র পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস। কিন্তু এই পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসও আলোচনা করিলে দেখা যাইবে অন্যান্য দেশের সহিত কি আকাশ-পাতাল পার্থক্যই না ছিল এই জার-শাসিত, অত্যাচারিত রুশিয়ার। মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মানী তাহার শক্তি সংহত করিয়া পৃথিবীর সমস্ত শক্তির সহিত আজ জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বৎসরের হইলেও তাহার পিছনে রহিয়া গিয়াছে শতাধিক বৎসরের সাধনা, বিস্‌মার্কের জীবনব্যাপী সাধনার সঞ্জীবনী অনুপ্রেরণা। কিন্তু রুশিয়ার অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। যখন সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলি কম বেশী শিল্পপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীর বাজারে নিজ নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সাধনের জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন জারের অত্যাচারে জর্জরিত রুশিয়ায় দেখা যায় অশিক্ষিত, শিল্পবিমুখ, অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন একদল কৃষক মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। রুশিয়াতে জারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার চেষ্টা বহুবারই করা হইয়াছে, কিন্তু শাসন-যন্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাত প্রতিবারই নির্ম্মমভাবে তাহাকে বিনষ্ট করিয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়াতে প্রথম বিপ্লবের সূত্রপাত। নিষ্ঠুর এবং বেপরোয়া হত্যা দ্বারা জার ইহাকে দমন করিতে চেষ্টা পান। নিপীড়িত, অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণের

এক বিরাট শোভাযাত্রা ২২শে জানুয়ারী তারিখে জারের প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হয় তাহাদের দুঃখকষ্টের এক আবেদন জানাইতে; নিতান্ত শান্তিপূর্ণভাবেই এ শোভাযাত্রা চালিত হইয়াছিল এবং ইহার চালক ছিলেন গীর্জার একজন পুরোহিত। আবেদনে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, জার তাহাদিগের উপর গুলি করিবার আদেশ দেন। সেই দিনই প্রায় নিরপরাধ দুই শতাধিক লোকের রক্তে শীতের তুষার রঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সমগ্র রুশিয়াতে এক আতঙ্কের ছায়াপাত হয় এবং ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট সুরু হয়। সরকারপক্ষ কিছুটা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপ্লবকে চাপা দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি নরমপন্থী নেতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ধনী কৃষক-সম্প্রদায়ও বিপ্লব বিরোধী হওয়ায় সরকারের সহিত ভিড়িয়া যায়। আস্তে আস্তে দেশের বিভিন্ন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে জার গবর্ণমেণ্ট এক ভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। শাসন-সংস্কারের নামে যে শাসন-পরিষদ (Duma) গঠন করা হয় তাহাও কমবেশী জারের নিজের লোক দ্বারাই গঠিত হয়। এইভাবে বিপ্লবের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া জার বিপ্লবের মূলোৎপাটন করিতে আরম্ভ করেন—শত সহস্র লোকের হত্যাসাধন করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। বহু নেতা সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত হন। কিন্তু এ বিপ্লব রুশিয়ার পক্ষে বৃথা হয় নাই। জনগণের মনে অসন্তোষ-বহ্নি তুষের আগুনের মত ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে থাকে। ইহাই পরবর্ত্তী যুগে রুশিয়াকে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মাঝে মাঝেই জার-তন্ত্রের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা চলে। নির্বাসিত ও দেশে বিদেশে পলায়িত অবস্থায় নেতাগণ গোপনে গোপনে কাজ করিয়া যান।

কিন্তু যদিও এ পর্য্যন্ত জারের বিরুদ্ধে দেশের জনশক্তি তেমন করিয়া মাথা তুলিতে পারে নাই এবং দেশকে বহির্জগতের জাগ্রত শিল্প-শক্তিতে সম্পূর্ণ অন্ধ রাখিয়া জার আপন আধিপত্য কায়েম করিবার প্রয়াস পান, তবুও বাহিরের শক্তির সহিত সংঘর্ষে রুশিয়ার সামরিক শক্তিহীনতা পদে পদে প্রতিপন্ন হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নবজাগ্রত জাপানের সঙ্গে রুশিয়ার পরাজয়ই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং দেখা যায়, যুদ্ধ-পূর্ব রুশিয়ার অবস্থা সংগঠনের দিক দিয়াও অতি নিম্ন স্তরের ছিল। তদুপরি জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা কুশিক্ষা ও শিল্প-বিমুখতাও ছিল দেশের অগ্রগতির পথে এক প্রবল বাধা।

গত যুদ্ধে রুশিয়ার যে ক্ষতি সাধিত হয় তাহা অবর্ণনীয়। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা চরমে উপনীত হয়। তাই জারের সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিপ্লবাগ্নি আবার চতুর্দিকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে—মহাযুদ্ধ তখনও শেষ হয় নাই। একদিকে জারের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ, অপরদিকে যুদ্ধ-দানবের হাতে নিপীড়িত জনশক্তি মরিয়া হইয়া শেষ আঘাত হানিল জারের বিরুদ্ধে, তাহাদের পুঞ্জীভূত রোষাগ্নি দগ্ধ করিল শাসক-সম্প্রদায়কে। বহু কালের শত্রু তাহাদের নিপাত হইল বটে, কিন্তু এই জাগ্রত শক্তি নিয়া ঘরে-বাহিরে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইল তাহাদিগকে আরও চারি বৎসর। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই বিপ্লবের সূত্রপাত, কিন্তু ১৯১৭-১৯২১ হইল রুশিয়ার প্রকৃত বিপ্লবের যুগ।

"The first four years after the revolution from 1917 to 1921, had been a period of fighting to preserve the Revolution from a host of enemies. It was a thrilling and dramatic period of war and revolt and civil war and starvation and death, brightened up by the crusading zeal of the masses and the heroism shown in defence of an ideal. The immediate reward was nothing, but great hopes and promises filled the people and made them bear their terrible sufferings and forget even, for a while, their empty stomachs."

যুদ্ধে রুশিয়ার বিপুল ক্ষতি হয়। যুদ্ধশেষে পরাজিত জার্ম্মানীর সহিতও তুলনায় অনেকখানি দুর্বল পটভূমিকায় রুশিয়াকে তাহার সংগঠন সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার বহুপূর্বেই নিতান্ত হীন সর্ত্তে রুশিয়াকে জার্ম্মানীর সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল। রুশিয়ার জনসাধারণের মনের গতি বুঝিয়া নেতা লেনিন যে কোন মূল্যে শান্তি ক্রয় করিতে স্বীকৃত হন, যুদ্ধশেষে যদিও জার্ম্মানীকে নিঃসন্দেহে পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল তথাপি দেখা যায় জার্ম্মান সামরিক শক্তির এক বৃহৎ অংশ অধিকৃত পররাজ্যে অবস্থিত। জার্ম্মান সামরিক

শক্তি যদিও রণক্ষেত্রে বহুলাংশে অটুট ছিল, সম্মিলিত মিত্রশক্তিবর্গের নিখুঁত ব্যবস্থার দরুণ বহির্জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া জার্মান জনসাধারণকে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ভিতরের অশান্তি তাহাদের নৈতিক বলের মূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছিল—এতেই ডাকিয়া আনিয়াছিল তাহাদের পরাজয়, অবশ্য যুদ্ধোত্তর কালে পরাজিত জার্মানীকে তাহার শক্তি সংগঠন করিতে অনেকখানি প্রতিবন্ধকতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু রুশিয়ার অবস্থা ছিল ইহার চাইতেও সাংঘাতিক। যুদ্ধে বিপুল ক্ষতি, ভিতরের প্রতিক্রিয়াপন্থীদের বাধা ও বহির্জগতের সম্মিলিত প্রতিবন্ধকতা সব কিছুর বিরুদ্ধে একযোগে তাহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল।

রুশ-বিপ্লবের আরম্ভের অব্যবহিত পরেই দেখা যায় বাহিরের সমস্ত শক্তি একযোগে রুশিয়ার বলশেভিকদের বিরুদ্ধে নিতান্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। তখনও মহাযুদ্ধ শেষ হয় নাই এবং জয়-পরাজয় অনিশ্চয়তার মাঝেই নিহিত—ফরাসী সীমান্তে যুদ্ধের বজ্রনির্ঘোষে তখনও আকাশ, বাতাস ধ্বনিত। কিন্তু রুশিয়ায় তখন সম্পূর্ণ আলাদা এক ভাব। মিত্রপক্ষ এবং জার্মানী উভয়েই স্বাধীনভাবে একই সাধারণ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত,—বলশেভিকদের উচ্ছেদসাধন। ইহার ফলে রুশ নায়কদিগকে বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার সহিতই সংগ্রাম করিতে হয়। প্রথমতঃ, একদিকে জারের শেষ সামরিক শক্তি ও রক্ষণশীল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে নূতন শাসন-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা এবং তাহাতে বাহিরের মিত্র পক্ষ ও জার্মানী উভয়ের সরাসরি সহানুভূতি ও সাহায্য, অপরদিকে রুশিয়ার সহিত বাহিরের সকল জাতির রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাকে ক্লিষ্ট করিবার ব্যবস্থা। যুদ্ধে রুশিয়া যদিও মিত্রপক্ষে ছিল, কিন্তু যুদ্ধজয়ের পরে ভার্সাই সন্ধিতে পরাজিত জার্মানীকে যেমন ডাকা হয় নাই, কেবল সন্ধির সর্ত্ত গ্রহণ করিবার জন্যই তাহাকে প্রয়োজন ছিল, রুশিয়ার কোন প্রতিনিধিও তেমনি সেখানে ছিল না। কারণ যুদ্ধের প্রারম্ভে জার-শাসিত যে রুশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিয়া মহাযুদ্ধের এক বৃহৎ গুরুভার নিজের বুকে বহন করিয়াছিল, যুদ্ধশেষে সেই রুশিয়াই সোভিয়েট গণতন্ত্র রূপে জাতিসংঘের সামাজিক পঙ্‌ক্তিতে অপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া পড়িয়াছিল। কার্যকরীভাবে মিত্রশক্তি রুশিয়ার বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে, নিম্নোদ্ধৃত অংশটি হইতে তাহা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইবে:—

"The Allies also blockaded Russia, and so effective was this that for the whole of 1919 Russia could neither buy nor sell anything abroad."

রুশ বিপ্লবের প্রথমদিকে এ সংগ্রামের প্রধান সেনাপতিরূপে আমরা পাই লেনিনকে। তার পরই ট্রট্স্কির নাম উল্লেখযোগ্য।

"Towering above all others, and exercising an unchallenged supremacy, was Lenin. To the Russian people he became like a demi-god, the symbol of hope and faith, the wise one who knew a way out of every difficulty and whom nothing ruffled or perturbed. Next to him in those days (for he is discredited in Russia now) came Trotsky, a writer and an orator, without any previous military experience, who now set about building up a great army in the midst of civil war and blockade."

রুশিয়ার যে লাল ফৌজ (Red Army) আজ জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা ট্রট্স্কির সৃষ্টি। একক ভাবে তিনি এই সৈন্যদল গঠন করেন এবং ইহাদেরই সহায়তায় সাম্যবাদের গোড়াপত্তন হয়। আর এই সৈন্যদলই জার্মানবাহিনীর বিদ্যুৎগতিতে আনিয়া দিয়াছে মন্থরতা।

যে সাম্যবাদের নীতি বিপ্লবের মধ্যে রুশিয়াতে উপ্ত হয় তাহার প্রতিক্রিয়া ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিশেষভাবে দেখা দেয়। যুদ্ধ, বহির্জগৎ হইতে একপ্রকার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থা, ফলে দুর্ভিক্ষ ও মারী দেশটিকে এক শোচনীয় অবস্থায় উপনীত করে। শস্যোৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পায়। এদিকে উৎপন্ন শস্যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করাতে কৃষকেরা যথাশক্তি শস্য উৎপাদনে বিরত হয়। এই ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ১৯২১ খৃষ্টাব্দে লেনিন তাঁহার নূতন আর্থিক ব্যবস্থার (New Economic Policy) প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থাতে সমাজতান্ত্রিক নীতির সহিত ধনতান্ত্রিক নীতির একটা সাময়িক আপোষ-রক্ষার চেষ্টা হয়। একদিকে রাষ্ট্রের অধীনে সমষ্টিগত

আর্থিক ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, অপর দিকে ব্যক্তিগত অর্থোপার্জন এবং সঞ্চয়-ব্যবস্থাকেও মানিয়া লওয়া হয়। প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল এই ব্যবস্থার রন্ধ্রপথে হয়ত দুষ্টগ্রহ আবার রুশিয়াতে দেখা দিবে এবং ক্রমে শাসন-ক্ষমতা মুষ্টিমেয় ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে যাইয়া পড়িবে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হয় নাই। এই সাময়িক ব্যবস্থা আস্তে আস্তে অপসারিত হয়, লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিনের হস্তে ধনতন্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধিত হয়।

এই নূতন আর্থিক ব্যবস্থাকে ট্রট্স্কি নিজের মনে কোন দিনই কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যতদিন লেনিন ছিলেন ততদিন তাঁহার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের নিকট ট্রট্স্কিকে এ ব্যবস্থা মানিয়াই চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মনের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই। ট্রট্স্কি আরও বিশ্বাস করিতেন যে বিপ্লব সাময়িকভাবে কাজ করিয়াই শান্ত হইয়া যাইতে পারে না এবং সমাজতন্ত্রবাদ একটি মাত্র দেশে সাফল্যের সহিত প্রবর্তনও সম্ভবপর নয়। পৃথিবীব্যাপী স্থায়ী বিপ্লবের দ্বারা সর্বদেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা বাহিরের ধন-তান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সংঘাতে একক দেশের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অপঘাত-মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। লেনিনের মৃত্যুর পর এই সমস্ত মূল বিষয়ের মত ভেদেই ষ্ট্যালিনের সহিত তাঁহার বৈষম্য বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং উভয়ের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের স্থান একই সময়ে এক দেশে স্থায়িত্ব লাভ করা অসম্ভব হইয়া পড়ায় একজনকে অপরের জন্য স্থান করিয়া সরিয়া পড়িতে হয়। বলশেভিক দলে ট্রট্স্কি ছিলেন অনেকটা নবাগত এবং একমাত্র লেনিন ব্যতিরেকে দলের অন্য কাহারও বিশ্বাস অর্জন করা তাঁহার পক্ষে খুব সহজ হইয়া উঠে নাই। এদিকে ষ্ট্যালিন ছিলেন বলশেভিক দলের পুরাতন লোক এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারীও ছিলেন তিনি। তাই শেষ পর্যন্ত দলগত শক্তিতে এবং বিশ্বাসের জোরে ষ্ট্যালিনই এই বিরাট পরীক্ষামূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কর্ণধার হইয়াছিলেন।

স্থায়ী বিপ্লবের দ্বারা পৃথিবীব্যাপী সমাজতান্ত্রিক মত-বাদের প্রবর্তন আবশ্যক, এবং বহির্জগতে যখন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সুদৃঢ়ভাবে নিজ আধিপত্য বজায় রাখিয়া এই নবপ্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছে তখন একটি মাত্র দেশে তাহার প্রবর্তন নিষ্ফল-তারই নামান্তর,—ইহাই ছিল ট্রট্স্কির বিশ্বাস। লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কিপন্থীরা রুশিয়ার সাম্যবাদের ধীর মন্থর গতি দেখিয়া আশঙ্কিত হইয়া পড়েন।

"The Trotskyists were horrified at the way things went after Lenin's death. They thought that the socialisation of the U. S. S. R. was going ahead far too slowly. They feared that Lenin's tactical and temporary concession to capitalist forces, the N. E. P. (New Economic Policy) would continue indefinitely; they thought that communism in Russia itself, with such meagre spoils of victory, would perish without help from proleterian revolution in the external world."

বাহিরের সংঘাত যে খুবই সাংঘাতিক ছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কম। কিন্তু কৃষিপ্রধান এবং মহাদেশ-সদৃশ বিরাট রুশ দেশ একক হইলেও এবং বাহিরের প্রতি-বন্ধকতা সত্ত্বেও এই নীতি এখানে সাফল্য লাভ করিবে ইহাই ছিল লেনিনের এবং ষ্ট্যালিনের বিশ্বাস। অবশ্য এ বিশ্বাস করিবার যে কারণ ছিল পরবর্তী ইতিহাস তাহা অনেকাংশে সপ্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু তবু ইহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। যাক্, সে কথা পরে দেখিব।

লেনিন দেখিয়াছিলেন রুশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। রুশিয়ার শতকরা ৯৪ জন লোক গ্রামের অধিবাসী। সহরে মাত্র বাস করে ৬ জন। এই বিরাট কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পে উন্নত করিয়া তোলাই হইল প্রথম কাজ। ব্যাপকভাবে দেশের সর্বত্র তিনি হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক প্ল্যাণ্ট স্থাপন করেন। তিনি বলেন Electricity plus Soviets equals socialism". শিল্পোন্নত দেশগুলি হইতে কৃষিকার্য্যের উপযোগী বহু আধুনিক যন্ত্রপাতি দেশে আনয়ন করা হয়। ইহাতে শিল্পের সহিত দেশের কৃষি-কার্য্যের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হয়। কিন্তু দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উপর যখন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা হস্তক্ষেপ করে তখনই তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হইয়া উঠে। বিরুদ্ধবাদী দলও এই সুযোগ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই বিপদের ছায়া লেনিনের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই সময়েই তিনি তাঁহার নূতন আর্থিক ব্যবস্থার (New

Economic Policy) প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে সাম্যবাদের মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হইলেও ভিতরের অসন্তোষ দমন করিয়া তৎকালীন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বিধান ও শক্তি সঞ্চয় এবং পরবর্তীকালে অগ্রগমনের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া স্বীকৃত হয়। উৎপাদনের স্বাধীনতা সাধারণ হস্তশিল্প, বিক্রয়-ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি প্রভৃতি এই ব্যবস্থা দ্বারা স্বীকার করা হয়। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, বৃহৎ ও মাধ্যমিক শিল্প প্রবর্তন রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিজ হস্তে গ্রহণ করে। সর্বোপরি দেশের কৃষি-ব্যবস্থাতেও রাষ্ট্রের অধীনে বড় বড় যৌথ ফার্ম গঠন করা হয়। ইহাতে যদিও আপাততঃ একটা বিপদের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা হয় তথাপি ইহাতে এক শ্রেণীর ধনী কৃষক ও গ্রাম্য শিল্পীর উদ্ভব হয়। রুশিয়ায় ইহাদিগকে বলা হয় Kulaks. ভবিষ্যতে যাহাতে ইহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে সে জন্য কঠোর হস্তে ইহাদের উপর প্রথম হইতেই নানা প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চাপান হয়। দেশের ক্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকেও ক্রমশঃ উচ্ছেদ করা হয়।

"The Kulaks had been liquidated by a more direct process. These were peasants of more than average industry or ability or wealth; the capitalist farmers, 'class enemies on the agrarian front.' In 1928, there were seven hundred and fifty thousand people officially classed as Kulaks in the Soviet Union. To-day there are none. They were rooted out like trees, packed into prison trains, dispatched to labour camps in far parts of the country, put to forced labour on building railways, digging canals."

কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সাম্যবাদের নীতিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রবর্তনই সোভিয়েট রুশিয়ার শেষ কথা নয়। এই নীতিকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি করিয়া দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্যোন্নতিকর যে পরিকল্পনা এবং দেশের শিল্প, সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া উন্নততর জীবন যাপনের যে সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়, তাহার বিস্ময়কর পরিণতি আজ মানুষের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়। ষ্ট্যালিন রাষ্ট্রের কর্ণধার হন। সোভিয়েট নেতাগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন একদিকে তাঁহাদের ঘর সামলানো যেমন দরকার, বাহিরের শত্রুদের সহিতও তাঁহাদিগকে তেমনি জয়ী হইতে হইবে। দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে মোটামুটি কায়েম করিয়াই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের সর্বোন্নতিকর পরিকল্পনা কার্য্যকরী ভাবে গ্রহণ করেন। লেনিনের প্রবর্তিত বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাকে আরও ব্যাপকতা দেওয়া হয়। সমস্ত দেশটাকে একযোগে শিল্পোন্নত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্যই ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five Year Plan) গ্রহণ। খুব সতর্কতার সহিত এই পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। প্রথমতঃ, সমগ্র দেশটাকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা জরিপ করান হয়। পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ চালু করিবার পক্ষে যে সমস্ত সম্ভাব্য বাধাবিঘ্ন আছে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত গ্রহণ করা হয় এবং প্রতিকারকল্পে তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দেশের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে কি ভাবে সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া সামঞ্জস্য বিধান করা যায় তাহাও স্থির হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সমগ্র দেশটাকে বৃহৎ শিল্পে গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হয় এবং যৌথ কৃষি-ব্যবস্থাও ইহার অন্তীভূত হয়।

কিন্তু এই প্রচেষ্টাতে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টকে দুই প্রকার বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে দেশে বড় বড় কারখানা স্থাপন করা, রেলওয়ের বিস্তার সাধন করা, খনি প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা হয়। এই সমস্ত বড় বড় কারখানাতে রেলওয়ের এঞ্জিন, লৌহ, ইস্পাত পরিবর্তী যুগের জন্য ছোট ছোট শিল্পের উপযোগী এবং কৃষি-কার্য্যাদিতে প্রয়োজনীয় কলকব্জা তৈরী করাই হইল প্রধান কাজ। সোজা কথায় ভবিষ্যতে দেশের শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহারিক দিক বিবেচনায় বৃহৎ শিল্পের গোড়া পত্তনই হইল এই পরিকল্পনার মূল কথা। কিন্তু ইহাতে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা থাকিলেও দেশের জনসাধারণের সাময়িক কষ্টের তুলনা থাকে না। কারণ আপাততঃ এই সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরী হওয়ার কালীন খাদ্য-সমস্যা ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সমস্যা খুব প্রকট হইয়া উঠে। বিদেশ হইতে বহু কলকব্জা এঞ্জিন প্রভৃতি ক্রয় করার প্রয়োজন হয়, কিন্তু তৎপরিবর্তে নিজের দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য কাঁচা মাল সেই সমস্ত

দেশে প্রেরণ করিতে হয়—ইহাতেও দেশে খাদ্যদ্রব্যাদির দিক দিয়া অপ্রাচুর্য্য দেখা দেয়। তদুপরি এই সমস্ত বৃহৎ শিল্পে যত বেশী লোক নিযুক্ত হয় দেশে খাদ্য-উৎপাদক সংখ্যা তত বেশী হ্রাস পাইতে থাকে। ফলে দেশব্যাপী অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। এই পরিকল্পনায় দ্বিতীয় প্রকারের বাধা হইল ইহার সমগ্র অংশের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া পূর্বপরিকল্পিত পথে ইহাকে ঠিকভাবে চালিত করা। সমস্ত পরিকল্পনাটি এমন ভাবে তৈরী যে, ইহার বিভিন্ন অংশ এক বৃহৎ যন্ত্রের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিভিন্ন অংশের মত। রেলওয়ের জন্য দরকার লোহার রেল, এঞ্জিন প্রভৃতি। তাহার জন্য দরকার লৌহ-উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং এই লৌহ-উৎপাদন-ব্যবস্থায় লৌহের কারখানার যেমন প্রয়োজনীয়তা, কয়লা-উৎপাদন-ব্যবস্থাও তেমনি আবশ্যক। এসব কিছুকে চালু করিবার জন্য আবশ্যক শক্তি— বিদ্যুৎ উৎপাদন। এইরূপে দেশের সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তেমনি আবার এই বৃহৎ দেশের সমস্ত প্রদেশের শিল্প-ব্যবস্থারও যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। সুতরাং সমগ্র পরিকল্পনাটির এক অংশের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমগ্র অংশকে কমবেশী প্রভাবিত করিতে বাধ্য। তাই এই পরিকল্পনার সফলতা দ্বারা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দেশটির চেহারা একদম বদলাইয়া ফেলা হইয়াছিল, জনসাধারণকে সেই জন্য যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহা অপরিসীম ও কল্পনাতীত।

কিন্তু এ পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে ছিল সোভিয়েট নেতাদের অদম্য সাহস, অসীম কর্মপ্রচেষ্টা ও ধৈর্য্য এবং সর্বোপরি তাঁহাদের অফুরন্ত আত্মবিশ্বাস, আর জন-সাধারণের অসাধারণ সহিষ্ণুতা। নেতাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নে রঙীন বর্তমান জাগ্রত শক্তি।

এদিকে সংগঠনের প্রথম দিক হইতেই দেশে সর্বত্র বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। অজ্ঞানতা জাতির অগ্রগতির পথে পদে পদে বাধা জন্মাইবে এটা বুঝিয়াই রাষ্ট্র শিক্ষা-ব্যবস্থায়ও হস্তক্ষেপ করে এবং এই দিকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ইহাকে যথেষ্ট ব্যাপক এবং উন্নত করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত থাকিলেও সর্বত্র ল্যাটিন বর্ণমালার প্রবর্তন করা হয়। ইহাতে দেশের সর্বত্র ভাষাগত বৈষম্য থাকিলেও একই বর্ণমালা সর্বত্র গৃহীত হয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে শিক্ষার পার্থক্যও যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। দেশের শিল্পের সহিত শিক্ষার যোগাযোগ রক্ষিত হওয়ায় বিজ্ঞানের কার্য্যকরী দিকটাতেই মানুষের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। অবশ্য শিক্ষার বিস্তৃতি থাকাতে দেশে সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা এবং উচ্চাঙ্গের চিন্তাশীলতারও অভাব ঘটে নাই। কিন্তু হাল্কা নাটক, নভেল রুশ জন-সাধারণকে যতটা আকৃষ্ট করে তার চাইতে অনেক বেশী আকৃষ্ট করে তাহাদিগকে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্য-সম্বলিত পুস্তকাদি। শিক্ষার দিক দিয়া দেশের নিরক্ষরতা দূর করিয়া সোভিয়েট রুশিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে বলা যায়। 'অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশ' আজ অতীতের কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। দেশের অগ্রগতির সাথে সাথে লোকের জ্ঞানতৃষ্ণা অপরিসীমরূপে বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু তবু আজ যত সহজে সোভিয়েট রুশিয়ার এ সমস্ত পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় তাহা তত সহজে সম্পন্ন হয় নাই। এজন্য রুশিয়ার জনসাধারণকে কঠিন মূল্য দিতে হইয়াছিল। ১৯২৯-১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কাল, কিন্তু উৎসাহের প্রাবল্যে এ পরিকল্পনা ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চারি বৎসরেই শেষ করা হয় এবং ১৯৩৩-এর গোড়াতেই দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বৎসরের আরম্ভেই রুশিয়াতে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষকদের হাত হইতে জমি গ্রহণ করিয়া রাষ্ট্রের অধীনে যৌথ শস্যোৎপাদন-ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। এ ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই কৃষক সম্প্রদায় সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; তাহারা ইহাতে সক্রিয় ভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাদের গৃহপালিত গবাদি পশু ও কৃষি-যন্ত্রপাতি গবর্ণমেন্ট-প্রবর্তিত যৌথ কার্য্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু তাহারা ইহা দিতে অস্বীকার করে। এ ব্যবস্থার প্রতিরোধ-কল্পে তাহারা

এক অদ্ভুত এবং আত্মঘাতী নীতির অনুসরণ করে। তাহারা তাহাদের সমস্ত গবাদি পশু নির্বিচারে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করে। যদিও এই প্রতিরোধ-ব্যবস্থা কৃষকদের মধ্যে পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী একযোগে শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ হয় নাই, তবুও একবার আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির মত ইহা দ্রুতগতি দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। রুশিয়ার প্রায় অর্দ্ধেক পশু ইহাতে বিনষ্ট করা হয়। এদিকে যে সকল কৃষক তখনও এই সমস্ত যৌথ কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার কঠোরতা দ্বারা তাহাদিগকে তাহাদের শস্যের মূল্য বাবদ যৎসামান্য মাত্র দেওয়া হইত এবং তাহারা শিল্পজাত কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিত না, অথবা তাহাদিগের নিকট যে সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হইত তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এসব কিছুর প্রতিরোধকল্পে তাহারা আর এক অদ্ভুত পন্থা অবলম্বন করে। জমিতে রীতিমত শস্য উৎপন্ন করিলেও শস্য সংগ্রহ করার সময় তাহারা কেবল নিজেদের আবশ্যক পরিমাণই মাত্র সংগ্রহ করে; বাকী শস্য জমিতেই নষ্ট হইয়া যাইতে দেওয়া হয়। তাহারা বলে—

"What was the use of slaving to produce a handsome crop, if the State simply seized it all?"

কিন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের শস্যের প্রয়োজন,—তাহা শিল্পাঞ্চলের জন্য, বড় বড় নগরের জন্য, বিদেশ হইতে কল-কব্জা আনিতে বিদেশে রপ্তানীর জন্য। রাষ্ট্রের প্রতি এই সমস্ত প্রতিরোধ কঠিন হইয়া বাজিল, কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ণধার ষ্ট্যালিন ইহাকে কঠিনতর হস্তে চূর্ণ করিয়া দিলেন। যৌথ ফার্মে উৎপাদিত শস্য শিল্পাঞ্চলে ও নগরে প্রেরণ করিলেন,—এবং সেখানে প্রয়োজনও ছিল। এদিকে কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত শস্য হইতে সরকার তাহার কর কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লইল। সরকারের নিয়োজিত লোক সংগৃহীত শস্যের বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করিয়া সরকারের প্রাপ্য কর পরিশোধের ব্যবস্থা করিল। ফলে বলিতে গেলে কৃষকের রহিল না কিছুই—উপবাস ভিন্ন তাহার আর গত্যন্তর রহিল না। দৃকপাতহীন সরকার এমনি নির্দয়ভাবে তাহাদের প্রতিরোধ-ক্ষমতার মূলোৎপাটন করিল।

"The famine broke the back of peasant resistance in the U. S. S. R. . . . . All but a small fraction of the best arable land in Russia is now organised into about two hundred and fifty thousand farms. The peasants tried to revolt. The revolt might have brought the Soviet Union down. But it collapsed on the iron will of Stalin. The peasants killed their animals, then they killed themselves."

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে দেশের চেহারার যেন আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আলাদিনের প্রদীপ-স্পর্শে রাতারাতি এক বিরাট ঐশ্বর্য্য যেন অর্গলমুক্ত হইয়া পড়ে। সরকারের প্রতি দেশের জনশক্তির বিশ্বাস ধীরে ধীরে দৃঢ়তা লাভ করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম বারকার তুলনায় লোকের কষ্টের পরিমাণ বহুলাংশে লাঘব হইয়া উন্নততর জীবন যাপনের সূত্রপাত হয়। বিদেশ হইতে বৃহৎ শিল্পজাত কলকব্জাদির আনয়ন যেমন বিশেষভাবে হ্রাস পায়, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-দ্বারা সংগঠিত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিও তেমনি জন-সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যৌথ কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানে অগ্রসর হয় এবং অন্ন-সমস্যার সার্থক সমাধানে সমর্থ হয়। সাম্যবাদ রাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হওয়ায় পরিতুষ্ট জনসাধারণ রাষ্ট্রের পিছনে এক বিরাট শক্তিরূপে দেখা দেয়, এখানে জনসাধারণের শ্রমের ফল তাহারাই ভোগ করে। মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি সাধন সমাজতান্ত্রিক নীতির শেষ পরিণতি নয়। সব কিছু করা হয় রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। আবার রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সম্পদ সংগঠন, সর্বোপরি অন্ন-বস্ত্রের মোটা প্রয়োজন মিটাইবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমষ্টিগত ভাবে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যালিন যৌথ ফার্মের কৃষকদের এক কংগ্রেসকে উদ্দেশ করিয়া বলেন:—

"Our immediate task is to make all collectivized peasants well-to-do. Yes, comrades, well-to-do. . . . . Sometimes people say: if there is socialism why should we still work? We worked before; we work now. Isn't it time we quite working? . . . . No, socialism is built on labour. . . . . Socialism demands that all men work honestly, not for others, not for the rich, not for the exploiters, but for themselves, for society."

এ যুগের ইতিহাসে রুশিয়ার বৈদেশিক নীতি একটি

মাত্র কথায় প্রকাশ করা যায়—'শান্তি'। ইহা হইতেই বুঝা যায় রুশিয়া কতটা মনে-প্রাণে তাহার দেশ সংগঠন করিতে আরম্ভ করে। বাহিরের শক্তির সহিত তাহার কোন সংঘাত সে আকাঙ্ক্ষা করে নাই। সে বুঝিয়াছিল প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিলে বহিঃশত্রুর আশঙ্কা সে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে। প্রকৃতির যে অফুরন্ত সম্পদ তাহার বরফাচ্ছন্ন দেশের বুকে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। তাহার পাহাড়-পর্বতের কারাগারে ঐশ্বর্য্যের যে বন্দী দেবতা মুক্তি প্রতীক্ষায় রহিয়াছে, প্রকৃতির দম্ভ চূর্ণ করিয়া তাহাদের মুক্তি প্রয়োজন। আর সর্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশবাসীর বুকে যে শক্তি সুপ্তির আবেশে পড়িয়া আছে তাহার নব জাগরণ। সেইজন্যই সে সর্বপ্রকারে এড়াইয়া চলিয়াছে বাহিরের সহিত সংঘাত। নেতা ষ্ট্যালিন বলেন :—

"Our foreign policy is clear. It is a policy of preserving peace and strengthening commercial relations with all countries. The U. S. S. R. does not think of threatening anybody—let alone of attacking anybody. We stand for peace and champion the cause of peace. But we are not afraid of threats and are prepared to answer blow for blow against the instigators of war. Those who try to attack our country will receive a stunning rebuff to teach them not to poke their pig's snout into our Soviet garden."

বিপ্লবের প্রথমদিকে পৃথিবীর বড় বড় শক্তি তাহাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিলেও তাহার জাগ্রত শক্তির সহিত সকলকেই শেষ পর্য্যন্ত হাত মিলাইতে হইয়াছে,—বিশেষ ভাবে নিজেদেরই স্বার্থের খাতিরে। কারণ রুশিয়ার সংগঠনের যুগে পৃথিবীর বাজারে সে ছিল বৈদেশিক শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতা এবং ইহার মূল্যবাবদ সে দিয়াছে আপনার খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য কাঁচা মাল—যাহা এই সমস্ত দেশগুলির ছিল একান্ত প্রয়োজন। গরজ বড় বালাই। সর্বশেষ ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লয়।

যদিও সর্বপ্রকারে রুশ নেতাগণ বাহিরের শক্তির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত রাজনৈতিক মতানৈক্য ইহাকে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ইউরোপের যুদ্ধ-পূর্ব রাজনীতি জাগ্রত রুশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া এক আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই আবর্তের গ্রাস হইতে রুশিয়ার আত্মরক্ষার চেষ্টা বিশেষ ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপের আকাশে যখন ভাবী যুদ্ধের কাল মেঘ ঘনাইয়া উঠে তখনও রুশ নেতাগণ ফ্যাসিষ্টবাদী জার্মানীর সহিত মিত্রতা করিয়া শান্তির শেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। অবশ্য রুশিয়া তার জন্য প্রস্তুত ছিল সম্পূর্ণই। কেহ কেহ মনে করেন—

"If Russia were allowed another five years to develop herself at the rate she had shown since 1929, no combination of powers in the world could have defeated her. It was an appreciation of this knowledge which perhaps led to the precipitation of the Russo-German conflict."

হয়ত ইহাই সত্য। ট্রট্‌স্কি বিশ্বাস করিতেন বাহিরের পৃথিবীতে যখন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম, তখন একক দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি টিকিয়া থাকিতে পারে না। তাই আজ কে বলিবে এ সংগ্রাম সোভিয়েট রুশিয়ার কোন্ পরিণতি আনিয়া দিবে—পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমরের এই দুর্যোগ রাত্রির অবসানে নূতন প্রভাতে মাতা বসুন্ধরা তাঁর সর্বহারা সন্তানের জন্য কোন্ কল্যাণ-ধারা বহন করিয়া আনিবেন।

আহ্বান

(গল্প)

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

—'নগেন আজও ত এল না, হঠাৎ তার অসুখ-বিসুখ হ'ল না ত ?'

—'কেন এত মিছে ভাবছ মা ? দাদা ছুটিই হয়ত পায়নি, তাই আজ আসতে পারল না।'

—'ভাবনা আপনি আসে নরেন, কাল আসবার কথা লিখেছিল, কিন্তু আজ এখনো সে এলো না। ভাবনায় কাল রাত্রে একটুও ঘুম হয়নি, আর আজ সারাদিন যে দুর্যোগ চলেছে তাতে ভাবনা আরো বেড়েই যাচ্ছে, কিছুতেই মনে ভরসা পাচ্ছি না।'

—'মা, তুমি ভেব না, দাদা আজ যদি না আসে ত ভালই, এলে এই ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে আর দুর্যোগে খুব বিপদে পড়বে।'

—'আমি ত সেই কথাই ভাবছি নরেন! ভগবান্ করুন আজ যেন সে না আসে।'

নগেন কলিকাতায় কোন মুদীর দোকানে কাজ করে; তাহার সম্বন্ধেই মাতাপুত্রের মধ্যে কথা হইতেছিল। মাতার অশান্ত মনকে সান্ত্বনা দিবার মত কোন উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না, সুতরাং নরেন চুপ করিয়া রহিল। সারাদিনের পরিশ্রমে তাহার চোখ বুজিয়া আসিতেছিল; সে শুইয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্রিত হইল।

যশোদা কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাহার অশান্ত মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। এদিকে রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, ঝড়বৃষ্টির অশান্ত তাণ্ডব ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে মড়্‌মড় শব্দ করিয়া বড় বড় গাছ এবং ডালপালা ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। ঝড়ের একটা ভীষণ ঝাপ্‌টা আসিয়া ঘরের দেওয়াল ও চালটাকে তীব্রভাবে কাঁপাইয়া দিল। উঠানের দরজায় কে যেন কয়েকবার ধাক্কা দিল; যশোদা সেদিকে কান খাড়া করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল নগেন হয়ত ডাকিতেছে। আবার কয়েকবার দরজাটা নড়িয়া উঠিল; সে আর উৎকণ্ঠা চাপিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, 'কে ? নগেন এলি ?' বাহির হইতে কোন উত্তর আসিল না।

সে আবার ডাকিল, 'কে নগেন বুঝি ?'…নিদ্রিত পুত্রের উদ্দেশে বলিল, 'নরেন! ও নরেন!…ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?…একবার ওঠ না!'

এবারেও বাহির হইতে এবং নরেনের নিকট হইতেও কোন সাড়া আসিল না। কেবল ঝড়ের সঙ্গে একটা বিকট হু-হু শব্দ ক্রমাগত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। যশোদা বুঝিল যে ঝড়ে দরজা নড়িতেছে; সে আর কোনমতেই স্থির থাকিতে না পারিয়া ডাকিল, 'নরেন, ও নরেন…উঠে পড়।' কোন সাড়া না পাইয়া সে বুঝিল যে নরেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে নরেনের শয্যার কাছে গিয়া তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে আবার ডাকিল, নরেন, আর ঘুমোসনি বাবা,…উঠে পড় শীগ্‌গির।'

এবার নরেন 'উঃ' করিয়া একটা অস্ফুট শব্দ করিল মাত্র, কিন্তু উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

—'নরেন শুনচিস্! আর শুয়ে থাকিস ..., উঠে পড়।'

অগত্যা নরেন উঠিয়া বসিল, তার পর বলিল, 'কেন ডাকছিলে ? কি হয়েছে ?'

যশোদা বলিল, 'শুনতে পাচ্ছিস না দূর থেকে কিসের একটা আওয়াজ আসছে ? বোধ হয় বান আসছে।'

নরেন বলিল, 'তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা ? ও বান আসার শব্দ নয়, ঝড় আরো জোরে উঠছে।'

—'না, নরেন না, তুই ঠিক বুঝতে পারচিস্ না, ও শুধু ঝড়ের শব্দ নয়, বান আসছে,…নিশ্চয়ই বান আসছে।'

—'তুমি ঠিক বলেছ মা, বোধ হয় বানই আসছে, কিন্তু এখন উপায় কি মা?'

—'উপায়?…চল্ আমরা বরং বাইরে যাই, ভেতরে থাকলে ঘর চাপা পড়ে মরতে হবে।'

—'কিন্তু মা, বাইরে কি ঘরের চেয়ে বিপদ কম মনে কর?'

—'তা হোক্, বাইরেই চল্, গাঁয়ের সব লোকই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। আর বেশী সময় নেই… বোধ হয় বান খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। তুই তাড়াতাড়ি করে গরু কটার গলার দড়ি খুলে দিয়ে আয়, যেদিকে ইচ্ছে ওরা চলে যাক, আমি ততক্ষণ দু-একটা জিনিষ গুছিয়ে নিই।'

নরেন বলিল, 'তা দিচ্ছি, কিন্তু তুমি আর দেরী ক'রো না…আমি এখুনি আসছি। জমিদার-বাড়ীর দালানে গিয়ে আজকের রাতটা কোন রকমে কাটাতে হবে।'

যশোদা বলিল, 'এই ঝড়বিষ্টি মাথায় ক'রে, এই রাত্তিরে অত দূরে আমি যাব কি ক'রে?…আমি যেতে পারব না, তুই বরং যাস।'

'আচ্ছা আমি থাকতে তোমাকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। যেমন করেই হোক তোমাকে নিয়ে যেতে পারব।'—এই বলিয়া তাহার মাকে আর কথা কহিবার অবসর না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গোয়ালে ঢুকিয়া নরেন গরুগুলির দড়ি একে একে খুলিয়া দিল। একটি গরু নীরবে তাহার গা চাটিতে লাগিল—কি যেন তাহাকে বলিতে চায়! নরেন তাহার অব্যক্ত ভাষা হয়ত বুঝিতে পারিল; একবার ভাবিল মৃত্যু যে আসন্নপ্রায় তাহা এই মূক প্রাণীও বুঝিয়াছে। গরুগুলির চিন্তায় সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। এমন সময় ঝড়ের দাপটে প্রাচীন আমগাছটি সশব্দে উঠানের উপরে ভাঙিয়া পড়িল। যশোদা দাওয়া হইতে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'নরেন! নরেন, কোথায় তুই?'

নরেনের চমক ভাঙিয়া গেল, সে ছুটিয়া দাওয়ায় আসিয়া বলিল,'এই যে মা আমি! আর দেরী নয়…চল।'

তার পর নরেন জোর করিয়া তাহার মাকে একেবারে তাহার কাঁধের উপরে তুলিয়া লইল এবং জমিদার-বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পথে যশোদা আপত্তি করিয়া বলিল, 'ওরে পাগল! আমাকে এমন ক'রে নিয়ে যেতে হবে না—তোর কষ্ট হবে আর আমারও কষ্ট হবে আমাকে নামিয়ে দে আমি হেঁটেই যেতে পারব।'

নরেন তাহার উত্তরে বলিল, 'আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না মা, আর তাড়াতাড়ি যেতে তুমি পারবে না।'

—'কিন্তু কিছুই যে সঙ্গে নিতে পারলুম না বাবা।'

—'সঙ্গে নেবার মত কি-ই বা ছিল মা? দুঃখ, দৈন্য সে ঠিক আমাদের সঙ্গেই আছে। কিন্তু তুমি এখন চুপ কর মা।'

এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে নরেন জমিদার-বাড়ী যাওয়া যত সহজ ভাবিয়াছিল পথ চলিতে চলিতে বুঝিতে পারিল তাহা তত সহজ নহে।

প্রমত্ত বেগে ঝড় প্রবাহিত হইতেছে; গাঢ় মসীকৃষ্ণ অন্ধকার দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে; দূরের বৃক্ষরাজির শিরোমালা জমাট অন্ধকারে এক-একটা স্তূপের মত দাঁড়াইয়া আছে, তাহার ফাঁকে ফাঁকে সঙ্কীর্ণ পথের রেখা অস্পষ্টভাবে অনুমিত হইতেছে; কিন্তু পথ চেনা হইলেও পথ চলা তাহার পক্ষে ক্রমশঃই কঠিন বোধ হইতে লাগিল। বৃষ্টিতে পথ কর্দ্দমাক্ত ও পিছল হইয়াছে, পথের উপরে বড় বড় গাছ এবং ডালপালা ভাঙিয়া পড়িয়া স্থানে স্থানে পথ রোধ করিয়াছে; কিন্তু নরেনের কোন ভ্রূক্ষেপ নাই; সে চলিয়াছে তো চলিয়াছে—এই পথের যেন আর শেষ নাই। তাহার পা দু'টা যেন ভাঙিয়া আসিতে লাগিল, তবুও সে টানিয়া টানিয়া কোন মতে জোরে চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ওদিকে ঝড়বৃষ্টির প্রলয় নৃত্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ফেনিল জলরাশি গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করিয়া বিপুল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে; ভয়ার্ত্ত মানব এবং পশুর বিকট আর্ত্তনাদ ও কোলাহল দিগন্ত মুখর করিয়া তুলিয়াছে; প্রচণ্ড ঝড় ও জলোচ্ছাসের গর্জ্জন নরেনের প্রাণে এক অজানা ভীতির সঞ্চার করিল, কিন্তু সে নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিল। আরও খানিকটা গিয়া তাহারা জমিদার বাড়ীর দালানে উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া

নরেনের সকল আশা নিভিয়া গেল; ইতিমধ্যেই সেখানে শত শত বিপন্ন নরনারী ও শিশু সমবেত হইয়াছে—তিল ধারণের মত স্থান সেখানে আর নাই। সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সোজা সাহাদের ভাঙা বাড়ীর অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিল, ভাবিল হয় ত সেখানে আশ্রয় মিলিতে পারে। এবার যশোদা বলিল, 'নরেন, কথা শোন,...আর কোথাও গিয়ে লাভ নেই। আমাকে এখানেই নামিয়ে দে বাবা।' নরেন সে কথার উত্তর না দিয়া তেমন ভাবেই ছুটিতে লাগিল। অবশেষে সে সাহাদের ভাঙ্গা বাড়ীর দালানে উপস্থিত হইল। এখানেও ইতিমধ্যে অনেক লোক জড় হইয়াছে। নরেন এইখানেই কোনমতে একটু স্থান করিয়া লইয়া তাহার মাকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দিল। তারপর সে তাহার অবসন্ন দেহটাকে একটা ভাঙ্গা থামের গায়ে এলাইয়া দিল—তখন তাহার আর কোন কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। যশোদাও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, একটা সান্ত্বনার বাক্যও তাহাকে শুনাইতে পারিল না।

প্লাবন গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; বন্যার জল হু-হু শব্দে নিজের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া তাহাদের গ্রাস করিতে প্রবলবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে ভীষণ জলোচ্ছ্বাস এই গ্রামটিকেও চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ধীরে ধীরে এই বেষ্টনী ছোট হইয়া আসিতে লাগিল। অবিরাম প্রচণ্ড ঝড়ে তরঙ্গমালা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল এবং সাহাদের বাড়ীর ভিৎ যেন কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। একটা প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস আসিয়া সশব্দে দালানের একাংশ ভাঙ্গিয়া দিল। অসহায় নরনারীর মুখ দিয়া কেবল একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইল। প্রকৃতির এই ভয়াবহ তাণ্ডব-লীলা এবং আসন্ন মৃত্যুভয় তাহাদের পাগল করিয়া তুলিল। কেহ কেহ জ্ঞান হারাইল; 'ভগবান বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও!' আর্ত্তনাদে ও ক্রন্দনে সেখানকার আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আসন্ন মৃত্যুভয়ে এই দুইজন একটুও বিচলিত হইল না; মাতা পুত্র তেমনি নীরবেই বসিয়া রহিল। নরেনের মাথা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া যশোদা বার বার তাহার দিকে তাকাইতে লাগিল। নরেনও দুই হাত দিয়া তাহার মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল। যশোদার চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু নরেনের মুখের উপর ঝরিয়া পড়িল। নরেন আস্তে আস্তে বলিল, 'মা, তুমি কাঁদছ?'

যশোদা চুপ করিয়া রহিল ও সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন আবার বলিল, 'আজ কিসের দুঃখ মা, মরণের? পৃথিবীতে যা সবচেয়ে বড় সত্যি, সেই মরণ আজ আমাদের ডাক দিয়েছে, আমাদের যে হাসিমুখে সাড়া দিতে হবে মা?'

যশোদা সংযত কণ্ঠে কহিল, 'মরণের জন্যে একটুও দুঃখ নেই, কিন্তু নগেনের সঙ্গে যে আর দেখা হ'ল না বাবা।'

নরেন স্মিতমুখে বলিল, 'সে জন্যে দুঃখ ক'রো না মা, ভগবান হয়ত কোন মহৎ কাজের জন্যেই দাদাকে আজ আমাদের কাছ থেকে দূরে রেখেছেন।...তুমি এখান থেকে দাদাকে তোমার শেষ আশীর্ব্বাদ জানাও মা।'

যশোদা বোধ হয় একবার নীরবে নগেনকে তাহার শেষ আশীর্ব্বাদ জানাইল। বিরাট জলোচ্ছ্বাস ভীষণভাবে গর্জ্জন করিতে করিতে সাহাদের দালানের উপর আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। অসহায় নরনারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের সুর আরও তীব্র হইয়া উঠিল। অবশেষে আর একটি বিরাট জলোচ্ছ্বাস আসিয়া সকলকেই গ্রাস করিল। প্রবল জলস্রোতে সকলেই কোথায় ভাসিয়া গেল। তাহাদের আর্ত্তনাদ আর ক্রন্দন চিরদিনের মত বিলীন হইয়া গেল।

* * *

ছয়দিন পরে কলিকাতায় নগেন লোকপরম্পরায় শুনিল যে গত মহাসপ্তমীর রাত্রির প্রলয়ঙ্কর বাত্যা ও বন্যায় সমগ্র মেদিনীপুর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র নরনারী ও গবাদি পশুর প্রাণহানি হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাহার অন্তর একবার কাঁপিয়া উঠিল। আজ ছয়দিন হইল কিন্তু সে ত এখনও তাহার মা ও ভাইয়ের কোন চিঠিপত্র, কোন খবরই পায় নাই। ভাবিল তবে কি তাহারা আর জীবিত নাই?

নগেন সেই দিনই ছুটি লইয়া তাহার মা যশোদা ও ভাই

নরেনের সংবাদ জানিবার জন্ম অনেক দিন পরে আবার তাহার গ্রামের ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এই ফিরিয়া আসার মধ্যে তাহার মনের কোণে একটুও আনন্দ নাই, আছে শুধু এক অজানা উদ্বেগ ও আশঙ্কা। গ্রামের বাহিরেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাহার শঙ্কা বাড়িয়া গেল। সহস্র সহস্র গৃহহীন, বস্ত্রহীন ও বুভুক্ষিত নর-নারীর অসহায় শীর্ণ মুখ প্রথমেই তাহার চোখে পড়িল। সকলের ক্ষুধার্ত্ত মুখে কাতর মিনতি ও অব্যক্ত বেদনার ভাব পরিস্ফুট। ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে; কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য এ পর্য্যন্ত আসে নাই।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা ও জলোচ্ছ্বাসে দেশের এমন ভয়াবহ মূর্ত্তি হইয়াছে যে নিজের গ্রামকে পর্য্যন্ত চিনিবার কোন উপায় নাই। সমুখের ধানের ক্ষেতটাকে এক সীমাহীন নিস্তব্ধ প্রান্তর বলিয়া মনে হইতেছে; ঝড়ের দাপটে ধানের চারাগুলি মাটির সহিত একেবারে মিশিয়া গিয়াছে।

দূরে তালবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামখানির ছোট ছোট গৃহ-গুলিকে যেন একটা ছবির মত দেখাইত, কিন্তু একরাত্রির ঝড়েই তাহা কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। দিক্-চক্রবালে যে প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণী জটলা করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার অনেকাংশ ফাঁকা হইয়া গিয়াছে। ঊর্দ্ধাকাশে কতকগুলি শকুনি চক্রাকারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। মাঠের বুক চিরিয়া সর্পিল পথটি অদূরে মিশিয়া গিয়াছে।

একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিয়াছে। যেদিকে দৃষ্টি পড়ে, সেইদিকেই কেবল অগণিত নরনারী, শিশু এবং গৃহপালিত পশুর গলিত শব পড়িয়া আছে আর শকুনির দল নির্ভয়ে মহা উল্লাসের সহিত মৃতদেহের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও কোথাও অনেকগুলি মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এই বীভৎস ও ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া নগেনের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল এবং ক্ষণে ক্ষণে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ধূসর মাঠের উপর দিয়া সে হাঁটিয়া চলিয়াছে। সমস্ত কুটিরগুলি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে; অনেক পাকাবাড়ীও ধ্বসিয়া গিয়াছে—তাহাদের ধ্বংসাবশেষ যেন অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। যাহাদের ভাঙাবাড়ীটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে; সেই ধ্বংস-স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি মৃতদেহ আটকাইয়া রহিয়াছে। সে আর সেদিকে চাহিতে পারিল না।

ঘূর্ণিকাবর্ত্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসমূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে; কয়েকটি তালগাছের মাথা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহাদের কাণ্ডগুলি মহাপ্রলয়ের স্মৃতি-স্তম্ভের মত আকাশের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নগেন চলিতে লাগিল। সন্ধ্যাদীপের মিটমিটে আলো চোখে পড়ে না, শঙ্খধ্বনিও কানে আসে না; রাখাল-বালকের বাঁশীর সুরও আর কানে আসে না। চারিদিকে কেবল একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

অবশেষে নগেন তাহার বাড়ীর কাছে উপস্থিত হইল। সে-রাত্রির প্লাবনে আর ঝড়বৃষ্টিতে তাহার বাড়ীও ভাসিয়া গিয়াছে। সেখানে জনমানবের কোন চিহ্ন আর নাই। সে মোটেই বিস্মিত হইল না; স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে তাহার স্নেহের মা এবং ভাই যে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছে সেখান হইতে আর কোনদিনই তাহারা ফিরিয়া আসিবে না। তাহার ডাক আর সেখানে পৌঁছিবে না। তাহার দুই চক্ষুতে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার চলিতে লাগিল। একবার ভাবিল, সে তাহার নিজের মা ও ভাইকে চিরদিনের মত হারাইয়াছে সত্য; কিন্তু সে তো সর্ব্বহারা হয় নাই। এখনও তাহার যে অগণিত ভাইবোন ও মা জীবিত রহিয়াছে, তাহাদের সেবা করিলে, তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে, পরনে বস্ত্র দিলে এবং আশ্রয় দিলে তাহাদের মাঝেই সে তাহার মা ও ভাইকে খুঁজিয়া পাইবে। তাহার শক্তি ও সামর্থ্য যত সামান্যই হোক্, অলক্ষ্য হইতে তাহার মা ও ভাই তাহাকে যে প্রেরণা ও শক্তি যোগাইবে, তাহা তো কম নহে।

মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছে; নীল আকাশের বুকে মেঘের চিহ্ন নাই। ফাঁকা মাঠের ঝির ঝিরে মিষ্টি বাতাস তাহার অবসাদগ্রস্ত শরীর ও ক্লান্ত মনকে জুড়াইয়া দিল। নগেন আগাইয়া চলিল—সহস্র সহস্র কণ্ঠের আকুল আহ্বান তাহার কানে আসিয়া বাজিতেছে। এই আহ্বানে নিদারুণ দুঃখও তাহার কাছে দুঃখ-বিলাস বলিয়া মনে হইল। সহস্র সহস্র দুঃস্থ ভাই বোন ও মায়ের কাতর আহ্বান তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।

সঞ্চয়ন

বিদেশী পত্রিকা হইতে

সোভিয়েট ফার্মে

[লিয় কিরিলের (Leon Kiril) লেখা এই প্রবন্ধটি লণ্ডনের 'দি স্পেক্টেটা'র (The Spectator) নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে সংকলিত। সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কৃষিকার্য প্রথার অনেক কিছু শেখার আছে বলেই মনে হয়]

জারের রাশিয়ায় কৃষকরা দুইটি বড় শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—যাঁরা গ্রামিক গোষ্ঠীর (village commune) বা মিরের (Mir) সভ্য হিসাবে সাধারণ জমিতে কৃষিকার্য করত—আর একদল ছিল মালিক কৃষক; এদের নিজেদের ফার্ম ছিল। পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে এই দুটি শ্রেণীই ছিল দরিদ্র এবং অজ্ঞ। পুরাতন শাসকদের আমলে শেষ দশ বৎসরে কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক কিছু করা হয়েছিল—কিন্তু এই অল্প সময়ে এগারো কোটি কৃষকের এমন কোন অবস্থান্তর করা সম্ভব হয় নি যার প্রভাব অনুভব করা যেতে পারে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট প্রায় ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃষকদের অনেকটা প্রাচীন পদ্ধতিতেই কাজ চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কৃষকদের বুঝিয়ে সমষ্টিগত ফার্মে (collective farm) আনার জন্য উৎসাহের সঙ্গে অভিযান সুরু করা হয়েছিল—এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেশীর ভাগ কৃষক-ফার্ম সমষ্টি-ফার্মে পরিণত হয়েছিল এবং কৃষকরাও সমষ্টিগত ফার্মে যোগ দিয়েছিল। এই ব্যবস্থা চালু করতে গবর্ণমেণ্ট নিষ্ঠুর এবং পাশবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন—তার ক্ষতচিহ্ন এখনও দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীন ধরণের কৃষক-ফার্ম রাশিয়ায় অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল; এর অবস্থা অনেকটা হয়েছিল বিদ্যুৎ-শক্তি, কেন্দ্রিক তাপ এবং সর্বপ্রকার আধুনিক যন্ত্রাদি-সমন্বিত সহরে অশ্ব-বাহিত ট্রামগাড়ী রাখার মত।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁর শ্রমশিল্পের নীতি অনুসারে বড় বড় স্টেট ফার্ম সৃষ্টি করতে পারতেন—সেখানে কৃষকদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা যেত। এর পরিবর্তে হয়ত বিচক্ষণতার সঙ্গেই গবর্ণমেণ্ট সমবায় নীতির উপর কৃষিকার্যের ভিত্তি স্থাপনা করতে মনস্থ করেছিলেন। নীতিগত দিক থেকে সমষ্টিগত ফার্ম হচ্ছে সমবায়ী প্রতিষ্ঠান—এখানে সভ্যদের নীতি-নির্ধারণ এবং ব্যবস্থাপনার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু কার্যত গবর্ণমেণ্ট-নির্ধারিত সাধারণ পরিকল্পনা অনুসারে তাদের স্বাধীন মতামত সীমাবদ্ধ; কোন্ অনুপাতে কি শস্য উৎপন্ন করতে হবে তা গবর্ণমেণ্টই নির্ধারণ করেন। ফার্মের সভাপতিও কার্যত পার্টির মনোনীত ব্যক্তি—তাঁকে নিযুক্ত করা হয় গবর্ণমেণ্টের উপদেশ এবং আদেশ যাতে যথাযথ প্রতিপালিত হয় সেটা দেখার জন্য এবং ফার্মের আভ্যন্তরীণ শাসন পরিদর্শনের জন্য। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আনুগত্য স্টেট্ এবং ফার্মের সভ্যদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত ফার্ম যাতে তার উৎপন্ন দ্রব্যের দেয় অংশ ঠিকমত স্টেটকে দেয় তার দিকে নজর রাখা তাঁর অন্যতম প্রধান কর্তব্য। এর জন্য স্টেট নির্দিষ্ট মূল্য দেয়—বাকী উদ্বৃত্ত শস্য বিক্রী ক'রে যে দাম পাওয়া যায়, এ দাম তার চেয়ে যথেষ্ট কম।

ফার্মের সর্বপ্রকার আর্থিক দেনা-পাওনা মিটিয়ে কোন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শস্য, কোন ক্ষেত্রে বা তার দাম দিয়ে সভ্যদের পাওনা মেটানো হয়। ডিভিডেণ্ডের পরিমাণ মোট অর্থকরী আয়ের অর্ধেক এবং শস্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ দাঁড়ায়। প্রত্যেক সভ্যের আয় নির্ভর করে তার ভাগে যে পরিমাণ শ্রম-দিবস (labour day) পড়ে তার উপর। শ্রম-দিবস এবং একদিনের কাজ একার্থবোধক নয়; এটা অনেকটা কাজের একক—যেমন এতটা জমি চাষ কিংবা খনন, এতগুলো গাভী দোহন প্রভৃতি। গড়ে একদিনের কাজ প্রায় দেড় দিনের শ্রম-দিবসের সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের অর্জিত শ্রম-দিবস তার নৈপুণ্য এবং উৎসাহের উপর নির্ভর করে। কাজেই খণ্ড কাজের নীতি কিংবা ফল অনুসারে বেতন দেবার নীতি অনুসৃত হয়।

সমষ্টিগত ফার্মগুলোর আকারে অনেক বিভিন্নতা দেখা যায়; ইউরোপীয় রাশিয়ার কৃষি-অঞ্চলে গড়ে এগুলোর আকার হয় প্রায় দু-হাজার একর—কার্যরত শ্রমিকের

সংখ্যা হয় দুই-শ কিংবা তারও বেশী। চাষের অধিকাংশ করা হয় স্টেট-পরিচালিত মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনের ট্র্যাক্টর এবং মেশিনের দ্বারা। ফার্মগুলোর সাধারণত অশ্ব-বাহিত কল থাকে—আর গৌণ কৃষিকার্য এবং ট্র্যাক্টরের অনুপযুক্ত কাজের জন্য যন্ত্রপাতি ও ভারবাহী পশুও থাকে। তাদের কলের সাহায্যে উৎপন্ন শস্যের একাংশ মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলো পেয়ে থাকে।

গবর্ণমেণ্টের কৃষিকার্য সম্বন্ধীয় নীতির বিরুদ্ধে প্রাথমিক অসন্তোষ এবং সন্দেহ অনেকটা বিদূরিত হয়েছে—অবশ্য বুড়ো লোকদের মধ্যে অনেকে এখনও বিগত দিনের ব্যক্তিগত মালিকানা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কামনা করে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম-বয়স্ক সভ্যরা মোটের উপর বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট। নিজেদের প্রচেষ্টায় হয়ত তারা অনেকেই ফার্ম চালাতে পারবে না, কেন-না কৃষিকার্য এবং পশুপালনের এক একটি শাখায় বিশেষজ্ঞতা অর্জন করার দিকেই তাদের ঝোঁক, প্রকৃতপক্ষে পল্লীর যুবক কৃষক-সম্প্রদায় দ্রুত আদর্শবাদী শ্রমিক সম্প্রদায়ে পরিণত হচ্ছে—তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পুরনো কৃষক সম্প্রদায়ের মত নয়—অনেকটা যন্ত্র-শিল্পের শ্রমিকদের মত। সমষ্টিগত ফার্মে কৃষিকার্য শিল্পরূপ ছাড়িয়ে যে অনেকটা খাঁটি বৈজ্ঞানিক রূপ পরিগ্রহ করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনেক ফার্মের নিজস্ব ছোট বিজ্ঞান-গবেষণাগার আছে—সেখানে বিশেষজ্ঞরা শস্য-ধ্বংসকারী পতঙ্গ ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কীট পতঙ্গ উৎপাদন করেন, নানা প্রকার সারের সংমিশ্রণ ক'রে গবেষণা করেন, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ্ সংমিশ্রণ ক'রে প্রজনন গবেষণা করেন।

কোন কৃষি-শ্রমিককে একা পেয়ে যদি তার সঙ্গে আলাপ করা যায়, তবে সর্ব্বপ্রথম একটা জিনিস দেখা যায় —তারা নিজেদের বাড়ী, নিজেদের বাগান, নিজেদের গরু, শূকর এবং মুরগী সম্বন্ধে খুব গর্বিত! গড়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে দেড় একর জমি, একটা গরু, একটা শূকর এবং যতটা খুসী মুরগী। নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য এগুলোর উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয় —কেননা ফার্মে কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনের হার বেশী নয়। এর কারণ এই যে, গবেষণা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কৃষি-কার্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাবিধান এবং ক্রমবর্ধমান নীতিতে উন্নত ধরণের কলকব্জা নির্মাণের জন্য কারখানা স্থাপনে স্টেটের অনেক ব্যয় হয়—এতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত পল্লী-জীবন এত উন্নত হবে যে আগেকার দিনের কৃষিকার্য-প্রথায় সেটা কোন মতেই সম্ভব হ'ত না—কিন্তু তার জন্য প্রথমত কৃষিজীবীদের কিছুটা স্বার্থত্যাগ করতে হবে।

যদিও শ্রম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সভাপতি এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের অনেকটা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সীমা নির্ধারণ দেখে মনে হয় যে সাধারণ ফার্মের সভ্যরা ভাড়াটে কৃষি-শ্রমিকদের চেয়ে ভিন্ন নয়, তবু তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গী কিন্তু শ্রমজীবীদের মত নয়। তারা সমষ্টিগতভাবে নিজেদের জমির মালিক ব'লে মনে করে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে যে স্বার্থজনিত একত্ববোধ দেখা যায়, মালিকত্ববোধহীন ভাড়াটে শ্রমজীবীদের মধ্যে তার সন্ধান মেলে না।

এই মালিকত্ব এবং একত্ব-বোধই তাদের দেশকে আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রুশ কৃষকদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

ব্যবসায়ে জাপানী

[জাপানীরা যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী জাতি সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্তমান প্রবন্ধে মিঃ ঈ, এম্, গাল্ (E. M. Gull) জাপানীদের ব্যবসায়-পদ্ধতির আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি The world Digest নামক পত্রিকা থেকে সংগৃহীত]

এক শতাব্দী পূর্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপানীদের স্থানই ছিল না। তথাপি ইউরোপীয় যুদ্ধ সুরু হবার কিছু পূর্বে তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল মোটামুটি ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। শুধু অঙ্ক সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটা নীরস, কিন্তু জাপানী ব্যবসায়ীর মধ্য দিয়ে মানবীয় পদ্ধতিতেও ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। জাপানী ব্যবসায়ীর মূল কথা তার দ্বৈত ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত আছে। তার ব্যক্তিত্বের একাংশ তোমার আমার মতই পাশ্চাত্য

ভাবাপন্ন : অপরাংশ পুরোপুরি জাপানী। তার অফিস—অফিসের গঠন, ব্যবস্থাপনা, আসবাব এবং যন্ত্রাদি—ঠিক তোমার আমার অফিসের মতই। তার পোষাক, পরিধান-পদ্ধতি, তার ব্যবহার, তার ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং কথাবার্তা এবং বহুলাংশে তার ব্যবসায়ের স্ট্যাণ্ডার্ড, তোমার আমার মতই।

কিন্তু অফিসের পরে জাপানী ব্যবসায়ী আর আদৌ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন নয়। জাপানী ব্যবসায়ী যদি ধনী হয় এবং পাশ্চাত্য-পদ্ধতির বাড়ীতে থাকে, তবে বাড়ীর যে অংশে সে সাধারণত তোমাকে অভ্যর্থনা করে, সে অংশে সে ফিরে যায় না; সে বাড়ীটির জাপানী অংশে চলে যায়। যদি সে ধনী না হয়, তবে সে কাঠ এবং কাগজ নির্মিত ক্ষীণকায় পুতুলের বাড়ীতে ফিরে যায়। উভয়-ক্ষেত্রেই সে তৎক্ষণাৎ কিমনো পরে খালি পায়ে মেঝের মাদুরে জোড়াসনে বসে পড়ে। এক ফুটেরও কম উঁচু একটা লম্বা টুল ছাড়া আর কোন আসবাব ঘরে থাকে না। ঘরের দেয়াল, দরজা কিংবা কাচের জানালা থাকে না—ঘরগুলির মাঝের কাগজের তৈরী বেড়াগুলি এদিকে ওদিকে দোলে। তবে বৈদ্যুতিক বাতি ও টেলিফোন থাকেই—এবং সম্ভবত একটা বৈদ্যুতিক তাপবিকীরণ-কারী যন্ত্রও থাকে। সম্ভবত একটা কাঠ কয়লার ছোট অগ্নি-পাত্রও থাকে। গৃহ-সজ্জার মধ্যে হয়ত একখানা ছবি, একটা জড়ানো ফর্দ এবং একটি চীনা মাটির পাত্রে কয়েকটা ফুল থাকে। লম্বা টুল থেকে সে নিজেই হলুদ রঙের কিংবা সবুজ রঙের চা ঢেলে নেবে; যে ছোট মি-টি ধীর গতিতে চা নিয়ে আসে তাকে দেখে মনে হয় যেন সে কোন সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে জীবন ধারণ ক'রে বেরিয়ে এসেছে। সান্ধ্য ভোজন কাঠির সাহায্যেই করা হয়; সান্ধ্য ভোজে ভাতই প্রধান উপাদান এবং খাবার পরে সেই মার্জিত-ব্যবহার ব্যবসায়ী বন্ধু পুনঃ পুনঃ সশব্দে এবং সন্তুষ্টির সঙ্গে ঢেঁকুর তুলতে থাকে। তখন সে দেহ এবং আত্মা—এই উভয় দিক থেকেই ব্যবসায় জগৎ থেকে একেবারে দূরে সরে যায়।

জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই তীক্ষ্ণ বৈষম্যই দেখা যায়। একেবারে শীর্ষদেশে অর্থনৈতিক শক্তির সজ্ঘবদ্ধতার সঙ্গে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের সাদৃশ্য থাকলেও এটা পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের ব্যঙ্গ ছাড়া কিছু নয়। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে মিৎসুই, মিৎসুবিসি, সুমিতোমা এবং ইয়াসুদা নামক চারটি অত্যন্ত ধনী পরিবারের হাতে। এঁদের তিন জন দেশের জাহাজ নির্মাণ ব্যবসায়ের অর্ধেকের অধিকারী। এঁদের প্রত্যেকেরই এক-একটা বিরাট ব্যাঙ্ক আছে। প্রকৃতপক্ষে এঁদের চারটি ব্যাঙ্কে জাপানের সামগ্রিক ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক তৃতীয়াংশ থাকে। তাঁদের ট্রাস্ট কোম্পানীগুলিতে দেশের সমগ্র ট্রাস্টে গচ্ছিত অর্থের শতকরা সত্তর ভাগ খাটে। দেশীয় বীমা-ব্যবসায়ে এঁদের বীমা কোম্পানীগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও কয়েকটি পরিবারসহ এই চারটি পরিবারকে বলা হয় জৈবাৎসু (Zaibatsu) অথবা ধনতান্ত্রিক দাস; দেশের বড় বড় এঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম, খনি, মদের ব্যবসায়, কাগজের ব্যবসায়, রাসায়নিক ব্যবসায়, চিনির ব্যবসায়, ইস্পাতের ব্যবসায়, লৌহেতর ধাতুর ব্যবসায়, তৈল-সংশোধন ব্যবসায়, টিনে রক্ষিত খাদ্য এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ব্যবসায় এঁদের অধিকারে। অপরিমিত ধনের অধিকারী হওয়ায় এঁদের প্রচুর রাজনৈতিক প্রভাব আছে। শুধু জাপানে নয়, জাপ সাম্রাজ্যে অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ কার্যে পরিণত করতে রাষ্ট্র এঁদেরই উপর নির্ভর করে।

আধুনিক জাপানী ব্যবসায়ী অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক—ধন-সম্পত্তি এবং মানব-জীবনের উপর তাঁর অসম্ভব অধিকার। চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ সুরু হবার পূর্বে আট কোটি জাপানীদের মধ্যে প্রায় চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। এদের প্রায় শতকরা সত্তর জন কাজ করত এমন সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যেখানে পঞ্চাশ জনের কম কর্মী নিযুক্ত ছিল। যে সস্তা মাল জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য, এই সব ছোট-খাটো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানেই সে মাল তৈরী হ'ত—মোজা, গেঞ্জি, বৈদ্যুতিক বাতি, রবারের জুতো, পেন্সিল, খেলনা, বাইসিকল্, নানা রকমের ছোটখাটো ধাতব পদার্থ প্রভৃতি। অনুল্লেখ্য বাড়ীতে স্থাপিত গেঞ্জি প্রভৃতির কল

দেখে চিনবার উপায় নেই—কোন কোন কারখানায় বৈদ্যুতিক যন্ত্র থাকে আবার কোথাও বা হাত-কলের সাহায্যেই কাজ চালান হয়; কাজের মধ্যে এত সূক্ষ্ম বিভাগ যে কোন কোন কারখানায় শুধু বোতামই লাগান হয়। সেই রকম রপ্তানীর জন্য নির্মিত বাইসিকলের বেলায়ও দেখা যায় যে কোন দোকানে রিম তৈরী হয়, কোন দোকানে চাকার মধ্যাংশ তৈরী হয়, কোন দোকানে তৈরী হয় হাতল আবার কোন দোকানে শুধু ফ্রেমই তৈরী হয়। আমাদের যন্ত্র-শিল্পগুলিও অবশ্য বিশেষীকরণের উপর গঠিত। কিন্তু শ্রম-বিভাগ জাপানের কুটির-শিল্পের বৈশিষ্ট্য নয়—তার বৈশিষ্ট্য আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন ছোট ছোট কর্ম-বিভাগে। যখন যুদ্ধোৎপাদনের জন্য এই সব কিছুকে সংগঠিত করা হয়, তখন সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য জন-শক্তির সঙ্ঘবদ্ধতাই সম্পাদন করা হয়। এই কথার সঙ্গে ভেবে দেখুন যে এই সব ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধনতান্ত্রিক দৈত্য জাইবাৎসুদের কাছ থেকে তাদের উপকরণ এবং মূলধন পেয়ে থাকে—তবেই যুদ্ধকালে একটা স্বৈরতান্ত্রিক জাতি কি ভাবে কাজ করে সেটা বোঝা যায়।

এই শিল্পজগতের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে কম মাইনের অনেক নারী শ্রমিক খাটে। বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পগুলির সম্বন্ধেও এ কথা বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য। রেশম পশম ও কার্পাস বস্ত্রের মিলে নিযুক্ত শ্রমিকদের তিন ভাগই তরুণী; পল্লী অঞ্চল থেকে মিলের এজেন্টরা এদের নিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পূর্বে প্রকাশিত সরকারী হিসাব থেকে দেখা যায় যে জাপানের ছোট ও বড় কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নারী। সাধারণত এরা মাসে দুদিন ছুটি পায়—কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তাহে একদিনও বিশ্রাম পায় এবং চীন যুদ্ধের পূর্বে তাদের বেতন ছিল দৈনিক প্রায় এক শিলিং: কম করে দৈনিক সাড়ে আট ঘণ্টা এদের খাটতে হয়—আর যে-সব কারখানা ফ্যাক্টরী অ্যাক্টের (Factory Act) আওতায় পড়ে না সে-সব কারখানায় দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা খাটতে হয়। চীন যুদ্ধের পূর্বে শুধু বড় বড় সমৃদ্ধিশালী মিলেই এই বেতন, বোনাস, অবসর গ্রহণকালীন ভাতা এবং দ্রব্য-মূল্য প্রভৃতি নিয়ে দৈনিক এক শিলিং নয় পেন্স দাঁড়াত। সুদক্ষ পুরুষ কর্মীদের বেতন হ'ত সাড়ে চার শিলিং থেকে সাড়ে সাত শিলিং-এর মধ্যে। আর যারা দৈনিক চুক্তিতে সাধারণত কাজ ক'রে থাকে তারা পেত দৈনিক এক শিলিং হিসাবে। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষে বেতনের হার শতকরা পঁচিশ হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বটে—তবে জীবন-ধারণের ব্যয়ও দ্বিগুণের বেশী বেড়ে গেছে।

জাপানের শিল্প এবং ব্যবসায়-জগতকে ধরে রেখেছে তার কৃষিকার্য: কৃষিকার্যই জাপানের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। এই কৃষি-জগতে জাপানের প্রায় অর্ধেক শ্রম-শক্তি নিযুক্ত; কৃষিকার্যের সর্বনিম্ন স্তরে ভীষণ দারিদ্র্য, অর্ধেকটা উপরে জীবিকা নির্বাহের পুরাতন অসামর্থ্য এবং শীর্ষদেশে আছে প্রায় ৪০০০ লোক যাদের জমিদারী ১২৪ একরের বেশী—আপেক্ষিক হিসাবে বড় এই জমিদারদের জমিদারী গড়ে ৩০৬ একর। * * *

এই হ'ল জাপানীদের ব্যবসায়িক পট-ভূমিকা এবং এর থেকে সহজেই বোঝা যায় জাপান ব্যবসায়কে কত সহজে তার যুদ্ধযন্ত্রে প্রয়োগ করেছে। জার্মানীর মত জাপানও তার আমদানী জিনিস দেশের লোকের জীবন-ধারণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য খরচ না করে যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত করেছিল।

প্রাতরাশের জন্য ক্যানাডাকে ধন্যবাদ

[ব্রিটেনে খুব কম লোকই জানে ক্যানাডা কি ভাবে তাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করে, সৈন্য জুগিয়ে, নগদ টাকা দিয়ে এবং খাদ্য উৎপাদন ক'রে সাহায্য করছে। এখানে খাদ্য-উৎপাদনের একটা ব্যাপক এবং সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধটির লেখক রেমণ্ড আর্থার ডেভিস্ (Raymond Arthur Davies) এবং প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল টরন্টোর Maclean's Magazineএ]

আটাশ লক্ষ ত্রিশ হাজার শূকর নিশ্চয় অনেক শূকর। পর পর সাজিয়ে দিলে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ধরে এই শূকরেরা ভ্যাঙ্কুভার থেকে লণ্ডন (অণ্টেরিও) পর্যন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন সার তৈরী করতে পারে। যদি এই শূকরগুলোকে একশ কামরাওয়ালা মালগাড়ীতে বোঝাই

করা হয় এবং ঘণ্টায় যদি একখানা করে শূকরের স্পেশাল গাড়ী পর পর ছাড়া হয়, তবে রেল-লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে এই সব শূকরের স্পেশাল গাড়ী দেখতে এক বছর লাগবে। ব্রিটেনে সত্তর কোটি পাউণ্ড শুষ্ক লবণাক্ত শূকর-মাংস (bacon) এবং জঙ্ঘা দেশ (ham) পাঠাতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডাকে কত শূকর উৎপন্ন করতে হয়েছে এর থেকে তার কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

ক্যানাডার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার এটা ত মাত্র একটি দিকের একটি দৃশ্য—যুদ্ধরতদের জন্য খাদ্য-উৎপাদন। ক্যানাডায় অসামরিক অধিবাসী, সৈন্যদল, ব্রিটেন এবং আমাদের অন্যান্য মিত্রশক্তির খাদ্য-সরবরাহ কার্যে সাত লক্ষ পঁচাশী হাজার ফার্মে পঁয়ত্রিশ লক্ষেরও বেশী নরনারী নিযুক্ত আছে; উপরন্তু হাজার হাজার প্যাকিং হাউস, ময়দার কলের শ্রমিক, ডেয়রী শ্রমিক, মৎস্যজীবী প্রভৃতিও এই কার্যে নিযুক্ত আছে।

শুধু ব্রিটেনেই ক্যানাডা যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে পঁয়তাল্লিশ গুণ বেশী ডিম এ বৎসর (১৯৪২) পাঠিয়েছে; তিন গুণ বেশী শুষ্ক লবণাক্ত শূকর-মাংস পাঠিয়েছে; ক্যানাডার চেডার (Cheddar) পনির পাঠিয়েছে দুই গুণ বেশী; আর পাঠান হয়েছে আমরা যুদ্ধ-পূর্ব বৎসরে গড়ে সারা পৃথিবীতে যতটা গম পাঠাতাম ততটা; টিনে রক্ষিত আমাদের সমস্ত স্যালমন্ এবং হেরিং মাছও পাঠান হয়েছে। অধিকন্তু ক্যানাডার কৃষকরা কম জমিতে বেশী গম, যুদ্ধের পূর্বের তিনগুণ বেশী শণের বীজ (তিসির তেলের জন্য) এবং সয়া বীন্স্ (soya beans), এক-চতুর্থাংশ বেশী খাদ্য-শস্য এবং শতকরা ১৫ ভাগ বেশী গোমাংস উৎপাদন করছে। এমন কি গৃহ-পালিত পশু-গুলোও যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। ক্যানাডার শূকরীরা বেশী শাবক প্রসব করে, গরু বেশী দুধ দেয় এবং মুরগী বেশী ডিম পাড়ে।

আমাদের সুবৃহৎ এবং জটিল কৃষি-প্রথাকে যুদ্ধের প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করা সহজ হয় নি। এখন পর্যন্ত আমরা পরিপূর্ণ সাফল্যলাভ করি নি। তা সত্ত্বেও ক্যানাডার কৃষকরা যতটা সাফল্য লাভ করেছে, তার জন্য তারা সম্মানসূচক ব্যাজ পেতে পারে। যুদ্ধের প্রথম দুই বছরে ব্রিটেনে আটচল্লিশ কোটি ডলারের খাদ্য পাঠান হয়েছিল। শুধু ১৯৪১-৪২ খৃস্টাব্দেই তেত্রিশ কোটি সত্তর লক্ষ ডলার মূল্যের খাদ্য পাঠান হয়েছিল।

জাহাজে করে যে-সব মাল পাঠান হয় তার মধ্যে গম, ময়দা, শূকর-মাংস, পনির এবং ডিমের পরিমাণই (অবশ্য মূল্যের দিক দিয়ে) শতকরা নব্বই ভাগ। তবু গম এবং ময়দা ছাড়া ব্রিটেনের যতটা চাহিদা ততটা রপ্তানী-দ্রব্য কোনদিন উৎপন্ন করে নি। এই সমস্যাই আমাদের কৃষক এবং কর্মীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। ব্রিটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এ সমস্যার সমাধান আবশ্যক ছিল। এ সমস্যার সমাধানও হয়েছে।

কি ভাবে এটা সম্ভব হয়েছিল? শূকর-মাংস উৎপাদনকেই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক্। যুদ্ধের পূর্বে ক্যানাডার ছত্রিশ লক্ষ শূকর ছিল। ব্রিটেনে আঠারো থেকে উনিশ কোটি পাউণ্ড শূকর-মাংস রপ্তানী করা হ'ত। তারপরেই এল নিম্ন দেশগুলি (Low Countries) এবং ডান্‌মার্কের বিপর্যয়। তখন খাদ্যের জন্য ব্রিটেনের কাছ থেকে জরুরী এস্, ও, এস্ (S.O.S) এল। কৃষকরা দৃঢ়তার সঙ্গে কাজে লেগে গেল। যুদ্ধের প্রথম বছরে তারা আটাশ কোটি পাউণ্ড শূকর-মাংস উৎপন্ন করে ব্রিটেনে রপ্তানী করল। প্রথম মহাযুদ্ধের চার বছরে যে শূকর উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল, এক ১৯৩৯ খৃস্টাব্দেই তা' করা হয়েছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে রপ্তানী মাল প্রায় দুই গুণ বেড়ে গেছিল ১৯৪২ খৃস্টাব্দে যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে এই রপ্তানীর পরিমাণ হয়েছিল সত্তর কোটি পাউণ্ড। এখনও এ বৃদ্ধির সীমা নির্ধারিত হয়নি।

এত অল্প সময়ে এই বৃদ্ধি ক্যানাডার কৃষিকার্যে বিপ্লবেরই সূচক এবং এর ফলও নিশ্চয়ই স্থায়ী হবে। শূকর-উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের বেশী খাদ্য-দ্রব্যেরও প্রয়োজন হয়েছিল। প্রতি একর গমের জমিতে শূকরের খাদ্য এবং শণ-বীজ উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্ট দুই ডলার বোনাস্ দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ওট্ এবং যবের জমির পরিমাণ শতকরা পঁচিশ ভাগ বেড়ে গেছিল—চল্লিশ লক্ষ একরে দাঁড়িয়ে ছিল।

ফলে কৃষকরা বেশী শূকর উৎপাদন
টিশদের চুক্তির ফলে এই উৎপাদন
ব্রিটিশ চুক্তিতে শূকরের মাংসের
বাঁধা দাম দেওয়া হয়ে থাকে।
ই উৎপাদন বৃদ্ধির আরেকটি কারণ
শূকর কিংবা তার মৃতদেহের জন্য
সর্ট হিসাবে বোনাস দেওয়া হয়ে
চতর মূল্যের জন্য শূকরের মাংস
য়ে না যায়, তার জন্য ক্যানাডার
গবর্ণমেণ্টের দেয় মূল্য পাঁচ শিলিং
।

যথেষ্ট হয় নি। ক্যানাডিয়ানরা
খাওয়ার ফলে ব্রিটেনের জন্য যথেষ্ট
১৯৪১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শূকর-
ট অভিযান সুরু হয়েছিল। খুচরো
হোটেল, ডাইনিং-কারের মালিক
অনুরোধ করা হয়েছিল যে তারা
শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কম শূকরের
পারে কৃষকদের প্রাপ্য শূকরের
বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

ফল খুব ভাল হয়েছে। শূকরের
ছত্রিশ লক্ষ থেকে ১৯৪১ খৃস্টাব্দে
ছিল। সারা দেশে হত্যার জন্য
প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। এবং মনে
শূকরের সংখ্যা ১৯৪১ খৃস্টাব্দের
কে পঁচিশ ভাগ বেড়েছে।

তে হ'লে শূকরকে প্রথম হত্যা করে
করে জাহাজে ওঠাতে হয়। মোটর-
চর অনুসরণে তারা আপেক্ষিকভাবে
বাড়িয়েই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি
এবং তিন গুণ। আমাদের সঙ্গে
কিং হাউসে শূকরের মাংস কাটার
করণ ঘর থেকে আগত রেলের উপর
রের মৃতদেহ ঝুলে আছে। মৃত-
গে বিভক্ত এবং নাড়ীভুঁড়িগুলিও
ফেলে দেওয়া হয়েছে। একজন শ্রমিক তার দীর্ঘ এবং ক্ষুর-ধার ছুরিকার সুদক্ষ বাঁকা আঘাতে মাথাটি কেটে ফেলে—তার পর মাথাটাকে আরও কার্য-ক্রমের জন্য শিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। (মাথাগুলি দেশেই বিক্রী করা হয়)। অপর একটি শ্রমিক সম্পূর্ণভাবে মৃত দেহটিকে দ্বিখণ্ডিত করে এবং একটি বাহক-প্রণালীতে সেগুলো ফেলে দেয়।

একটার পর একটা করে খণ্ডগুলি আসতে থাকে। নর এবং নারী কর্মীরা পা কেটে নেয়, বহিরাগত চর্বি এবং মাংসখণ্ড কেটে ফেলে, বৈদ্যুতিক করাতের সাহায্যে আংশিকভাবে মেরুদণ্ডটি কাটে এবং যন্ত্রের দ্বারা কাঁধের হাড় বাহির করে নেয়। তার পর একটা ঢালু পথ বেয়ে মাংসখণ্ডগুলি রপ্তানীর ঘরে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে সাধারণত দ্রবণ-বিন্দুর (freezing point) নীচে উত্তাপ রেখে এগুলোকে অন্য একটি বাহক-নলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। শ্রমিকরা ফাঁপা সূচের সাহায্যে মাংসের মধ্যে লবণাক্ত আচার ঢুকিয়ে দেয়। মাংসখণ্ডের গর্তের মধ্যে লবণ ঢোকান হয়। প্রত্যেক শ্রমিক ঘণ্টায় এরূপ আশীটি মাংসখণ্ড এবং দশ ঘণ্টার একদিনে আট-শ মাংস-খণ্ডের কাজ করে।

তার পর আট দিন ধরে এই সব মাংস ৫৫০০০ থেকে ৯০০০০ পাউণ্ড লবণাক্ত পাত্রে জমা ক'রে রাখা হয়। তার পর এগুলোকে পাত্র থেকে তুলে দেয়ালের পাশে সার দিয়ে রাখা হয়,—পরে পরীক্ষা করে, পরিষ্কার করে, স্ট্যাম্প দিয়ে প্যাক্ করা হয়। ক্যানাডার ১৪৬টি প্যাকিং হাউসে একই দৃশ্য দেখা যায়। এর মধ্যে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে মাত্র দুই-তিন হাজার শ্রমিক বাড়িয়েই এই উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল মোট ১২৫০৩ জন নরনারী; ১৯৪০ খৃস্টাব্দে এদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৪৩০১ জনে।

যদিও ব্রিটেনে আমাদের উৎপন্ন শূকর-মাংসের রপ্তানী অনবরত বেড়েই চলেছে, তবু এখনও ময়দা এবং শস্য আকারে গমই আমাদের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। ব্রিটেনে প্রায় বিশ কোটি বুশেল গম পাঠান হয়; সমস্ত দেশে দশ বছর সময়ে গড়ে আমাদের এই পরিমাণ রপ্তানীই ছিল। এর একটা বৃহৎ অংশ যাচ্ছে রাশিয়াতে;

ব্রিটেন সোভিয়েটের পক্ষে ক্রেতার কাজ করছে। রেড্ ক্রস মাসে ১৫০০০ টন গ্রীসে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে। ব্রিটিশের খাস উপনিবেশগুলোতেও কিছু কিছু গম পাঠানো হচ্ছে।

শস্য এবং ময়দা এই উভয় আকারেই গম পাঠানো হয়—ময়দার মিলের কাজও বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে আমাদের ময়দার মিলে ২৭৫২৭৫ ব্যারেল ময়দা উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে এই উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১১২৭৯৭৪ ব্যারেলে—বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ৪০০ ভাগেরও বেশী। তথাপি এর জন্য যে খুব বেশী শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়েছে তা নয়। ক্যানাডার ময়দার মিলসমূহে শ্রমিকদের সংখ্যা ১৫০০ জনেরও কম!

অপর একটি খাদ্যদ্রব্যের জন্যও অক্লান্ত এবং জরুরী চাহিদা আছে—সেটি হচ্ছে পনির। ১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডা ব্রিটেনে পাঠিয়েছিল ৯৩০৮১০০০ পাউণ্ড পনির। কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি যে এত পনির উৎপন্ন হ'তে পারে। কিন্তু ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষকেরা এই উৎপাদন-পরিমাণকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।···ইতিপূর্বে আমরা মোট যে পরিমাণ পনির উৎপাদন করতাম, বর্তমানে সেই পরিমাণ পনিরই ক্যানাডা ব্রিটেনে পাঠায়—অথচ আমাদের বার্ষিক তিন কোটি থেকে চার কোটি পাউণ্ড প্রয়োজন মিটানোর জন্যও যথেষ্ট পনির থাকে।

পনির ছাড়াও যুদ্ধের প্রথম দু'বছরে ক্যানাডা ব্রিটেনে ১৪৩৫০০০ কৌটা শুকনো দুধ পাঠিয়েছিল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ কমে ৬৬৮০০০ কৌটা হয়েছিল। এর কারণ এই যে ব্রিটিশ খাদ্য-মন্ত্রী বিভাগ ক্যানাডার ডেয়ারী উৎপন্ন দ্রব্যকে পনিরের আকারেই পেতে ভালবাসেন। তা ছাড়া ব্রিটেন যুক্ত-রাষ্ট্রের কাছ থেকেও যথেষ্ট শুকনো দুধ পাচ্ছে।

ব্রিটেনের জন্য ক্যানাডার খাদ্য উৎপাদনে ডিমের গুরুত্বও কম নয়। যুদ্ধের পূর্বে আমাদের কৃষকরা ব্রিটেনে বছরে দশ লক্ষ ডজন ডিম পাঠাত। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে আমরা পাঠিয়েছি চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডজন—শতকরা প্রায় ৪৫০০ ভাগ বেশী। যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে এখন আমাদের এক কোটি বেশী মুরগী আছে। আমাদের ডিম উৎপাদন ২১৩,৩৭৭,০০০ ডজন থেকে বেড়ে ২৪৪,১৫৪০০০ ডজন হয়েছে।

পনিরের মত ডিমের ক্ষেত্রেও গভর্ণমেণ্ট-বোনাসের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে—এক্ষেত্রে রপ্তানীর জন্য প্রাপ্ত প্রতি ডজন প্রথম শ্রেণীর ডিমের জন্য তিন সেণ্ট, ব্রিটেন কর্তৃক প্রদত্ত বেশী দাম এবং আগে থেকে ভাল চুক্তি সম্পাদন করা হয়। এমন কি মুরগী পর্যন্ত যুদ্ধ পূর্ব সময়ের ১১১টার পরিবর্তে ১১২টা করে ডিম পাড়ছে। এর অর্থ এই যে বিশ লক্ষের বেশী ডিম উৎপাদন বেড়ে গেছে।

অটোয়া, ট্রেণ্টন, বেল্‌মণ্ট, উইনিপেগ্ এবং স্যাস্কাটুনের পাঁচটি ডিম শুষ্ককারী যন্ত্র-ভবনের যে কোন একটিতে আমাদের সঙ্গে আসুন।

আপনার সামনে লম্বা টেবিলে বিশুদ্ধ শাদা পোষাকে আবৃত মেয়েরা শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ মেয়েদের কাজ হচ্ছে ডিম ভাঙা। তাদের সামনে বড় বড় ইস্পাতের পাত্র রয়ে গেছে।··· পাত্রটির উপর দিয়ে একটা ধাতব সেতু চলে গেছে; এই সেতুটির পার্শ্বদ্বয় ছুরির মত তীক্ষ্ণ। মেয়েরা সেতুর উপর ডিম ভাঙে এবং পরে একটি পাত্রে ডিমের সারাংশ ফেলে দেয়। যখন দুটো ডিম ভাঙা হয়ে যায়, তখন মেয়েরা নিশ্চিত হবার জন্য তরল পদার্থ শুঁকে দেখে···যদি গন্ধের অভাবে বোঝা যায় যে ডিমটি টাটকা আছে, তবেই সেটাকে ৮০ কোয়ার্টের একটি বালতিতে রেখে দেওয়া হয়।

তার পর ডিমগুলোকে মিশ্রিত করে ছাঁকা এবং সংশোধন করা হয়; তখন মসৃণ হল্‌দে রঙের ডিমের তরল পদার্থকে দেখায় পুরু সরের মত। তখন এই তরল পদার্থকে অনবরত চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপে সংরক্ষিত একটা দাগহীন দশ হাজার পাউণ্ড পরিমাণের ইস্পাত-পাত্রে ঢালা হয়। এখান থেকে প্রতি বর্গইঞ্চিতে চার হাজার পাউণ্ড চাপে পাম্প করে এই তরল পদার্থকে পঁচিশ ফুট বিস্তৃত এবং পঞ্চাশ ফুট উচ্চ একটি বৃহৎ ধাতব শঙ্কাকৃতি পাত্রে নিয়ে যাওয়া হয়; যে নলটির মধ্য দিয়ে এই পদার্থ নিয়ে যাওয়া হয় তার ব্যাস এত কম যে একটি

পিন্‌ও তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। বিপরীত পার্শ্ব থেকে গরম বাতাস ঢোকানো হয়—ফলে তরলত্ব বাষ্পে পরিণত হয়ে ডিমের সারাংশ চূর্ণাকারে শঙ্কুর নীচে পড়ে।

খোলসের মধ্যে যখন ডিম থাকে সে তুলনায় এই আকৃতিতে ডিমের ওজন এবং আ াার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের সমান হয়ে যায়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে যে ৪৫০০০০০০ ডজন ডিম পাঠান হয়েছিল খোলসসহ তার ওজন হ'ত ৩২০০০ টন এবং এগুলো পাঠানোর জন্য পাঁচ-ছয়টি বড় আকারের মালবাহী জাহাজের প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু শুকনো আকারে এই ডিমেরই ওজন হয় মাত্র ৮২০০ টন। এতে জাহাজের স্থান বাঁচে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ। ব্রিটেনে ডিম এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্যানাডা টিনে রক্ষিত হেরিং এবং স্যালমন্ মাছও পাঠায়। এ বছর আমরা আমাদের এই দুই রকমের মাছের সবটাই পাঠাচ্ছি।

টিনে রক্ষিত হেরিং ক্যানাডার প্রায় নূতন ব্যবসায়। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে পশ্চিম উপকূলে মোট ২৩৪০০ টিন মাছ পাওয়া গেছিল। কিন্তু ১৯৪১ খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার জেলেরা ১০১৩৩২৯ টিন মাছ ধরেছিল। যুদ্ধ আরম্ভের পর থেকে আমাদের টিনে রক্ষিত হেরিং মৎস্য উৎপাদন এগারো গুণ বেড়ে গেছে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দে ব্রিটেন আমাদের কাছে ১৬০০০০০ টিন মাছ চেয়েছিল—সেখানে আমরা পাঠিয়েছিলাম মোট ১৫৬৫০০০ টিন।

টিনে রক্ষিত হেরিং-এর সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য-ব্যবসায় প্রত্যাশিত ১৭০০০০০ টিন স্যালমন্ মাছেরও দুই তৃতীয়াংশ ব্রিটেনে পাঠানোর ভার গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪১ খৃস্টাব্দে আমরা ২২৪৫০০০ টিন স্যালমন্ মাছ পেয়েছিলাম—এত স্যালমন্ কোন বছরে ধরা পড়েছিল বলে আমাদের জানা নেই এবং ব্রিটেন যা প্রত্যাশা করেছিল তার চেয়ে বেশীই সে পেয়েছিল।

সমুদ্রের দৌলতে ক্যানাডা আরেকটি বৃহৎ ব্যবসায়েরও সুযোগ পেয়েছে—ভিটামিন্‌কড—এবং হ্যালিবাট লিভার অয়েল উৎপাদন। বেশীর ভাগ কডলিভার অয়েলই পূর্ব উপকূলে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অর্থ-মূল্যের হিসাবে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলেই বড় ব্যবসায় চলছে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দে পশ্চিম উপকূলে ২৪০০০০০ পাউণ্ড ভিটামিন লিভার অয়েল উৎপন্ন হয়েছিল—তার মূল্য ১২৫০০০০ ডলার। এ ছাড়াও অন্য প্রকারের ব্যবসায়ের তৈল উৎপন্ন হয়। বেশীর ভাগ ভিটামিন অয়েলই ব্রিটেনে রপ্তানী করা হয়।

ক্যানাডার সর্বপ্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে শাক-সব্জি এবং ফলের চাহিদা কমে গেছে—বাজারের অবস্থাও অনিশ্চিত। জাহাজে স্থানাভাবের জন্য ব্রিটেন অনেক ফল ও শাকসব্জির আমদানী বন্ধ করে দিয়েছে এবং অনেক জিনিসের আমদানীও কমিয়ে দিয়েছে। এ সত্ত্বেও যুদ্ধের প্রথম দু বৎসরে ক্যানাডা ব্রিটেনে ১২০০০০০ ব্যারেল আপেল, কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত ৪৩০০০০ টিন আপেল, ৬০৮০০০ বুশেল শিম, ১৯০০০ টন টিনে রাখা টম্যাটো এবং সালফার ডায়োক্সাইডে রক্ষিত ১১০০ টন জাম পাঠিয়েছিল।

১৯৪২ খৃস্টাব্দে এই রপ্তানী কমে গেছে। ফল এবং শাক-সব্জি নিয়ে মুস্‌কিল এই যে এগুলো আকারে বড় এবং যথারীতি শীতলীকরণের বন্দোবস্ত না করতে পারলে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়। যদি এদের জলীয় ভাগ দূর করা যায় তবেই এ সমস্যার সমাধান হ'তে পারে।

কাঁচা অবস্থায় যে এক বস্তা আলুর ওজন হয় পঁচাত্তর পাউণ্ড, জলীয় অংশ দূর করতে পারলে সেই আলুরই ওজন হয় মাত্র বারো পাউণ্ড। জলীয় অংশ দূর করলে এক টন কপির ওজন হয় ১২০ পাউণ্ড এবং বারোটি পাঁচ গ্যালন মাপের পাত্রে তাদের আটানো যায়; প্রতিটি পাত্রের আকার এক ঘন ফুটের চেয়ে কম হয়।

সম্প্রতি শুকনো শাক-সব্জির উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা নির্ধারণের জন্য অনেক কাজ করা হয়েছে। কাঁচামালের মতই ভাল কয়েক শ' টন শুকনো আলু, গাজর, কপি এবং শালগম উৎপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও শুষ্কীকরণ এখনও তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি।

যুদ্ধে সাহায্যকারী খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ক্যানাডার কৃষকরা অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য বিষয়েও যুদ্ধকালীন

গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করেছে। এদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে শণ-বীজ এবং সয়া বীন্‌স্ (Soya beans—এক জাতীয় শিম) উৎপাদন; এ দুটি বস্তু থেকেই মূল্যবান্ তৈল উৎপন্ন হয়। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে সমগ্র ক্যানাডায় মাত্র ২০৪৪০০০ বুশেল শণ-বীজ উৎপন্ন হয়েছিল, ১৯৪১ খৃস্টাব্দে এর পরিমাণ হয়েছিল ৬৪১২০০০ বুশেল। শণ-বীজ চাষের জমিও আট গুণ বেড়ে গেছে—১৯৩৯এর ২৯৮০০০ একর থেকে ১৯৪২এ ২৫৩১৬০০ একরে দাঁড়িয়েছে।······ সূর্যমুখী বীজ থেকে তৈল উৎপাদনের জন্যও গবেষণা চালান হচ্ছে। সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ৩০০০০ পাউণ্ড বৃহৎ রুশ সূর্য্যমুখী বীজ কিনেছেন।

ক্যানাডার খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য-প্রেরণ প্রভৃতি কার্য ভালভাবেই সম্পন্ন হয়। চাষীরা আরও বেশী কৃতিত্বের দাবী করতে পারে এইজন্য যে তারা ক্ষীয়মাণ শ্রমিক সরবরাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করছে। কৃষিকার্যের প্রধান সমস্যা হচ্ছে শ্রমিকদের নিয়ে এবং এই সমস্যা যে আরও বেশী পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কৃষকরা এতে প্রতিহত হয় না। পল্লী অঞ্চলে কৃষক, তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা বিজয় লাভের জন্য কাজ করে।

—

দেশী পত্রিকা হইতে

তাপ

[দশম বর্ষের ৩৩শ সংখ্যার সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা থেকে সংগৃহীত]

মাত্র কিছুকাল হল তাপের সঠিক কারণ জানা গেছে। এর আগে তাপের সঠিক কারণ জানা সম্ভবপর হয় নি। পূর্বে আলোককে জড় পদার্থের ছটা বলে মনে করা হত। পঞ্চাশ বৎসর আগে আলোকের ন্যায় তাপকে জড়পদার্থ বলেই মনে করা হত। তাপকে তখন এই ভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল—"তাপ একটি সূক্ষ্ম দ্রব্য, বিশ্বব্যাপী বিক্ষিপ্ত এবং সর্বাপেক্ষা মন পদার্থকেও ভেদ করতে সমর্থ।" এই দ্রব্যের বিভিন্ন অংশকে মনে করা হত পরস্পরের প্রতি-নিবারক (repellent), অথচ বিভিন্ন দ্রব্যাদির অংশগুলির প্রতি আকর্ষক (attractive)—এইরূপে জড় পদার্থের সম্প্রসারণ এবং সঙ্কোচন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা হয়েছিল।

এখন তাপকে জানা গেছে শক্তির একটি প্রকারভেদ বলে। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের পরমাণু সকল (molecules) আবহমান কালের জন্য গতিশীল। এই গতি থেকে তাপের উৎপত্তি। পরমাণু সকল যত বেশী গতিশীল হবে দ্রব্য তত বেশী উত্তপ্ত হবে।

উপরোক্তরূপ তাপের ফলে দ্রব্যের রাসায়নিক (chemical) কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এ ছাড়া দহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে অগ্নি উৎপন্ন হয়। দহন ক্রিয়ায় দ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্তন হয়।

প্রায় সকল দ্রব্য থেকেই, বিশেষত নক্ষত্রের ন্যায় যে সকল পদার্থ বিকীরণ করে থাকে; এক বা অন্য উপায়ে তাপ পাওয়া যায়। নক্ষত্ররাশির মধ্যে সূর্যই আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়।

তিন উপায়ে তাপ উৎপন্ন হতে পারে—বল সম্বন্ধীয় কার্যের সাহায্যে (mechanical work), রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে (chemical action) এবং বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে (electricity)। প্রথমটির সাহায্যে ঘর্ষণ (friction) উৎপন্ন হয় এবং তাহা থেকে তাপের সৃষ্টি হয়। ঘর্ষণের সাহায্যে তরল পদার্থকেও উত্তপ্ত করা যায়। অতি সহজেই ইহা প্রমাণ করা যায়। একটি বোতলের মধ্যে যদি ঠাণ্ডা জল দ্রুত নাড়া যায়, তবে দেখা যাবে, এক মিনিটের মধ্যে জলের তাপ এক ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন কি যদি কোন শূন্যে (vacuum) দুইটি বরফের টুকরাকে ঘষা যায় তবে সেই ঘর্ষণের ফলে বরফকে গলাবার পক্ষে যথেষ্ট তাপ সৃষ্টি হবে। যখন আমরা একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি কোন খসখসে জায়গায় ঘর্ষণ করি, তখন সেই ঘর্ষণের ফলেই তাপ

উৎপন্ন হয় এবং সেই তাপ কাঠিটিকে প্রজ্জলিত করতে সাহায্য করে। যদি কাঠিটিকে কাঁচের ন্যায় কোন মসৃণ গাত্রে ঘষা যায়, তবে তার ফলে সামান্য ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়—সেই ঘর্ষণ এত সামান্য যে তার দ্বারা কাঠিটিকে প্রজ্জলিত করা কষ্টকর, হয়ত অসম্ভব। প্রথম উদাহরণে ঘর্ষণের ফলে দহন-ক্রিয়া সাধিত হয়—ইহা বোঝা যায় কাঠিটির আগুনটা লক্ষ্য করে। কিন্তু এস্থলে দহন-ক্রিয়ার পূর্বেই তাপের সৃষ্টি হয়েছিল।

অগ্নিউৎপাদনের প্রাচীন উপায়

প্রাচীন কালে মানুষ দুটি কাঠের অংশকে পরস্পর ঘর্ষণ করে সেই ঘর্ষণ থেকে অগ্নি উৎপন্ন করত। প্রথাটি ছিল এই যে একটি কাষ্ঠের তুরপুণকে একটি কঠিন কাষ্ঠের ভূমির উপর ঘর্ষণ করা হ'ত।

উপরোক্ত প্রথায় ঘর্ষণের শক্তিশালী বেগ, যে-বস্তুকে ঘর্ষিত করা হয়, তার সংযোগ বা সংলগ্নতার যে-শক্তি তাহা দ্বারা প্রতিহত হয় এবং এই প্রতিঘাত থেকে তাপের সৃষ্টি হয়। কাষ্ঠের অংশকে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদনের বহু পরে চকমকি পাথর এবং ইস্পাতে ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদনের প্রথা আবিষ্কৃত হয়। এই প্রথায় যে অগ্নি-কণা দেখা যায়, তাহা ধাতুদ্বারা বিচ্ছিন্ন চকমকি পাথরেরই অংশ—যার ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত হয়ে প্রজ্জলিত হয়ে থাকে। এই চকমকি পাথরের প্রজ্জলিত অংশ সকল পোড়া শোলা অথবা ঐরূপ সহজ দাহ্য বস্তুর উপর পতিত হয়, তৎপরে পাখা দ্বারা বাতাসের সাহায্যে অগ্নিশিখা উৎপন্ন করা হয়। সুপরিচিত 'সিগারেট লাইটারে'র মধ্যে এই প্রথার আধুনিক প্রয়োগ দেখা যায়। এ স্থলে চকমকির পোড়া শোলার পরিবর্ত্তে পাটের অসূক্ষ্ম ভাগ অথবা অপ্রয়োজনীয় তুলার অংশ ব্যবহার করা হয় এবং উহাকে দাহ করিবার জন্য 'পেট্রোল' অথবা 'বেনজাইন্' (Benzine) দ্বারা ভিজিয়ে রাখা হয়।

বহু শতাব্দী ধরে ব্রহ্মদেশ এবং বোর্ণিওর অধিবাসিগণ কর্তৃক এক কৌশলে অগ্নি উৎপন্ন করা হ'ত। এই কৌশলটি ছিল একটি অগ্নি-উৎপাদনকারী পিচকারি (syringe) অথবা অগ্নি প্রস্তুতকারী চাপদণ্ডের (piston) ব্যবহার। উপরোক্ত চাপদণ্ড অথবা পিচকারি দেখতে ছিল অনেকটা সাইকেলের পাম্পের মত। সাধারণত বাঁশ নির্মিত একটি গোলাকার বস্তুর মধ্যে একটি চাপদণ্ডকে অতি দ্রুত উপর থেকে নীচে চালনা করা হ'ত। এর ফলে গোলাকার বস্তু-(cylinder) মধ্যস্থ বাতাসের তাপ এরূপ বৃদ্ধি পেত যে তার সাহায্যে শুষ্ক শোলা জাতীয় পদার্থকে প্রজ্জলিত করা সম্ভবপর হ'ত। সাইকেলের পাম্পের যে দিক থেকে বাতাস নির্গত হয় সেই দিকে অঙ্গুলি রেখে পাম্পের চাপদণ্ডটি বারকতক উপর নীচে চালনা করে বোঝা যায় ভিতরের বাতাসের তাপ কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপর থেকে কোন বস্তু ভূমির উপর পড়লে অথবা দুইটি বস্তু ধাক্কা খেলে তাপ উৎপন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি একটি পেরেকের উপর দুই-তিন মিনিট ধরে হাতুড়ি পিটান যায় তবে পেরেকটি উত্তপ্ত হয়ে লাল বর্ণ হয়।

তাপ এবং সঙ্কোচন

সঙ্কোচনের ফলেও তাপ সৃষ্টি হ'তে পারে। যখন একটি ধাতুর পিণ্ডকে ঠাণ্ডা অবস্থায় পিষ্ট (cold rolled) করা হয়, তখন এত উত্তপ্ত হয় যে পেষণকারী যন্ত্রের দুইটি গোলকের মধ্যে যাবার সময় জল ফুটতে থাকে। (ঠাণ্ডা অবস্থায় পেষণ করতে হলে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ধাতু-পিণ্ডের উপর নলের সাহায্যে জল নিক্ষেপ করা হয়)।

অম্লজান এবং অঙ্গারের ন্যায় পদার্থের সংমিশ্রণে (combination) তাপ উৎপন্ন হতে পারে। অম্লজানের সঙ্গে কোনও পদার্থের রাসায়নিক সংমিশ্রণের ফলে প্রচণ্ডভাবে তাপ উৎপাদনের উপায়কে বলা হয় দহন-ক্রিয়া (combustion)। অম্লজান ভিন্ন অন্য কোন বায়বীয় পদার্থের সাহায্যে অনুরূপ তাপ উৎপাদনের উপায়কেও বলা হয় দহন-ক্রিয়া। অম্লজানের সাহায্যে দহন-ক্রিয়াকে আমরা অগ্নিকাণ্ড বলে থাকি—ইহা সাধারণ বাতাসেই সংসাধিত হয়।

প্যারাফিন্ (খনিজ তৈল বিশেষ), চুল্লীতে যে তৈল ব্যবহৃত হয় তা উদযান এবং অঙ্গারের যৌগিক পদার্থ (compound)। এই তৈল বাতাসের অম্লজানের সহিত সংমিশ্রিত হয়ে অগ্নির সৃষ্টি করে থাকে। যখন চুল্লীর পলিতাকে (wick) উত্তপ্ত করা হয়, তখন পলিতার উপর

উথিত তৈল বাষ্পাকার ধারণ করে। বাষ্পের একাংশ তখন জ্বলতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ বাতাসের অম্লজানের সহিত সংমিশ্রিত হয়ে থাকে এবং অঙ্গারাম্ল (carbondi-oxide) নামক বায়বীয় পদার্থ এবং জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। এই দহন-ক্রিয়ায় বাষ্পের অপরাংশের পরমাণুসকল উদযান পরমাণু (Hydrogen molecules) এবং অঙ্গার পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হয়। অগ্নিশিখার সাহায্যে ঐগুলি উত্তপ্ত হয় এবং ফলে অগ্নিশিখা থেকে তাপ এবং আলোক নির্গত হয়।

প্যারাফিন ব্যবহৃত বায়বীয় চুল্লী

এই চুল্লীতে কোন পলতে নাই, সঙ্কুচিত বায়ুর সাহায্যে তৈলকে অগ্নিশিখা পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়। একটি বদ্ধ আধারে প্যারাফিন লওয়া হয়। এই আধারে বায়ু প্রবেশ করবার একদিক আঁটা ঢাকনি (air valve) এবং নিষ্কাশন-যন্ত্র (pump) সংযুক্ত করা থাকে। চুল্লীর মাথায় একটি দাহবর্ধনী (burner) থাকে। এবং তার ঠিক নিম্নে একটি ছোট পাত্র থাকে। পাত্র হতে দাহবর্ধনী পর্যন্ত একটি অগ্নি-সাহায্যকারী নল (pilot light jet) আছে।

প্রথমে ছোট পাত্রে কিছু মেথিলেটেড স্পিরিট দ্বারা ঐটিকে প্রজ্জলিত করা হয়। স্পিরিট জ্বলে যাবার সময় সাহায্যকারী নল থেকে অগ্নিশিখা দেখা যায়। তখন বায়ু প্রবেশ-পথটি (air-valve) বন্ধ করে বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রটিকে কয়েকবার চালনা করা হয়।

দাহবর্ধনী সংযুক্ত নল বরাবর তৈল উঠে। ঐ স্থানের তাপ তৈলকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করে। ঐ বায়বীয় পদার্থ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়ে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বের হয় এবং প্রবল অগ্নিশিখা সমেত জ্বলতে থাকে। ফলে দাহবর্ধনকারী নল অধিকতর উত্তপ্ত হয় এবং যখন তৈল নল-বরাবর উঠতে থাকে তখন ঐটিকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করতে থাকে।

বিদ্যুৎ থেকেও তাপ উৎপন্ন হয়। জানা গেছে যে প্রাকৃতিক বিদ্যুৎ (lightning) গৃহ প্রজ্জলিত করে ধাতুর দণ্ড গলিয়েছে এবং বালুকাকে গলিয়ে এবং বালুকাকে তার অবস্থান্তর ঘটিয়েছে। অতি সূক্ষ্ম তারে মধ্য দিয়ে ঐ তারের বহন ক্ষমতার অতীত বিদ্যুৎ যদি সঞ্চালিত করা হয় যায়, তবে তারের পরমাণুগুলি অতি প্রবলভাবে চঞ্চল হয়ে ওঠে। তাপ উৎপন্ন হয় এবং তাপ এরূপ হতে পারে যার ফলে তারটি লোহিতাভা ধারণ করতে অথবা গলে যেতে পারে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ-ব্যবস্থার সহিত ফিউজ-বক্স থাকে। ইহা আর কিছুই নয়—উপরোক্ত অভিজ্ঞতার বাস্তব প্রয়োগ মাত্র। যদি কোনও কারণে বিদ্যুৎ মাত্রাপেক্ষা বেশী প্রবাহিত হতে থাকে, তখন আশঙ্কা অনেক। কিন্তু ঐ 'ফিউজ বক্স' থাকার জন্য আশঙ্কা দূরীভূত হয়। অধিক বিদ্যুৎ অপর কোন ক্ষতি না করে ফিউজ বক্সের তার গলিয়ে দেয় এবং বিদ্যুৎ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়; আর আশঙ্কার কোন কারণ থাকে না।

তাপ উৎপাদনের শেষ উপায়টি হচ্ছে শরীর বিষয়ক উপায় (Physiological source)। উদাহরণ পাওয়া যায় আমাদের শরীরে এবং উষ্ণ রক্তধারী (warm blooded) বা ঠাণ্ডা রক্তধারী (cold blooded) উভয় প্রকার প্রাণী সকলের শরীরে। উপরোক্ত উভয় প্রকারের প্রাণীই বেশ তাপ উৎপন্ন করে থাকে, কিন্তু শেষোক্তের তাপের ক্ষয়ের অনুপাত প্রথমোক্ত অপেক্ষা অনেক বেশী। অথবা অন্য প্রকারে বলতে গেলে প্রথমোক্ত প্রাণীদিগের তাপ প্রায় সমান থাকে—সামান্য ইতরবিশেষ হয়, কিন্তু শেষোক্ত প্রাণীদিগের তাপ সমান থাকে না—অধিক বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়ে থাকে। উপরোক্ত দুই প্রকার প্রাণীর মধ্যে এটাই আসল প্রভেদ।

(সুনীল মিত্র, এম্, এস্, সি)

—

রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

দেহের মৃত্যুরে ঢাকি' স্নিগ্ধ তব আত্মা যেথা রহিয়াছে জাগি,'
দেবতার আশীর্ব্বাদ বর্ষে সেথা অনিবার নিত্য তব লাগি'
তোমারি প্রযুক্ত শিরে। দেহ—সেতো তুচ্ছ অতি;
দেহাতীত তুমি।

যে-অমৃত সঞ্চারিলে সংসারের বিষতিক্ত কালসিন্ধু চুমি'
পঙ্কে ঢাকা ধূলিম্লান ধরণীর মাঝে,—সে চির অমৃত-স্নাত
তোমার জীবন। সত্তা তব নিত্যকাল সেথা রয়েছে জাগ্রত
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম জরামৃত্যুহীন। হে বিশ্ববরেণ্য কবি!
ধরিত্রীর মর্ম্মাকাশে অনন্তকালের তুমি,—তুমি দীপ্ত রবি।

মোদের ক্রন্দন শুধু তোমার বন্ধনহীন বাহুর আড়ালে
উঠিছে উচ্ছ্বসি' দিশাহারা।
জানি তুমি অন্তরের অন্তরালে

আজিও রয়েছ' বসি' প্রশান্ত বদনে; তবু মিথ্যা অশ্রুধারা
বলিতে পারো কি তবে বক্ষতল সিক্ত করি' বাধাবন্ধহারা
অঝোরে ঝরিছে কেন? দেহ কি সর্ব্বস্ব তবে? মিথ্যা
কথা সব;

তোমার আত্মার কাছে দেহ তব নত হয়ে' মানে পরাভব॥

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি

শ্রীশেফালিকা শেঠ

যে দেশে জন্মেছি মোরা তার চিত্র মাতৃরূপে ফুটেছিল তোমার নয়নে
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-ঢালা সঙ্গীত-নৈবেদ্য তাই স'পি দিলে তাঁহার চরণে।
উচ্ছলিত কলকণ্ঠে স্বর-সুরধুনি-ধারা আনি দিয়া নবীন জীবন,
মন্ত্রপূত নব ভাব ঝঙ্কারি মুখর ছন্দে প্লুত রসে করিল স্ফুরণ।
স্নিগ্ধ হাস্য বিতরণে তীব্র শ্লেষ কষাঘাতে বিদূরিয়া ভণ্ডতা ভঙ্গিমা
দুঃখ দৈন্য লজ্জা ক্লেশ ঘুচায়ে চেয়েছ শুধু মানবের আদিম গরিমা।
রচিয়াছ কল্পলোক অপরূপ বর্ণচিত্র উদ্ভাসিত তব তুলিকায়
ধরার ধূলির ধারে ব্যথিত আকুল প্রাণ ঊর্দ্ধ মুখে ধরা পানে চায়।
মেবারের গিরিশিরে লোহিত পতাকারাজি সঞ্চারিছে শৌর্য্য উন্মাদনা,
বিপদে অটল ধীর বীরেন্দ্র প্রতাপ করে চিতোরের উদ্ধার সাধনা,
দুর্গাদাস প্রভুভক্তি চাণক্যের কূটবুদ্ধি অন্বেষিছে রাজ্যশ্রী-সোপান
রত্ন-সিংহাসন ছাড়ি কারার আঁধারে কাঁদে স্নেহক্ষুধাতুর সাহাজান;
শান্ত সমাহিত চিতে ধরিয়া পৌরুষ বজ্র; ভীষ্ম মহামনা কালজয়ী
ললনা ললাম সীতা দহি দুঃখ-দাবদাহে অনবদ্য-দিব্য-দ্যুতিময়ী।
নির্ম্মম সংসার-ক্ষেত্র নন্দনের কান্তি ধরে সুনন্দা-রমণী-নেত্রপাতে,
দয়াপ্রীতি প্রেমসুধা সিঞ্চনে হৃদয়-কলি প্রস্ফুটিত স্বর্গীয় শোভাতে,
হেলেন নূরজাহান মানসী সরযূ রেবা নাজিরা দিলিরা জাহানারা
হেরেছ বৈচিত্র্যময়ী চিরন্তনী নারী-মূর্ত্তি হয়ে আর্ত্ত সুরবালাহারা।
মহাসিন্ধু পার হ'তে মন্দ্রিছে বন্দনা তব ভারতের পায়ে নমি শির।
নহি মোরা মেষদল মানুষ হইতে হবে বিশ্বমৈত্রী লক্ষ্য রবে স্থির।

চাকরীটা খেয়ে নিল 'কিউ'তে

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস্-সি.

নির্ভীক অতি ধীর ব্যোমকেশ বড়ালে
বোমা নয়—হেথা হতে 'কিউ'তেই সরালে।

বোমা আর 'সাইরেনে' 'ব্রেণ' হ'লে ত্যক্ত
কলকাতা ছেড়ে গেল বহু অনুরক্ত।
বাইরেতে যেথা যার আছে জ্ঞাতি মস্ত
পাঠাইল পরিবারে করি জোড়-হস্ত।
সম্পতি নেই যার সে-ও ঋণে জড়ায়ে
যেন-তেন-প্রকারেণ দিল সব সরায়ে।
আমরা চাকুরীজীবী—দুর্ভাগা কেরাণী!
যার কাছে যাব ভাবি সে-ই দেয় খেদানি।
ছেলেপুলে নিয়ে যবে হয়েছিনু ত্রস্ত,
হেরিলাম ব্যোমকেশে বরাভয়-হস্ত।
ব্যোমকেশ বলে, "দাদা, রেখে দাও ভাব্না!
কলকাতা ছেড়ে অই মূর্খেরা যাক্ না।
সেবারে যে হুজুগেতে মিছিমিছি ঘোরালে—
নাচব কি এবারেও ভুলে 'হাই মোর্যালে'?
তুমি দেখি একেবারে ইয়ে যেন বেশ্ ত!
যেখানেই যেতে চাও, আগে চাই রেস্ত।
আকাশ-কুসুম গাঁথ দিয়ে গায়ে কন্থা,—
চাকরী ব্যতীত বলো আছে কিবা পন্থা?
মার্চ্চেণ্ট আপিসের চাকরীটা ভরসা,
নচেৎ দেখিতে পাবে সব দিক ফর্সা।
আমি আছি যতদিন ভয় নেই কিচ্ছু—
জেনে রাখ': ব্যোমকেশ ছেলে নয় বিচ্ছু!"

আদর্শ 'মোর্যালে'র মূর্ত্ত সে প্রতীকে
দেখে-শুনে বুকে বল আনি কোন গতিকে।
'মোর্যালে'র জয়গানে চলি মোরা লাফিয়ে—
টিট্কারী দেই তারে গেছে যারা পালিয়ে।

মাস দুই বর্ষণ আছে বেশ বন্ধ।
খাঁটি কয় ব্যোমকেশ নেই তাতে সন্দ।
তার প্রতি ধীরে ধীরে বেড়ে গেল শ্রদ্ধা,—
হঠাৎ আজিকে গলে কেবা দিল রদ্দা!

আপিসে আসিতেছিনু ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ধরিয়া,
সহসা ছ্যাক্‌রা গাড়ী গেল চোখে পড়িয়া;
ডাক দিল ব্যোমকেশ গলাখানি বাড়ায়ে—
চকিতে স্থাণুর মত গেনু সেথা দাঁড়ায়ে।
ব্যোমকেশ বলে, "ভাই, হই বরখাস্ত—
সাহেব করিতে নারে আর বরদাস্ত।
প্রত্যহ সকালেতে হয় 'রো'-এ দাঁড়াতে,
জেনে-শুনে 'লেট-মার্ক' হয় তাই বাড়াতে।
আমাদের 'গ্রেণ-শপ্' 'ফার্ম' বৈ নয় ত,
দুপুরে চালের 'কিউ' ধরতেই হয় ত।
প্রত্যহ 'কিউ' ধরি চাল-চিনি-কয়লা—
সাহেবের নোটিশেতে আনে মধু গয়লা
হাতে-নাতে ডিস্মিস্। চলি 'ডু. .ভউ'তে।
অবশেষে চাকরীটা খেয়ে নিল 'কিউ'তে।"

অজানার হাতছানি

শ্রীঅমিয় বসু (কাশফুল)

আর রইতে নারি ঘরে
উদাস করা সুরের হাওয়া
ডাক দিয়েছে মোরে।
নূতন গাছে নূতন শাখী
নূতন সুরে গাহে যে পাখী
সে-সুর শুনে রইতে নারি
প্রাণ যে আকুল করে॥

ফুটিয়াছে ফুল কুঞ্জবনে
গন্ধে মোদিত হিয়া—
গাহিছে কোয়েলা কুহুতানে
নাচিছে পাপিয়া
কৃষ্ণচূড়ার রাখী বাঁধি
পলাশ বঁধু মেলি আঁখি
মোরে, অবিরত—হাতছানিতে ডাকছে বারে বারে॥

পুস্তক-পরিচয়

সঙ্কেত ও অন্যান্য গল্প—সোমেন চন্দ। প্রকাশক: প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা। দাম দেড় টাকা।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক সোমেন চন্দ ঢাকার সুপরিচিত শ্রমিক-কর্মী ছিলেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা ছুরিকাহত হ'য়ে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন; মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল মাত্র বাইশ বৎসর। তাঁর এই স্বল্প-পরিসর কর্মময় জীবনের মধ্যে বাংলা সাহিত্য একটা বিশেষ স্থান দখল ক'রে ছিল। রাজনৈতিক জীবনের অবসর-মুহূর্তগুলো তিনি বৃথা ব্যয় না ক'রে, মাতৃভাষার সাহিত্য-চর্চা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কয়েকটি ছোটগল্প বিভিন্ন বাংলা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর ইচ্ছা থাকলেও তিনি তাঁর ছোট গল্পগুলো সংগ্রহ ক'রে কোন গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে যেতে পারেন নি। তাঁর কয়েকজন গুণগ্রাহী বন্ধুর প্রচেষ্টায় তাঁর অকালমৃত্যুর পরে বর্তমান গল্প-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর সেই অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে—তবে তিনি সেটা দেখে যেতে পারেন নি' এই যা দুঃখ।

সোমেন চন্দ-র বর্তমান গল্পগ্রন্থখানি প'ড়ে বোঝা যায় যে বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর যেমন স্বাভাবিক নিষ্ঠা ও মমত্ব-বোধ ছিল—তেমনি তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতাও ছিল। বেঁচে থাকলে তিনি হয়ত একদিন বড় লেখক হ'তে পারতেন। তাই সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর মৃত্যুকে শোকাবহ বলতেই হয়। কিন্তু অকালে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হবার ফলে এবং তাঁর পিছনে একটি রাজনৈতিক দল থাকাতে ইতিমধ্যেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য নিয়ে এত বেশী হৈ-চৈ হয়ে গেছে যে তাঁর গল্পের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করা কঠিন হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকেও পর্যন্ত এত বেশী প্রশংসা করা হয়েছে যে সমালোচনার চেয়ে তার মধ্যে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দরদই ফুটে উঠেছে বেশী।

খাঁটি সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায় যে সোমেন চন্দ-র মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল, তবে সেই ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আর দশজন সাহিত্য-যশপ্রার্থীর মতই তিনি রোমান্টিক মন এবং স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গল্প লিখতে সুরু করেছিলেন; তবে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গল্প-রচনা-পদ্ধতিরও ক্রম-বিবর্তন হচ্ছিল। এই ক্রমবিবর্তনেরই শ্রেষ্ঠ বিকাশ আমরা দেখি সোমেন চন্দর শ্রেষ্ঠ গল্প 'ইন্দুর'এ। তাঁর স্বল্পায়তন জীবনে এই ক্রম-বিবর্তনের সময়টা খুব সামান্য—কিন্তু ধারাটি সুস্পষ্ট। বর্তমান গল্প-গ্রন্থে 'রাত্রিশেষ', 'স্বপ্ন', 'একটি রাত', 'সঙ্কেত', 'দাংগা' এবং 'ইঁদুর' নামে যে ছয়টি গল্প স্থান পেয়েছে—তাদের মধ্যে এই ক্রমপরিবর্তনের ধারাটি এলিয়ে আছে। প্রথমোক্ত গল্প তিনটি একটি তরুণ রোমান্টিক মনের সৃষ্টি—ভাব ও ভাষার অস্পষ্টতা এবং রহস্যময়তায় এ গল্প কয়টি সমাচ্ছন্ন। স্বদেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকদের প্রভাবও এগুলোর মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু 'সংকেতে'ই সোমেন চন্দ-র প্রথম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনাশীল মন সমাজের ভাঙনধরা রূপটির সন্ধান পেয়েছে—শুধু তাই নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার পরিধিও অনেক বিস্তৃত হয়েছে এবং তিনি সমাজের ভবিষ্যৎ রূপও অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছেন। তবু তাঁর 'সংকেত' ও 'দাঙ্গা' নামক গল্প দুটি প্রকৃত শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে নি। গল্প বলা এবং চরিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনের থেকে তাঁর বাণী দেবার স্পৃহাটাই কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ফলে গল্প দুটি রস-ঘন হয়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। মনের উপর বিশেষ কোন ছাপ তারা রাখতে পারে না। এদিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর ''ইঁদুর' গল্পটিকে সার্থক রচনা বলা যেতে পারে। ইঁদুরের রূপকের মধ্য দিয়ে লেখক যে আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের ভাঙন-ধরা অথচ স্বয়ং সন্তুষ্ট রূপটি এঁকেছেন তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। চরিত্র-সৃষ্টিতেও তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের ফাঁপা অস্তিত্বের ভিত্তিতে যে ধ্বংসকারী ইঁদুর লেগেছে—এই

গল্পটির সেইটাই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এই প্রতিপাদ্যটিকে লেখক নিপুণ শিল্প-নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্প বলার এলোমেলো শিথিল ভঙ্গীটি প্রতিপাদ্যের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। 'বর্তমান গ্রন্থের মুদ্রণ-পারিপাট্য ও অঙ্গ-সজ্জা প্রশংসনীয়।

গোপাল ভৌমিক

কালপুরুষের সাত-পাঁচ—শ্রীসুবোধ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প-লেখক হিসাবে সুবোধবাবু বিশিষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। কথা সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছি, তাতে তাঁর মহত্তর ও নবতর দৃষ্টির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু সুবোধবাবুর কৃতিত্ব যে কেবল ছোট গল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও যে তিনি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারেন, তার প্রমাণ আমরা আলোচ্য গ্রন্থখানার মধ্যে পেয়েছি।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'কালপুরুষ' এই ছদ্মনামে আনন্দ বাজার পত্রিকার "রবিবাসরীয় আলোচনা"তে তাঁর অনেকগুলো লেখা প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের অধিকাংশ রচনা তা থেকে সংগ্রহ করা। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি লেখাও তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। 'রবিবাসরীয় আলোচনা'তে যখন লেখাগুলো প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই সেগুলো পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সংপ্রশংস অভিনন্দনেই সেগুলিকে তাঁরা অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন। কাজেই গ্রন্থাকারে বদ্ধ হয়েও রচনাগুলো অনুরূপ বা অধিকতর সমাদর লাভ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কারণ বিচ্ছিন্নভাবে তারা যে রস পরিবেশন করেছে, ফুল ও ফুলের মালার আবেদন ভেদের মত একত্রে গ্রথিত এই রচনাগুলো নূতনতর রসের আস্বাদন দেবে বলে আমরা মনে করি।

যাঁরা পত্রিকায় প্রকাশ কালে লেখাগুলো পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরা এর প্রকৃতি ও পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু যাঁদের সে সুযোগ হয় নি তাঁদের কাছে দু-একটা কথা বলা দরকার।

ভারিক্কি চাল আর বিষয়ের গাম্ভীর্য্য মিলে প্রবন্ধ বা নিবন্ধকে এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে প্রায় নিষিদ্ধ বস্তুর মত পরিহার্য্য ক'রে তোলে। পারতপক্ষে তারা এর গা ঘেঁষে চলতে চান না। এ শ্রেণীর পাঠকের সংখ্যা যে খুব কম নয়, তা যাঁরা পাঠকদের রুচি-বৈচিত্র্যের খোঁজ-খবর রাখেন তাঁরাই জানেন। কতকটা এদের কাছে বক্তব্যকে পৌছানোর জন্যও বটে, তা ছাড়া আঙ্গিকের বৈচিত্র্য ও রস-পরিবেশনে নূতনত্ব সম্পাদনের জন্যও বটে সব দেশের সাহিত্যিকেরাই প্রবন্ধ বা নিবন্ধনে নতুন নতুন সাজ পরিয়ে, পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেন। বাংলা সাহিত্যে নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত', রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত', শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলের হালখাতা', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতির। এ সব ক্ষেত্রে লেখার চালটা হালকা, কিন্তু বক্তব্যের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ বরং শিল্পীর হাতের সযত্ন মার্জ্জনে অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোগ্রাহী।

সুবোধ বাবুও তাঁর বক্তব্যকে এইরূপ আকর্ষণীয় পরিচ্ছেদে ভূষিত করে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন।...তাঁর এই রচনা-গুলি ইতিপূর্ব্বেই যে সমাদর লাভ করেছে, তা থেকেই বোঝা যায় তার প্রয়াস অনর্থক হয় নি। অবশ্য একথা আমরা বলছি না যে তাঁর সবগুলি লেখাই পরিপূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এদের অনেকগুলিই যে রসবিচারী পাঠককেও তৃপ্তি দেবে সে কথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি শিকারে কারসাজি, মধুমালার দেশ, হে মোর দুর্ভাগা দেশ, মরণকে লাগি, নাহি চাহি সে অরণ্য, অতিরঞ্জন, মৃত্যুং তীর্ত্বা, ৩রা মার্চ্চ প্রভৃতি লেখার। বইখানার 'সাত-পাঁচ' নাম থেকেই প্রকাশ যে, লেখকের বিষয় নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র ব্যাপক ও বিচিত্র। প্রত্নবিদ্যা, জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, খেলাধূলা, ইতিহাস, তক্ষণশিল্প, পূর্ত্তবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান রূপকথা প্রভৃতি এত বিষয় তাঁর আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে যে তার উল্লেখ করতে গেলে, সে ফিরিস্তি ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে। সমস্ত বিষয়ের আলোচনাতেই সুবোধ বাবু, সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানী মনের পরিচয়, সুস্পষ্ট। সুনিপুন শব্দ নির্ব্বাচন,

ছন্দোময় ভাষা ও ভাব-বিন্যাস-বৈচিত্র্য লেখকের বক্তব্যকে এত মনোজ্ঞ ও রসগাঢ় করে তুলেছে যে অনেক জানা কথাও তাঁর লেখার গুণে নূতনতর রসতৃপ্তি দান করে। অনেক গুরুতত্ত্বও রসসাহিত্যের সরসতায় ভূয়িষ্ঠ হয়ে উঠছে। তাঁর লেখা থেকে অনেক স্থানই উদ্ধৃত করে দেখাবার লোভ হয়। কিন্তু স্থানাভাবের জন্যে এবং পাঠক সমগ্র বইখানা পড়ে রসাস্বাদন করবেন এই আশা করে আমরা তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়েই ক্ষান্ত হলাম।

উপসংহারে একটি কথা বলা দরকার। তা হল এই যে, এত বিচিত্র ও ব্যাপক বিষয়ের আলোচনাতে কোথাও কোথাও লেখকের সঙ্গে পাঠকদের মতপার্থক্য হওয়া আশ্চর্য্য নয়। আমাদেরও দু' এক বিষয়ে তেমন মতভেদ না আছে তা নয়। কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টিতে মতভেদটাই বড় কথা নয়। লেখকের সৃষ্টির আবেদন যদি পাঠকের রসগ্রাহী চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে তবেই তাঁর সৃষ্টি সার্থক হয়েছে বলতে হবে এবং যে দিক দিয়ে দেখলে সুবোধ বাবুর এ বইয়ের অনেক লেখারই সার্থকতার দাবী অনুপেক্ষনীয়।

শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল

লালচীন—(ভ্রমণ) ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। প্রকাশক শ্রীমাধবেন্দ্র মিত্র, ১৫৬, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

চীনদেশের যে-অঞ্চলে চীনা কম্যুনিষ্টরা সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই অঞ্চলে রামনাথ বাবুর ভ্রমণ-কাহিনী এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। তিনি যখন ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন তখনও সকল স্থানে সোভিয়েট গড়া শেষ হয় নাই—কোথাও সোভিয়েট গড়া শেষ হইয়াছে, কোথাও গঠনের কাজ চলিতেছে, কোথাও বা চলিতেছে গঠনের আয়োজন। সোভিয়েট গঠনের কাজ কি ভাবে চলে যাঁহারা জানিতে চান 'লাল চীন' তাঁহাদের কাছে খুব চিত্তাকর্ষক হইবে, যাঁহাদের সোভিয়েট-ভীতি আছে তাঁহাদিগকেও আমরা বইখানা পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

শুধু ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হিসাবেই নয়, চীনে কম্যুনিষ্ট এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি, জাপান কি উদ্দেশ্যে চীন আক্রমণ করিয়াছে, জাপ অধিকৃত চীনে জাপানী শাসনের নমুনা, আধুনিক সামরিক শক্তিতে শক্তিমান জাপানকে কোন্ শক্তি বলে চীন দীর্ঘদিন ধরিয়া রুখিয়া আসিতেছে তাহাও 'লাল চীনে' সহজ ও সরল ভাষায় আলোচিত হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের ধনতান্ত্রিক শোষণের আগুনে পুড়িয়া চীনের নবজন্মের কাহিনীর মধ্যেই চীনের তথাকথিত শাশ্বত সমস্যার (The eternal Chinese question) প্রকৃত স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। চীনের রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-রীতি ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিচয়ের মধ্য দিয়া রামনাথবাবু তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ অনাড়ম্বর ভাষায় তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহা কোন সাম্রাজ্যবাদী প্রচার পুস্তকের চর্ব্বিত চর্ব্বন নয়। 'লাল চীনে'র পর্য্যটকরূপে তিনি যাহা দেখিয়াছেন, যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। 'লাল চীনে'র যে বহুল প্রচার হইবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বিবিধ প্রসঙ্গ

হক সাহেবের অভিযোগ

পদত্যাগ-রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া গত ৫ই জুলাই সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেব যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বাংলার গবর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্টের বিরুদ্ধে কতগুলি অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই অভিযোগগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, বাংলার রাজনৈতিক দল বিশেষ অর্থাৎ মুসলিম লীগের পক্ষ সমর্থনের অভিযোগ। দ্বিতীয়তঃ ভূতপূর্ব মন্ত্রি-সভার প্রতি গবর্ণর যে শুধু সহানুভূতিহীন ছিলেন তাহা নহে, অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে মন্ত্রিসভার বিরোধী হইয়াছিলেন। হক সাহেবের দীর্ঘ বিবৃতিতে অস্পষ্টতা কোথাও নাই,—তাঁহার বিবৃতিকে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করিবারও কোন প্রয়োজন হয় না। সকলেই এই বিবৃতি যে মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ আমাদের নাই। আমরা শুধু তাঁহার বিবৃতির কয়েকটি বিষয় মোটামুটি আলোচনা করিব।

১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে হক সাহেবের প্রধান মন্ত্রিত্বে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রিসভা গঠনের প্রাক্কাল হইতে মুসলিম লীগের পক্ষ সমর্থন সম্পর্কিত অবস্থা-ঘটিত প্রমাণ হক সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে উপস্থিত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, হক সাহেব কৃষক-প্রজা দলের মনোনীত প্রার্থীরূপে লীগদলের মনোনীত প্রার্থী খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের পরে লীগ দল সাদরে তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিল। কিন্তু হক সাহেব লীগ দলের নীতি ও মনোবৃত্তির সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইতে সক্ষম হন নাই বলিয়া লীগ দল তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিবার সুযোগ খুঁজিতে ছিল। সেই সুযোগ কি ভাবে আসিয়াছিল তাহাও সকলে জানেন। সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। হক সাহেব তখন প্রধান মন্ত্রী, অথচ তাঁহার অজ্ঞাতসারেই ছয় জন মন্ত্রী একসঙ্গে পদত্যাগ করেন। তার পর আরও দুইজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিবার পর গবর্ণরের অনুরোধে হক সাহেবও পদত্যাগ করিলেন। তার পর আসিল নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পালা। হক সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, পরিষদের ১৩৭ জন সদস্য তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া গবর্ণরের নিকট পত্র দেওয়ার পরেও নূতন মন্ত্রিসভা গঠনে কয়েক দিন বিলম্ব হইয়াছিল। এই বিলম্বের কারণ সম্বন্ধে হক সাহেবের বক্তব্য এই যে, প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার মত মন্ত্রিসভা গঠনে অনুমতি দিতে গবর্ণর অনেক দ্বিধা করিয়াছেন এবং খাজা স্যার নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দিবার জন্যও বিলম্ব করিয়াছেন।

১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে হক সাহেব তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতে এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। গবর্ণর প্রথমতঃ বাজেট সেসন শেষ হওয়ার পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু করিতে অস্বীকৃত হন। বাজেট নির্ব্বিঘ্নে পাশ হওয়ার পর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের কথা উঠিলেই গবর্ণর একটা না-একটা আপত্তি উত্থাপন করিতেন, স্যার নাজিমুদ্দিন এবং তাঁহার কয়েকজন সহযোগীকে মন্ত্রিসভায় নেওয়ার কথা বলিতেন। এবং কখনও কখনও এমন কথাও তিনি বলিয়াছেন যে, মুসলিম লীগ তাহাদের মনোভাব স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা না করিলে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হইতে পারে না। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় মোট নয় জন মন্ত্রী ছিলেন, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ছিলেন মাত্র একজন। কিন্তু নূতন মন্ত্রিসভায় তের জন

মন্ত্রী এবং তের জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী। হক সাহেব বলিয়াছেন, নূতন মন্ত্রিসভা এবং পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বাবত অতিরিক্ত ব্যয় হইবে দুই লক্ষ টাকা। এখানে লোকের মনে স্বতঃ এই প্রশ্ন উঠিবে, হক সাহেব এবং স্যার নাজিমুদ্দিনের প্রতি এই ব্যবহার-বৈষম্যের কারণ কি?

নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও স্যার নাজিমুদ্দিনকে গবর্ণর সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করার কথা হক সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন। হক সাহেবকে অপসারিত না করিলে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে পারে না। কিরূপ অবস্থায় তিনি পদত্যাগ-পত্র দস্তখত করিতে বাধ্য হইলেন, তাহা বিস্তৃতভাবেই তিনি বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে হক সাহেবের অভিযোগ এই যে, (১) তাঁহার সমস্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া পদত্যাগ দাবী করা হয়, (২) একখানা টাইপ করা পদত্যাগ-পত্র দস্তখতের জন্য তাঁহার সম্মুখে ধরা হয়, (৩) সর্ব্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের কার্য্য অত্যাবশ্যক না হইলে পদত্যাগ পত্র অকার্য্যকর থাকিবার আশ্বাস দেওয়া হয় এবং (৪) স্বাক্ষর করিবার দুই ঘণ্টা পরেই পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হয়। স্যার নাজিমুদ্দিনকে মন্ত্রিসভা গঠনে সাহায্য করা সম্পর্কে হক সাহেব বলিয়াছেন, "স্যার জন হার্কার্ট মন্ত্রিসভা গঠনে স্যার নাজিমুদ্দিনকে শুধু সর্ব্বপ্রকারে সাহায্যই করেন নাই এবং অনেক অকরণীয়ও করিতে দিয়াছেন।" স্যার নাজিমুদ্দিনের সহকর্ম্মী সংগ্রহের জন্য গবর্ণর নিজেই উৎসাহভরে মাতিয়া উঠার অভিযোগও হক সাহেব করিয়াছেন।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনে মন্ত্রীদের ক্ষমতা কতটুকু তাহা ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন-আইন যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। এই সামান্য ক্ষমতা হইতেও হক মন্ত্রিসভা কি ভাবে বঞ্চিত হইয়াছিলেন হক সাহেবের দ্বিতীয় দফার অভিযোগগুলিতে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। অভিযোগগুলি মোটামুটি ভাবে এই :

(১) ভারত-শাসন আইনে যে সকল ব্যাপার মন্ত্রিদের ক্ষমতার অন্তর্গত সে সব ক্ষেত্রেও গবর্ণর মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা না করিয়াই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন। মিঃ ম্যাক ইনেসকে চাউল কণ্ট্রোলিং অফিসার নিয়োগ উহার একটি দৃষ্টান্ত।

(২) সেক্রেটারীরা মন্ত্রীদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিজের দায়িত্বে অথবা গবর্ণরের পরোক্ষ বা অপরোক্ষ অনুমোদনে অনেক আদেশ দিয়াছেন।

(৩) চাউল স্থানান্তরিত করা, নৌকা অপসারণ, হোম-গার্ড গঠন ব্যাপারে মন্ত্রীদিগকে উপেক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া হক সাহেব অভিযোগ করিয়াছেন। ১৯৪২ সনের ২রা আগষ্ট তারিখে গবর্ণরের নিকট লিখিত পত্রে হক সাহেব লিখিয়াছিলেন "আপনি এমন ভাবে কাজ করিয়াছেন যেন ভারত-শাসন আইন বাংলা দেশে স্থগিত রহিয়াছে।"

(৪) গবর্ণর নিজে কতকগুলি বিষয়ে হক সাহেবের কার্য্যে বাধাদান করিয়াছেন। কোন অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ফেণীতে যাইতে চাহিলে গবর্ণর আপত্তি করেন।

(৫) ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে গুলী চালনা, এবং মেদিনীপুরে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য হক সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। পাইকারী জরিমানার ব্যাপারে হক সাহেবের প্রতিবাদ অনেক ক্ষেত্রে অরণ্যরোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

(৬) মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা উপেক্ষা করিতে গবর্ণর এক শ্রেণীর স্থায়ী কর্ম্মচারীদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

হক সাহেব তাঁহার বিবৃতিতে বাংলার গবর্ণর স্যার জন হার্কার্টের বিরুদ্ধে যে-সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুতর। উহার যে-কোন একটি একাই ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন আইন দ্বারা প্রবর্ত্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন বিলোপ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। হক সাহেবের বিবৃতি হইতে ইহাই বোঝা যায়, তাঁহার মন্ত্রিত্বের পনর মাসের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের কোন অস্তিত্বই ছিল না। প্রাদেশিক গবর্ণরের হাতেই শাসনতন্ত্রের বিলোপের অভিযোগের মত গুরুতর অভিযোগ আর কিছু হইতে পারে না। নরমপন্থী 'পাইওনীয়ার' পত্রিকা পর্য্যন্ত বলিয়াছেন :

"১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত এরূপ গুরুতর অভিযোগ কোন গবর্ণরের বিরুদ্ধেই উত্থাপিত হয় নাই।...আমরা মনে

করি, বাংলা তথা সমগ্র ভারতের অধিবাসীরাই স্যার জন হার্বার্টের বক্তব্য শুনিবার দাবী করিতে পারে। তিনি যে কোন উপায়ে প্রত্যুত্তর দিতে পারেন,—ইস্তাহার প্রচার করিতে পারেন কিংবা আইনসভার যুক্ত-বৈঠকে বক্তৃতাও করিতে পারেন। এই সুস্পষ্ট অভিযোগের দায় হইতে মুক্তিলাভ করা স্যার জন হার্বার্টের যেমন নিজের প্রতি, তেমনি জনসাধারণের প্রতি—ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি কর্ত্তব্য পালনেরই সামিল।"

কিন্তু বাংলার গবর্ণর এ পর্য্যন্ত কোনটাই করেন নাই। সুতরাং হক সাহেবের কথিত মত জনসাধারণ যদি এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে নিজেরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে তাহাদিগকে কেহই দোষ দিতে পারিবে না। হক সাহেব বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের নিকটই এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। আইন সভার আবেদনে গবর্ণরকে অপসৃত করিবার দৃষ্টান্ত অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ-আফ্রিকায় আছে। ভারতের অবস্থা অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তথাপি পরিষদেরও এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য আছে। পরিষদ যদি এই কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিবার গুরুতর দায়িত্বের সম্মুখীন অবশ্যই তাঁহাদিগকে হইতে হইবে।

—

বিবৃতিতে বিরোধিতা

হক সাহেব এবং তাঁহার অপর সহকর্ম্মীদের পদত্যাগের কারণ বিবৃত করিবার সুযোগ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট পরিষদের কর্ম্মসূচীতে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। অধিবেশনের প্রথম দিনে হক সাহেব এবং তাঁহার তিন জন সহকর্ম্মী বিবৃতি দিবার জন্য স্পীকারের অনুমতি প্রার্থনা করিলে প্রধানমন্ত্রী স্যার নাজিমুদ্দিন তাহাতে আপত্তি করেন। একজন মন্ত্রী পদত্যাগ করিলেই শুধু তিনি বিবৃতি দিতে পারেন সমগ্র মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে তাঁহারা পদত্যাগের কারণ বর্ণনা করিয়া কোন বিবৃতি দিতে পারেন না। স্যার নাজিমুদ্দিনের সমর্থনে এস্কুইথ, লয়েড জর্জ্জ, রামজ্যা ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদদের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারিত হইয়াছে। ইউরোপীয় দলের সেক্রেটারী মিঃ এফ, ষ্টার্ক বলেন, কোন মন্ত্রিসভা সমগ্র ভাবে পদত্যাগ করিলে পদত্যাগকারী কোন মন্ত্রীর ঐ সম্পর্কে বিবৃতি দিবার কোন পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত বিলাতের পার্লামেণ্টারী নিয়মকানুনে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, আইন সভার আস্থাভাজন থাকা সত্ত্বেও কোন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করার পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত মে-প্রণীত পার্লামেণ্টারী রীতিনীতি-সংক্রান্ত পুস্তকে পাওয়া যায় না, কারণ এখানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে ইংলণ্ডে তাহা কখনও ঘটে নাই। আশ্চর্য্য এই যে, বিলাতে যাহা কখনও ঘটে নাই—ঘটিতে পারে না, বাংলায় তাহাই ঘটিয়াছে, অথচ আপত্তি করিবার সময় নজীর টানিয়া আনা হইবে বিলাত হইতে। তবে বিলাতী নজীর টানিয়া বিবৃতি দানের বিরোধিতা করিবার কারণ হক সাহেবের বিবৃতি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলী এস্কুইথ, লয়েড জর্জ্জ, রামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি খ্যাতনামা বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ এবং বিলাতের পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির নজীরে ভড়কাইয়া যান নাই—সমগ্র বিষয়টি ধীর ভাবে তিনি বিবেচনা করিয়াছেন। রুলিং প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বৃটিশ পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিবর্ত্তিত করা ব্যতীত পার্লামেণ্ট অন্য সব কিছুই করিতে পারে। কিন্তু বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে,গবর্ণরের খুসী ছাড়া এই পরিষদ কিছুই করিতে পারে না। বৃটেনে যে কার্য্য ধারণাও করা যায় না, বাংলায় তাহা স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে অনুষ্ঠিত ও চালু হইয়া থাকে। সুতরাং জগতের অপর স্থানের পার্লামেণ্টগুলির দৃষ্টান্ত হইতে এ দেশের আইনকর্ত্তাগণ যেমন উপকৃত হইতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিবেন, তেমনি তাঁহারা যাহাতে ভ্রান্ত উপমাদ্বারা বিভ্রান্ত না হন, তাহাও দেখিতে হইবে।'

হক সাহেবকে বিবৃতি দিতে অনুমতি না দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ স্পীকার দেখিতে পান নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার পদত্যাগের অবস্থাটা অস্বাভাবিক এবং রহস্যাবৃত, পদত্যাগের তারিখ সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। এই সকল

কারণে স্পীকার হক সাহেব এবং তাঁহার সহকর্মী-দিগকে তাঁহাদের পদত্যাগ সম্বন্ধে বিবৃতি দিতে অনুমতি প্রদান করেন। তাঁহার যুক্তি স্বচ্ছ এবং বলিষ্ঠ; সুতরাং কোন মন্তব্য অনাবশ্যক।

—

বাজেট সম্পর্কে স্পীকারের রুলিং

গত ৬ই জুলাই মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধী দল কর্তৃক বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। উক্ত বৈধতার প্রশ্ন সম্বন্ধে স্পীকার সৈয়দ নৌশের আলী ৭ই জুলাই বুধবার এই মর্ম্মে রুলিং প্রদান করেন যে, বাজেট আংশিক ভাবে পরিষদের একাধিক অধিবেশনে বিবেচিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহার গভীর সন্দেহ আছে। কিন্তু ১৯৪৩ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে-সময়ে ৯৩ ধারা অনুসারে প্রদেশের শাসনভার গবর্ণরের হস্তে অর্পিত ছিল ঐ সময়ে বাজেট-সংক্রান্ত প্রস্তাবিত ব্যয়-বরাদ্দের বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে তাহার বিন্দুমাত্র আভাষ না থাকায় বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাবগুলি আইনসঙ্গত নহে এবং ঐগুলি বিধিবহির্ভূত। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের এই বর্ষা-কালীন সংক্ষিপ্ত অধিবেশন বিশেষভাবে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দগুলি মঞ্জুর করাইয়া লইবার জন্যই আহূত হইয়াছিল। সুতরাং স্পীকারের এই রুলিং-এর গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দ্বারা আইন ও পরিষদের মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষিত হইল তাহা আলোচনা করিতে হইলে, বাজেট সম্পর্কে ভারত শাসন আইনের বিধানসমূহ এবং কিরূপ অবস্থায় বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি উপস্থিত করিবার প্রয়োজনীয়তা উদ্ভূত হইয়াছে তাহাও মোটামুটিভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৪৩-৪৪ সনের বাৎসরিক বাজেট (annual financial statement) গত ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থাপিত হয়। ২৮শে মার্চ্চ হকসাহেব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় ২৯শে মার্চ্চ স্পীকার পরিষদের অধিবেশন ১৫ দিনের জন্য মুলতুবী রাখেন। অধিবেশন মুলতুবী রাখার পূর্ব্বে বাজেট ব্যয়-বরাদ্দর কতকগুলি দফা পরিষদের মঞ্জুরী লাভ করে, কিন্তু অবশিষ্ট দফাগুলি মঞ্জুরী লাভের পূর্ব্বেই সাময়িক ভাবে অধিবেশন স্থগিত থাকে। অতঃপর ৩১শে মার্চ্চ ৯৩ ধারা অনুসারে গবর্ণর প্রদেশের শাসন ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের মঞ্জুরী-কৃত ব্যয়-বরাদ্দসহ সমস্ত ব্যয়-বরাদ্দ বিশেষ ক্ষমতা বলে মঞ্জুর করেন। গত ২৪শে এপ্রিল বর্ত্তমান নাজীম-মন্ত্রি সভা গঠিত হয় এবং গবর্ণর ৯৩ ধারার ঘোষণা প্রত্যাহার করিয়া পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আদেশ দেন। বিগত বাজেট অধিবেশনে ব্যয়-বরাদ্দর যে-সকল দফা মঞ্জুর হওয়ার বাকী ছিল শুধু সেইগুলিই বর্ত্তমান অধিবেশনে পরিষদের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইয়াছিল, কিন্তু ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত যে-সময়ে প্রদেশের শাসনভার গবর্ণরের হস্তে অর্পিত ছিল ঐ সময়ে ঐ সকল দফায় কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে তাহা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাবসমূহে উল্লিখিত হয় নাই।

বিরোধী দল নিম্নলিখিত কারণে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দের দাবীগুলি অবৈধ বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন :

(১) বাজেট একটিমাত্র অখণ্ড বিষয় এবং উহাকে গবর্ণমেণ্ট যেভাবে আংশিক ভাবে বিবেচনা করিতে চাহিতেছেন তাহা করা চলে না।

(২) পরিষদের অধিবেশন পরিসমাপ্ত হইবার পর বাজেট সম্পর্কে উক্ত অধিবেশনে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে তাহা স্বভাবতঃই বাতিল হইয়া গিয়াছে।

(৩) পরিষদের ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল মাসের অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা সবই ৯৩নং ধারা অনুসারে গবর্ণরের ঘোষণা-বাণীর ফলে এবং উহার তৃতীয় অংশের দ্বারা তিনি যে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন, তৎকার্য্যের ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

(৪) গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বর্ত্তমান অধিবেশনে উত্থাপিত দাবীসমূহে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ অনির্দ্দিষ্ট হওয়ার জন্য এই দাবীগুলি আইনতঃ সিদ্ধ নহে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, বাজেট একটি অখণ্ড বিষয় কিনা? যদি অখণ্ড বিষয় হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যেভাবে আংশিক বাজেট উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন তাহা করা চলে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে বাজেট আংশিক ভাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহা হইলেও প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে, পরিষদের বিগত অধিবেশন পরিসমাপ্ত হওয়ায় ঐ অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে যাহা কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সমস্তই বাতিল হইয়া গিয়াছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ভারত-শাসন আইনের ৭৩ ধারার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার সময় যে-সকল বিলের আলোচনা শেষ হওয়া বাকী থাকিয়া যায় সেগুলি যাহাতে বাতিল না হয়, তাহারই বিধান উক্ত ৭৩ ধারায় করা হইয়াছে। কিন্তু বাজেট সম্পর্কে উক্ত ধারায় কিছু বলা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারত-শাসন আইনের ৮৩(১) ধারার (বি) উপধারায় সময়মত আর্থিক ব্যাপার পরিসমাপ্তির ব্যবস্থার জন্য বিধি প্রণয়নের বিধান আছে। ৮৪ (১) ধারার সহযোগে ৭৩ ধারা বিবেচনা করিলে দেখা যায়,. বাজেটকে একটি অখণ্ড বিষয়রূপে বিবেচনা করাই আইন-কর্তাদের উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয়তঃ পরিষদের বিগত অধিবেশন পরিসমাপ্তির সময় বাজেটের কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়ায় উক্ত অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে যাহা কিছু আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে সমস্তই বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখানে একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, গবর্ণর যদি ৯৩ ধারার ঘোষণা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আদেশ না দিতেন এবং নূতন মন্ত্রি-সভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পরিষদে এই ব্যয়-বরাদ্দগুলি পাশ করাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে বোধ হয় এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার সুযোগ হইত না।

ভারত-শাসন আইনের ৭৮ হইতে ৮৪ (১) ধারার বিধানগুলি এবং উক্ত ৮৪ (১) ধারার 'বি' উপধারা অনুসারে গবর্ণর কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলীর ১২ হইতে ১৫নং নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া স্পীকার বলেন, "একাধিক অধিবেশনে আংশিকভাবে বাজেট আলোচনা করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে আমার গভীর সংশয় আছে।" কিন্তু স্পীকার এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার রুলিং প্রদান করেন নই। সুতরাং আমরা তৃতীয় আর একটি প্রশ্নে উপস্থিত হইতেছি। এই প্রশ্নটি হইল এই যে, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বাজেট আংশিক-ভাবে উপস্থিত করা যায় (এ বিষয়ে স্পীকারের গভীর সংশয় আছে) এবং পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়াতে ঐ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাতিল হইয়া যায় না, তাহা হইলে, ৯৩ ধারা অনুসারে গবর্ণরের ঘোষণার তৃতীয় প্যারার দ্বারা বাজেটের যে ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহাতে পরিষদের ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাতিল হইয়া গিয়াছে কিনা?

উক্ত প্রশ্নটি আলোচনা করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষের যুক্তিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন যে সকল যুক্তি দিয়াছেন তাহা দুই অংশে বিভক্ত: (১) অবশিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দগুলি পরিষদ কর্তৃক মঞ্জুর করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন গবর্ণমেণ্টের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের মতে উহাই একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। এই বিষয়ে এডভোকেট-জেনারেল এবং ভারত-গবর্ণমেণ্টের আইন-বিশেষজ্ঞও একমত; (২) নূতন বাজেট উপস্থিত করিতে ৩।৪ মাস সময় লাগিবে। সুতরাং এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে গবর্ণমেণ্টকে মঞ্জুরীহীন ব্যয় করিতে হইবে। প্রথম যুক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আইন-বিশেষজ্ঞগণের যে কখনই ভ্রম হইতে পারে না, স্যার নাজিমুদ্দিন তাহা বলেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় যুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল—এত দুর্ব্বল যে আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া এই যুক্তিকে মানিয়া লওয়া যায় না। অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার যুক্তিকে কতকটা যুক্তিসহ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র স্থগিত ছিল, এই ২৪ দিনের ব্যয়-বরাদ্দ গবর্ণর মঞ্জুর করিয়াছেন। সুতরাং যেখান হইতে তাঁহারা ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন, সেইখান হইতেই তাঁহারা আবার সুরু করিতে চান। অর্থাৎ বাজেট সম্পর্কে পরিষদ যে অবস্থায় ছিল পুনরায় সেই অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তাই যদি হয়, তবে বাজেটের অবশিষ্ট অংশ উপস্থিত করিতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু পরিষদের অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আদেশ দিবার পূর্ব্বে ৯৩ ধারার ঘোষণায় গবর্ণর যে-বাজেট মঞ্জুর করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, বাজেটের যে সকল দফা পরিষদ মঞ্জুর করিয়াছিলেন সেগুলি তিনি সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বাজেটের অবশিষ্ট বরাদ্দগুলিতে ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামীর যুক্তির অর্থ দাঁড়াইল এই যে:

(১) পরিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে-সকল ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হইয়াছে তৎসম্পর্কে পরিষদ ২৯শে মার্চ্চের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কিন্তু

(২) যে-সকল ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর হওয়া বাকী আছে তৎসম্পর্কে পরিষদ সেই অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিল যে-অবস্থায় ২৪শে এপ্রিল গবর্ণর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে পারেন না। স্পীকার বলেন,

"গবর্ণমেণ্টকে হয় ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৪ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রস্তাবিত দাবীগুলি সম্বন্ধে নূতন একটি বাজেট পরিষদে অবশ্যই উত্থাপন করিতে হইবে, না হয় ১৯৪৩ সালের ১লা হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সময়ে উক্ত দাবীগুলি বিভিন্ন খাতের যে ব্যয়-বরাদ্দ গবর্ণর মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া বাজেটের সমগ্র অসমাপ্ত অংশই পরিষদের আলোচনার্থ ও ভোটের জন্য পেশ করিতে হইবে। এই দুইটি ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।"

অবশিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের জন্য যে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে তাহা অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট। কারণ ১৯৪৩ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ২৪শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কি পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে তাহার কোন আভাষ গবর্ণমেণ্ট দেন নাই। গবর্ণমেণ্টের মতে তাহা দেওয়া অসম্ভব। কাজেই ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরের প্রস্তাবগুলি বৈধ বলিয়া স্পীকার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

—

পরিষদে বন্দীমুক্তির দাবী

গত ৯ই জুলাই শুক্রবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে সমস্ত রাজবন্দী এবং রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করিয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আলোচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ব্যবস্থা-পরিষদের এই অধিবেশনে বে-সরকারী কার্য্যের জন্য আর কোন নির্দ্ধারিত দিন ছিল না। সুতরাং ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই অধিবেশনে পরিষদ রাজবন্দীদের সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলেন না।

মন্ত্রিসভা গঠনের পূর্ব্বে স্যার নাজিমুদ্দিন এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন, রাজবন্দীদের মুক্তি-দান-সমস্যা জাতীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু কার্য্যত নূতন মন্ত্রিসভা বন্দীমুক্তির জন্য কতটুকু কি করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে সে সম্বন্ধে কোন বিবৃতি পরিষদে দেওয়া হয় নাই। ব্যবস্থা-পরিষদে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার প্রস্তাব লইয়া যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতেই যাহা কিছু আভাষ পাওয়া যায়। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, সতর শত রাজবন্দী কারাগারে রহিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই অসুস্থ। হাজারের উপর রাজবন্দী পারিবারিক ভাতার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু মাত্র একশত জনের মত রাজবন্দীকে পারিবারিক ভাতা মঞ্জুর করা হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সমর্থক দলের সদস্য মিঃ এ, আর সিদ্দিকী শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিসভার আমলেই রাজবন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪১ সালে তদানীন্তন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের সময় নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা ছিল দুই শত বা আড়াই শত, কিন্তু ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১৫৭৯ জন হইয়াছে। এই বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে মিঃ সিদ্দিকী কিছুই বলেন নাই। গত আগষ্ট মাসে কংগ্রেস নেতৃবর্গের গ্রেফ্‌তারের পর দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই রাজবন্দীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। কিন্তু ১৯৪১ সনের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে নিরাপত্তা বন্দীর সংখ্যা দুই শত বা আড়াই শত হওয়ার কারণ সম্বন্ধে মিঃ সিদ্দিকী কিছুই বলেন নাই।

বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা রাজবন্দীদের ভাতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বলেন, প্রগতিশীল কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্ট বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধির জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিলেও স্বরাষ্ট্র সচিব রূপে স্যার নাজিমুদ্দিনই ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সে কথা যাউক। কিন্তু বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধি শুধু বর্ত্তমান মন্ত্রিসভারই বিশেষ কৃতিত্ব নয়। খাদ্যদ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য সকল প্রদেশেই বন্দীদের ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বাংলায় বন্দীদের ভাতা দেড় টাকা করা হইয়াছে, কিন্তু দাম বৃদ্ধির দিক্ হইতে দেখিলে উহা বৃদ্ধির পর্য্যায়ে পড়ে কি? গত তিন মাসে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা ১১০ জন বন্দীকে মুক্তি দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বলেন, "মিঃ ফজলুল হক স্বরাষ্ট্র সচিব থাকা কালীন, ইতিপূর্ব্বেই পাঁচশত বন্দীর মুক্তির জন্য আদেশ দিয়াছিলেন।" কিন্তু ঐ আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার কথা কিছু জানা যায় না। ঐ সকল বন্দীরাই কি এখন মুক্তি লাভ করিতেছেন? ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ ডেভিড্ হেণ্ড্রী অবিলম্বে সাধারণ ভাবে রাজবন্দীদের মুক্তি দান সমর্থন করেন না। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার বন্দীমুক্তির নীতি ইউরোপীয় দলের এই অভিমত দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হইবে, ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দিয়াই তাহা বুঝা যাইবে।

—

১৯নং অর্ডিনান্সের ব্যাখ্যা

ফেডারেল কোর্টের বিচারে স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্স অবৈধ বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৩ সনের ১৯নং অর্ডিনান্স জারী হয়। এই অর্ডিনান্স দ্বারা স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্স বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার ৩(১) ধারায় স্পেশ্যাল কোর্টের দণ্ডাদেশ প্রচলিত ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইয়া বহাল থাকার বিধান করা হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টে সুশীলকুমার বসুর মামলায় ১৯নং অর্ডিনান্সের ৩(১) ধারার বৈধতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিঃ খোন্দকার এবং বিচারপতি মিঃ সেনকে লইয়া গঠিত স্পেশ্যাল বেঞ্চ সুশীলকুমার বসুর দণ্ডাদেশ নাকচ করিয়া তাঁহার মুক্তির আদেশ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া সাধারণ আদালতে পুনরায় মামলার বিচারের আদেশ দেন। কিন্তু ১৯নং অর্ডিনান্সের ৩(১) ধারা সম্পর্কে বিচারপতি মিঃ সেন প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ খোন্দকারের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

বিচারপতি মিঃ সেনের মতে উক্ত ৩(১) ধারা অবৈধ। কিন্তু প্রধান বিচারপতি এই ধারাটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ফেডারেল কোর্টের বিচারে স্পেশ্যাল কোর্ট অর্ডিনান্স অসিদ্ধ হইয়াছে। কাজেই স্পেশ্যাল কোর্টের আদেশ অনুসারে কারাধ্যক্ষ কাহাকেও আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। আবার উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ব্যতীত ছাড়িয়াও দিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, স্পেশ্যাল কোর্ট কর্ত্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে দোষীও থাকিতে পারে, নির্দ্দোষীও থাকিতে পারে। এই অবস্থায় উপযুক্ত আদালতে আসামীদের বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত কারাধ্যক্ষ যাহাতে তাহাদিগকে আইনসঙ্গত ভাবে আবদ্ধ রাখিতে পারেন ১৯নং অর্ডিনান্স দ্বারা তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে, স্পেশ্যাল কোর্টের কার্য্যকে আইনসিদ্ধ করা হয় নাই। এই বিষয়ে বিচারপতি মিঃ খোন্দকার প্রধান বিচারপতির সহিত একমত হইয়াছেন।

প্রধান বিচারপতি ১৯ নং অর্ডিনান্সের ৩ (১) ধারার যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে উহা অসিদ্ধ হইল না, কিন্তু স্পেশ্যাল কোর্টের বিচারে দণ্ডিত আসামীদের পুনরায় সাধারণ আদালতে বিচার হইবে। প্রধান বিচারপতি তাঁহার রায়ে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, যে-সকল এলাকায় স্পেশ্যাল কোর্টের বিচারে দণ্ডাদেশ দেওয়া হইয়াছে তত্রত্য উপযুক্ত ক্ষমতা বিশিষ্ট আদালতের কর্ত্তব্য ঐ সকল মামলার নথীপত্র তলপ করিয়া দণ্ডাদেশ বাতিল করা এবং সাধারণ আইন অনুসারে পুনরায় বিচারের নির্দ্দেশ দেওয়া।

বিচারের সময় কি কি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

—

আদালত অবমাননা হয় নাই

কলিকাতা হাইকোর্টে যে দুইটি আদালত অবমাননার মামলা চলিতেছিল গত ১৪ই জুলাই বুধবার ঐ দুইটি মামলার রায় প্রদত্ত হইয়াছে। যে ঘটনা হইতে এই মামলা দুইটি উদ্ভূত হয় সংক্ষেপে তাহা এই: গত ৩রা জুন কলিকাতা হাইকোর্টের স্পেশ্যাল বেঞ্চের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬ নং বিধি অসিদ্ধ এবং স্পেশ্যাল বেঞ্চ শ্রীযুত শিবনাথ ব্যানার্জ্জি ও শ্রীযুত নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারকে মুক্তি দেন। মুক্তির পরই পুলিশ ১৮১৮ সালের তিন আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করে। শ্রীযুত ব্যানার্জ্জিকে আদালত-গৃহেই গ্রেফ্‌তার করা হয় এবং শ্রীযুত দত্তমজুমদারকে গ্রেফ্‌তার করা হয় হাইকোর্টের বারান্দায়। এই গ্রেফ্‌তার হইতেই উল্লিখিত দুইটি আদালত অবমাননার মামলার উদ্ভব হয়।

মামলা দুইটি বিচারের জন্য প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিঃ খোন্দকার এবং বিচারপতি মিঃ মিত্রকে লইয়া স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুত ব্যানার্জ্জীর মোকদ্দমায় তিনজন বিচারপতিই একমত হইয়া সাব্যস্ত করেন যে, আদালত অবমাননা হয় নাই। কিন্তু শ্রীযুত দত্তমজুমদারের মামলায় তিনজন বিচারপতি একমত হইতে পারেন নাই। প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি মিঃ খোন্দকার একমত হইয়া আদালত অবমাননা হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত করেন, কিন্তু বিচারপতি মিঃ মিত্র সাব্যস্ত করেন, আদালত অবমাননা হইয়াছে। সুতরাং উভয় মামলাতেই রুল খারিজ হইয়া গিয়াছে। তবে তিনজন বিচারপতির মতেই শ্রীযুত দত্তমজুমদারের প্রতি পুলিশের আচরণ নিন্দনীয় হইয়াছে।

শ্রীযুত দত্তমজুমদারের মামলায় বিচারপতি মিঃ মিত্র রায়ে বলিয়াছেন, "শ্রীযুত দত্ত-মজুমদারের বেলায় যাহা করা হইয়াছিল তাহা আদালতের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করারই সামিল। আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই যে, সেদিন পুলিশ যে-ব্যবহার করিয়াছিল তাহাতে লোকের মনে এই ধারণাই হইবে যে, পুলিশই সর্ব্বময় প্রভু। ইন্সপেক্টার হাসানের মন্তব্য এই ধারণারই পোষকতা করিবে। তাঁহার মন্তব্যের মর্ম্ম এই যে, হাইকোর্টের নির্দ্দেশ লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমি আপনাকে গ্রেফ্‌তার করিতেছি ইহাই যথেষ্ট। কোন্ অধিকারে গ্রেফ্‌তার করিতেছি তাহার কোন কৈফিয়ৎ দিব না। আপনি কি জানেন না, আমি পুলিশ অফিসার?"

হাইকোর্টের মধ্যে গ্রেফ্‌তার করা সম্পর্কে প্রধান বিচারপতির অভিমত এই যে, ইহাতে কোন দোষ নাই। হাইকোর্টের মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফ্‌তার করিবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত অপরাধী হাইকোর্টে আসিয়া আশ্রয় লইতে পারে। আমরা প্রধান বিচারপতির নিকট সসম্মানে এই নিবেদন করিতে পারি যে, সাধারণ লোকের কাছে হাইকোর্ট গৃহে কোন একজন অপরাধীকে গ্রেফ্‌তার করা এবং হাইকোর্টের আদেশে সদ্যমুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধের কারণ না দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ গ্রেফ্‌তার করার মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত দত্ত-মজুমদারের গ্রেফ্‌তারের সময় পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে শ্রীযুত দত্ত-মজুমদারের প্রতি উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন করা হয় নাই এবং সম্ভবতঃ অপ্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিচারপতি মিঃ মিত্র বলেন, ইনস্পেক্টর তাঁহার (শ্রীযুত দত্ত-মজুমদারের) প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছে তাহা সমর্থনের অযোগ্য। বিচারপতি মিঃ খোন্দকার শ্রীযুত দত্ত-মজুমদারের প্রতি পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন: "সমাজে মিঃ দত্ত-মজুমদারের যে প্রতিষ্ঠা, তাঁহার তদুপযুক্ত প্রাপ্য মর্য্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও অপর এক ব্যাপক দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইন্‌স্পেক্টরের এই আচরণ আদালতের কাছে নিন্দার্হ বলিয়া গণ্য হইতে বাধ্য। এদেশের পুলিশ যে রাষ্ট্রের ভৃত্য এ কথা ভুলিয়া গিয়া নিজেরাই একচ্ছত্র প্রভু বলিয়া মনে করিয়া থাকে—এই ধরণের মন্তব্য মোটেই অত্যুক্তি নহে। জনসাধারণের প্রতি পুলিশের

স্বেচ্ছাচারের নিদর্শন দুঃখের বিষয় এদেশে সচরাচর পাওয়া যায়। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত বিভাগের এতদ্দ্বারা মর্য্যাদা ও সুনাম বৃদ্ধি পায় না।"

সংশ্লিষ্ট পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে হাইকোর্টের এই মন্তব্যের পর গবর্ণমেণ্ট তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেন, দেশবাসী তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করিবে।

—

ভারতীয় সংবাদপত্রের সমস্যা

বোম্বাই সহরে নিখিল-ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমীটির অধিবেশন সদ্য সমাপ্ত হইয়াছে। এবারকার অধিবেশনের বিশেষত্ব এই যে, গবর্ণমেণ্ট এবং সংবাদপত্রসেবী উভয় পক্ষই ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করিয়াছেন। এই অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেণ্টের সংবাদ ও বেতার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার সুলতান আহমদ বলেন, "সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আপনাদের একান্ত কাম্য। উহা এখন আপনারা লাভ করিয়াছেন। অন্ততঃ আমার নিজের ধারণা ইহাই।" তাঁহার এই মন্তব্যের উত্তরে ষ্ট্যাণ্ডিং কমীটির সভাপতি মিঃ শ্রীনিবাসন যাহা বলিয়াছেন তাহা এত সুস্পষ্ট যে, উহার উপর আর কোন মন্তব্য করার আবশ্যক হয় না।

মিঃ শ্রীনিবাসন বলিয়াছেন, "সংবাদ ও বেতার বিভাগ দ্রুত মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহে ভারতীয় নেতাদের সম্পর্কে বিকৃত ও মিথ্যা প্রচার-কার্য্যের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক সংবাদ কড়াকড়ি ভাবে সেন্সর করা হইতেছে।" যে-সকল সংবাদ ভারতে আসে এবং যে-সকল সংবাদ ভারত হইতে বাহিরে যায় সেগুলি কিরূপ কঠোরভাবে সেন্সর করা হয় তৎসম্পর্কে মিঃ শ্রীনিবাসন বলেন যে, দিল্লীস্থিত বিশেষ সংবাদদাতাগণ এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কমীটি গত এক বৎসরে যে-সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন স্যার সুলতান আহমদ তাঁহার দপ্তরে সে সম্পর্কে তদন্ত করিলেই ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। সেন্সরের শেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি মিঃ লুই ফিসারের প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন।

যুদ্ধের সময়েও প্রকৃত তথ্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারতের প্রধান সেনাপতি স্যার ক্লড অচিনলেক যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি মনে করেন, যত অধিক সংবাদ প্রকাশিত হয় ততই ভাল, ইহাতে সামরিক বিভাগই সহায়তা প্রাপ্ত হইবে। কারণ জনসাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে এবং জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকিলে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় তাঁহারা অধিকতর সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে। সেন্সারের যত বেশী কড়াকড়ি হইবে সত্য প্রকাশে বাধা ততই বেশী হইবে বলিয়া কি স্যার সুলতান আহমদ মনে করেন না? ইহাতে কি যুদ্ধ-প্রচেষ্টাই ব্যাহত হয় না?

গবর্ণমেণ্ট এবং সংবাদপত্রসেবীদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার উপর স্যার সুলতান আহমদ বিশেষ জোর দিয়াছেন। সংবাদপত্রসেবীদের পক্ষে এরূপ সহযোগিতা বিশেষ কাম্য। কিন্তু সহযোগিতা বলিতে তিনি কি বুঝেন? গবর্ণমেণ্টের অভিমত বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করাই কি সহযোগিতা? সম্পাদকীয় কাজকর্ম্মে কিরূপ বিরক্তিকর আদেশ ও নির্দ্দেশ দেওয়া হয় মিঃ শ্রীনিবাসন তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। টিউনিসিয়ার বিজয়-উৎসব উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু উহার জন্য কাগজ পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর করা হয় না অধিকন্তু একদিন কাগজ প্রকাশ বন্ধ রাখিয়া ঐ কাগজ দ্বারা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। কাগজ সরবরাহের দায়িত্বটা তাঁহার বিভাগের নয়, এই কথা বলিয়া স্যার সুলতান আহমদ কি পাশ কাটাইয়া যাইতে পারেন? সংবাদপত্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য স্যার সুলতান আহমদ দুইটি কমীটি গঠনের পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন। কমীটি ইত্যাদি নূতন নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে তাহা দ্বারা কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। এই ধরণের কমীটি অপেক্ষা মিঃ শ্রীনিবাসন যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক তিনি বলেন, "বৎসরে অন্ততঃ চারি বার সম্পাদকমণ্ডলী ষ্ট্যাণ্ডিং কমীটির অধিবেশন হয়। আমি স্যার সুলতানকে এই সকল অধিবেশনে যোগদান করিতে অনুরোধ করি এবং তিনি যখনই প্রয়োজন বোধ করিবেন তখন

আমাদের সহিত আলোচনা করিতে পারিবেন।" ভারতীয় সংবাদ-পত্রসমূহ যথেষ্ট কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। তথাপি গবর্ণমেণ্ট এবং সংবাদপত্রের মধ্যে মাঝে মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হয় কেন স্যার সুলতানকে তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

—

ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য-সমস্যা

বাংলার খাদ্য-সমস্যা লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তিন দিন ব্যাপী আলোচনা হইয়াছে এবং আলোচনার শেষে বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলি সমস্তই অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হওয়ায় বাংলার বুভুক্ষু নরনারী কতটুকু সান্ত্বনা লাভ করিল, তাহাদের অন্ন-সমস্যার কতটুকু সমাধান হইল বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এবং পরিষদের সদস্যগণকে আমরা তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহাদের ভোটে বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইল, নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া যাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন? তাঁহাদের ভোটে প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইয়াছে বলিয়া কি নির্ব্বাচকমণ্ডলী এবং জনসাধারণের ক্ষুধার দাবীও অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে?

বিরোধী দলের প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হওয়ার পরও বাংলার শোচনীয় খাদ্য-পরিস্থিতি তেমনি শোচনীয়ই রহিয়া গিয়াছে, শুধু সমগ্র দেশের খাদ্যাভাবের চিত্র পরিষদের আলোচনায় সুস্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র। বাংলার মফঃস্বলে খাদ্যাভিযান সম্পর্কে খাদ্যসচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দী একাধিকবার বলিয়াছেন, খাদ্যাভিযানের ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। সন্তোষজনক বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহা তিনি কোথাও বলেন নাই, বাংলার মফঃস্বল হইতে কি পরিমাণ মজুত ধান ও চাউলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাও তিনি প্রকাশ করেন নাই। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে খাদ্যাভিযান চালাইয়াছেন তাহার ফলাফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। খাদ্য-সচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দী জানান যে, উহার সমস্ত ফলাফল তাঁহার নিকটে নাই; কিন্তু সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে তিনি পরিষদকে ইহা জানাইতে পারেন যে, প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতেই সংবাদ ঘাট্‌তির সংবাদ আসিয়াছে। সুতরাং খাদ্যাভিযানের ফল সন্তোষজনক হওয়ার অর্থ তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় কি? খাদ্যাভিযান সম্পর্কে বর্দ্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতব বাহাদুর বলেন, এই অভিযানের ফলে গরীব চাষীদের ঘরে যেটুকু ধান মজুত ছিল তাহাও লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

খাদ্যসচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দী বলিয়াছেন, চাউলের মূল্য বৃদ্ধির গতিরোধ করা হইয়াছে। গতিরোধ বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চাহেন তাহা সাধারণের বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। পরিষদে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ এ, এম, এ জমান বলেন, বিগত মন্ত্রিসভার আমলে চাউলের মূল্য মণ প্রতি ১২৲ টাকায় উঠে, তখনই বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার সদস্যগণ বিরোধী দলে থাকিয়া চেঁচামেচি সুরু করিয়া দেন। আজ যখন উহা ৪০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে তখন তাঁহারা কি করিতেছেন? শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্ত বলেন, বিগত মন্ত্রিসভা পদত্যাগের সময় চাউলের মূল্য প্রতি মণ ১৮৲ টাকা ছিল; সেই সময় তথাকথিত কম্যুনিষ্টগণ বুভুক্ষিতের অভিযান অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আর আজ যখন এই মন্ত্রিসভার সময় চালের মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে তখন ঐসব তথাকথিত কম্যুনিষ্টগণ কোথায়? শুধু কি চাউলের মূল্যই বাড়িয়াছে? শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন বলেন, অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্যও শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বাংলায় এই যে খাদ্য পরিস্থিতি তাহাকে কি বলা যায়? বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বিরোধীদল বাংলাকে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিবার দাবী করেন। খাদ্যসচিব তাহাতে রাজী হন নাই। কিন্তু ১৫ই জুলাই পরিষদে তাঁহার বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, দিল্লীতে আহূত খাদ্য-সম্মেলনে বিভিন্ন প্রদেশের এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদিগকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষের অবস্থা বর্ত্তমান তাহা তিনি সমঝাইয়া দিয়াছেন। বাংলা

দেশ সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পনা গঠন করিতেছেন তাহাতে যে বাংলা দেশকে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। খাদ্যসচিব নিম্নলিখিত উপায়ে জনসাধারণকে সাহায্য দিবার চেষ্টা করিবেন:

(১) মাড় ভাত সরবরাহের জন্য লঙ্গরখানা খোলা হইবে।

(২) সম্ভব হইলে দুঃস্থদের খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইবে এবং খাদ্যশস্য পাওয়া না গেলে নগদ পয়সা দেওয়া হইবে।

(৩) খালি রাস্তা নির্ম্মাণ ভিন্ন অন্যান্য কাজের ভিতর দিয়াও জনগণকে সাহায্য দেওয়া হইবে।

(৪) বীজ ক্রয়ের জন্য নগদ টাকা দান করিয়া, গবাদি পশু সরবরাহ করিয়া চাষীদের সাহায্য করা হইবে।

(৫) গরীবদিগকে অল্পমূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইবে।

বাংলায় খাদ্যাভাব নাই বলিয়া খাদ্যসচিব এতদিন যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তাঁহার বিবৃতি দ্বারা তাহা সমর্থিত হয় না। তিনি হয়ত অবাধ বাণিজ্যের ব্যবস্থার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর সম্মিলনে অবাধ বাণিজ্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। 'রয়েজ উইকলী' পত্রিকায় প্রকাশ, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট খাদ্য-সম্মেলনের পর যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতে যাইয়া মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দী বলিয়াছেন : I have received a death sentence—আমি মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে তিনি বলিয়াছেন, "আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে অধিকতর সাহায্য দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

বাংলার মফঃস্বলে খাদ্যাভিযানের ফলে ৭০ লক্ষ মণের অধিক খাদ্যশস্যের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কলিকাতা ও হাওড়া এই অভিযান হইতে বাদ পড়িয়াছে। এই দুইটি সহর সম্বন্ধে খাদ্যসচিব বলিয়াছেন, "কলিকাতা ও হাওড়া হইতে খাদ্যশস্য যাহাতে বাহিরে না যাইতে পারে তজ্জন্য ঐ সকল অঞ্চল পরিবেষ্টনের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলে কি পরিমাণ আমদানী হইতেছে এবং সেখান হইতে কি পরিমাণ বাহিরে যাইতেছে তাহা সত্বরেই জানিতে পারা যাইবে।"

খাদ্য সচিবের বিবৃতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বিরোধী দল খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে-সকল প্রস্তাব আনিয়াছিলেন মন্ত্রিমণ্ডলীকে অপদস্থ করার উদ্দেশ্য তাহাতে ছিল না। প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হইলেও অন্নাভাবক্লিষ্ট নরনারীকে খাদ্য যোগাইবার দায়িত্ব হইতে মন্ত্রিসভা রেহাই পাইতে পারেন না।

—

ভারতের বস্ত্র-শিল্প-নিয়ন্ত্রণ

ভারতের বস্ত্রশিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কাপড়ের কলের মালিকরা প্রথমে ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। পঁচিশ-জন সদস্য লইয়া একটি বোর্ড গঠিত হওয়ায় এবং একজন বে-সরকারী ব্যক্তি এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ায়, গবর্ণমেণ্ট এবং বস্ত্রশিল্পের মালিকদের মধ্যে একটা আপোষ হইয়াছে। কাপড় ও সুতার উৎপাদন, দাম এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ এবং কাপড় ও সুতা মজুত করা নিবারণ করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। আমাদের অন্নসমস্যার মত বস্ত্র-সমস্যাও দিন দিন কঠোর হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং কাপড়ের দাম হ্রাসের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনার মধ্যে নিকট ও মধ্য-প্রাচ্যে ন্যায্যমূল্যে কাপড় রপ্তানি করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ পরিস্ফুট রহিয়াছে। কাপড়ের দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এখনও আমরা জানি না। তবে মজুত কাপড় নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবার নির্দ্দেশ দেওয়ায় কাপড়ের দাম সামান্য কিছু কমিয়াছে। কিন্তু এই দাম কমকে উল্লেখযোগ্য কম কিছুতেই বলা যায় না। দেশের লোকের কাপড়ের নিম্নতম প্রয়োজন মিটিবার পূর্ব্বে বিদেশে কাপড় রপ্তানি না করিবার নীতি গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

—

ভারতের নূতন বড়লাট

লর্ড লিনলিথগো অবসর গ্রহণ করিলে ভারতের বড়লাটের পদে ফিল্ড মার্শাল আর্চিবল্ড পার্সিভাল ওয়াভেলের (বর্ত্তমানে লর্ড) নিয়োগ স্থির হইয়া গিয়াছে। এই নিয়োগ অল্পাধিক সকলকেই বিস্মিত করিয়াছে। কারণ সামরিক বিভাগ হইতে ভারতের বড়লাটের পদে নিয়োগ ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে আর কখনও হয় নাই। কিন্তু ভারতের জন্ম বড়লাট খুঁজিয়া পাওয়া কিরূপ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল লর্ড লিনলিথগোর কার্য্যকাল বৃদ্ধিতেই তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে। বড়লাটের নীতি ভারত-সচিবের দপ্তর হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু ভারত সচিব ও বড়লাটের মধ্যে নীতিগত ঐক্য থাকা ভারতের বড়লাটের পদের জন্য শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হওয়া স্বাভাবিক। ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের (বর্ত্তমান লর্ড) এই যোগ্যতা না থাকিবার কোন কারণ নাই। ক্রিপস-মিশনের সময় তিনি ভারতে উপস্থিত ছিলেন। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের চেষ্টায় তাঁহার সহিত মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত নেহরুর আলোচনা হইয়াছিল। এই আলোচনা সম্পর্কে মৌলানা আজাদ বলিয়াছিলেন, এই আলোচনা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দিক হইতেই হইয়াছে এবং তাঁহার মনে হইয়াছে, তিনি কোন সমর-বিশারদের সহিত আলোচনা করিতেছেন না, আলোচনা করিতেছেন একজন রাজনীতি-বিশারদের সহিত। সুতরাং মিঃ চার্চ্চিল যদি একই সঙ্গে সমর-বিশারদ এবং রাজনীতি-বিশারদ ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকেই বড়লাটের পদে নিয়োগ করার প্রয়োজন অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিস্ময়ের বিষয় হইবে কেন?

বড়লাটের পদে ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলের (বর্ত্তমানে লর্ড) নিয়োগের সঙ্গে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্ম স্বতন্ত্র এক পূর্ব্ব এসিয়া কমাণ্ড নিয়োগের প্রস্তাব হইয়াছে। এই ব্যবস্থা দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা ব্যাপারকে ভারতের শাসন ব্যাপার হইতে পৃথক করা হইল। ক্রিপস-প্রস্তাব আলোচনার সময় কংগ্রেস অনেকটা এই রকম প্রস্তাবই করিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেসের দাবীর মূলে ছিল জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন।

মিঃ চার্চ্চিলের গিল্ড-হলের বক্তৃতা

গত ৩০শে জুন লণ্ডনে গিল্ড-হলের বক্তৃতায় মিঃ চার্চ্চিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতীয় বাহিনীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এই বাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য স্বেচ্ছাসেবক—কাহাকেও যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করা হয় নাই। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স কোন দেশই এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় নাই।" মিঃ চার্চ্চিল যাহা বৈশিষ্ট্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সোজা কথায় বলিলে তাহা দাঁড়ায় এই যে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং ফ্রান্সে সৈন্যদলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, কিন্তু ভারতে বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীর সৈন্যদলে যোগদান করা বাধ্যতামূলক কেন করে নাই? ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিবার জন্যই কি?

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বৈশিষ্ট্যের কথা ছাড়া তিনি রাশিয়া ও চীনেরও যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, কামনা করিয়াছেন ফ্রান্সের স্বাধীনতা; কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার মূল সুর ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী। মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন, "আমরা সকলেই বিশ্বস্তরূপে পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই চলিতেছি, তথাপি ব্রিটিশ এবং মার্কিন গণতন্ত্রের সম্মুখে আজ এই ভীষণ সত্য উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহা হইলে সকল জাতিকেই আমরা বিপদসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে পারি; কিন্তু আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হই, তবে দীর্ঘকালের জন্য সকল দেশ এবং জাতি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরবক্ষে অন্ধকারের মধ্যে ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে।"

তাঁহার এই উক্তির মধ্যে একটা আশঙ্কার ভাবই কি সূচিত হইতেছে না? কি এই আশঙ্কা, আর এই আশঙ্কাই বা কেন? আমেরিকা বৃটেনের ভারতীয় নীতির কিছু কড়া সমালোচনা করিয়াছিল, কিন্তু আমরা শুনিতেছি, ভারতীয় সমস্যাটা যে কত বড় কঠিন সমস্যা তাহা আমেরিকা নাকি এখন বুঝিতে পারিয়াছে। ভারতীয় সমস্যা লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন মৈত্রী ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই। ভারতবর্ষ চিরকালই বৃটেনের ঘরোয়া সমস্যা হইয়াই

থাকিবে। তিনি আমেরিকে আশ্বাসও দিয়াছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বৃটিশারদের মনে ভয় কিম্বা ঈর্ষার উদ্রেক করে না। তবু তাঁহার মনের কোন্ স্থানটিতে খোঁচা লাগিতেছে?

—

বৃটিশ শ্রমিকদলের ভারতপ্রীতি

বৃটিশ শ্রমিকদলের সম্মেলনে ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুইটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার জন্য আলোচনা চালাইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে উদ্যোগী হইবার জন্য দাবী করা হয়। অপর প্রস্তাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান ভারতীয় নীতির নিন্দা এবং কংগ্রেস-নেতাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ সম্মেলনে এই দুইটি প্রস্তাবের একটিও উত্থাপিত হয় নাই, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতি সম্পর্কে নূতন করিয়া আলোচনা আরম্ভ করা হইবে, সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট এই আশ্বাস পাইয়া প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহার করা হয়। প্রস্তাব দুইটি গৃহীত না হইলে বৃটিশ শ্রমিক দলের ভারতপ্রীতির স্বরূপ বড় নির্ম্মম ভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়িত, আবার গৃহীত হইলে বৃটিশ মন্ত্রি-সভায় যে-কয়েক জন শ্রমিক দলের সদস্য আছেন তাঁহারাও অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতেন। প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহৃত হওয়ায় উভয় কুলই রক্ষা পাইল।

এই প্রস্তাব দুইটি প্রত্যাহৃত হওয়া সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, শ্রমিক দলের কার্য্যকরী সমিতির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন আলোচনা আরম্ভ করা হইবে, শ্রমিকদলের কর্ম্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে মিঃ আর্থার গ্রীনউড্ এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিলে আপোষ-আলোচনা চলিতে পারে, ইহাই এই রিপোর্টের সার মর্ম্ম। কিন্তু কংগ্রেস যে আদপেই আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে নাই, রিপোর্টের রচয়িতাগণ এই সত্যটাই চাপিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই রিপোর্টে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতিই কার্য্যতঃ সমর্থন করা হইয়াছে।

বৃটিশ মন্ত্রি-সভায় কয়েক জন শ্রমিকদলের সদস্য মন্ত্রী-আছেন। বৃটেনের ভারতীয় নীতি নির্দ্ধারণে তাঁহাদের প্রভাব কতখানি তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। শ্রমিক দলের ভারতপ্রীতির স্বরূপ ভারতবাসী ভাল করিয়াই জানে। কাজেই প্রস্তাব দুইটিকে ধামা চাপা দেওয়ায় ভারতবাসীর বিস্মিত কিম্বা দুঃখিত হইবার কিছু নাই।

—

ইকনমিষ্ট পত্রিকার উপদেশ

বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা ভারতের ভাবী বড়লাট ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেলকে (বর্ত্তমানে লর্ড) ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ নির্ম্মাণ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরামর্শ দিয়াছেন। উক্ত পত্রিকা মনে করেন, যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে, ভারতীয়দের মধ্যে থাকিবে গুরুতর অনৈক্য, ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় ফিল্ড মার্শাল ওয়াভেল ততদিন কোন বৃহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারিবেন না। ইকনমিষ্ট পত্রিকার এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ যুদ্ধ একদিন অবশ্যই শেষ হইবে, কিন্তু ভারতীয় অনৈক্য জীয়াইয়া রাখা চলিবে চিরকাল। উক্ত পত্রিকা বৃটেন এবং ভারতের পারস্পরিক অবিশ্বাসের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু জোর দিয়াছেন ভারত সম্পর্কে বৃটেনের উদ্দেশ্যের প্রতি ভারতবাসীর সন্দেহ। তাঁহার মতে এই সন্দেহটা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং ইহার জন্য ভারতের পুরাতন রাজনীতিকরাই দায়ী। তাই ভারতে ন[illegible] নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তার উপর উক্ত পত্রিকা জোর দিয়াছেন। কারণ এখন যাঁহারা রাজনৈতিক নেতা তাঁহারা এমন প্রকৃতির যে তাঁহারা শুধু শিখেন, কিন্তু ভুলেন না কিছুই।

কংগ্রেসকে 'টোটেলিটেরিয়ান' এবং অন্ধগলিতে পরিভ্রমণশীল বলিয়া অভিহিত করিয়া 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বিকৃত করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু নূতন নেতৃত্বের পথের সন্ধান দিতে পারেন নাই। আমরা মিঃ জিন্নার এবং ডাঃ আম্বেদকরের নেতৃত্ব গড়িয়া উঠিতে দেখিয়াছি। দেশের মাটিতে সঞ্চিত রস আকর্ষণ করিয়া এই নেতৃত্ব

পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় নাই বলিয়া তাঁহাদের নেতৃত্বে অনৈক্যের পথই সুগম হইয়াছে। ফরমাইস মাফিক গঠিত নেতৃত্ব শুধু অনৈক্যের সৃষ্টিই করিতে পারে, সমস্যাকে শুধু জটিল করিয়াই তুলিতে পারে, কিন্তু সমাধানের পথের সন্ধান দিতে পারে না।

—

বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি

বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলী কমন্স সভায় বৃটিশ উপনিবেশসমূহের পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করা হইবে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। এই সহযোগিতা গ্রহণ করা হইবে উপনিবেশসমূহের আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য। বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য কতকগুলি কমিশন গঠন করা হইবে। এই কমিশনে থাকিবেন উপনিবেশগুলির মালিক রাষ্ট্রসমূহ এবং ঐ উপনিবেশগুলিতে যে সকল রাষ্ট্রের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে তাঁহারা। এই কমিশনই উপনিবেশের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন। অবশ্য উপনিবেশগুলির কল্যাণের জন্য যাহা করা হইবে তাহা ডোমিনিয়নগুলি এবং অন্যান্য দেশগুলির সহিত আলোচনা করিয়াই করা হইবে। উপনিবেশের জনগণের থাকিবে শুধু এই কমিশনের সহিত সংযোগ। এই সংযোগটা কিরূপ হইবে তাহা বুঝাইয়া বলিবার জন্য যখন তাঁহাকে চাপিয়া ধরা হইল তখন তিনি বলিলেন, কোন উপনিবেশ যতটুকু স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছে তাহারই উপর এই সংযোগের প্রকৃতি নির্ভর করিবে।

উল্লিখিত ব্যবস্থায় উপনিবেশগুলির আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ কিরূপ ভাবে চলিবে তাহা বোধ হয় অনুমান করা কঠিন নহে। গত যুদ্ধের সময় হইতে অধীন দেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের কথা আমরা শুনিতেছি। এই অধিকার আজও কাহারও ভাগ্যে মিলে নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধে অর্থনৈতিক আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার কথা শুনিতেছি। উপনিবেশগুলি ডোমিনিয়নগুলির মত স্বায়ত্তশাসন পাইলে এইরূপ কমিশন গঠনের কোন অর্থ হয় না। মিঃ ষ্ট্যানলীর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী উপনিবেশের ব্যাপারে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির সহিত একটা রফামূলক সহযোগিতার ব্যবস্থা হইলে অধীন দেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার জন্য আর কেহ মাথা ঘামাইবে না। কারণ অধীন দেশ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে এইরূপ সহযোগিতার কোন সার্থকতা আর থাকিবে না।

—

বৃটিশ রপ্তানি-বাণিজ্য ও ভারত

যুদ্ধের পর বৃটিশ রপ্তানি-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ হইবে বৃটিশ ব্যবসায়িগণ এখন হইতেই তাহা চিন্তা করিতেছেন। কাজেই লণ্ডনের এক সভায় মিঃ আমেরী এ সম্পর্কে আলোচনা করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। বৃটিশ রপ্তানি-বাণিজ্যের কথা বলিতে গেলে ভারতের কথা না আনিয়া উপায় নাই। মিঃ আমেরীর বক্তৃতায় উহা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পর ভারতের আমদানি-বাণিজ্যে বড় রকম একটা পরিবর্ত্তন হইবে। ভারতে শিল্পোন্নতির প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত হইলে, বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ ভারতে পণ্য বিক্রয়ের এবং মূলধন নিয়োগের কোন সুনির্দ্দিষ্ট সুবিধার আশা করিতে পারেন না। মিঃ আমেরীর কথাগুলি শুনিতে ভাল, কিন্তু ভারতের বাজার যাহাতে হাতছাড়া না হয় তাহার জন্য তাঁহারা চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিতেছেন কি?

সংরক্ষণ নীতির অভাবের জন্যই ভারতের শিল্প প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। যুদ্ধের পরে যে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে তাহার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। তারপর রহিয়াছে ভারতের ষ্টার্লিং সম্পদ। যুদ্ধের পরে বৃটিশ পণ্য ভারতে বিক্রয় করিবার সুবিধার জন্যই এই ষ্টার্লিং সম্পদকে সঞ্চয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

—

মহাযুদ্ধের গতিপথে

রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের দুই বৎসর পূর্ণ হইয়া তৃতীয় বৎসর সুরু হইয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধও সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিল। মহাযুদ্ধের গতিপথে যে একটি পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে তাহা বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। রুশ রণ-ক্ষেত্রে এবার জার্ম্মানীর গ্রীষ্মাভিযান সুরু হইতে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। কিন্তু ৫ই জুলাই ওরেল-কুরস্ক-বিয়েল-গোরড রণাঙ্গনে জার্ম্মানীর অভিযান যখন সুরু হইল তখন আক্রমণটা এতই প্রচণ্ড হইয়াছিল যে, অনেকেই মনে করিয়াছিলেন পশ্চিম রণাঙ্গণে মিত্র শক্তির সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব্বে জার্ম্মানী রাশিয়ার সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিতে চায়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই রাশিয়া জার্ম্মানীর অগ্রগতি রোধ করিয়া ফেলিল এবং আক্র-মণোদ্যোগ আসিয়া পড়িল রাশিয়ার হাতেই। অতঃপর জার্ম্মানী নূতন করিয়া অভিযান সুরু করিতে পারিবে কি না তাহা বলা কঠিন। মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই সিসিলী দ্বীপে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এবং অক্ষশক্তির প্রতিরোধ প্রতিহত করিয়া দ্বীপের অনেকখানি ইতিমধ্যেই দখল করিয়াছে। মিত্রশক্তিবর্গের এই সমরোদ্যম রাশিয়ার উপর জার্ম্মানীর চাপ অনেকখানি হ্রাস করিবে সন্দেহ নাই। মহাযুদ্ধের গতিপথে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতির সূচনা করিতেছে।

—

পরলোকে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জির মৃত্যুতে হিন্দুমহাসভার একজন বিশিষ্ট নেতার জীবনাবসান হইল। তিনি ব্যবহারজীবী হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া-ছিলেন। ভাওয়াল মামলার পরিচালনায় তাঁহার ব্যবহার-কুশলতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কর্ম্মজীবনের প্রথম ভাগে মিঃ চ্যাটার্জ্জি কংগ্রেসে যোগদান করিয়া-ছিলেন। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিবাদে কংগ্রেসের সহিত সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। পরে তাঁহাকে রাজনীতিক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে। তাঁহার পরলোকগত আত্মা শান্তি লাভ করুক, ইহাই আমাদের কামনা। তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইতেছি।

—

ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

একচেটিয়া নীতির সহিত ঔপনিবেশিক নীতির সম্বন্ধটা খুব নিবিড়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভের হার নিবারণ করা একচেটিয়া নীতির সার্থকতা। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবস্থাই যখন ক্রমে সাধারণ ব্যবস্থা হইয়া দাঁড়ায় তখন লাভের হার হ্রাস হওয়া সামলান তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় হয় শ্রমশক্তিকে সস্তা করা, না-হয় মধ্যবর্ত্তী উপার্জ্জকদের ঘাড় ভাঙ্গা ছাড়া লাভের হার হ্রাস হওয়া নিবারণ করিবার আর কোন উপায় থাকে না। কিন্তু তাহা করিতে গেলেই পণ্য-ব্যবহারকারীদের আয় হ্রাস পাইয়া ব্যবহার্য্য পণ্যের (consumers' goods) চাহিদা কমিয়া যায় এবং ব্যবহার্য পণ্যের চাহিদা কমিয়া গেলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় মূলপণ্যের (capital goods) অর্থাৎ উৎপাদক যন্ত্রপাতির চাহিদা হ্রাসের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমশক্তির দাম হ্রাস করা এবং মধ্যবর্ত্তী উপার্জ্জকদের আয় কমানোর পথেও প্রবল বাধা আছে। শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন মজুরি কম করিবার পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আয় হ্রাস হইলে মধ্যবর্ত্তী উপার্জ্জকদের মধ্যেও চরম বামপন্থী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়া শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণীর একটা সম্মিলিত ফ্রণ্ট ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গড়িয়া উঠিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। পুঁজিপতিদের সম্মুখে তখন দুইটি পথ খোলা থাকে। তাঁহাদিগকে হয় ফ্যাসিষ্ট নীতি অবলম্বন করিতে হয়, না-হয় নিজেদের দেশের বাহিরে করিতে হয় শোষণের ক্ষেত্রের সন্ধান। এই শোষণের ক্ষেত্র উপনিবেশ। যতক্ষণ ঔপনিবেশিক শোষণের সুযোগ থাকে ততক্ষণ গণতান্ত্রিক আবরণটা পুঁজিপতিরা কিছুতেই ফেলিয়া দিতে রাজী হন না। কারণ তাহাতে বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের শ্রেণী-একনায়কত্ব (class dictatorship) ফ্যাসিষ্ট একনায়কত্বের নগ্নমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, অদূর ভবিষ্যতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভরসা দিতে না পারিলে শ্রেণীসংগ্রাম প্রবলতর হইয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপন্ন করিয়া তোলে।

উপনিবেশ হইতে প্রাপ্ত অতিলাভ পুঁজিপতিদের লাভের হারকে কিরূপে বর্দ্ধিত করিয়া লাভের হার হ্রাস হওয়া নিবারণ করে তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন স্বতঃই উঠিয়া থাকে যে, ঔপনিবেশিক অতিলাভ দ্বারা লাভের হার হ্রাস হওয়া চিরকাল রোধ করিতে পারা যাইবে কি না? লাভের হ্রাস হওয়া নিবারণ করিতে হইলে সর্ব্বদাই লাভের হার বর্দ্ধিত করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি শুধু একচেটিয়া নীতিদ্বারা লাভের হার হ্রাস হওয়া নিবারণ করার একটা সীমা আছে, যে সীমা অতিক্রান্ত হইলে ঔপনিবেশিক শোষণ ছাড়া আর উপায় থাকে না। কিন্তু উপনিবেশে যে-লাভটা অর্জ্জিত হয় তাহা অতিলাভ। এই অতিলাভের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন নূতন উদ্ভাবিত শ্রমসাশ্রয়কারী কলযন্ত্রের প্রথম ব্যবহার দ্বারা কোন একজন শিল্পোদ্যোগী অধিক হারে যে লাভ অর্জ্জন করেন উপনিবেশে অর্জ্জিত লাভ সেই জাতীয়। ঐ শিল্পোদ্যোগী যেমন নবাবিষ্কৃত কলযন্ত্রের প্রথম ব্যবহারের সুবিধাটা বেশী দিন ভোগ করিতে পারেন না, উপনিবেশে অর্জ্জিত অতিলাভ সম্বন্ধেও তাহা তেমনি সত্য কিনা তাহা আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

কোন একটা নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণ দেখিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম হয় নাই। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী কতিপয় সহরে বিক্ষিপ্ত ভাবে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল বটে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক যুগ প্রকৃত পক্ষে ষোড়শ শতাব্দী হইতেই

আরম্ভ হয়। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার জন্য পুঁজি-পতিদের হাতে থাকা চাই প্রচুর মূলধন, আর চাই তাঁহাদের তাঁবে স্বীয় শ্রম বিক্রয়কারী বহু সংখ্যক শ্রমিক। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার এই দুইটি উপাদানই তৈয়ার হইতেছিল। নূতন মহাদেশ আমেরিকার আবিষ্কার এবং জলপথে প্রাচীর সহিত বাণিজ্য ইউরোপীয় বণিক-দিগকে প্রচুর অর্থ যোগাইয়াছিল এবং ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদ যোগাইয়াছিল স্বীয় শ্রম বিক্রয় করিতে সমর্থ স্বাধীন শ্রমিক। এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী অর্থনৈতিক মতবাদ গড়িবার ভিত্তি যোগাইয়াছিল রিফরমেশন আন্দোলন অর্থনীতিকে ধর্ম্মাচার্য্যদের শাসন হইতে মুক্তি দিয়া।

নূতন মহাদেশ আমেরিকায় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের পথপ্রদর্শক স্পেন। পর্ত্তুগালের স্থান ছিল স্পেনের পরেই, যদিও নূতন মহাদেশ অপেক্ষা প্রাচীতেই ছিল তাহার বেশী প্রাধান্য। বাণিজ্য করিতে আসিয়া পর্ত্তুগীজরা আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্য্যন্ত উপনিবেশের একটা লহর গড়িয়া তুলিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সোফালা, মোজাম্বিক এবং মেলিণ্ডায়, পারস্য উপসাগরে ওরমুজ দ্বীপপুঞ্জে, ভারতে মালাবারের সমগ্র উপকূল ভাগে, সিংহল দ্বীপ, মালাক্কা এবং মলুকা দ্বীপের কতক অংশে এবং চীনের মেকাও-এ বাণিজ্য উপলক্ষে পর্ত্তুগীজদের ঔপ-নিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্পেনিশ আরমাডা হইতেই স্পেনের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলেও উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্তও স্পেন তাহার উপ-নিবেশগুলি রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু প্রাচী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই হল্যাণ্ড পর্ত্তুগালকে হটাইতে আরম্ভ করে এবং পর্ত্তুগালের অধিকারের অধিকাংশই হল্যাণ্ডের হাতে চলিয়া আসে। কিন্তু আফ্রিকার উপকূলস্থ অধিকার এবং দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল পর্ত্তুগাল অনেক রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বাণিজ্য এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দিক হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হল্যাণ্ডের স্বর্ণযুগ। এই শতাব্দীতেই হল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দিল ইংলণ্ড। ক্রমওয়েল ইংলণ্ড এবং হল্যাণ্ড একত্র করিয়া একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং হল্যাণ্ডও প্রথমে তাহাতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু এই যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব করিবে কে,—ইংলণ্ড না হল্যাণ্ড—এই প্রশ্ন লইয়াই উক্ত প্রস্তাব ফাঁসিয়া গেল। ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নেভিগেশন আইন বিধিবদ্ধ হয়। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যসম্ভার ডাচ্ বণিকদের জাহাজে করিয়াই আমদানি-রপ্তানি করা হইত। নেভিগেশন আইনের ফলে হল্যাণ্ডের জাহাজী ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও ইউট্রেচ্‌টের সন্ধির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে তাহার প্রভাব তেমন ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই সন্ধির পর হইতে প্রাচীর বাণিজ্য হল্যাণ্ডের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে, যদিও পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ডাচ বণিকরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে ডাচ বণিকদের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ভারতের বাণিজ্যে হল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিলুপ্ত হইল, হল্যাণ্ড সন্তুষ্ট রহিল শুধু পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ লইয়া।

সপ্তদশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে নূতন মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উদ্যোগী হয় নাই। নূতন মহাদেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠায় ফ্রান্স ইংলণ্ডের পিছনে পড়িয়াছিল, এ কথা সম্পূর্ণ ঠিক না হইলেও ইউরোপে ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ায় ঔপনিবেশ স্থাপনের দিকে ফ্রান্স তেমন মনোযোগ দিতে পারে নাই। সাত বৎসরের যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (১৭৫৬—১৭৬৩) ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক অধিকার ছিল উত্তর-আমেরিকার উপনিবেশ-গুলিতে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে, পশ্চিম ভারতীয় শর্করা দ্বীপ-পুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে, আফ্রিকার উপকূল, ভারত এবং অন্যান্য স্থানে কতগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্রে। ফ্রান্সের অধিকারে ছিল উত্তর-আমেরিকার কানাডা, লুসিয়ানা, শর্করা দ্বীপ পুঞ্জের গোয়াদে লুপে, মার্টিনিক, এবং আফ্রিকা ও ভারতের কয়েকটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। উত্তর-আমেরিকার আমস্টার্ডাম দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রাজিল, আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের এন্টিপড্ দ্বীপপুঞ্জের ভ্যান ডি ম্যান্‌সল্যাণ্ড, এবং পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন

স্থানে ছিল হল্যাণ্ডের আধিপত্য। ঔপনিবেশ ও বাণিজ্য লইয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রতিযোগিতাই সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের কারণ! ইংরেজ এবং ডাচ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই যুদ্ধ করা হইয়াছিল। (See Expansion of England, pp. 151-52)। এই যুদ্ধের উপসংহারে ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য একেবারেই ক্ষুদ্র হইয়া গেল—নূতন মহাদেশে ফ্রান্স তাহার উপনিবেশগুলি হারাইল, ভারতেও তাহার অধিকার রহিল না, শুধু পণ্ডিচেরী তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। গতমহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকাংশই অর্জ্জিত হয় ওয়াটালু'র যুদ্ধের পরে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে টারগট (Turgot) বলিয়াছিলেন, উপনিবেশগুলি ফলের মত—পাকিলেই বোঁটা খসিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। টারগটের এই উক্তি উত্তর-আমেরিকায় বৃটেনের মূল উপনিবেশগুলি সম্পর্কে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। সাত বৎসরের যুদ্ধে ফরাসী উপনিবেশগুলি ইংলণ্ড পাইল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদেই মূল বৃটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ইহাতে আমেরিকায় ইংলণ্ডের যে ঔপনিবেশিক ক্ষতি হইয়াছিল তাহা পূরণ হইল ভারতে, অষ্ট্রেলিয়ায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিউজিল্যাণ্ডে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা পাকা ফলের মত বোঁটা খসিয়া পড়িয়া যায় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। উপনিবেশ সম্পর্কে টারগটের অভিমতে বিশ্বাসী ছিল বলিয়াই ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ ওয়াটালু'র পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্য্যন্ত উপনিবেশ সংগ্রহে মন দেয় নাই, একথা সত্য নহে, যদিও একথা সত্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকেই উপনিবেশের মূল্য এবং উপনিবেশ সম্পর্কে মতবাদ নূতন করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কলযন্ত্রের আবিষ্কার অষ্টাদশ শতব্দীর মধ্য ভাগে ইংলণ্ডে উৎপাদন-কৌশলের বিপুল পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। ইহাকেই বলা শিল্প-বিপ্লব। এই শতাব্দীর চতুর্থ পাদে ফ্রান্সেও শিল্প বিপ্লব সুরু হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রান্সের ভূমিদাসরা তখনও মাটির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া স্বীয় শ্রমশক্তি-বিক্রেতা স্বাধীন মজুরে পরিণত হয় নাই। ইংলণ্ডে যাহা ধীরে ধীরে সাধিত হইয়াছিল ফ্রান্সে তাহারই জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের মত একটা বিপুল আলোড়নের। বিপ্লবের পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সে অতি দ্রুত কলযন্ত্রের ব্যবহার প্রসার লাভ করে। বেলজিয়মেও শিল্পের প্রসার হইতেছিল, কিন্তু বেলজিয়ম অতি ক্ষুদ্র দেশ। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা জার্ম্মানীতে প্রসার লাভ করে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পরে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে রাশিয়া ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পথে অগ্রসর হয় নাই। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রথম যুগে বাণিজ্যের প্রাধান্যই ছিল শিল্প প্রাধান্যের দ্যোতক, কিন্তু কলযন্ত্রের আবির্ভাব শিল্পের প্রাধান্যকে বাণিজ্যে প্রাধান্যের দ্যোতক করিয়া তুলিল। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা হইতে উৎপাদন কৌশলে বিপ্লব সাধিত হওয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। ইংলণ্ডে যখন শিল্প-বিপ্লব সাধিত হইল তখন প্রকৃত পক্ষে শিল্প-বাণিজ্যে কেহই তাহার প্রতিযোগী ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু যখন ইউরোপের মূল ভূখণ্ডেও শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া গেল, তখন ইউরোপের বাহিরে নূতন বাজার এবং কাঁচামাল সংগ্রহ ও মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র সংগ্রহ করিবার প্রতিযোগিতাও দেখা দিল নূতন করিয়া।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কঙ্গো সম্পর্কে ষ্ট্যানলীর আবিষ্কারের বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর আফ্রিকার ভূখণ্ড লইয়া কাড়াকাড়ি অত্যুগ্র রূপ ধারণ করে তাহা সত্য। কিন্তু পর্ত্তুগীজরাই আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের পথপ্রদর্শক। কেপ কলোনী পর্ত্তুগীজদের হাত হইতেই ডাচদের হাতে যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের অর্দ্ধ শতাব্দী পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে কেপ কলোনী শেষবারের মত হাত বদলাইয়া ইংরেজের হাতে আসে। আফ্রিকার উত্তরোপকূলে উপনিবেশ সংগ্রহের কার্য্য আরম্ভ হয় ইহার পনর বৎসর পর। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারতের শাসনভার বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবার ২৮ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স আলজিরিয়া দখল করার পর হইতেই ইহার সূত্রপাত। ইহার কয়েক বৎসর

পরে ন্যাটাল আসে বৃটিশ অধিকারে। আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। তবে এইটুকু আমরা বলিতে পারি উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে আফ্রিকা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে আলজিরিয়া ছাড়া আফ্রিকায় ফ্রান্সের অধিকার খুব সামান্যই ছিল। কেপ কলোনী এবং আরও সামান্য কিছু ছিল বৃটিশের অধিকারে। গিনির সামান্য একটু অংশে এবং আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই-একটি অঞ্চলে ছিল পর্ত্তুগীজদের অধিকার। স্পেনের ছিল রিও-ডি-ওরো এবং গিনির সামান্য এক টুকরা। কিন্তু ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে আফ্রিকার পঞ্চাশ লক্ষ বর্গমাইল ভূমি বৃটেন, ফ্রান্স এবং জার্ম্মানীর করতলগত হয়। উত্তর-আফ্রিকাস্থিত তুরস্কের সাম্রাজ্য স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল। ইংলণ্ডের ভাগে যাহা পড়িল তাহা মিশরের উপর প্রটেক্টরেট অধিকার। ফ্রান্সের সঙ্গে একযোগে এই অধিকার ইংলণ্ড পাইলেও ফ্রান্স ছিল নিষ্ক্রিয় অংশীদার। শিল্পবিপ্লব ইটালীতে কিছু বিলম্বে আসিয়াছিল বলিয়াই যে ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে। ১৮৯৬ সালে আবেসিনিয়ার নিকট ইটালীর পরাজয়ই তাহার কারণ।

উল্লিখিত দশ বৎসর (১৮৮০-৯০) এশিয়াতেও সাম্রাজ্য বিস্তারের উল্লেখযোগ্য যুগ। এই দশ বৎসরের মধ্যেই বৃটেন ব্রহ্মদেশ, মালয় ও বেলুচিস্থান অধিকার করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডিজরেলি মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া অভিনন্দিত করিবার দশ বৎসরের মধ্যে ইন্দোচীনের বিস্তৃত অঞ্চল ফ্রান্সের অধিকারে আসে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি লইয়াও এই সময়ে কাড়াকাড়ি পড়িয়াছিল।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ক্রমোন্নতি করিতে ব্যস্ত থাকায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে উপনিবেশ সংগ্রহের পথে পা বাড়াইতে পারে নাই। জাপানের অবস্থাও তখন ছিল কতকটা ঐ রকমের। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ভাগ হইতেই জাপান ধনতন্ত্রের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং এই শতাব্দীর শেষ দশকে জাপান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অনুরূপ হইয়া উঠে। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী রূপ আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের কোরিয়া দখলের সময় হইতে।

চীনের প্রতিও ইউরোপীয় শক্তিবর্গের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই চীনে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম সূচনা হয়। আফিমের যুদ্ধ হইতেই ইহার সূত্রপাত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চীন বৃটেনকে হংকং দিয়া সন্ধিস্থাপন করে। আফ্রিকা ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া যাইবার পর আবার যখন চীনের উপর ইউরোপীয় শক্তিবর্গের লোলুপ দৃষ্টি পড়িল তখন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও তাহাদিগকে ভাবিতে হইয়াছিল। জাপানের কোরিয়া অধিকারের পর চীনের ভিতর জাপান আর যাহাতে অগ্রসর হইতে না পারে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ তাহার উপায় উদ্ভাবনে মনোযোগী হইলেন—চীনের নিকট হইতে আরও সুবিধা আদায়ের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। রাশিয়া মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিতে গিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে শুধু ব্যর্থই হয় নাই, রুশ-জাপান যুদ্ধের পরিণাম দেখিয়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আফ্রিকার মত চীনকে ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার অনেক অসুবিধা এবং বাধাবিঘ্ন ছিল। অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ চীনকে শোষণ করিবার জন্য একটি সর্ব্বসম্মত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নিকট প্রাচীতেও প্রভাবাধীন অঞ্চল সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছিল। কাইজারের বাগদাদ রেলওয়ে স্থাপনের একটা পরিকল্পনা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ধাক্কা খাইয়াই তুরস্কে ১৯০৮ সালে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লব হয়। এই বিপ্লবের ফলে তুরস্কে যে নূতন শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাতে তাহার পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইল না। চীনের মতই নিকট প্রাচীর রাজ্যগুলি ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার অসুবিধা এবং বিপদ মোটেই উপেক্ষার বিষয় ছিল না, বরং আফগানিস্থান, পারস্য এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষা করা ভারত সাম্রাজ্যের

* L. Woolf, Economic Imperialism, pp. 33-34.

নিরাপত্তার দিক হইতে বিশেষ ভাবেই প্রয়োজনীয়। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের (১৮৫৬) পর হইতে তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। পারস্তে বৃটেন এবং রাশিয়া এই দুই রাষ্ট্র শক্তির কতখানি প্রভাব থাকিবে তাহা ১৯০৭ সালের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনে স্থির হয়। কিন্তু ইহারই দুই বৎসর যাইতে-না-যাইতেই পারস্তের দ্বিতীয় বিপ্লবের সময় উত্তর-পূর্ব্ব পারস্তের আজারবাইজান প্রদেশটি রাশিয়া দখল করিয়া লয়।

ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে উপনিবেশ সংগ্রহের ব্যাপারে ইটালীই বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৯১২ সালে ইটালী তুরস্কের অধিকারভুক্ত ট্রিপলি দখল করিয়া লয়। অতঃপর উহারই নাম হয় লিবিয়া।

উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতেই বুঝা যাইতেছে গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে, সমগ্র পৃথিবীই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হইয়া গিয়াছিল—উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতার আর স্থান ছিল না। কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নূতন উপনিবেশ পাইতে হইলেই অপর কাহারও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ভাগ ভাগ বসান ছাড়া আর উপায় নাই। উপনিবেশের এই পুনর্বণ্টনের চেষ্টার নামই যুদ্ধ।

গত মহাযুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণটা সহজে আমাদের চক্ষে ধরা পড়ে নাই। কিন্তু উহার অর্থনৈতিক কারণ সম্বন্ধে এখন সকলেই নিঃসন্দেহ। গত মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশগুলির কতকটা যে পুনর্বণ্টন হইয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। ভার্সাই সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যও বিলুপ্ত হইল। এইগুলি কাহার কাহার ভাগে পড়িল এখানে তাহা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। এই যুদ্ধের আর একটি উল্লেখযোগ্য ফল এসিয়াস্থিত তুরস্কের সাম্রাজ্যের বিলোপ। তুরস্কের সাম্রাজ্য গেল বটে, কিন্তু তাহার স্থানে বৃটেন এবং ফ্রান্সের প্রভাবাধীন কয়েকটি আরব রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল। ইটালী বিজয়ী পক্ষে থাকিলেও উপনিবেশের দিক হইতে তাহার উল্লেখযোগ্য কিছুই লাভ হয় নাই। জাপানও গত মহাযুদ্ধে উপনিবেশের দিক দিয়া কিছুই লাভ করে নাই। সুতরাং গত মহাযুদ্ধের পরে উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টন হইল বটে, কিন্তু জার্ম্মানী উপনিবেশহীন হইল এবং ইটালী ও জাপানের উপনিবেশের ক্ষুধাও মিটিল না। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের মূলে যে জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের উপনিবেশ সংগ্রহের প্রচেষ্টা তাহা আমরা জানি। এই তিনটি ধনতান্ত্রিক দেশের সাম্রাজ্যস্পৃহাকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধের পরে তাহাদিগকে কার্য্যকরী ভাবে নিরস্ত্র রাখিবার পরিকল্পনার কথা আমরা শুনিয়াছি। এই পরিকল্পনার মধ্যে উপনিবেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কোন কথা নাই। সুতরাং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পরে অতি-সাম্রাজ্যবাদ (Super-Imperialism) অর্থাৎ অল্প কয়েকটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র মিলিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমগ্র পৃথিবী শোষণের পরিকল্পনার সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পরেও ঠিক এই রকম অবস্থারই উদ্ভব হইয়াছিল।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশ মিলিয়া সমগ্র পৃথিবী শোষণ করা সম্ভব কিনা, তাহা এখনও প্রমাণিত হয় নাই। বরং দেখা গিয়াছে যে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে উপনিবেশে লাভজনক উপায় অর্থনিয়োগ করার ক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত ছিল, যুদ্ধের পরে এই ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঔপনিবেশিক অতিলাভের সীমা যে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে গত মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যে অভূতপূর্ব্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে সত্য, কিন্তু শুধু প্রবল এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক সঙ্কটই ধনতন্ত্রের পতনের কারণ হইবে কিনা সে-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্বন্ধে প্রফেসার রবিনস্ বলিয়াছেন,

> "There have been many depressions in modern economic history, but it is safe to say that there has never been anything to compare with this." (The Great Depression).

গত সঙ্কট অভূতপূর্ব্ব হইলেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উহা কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। ভবিষ্যতেও কাটাইয়া উঠিতে পারিবে ইহাই অনেকের ধারণা। কারণ পৃথিবীতে অনুন্নত দেশ এখনও অনেক রহিয়াছে, নূতন মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্রের সত্যই অভাব হইয়াছে, তাহাও নয়।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি লাভজনক উপায়ে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। তাহার কারণ ইহা নয় যে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র নাই। ক্ষেত্র আছে বটে, কিন্তু সীমা সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের প্রসার ইহার একটা কারণ বটে; কিন্তু গত মহাযুদ্ধের সময়ে এবং পরে পৃথিবীর অনেক অনুন্নত দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থা যে উন্নত এবং বিস্তৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত মহাযুদ্ধের পরেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিকে অনুন্নত দেশে নূতন গড়া শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। একথা খুবই ঠিক যে, উপনিবেশগুলির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় ঔপনিবেশিক মূলধন কোন রক্ষণমূলক ব্যবস্থার সাহায্য পায় নাই এবং ঔপনিবেশিক শিল্পপ্রচেষ্টা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। তথাপি উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কিছু-না-কিছু সঙ্কুচিত হইয়াছে। ঔপনিবেশিক এই শিল্প-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার চেষ্টা দেখা যায় আন্তর্জ্জাতিক কার্টেল গঠনের মধ্যে।

গত মহাযুদ্ধের পর উপনিবেশগুলির পুনর্বণ্টন হইল বটে, কিন্তু বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাইল না। প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক শোষণের সুবিধার জন্যই আন্তর্জ্জাতিক কার্টেল গত যুদ্ধের পরে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলগুলি নূতন এক রকমের একচেটিয়া ব্যবস্থা। সুতরাং এই ব্যবস্থাতেও লাভের হার এক সময়ে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিতে বাধ্য যদি মূলধন নিয়োগের নূতন ক্ষেত্র পাওয়া না যায়। দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক একচেটিয়া চুক্তিদ্বারা শোষণের কাজও শান্তিপূর্ণভাবে চলিতে পারে না। কারণ, এই চুক্তি দ্বারা পৃথিবীর বাজারকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া হয়। এই চুক্তির এক এক পক্ষ কতকগুলি দেশ বাজার স্বরূপ পায় যেখানে তাহারা অপর পক্ষের প্রতিযোগিতা-হীন হইয়া পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক একচেটিয়া ব্যবস্থা যে কত দূর গড়াইতে পারে তাহা আন্তর্জ্জাতিক কার্টেল হইতে বুঝিতে পারা যায় এবং বিভিন্ন পুঁজিপতির দল কি উদ্দেশ্যে আন্তর্জ্জাতিক কার্টেল গঠন করে, উহারই মধ্যে সেই উদ্দেশ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। লেনিন লিখিয়াছেন,

"International cartels show to what point capitalist monoplies have developed and they reveal the object of the struggle between the various capitalist groups." (*Imperialism, the Highest Stage of Capitalism*).

আন্তর্জ্জাতিক কার্টেলকে আমরা পুঁজিপতিদের আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতাও বলিতে পারি। কিন্তু এই সহযোগিতা দ্বারা বর্ত্তমান যুদ্ধকে নিবারণ করা সম্ভব হয় নাই। প্রাক্‌যুদ্ধের আন্তর্জ্জাতিক কার্টেগুলি ছিল বে-সরকারী ব্যবস্থা, যদিও এই ব্যবস্থার বিভিন্ন পক্ষ নিজ নিজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন। যদি এই আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তাহা হইলেও তাহার ফল অনুরূপ হইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্যই রাষ্ট্রশক্তি নিয়োজিত করিয়া থাকে। অধ্যাপক লাস্কী তাঁহার A Grammar of Politics-এ লিখিয়াছেন,

"In a capitalist society, like Great Britain, for instance, the substance of law will, similary, be predominantly determined by the owerns of capital."

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পুঁজিপতিরা মূলধন নিয়োগ করেন লাভ করিবার জন্য, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য নয়। উপনিবেশে মূলধনের নিয়োগের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিপতিরা যে মূলধন উপনিবেশে নিয়োগ করেন, তাহা তাঁহারা নিজের দেশে নিয়োগ করিলে, তাঁহাদের স্বদেশবাসী সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইত। মিঃ জে, এ হবসন তাঁহার Imperialism নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, আয় এবং পণ্যের চাহিদার শক্তি যদি যথাযোগ্য ভাবে বণ্টন করা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে যাহা কিছু তৈয়ার হইবে তাহার সমস্তই ইংলণ্ডেই ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু আয় এবং ক্রয়শক্তির যথাযোগ্য বণ্টন করিতে গেলেই মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিদেশের বাজারে পণ্য বিক্রির চেষ্টার পরিবর্ত্তে দেশের বাজারেই যদি সব বিকাইতে হয়, তাহা হইলে মজুরি বৃদ্ধি করা ছাড়া কোন পথ দেখা

যায় না। মজুরি বৃদ্ধিই ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের এক মাত্র পরিবর্ত্ত। কিন্তু ধনতন্ত্র যদি ধনতন্ত্রই থাকে, তাহা হইলে লাভের হার হ্রাস না করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। পুঁজিপতিদের পণ্যের ক্রেতাদের আয় আর যত রকমে বৃদ্ধি হউক তাহাতে তাঁহাদের আপত্তির কোন কারণ নাই, বড় খুসী হওয়ারই কারণ, কিন্তু নিজেদের লাভের অংশ কম করিয়া মজুরি বৃদ্ধি করিতে কিছুতেই তাঁহারা রাজী হইবেন না, রাজী হইলেও লাভ তাহাতে হইবে না। কোন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র উপনিবেশের লোভ ছাড়িয়া নিজের দেশের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সকল দেশের পুঁজিপতিরাই যেন জৈব-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই ঔপনিবেশিক অধিপত্য রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। এবং ঔপনিবেশিক আধিপাত্য সামান্য পরিমাণেও ক্ষুণ্ণ হওয়ার আন্দোলনকে দৃঢ় হস্তে দমন করিতে পরাঙ্মুখ হন না। ধনতন্ত্র যতদিন ধনতন্ত্র থাকিবে তত দিন পুঁজিপতিরা তাঁহাদের বাড়তি মূলধনকে নিজেদের দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে ব্যয় করিবেন না কিছুতেই। ইহাই যদি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করা খুব কঠিন নয়।

পৃথিবীর সসীমতা দ্বারাই ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের জন্যই বর্ত্তমানে এক ধনতান্ত্রিক দেশের উপনিবেশে ভাগ না বসাইয়া অপর ধনতান্ত্রিক দেশের পক্ষে নূতন উপনিবেশ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য। যুদ্ধের অনিবার্য্যতাকে বাদ দিতে হইলে একমাত্র উপায় থাকে অতি-সাম্রাজ্যবাদ। এই অতি-সাম্রাজ্যবাদের কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অতি-সাম্রাজ্যবাদের অর্থ সম্মিলিত ভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কর্ত্তৃক সমগ্র পৃথিবী শোষণ। লেনিন মনে করেন, অতি-সাম্রাজ্যবাদ কখন সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি সম্ভব না হয় তাহা হইলে একমাত্র উপায়ান্তর থাকে সমাজতন্ত্রবাদের অভ্যুত্থান এবং ধনতন্ত্রের বিলোপ। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্ত্রবাদের যদি অভ্যুত্থান হয়, তবে কোন পুরাতন ধনতান্ত্রিক দেশে হইবে না, হইবে শিল্পে কম উন্নত কোন ধনতান্ত্রিক দেশে (the weekest link) এবং এই অভ্যুত্থান হইবে মহাযুদ্ধের মত কোন গুরুতর সঙ্কটের সময়। অতি-সাম্রাজ্যবাদ সম্ভবপর নয় কেন, আমরা এখানে তাহাই আলোচনা করিব।

সম্মিলিত ভাবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে উপনিবেশগুলি শোষণের অর্থ এই হইতে পারে যে, উপনিবেশের অপর্য্যাপ্ত শ্রমিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করিবার জন্য উপনিবেশে মূলধন রপ্তানির পথে কোন বাধা থাকিবে না। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বিভিন্ন উপনিবেশগুলির মালিক দেশগুলির মধ্যে একটা সন্তোষজনক চুক্তির ফলে মূলধন রপ্তানির বাধা দূরীভূত হইল। অনুন্নত দেশগুলিতে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ শ্রমিক পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং যেরূপ অপর্য্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, তাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মালিক দেশগুলি তাহাদের মূলধন লাভজনক উপায়ে নিয়োগ করিবার সুযোগ পাইবে। মূলধন রপ্তানির বাধা দূর হওয়ায় উপনিবেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মূলধন রপ্তানি হইতে থাকিবে। ফলে মালিক-দেশগুলিতে মূলধনের নিয়োগ কমিয়া আসিয়া শ্রমিকের চাহিদা হ্রাস পাইবে। শ্রমিকের এই চাহিদা হ্রাস দেখা দিবে মজুরি হ্রাসের মধ্যে। উপনিবেশে যত বেশী পরিমাণে মূলধন নিয়োজিত হইতে থাকিবে, মালিক দেশের শ্রমিকদের মজুরি ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে, এবং শেষে মালিক দেশের শ্রমিকদের মজুরি উপনিবেশের শ্রমিকদের মজুরের স্তরে আসিয়া নামিবে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলি যে মজুরি হ্রাসের পথে বাধা সৃষ্টি করিবে, তাহা আমরা অবশ্যই অনুমান করিতে পারি। এই প্রতিরোধে বাধা দিবার পক্ষে এক উপায়, আরও নূতন উপনিবেশের সন্ধান করা। কিন্তু অতি-সাম্রাজ্যবাদের ফলে তাহার সম্ভাবনা আর থাকিবে না। আর এক উপায় থাকিবে অধিকতর শ্রম-সাশ্রয়কারী নূতন কলযন্ত্রের উদ্ভাবন। যদি এইরূপ কলযন্ত্র উদ্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে ফ্যাসিষ্ট নীতি অবলম্বন করা ছাড়া আর উপায় থাকিবে না।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি যদি নিজেদের শ্রমিদের মজুরি হ্রাসে বাধা দেওয়া প্রতিরোধ করিতে পারেও, তাহা হইলেও, ধনতন্ত্র তাহার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ হইতে মুক্তি পাইবে না। মূলধনই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় প্রধান বাধা, কার্ল মার্কসের এই উক্তির সত্যতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। পণ্য ব্যবহারের ক্ষমতা যদি বর্দ্ধিত না হয়, জনসাধারণে ক্রয় শক্তি যদি না বাড়ে, তাহা হইলে অর্থনৈতিক সঙ্কটকে রোধ করা সম্ভব নয়। মজুরি যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে জনসাধারণের ক্রয়-শক্তিও কমিয়া যাইবে। পণ্যবিক্রয়ের জন্য লাভজনক বাজারের অভাবে কলকারখানা বন্ধ রাখিতে হইবে, শ্রমিকরা বেকার বসিয়া থাকিবে। ধনতান্ত্রিক-ব্যবস্থা তখনই এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইতে সমর্থ যখন বহুসংখ্যক শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হইয়া, বহু মূলধন নষ্ট হইয়া নূতন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিবে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এই ভাগ্যলিপি বহুদিন পূর্ব্বেই মার্কস উদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাহার পর শত বৎসর ধরিয়া ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ কার্ল মার্কসের ভুলত্রুটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ধনতন্ত্রকে সঙ্কট হইতে ত্রাণ করিতে পারেন নাই।

অতি-সাম্রাজ্যবাদ আসলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির একটা সংহতি। এই সংহতির মধ্যেও ধনতন্ত্র সুলভ স্ববিরোধ থাকিয়াই যাইবে। মালিকদেশ তাহার উপনিবেশগুলিতে রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘের অনুকূলে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। উপনিবেশগুলির অর্থনৈতিক শোষণের ব্যবস্থাই শুধু আন্তর্জ্জাতিক সংঘের হাতে থাকিবে। অন্য কোন দুর্ব্বল ধনতান্ত্রিক দেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়া যাহাতে উপনিবেশের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু উপনিবেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে মালিকদেশের আধিপত্য এবং অর্থনীতি ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্য সঙ্ঘের আধিপত্য একটা স্ববিরোধী অবস্থার সৃষ্টি না করিয়া পারে না। কারণ রাষ্ট্রনৈতিক আধিপত্য দ্বারা অর্থনৈতিক আধিপত্য অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হইতে বাধ্য। অর্থনীতিকে রাষ্ট্রনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উপায় নাই। অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য আন্তর্জ্জাতিক সাম্রাজ্য সংঘ উপনিবেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে দৃঢ় হস্তে দমন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সংঘের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিলোপ করিতে পারিবে না। কারণ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদনের যত পরিকল্পনাই করুক উৎপাদন ব্যবস্থায় অরাজকতা দূর করিতে পারিবে না। বরং মূলধন রপ্তানির বাধা দূর হওয়ায়, পণ্য উৎপাদনে অরাজকতা আরও বৃদ্ধি পাইবে। পণ্য উৎপাদনে অরাজকতা যত বৃদ্ধি পাইবে প্রতিযোগিতাও তত প্রবল হইয়া উঠিবে। একদিকে একচেটিয়া ব্যবস্থা, আর একদিকে প্রতিযোগিতা ধনতান্ত্রিক স্ববিরোধকে আরও প্রবল করিয়া তুলিবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে না, বরং মজুরি হ্রাসের মধ্যেই তাহার ফল প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পুঁজিপতি শ্রেণীর লাভ বৃদ্ধি করা। লাভ বৃদ্ধি করিতে গেলে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা যায় না। যদি বলা যায় যে, ইহাতে পরিণামে যখন পুঁজিপতি শ্রেণীরই লোকশান হইবে, সুতরাং পুঁজিপতি শ্রেণী জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের পণ্যক্রয়ের শক্তিকে বৃদ্ধি করিবে না কেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই করা যায়, কিন্তু ইহার উত্তর এই মাত্র হইতে পারে যে, পুঁজিপতিদের সহজাত প্রবৃত্তিই তাঁহাদের নিজেদের স্বার্থের প্রতিকূল। অতীতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। বেশী মজুরির অর্থনীতিকে পুঁজিপতিরা কোন দিনই পছন্দ করেন নাই। আর পছন্দ করিলেও তাহাতে তাঁহাদের লাভ হইতে পারে না। যত কম ব্যয় করিয়া যত বেশী তাঁহারা অর্জ্জন করিতে পারেন তাহারই দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য। জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিবার জন্য যেদিন তাঁহারা মূলধন নিয়োগ করিবেন, সেদিন তাঁহারা আর পুঁজিপতি থাকিবেন না। উপনিবেশের প্রতিও তাহাদের লোভ হইবে না, লাভ করাও আর তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। ধনতন্ত্রকে ধনতন্ত্র রাখিয়া তাহা করা সম্ভব নয়, যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে উহার আর ধনতন্ত্র থাকিবে না। ব্যক্তিগত লাভের বিলোপ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেই সম্ভব। কারণ সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হইল শ্রেণীসম্বন্ধের বিলোপ। আর শ্রেণী-সম্বন্ধই হইল ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি। ভূমি এবং মূলধন যে দিন সমাজের সম্পত্তি হইবে, তখনই শুধু উপনিবেশে মূলধন নিয়োগের পরিবর্ত্তে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য পণ্য উৎপাদন সম্ভব হইবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা কখনই সম্ভব নয়।

—

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

পঞ্চম বর্ষ | ভাদ্র, ১৩৫০ | ৮ম সংখ্যা

কবির প্রেরণা

এস, ওয়াজেদ আলি, বি-এ (কেন্টাব) বার-এট-ল

কবি বসে বসে ভাবছে একটা কিছু লিখতে হবে, সুন্দর কবিত্বময় কিছু, যা পড়ে লোকে বলবে, হ্যাঁ কবি বটে, প্রেরণা আছে। নিকটের বাঁশবনে একটা কোকিল কুহু কুহু রবে ডাকছিল—অবিশ্রান্ত. আবেগভরা তার সেই ডাক। কবি ভাবলে, এই কোকিলের ব্যথার কথাই লিখি। লেখবার জন্য সে কলম তুলে নিলে। কলম থেকে বেরুলো কিন্তু সেই মামুলি গৎ, হাজার হাজার কবি হাজার হাজার বছর ধরে যা হাজার হাজার রকমে লিখেছে। নূতনত্ব তাতে কিছু নাই। অসন্তুষ্ট কবি লেখা ছিঁড়ে ফেলে দিলে।

তার পর কবি ভাবলে বসন্তের এই আনন্দোজ্জ্বল প্রভাতের বিষয় কিছু লিখি। পাখিরা তাদের আনন্দ-কাকলীতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছিল। মলয় সমীর প্রাণে অব্যক্ত কত বাসনার সৃষ্টি করছিল। গাছের নূতন পাতা, নূতন ফুল স্নেহ-প্রীতি সম্ভাষণে পরস্পরের দিকে চাইছিল। কবি পদ্য-রচনা করতে সুরু করলে।

না, এও সেই মামুলি গৎ। কাব্যের জন্ম থেকে কবিরা সেই একই কথা লিখে আসছে। অবজ্ঞায়, অভিমানে কবি তার অসমাপ্ত লেখা দূরে ফেলে দিলে। আপন মনে সে ভাবলে—না আমার দ্বারা লেখা-টেখা কিছু হবে না। যাই, বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি। প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হবে। লেখার কথা ভেবে অনর্থক মাথা গরম করে লাভ নাই।

কবি বাইরে বেরুল। মাঠের পাশ দিয়ে তার পথ। পথের দুই ধারে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা; কি সুন্দর সেই ঘাস, কি চোখ-জুড়ান তার রং। পরিচিত ছেলে-মেয়েরা রেলের লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে ট্রেনের যাওয়া-আসা দেখছিল। কবি তাদের দিকে চাইতেই তারা লজ্জা-কুণ্ঠা-স্নেহ-প্রীতিভরা সর্ব্বজয়ী একটা হাসি হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে গেল। কি সুন্দর এই শিশুর দল, কি মধুর এদের হাসি!

কবি চলতে লাগলো। কতকগুলো তেলা-কুচোর ফল একটা পানের বোরোজের গা থেকে ঝুলছিল। নধর-কান্তি শিশুদের মতই তারা টুকটুক্ করছিল। বোরোজের জীর্ণ ধূসর গায়ে তাদের উজ্জ্বল হাসি-ভরা মুখগুলি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল—ঠিক যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদার কোলে টুকটুকে নধর-কান্তি নাতি-নাতিনীর দল! কবি আবার ভাবলে—কি সুন্দর এই জগৎ, কি প্রাণ-বিমোহন এর জীবন-প্রবাহ!

বেড়াতে বেড়াতে কবি এল তাদের বাগানের পুরানো ঘাটের কাছে। কত কি কারণে একযুগ ধরে কবি এই ঘাটের কাছে আসে নি। যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময় কবি রোজই এই ঘাটে আসত তার বন্ধুদের সঙ্গে, আর

এখানে কত কথাই না বলতো সবে, কত খেলাই না খেলতো তারা! আশা, আনন্দ, স্নেহপ্রীতি ভরা কি মধুর ছিল তখনকার সে জীবন!

অনেক দিন পরে অতীতের স্মৃতিভরা এই ঘাটটা দেখে কবির প্রাণ পুলক এবং বিষাদের অপূর্ব্ব এক ভাবাবেশে কেঁপে উঠল। অতীতের সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখগুলি তাদের প্রীতিভরা হাসি নিয়ে আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃত হয়ে কালের দীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করে, কবি সেই সুদূর অতীতের জগতে চলে গেল।

হঠাৎ নারকেল গাছের শুকনো একটা ডাল ধপ করে মাটিতে এসে পড়ল। কবির মোহ ভেঙ্গে গেল!

কোথা গেল রামধনুর বিচিত্র রঙে চিত্রিত জীবনের সেই উজ্জল দিনগুলি? অতীতের অতলস্পর্শ গহ্বরে তারা তলিয়ে গেছে। কোথা গেল সেই স্নেহ-স্নিগ্ধ মুখগুলি, কোথা গেল একান্ত অন্তরঙ্গ সেই বন্ধুরা সব? কেউ জীবন থেকে চির বিদায় নিয়েছে, কেউ সুদূর প্রবাসে চলে গেছে, কেউ একেবারে বদলে গেছে—অতীতের সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্ক নেই! অতর্কিতে দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু কবির চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। তার পর এল—অনুশোচনা!

কবি ভাবলে—সৌন্দর্য্যমণ্ডিত অবিস্মরণীয় অতীতের সেই দিনগুলিকে কালের করালগ্রাস থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমি কি করেছি? ক'জন বন্ধুর খবর নিয়েছি, ক'জন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি।

হঠাৎ লেখার কথা তার মনে এল। কবি বলে উঠল—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার বাণী যদি অক্ষম না হয়, সেই মধুর জীবনের স্মৃতি লুপ্ত হবে না। এই পুরানো ঘাটই হবে আমার কবিতার বিষয়বস্তু! আর অতীতে সেই মধু-মাখা জীবনই হবে তার অমৃত-সাগর!

কিছুকাল পূর্ব্বের ভাবের ব্যর্থ অনুসন্ধানের কথা কবির মনে পড়ল। কবি ভাবলে—লেখার জন্য ভাবের সন্ধান করলুম, ভাব এল না। নিজেকে জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ছেড়ে দিলুম—ভাব তার মধ্য থেকে আপনিই উথলে উঠল! কবিতা লেখবার জন্যে কলম ধরলে কবিতা আসে না। জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিলে, কবিতা কলম থেকে আপনিই ঝরে পড়ে। লেখার জন্যে ভাবের চর্চ্চা কিছু নয়, ভাবের অভিব্যক্তির জন্যই হচ্ছে লেখার চর্চ্চা। যারা লেখার জন্য ভাবের চর্চ্চা করে, তারা হ'ল dilettante কবি, সখের সাহিত্যিক; আর যারা ভাবের তাড়নায় লেখে তারাই হ'ল আসল কবি—বাণীর সন্তান!

পিলসুদ্‌সকি ও পোল্যাণ্ড

শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

রাজনীতিক জাতীয় স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনীতিক সমস্যাগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পোল্যাণ্ডের এই জাতীয় মনোবৃত্তি পিলসুদ্‌সকির ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। মধ্যযুগের ইউরোপে পোল্যাণ্ডের যথেষ্ট গৌরব-প্রতিপত্তি ছিল, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী হইতেই পোলরা নিতান্ত নগণ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই পোল্যাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মূল ছিল দুইটি:—জাতীয়তা ও পিলসুদ্‌সকি (Pilsudski)।

ডিক্টেটর পিলসুদ্‌সকি ১৯৩৫ খৃঃ দেহত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের অসাধারণ প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাই পোলিশ রাষ্ট্রকে জগতের সম্মুখে বিস্ময়করভাবে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলে।

দেশ-প্রাণ পোলিশ নায়ক যোসেফ পিলসুদ্‌সকি (Josef Pilsudski) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তিন সহস্রাধিক বিশ্বস্ত পদাতিক সৈন্য লইয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান সুরু করেন। এই সেনাদল বিখ্যাত কাক্রোকা

(Kadrowka—literally "Cadre") সৈন্য নামে পরিচিত। পিলসুদ্‌সকি এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে রুশ সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রাশিয়ার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আক্রমণ করেন। পরে এই তিন সহস্র সৈন্যের বাহিনীটিই একটি ডিভিসনে পরিণত হয়। ক্রমশঃ সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া তিন ডিভিসনে গিয়া দাঁড়ায়। অত্যল্পকালের মধ্যে এই ক্যাড্রোকা সৈন্যদল বিপুল সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। রাশিয়া যে-পোল্যাণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিল সেই পোল্যাণ্ড স্বদেশ রক্ষা করিবার জন্য চৌদ্দ সহস্র সৈন্যকে সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষাদান করে। এই সৈন্যদলের রণকৌশল অপূর্ব্ব। কিন্তু সংগ্রাম অধিককাল স্থায়ী হইবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ লোক ধারণা করিয়া বসিল যে, পিলসুদ্‌সকি একজন খামখেয়ালী উন্মাদ প্রকৃতির লোক। এমন কি পোলদের মধ্যেও এই প্রকার মনোভাব দৃষ্ট হইয়াছিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান ওয়ারশ অধিকার করে। অতঃপর জার্ম্মানী পোল সৈন্যদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করে, কিন্তু রাজনীতি-বিশারদ সুচতুর পিলসুদ্‌সকি পোলজাতির স্বাধীনতা খর্ব্ব হইবার সম্ভাবনায় জার্ম্মান সৈন্যের সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার ফলে পিলসুদ্‌সকিকে ম্যাগডেবার্গের (Magdeburg) কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হয়। কিন্তু তিনি তাঁর সৈন্যদলকে গোপনীয় কৌশলে সংগঠনকার্য্য চালাইবার এক অভিনব পন্থা উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। মৃত্তিকানিম্নে এই সংগঠনকার্য্য চলিত। পি, ও, ডব্লিউ (P. O. W.—Polska Organizaeja Wojskowa) এই সংগঠনকার্য্য চালাইত। ১৯১৮ খৃঃ জার্ম্মানীর পরাজয় ঘটে। অতঃপর পিলসুদ্‌সকি ওয়ারশতে ফিরিয়া আসিয়া পোলিশ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

লিজিয়নবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পিলসুদ্‌সকির হাতে গড়া। ১৯ বৎসর পর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের পোল্যাণ্ড ছিল তাঁহার নিজের তৈরী যন্ত্রবিশেষ। হিটলার কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড অধিকৃত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও লিজিয়নরা পূর্ব্বেকার ন্যায় পোল্যাণ্ড শাসন করিত। মার্শাল পিলসুদ্‌সকির মতানুসারে তাঁর অফিসরগণ চলিতেন, তিনি যাহা করিতেন তাহাই অন্ধের মত স্বীকার করিয়া লইতেন, তাঁহার উপর সকলেরই অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার কথা সকলেই বেদবাক্য মনে করিতেন, কাহারও মতামতের বালাই ছিল না। ইহাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, তাহাদের নেতা পিলসুদ্‌সকির মৃত্যু ঘটলেও পোলিশ জনসাধারণ তাহাদের নেতার নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে ভুলিবে না।

এই সকল অফিসরদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। জেনারেল থেডিয়াস ক্যাসপ্রিকি (Thaddeus Kasprizycki) সমর-সচিব ও পিলসুদ্‌সিকির রণক্ষেত্রের প্রথম তিন শত সৈন্যের ফিল্ড চীফ (field chief) ছিলেন। এক ডিভিসন সৈন্যের কমাণ্ডার জেনারেল জান সোনকৌস্‌কি (Jan Sownkowski). পিলসুদ্‌সকির পরবর্ত্তীযুগে পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট হইবার ইহার সম্ভাবনা ছিল। ইনি পিলসুদ্‌কির লিজিয়ন সেনাবাহিনীর বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। পিলসুদ্‌স্কির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জেনারেল এডওয়ার্ড রিজ স্মিগ্‌লি (Edward Rydz Smigly) তাঁর সৈন্যদলের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হন ও লিজিয়ন সৈন্যদলের প্রথম বাহিনীর ইনিই কমাণ্ডার ছিলেন। পিলসুদ্‌সকির মৃত্যুর পর কর্ণেল ভেলেরিয়ান স্লওয়েক (Colonel Velerian Slawek) প্রধান মন্ত্রী ও প্রথম তিন শত সৈন্যের গোয়েন্দা অফিসর ছিলেন। কর্ণেল ব্লেজেজ প্রিস্টর (Colonel Blazej Prystor) কয়েক বার প্রধান মন্ত্রী হন। পরে লিজিয়ন সৈন্যদের রাজনীতি-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রসিদ্ধ একটি স্থানের কর্ণেলদের বিশেষ এড্‌জুটান্ট (Adjutant) নিযুক্ত হন। কর্ণেল জোসেফ বেকের (Colonel Joseph Beck) পররাষ্ট্র সচিব হইবার কথা ছিল, কিন্তু পিলসুদ্‌সকি ইহাকে লিজিয়ন ও পি-ও-ডব্লিউদের প্রধান এড্‌জুটান্ট মনোনীত করেন। মারজিনড্রাম কোসালকাওস্কি (Marjan Zyndram Koscialkowski) সমাজ-সংস্কার বিভাগের সচিব ছিলেন, পরে ভিলনা আক্রমণকালে চীফ ইন্‌টেলিজেন্স অফিসরের কাজ করেন। অন্যান্য অফিসরদের মধ্যে কর্ণেল এডাম কক (Colonel Adam Koc, "ক্যাম্প অফ ন্যাশনাল

ইউনিটি” নামীয় দলের নেতা ছিলেন ও পি-ও-ডব্লিউ সংগঠনকার্য্যে পিলসুদ্‌সকির একজন বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন। গেজেটা পলস্কা (Gawelta Polska) সংবাদপত্রের সম্পাদক ও বোগুস্‌লভ মিডজিনস্কি (Boguslav Miedzinski) লিজিয়ন এবং পি-ও-ডব্লিউদের ইনটেলিজেন্স অফিসর ছিলেন। হেনরি ফ্লোয়ার রাজম্যান (Henri Floyar-Rajchman.) বাণিজ্য ও শিল্প-সচিব ছিলেন। পোলিশ ষ্টেট-ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল রোমান গোরেস্কি (General Roman Gorecki) কাড্রোকা (Kadrowka) দ্বিতীয় সৈন্য বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন। লিথুএনিয়ার ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ওয়াক্লা জেড্রিজেউইকজ্‌ (Waclow Jedresjewics) ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সচিব ছিলেন। পোল্যাণ্ডে লিজিয়নদের মধ্যে একমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জেনারেল সিকোরস্কি (General Sikorski) পিলসুদ্‌সকির ঘোরতর বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছিলেন।

ইঁহাদের হস্তেই পোল্যাণ্ডের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। পিলসুদ্‌সকিকে ইঁহারা অ্যালফা (Alpha) ও ওমেগা (Omega) রূপে দেখিতেন। আনত তিনশত সেনা-দলের মধ্যে যে-সকল অফিসর খ্যাতিলাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কাড্রোকা সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা ইটন ও অক্সফোর্ডের (Eton and Oxford) সামরিক বিদ্যালয়ের ন্যায় পিলসুদ্‌সকি কর্ত্তৃক এই বৈচিত্র্য-ময় পোলদেশেও সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারাই পরে পোল্যাণ্ডে প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। এই স্থলে আমরা পিলসুদ্‌সকির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া থাকি। পুত্র যেমন পিতার নিকট মানুষ হয়, পোল্যাণ্ডকেও তিনি সেই ভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

পিলসুদ্‌সকিকে সচরাচর “পিতা” বলা হইত না, কারণ শেষেরদিকে তিনি অত্যধিক বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহাকে জিয়াডেক (Dziadek) অর্থাৎ পিতামহ বলিয়া সম্বোধন করা হইত। তিনি তাঁর অফিসারগণকে “ডু” ও “টয়” ("Du" or "Toi") বলিয়া ডাকিতেন। তাঁর সম্মানার্থে কেহ কখনই এই সৌহার্দ্দব্যঞ্জক আহ্বানে সাড়া দিত না, বরং সকলে তাঁহাকেই কোমেনডাণ্ট (Komendant) অর্থাৎ প্রধান (chief) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বৃদ্ধ ডিক্টেটর অত্যন্ত কড়ামেজাজের লোক ছিলেন বটে, তাঁর ভাষা ছিল কর্কশ, ভাব ছিল সম্পূর্ণ ডিক্টেটরী, কিন্তু তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি সকলকেই আন্তরিকতা ও স্নেহমমতার সঙ্গে দেখিতেন। তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠিন, কুসুমের মত মৃদু। পোল্যাণ্ডকে তিনি নিজের প্রাণস্বরূপ মনে করিতেন।

অধুনা জিয়াডেকের জীবন-চরিত অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া অভিহিত হয়। জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যাহাকে বলেন “স্পোর্ট” (sport) তিনি ছিলেন গত যুদ্ধের ডিক্টেটরদের মধ্যে সেই “স্পোর্ট”। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তিনি কামাল আতাতুর্ক ডলফাস বা মুসোলিনীর ন্যায় সাধারণ পরিবারের লোক ছিলেন না। ভিলনার সন্নিকটে একটি ষ্টেটে ১৮৬৭ খ্রী: বিখ্যাত এক লিথুএনিয়ান পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। পোল্যাণ্ডকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই উহার বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ছিলেন খাঁটি ন্যাশনালিষ্ট (Nationalist)। সেই জন্য রাশিয়ার জারতন্ত্রকে মনেপ্রাণে তিনি ঘৃণা করিতেন।

পিলসুদ্‌সকির মাতাও পোল্যাণ্ডের হিতৈষিণী ছিলেন; প্রথমত:, রুশ জাতিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। পারিবারিক কিংবদন্তি বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও কালক্রমে সত্য সত্যই তিনি মার্কসপন্থী হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে একমাত্র সোসালিষ্ট (Socialist) আন্দোলন সক্রিয় ভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। পিলসুদ্‌সকি খারকভে মেডিসিন (Medicine) সাবজেক্ট লইয়া এম, ডি পড়িতেন। কিন্তু তখন তিনি এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন। তার একমাত্র কারণ তিনি বৈপ্লবিক কার্য্য-কলাপের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন। তৃতীয় আলেকজেণ্ডারকে (Czar Alexander III) হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তিনি ধৃত হইয়া সাইবেরিয়ায় সীসার খনিতে নির্ব্বাসিত হন। এই

অপরাধে লেনিনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে জীবন দান করিতে হইয়াছে। পিলসুদ্‌সকির একটি ভ্রাতারও ফাঁসি হয়। দেশময় বিপ্লব সৃষ্টি করাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল।

১৮৯৩ খৃঃ তিনি সাইবেরিয়া হইতে মুক্ত হইয়া সোসালিষ্ট সংবাদপত্র রোবটনিক-এর (Robotnik i.e. workman) সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই সংবাদপত্র নিয়মিত বাহির হইবার সময় তিনি নানাস্থানে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পুলিশ তাহার গুপ্ত পেরিপেটিক প্রিন্টিং প্রেস (Peripatic Printing Press) ক্রমাগত ৭ বৎসর অন্বেষণ করিয়াও বাহির করিতে পারে নাই। ১৯০০ খৃঃ তিনি ধৃত হন এবং ওয়ারশর নিকটবর্ত্তী দুর্গের "পাভিলিয়ন দশ নম্বর" ('Pavilion No 10') ভয়ঙ্কর কারাগারে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই ঘুটঘুটে অন্ধকার কারাগার শুধু নামজাদা বিপ্লবপন্থী রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। উন্মাদের ভান করিয়া তিনি সেস্থান হইতে মুক্তি পাইয়া পুনরায় পলায়ন করেন। কারাগারের চিকিৎসকগণ পাগল মনে করিয়া তাহাকে সেণ্ট পেটার্সবার্গের এসাইলিয়ামে প্রেরণ করেন। পিলসুদ্‌সকি দেখিলেন ইহা একটি মহাসুযোগ। তখন তিনি পোলিশ ডাক্তারের ছদ্মবেশে সরিয়া পড়েন ও পরে পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন।

কয়েক বৎসর তিনি রাজনৈতিক দস্যুবৃত্তিও করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃঃ তিনি চলন্ত ট্রেন হইতে মেলব্যাগ চুরি করিয়া ২০ লক্ষ রুবল (Two million roubles) লইয়া পলায়ন করেন। এই সময়ে সমাজতন্ত্রী ষ্ট্যালিন টিফিস ও জিওর-জিয়ায় (Tiffis & Georgia) বহুপ্রকার দুদ্ধর্ষ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর পরে পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধুত্ব সূত্র শিথিল হইয়া পড়ে। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পিলসুদ্‌সকি সমাজতন্ত্র মতবাদ ত্যাগ করেন। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, পোল্যাণ্ডকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে প্রথমতঃ অষ্ট্রিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে। সেই হেতু তিনি লিজিয়ন-বাহিনী সৃষ্টি করিলেন। এই সংগঠন কার্য্যে অষ্ট্রিয়াবাসীদের সমর্থন ছিল। পিলসুদ্‌সকি পরবর্ত্তী কালে তাঁহার একজন সমাজতন্ত্রী সহযোগীকে নিম্নোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন,—

"My friend, you and I caught the socialist train together. I got off at "Polish Independence" Station. I wish you good luck on your journey to Utopia" (Spectator May 17, 1935.)

যুদ্ধকালে পিলসুদ্‌সকির সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চর্য্য রহস্যময় গল্প শুনা যায়। তিনি পদস্থ অশ্বারোহী রুশ কর্ম্মচারীর ছদ্মবেশে ওয়ারশর কারাগারে উপস্থিত হইয়া পোলিশ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এই সকল বন্দীদের মুক্ত করিয়া অপর জেলে পাঠাইবার ক্ষমতা যেন তাঁহার ছিল। এইক্ষেত্রে চাতুরী তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত খেলিয়াছিলেন।

১৯১২ খৃঃ তিনি তাঁহার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রবাদী। ওয়ারশর সন্নিকটস্থ গ্রচাও-এ (Grochow) কোন একটি শিল্প ফ্যাক্টরীতে তিনি কাজ করিতেন। এই সময় জার্ম্মান কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পিলসুদ্‌সকি কারাগারে নিবদ্ধ হন। ১৯১৮ খৃঃ তিনি পোল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। অতঃপর তিনি পোল্যাণ্ড ষ্টেটের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁর পশ্চাতে সভাসদগণসহ তিনি প্রেসিডেণ্টের নির্দ্দিষ্ট শকটে আরোহণ করিয়া গ্রচাও অভিমুখে শকট চালাইলেন এবং গ্রচাও-এর শিল্পকেন্দ্র উপস্থিত হইয়া ফ্যাক্টরী হইতে নিজের স্ত্রীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মে। একটির নাম ওয়ানডা (wanda) ও অপরটির নাম জাডউইগা (Jadwiga)। এই দুইটি সন্তানের প্রতিই তাঁহার প্রগাঢ় মমতা ছিল।

পিলসুদ্‌সকি "কুপ ডি'টাট" (coup d'etat) দ্বারাই লিথুওনিয়ার নিকট হইতে ভিলনা (vilna) অধিকার করিতে সমর্থ হন। এই সম্বন্ধে ওয়ারশতে মিত্রপক্ষীয় মন্ত্রিগণ যখন প্রশ্ন করেন, তখন তিনি সরাসরি জানান যে, ইহাতে তাঁহার কোন প্রকার যোগাযোগ বা দায়িত্ব ছিল না। পরে ১৯২০ খৃঃ তিনি সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পরিহার করিয়া তাঁহার সকল মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমি সেদিন আপনাদের নিকট মিথ্যা

বলিয়াছিলাম—আমার তখন মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল সেই জন্যই হয়তো এই মিথ্যার অবতারণা করিতে হইয়াছিল। আমি এখন সাধারণের একজন, এখন আমি সত্য কথা বলিতে পারি। ভিলনা কুপের (vilna coup) দায়িত্ব আমারই।"

পিলসুদ্‌সকির মেজাজ ছিল যেমন কর্কশ—গোপন প্রিয়তাও ছিলেন তেমনি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় তাঁর মুখাকৃতি ফ্রিড্রিশ্ নিটস-এর (Friedrich Nietwsch) মুখাবয়বের সঙ্গে হুবহু সাদৃশ। অনেকে মনে করেন পিলসুদ্‌সকি সময় সময় নিজের ওজন বুঝিতে পারেন নাই। রুশদের নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে তিনি যে পাগলের ভান করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষে মোটেই শোভন হয় নাই। খামখেয়ালী বিবৃতি দ্বারা অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণকে বিমূঢ় করিবার মজ্জাগত অভ্যাস তাঁহার যথেষ্ট ছিল। বেক ও প্রিসটরকে কোন নীতি ও পরিকল্পনার বিষয় না বুঝাইয়া তাঁহাদের স্কন্ধে দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে মহা বিপদে ফেলিয়াছিলেন।

যুদ্ধাবসানে পিলসুদ্‌সকি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও দেশে পুনরায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গের সূত্রপাত ঘটিলে তিনি ১৯২৬ খৃঃ দেশের শান্তি রক্ষার্থে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি ওয়ারশর রাজপথগুলিতে ছয়শত উচ্ছৃঙ্খল লোককে হত্যা করেন। এই সময় হইতে তিনি যদিও সমর সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দেশ শাসনের সকল ভার তাঁহার উপরেই বর্ত্তে। এই সময় ডেপুটিগণ তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু বক্তৃতাচাতুর্য্যে তাঁহাদিগকে সকল সময়েই হাতের মুঠায় রাখিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় তাঁহার শৌর্য্য ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় পাওয়া যায়। পিলসুদসকির বক্তৃতাসমূহের কতকাংশ পাশ্চাত্য খবরের কাগজগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি মাতৃভূমি লিথুওনিয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাঁহার কন্যাদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহার মস্তিষ্কটিকে (Brain) ওয়ারশর বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ্চের জন্য প্রেরণ করিতে, হৃৎপিণ্ডটিকে ভিলনা (Vilna) নগরে ক্রিপট-এ (Crypt) তাঁহার মাতার ভস্মের সহিত রক্ষা করিতে এবং ক্রাকো নগরীর যেস্থানে পোল্যাণ্ডের প্রাচীন নৃপতির গোরস্থান সেই স্থানে তাঁহার মৃতদেহটিকে প্রোথিত করিতে আদেশ দেন।

জেনারেল এডুয়ার্ড রিজ-স্মিগলি (General Eduard Rydz-smigly) পোল্যাণ্ড-মার্শাল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইনি পেশাদারী সৈনিক ছিলেন না, পরন্তু একজন লিজিয়নেয়ার ছিলেন। ইনিই ১৯২১ খৃঃ কিয়েভ (Kiev) দখল করেন। রিজ-স্মিগলির যৌবনে চিত্রকর হইবার সাধ ছিল। সমগ্র সেনাদল তাঁহার প্রতি খুব অনুরক্ত। যে কোন দলকে তাঁহার অধীনে রাখিবার অসাধারণ ক্ষমতা তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সেই জন্য পিলসুদসকি ইঁহাকে সর্ব্বোচ্চপদের সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি ছাত্রের মত পড়াশুনা করিতেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ জুন মাসে তিনি পোল্যাণ্ডের প্রধান নাগরিকের (First citizen) সম্মান প্রাপ্ত হন। তাহার পশ্চাতে জনগণের ও সেনাবাহিনীর সমর্থন ছিল বলিয়া তিনিই কার্য্যতঃ পোল্যাণ্ডের ডিক্টেটরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

সমগ্র লিজিওনেয়ারদের (Legionaires) মধ্যে জেনারেল সনকোওস্কি (Soznkowski) পিলসুদসকির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি তাঁহার সঙ্গে মেগডেবার্গ (Magdeburg) কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। দশ বৎসর পরে পোল্যাণ্ডের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রবল ভাবে জাগ্রত হইয়াছিল। যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে, তাঁহার পুরাতন প্রভু পিলসুদস্কি ওয়ারশর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন তখন তিনি পোসনান-এ (posnan) এক ডিভিসন সেনার অধিনায়ক থাকিয়াও পিলসুদসকি বা গবর্ণমেণ্ট কাহারও সহিত যোগ দিলেন না। ইহার পরিবর্ত্তে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন। পোল্যাণ্ডে গৃহ-বিবাদ আরম্ভ হইবার পর সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে ভীষণ ভাঙ্গন ধরিয়াছে দেখিয়া আত্মসম্মান বজায় থাকে না বুঝিতে পারিয়া নিজের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি আহত হইলেন বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তাহার স্বদেশ প্রীতির

পুরস্কারস্বরূপ সনকোওস্কিই পিলসুদসকির পরে পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পিলসুদ্‌সকির মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে একজিকিউটিভ কমিটির সভ্যগণ একটি নূতন রকমের পরিকল্পনা করিয়া শক্তিশালী কনষ্টিটিউসন (Constitution) গঠন করিবার প্রয়াস পাইলেন।

কর্ণেল শ্লওয়েক (Colonel Slowek) বিপ্লবের সূচনা কাল হইতেই পিলসুদ্‌সকির সহকর্ম্মী ছিলেন। ইনি এক জন উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী। পিলসুদসকির বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য অতি বিস্ফোরক বোমা প্রস্তুতকালে দৈবাৎ একটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়া তাহার মুখমণ্ডলের একাংশ পুড়িয়া যায়। তাহার জন্মবৃত্তান্ত রহস্যময়। অনেকে মনে করেন যে, পিলসুদ্‌সকি ভিন্ন তাহার সঠিক নাম বা জন্মস্থান আর কেহই জানেন না। জনশ্রুতি এই যে, তিনি চেটওয়ার টিনস্কির (Czetwertynski) কাউণ্ট। ইহা পোল্যাণ্ডের একটি বিখ্যাত উচ্চ বংশের ছাপ। তিনি ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পিলসুদ্‌সকির সহিত যোগদান করিবার সময় বংশ-পরিচয় গোপন রাখেন। শ্লওয়েক ইদানী পোল্যাণ্ডের ধনিক সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ রেড্‌জি উইল (Redzlwills) এবং পটোক্কিস (:Potockis)-দের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে আপন জন বলিয়া মনে করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইনিই এরিষ্টো-ক্র্যাটদের ও পিলসুদসকির মধ্যে মিলনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

কর্ণেল জোসেফ বেক ১৮৯৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য সহকর্ম্মীদের ন্যায় শিষ্টাচার ও ভদ্রতা জ্ঞান তাঁহার ছিল না। তথাপি পরবর্ত্তীকালে তিনি পিলসুদসকির খুব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি একজন অদ্ভুত প্রকৃতির লোক, তাঁহার রহস্যময় চরিত্র বুঝিবার শক্তি জনসাধারণের ছিল না। তিনি প্রথমে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর তিনি লিজিয়ন-বাহিনীতে যোগদান করেন। পিলসুদসকি ওয়ারশতে যে মিলিটারী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে তিনি তাঁহাকে নিয়মিত ভাবে শিক্ষাদান করেন। পরে তিনি প্যারিসে পোলিস মিলিটারী এটাচি (Polish military attache) নিযুক্ত হন।

ইগনেসি মোসিস্কি (Ignacy Moscicki) পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। ইনি জনসাধারণের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি "ইগনেস দি অবিডেণ্ট" (Ignace the obedient) নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বৈদ্যুতিক পদার্থবিদ্যাবিশারদ (electro-physicist) ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি লাও (Lwow) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ওয়ারশর কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ হন। বৈদ্যুতিক পদার্থ (Eletro physics) বিজ্ঞানে ও রসায়ন-শাস্ত্রে (Chemistry) ৫০০টি জিনিষের তিনি আবিষ্কর্ত্তা। পেডারেস্কির (Padereswski) ন্যায় পোল্যাণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনিও অজস্র দান করিয়াছেন। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান না করার জন্যই তিনি এতটা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী কোসীলকাউস্কি (Koscial kowski) লিজিয়নিয়ার হইলেও, স্লয়েক-প্রিষ্টর-বেক (Slawek-Prystor-Beck) দল তাঁহাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ইহার কারণ এই যে, তিনি বামপন্থী (Left winger) ও লিবারেল (Liberal) নেতারূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করেন নাই। মন্ত্রী পিরাকি (Pieracki) আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত হইলে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে তিনি দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যোগদান করেন। পিরাকির মৃত্যুর পর কে প্রধান মন্ত্রী হইবে বৃদ্ধ মার্শাল পিলসুদসকিকে এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি কি সকল সময়ই সকল বিষয় স্থির করিয়া দিব? তোমরা যুবকবৃন্দ এখনও কি দেশকে শাসন করিতে শিখিলে না?"

তৎপর কর্ণেলগণ একটি নামের তালিকা পিলসুদ্‌সকির নিকট পেশ করিলেন। তিনি উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন ধরিয়া কোসাল-কাউস্কিকে ফোন করিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমিই দেশের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী নিযুক্ত হইবে," এই বলিয়া টেলিফোনটি রাখিয়া দিলেন। পিলসুদসকি ইঁহাকে খুব ভালবাসিতেন, কেননা

তিনিও একজন লিথুএনিয়ান। কোমালকাউস্কি মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠদের অনেক সুবিধাদান করিয়াছিলেন। পিলসুদসকিরও ইহাতে সম্মতি ছিল, কারণ তিনি একথা স্পষ্টই জানিতেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্টকে অনেক বিষয়ে নূতন নূতন কাজ করিতে হইবে।

হাঙ্গেরীর ন্যায় পোল্যাণ্ডেরও জাতীয় মনোবৃত্তি খুব প্রবল। পোল্যাণ্ডকে খণ্ডবিখণ্ডিত করা হইলে পোল্যাণ্ডের অধিবাসী তাহার মর্ম্মপীড়া সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। পোল্যাণ্ডকে মানচিত্র হইতে তুলিয়া দিলেও পোল্যাণ্ড ছিল আশী লক্ষ (eight million) লোকের বাসভূমি এবং পুনরায় উড্রো উইলসনের (Woodrow Wilson) চেষ্টায় মানচিত্রে স্থান পাইলে দুই কোটি পোলের বাসভূমিতে দাঁড়ায়। পোল্যাণ্ড মানচিত্র হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া পড়িলেও সে তার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। পোল্যাণ্ডকে যীশুর ন্যায় ক্রসে বিদ্ধ করিয়া মৃত্যু ঘটাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডের এই অবনতির ইহাই মূল কারণ। এইরূপ বিপর্য্যয়ের মধ্যে পোল্যাণ্ডের পুনরভ্যুত্থান একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। পোল্যাণ্ডের মৃত্যু ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু তার পুনর্জ্জন্মলাভে এই কথাই মনে হয় যে, ইহার পশ্চাতে কোন ঐশ্বরিক শক্তি লুক্কায়িত ছিল। পোল্যাণ্ড এই প্রকার দুঃখভোগ করিবার পর যে সে শুধু কৃতকার্য্য হইয়াছিল তা নয়—একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল।

পোল্যাণ্ডের জাতীয় চেতনাকে একটি হস্তীর গল্পের সহিত সুন্দরভাবে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রবাদ আছে যে, এই গল্পটি কোনও বিশেষ কার্য্যসিদ্ধি উপলক্ষে পেডারেস্কির (Paderewski) মস্তিস্কপ্রসূত।

এই সূত্রে বিভিন্ন দেশীয় পাঁচ জন লেখক "হস্তী" সম্বন্ধে এক একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজ ভদ্রলোকটি ভারতবর্ষে আসিয়া একটি শিকারের দল গঠন করেন এবং কিরূপে তাঁহার জীবনে প্রথম হস্তী শিকার করিতে যাইয়া হস্তীকে গুলিবিদ্ধ করেন সেই সম্বন্ধে একটি চিত্রবহুল পুস্তক রচনা করেন। ফরাসী ভদ্রলোকটি একটি চিড়িয়াখানা দেখেন এবং হরিদ্রাবর্ণের কভারযুক্ত 'L' Elefantetses Amours' নামক পুস্তক লেখেন। জার্ম্মান ভদ্রলোকটি কয়েক বৎসর রিসার্চ্চ করিয়া 'Introduction to a' Monograph to the Study of the Elephant' নামক পাঁচ ভলিউমের একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। রাশিয়ান ভদ্রলোকটি ভদকা (Vodka) নামক সুরা পান করিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে বসিয়া একটি গবেষণামূলক "The Elephant—Does it Exist" নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। পোল্যাণ্ডের অধিবাসী জাতীয় পাঠাগার হইতে 'The Elephant and the Polish Question' নামক প্রচার-পত্র বাহির করে।

পোল্যাণ্ড যদিও জার্ম্মান, রাশিয়া, ইংলণ্ড প্রভৃতির ন্যায় খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র নয়, তথাপি ইহার আয়তন উপেক্ষণীয় নয়। ইহার জনসংখ্যা ৩ কোটি ২০ লক্ষ (Thirty two million)। এই জনসংখ্যা প্রতি বৎসরে পাঁচ শত হাজার করিয়া বাড়িতে থাকে। রাশিয়াকে বাদ দিলে ইহার আয়তন ইউরোপের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। পোল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রধান কাজ ছিল রাশিয়া, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়াকে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে একত্রীভূত করা। কিন্তু সেই সময় দুইটি প্রধান আভ্যন্তরিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা তার মধ্যে একটি। ইহার কারণ ক্ষুৎ-পীড়িত পোল তার সাম্রাজ্যের ন্যায্য অংশের অধিক প্রাপ্ত হইয়াছিল, সমগ্র জনসংখ্যা তিন কোটি ২০ লক্ষের (Thirty-two million) মধ্যে ৮ হইতে .. লক্ষ লোক পোল নয়, তারা ইউক্রেনিয়ান (Ukrainians), জার্ম্মান (Germans), হোয়াইট রাশিয়ান (White Russians), গ্যালিসিয়ান (Galicians), রুথিয়ান (Ruthians) ও লিথুয়েনিয়ান (Lithuanians)। দ্বিতীয় সমস্যা দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য যথোচিত হ্রাস করা।

সেণ্ট্রাল ইউরোপ ও বল্কান সহরগুলির অর্থনৈতিক বাজেটে শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ সামরিক কার্য্য-কলাপের জন্য ব্যয় হওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই সহরগুলি শিল্পদ্রব্য উদ্ভাবনের প্রশস্ত স্থান ছিল না, প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যই হইত। তথাপি এই স্থান হইতে গুরুত্বপূর্ণ রণসম্ভার যোগান দেওয়া হইত। ৩ শত ৫০ হাজার সৈন্য

সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিত, ১ লক্ষ ৬ শত ৪৫ হাজার শিক্ষিত সৈন্য রিজার্ভ রাখা হইত। পোল্যাণ্ডও ত্রিশ লক্ষ (Three millions) সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিত। পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা অস্পষ্ট বলিয়াই পোলজাতির এইরূপ বিপুল সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজন। কারণ এই ভূখণ্ড জার্ম্মান ও রাশিয়া দুইটি প্রবল শক্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত।

গত যুদ্ধের পর হইতে পোল্যাণ্ড বৈদেশিক কূটনীতিতে (foreign policy) খুব চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল। প্রথমত: পোল্যাণ্ডও ক্ষুদ্র (Little Entente) আঁতাতের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে। যদিও ফ্রান্সের সঙ্গে এই সন্ধি বলবৎ থাকে তথাপি বেক (Beck) জার্ম্মান শক্তির ভয়ে ইহার কিছু রদবদল করেন। বেক স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, জার্ম্মানী পোলকে তার অন্তর্ভুক্ত করিতে অভিলাষী। সেই হেতু হিটলার যে দশ বৎসর কালের সন্ধি-প্যাক্ট প্রস্তাবের কথা তুলিয়াছিলেন, সেই সুযোগ তিনি গ্রহণ করিলেন। পোলিশের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন হইবার পর জার্ম্মানী পোলিশ করিডোরের (corridor) দাবী সাময়িক-ভাবে বন্ধ রাখে। এই প্যাক্টের ফলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ভাব জাগ্রত হইল। বেক বার্লিন বা মস্কোতে গেলেন না। ইহাতে পোলিশ ও সোভিয়েটের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি শিথিল হইল না। রাশিয়া চিরস্থায়ী সন্ধির কথা বলিতে লাগিল এবং এই ভিত্তিতে একটি ফ্রন্ট গঠন করিবার প্রস্তাব তুলিয়াছিল। এই প্রস্তাব পোল্যাণ্ড প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হয়। পোল্যাণ্ডের পক্ষে ইহা মস্ত বড় বাঁধ, কারণ ইহা দুই দিকেই তাল রাখার সামিল।

উত্তরাঞ্চলের ডানজিগ ও মেমেলের দিকে জার্ম্মানীর চোখ ছিল। পূর্ব্বে এই দুইটি স্থানই জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভার্সাই সন্ধিতে (Treaty of Versailes) রাইখ (Reich) হইতে এই দুইটি স্থানকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর হইতে লীগ অব্ নেশনের আওতায় এই দুই নগর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। পরে জার্ম্মানী এই দুইটি নগর ফিরিয়া পাইবার দাবী জানায়। ডানজিগ সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, লীগ অব্ নেশনস্ উহাকে দেখিত, কিন্তু মেমেল ছিল লিথুওনিয়ান রাজ্যের অন্তর্গত। জার্ম্মানী পূর্ব্ব-প্রুশিয়া ত্যাগ করিয়া সমুদ্রপথে পোল্যাণ্ডকে খানিকটা ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া পোলিশ করিডোরের (Corridor) সামান্য অংশ অধিকার করে, কিন্তু ইহার ফলে ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। পোলিশ-জার্ম্মান প্যাক্ট দ্বারা এই ব্যাপার মীমাংসা হইয়াছিল। এইরূপ একটি প্যাক্টের দরুণ ডানজিগের বিপদ কাটিয়া যায়। ডানজিগ ছিল করিডোরের স্বাভাবিক বন্দর। ডানজিগে নাৎসি সৈন্য সমাবেশ করা হইলে কল্পনাতীত নিগূঢ় অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখা দিল। ডানজিগে নাৎসি জার্ম্মানীর কার্য্যকলাপ পোল্যাণ্ডের চক্ষু এড়াইতে পারিল না। পোল্যাণ্ড জার্ম্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বীমূলক গিনিয়ার (Gdynia) দ্বারপ্রান্তে (Corridor) ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি সুদৃঢ় বন্দর (port) স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। গিনিয়ায় (Gdynia) এত অর্থব্যয় করিবার কারণ এই যে, ডানজিগে যাহাই ঘটুক না কেন, পোল্যাণ্ড যুদ্ধে পরাভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সে তার করিডোর কখনই ছাড়িয়া দিবে না।

লিথুএনিয়াকে সমুদ্রপথে চলাচলের সুবিধা দানের জন্য মেমেলকে জার্ম্মানী হইতে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে ডানজিগের মত লিথুএনিয়ার অবস্থা ঘটে। মিত্রপক্ষ যখন এই সব স্থানের সীমান্তরেখার পরিকল্পনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় পিলসুদসকি লিথুএনিয়ার ভিলনী নামক স্থানটি দখল করেন। অত:পর লিথুএনিয়াও মেমেল অধিকার করে। এখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ জার্ম্মানদের উপর খারাপ ব্যবহার করা হয়। ভিলনা অবরোধের পর পোলিস-লিথুএনিয়ান বন্ধুত্ব ফাঁসিয়া যায় এবং পনর বৎসর পরেও উভয়েরই সীমান্তদ্বার বন্ধ রাখা হয়। কোন প্রকার বিপদ ঘনীভূত হইলে ইউ, এস, এস, আর-এর সাহায্য প্রাপ্ত হইবে বলিয়া লিথুএনিয়ানদের প্রবল বিশ্বাস ছিল। যত দিন পোল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে সখ্যতার ভাব বজায় ছিল, প্রকৃতপক্ষে লিথুএনিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল না। পোল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর যত দিন সদ্ভাব ছিল তত দিন হিটলারের লিথুএনিয়া আক্রমণ করা সম্ভব হয় নাই। পোল্যাণ্ড ও জার্ম্মানীর মধ্যে লিথুএনিয়া ভাগাভাগি করিয়া

লইবার প্রশ্ন কোনদিনই উঠিতে পারে নাই, কারণ ইহাতে প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা ছিল। নেতাদের মধ্যে নানা রকম গলদ থাকায় সীমান্ত সম্বন্ধীয় যুক্তিসঙ্গত মীমাংসায় পৌছান সম্ভব হয় নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পোল্যাণ্ডের ইতিহাস বিবৃত হইল। কিন্তু একদিন যে-পোলাণ্ড জগতের সম্মুখে একটি শক্তিশালী জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল সেই পোল্যাণ্ডের আজ ভাগ্যবিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধে হিটলার সর্ব্বপ্রথমেই পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করে, কারণ পোল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মানীর স্বার্থ জড়িত। পোল্যাণ্ড তার সমগ্র শক্তি দ্বারা হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, তাই আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি পোল্যাণ্ড হিটলারের করতলগত। কালস্রোতের ঘূর্ণি কোন্ জাতিকে কোন্ দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে কে বলিতে পারে।

জয়ের নেশা

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

হিটলার-মুসোলিনী-ষ্টালিন প্রভৃতির সঙ্গে পাতু ঘোষের তুলনা করা যায় না, কারণ সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য একটা মানুষ, কেউ তাকে জানে না—কেউ তাকে চেনে না!

...বর্ষার প্রথম, সবে আকাশের রং বদলে ঘোর হয়ে আসছে, উঁচু আকাশ মাটির দিকে নুইয়ে পড়ছে জলভারে! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিমাখা মেঘগুলো বাদলা হাওয়ায় ভর করে ছুটে চলেছে দূর-দূরান্তরের দিকহীন দিগন্তের পানে··· দ্রুতগতিতে—যেন বিরাট চিমনীর মুখ থেকে সদ্য বার হয়েছে একচাপ ধোঁয়ার সমষ্টি। নিথর পলাশ তেঁতুল খেজুর গাছগুলোর মাথা থেকে ঝরে পড়ছে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টির জল। সারাটা আকাশ একটা দুরন্ত ছিঁচকাঁদুনে ছেলের মত থেকে থেকে মুখভার করে সজল ধরণীর বুক ভরিয়ে দিচ্ছে অশ্রুবর্ষণে—গ্রামের বাইরে মাঠে লেগেছে চাষীদের জনতা—ছেলে-বুড়ো সকলেই কেউ বা বীজ টানছে—কেউ বা লাঙলের বোঁটাটা নরম মাটির বুকে গভীর ভাবে টিপে ধরে ডান হাত দিয়ে গরু দুটোর লেজ মলতে মলতে তার-স্বরে চীৎকার করে উঠছে—'ও যমুনার জলে কেউ যেও না।···' ভটচাষ্যি-পুকুরের কাঁকুরে মাটির পাড়টার উপর মুনিষ মান্দিররা বসে বসে মুড়ি চিবুচ্ছে।···এই সময়টাকে বলে—মেঘের বাত, বর্ষার প্রারম্ভ!

হঠাৎ ষষ্ঠীতলার মাঠ থেকে সম্মিলিত কণ্ঠে চীৎকার সারাটা মাঠ ভরিয়ে তোলে! ক্রমশঃ সেটা বেড়ে চলেছে সারা মাঠের লোক গিয়ে জমেছে সেইখানে।

পাতু ঘোষ কাঁটাবাধের একজন সঙ্গতিপন্ন চাষী··· বাড়ীতে প্রায় দু'খান হালের চাষ—গরু-বাছুর সোনাজমি সব কিছুই এক-আধটু আছে, তা ছাড়া লুকিয়ে ছাপিয়ে চড়াদামে ধান বেচে বেশ দু-পয়সা রোজগার করেছে। একে চাষার মর্দ্দ, তাতে আবার ঘরেও দুপয়সা এসেছে, সুতরাং তার মেজাজটা যে বর্ষার মরশুমেও ঠাণ্ডা থাকবে এ একটা কথাই নয়!···উপরেই গদাধর মোড়লের জমি—নীচে পাতু লাঙল দিচ্ছিল···এবং বেশ একটা উপরের আল কোদাল দিয়ে কেটে নিজের দিকে নাবিয়ে নিয়েছে গদাধরের মেজ ছেলে ভোলা প্রতিবাদ করেছিল, তা মানে নি—অগত্যা ভোলা এসে তার কোদালখানা কেড়ে নিতে যায়—ফলেই এই ব্যাপার।

পাতু জমির কাদার উপর গামছাপরা অবস্থাতে একটা প্রচণ্ড ডিগবাজি খেয়ে দু'আনার সার্কাসের প্লেয়ারের মত একপাক ঘুরে নিয়ে সজোরে তাল ঠুকতে থাকে-'আলবৎ—করব, এক শ' বার করব—তুইও ত আম নিয়েছিস কেলেকোড়ার মাঠে একেবারে মাদনাতল বাকুড়ীখানা নিপুছ করে নামিয়ে নিয়েছিস, তাই আমি নিয়েছি—বেশ করেছি!'

বলাবাহুল্য মাদনাতলার বাবুড়ীর নীচে গদাধরের জমি চাষই দেওয়া হয় নি, কিন্তু কে কার কথা শোনে! ভোলাও রুখে ওঠে—'শালার গরম ভেঙে দোব এক পাচনের বাড়িতে! ডিগ্‌বাজী বার করে দোব।'

পাতু কথা না শুনে ওদিকে কোদাল চালিয়ে চলেছে—নরম মাটি কোদালের ঘায়ে ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ করে খানা-খানা হয়ে কেটে পড়ছে নীচে জমির উপর! আলটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে! ভোলা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে পাতুর উপর চড়াও হ'ল, হাতের পাচনটা দিয়ে বেড়িয়ে চলেছে তার গায়ে! পাতুও কোদালখানা ছেড়ে ভোলাকে জড়িয়ে ধরেছে। দুজনে জমির জল-কাদার উপর একটা খণ্ড প্রলয়ের সূচনা করে চলেছে।...চারিদিক থেকে লোকজন এসে অনেক কষ্টে তাদের দুজনকে দুদিক করে দিল। মার খেয়েছে পাতুই বেশী,—সারাটা গা তার মোটা দড়ির মত ফুলে উঠেছে পাচনের ঘায়ে...কপালটা এক জায়গায় কেটে গিয়েছে খানিকটা, কাদামাখা মূর্ত্তি...বীরদর্পে আস্ফালন করে চলেছে—'দেখে লোব শালাকে—ও জমি তোর না বেচা করাই ত আম্মর নাম মিছে, একবাপের বেটাই লই।...ও জমির আল আসছে বছর আমি বাঁধব। জমি থাকলেই ত আল দিবি।'

...ভোলার বাঁ হাতখানা কোদালের পাশে লেগে কেটে গিয়েছে—রক্তাক্ত হাতখানা থেকে জলকাদা মুছে নিয়ে ভোলাও জবাব দিতে ছাড়ে না! তার টাকার জোর নাই, তবুও রক্তের জোরে সে শাসিয়ে চলেছে—'যা যা খুব মরদ দেখেছি—তুই আবার কোন হরিদাস পাল এলিরে, দিতাম আরও ঘা-কতক...!'

ঘটনাটার উপসংহার টানল তার পরদিননি—মাই চাটুয্যে—সকাল বেলায়! হাত মুখ না ধুয়েই একটা টগরের ফুল আধপাকা চুলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় শিখাটার ডগায় পাক দিয়ে...পেরেকে তোলা সাজিটার মধ্য হ'তে হরে বেণের দোকান থেকে জোর করে উঠিয়ে আনা তামাকটুকু নামিয়ে রেখে ফুল তুলতে বার হ'ল! ফুল তোলাটা তার বাইরের কাজ...ভিতরের উদ্দেশ্যটা কেউ জানে না...চাণক্য পণ্ডিতের শিষ্য বোধ হয়—"মনসা চিন্তিতং কর্ম্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ!" ভাবখানা এই রকমই।

পর দিনই দেখা গেল খাওয়া-দাওয়া সেরে পাতু ঘোষ গাড়ী জুড়ে বাঁকুড়া রওনা হয়ে গেল, মাথায় হাতে নানা জায়গায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে রুক্ষ মাথায় গাড়ী যাত্রা করল, গাড়ীখানা পুকুরের মহুয়া বাগানটা পেরিয়ে শালবনের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল—বনের বাইরেই নিমাই চাটুয্যে...বাপুতি-আমলের একটা দড়ির মত কড়া পাক দেওয়া একটা উড়ুনী থ্রি-কোয়াটার টিংটিঙে মার্কিনের পাঞ্জাবীর উপর চড়িয়ে—লাল রঙের ক্ষয়প্রাপ্ত তলাহীন-কেড্‌স্ হাতে করে পাতু ঘোষের গাড়ীতে উঠে এল! গাড়ীখানা বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"Everybody continues in its state of rest or of motion' কথাটা সত্য বলেই নিমাই চাটুয্যের চালটা খুব জবর হয়েছিল। একবার ধাক্কা দিয়ে পাতুকে নামিয়ে দিয়েছে, তার পর থেকে মোকদ্দমাটা আপনা থেকেই চলছে। গদাধর বুড়ো বয়সে কাছারী হাঁটাহাঁটি করছে অবশ্য বাধ্য হয়েই। বুড়ো বয়সে হয়রাণির চূড়ান্ত! পাতুর মত দু-পয়সা তার নাই—যে যা-কিছু করতে হয় ধান বেচে; মটর ভাড়া, খোরাকী, উকিলের ফি, সব কিছু করতে হয় ধান বেচে; গরীব ছাপোষা লোক—সামান্য চাল-ধানের উপর সারা বছর নির্ভর করে থাকতে হয়।

ওদিকে পাতু ঘোষ বাঁকুড়ার তাঁতের নূতন ধুতি পরে পাঞ্জাবী চড়িয়ে মোকর্দ্দমার দিন গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ সজ্জনদের, হরিতলায় ভৈরবতলায়, প্রণাম সেরে গদাই লস্করি চালে গাড়ীতে উঠে রওনা হয়। প্রমথ মোড়ল দন্তহীন মাড়ি বার করে হাসবার একটু বৃথা চেষ্টা করে কোটরাগত ঘোলাপড়া চোখ দুটো তুলে পাতুর দিকে বলে ওঠে 'জয়ী হয়ে ফিরে এস বাবা—ধনেপুতে লক্ষ্মী লাভ হোক—জয়জয়কার হবে! দুগ্‌গা দুগ্‌গা।"

বেনে-গ'ড়ের সরু কর্দ্দমাক্ত পাড়টা দিয়ে গদাধর মোড়ল সাদা কাপড় লাগান পুরোনো ছাতাটা বগলদাবা করে পা টিপে টিপে সন্তর্পণে রওনা হয়! ভোলার মা আর বিধবা মেয়ে রতনী ম্লান বিষণ্ণ চাউনীতে বৃদ্ধের গতিপথ দিকে চেয়ে থাকে!

যাওয়া-আসাই ক্রমাগত চলছে কয়েক মাস ধরে! গদাধর মোড়লের চাস-বাস অনেক বাকী, ভোলা হাজতেই

ছিল প্রায় মাসখানেক, তার পর জামিনে খালাস পেয়েছে। চেহারাও খারাপ হয়ে গিয়েছে অনেক।

সে-দিন লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে গদাধর নিমাই চাটুয্যের পা-টা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললে, 'দা-ঠাউর এট্টুন থেকে তোমাকে দেখে আসছি—এ উবগারটা করতেই হবে, ভোলা ছেলেমানুষ রাগের মাথায় কি করে বসেছে। তুমি যদি পাতুকে একটু বল, মামলাটা মিটমাট করে নেয় তা হ'লে—দোহাই দা-ঠাউর!'

নিমাই চাটুয্যে টিকিস্থ ফুলটাকে জোরে এক পাক ঘুরিয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে জবাব দেয়—'পাতুকে অপমান করেছে—মেরেছে, ও সইবে কেন বাপু, তা ছাড়া তোমার ভোলারও বাড় কম নয়! এই ত চোৎ-পরবের রাতে—আমাকে শুধু শুধু হাড়ির অপমানটাই না করলে, তোমার বাড়ী রাত-বিরেতে কাজ পড়লে কি যেতে নাই...তা ভোলাত আমাকে মারতেই বাকী রাখ্‌লে; ওর বড় বাড় মোড়ল—একটুকু সেঁক পাওয়া ভাল।''

চোৎ-সংক্রান্তির রাত্রির ব্যাপারটা পল্লীগ্রামের ইতিহাসে নেহাৎ সাধারণ একটা ঘটনা, গদাধরের বাল-বিধবা মেয়ে রতনীর ঘরে জানলা গলিয়ে রাত্রি বেলায় ঢুকেছিল ঐ মাননীয় চাটুয্যে মশায়—রতনী চীৎকার করে ওঠে ভয়ে এবং ফলে ভোলার হাতে নিমাই চাটুয্যের তথাকথিত হাড়ির অপমান। যাক্—ও পুরোনো কথা!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিমাই বলে ওঠে, 'বুঝেছ মোড়ল, ঐ ষষ্ঠীতলার জমিখানা পাতুকে বিক্রী কর, আমি নিজে কিছুই চাই না—মা-কালীর প্রণামী বাবদ আমাকে কিছু দিও ব্যস, আমি একবার পাতুকে বলে দেখি। ঐ যে ষষ্ঠীতলায় পাতুর জমির মাথায় জমিটা পাতুকে বিক্রী...'

বাধা দিয়ে ওঠে গদাধর—'মাথা বিক্রী করব ঠাকুর, তবু ও জমি বিচব নাই!' কাপড়ের খুটে চোখ মুছে নিয়ে মোড়ল বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল চাটুয্যে তার শাস্তির সর্ত্ত নিয়ে।

আজ মামলার একটা হেস্ত-নেস্ত যা হোক একটা কিছু হবে। পাতু অনেক পয়সা খরচ করে অনেক খবরই সংগ্রহ করেছে, এবং কাঁটাবাঁধের পেতো ঘোষ বাঁকুড়া কাছারীতে ধুতি পাঞ্জাবী লাগিয়ে শ্রীহরি ঘোষ বলে গণ্য হয়েছে। কাছারীর কাছে বটতলায় পানউলীর কাছে মিঠে পান আর একবাক্স 'পলমল সিগারেট' কিনে ফুচু ঘোষ, নবীন লোহার, সনাতন দাসকে দিয়ে নিমাই চাটুয্যের তত্ত্বাবধানে সাক্ষীর দলবল নিয়ে কোর্টে প্রবেশ করল।

গদাধর নিমাইয়ের সাক্ষ্য শুনে অবাক হয়ে যায়! কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সুচতুর বক্তার মত বলে চলেছে 'আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার, ভোলানাথ এসে একেবারে শ্রীপতির উপর চড়াও হ'ল! ও একেবারে চাষা কাঠ গোঁয়ার, শ্রীপতি ভদ্রলোক, পারবে কেন, ভোলানাথ কোদাল না নিয়ে চোট মারতে যায় আর কি শ্রীপতিকে আমি নবীন লোহার সনাতন দাস গিয়ে তবে কোন রকমে ছাড়াই, ছাড়তে কি আর চায়...''

গদাধর বাধা দিয়ে ওঠে—'দোহাই ওর কথা শুনবেন না হুজুর! পয়লা-নম্বর মিথ্যুক ও—টাকায় আটটার দরের সাক্ষী।' কোর্ট শুদ্ধ লোক কথাটা শুনে হো হো করে হেসে উঠল, জজ সাহেবের মুখ-চোখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, টেবিলের উপর পেন্সিলটা চঞ্চল ভাবে ঠুকতে থাকেন। পরক্ষণেই বিপক্ষের উকীল গদাধরকে এক ধমক দিতেই সে চুপ করে যায়! ন্যায়-বিচার যথারীতি চলতে থাকে।

বর্ষা শেষ হয়ে গিয়ে এসেছে শরৎ-কালের আভাষ গাঁয়ের বাইরে সুরু হয়েছে প্রকৃতির শ্যামল শোভা; মাটির বুক চিরে অনাদিকালের অফুরন্ত ধন শস্য...সবুজ রং সতেজ হয়ে পৃথিবীর অগণিত নরগণের দিকে চেয়ে থাকে! মাথার উপর নীল আকাশের ভালবাসা খাল বিলের কালো জলে লুটিয়ে পড়েছে! মেঘহীন নীল আকাশে টুকরো টুকরো ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা; খাল ডোবাগুলো ভরে উঠেছে শালুক ফুলের অমলিন হাসিতে আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে মিষ্টি সোনালী সূর্য্যের কোমল ছোঁয়া; দূরে জলামাঠের উপর বিসর্পিল রেখা উঠছে ক্ষেতের বুক থেকে অস্পষ্ট বাষ্পরাশি!

শ্রীপতি ঘোষ পাটের চেলী পরে গ্রামের গণ্যমান্য প্রত্যেকের ঘর গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে...গাঁয়ের বাইরে পুরোনো তেঁতুলতলায় বাবা ভৈরবনাথের পুজো

আয়োজন করা হয়েছে; পুজো ঠিক নয়—মানসিক শোধ করছে! নিমাই চাটুয্যে পুরোহিতের আসনে ভবিষ্যযুক্ত হয়ে বসেছে, শিখাতে আজ একটা রক্তকরবী ফুল, শীর্ণ নাকে রক্তচন্দনের দীর্ঘ তিলক—পাতু অদূরে জোড়হাত করে বসে রয়েছে! পাতু আজ ষোড়শপচারে বাবা ভৈরবনাথকে সন্তুষ্ট করতে এসেছে! অদূরে গাছের শিকড়ে একটা ছোট্ট পাঁঠা বাঁধা—আর্ত্তকণ্ঠে সে মাঝে মাঝে চীৎকার করছে!

কতকগুলো ছেলে অদূরে গোলমাল করছে; গ্রামের অনেকেই এসে জুটেছে—রমেশ দাস, গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে, নটবর ভটচার্য্য—আরও অনেকে এসে জুটেছে; ধূপধূনোর গন্ধে বাবা ভৈরবনাথ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন! ঢাকটা সজোরে বেজে চলেছে! ছোট্ট ছাগলের বাচ্চাটাকে হাড়িকাঠে পুরে গদা কামার একচোটে দু'খানা করে দিল! পাতু ঘোষ পাশ থেকে ছুটে গিয়ে ছাগলের ছিন্ন মুণ্ডটা তুলে নিয়ে নাচতে থাকে বাজনার তালে তালে; তার হাঁক-ডাকে ভৈরবতলা কেঁপে উঠছে—"জয় বাবা ভৈরবনাথ, বাজা বাজারে জোরসে,"—খা-জিং জিং জিং জিনাক্ জিজিং জিং জিং জিং জিন্না! গদাধর মোড়ল মামলায় হেরে গিয়েছে, ভোলা এখন জেলে—প্রায় মাস তিনেক তাকে থাকতে হবে ঐখানে; যাকে বলে আশাতীত ফললাভ!

রক্তাক্ত কলেবরে জয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাতু ঘোষ নেচে চলেছে বাবা ভৈরবনাথের সামনে।

...তবুও হিটলার-মুসোলিনী-ষ্টালিন প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করা যায় না পাতু ঘোষকে; সে তাদের তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য একটা গ্রাম্য লোক—কেউ তাকে জানে না—চেনে না—চিনবেও না।

নক্ষত্রের কথা

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার

সূর্য অস্তাচলে গমন করিলে রজনী ধীরে ধীরে তাহার কৃষ্ণ অঞ্চলখানি টানিয়া ধরাকে আচ্ছাদিত করে। তখন নিরভ্র নির্মলাকাশে এক একটি করিয়া জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররাজি দৃষ্টিগোচর হয়। দেখিতে দেখিতে উজ্জল তারকানিচয়ে নভোমণ্ডল ছাইয়া যায়। নীল আকাশ তখন সহস্র সহস্র প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডখচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় কি রমণীয় শোভা ধারণ করে। নৈশ আকাশের সেই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিলে বিস্ময়ে ও গাম্ভীর্যে হৃদয় মোহিত হইয়া যায়। তখন বসুন্ধরার পৃষ্ঠে তরুলতার শ্যামল মাধুর্য অদৃশ্য হয় বটে, কিন্তু অসীম আকাশে সুশোভিত জ্যোতিষ্কনিচয় আর এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে চিত্ত অভিভূত করে। অনন্ত আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্ক-রাজি সৃষ্টির আদি হইতে নীরবে স্রষ্টার অপূর্ব মহিমা ঘোষণা করিতেছে। এই সকল জ্বলন্ত অক্ষরে কত অচিন্তনীয় রহস্য অব্যক্ত—প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ দিবানিশি অক্লান্ত শ্রম ও গবেষণা করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন।

অন্ধকার রাত্রে মেঘহীন আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে পূর্ব দিকে দিগ্‌বলয়ের (Horizon) নিকটে গাছপালার উপরে কতগুলি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। কতগুলি তারা মাথার উপরে আর কতগুলি পশ্চিমাকাশে দৃষ্টিগোচর হয়। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে নক্ষত্রগুলি আকাশে স্থির নহে। পূর্বদিকের গাছপালার উপরের তারাগুলি ক্রমে ক্রমে মধ্যাকাশে মাথার উপরে আসিতেছে; যেগুলি মাথার উপরে ছিল সেগুলি পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িতেছে এবং পশ্চিমাকাশের তারাগুলি দিগ্‌-বলয়ের নীচে অদৃশ্য হইতেছে। তখন পূর্ব দিকে আবার নূতন নক্ষত্ররাজি দেখা দিতেছে এবং ক্রমে সেই সকল নক্ষত্রও মাথার উপরে আসিয়া পশ্চিম দিকে অস্তমিত হইতেছে।

আকাশটা যেন একটি বিরাট্ গোলাকার ফাঁপা বল। উহার কেন্দ্রে পৃথিবী অবস্থিত। আকাশের খোলে যেন হীরকখণ্ডের ন্যায় কোটি কোটি নক্ষত্র গ্রথিত রহিয়াছে। নক্ষত্রখচিত আকাশের গোলকটি অবিরাম পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। দিনে খ-গোলের অর্ধাংশ আমাদের মাথার উপরে থাকে। রাত্রে অপরার্ধ নক্ষত্র-খচিত হইয়া মাথার উপরে আইসে। দিনের বেলায় প্রখর সূর্যালোকে আকাশের অর্ধাংশের নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে ঘুরিয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে, এইজন্য আমরা পৃথিবী হইতে দেখি যেন নক্ষত্র-খচিত আকাশটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। আমরা নক্ষত্রসকলের যে গতি প্রত্যক্ষ করি তাহা উহাদিগের প্রকৃত গতি নহে। কিন্তু নক্ষত্রসকল এক স্থানে স্থির নহে। উহাদিগের দৃষ্টগতি ব্যতীত প্রকৃত গতি (real motion) আছে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন জ্যোতিষ্কই অচল নয়।

খ-গোল (Celestial Sphere)

পৃথিবীর কাল্পনিক মেরুদণ্ডটি উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত করিলে উহা আকাশের যে দুই বিন্দুতে মিলিত হইবে তাহাই যথাক্রমে খ-গোলের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু (Pole)। আর এই কল্পিত মেরুদণ্ডটি আকাশের অক্ষ (Axis)। এই অক্ষের দুইপ্রান্ত যেন আকাশে গাঁথা রহিয়াছে, উহার নড়চড় নাই। উহার উত্তর প্রান্তকে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ প্রান্তকে দক্ষিণ মেরু বলে। গাড়ির চাকা যেমন একটি দণ্ডের চারিদিকে ঘুরে তেমনি খ-গোল কল্পিত অক্ষদণ্ডের চারিদিকে অবিরাম আবর্তন করিতেছে। আমরা আকাশের মেরুদ্বয়কে নিশ্চল দেখিতে পাই। কোন চক্র আবর্তন করিলে উহার মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্র নিশ্চল দৃষ্ট হয়। আমরা ভারত-বর্ষ হইতে আকাশের উত্তর মেরু দেখিতে পাই, দক্ষিণ মেরু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

আকাশের উত্তর মেরুর অতি সন্নিকটে একটি নক্ষত্র আছে, উহাকে ধ্রুবতারা কহে। ধ্রুবতারার কোন গতি দৃষ্ট হয় না। উহার উদয়ও নাই অস্তও নাই। রাত্রিকালে আকাশের উত্তর মেরুতে উহাকে সর্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্রুবতারার গতি নাই, ইহা অচল, এই জন্য আমরা বলিয়া থাকি ধ্রুবের ন্যায় অচল। কিন্তু ধ্রুব তারাটি আকাশের ঠিক মেরু বিন্দুতে অবস্থিত নহে। নক্ষত্র সকলের দূরত্ব ও স্থান নির্ধারণের সুবিধার জন্য আকাশ গোলকটিকে জ্যোতির্বিদগণ ৩৬০ অংশে বা ডিগ্রিতে বিভক্ত করিয়াছেন। ২৪ ঘণ্টা বা ৬০ দণ্ডে সমস্ত খ-গোলটি একবার আবর্তন করে। খ-গোলটি ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০ ডিগ্রি বা অংশ ঘুরে, সুতরাং এক ঘণ্টায় ১৫ ডিগ্রি বা অংশ ঘুরে এবং ৪ মিনিটে ১° ডিগ্রি ঘুরে* পূর্ণিমার চাঁদের ব্যাসকে আধ অংশ বা ডিগ্রি অর্থাৎ ৩০ কলা ধরা হয়। ধ্রুবতারাটি আকাশের ঠিক মেরুতে অবস্থিত নহে। উহা কেন্দ্র হইতে ১° ১৫′ এক অংশ পনর কলা দূরে আছে। সেই জন্য যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে ইহা একটি ক্ষুদ্র বৃত্তপথে মেরুবিন্দুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে দৃষ্ট হয়। কিন্তু খালি চক্ষে ধ্রুব নিশ্চলই বোধ হয়। বৎসরের সকল সময়েই উহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে বৈদিক কালে আর্য ঋষিরা ধ্রুব নক্ষত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ধ্রুব অচল তাঁহারা জানিতেন। প্রাচীন আর্য-সমাজে বিবাহকালে বর নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পড়াইয়া কন্যাকে ধ্রুব নক্ষত্র দেখাইতেন:—

ওঁ ধ্রুবমসি ধ্রুবাহং
পতিকুলোভূয়াসম্

হে ধ্রুব নক্ষত্র, তুমি যেমন অচল আমি যেন তেমনি পতিকুলে অচলা হই।

ধ্রুব তারা খ-গোলের উত্তর মেরুর অতি সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া ইহাকেই কেবল নিশ্চল দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া অপর সমস্ত নক্ষত্রকেই ধ্রুবতারার চারিদিকে

* সূক্ষ্ম হিসাবের জন্য ডিগ্রি বা অংশকে ৬০ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই অংশের এক এক ভাগকে 'কলা' বলে। কলাকেও ৬০ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক এক ভাগের নাম এক এক বিকলা প্রদত্ত হইয়াছে। সংখ্যাবাচক শব্দের উপর ডান দিকে '°' এইরূপ চিহ্ন দিলে অংশ বা ডিগ্রি, '′' এইরূপ চিহ্ন দিলে কলা বা মিনিট ও '″', এইরূপ চিহ্ন দিলে বিকলা বা সেকেণ্ড বুঝায়। যেমন ১৫°, ২০′, ২৫″ পনর অংশ, কুড়ি কলা পঁচিশ বিকলা। ৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট, ৬০ মিঃ ১ ডিগ্রি।

আমরা পূর্ব হইতে পশ্চিমে অবিরাম ঘুরিতে দেখিতে পাই। আকাশের দক্ষিণ মেরুতে একটি ক্ষুদ্র নিশ্চল তারা আছে। উহার নাম হ্যাডলির অক্‌ট্যান্ট (Hadley's octant) পৃথিবীর দক্ষিণ-গোলার্ধের লোকেরা ইহাকে অচল দেখিতে পায়। ইহা দক্ষিণ গোলার্ধের ধ্রুবতারা।

আমাদের ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে অবস্থিত। ইহা খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র নহে। সহস্র সহস্র নক্ষত্রের মধ্যে ইহাকে অচল বলিয়া নির্ধারণ করা অতিশয় কঠিন কাজ। ধ্রুবকে চিনিবার একটি কৌশল আছে।

অতি প্রাচীন কালে জ্যোতিষীরা আকাশের নক্ষত্রগুলিকে চিনিবার সুবিধার জন্য কতকগুলি নিকটবর্তী নক্ষত্র লইয়া এক একটি 'মণ্ডল' (Constellation) কল্পনা করিয়াছিলেন। এই সকল মণ্ডলের তারাগুলি মিলাইয়া উহাদের এক একটি মূর্তিও তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন। অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্রমণ্ডল এবং মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশি সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি আছে।

উত্তর আকাশে একটি বিখ্যাত নক্ষত্রমণ্ডল আছে। উহা সাতটি উজ্জ্বল তারা দ্বারা রচিত। এই জন্য প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষীরা উহার নাম দিয়াছিলেন 'সপ্তর্ষি মণ্ডল'। ইহার ইয়ুরোপীয় নাম ursa major বা বড় ভল্লুক। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা সাতটি প্রসিদ্ধ ঋষির নাম অনুসারে সাতটি তারার নাম-করণ করিয়াছিলেন। এই সাতটি তারকা যথাক্রমে, ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অংগিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি। ক্রতু, পুলহ পলস্ত্য ও অত্রি এই চারিটি নক্ষত্র মনে মনে রেখা টানিয়া একত্র সংযুক্ত করিলে একটি চতুর্ভুজ হয়। উহার কোণের অত্রি নক্ষত্র হইতে রেখা টানিয়া আর তিনটি তারা মিলাইলে সপ্তর্ষি মণ্ডল গঠিত হইবে। বশিষ্ঠ নক্ষত্রের নিকট আর একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে, উহার নাম অরুন্ধতী (Alcar)। কথিত আছে, বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী অসামান্য পতিভক্তির পুরস্কারস্বরূপ সপ্তর্ষি মণ্ডলীতে পতির পার্শ্বে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাহায্যে ধ্রুবনক্ষত্রটি বাহির করা সহজ। সপ্তর্ষি মণ্ডলকে বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে উত্তর আকাশের পূর্বদিকে দিগ্‌বলয়ে গাছপালার উপরে দেখা যায়। রাত্রি ৯টার সময়ে উহা মধ্যাকাশে আইসে এবং ১২টার সময়ে পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ে। উহা সারারাত্রে ধ্রুব নক্ষত্রকে একবার প্রদক্ষিণ করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে সপ্তর্ষি সন্ধ্যার সময়ই দিগ্‌বলয়ের অনেক উপরে দৃষ্ট হয়। ক্রমেই উহা পশ্চিম আকাশে সরিতে থাকে। সরিতে সরিতে অগ্রহায়ণ মাসে পশ্চিমাকাশের দিগ্‌বলয়ের নীচে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন শেষরাত্রে উহাকে পূর্বাকাশে দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তর্ষি মণ্ডলের লেজের বিপরীত দিকের অর্থাৎ ক্রতু ও পুলহ নামক উপরের দুইটি তারাকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া ঐ রেখাটিকে বাড়াইয়া দিলে উহা ধ্রুবতারার অতি নিকট দিয়া যাইবে। এই দুইটি নক্ষত্র সর্বদা ধ্রুবকে নির্দেশ করে বলিয়া উহাদিগকে ধ্রুব নক্ষত্রের 'প্রদর্শক' (Pointers) বলে।

সপ্তর্ষি ও ধ্রুব নক্ষত্রকে চিনিলে আকাশের অন্যান্য নক্ষত্র মণ্ডলকে উহাদের সাহায্যে চিনা সহজ হয়। ধ্রুব নক্ষত্রের একপাশে সপ্তর্ষি মণ্ডল উহার বিপরীত দিকে প্রায় সমদূরে আর একটি নক্ষত্র মণ্ডল আছে উহার নাম কাস্সিপিয়া (Cassiopeia)। এই নক্ষত্র মণ্ডলের পাঁচটি নক্ষত্রকে মনে মনে রেখা টানিয়া সংযুক্ত করিলে ইংরেজী ডাব্‌লিউ (W) অক্ষরের আকার হয়। কাস্সিপিয়ার আর এক নাম চেয়ারে উপবিষ্টা নারী (Lady in Chair)। সেকালের গ্রীক্ জ্যোতির্বিদগণ এই নক্ষত্র মণ্ডলের তারাগুলি সংযুক্ত করিয়া চেয়ারে উপবিষ্টা একটি নারীমূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন।

সপ্তর্ষি ধ্রুবতারার পূর্বে থাকিলে কাস্সিপিয়া বিপরীত দিকে পশ্চিমে থাকে। সপ্তর্ষি পশ্চিমে থাকিলে কাস্সিপিয়া পূর্বে আসে। সপ্তর্ষি ধ্রুবের উর্ধে থাকিলে কাস্সিপিয়া নিম্নে থাকে। ধ্রুবের বিপরীত দিকে থাকিয়া এই দুইটি নক্ষত্র মণ্ডল ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। বলা বাহুল্য, সকল নক্ষত্রই এইরূপে ধ্রুবতারার চারিদিকে ঘুরিয়া উহাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে।

আকাশের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে আবদ্ধ কল্পিত অক্ষের চারিদিকে নক্ষত্রখচিত খ-গোলটি (Celestial Sphere) নাটাইর মত দিবারাত্র ঘুরিতেছে। পূর্বেই বলা

হইয়াছে, পৃথিবীর আবর্তনের জন্য নক্ষত্রের গতি ও উদয়-অস্ত আমরা লক্ষ্য করি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করে। কিন্তু পৃথিবী একস্থানে থাকিয়া আবর্তন করে না। উহা নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী ক্রমেই পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। পৃথিবীর পূর্বদিকে এই অগ্রগতির জন্য প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টায় আকাশের নক্ষত্রগুলি ৪ মিনিট করিয়া আগে উদয় হয় এবং আগে অস্ত যায়। পৃথিবী নিজ কক্ষে ২৪ ঘণ্টায় প্রত্যহ ৪ মিনিট পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আজ যে নক্ষত্রটি আকাশের যে নির্দিষ্ট স্থানে দেখা যাইতেছে কাল ৪ মিনিট পূর্বে সেই নক্ষত্রটি এই স্থানে আসিবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে আরও পশ্চিমে সরিবে। এইরূপ প্রত্যহ ৪ মিনিট করিয়া এক মাসে ২ ঘণ্টা প্রভেদ হইবে। ১লা বৈশাখ পূর্বাকাশে দিঙ্বলয়ের নিকট যে সকল নক্ষত্র রাত্রি ১২টায় উদিত হইবে তাহারাই রাত্রি ৫টায় অস্ত যাইবে। সেই সকল নক্ষত্র ১লা জ্যৈষ্ঠ দুই ঘণ্টা পূর্বে রাত্রি ১০টায় উদয় হইবে ও ৩টায় অস্ত যাইবে এবং ১লা আষাঢ় রাত্রি ৮টায় উদয় হইবে এবং ১টায় অস্ত যাইবে। এইরূপ ছয় মাসে ১২ ঘণ্টার প্রভেদ হইবে। পৃথিবীর গতির জন্যই এক এক ঋতুতে এক এক সময়ে নভোমণ্ডলে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রসকল দৃষ্টিগোচর হয়।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। আকাশের নক্ষত্রগুলি খ-গোলের সহিত অবিরাম ঘুরিতেছে আমরা প্রতি রাত্রেই দেখিতে পাই। কিন্তু নক্ষত্রসকলের পরস্পরের দূরত্বের অথবা উহাদের অবস্থানের কোনই পরিবর্তন হয় না। আজ রাত্রে আমরা যে সকল নক্ষত্রকে অন্য নক্ষত্র হইতে যত দূরে ও যেভাবে অবস্থিত দেখিব কাল রাত্রেও উহারা এইরূপই থাকিবে। দশ বৎসর কিংবা এক শতাব্দী পরও উহারা এইরূপই থাকিবে। পরস্পর সম্পর্কে নক্ষত্র সকলের অবস্থানের কোনই পরিবর্তন হয় না। নক্ষত্র সকল যেন খ-গোলের গায় দৃঢ়ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে। উহাদের নড়চড় নাই। কেবল নক্ষত্রখচিত খ-গোলটি পৃথিবীর চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে আমরা দেখিতে পাই।

নক্ষত্রের সংখ্যা

অন্ধকার রজনীতে নক্ষত্রশোভিত আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের ধারণা হয়, আমরা যেন লক্ষ লক্ষ তারকা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বাস্তবিক ইহা ভুল ধারণা। জ্যোতির্বিদগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যাহাদের দৃষ্টিশক্তি একটু ভাল তাহারা সমগ্র আকাশে মাত্র ৭ হাজার নক্ষত্র দেখিতে পান। রাত্রিকালে খ-গোলের অর্দ্ধাংশ আমাদের মাথার উপরে আসে। সুতরাং সাত হাজারের অর্ধেক ৩৫০০ নক্ষত্র আমরা এক সময়ে আকাশে দেখিতে পাই। খালি চক্ষে ইহার অধিক নক্ষত্র এক সময়ে দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ তাহারা আরও কম সংখ্যক নক্ষত্র দেখিতে পায়।

প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষীরা আকাশে চন্দ্র ও সূর্যের কক্ষ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। এই কক্ষটি সহজে চিনিবার জন্য তাঁহারা চন্দ্র ও সূর্যের ভ্রমণ-পথ বা 'ভ-চক্র' (Ecliptic) আটাশটি উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডল দ্বারা চিহ্নিত করিয়াছিলেন। এই সকল নক্ষত্রের সাহায্যে কোন্ তিথিতে চন্দ্র সূর্য আকাশের কোন্ স্থানে আছে তাহা নির্ধারণ করা সহজ। এই ২৮টি নক্ষত্র ব্যতীত তাঁহারা আরও সহস্র সহস্র নক্ষত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা উহাদের স্থান নির্দেশ করেন নাই এবং নামকরণও করেন নাই। যজ্ঞ-কার্যের সময় নির্ধারণের জন্য আর্য ঋষিদিগের ২৮টি নক্ষত্রেরই প্রয়োজন হইয়াছিল। এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত অন্য কোন নক্ষত্রের নাম আর্য জ্যোতির্বিদগণ উল্লেখ করেন নাই।

সুবিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপার্কাস (Hipparchus) খৃষ্টের জন্মের ১২৭ বৎসর পূর্বে খালি চক্ষে দৃষ্ট নক্ষত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই তালিকায় ১০২৫টি নক্ষত্রের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আরব জ্যোতির্বিদ আল্‌সুফী খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে তাঁহার 'আকাশের বিবরণ' লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ১০১৮টি নক্ষত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর ইয়ুরোপে অনেক জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত খালি চক্ষে দৃষ্ট নক্ষত্রের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সকল তালিকা পর্যালোচনা

করিলে জানা যায়, সমগ্র আকাশে আমরা সাত হাজারের বেশী নক্ষত্র দেখিতে পাই না। দূরবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

স্যার উইলিয়ম হার্সেল (Sir William Herchel (1718-1822) তাঁহার নির্মিত ১৮".৭ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথের (Milky-way) নক্ষত্ররাজি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—ছায়াপথের প্রতি এক বর্গ ডিগ্রিতে প্রায় ৫০০ নক্ষত্র। দৃষ্ট খ-গোলের পরিমাণ ৪১২৫৩ বর্গ-ডিগ্রি নির্ধারিত হইয়াছে। এই হিসাবে সমগ্র আকাশে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ২০ কোটি হয়। ছায়াপথে নক্ষত্রের সংখ্যা অধিক; অন্যত্র তারকার পরিমাণ বিরল। এইজন্য চল্লিশ বৎসর পূর্বে আকাশে বিশ কোটি নক্ষত্র আছে এই কথা কোন জ্যোতির্বিদই বিশ্বাস করেন নাই। আকাশে ১০ কোটির বেশী নক্ষত্র থাকিতে পারে তাহা কেহ অনুমানও করিতে পারেন নাই।*

খালি চক্ষে কেবল উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশের যে স্থানে আমরা কোন নক্ষত্র দেখিতে পাই না, সেই স্থানে ক্ষুদ্র একটি দূরবীক্ষণ সাহায্যে দৃষ্টিপাত করিলে সহস্র সহস্র নক্ষত্ররাজি দেখা দেয়। যত শক্তিশালী দূরবীক্ষণ নির্মিত হইতেছে ততই অদৃশ্য ক্ষীণ-জ্যোতি তারাগুলি নয়নগোচর হইতেছে। সাধারণতঃ নিকটবর্তী নক্ষত্রগুলির উজ্জ্বলতা অধিক, এবং দূরবর্তী নক্ষত্র সকলের আলোক ক্ষীণ। পৃথিবী হইতে দূরবর্তী নক্ষত্রেরসংখ্যাই অধিক।

বর্তমান সময়ে আমেরিকার উইলসন্ মানমন্দিরের ১০০" ইঞ্চি দূরবীক্ষণই পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট। এই দূরবীক্ষণ সাহায্যে ১৫০ দেড়শত কোটি নক্ষত্রের ফটো তোলা হইয়াছে। আরও উৎকৃষ্টতর দূরবীক্ষণ নির্মিত হইলে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক বাড়িবে। স্যার জেমস্ জীনস্ (Sir James Jeans) প্রমুখ আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ মনে করেন, এক ছায়াপথেই ১০০০ দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের ন্যূন হইবে না। ছায়াপথের এক একটি নক্ষত্র আমাদের সূর্যের ন্যায় বৃহৎ ও প্রখর দীপ্তিশীল। নক্ষত্রগুলি এক একটি বিরাট সূর্য। আমাদের সূর্যও কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি নক্ষত্র। সূর্যে ও নক্ষত্রে কোনই পার্থক্য নাই। সূর্য আমাদের নিকটে এইজন্য সূর্যকে এত বৃহৎ দেখায় এবং উহার আলোক ও উজ্জ্বলতা এত প্রখর। নক্ষত্রগুলি অচিন্তনীয় দূরে অবস্থিত। এইজন্য উহাদিগকে আলোকবিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হয়।

পূর্বোক্ত দশ হাজার কোটি নক্ষত্র লইয়া একটি নক্ষত্র জগৎ (Galactic System) আমাদের সূর্যও এই নক্ষত্র-জগতের অন্তর্ভুক্ত। যখন মনে করা যায় দশ হাজার কোটি অত্যুজ্জ্বল সুবৃহৎ সূর্যের মধ্যে আমাদের সূর্য অন্যতম তখন সূর্যের গৌরব অনেকটা ম্লান হইয়া যায়। আমাদের নক্ষত্র-জগতের বাহিরে সুদূর আকাশে বহু সংখ্যক জলন্ত বাষ্পময় নীহারিকা (Nebula) আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমেরিকার উইলসন্ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাক্তার হাবল্ (Dr. E. P. Hubble) ১০০" ইঞ্চি দূরবীক্ষণ সাহায্যে এ পর্যন্ত প্রায় বিশ লক্ষ নীহারিকা আবিষ্কার করিয়াছেন। বর্ণ-বীক্ষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই সকল নীহারিকার উপাদান হইতে লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের জন্ম হইয়াছে ও হইতেছে। এক একটি নীহারিকা-দেহে এত উপাদান যে তাহা হইতে আমাদের সূর্যের ন্যায় বৃহৎ ও উজ্জ্বল দশ হাজার কোটি সূর্যের উৎপত্তি হইতে পারে। এক একটি নীহারিকা হইতে এক একটি স্বতন্ত্র নক্ষত্রজগতের (Galactic System) উৎপত্তি হইতেছে। আকাশে এইরূপ অন্যূন বিশ লক্ষ নক্ষত্র-জগৎ বর্তমান আছে। সুতরাং নক্ষত্রের সংখ্যা নির্ধারণ করা অসাধ্য ও অসম্ভব।

*We may conclude that a total of about 100,000000 will not be very far from truth. This is the number now usually assumed by astronomers. The Steller Heavens-J. E. Gore F.R.A.S.—1903.

"ধীরে বহে ডন্"

(অনুবাদ-উপন্যাস)

[পূর্বানুবৃত্তি]

মিখেল্ শোলকভ্

ষষ্ঠ অধ্যায়

(১)

মৃত্তিকার কঠিন কারাগার ভেদ করে সবুজ গমের অঙ্কুর আকাশের তলে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কয়েক হপ্তা পরে দাঁড়কাক তার মধ্যে উড়ে পড়লে অদৃশ্য হয়ে যায়। মাটির বক্ষ নিঙড়ে রস পান করে সে মঞ্জরিত হয়ে ওঠে—স্তব্ধ-পুষ্ট মঞ্জরীর বুক রসাল দুগ্ধের সুগন্ধে পরিস্ফীত হয়ে পড়ে—সোণালী শস্যের কিসলয়ে প্রান্তর ভরে যায়। প্রান্তরে গিয়ে চাষী স্থির দৃষ্টিতে তাদের পানে চেয়ে থাকে। কিন্তু মনে শান্তি নেই। যেদিকেই তাকায় গরুর পাল ক্ষেতে ঢুকে তার সোণার ফসল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে রেখে গেছে। এখানে কতগুলি দলিত গাছ মাটিতে ভেঙ্গে পড়েছে, ওখানে কতগুলি আধ-ভাঙ্গা একটা অন্যটার পর হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে আছে;—ক্ষোভে, দুঃখে, অসহায় চাষীর হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে।

একসিনিয়ার অবস্থাও আজ অনুরূপ। গ্রীগর তার ভারী কঠিন বুটের আঘাতে একসিনিয়ার সোণার স্বপন নির্মমভাবে দলিত করে, চুরমার করে দিয়ে গেছে, তাকে কলঙ্কিত করে, তাকে ভস্মীভূত করে অবাধে চলে গেছে। ব্যস ঐ পর্য্যন্তই।

মেলেকভদের সূর্য্যমুখী-কুঞ্জ থেকে এসিনিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়ে ফিরেছে। এক অনাদৃত জঙ্গলাকীর্ণ ফার্ম-প্রাঙ্গণের সঙ্গে আজ তার এতটুকু প্রভেদ নেই। রুমালের প্রান্ত দাঁতে চিবোতে চিবোতে বিভ্রান্তের মত সে হেঁটে চলেছে। রুদ্ধ কান্নার আবেগে শ্বাস রোধ হয়ে যাবার উপক্রম। ঘরে ঢুকেই সে মেজেতে সটান লুটিয়ে পড়ল। অবরুদ্ধ অশ্রু, বুকফাটা যন্ত্রণা এবং ভয়াবহ শূন্যতা একযোগে তার মাথার মধ্যে তীব্র কশাঘাত হান্তে লাগল। কিন্তু এ ঝড় স্বল্প স্থায়ী। উদ্বেলিত বুকফাটা যন্ত্রণার তরঙ্গ ক্লান্ত হয়ে ক্রমে অন্তরের অন্তঃস্থলে বাসা বাঁধল।

দলিত শস্য-শীর্ষ আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। রৌদ্র ও শিশিরের সঞ্জীবনী পরশে আবার তার ভাঙা বুক জোড়া লাগে। প্রথমে স্কন্ধে বোঝা চাপানো শ্রমিকের মত বাঁকা হয়ে থাকে; তার পরই মাথা চাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়,—সূর্য্যকিরণে তখন আবার তাদের উন্নত-শির ঝলমল করে ওঠে, পবনস্পর্শে পুলক রোমাঞ্চে দেহে জাগে শিহরণ।

নিশীথ রাত্রে স্বামীকে সোহাগ করতে গিয়ে একসিনিয়ার আর একজনকে মনে পড়ত। ঘৃণার সঙ্গে তার অন্তরে এক দুর্ব্বার প্রেম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। মনে সে এক নূতন কলঙ্কের ছবি আঁকত, কিন্তু সেই অতীত কলঙ্কের কালিমা যে কিছুতেই মোছা যায় না! খোঁচা দিয়ে সেই বিষক্ষতকে জাগিয়ে তো সারা মন টন্‌টন্ করে ওঠে। না, নেতালিয়ার কাছ থেকে গ্রীগরকে ছিনিয়ে সে নেবেই! সেই সুখ-স্বপ্নে বিভোর অবুঝ বালিকা, প্রেমের আনন্দ বা জ্বালা যে আজো বোঝে নি তার কাছ থেকে—তা হোক! এ একসিনিয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প। ডান হাতের ওপর টাকানের মাথা রেখে, সারা রাত জেগে একসিনিয়া কি উপায়ে সফলকাম হবে, তাই ভাবে। ভাবতে গিয়ে কল্পনার খেই হারিয়ে যায়; কিন্তু একটা জিনিষ তার কাছে ধ্রুবতারার মতই স্থির এবং অচঞ্চল —গ্রীগরকে সারা দুনিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে, তার প্রেম দিয়ে ঢেকে রাখবে। গ্রীগর যে-ভাবে তাকে অধিকার করেছিল, তা' থেকে কঠিনতর ভাবে গ্রীগরকে সে অধিকার করে রাখবেই।

দিনের বেলা সংসারের নানা কাজের মধ্যে একসিনিয়া তার চিন্তা ডুবিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে গ্রীগরের সঙ্গে আজকালও দেখা হয়। চোখাচোখি হতেই একসিনিয়া বিবর্ণ হয়ে যায়। অন্তরের লোলুপ বহ্নিশিখা চেপে সে অভিনীত তাচ্ছিল্যভরে নির্লজ্জের মত গ্রীগরের পানে চেয়ে থাকে।

একসিনিয়ার সঙ্গে প্রতি সাক্ষাতের পর গ্রীগর তাকে পাবার জন্য অধিকতর উৎসুক হয়ে ওঠে। অকারণে সে চটে-মটে অস্থির হয়; ঝাল ঝাড়ে ডুনিয়া এবং মায়ের উপর। কিন্তু প্রায়ই সে টুপী হাতে করে পেছনের আঙিনায় প্রকাণ্ড ঝোপটার কাছে গিয়ে সেটা সে কাটতে থাকে যে পর্য্যন্ত না ঘেমে-চুমে অস্থির হয়ে পড়ে। এই দেখে প্যাণ্টালীমন রাগে গড়গড় করে বলে—"জানোয়ার কোথাকার! রোজ উনি ঝোপ সাফ করতে যান! দাঁড়া, বিয়েটা হয়ে যাক্, দেখি কত তুই ঝোপ সাফ্ করতে পারিস্! তখন, উহুঁ, ও মুখোও হবে না!"

*　　　*　　　*

২

কনে আন্‌বার জন্য চারখানি সুসজ্জিত জুড়ী গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। পড়শীরা অনেকে মেলেকভের প্রাঙ্গণে গাড়ীর চার পাশে ভীড় করে উৎসুকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। কালো একটা ফ্রক-কোট এবং নীল সিটের পাজামা পড়ে পিয়োত্রা ব্যস্ত-সমস্তভাবে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। বাঁ হাতে দু'খানা সাদা রুমালও বাঁধা আছে। সে যে আজ বরকর্ত্তা! মুখে হাসি আর ধরে না!

'লজ্জা করিস নি গ্রীগর, জোয়ান মোরগের মত মাথা খাড়া করে রাখ!' ভাইকে সম্বোধন করে সোৎসাহে পিয়োত্রা বলে।

উইলো বৃক্ষের মত তন্বী ও নমনীয় ডেরিয়া স্বামীকে ঠেলা দিয়ে বললে—'যাবার সময় হ'ল না!

'হাঁ, হাঁ, বস না গিয়ে তোমরা!'—আদেশের সুরে পিয়োত্রা বললে—'আমার গাড়ীতে যাবে বর, আর জন পাঁচেক।'

সবাই একে একে গাড়ীতে উঠল গিয়ে। ইলিনীস্না বিজয়িনীর মত ফটক খুলে দিতেই ঘড়ঘড় শব্দে সারিবদ্ধ ভাবে গাড়ীগুলি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

পিয়োত্রা গ্রীগরের পাশেই বসেছে। তাদের সাম্‌নে বসে ডেরিয়া রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানাল।

গাড়ীর চক্রাঙ্ক এবং ঝাঁকানি মাঝে মাঝে তাদের সম্মিলিত ঐক্যতানে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগল। গাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে কসাকদের টুপীর আরক্ত ব্যাণ্ড, নীল ও কালো উর্দ্দি এবং ফ্রক্‌কোট, কটিদেশে বাঁধা সাদা রুমাল। মেয়েদের রুমালের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা এবং প্রতি গাড়ীর পশ্চাতের সূক্ষ্ম উর্দ্ধে-উৎক্ষিপ্ত-ধূলি-রেখা, এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

গ্রীগরের মেজকাকা এনিখি বরের গাড়ী চালাচ্ছে। আসন থেকে আর একটু হলেই পড়ে যাবে, এমনিভাবে ঘোড়ার উপর ঝুঁকে পড়ে এনিখি শিস্ দিচ্ছে, আর বন্ বন্ শব্দে চাবুক ঘুরাচ্ছে। দ্বিতীয় গাড়ীর চালক গ্রীগরের মামা ইলিয়া ওঝোগিন। সাম্‌নের গাড়ী কাটিয়ে যাবার জন্য ইলিয়া চীৎকার করে বললে—হেই, তাড়াতাড়ি' মামার পেছনে ডুনিয়ার উৎফুল্ল মুখখানি গ্রীগরের চোখে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র একটা শিস্ দিয়ে, এনিখি চীৎকার করে বললে—'না, না, এই—পারবে না আগে যেতে।' তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটো ছুটে চলল। সন্ত্রস্ত ডেরিয়া এনিখির পালিশ করা বুট জড়িয়ে ধরে বললে—'এই; পড়ে যাবে!' 'থামো!'—মামা পাশ থেকে বলে উঠলেন, কিন্তু ওদের এই চেঁচামেচি চাকার নিরবিচ্ছিন্ন তীব্র ঘড়ঘড় শব্দের মধ্যে ডুবে গেল। মেয়ে-পুরুষ বোঝাই দু'খানি গাড়ী তখন পাশাপাশি চলেছে। লাল-নীল কাগজের গোলাপ ফুল দিয়ে ঘোড়াগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেশর এবং কপালের সামনে রঙীন কাগজের ফিতে ঝুলছে। পথের খোঁচ-খাচের মধ্যে পড়ে মাঝে মাঝে গাড়ীতে খুব ঝাঁকানি লাগছে। ক্লান্ত ঘোড়াগুলির মুখ থেকে সাবানের মত ফেণা বেরুচ্ছে। আর কাগজের গোলাপগুলি তাদের আর্দ্র পিঠের উপর অবিরত দুলছে।

করশুনভের ফটকে বর-যাত্রীদের আগমন প্রতীক্ষায় বাছ ফচকে ছোঁড়া পথের পানে উৎসুক নয়নে চেয়েছিল।

রাস্তায় বালি উড়তে দেখেই ছুটে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বললে—'এসে গেছে। বর এসেছে!'

ফটকের সাম্‌নে গাড়ী থামলে। পিয়োত্রা গ্রীগরের হাত ধরে সিঁড়ি অবধি নিয়ে গেল। আর সবাই পেছন পেছন আস্‌তে লাগল। বারান্দা থেকে রান্নাঘরে যাবার দরজাটা বেশ করে খিল আঁটা ছিল। পিয়োত্রা কবাটে ধাক্কা মেরে বললে—'ভগবান যীশু, সদয় হউন।' দরজার ওপাস থেকে উত্তর এলো—'স্বস্তি।' আবার ঐ কথা বলে পিয়োত্রা তিনবার দরজায় ধাক্কা মারল, প্রতিবারেই ও পাশ থেকে একই উত্তর। তখন পিয়োত্রা জিজ্ঞাসা করল—'ভেতরে আস্‌তে পারি?'

—'নিশ্চয়!'

কবাট খুলে গেল। নেতালিয়ার ধর্ম্মমাতা কন্যার পিতামাতার প্রতিনিধি হিসাবে পিয়োত্রাকে অভ্যর্থনা করলেন। সবিনয়ে এক গ্লাস তীব্র টাট্‌কা 'ভাস' বাড়িয়ে দিয়ে তিনি হেসে বললেন—'আসুন।' পিয়োত্রা মুহূর্ত্ত মধ্যে পান-পাত্রটি শূন্য করে, অভ্যাগতদের চাপা হাসির মধ্যে বললে—'আপনার অভ্যর্থনা তো হয়ে গেল; দাঁড়ান, আমি আপনাকে অভ্যর্থনা এ ভাবে করব না। এর শাস্তি দিয়ে তবে আমি ছাড়ব।'

বর-কর্ত্তা এবং ধর্ম্মমাতার এই কথা কাটাকাটির মধ্যে বিবাহের চুক্তি মত বর-যাত্রীদের তিন গ্লাস করে 'ভোদ্‌কা' এনে দেওয়া হ'ল।

নেতালিয়া বিবাহের পোষাকে সজ্জিত হয়ে অবগুণ্ঠনাবৃত অবস্থায় টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দুটি বোন দুই পাশে তাকে পাহারা দিচ্ছে। মেরিয়ার হাতে পিন্ একটা, আর এগ্রিপনার হাতে পোকার।

ভোদ্‌কা পানে প্রমত্ত পিয়োত্রা তাদের সাম্‌নে গিয়ে অভিবাদন করে একটি পঞ্চাশ কোপেক্ মুদ্রা দিলে। টেবিল ঠুকে মেরিয়া বললে—'না, এত কমে কনে বিক্রী করা যায় না!' আবার পিয়োত্রা গ্লাসের মধ্যে একটি রৌপ্য মুদ্রা রাখল। আনতমুখী নেতালিয়াকে কনুই দিয়ে ঠেলা মেরে ভগিনীদ্বয় সমস্বরে বলে উঠল—'না, পাবেন না আপনি ওকে, দেবো না।'

প্রত্যুত্তরে আপত্তি জানিয়ে পিয়োত্রা বললে—'এর মানে কি? ওদের আমরা দিয়ে দিয়েছে, বেশীই দিয়েছি!'

—'এই, যা সরে যা!' মিত্রণ বললে। হেসে সে টেবিলের দিকে অগ্রসর হতেই, কন্যা-যাত্রীরা নবাগতদের আসন করে দেবার জন্য যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পিয়োত্রা একখানা আলোয়ানের প্রান্ত গ্রীগরের হাতে গুঁজে দিয়ে, এক লাফে বেঞ্চির উপর উঠে, ওকে কনের কাছে নিয়ে গেল। নেতালিয়া ইকনের তলায় বসেছিল। নেতালিয়া ভীরু-কম্পিত হস্তে আলোয়ানের অপর প্রান্ত ধরলে। গ্রীগর তার পাশে বসল।

টেবিলের পাশে তখন অভ্যাগতগণ সকলেই হাত দিয়ে মুরগীর ছানাগুলি টুকরো করছে। পরে যে যার চুলে হাত মুছে ফেললে।

এনিখি হাত ভরে মুরগীর ছানা তুলে চিবোতে শুরু করে দিয়েছে, আর তার গাল বেয়ে একটা হলুদে চর্ব্বির ধারা কলার অবধি এসে নেমেছে।

করুণ দৃষ্টিতে গ্রীগর প্রথম নিজের আহার্য্য পাত্রটির পানে চাইল। নেতালিয়ার চামচ একখানা রুমাল দিয়ে বাঁধা ছিল। গলা অস্ত করে অভ্যাগতগণ যে যার খেলে। পুরুষের ঘামের রঞ্জনের মত গন্ধ, নারী-দেহের সুবাসের সঙ্গে মিশে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে, সঙ্গে আছে স্কার্ট, ফ্রক-কোট এবং আলোয়ানের নেপথালিনের গন্ধ।

আড়চোখে গ্রীগর চাইলে নেতালিয়ার প[illegible]ন। সেই-ই প্রথম তার লক্ষ্য পড়ল, নেতালিয়ার [illegible]নি বেশ পুরু এবং অধরের পর ঝুঁকে পড়েছে। ডান গালে কটা একটা আঁচিলও আছে, তার ওপর আবার দুগাছি সোনালী লোমও রয়েছে। ব্যাপারটা তার কাছে নিতান্ত বিশ্রী বলে মনে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে একসিনিয়ার ছবি মানস-পটে ভেসে উঠল। মনে হ'ল কে যেন তার পিঠের উপর কতগুলি খস্‌খসে খড় চাপিয়ে দিয়েছে। সারা দেহ কাঁটা দিয়ে উঠল। সংযত ক্ষোভে নীরবে সে টেবিলের চতুষ্পার্শ্বস্থ অভ্যাগতদের খাওয়া লক্ষ্য করতে লাগল।

আস্‌বার বেলা কে যেন কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা করবার জন্য তার জুতোর মধ্যে একমুঠো শস্য ভরে দিয়ে গেল। সারা পথ সেগুলির জন্য পায়ে লাগতে লাগল। তা' ছাড়া

সার্টের এই আঁটা কলারে তার শ্বাস রোধ হবার উপক্রম হয়েছে। দুর্বিসহ ক্ষোভে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল।

* * *

৩

প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বৃদ্ধ মেলেকভ দম্পতি পথিমধ্যে তাদের অভ্যর্থনা করল। প্যাণ্টালীমন ইকনটা উঁচু করে ধরে ছিল। ইলিনীশনা তার পাশে ভাবলেশ হীন দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন।

আনন্দ-ধ্বনি এবং গম বর্ষণের মধ্য দিয়ে নবদম্পতি আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে তাদের দিকে অগ্রসর হ'ল। আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে প্যাণ্টালীমনের চোখ ফেটে জল এল। এই দুর্ব্বলতা পাছে অন্য কারও কাছে ধরা পড়ে এই আশঙ্কায় ভ্রূকুঞ্চিত করে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করলে।

বর-কনে কুটীরে প্রবেশ করল। পিয়োত্রাকে খুঁজে বার করার জন্য ডেরিয়া ছুটে বারান্দায় এল। না দেখে অমনিই ছুটলো দুনিয়ার কাছে।

—'পিয়োত্রা কই ?'

—'দেখি নি তো !'

—'হ্যাখো, কোথায় সে পুরুত ডাকতে যাবে, আর খোঁজই নেই !'

খোঁজ পাওয়া গেল। অতিমাত্রায় ভোদ্‌কা পানে বিবশ হয়ে সে গাড়ীর মধ্যে শুয়ে গোঙাচ্ছে। বাজ যেমন ছোঁ মেরে মেষশাবককে ধরে, ডেরিয়া তেমনিভাবে ধরলে পিয়োত্রাকে।

—'বেশী মদ খেয়ে ফেলেছো! যাও, শীগ্‌গির উঠে পুরুতকে ডেকে আনো।'

—'ভাগ্‌! তুই আদেশ করবার কে ?'

সাশ্রুনেত্রে আঙুল দিয়ে ডেরিয়া তার মুখ চেপে ধরে, এটা-ওটা করে তার নেশা ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল। তার পর এক কলসী জল মাথায় ঢেলে যতটা সম্ভব মুছে দিয়ে তাকে পুরুত-বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

এর পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিবাহের আনুষ্ঠানিক কৃত্য শুরু হ'ল। মোমবাতি হাতে গ্রীগর গীর্জ্জার মধ্যে নেতালিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ভাবে দেয়ালে দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল। সমাগত সকলেই নবদম্পতির পানে চেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে কি বলছিল। গ্রীগরের বারে বারেই মনে হ'তে লাগল—'গেছি, আমি একেবারেই শেষ হ'য়ে গেছি।' পিয়োত্রা পেছন থেকে কাশি দিয়ে উঠল। জনতার মধ্যে একবার যেন দুনিয়ার উৎফুল্ল চোখ দুটিও তার চোখে পড়ল। মনে হল আর সবাইও চেনা। সকলেই সমস্বরে ভজন শুরু করে দিলে; মনে হ'ল চারিদিকের একটা বিরূপ মনোভাব তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। মন্ত্র-চালিতের মত নীরবে সে ফাদার ভিসারিয়ণের পেছন পেছন ধর্ম্মগ্রন্থের মঞ্চটি ঘুরে এলো। পিয়োত্রা পেছন থেকে তার ফ্রক্‌কোটে টান মারতেই সে থেমে দাঁড়াল। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার পানে চেয়ে সে অন্তরের সঙ্গে সংগ্রাম করতে লাগল। একটা নামগোত্র-হীন জড়ত্ব সত্যি সত্যিই আজ তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। 'অঙ্গুরী বিনিময় কর!'—ফাদার ভিসারিয়ণ বল্লেন শুনল। যন্ত্রবৎ তারা আদেশ পালন করল। পিয়োত্রাকে চোখে পড়তেই নীরবে সে জিজ্ঞাসা করল—'কখন শেষ হবে ?' ঠোঁটে হাসি চেপে পিয়োত্রা জানাল—'এখনিই হয়ে যাবে।'

গ্রীগর স্ত্রীর আর্দ্র, নীরস অধর চুম্বন করলে। ক্রমে নির্ব্বাপিত আলোকশিখার তীব্র গন্ধে গীর্জ্জা ভরে উঠল। সমবেত জনমণ্ডলী প্রবেশ দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হতে লাগল।

নেতালিয়ার স্থুল এবং কর্কশ হাতখানা ধরে গ্রীগর বারান্দায় এলো। কে যেন মাথার টুপীর উপর কয়েকটি চাপড় মেরে সরে পড়ল। পূবালী উষ্ণ হাওয়া নাকে ফুলের সুবাস বয়ে নিয়ে এল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধতা প্রান্তর থেকে হুহু করে ছুটে এল। ডনের ওপারে বিজলীর চপল হাসি রেখা ফুটে উঠছে, বর্ষা আসন্ন। গীর্জ্জার শ্বেত বেড়ার ওপাশ থেকে ঘোড়ার কণ্ঠলগ্ন মৃদু ঘণ্টাধ্বনি জনতার কণ্ঠ-গুঞ্জন ভেদ করে তাকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। একপা' দুপা' করে গ্রীগর নেমে এল।

* * *

৪

বরকনে গীর্জ্জায় না যাওয়া অবধি করশুনভরা মেলেক-ভদের বাড়ীতে আসেনি। ওরা এলো কিনা দেখবার জন্য অস্থিরভাবে প্যান্টালীমন রাস্তা অবধি গিয়ে দেখে এসেছে। কই, কেউ নেই রাস্তায়! ভনের দিকে ফিরে দেখে বনে উজ্জ্বল হরিৎবর্ণের ছোপ লেগে গেছে। পরিণত বেণুবন ভনের জলাভূমির মধ্যে নুইয়ে পড়েছে। গোধূলির সহযোগে প্রথম শরতের এক ঘোলাটে রক্তিম ছটা গ্রাম-দিগন্ত আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রাস্তার চৌমাথার পাশে মন্দিরের চূড়াটি আকাশের বুকে মসী অঙ্কিত চিত্রের মত দেখাচ্ছিল।

সহসা গাড়ীর চাকার ক্ষীণ শব্দ এবং কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক প্যান্টালীমনের কানে এল। গাড়ী দুখানি স্কোয়ার ছেড়ে রাস্তায় পড়ল এসে। প্রথমখানিতে সস্ত্রীক মিরণ বসে ছিলেন, তাদের সামনেই ছিল গ্রীসাকা—সেইণ্ট জর্জ্জের ক্রশ এবং অন্যান্য বহু মেডেল তার নতুন উর্দ্দিটার বুকে ঝুলান। মিট্‌কা কোন রকম তাড়াহুড়া না করেই গাড়ী চালাচ্ছে। প্যান্টালীমন ফটক খুলে দিতেই গাড়ী দু'খানি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। ব্যস্তভাবে ইলিনীশনা ছুটে এলেন।

—'আসুন, আসুন! এই গরীবের কুটীরে পদার্পণ করে আমাকে ধন্য করুন।'—স্থূল কোমর অবনত করে ইলিনিশনা করশুনভদের অভ্যর্থনা জানালে।

হাত বাড়িয়ে সবিনয়ে প্যান্টালীমন বলল—'দয়া করে ভেতরে আসুন!' ঘোড়া ক'টা খুলবার আদেশ দিয়ে প্যান্টালীমন নবাগত অতিথিবর্গের দিকে অগ্রসর হ'ল। অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পর্ব্ব শেষ হলে, অতিথি-বর্গ, গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রীর পেছন পেছন কুটীরের দিকে চলল। অর্দ্ধমাতাল একদল অভ্যাগত ইতি পূর্ব্বেই সেই ঘরে টেবিলের চারিপাশে বসে ছিল। এরা আসবার কিছুকাল পরেই নবদম্পতি গীর্জ্জা থেকে ফিরে এল। তারা ঘরে ঢুকতেই এক গ্লাস 'ভোদ্‌কা' ঢেলে সাশ্রুনেত্রে প্যান্টালীমন বললে—'দেখুন মিরণ গ্রীগরীভিচ, এই যে আমাদের সন্তান এসেছে। প্রার্থনা করি, ওদের জীবন যেন আমাদের মতই মঙ্গলময় হয়, যেন ওরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।'

গ্রীসাকা দাদুকে বেশ বড় এক গ্লাস ভোদ্‌কা ভরে দেওয়া হ'ল। কিন্তু তার অর্দ্ধেকের বেশী বৃদ্ধ গলাধঃকরণ করতে পারলে না। বাকী অর্দ্ধেকের প্রায় সবটুকুই তার উর্দ্দির শক্ত কলারের মধ্যে ঢুকে গেল। পানপাত্রে ঠোকাঠুকি হতে লাগল। যে যতদূর পারে পানপাত্র শূন্য করতে কসুর করলে না।

করশুনভদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়, কোলো-ভাইদিন সহসা পানপাত্রটি উঁচু করে ধরে টেবিলের এক প্রান্ত থেকে গর্জ্জন করে উঠল'—'বড্ড ঝাঁঝালো।' টেবিলে উপবিষ্ট অন্যান্য অতিথিবর্গও তার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল—'বড্ড ঝাঁঝালো! বড্ড ঝাঁঝালো!' রান্নাঘরে সমবেত নারীমহল থেকেও প্রতিধ্বনিত হ'ল—'সত্যি, বড্ড ঝাঁঝালো।'

স্ত্রীর নীরস অধরে চুম্বন করে গ্রীগর ক্রুর দৃষ্টিতে জন-মণ্ডলীর পানে চাইল। চতুর্দ্দিকে শুধু আরক্ত মুখচ্ছবি, ইতর চাহনি, মাতালের হাসি আর বিকট চীৎকার। কোলোভাইদিন আবার হা করে, পানপাত্রটি তুলে ধরে বললে—'বড্ড ঝাঁঝালো'। আবার সকলে 'ঝাঁঝালো' বলে চীৎকার করে উঠল।

রান্নাঘরে ডেরিয়া নেশার ঘোরে গান ধরে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আর সব মেয়েরাও শুরু করলে। ক্রমে পুরুষ মহলেও গান সংক্রামিত হ'ল। সকলেই প্রমত্ত, সকলেই গাইছে। কিন্তু কণ্ঠস্বরের এই বীভৎস জগাখিচুড়ীর মধ্যেও, ক্রিস্তোনিয়ার কণ্ঠের স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরিই অক্ষুণ্ণ আছে। সকল কণ্ঠের উর্দ্ধে তার বীভৎস রাগিনী জানালার সার্সি কাঁপিয়ে তুলেছে।

সঙ্গীতান্তে আবার ভোজন শুরু হ'ল।

—'এই মাংসটা খাও না।'

—'হাত সরিয়ে নাও বলছি, দেখছো না আমার স্বামী চেয়ে আছে।'

—'বড্ড ঝাঁঝালো! বড্ড ঝাঁঝালো!'

রান্নাঘরের মেজে কেঁপে উঠল। গোড়ালীর পট্‌পট্‌ শব্দ হতে লাগল। একটা গ্লাস মেজেয় পড়ে গেল। কিন্তু চেঁচামেচির মধ্যে তার ঠুন্‌ঠুনানি ডুবে গেল। গ্রীগর চোখ তুলে চাইলে সেদিকে—মেয়েরা নৃত্য শুরু করে দিয়েছে।

রুমাল উড়িয়ে, স্থূল কোমর দুলিয়ে নাচছে তারা। কোমর সরু থাকেই বা কি করে? পাঁচ ছ'টার কম স্কার্ট কেউ পারে নি তো!

একর্কার্ডিয়নের সংলাপ আরম্ভ হ'ল। বাদক কসাক নৃত্যের গৎ বাজাতে লাগল। জনতার মধ্য থেকে সহসা কে চীৎকার করে বলে উঠল—'গোল হয়ে দাঁড়াও, গোল হয়ে দাঁড়াও!'

মেয়েদের কিছুটা ঠেলে পিয়োত্রা বললে—'একটু সরে দাঁড়াও!'

গ্রীগরের জড়তা মুহূর্ত মধ্যে কেটে গেল, নেতালিয়াকে লক্ষ্য করে বললে—'এই দেখ পিয়োত্রা "কসাক নৃত্য" নাচছে।'

—'কার সঙ্গে?'

—'দেখতে পাচ্ছো না?—তোমার মার সঙ্গে!'

মেরিয়া লুকি নিশ্না বাঁহাতে রুমাল নিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। পিয়োত্রা নৃত্যের তালে পা ফেলে তার দিকে এগিয়ে এল। কটিদেশ অবধি আনত হয়ে আবার উঠে দাঁড়াল; তার পর আবার নৃত্যের তালে তালে স্বস্থানে ফিরে এল। ইলিনীশনা এমন ভাবে স্কার্ট তুললেন, মনে হ'ল কোন জলাভূমি ছোটে পার হবেন বুঝি। তার পর পায়ে তাল ঠিক করে, পুরুষের মত পা ছুঁড়ে নৃত্য করতে সুরু করে দিলেন।

বাদক সঙ্গীতের তাল দ্রুততর করলে। কিন্তু পিয়োত্রা ঠিকমত তালে তালে গুটিগুটি পা ফেলে নেচে চলেছে। সহসা একটা শব্দ উঠে গুঁড়ি মেরে বসে দু হাতে বুটের পা' ধরে, মুখ দিয়ে গোঁফের প্রান্ত কামড়ে সে ক্ষিপ্র গতিতে হাঁটুদ্বয় বিস্তার এবং সঙ্কোচ করে নাচতে লাগল।

দরজায় ভীড় করবার জন্য গ্রীগর ও-পাশের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু মাত্র নেশামত্ত অতিথিবর্গের অস্পষ্ট চীৎকার এবং গোড়ালীর শব্দই কানে আসছে।

মিরণ নাচলে ইলিনীশ্নার সঙ্গে। কিন্তু সে নৃত্য নিতান্তই নিয়ম রক্ষা মাত্র। প্যান্টালীমন টুলের পর দাঁড়িয়ে ওদের নিরীক্ষণ করছিল। নৃত্যের তালে তালে তার খোঁড়া পা' খানা মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। কিন্তু পায়ের পরিবর্ত্তে নাচলে তার ঠোঁট দু-খানি এবং কানের অর্দ্ধচন্দ্র দুটি।

আনাড়ী আরও দু'চার জনে নাচবার চেষ্টা করল, কিন্তু জনতা চীৎকার করে বললে—'এই সব মাটি করবি না!'

এ সবের বহু পূর্ব্বেই গ্রীসাকা দাদু নেশায় চুড় হয়ে, পার্শ্বস্থ পড়সীর পিঠ জড়িয়ে ধরে, মাছির মত তার কানের কাছে ভ্যান ভ্যান করছিল।—কোন বছরে আপনি প্রথম সার্ভিসে যোগ দেন? প্রতিবেশী উত্তর করলেন—১৮৩৯ সালে, ছেলে।' গ্রীসাকা চমকিত হয়ে কান খাড়া করে বললে—'কোন সালে বললেন?'

—'বললাম না, ১৮৩৯ সালে।'

—'আপনার নাম? কোন রেজিমেণ্টে ছিলেন?'

—ম্যাক্সীম বোগাতিরীভ। বাক্লানভের রেজিমেণ্টের আমি একজন কর্পোরাল ছিলাম।

—'আপনি কি মেলেকভ পরিবারের লোক?'

—'কি?'

—'জিজ্ঞেস্ করছি, আপনি কোন পরিবারের...'

—'এ্যা! আমি ছেলের মাতামহ।'

—'কি বললেন। আপনি বাক্লানভের রেজিমেণ্টে ছিলেন?

বৃদ্ধ গ্রীসাকার পানে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—'তা হ'লে ককেসাসের যুদ্ধের সময় আপনি নিশ্চয়ি ছিলেন।'

—'আমি বাক্লানভের অধীনেই ছিলাম—ককেসাসের যুদ্ধে জয়লাভ করতে আমি তাকে সাহায্য করেছি। আমাদের রেজিমেণ্টে কয়েকজন কসাক যা ছিল। অমন আর হবে না। একবার একখানা কার্পেট আনবার জন্য আমাদের সেনাপতি খুব শাস্তি দিয়েছিলেন আমাকে'—

গ্রীসাকা বুক উঁচু করে তার পদকগুলি দেখিয়ে বললে—'আমি তুরস্ক-অভিযানের সময়ে ছিলাম। অ্যাঁ? হাঁ, আমি ছিলাম!'

কিন্তু বৃদ্ধ গ্রীসাকার কথা লক্ষ্য না করে বলে যেতে লাগলেন—'ভোর বেলা আমরা একটা গ্রাম অধিকার করলাম, দুপুর বেলা বিপদসূচক তুর্য্যধ্বনি হ'ল।'

গ্রীসাকা বললে—'আমরা রোসিংসের চার পাশে যুদ্ধ কর্চ্ছিলাম আমাদের দ্বাদশ ডন কশাক্ রেজিমেণ্ট, তুর্কী গোলন্দাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল।'

—'তূর্য্যবাদক যখন সঙ্কেত করলে আমি তখন একখানি কুটীরের মধ্যে…'

—'হাঁ, গ্রীসাকা বলে যেতে লাগল…'তুর্কী গোলন্দাজদের মাথায় সাদা…'

—'তূর্য্যবাদক সঙ্কেত করলে, আমি আমার সাথীকে বললাম—"ডিসোফি, আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হবে। কিন্তু তার আগে দেয়াল থেকে কার্পেটখানা খুলে নিই।"

—'আমি বীরত্বের জন্য দু'খানা জর্জ্জের পদক পুরস্কার পেয়েছি'—গ্রীসাকা বললে—'আমি একজন তুর্কী মেজরকে জীবন্ত ধরে এনেছিলাম।'

—'দেখ, শয়তান আমাকে কেমন কুপথে নিয়ে গেল।'

—এক খণ্ড মাংসের টুকরো হাতে নিয়ে বৃদ্ধ বললে—'জীবনে পরের জিনিষ ছুঁই নি। কিন্তু কার্পেটখানা দেখে ভাবলাম, ঘোড়ার পিটের একখানা…'আমি সমুদ্র পারেও গেছি' গ্রীসাকা প্রতিবেশীর চোখে চোখে চাইবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে অবশেষে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করলে। ভূমিকা না করেই সে গল্পের মাঝখান থেকে বলতে শুরু করে দিল—'কাপ্টেন আমাকে আদেশ দিলে—"ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চল। ফরোয়ার্ড!"

কিন্তু বাক্লানভ রেজিমেণ্টের কসাকটি আক্রমণোদ্যত সৈনিক যেমন তূর্য্যধ্বনি শুনে তেমনিভাবে পেছনে ঘাড় ফিরিয়ে বললে—'বল্লাম ঠিক রাখো। বাক্লানভের দল, অসি কোষমুক্ত কর!

বৃদ্ধের স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার নিষ্প্রভ চক্ষু দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল—'বাক্লানভের দল, আক্রমণ কর—ফরোয়ার্ড!" সহসা তার মুখে তারুণ্যের আভা ফুটে উঠল। ঝরঝর করে অশ্রু গড়িয়ে তার শুভ্র শ্মশ্রু ভিজে গেল।

গ্রীসাকাও রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে: আমাদের আদেশ দিয়ে অসি তুলে ইঙ্গিত করল। ক্ষিপ্রগতিতে আমরা অগ্রসর হলাম, তুর্কী গোলন্দাজেরা এই ভাবে ব্যূহ গঠন করে ছিল—টেবিলের পর একটি স্কোয়ার এঁকে দেখালে—'তাদের কামান নিরবিচ্ছিন্ন অগ্নি উদ্গিরণ করছিল। তিন তিন বার আমরা তাদের আক্রমণ করলাম। কিন্তু প্রতিবারেই আমাদের তারা বিতাড়িত করে দিলে। যখনই আমরা অগ্রসর হতাম, তাদের অশ্বারোহী দল পার্শ্বস্থ বন থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করত। আমাদের সেনাপতি আদেশ দিতেই আমরা সেই বনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিছুকালের মধ্যেই তাদের বিধ্বস্ত করে আমরা ফিরলাম। কসাকদের জুড়ী অশ্বারোহী সৈন্য দুনিয়ায় কোথায় আছে? তারা গভীর অরণ্যের মধ্যে পালিয়ে গেল, হঠাৎ তাদের একজন স্বর্ণন অফিসারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'ল। আমাকে দেখেই সে কোমর থেকে পিস্তল তুলে গুলী করলে, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'ল। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। তাকে দ্বিখণ্ডিত করতে গিয়ে আমার মনে একটা নতুন কথা জাগল। শত্রু হোলেও, সেও তো মানুষ! আমি ডান হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরতেই সে তার আসন থেকে পড়ে গেল। তাকে এক হাতে ঝুলিয়ে আমি ঘোড়া ছুটালাম। সে আমার হাত কামড়ে ধরেছিল। তবু ছাড়ি নি…' গ্রীসাকা বিজয়ীর মত প্রতিবেশীর পানে চাইলে; কিন্তু বৃদ্ধ ততক্ষণে নিশ্চিন্ত আরামে নাক ডাকাচ্ছে।

(ক্রমশঃ)

অন্ধকারের আফ্রিকা

(ভ্রমণ)

[পূর্ব্বানুবর্ত্তী]

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আমি চলেছি কামপালার দিকে। এ দিকের পথ ভারী চমৎকার। উঁচু-নীচু পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেছে পথ—দুদিকেই ছোট ছোট নিগ্রো গ্রাম। গ্রামগুলিতে কিরূপ লোক বাস করে, তাদের শিক্ষা কিরূপ তা জানবার জন্য আমি প্রায়ই গ্রামে যেয়ে আলাপ-আলোচনা করতাম। আমাদের দেশে যাকে সিজগাছ বলে তাই দিয়ে গ্রামের চারিদিক বেড়া দেওয়া। গ্রামে প্রবেশ করার একটি মাত্র পথ। পথটাও আবার এমনি ভাবে তৈরী যে গৃহপালিত কোন জীব সে পথ দিয়ে গ্রামে প্রবেশ করতে পারে না। দিনেরবেলায় খুব কম লোকই গ্রামে থাকে—প্রায় সবাই কাজে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর সবাই ফিরে আসে। ঘরগুলির ভেতর মুখ বাড়িয়ে দেখেছি, বেশ পরিষ্কার। গ্রামে কোন দুর্গন্ধ নেই, কোনরূপ আবর্জনা নেই। ওরা হাত দিয়ে কিছু পরিষ্কার করে না। সব:বাড়ীতেই খন্তা এবং ছোট ছোট টিনের টুকরা দেখতে পাওয়া যায়। টিনের টুকরাগুলিতে খন্তার সাহায্যে আবর্জনা রাখা হয় এবং গ্রামের বাইরে নিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। গ্রামের অবস্থা এবং মানুষের থাকার ব্যবস্থা দেখে মনে হ'ল, এরা যদি উপযুক্ত শিক্ষা এবং কাজ করবার সুবিধা পায় তবে এরাও ইংলিশ অথবা জার্মানদের মত সুখী হ'তে পারবে। আমার মনে হয়, সাম্রাজ্যবাদীরা এদের সে সুবিধা দিবে না এবং নিগ্রো বলে অবহেলা করে ওরা যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়ই রাখবার চেষ্টা করবে। সুখের বিষয়, ওদেরে কেউ কোন মতে উপবাসী রাখতে পারবে না। ওদের খাদ্য যেমন খুব উপাদেয় তেমনি পাওয়াও যায় সহজে। এক রকম মূলের ছাতু তাদের খাদ্য। এই ছাতু সিদ্ধ করে পাতলা অথবা ঘন লেই করা হয় এবং দু-এক টুকরা গোমাংস অথবা অন্য যে কোন মাংস উহার মধ্যে রেখে দিয়ে ওর সঙ্গে একটু নুন মিশিয়ে তাই তারা খায়। এরা হরিণ, গরু, শূকর, ছাগল এবং মুরগীর মাংস ছাড়া অন্য কোন জীবের মাংস খায় না। পায়রা, হাঁস, অন্যান্য পাখী, মাছ এসব কিছুই খায় না। আমার মনে হয়, এদের খাদ্য যেমন পরিষ্কার এবং সহজে পাওয়া যায় অন্য যে কোন খাদ্য সেরূপ সহজলভ্য এবং পরিষ্কার নয়। এরা দুধ প্রচুর পরিমাণে খায়, কিন্তু কোন জীবের রক্ত পান করে না। এরা বাগাণ্ডা শ্রেণীরলোক। সুসজ্জিত গ্রামে বাস করার জন্য এবং সভ্যতার আওতায় আসায় এদের মধ্যে আর সেই সামরিক ভাব নেই, তবে কারো কাছে আমাদের মত মাথাও নত করে না এবং পেটকা-ওয়াস্তে নিমকও হালাল করে না।

আটচল্লিশ মাইল পথ চলে কাম্পালায় পৌঁছে মনে হলো, আমার পায়ে ডুডু পোকা আক্রমণ করেছে। তাই পথে বসেই একজন নিগ্রোকে ডেকে তার হাতে একটি পিন দিলাম এবং কোথায় ডুডু-পোকা চামড়ার নীচে প্রবেশ করেছে তা দেখিয়ে দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ আমার পা পরীক্ষা করে একটা নয়, চার-পাঁচটা ডুডু পোকা বের করে ফেলল। এই জাতীয় পোকাকে আমি অত্যন্ত ঘৃণা এবং ভয়ও করি। একবার যদি শরীরে আড্ডা গাড়তে পারে তবে হুকওয়ার্ম-এর মত শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং লোকটিকে হত্যা না করা পর্য্যন্ত তার শরীরকে রেহাই দেয় না। হুকওয়ার্ম ডাক্তারগণ অনেক সময় শরীর হ'তে বেরও করতে পারেন, কিন্তু এই ডুডু যদি সুযোগ পেয়ে শরীরে ঢুকতে পারে তবে আর রক্ষা নাই। ডাক্তাররা

কোন মতেই তাকে শরীর থেকে বার করতে পারেন না। ড়ুড়ু পোকাকে ইংরেজীতে Giggers বলে।

কাম্পালা নতুন ধরণের শহর। ইণ্ডিয়ানরাই এই শহরের বাসিন্দা। ইণ্ডিয়ানদের নানা দল এবং নানা রকমের লোক এখানে বাস করে। সৌভাগ্যক্রমে আমার একটা প্রবন্ধ ইংলিশ ভাষায় বের হয় এবং নানা ভাষায় অনুবাদ হয়। সেই প্রবন্ধের অনুবাদও বের হয়। গুজরাতীতেও তা অনুবাদ হয়েছিল। পাঞ্জাবের কোন দৈনিক পত্র তা হিন্দিতে ছাপিয়ে ছিলেন। শহরে পৌছা-মাত্র আমিই সেই লোক কিনা তা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। অনেক চিন্তার পর একজন গুজরাতী বললেন, "প্রবন্ধ লেখক এই পর্যটকই হউন আর না-ই হউন, ইনি একটু থাকবার স্থান চাইছেন, তা দিতে আপত্তি কি?" জনৈক ব্রাহ্মণ এক গোয়ানী মুসলমান উভয়ে মিলে কি পরামর্শ করল, তারপর আমাকে পেটেল-সমাজে স্থান দেওয়া হবে না জানালো। জনৈক পেটেল তাতে ক্রুদ্ধ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে পেটেল-সমাজে থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন। লোকে বলে ধর্মের বন্ধন আছে। আমি বলছি ধর্মের গোড়ামী বা বন্ধন সকলের মধ্যেই আছে, নাই শুধু হিন্দুর মধ্যে। হিন্দুদের গোড়ামীকে আমি গোড়ামী বলব না, এটাকে বলব হিংসা। হিন্দুরা যেমন হিংসুক হয়, পৃথিবীর কোন ধর্মের লোক সেরূপ হিংসুক হয় না। যারা হিংসুক তারাই দুর্বল, তারাই মরণ-পথের যাত্রী।

পেটেল-সমাজের নতুন বাড়ি হয়েছে। সে বাড়ি প্রাসাদ তুল্য, যে কোন পেটেল সেখানে এসে বাস করতে পারে। সুখের বিষয় পেটেলদের মধ্যে একতা এবং ভ্রাতৃভাব থাকায় তাদের এখানে এসে থাকতে হয় না। এত বড় বাড়িটাতে আমি একাই ছিলাম। পেটেল-সমাজের বাড়িতে দু'জন নিগ্রো চাকর ছিল। তাদের একজন ছিল বেশ শিক্ষিত। আমি সেখানে যেয়েই ঐ লোকটির সংগে ভাব করে ফেললাম। এতে আমার বেশ লাভ হয়েছিল। অনেক তথ্য তার কাছ থেকে জানতে সক্ষম হয়েছিলাম। রাত্রে একটা বামনিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণের হোটেলে ভাল ভাত খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি, সমস্ত শরীর ব্যথা করছে। এটা পরিশ্রমের ব্যথা নয়, এটা হলো ড়ুড়ু পোকার আক্রমণের ব্যথা। ঘুম থেকেই উঠেই বয়কে ডাকলাম। সে এসে আমার হাতের নখের এবং পায়ের নখের নীচ হ'তে অনেকগুলি ড়ুড়ু-পোকা খসিয়ে দিল। গরম জলে স্নান করে চা খেয়ে এসে সেই চাকরের সংগে কথা বলতে লাগলাম। মনে হ'ল, এই চাকর যে সংবাদ আমাকে দিতে পারবে আর কেউ তেমনটি দিতে পারবে না। চাকর যে সকল সংবাদ দিল তা নোট বইএ লিখে ফের বের হয়ে পড়লাম।

বের হয়ে পড়বার অনেক কারণ ছিল। সে কারণ ভৌগলিক তথ্য জানবার প্রবৃত্তি। লোক সাগর পারে যায়, সাগরে স্নান করে আর এখানে দক্ষিণ দিকে সাগর আর পশ্চিম দিকে মরুভূমি। মরুভূমি এবং উগাণ্ডার মাঝে একটি প্রকাণ্ড বন। সেই বন বঙ্কিম-কথিত আনন্দমঠের বনের মতই। বন ভেদ করা দুঃসাধ্য নয়, তবে সে বনে একাকী যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়। সাথী পাব কি না তারই খোঁজে বের হলাম। সাথী যদি পাই তবে সে সাথী হবে নিগ্রো নয় ইউরোপীয়। এ ছাড়া আর সাথী হবার কেউ ছিল না। ইউরোপীয়রা এখানে ইণ্ডিয়ানদের মানুষ বলে স্বীকার করে না। আমি মানুষ নই বলেই নিগ্রোর খোঁজে বের হ'তে হ'ল। অনেকে হয়ত বলবেন, ইউরোপীয়গণ ইণ্ডিয়ানদের মানুষ বলে স্বীকার করে না, সে কেমন কথা? আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানী কি কম! কিন্তু আমিই বলছি, ভারতে এমন একটা লোক এসে আমাকে বুঝিয়ে যাক তার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল্য কত? এ সম্বন্ধে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, শুধু জেনে রাখলেই ভাল যে, আমাদের কেউ মানুষ বলে স্বীকার করে না। আমি সে জন্য অপরকে দোষী করব না, দোষ আমাদেরই।

বনে প্রবেশ করার সাথী পাওয়া গেল না। দুপুরবেলা খেয়ে আর বিশ্রাম করলাম না, একদম শহর ছাড়িয়ে কোথায় বন আছে তার সন্ধানে বের হয়ে পড়লাম। শুনলাম চল্লিশ মাইল গেলে বন পাওয়া যাবে। চল্লিশ মাইল সাইকেলে গিয়ে ফিরে আসা সহজ কাজ নয় ভেবে ফিরে আসতে হ'ল। জংগলের দিক থেকে ফিরে আসার

সময় মনে হলো আমার সংগে একটা চিঠি আছে। কলিকাতা হ'তে রওয়ানা হবার সময় আমাকে জনৈক যুবক একখানা পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্রটা ছিল তাঁর অগ্রজ শ্রীযুক্ত কালীপদ দাসগুপ্ত মহাশয়ের নামে। কালীপদ বাবু তখন কাম্‌পালার সরকারী হাইস্কুলে কাজ করতেন। ভাবলাম এবার চিঠিটা তার কাছে দিলে কেমন হয় দেখা যাক্‌! চীনা, জাপানী, এসব জাত তাদের নিজের ভাষার পত্রের সম্মান করে। বাংলা দেশে বাংলা ভাষার পত্র বাংগালীরা মোটেই পছন্দ করেন না, পত্র ইংলিশে হলে অথবা অন্য যে কোন ভাষায় হলে সেই পত্রের প্রতি তারা বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এক বাংগালী অন্য বাঙ্গালীর কাছে ইংলিশে পত্র না লিখলে পত্র লেখা হ'ল না বলেই ভেবে থাকেন। আমার ধারণা ছিল, কালীপদবাবুও সেরূপ গোছেরই কিছু হবেন। তাই পত্রখানা তাঁর পিয়নের মারফতে পাঠিয়ে দিয়ে স্কুল ঘরের বারান্দায় মাটিতেই বসে রইলাম, কি জানি আমাকে চেয়ারে বসতে দেখে বাবুর যদি আবার মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু পত্র পাওয়া মাত্র কালীপদবাবু বাইরে এসে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং এতদূর হ'তে পত্র বহন করে এনেছি বলে সুখী হয়েছেন তাও জানালেন। তারপর এটাও তিনি বুঝলেন, এরূপ পত্র বহন করে আনার মানে কি? অনেকে তা বুঝে না। বুঝবার দরকারও হয় না। আমাদের দেশে ক'জন লোক সাইকেলে পৃথিবী পর্যটন করেছে? ইউরোপে এরূপ লোকের সংখ্যা খুব বেশি। অবশ্য সাইকেলে ইউরোপীয়গণ শুধু ইউরোপেই বেড়ায়, অন্যত্র বড় যায় না। এরূপ পত্রের মানেই হলো পত্রবাহককে সকল রকমের সাহায্য দেওয়া। আমি কালীপদবাবুর কাছ হ'তে তা পেয়েছিলাম।

কালীপদবাবু দেশে থাকার সময় কিরূপ শিক্ষা পেয়েছিলেন তা তিনিই জানেন, কিন্তু বিদেশে গিয়ে যেরূপভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি পরিচালনা করছেন তা খুবই প্রশংসনীয় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের পরিচালিত প্রথামতে সে শিক্ষা উচ্চ শ্রেণীর তা কালীপদবাবুর শত্রুরাও বলতে বাধ্য হবে। আমি কিন্তু অন্য কিছু ভাবছিলাম। যদি কালীপদবাবুকে সোশিয়ালিষ্ট প্রথামতে শিক্ষা দিতে হতো তবে তিনি সেদিকেও উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক হতেন। সোশিয়েলিজম তাকেই বলে যার একমাত্র লক্ষ্য হলো মানুষকে স্বাধীনতা দেওয়া। যারা লোকের খাদ্য জোগাতে পারে না তারা স্বাধীনতা কিরূপে দিতে সক্ষম হবে? পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদীদের আমলে মানুষের স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করাও অন্যায়। তবে আশার আলো এই যে, যদি কোন দিন ভারতে স্বাধীনতা আসে তবে সেই স্বাধীনতাকে বজায় রাখার লোকের অভাব হবে না। কালীপদবাবু হলেন তার নিদর্শন।

কয়েক দিন কাম্‌পালাতে থাকার পর মনে হ'ল, আমার শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং ডুডু পোকাও প্রত্যহ শরীরে বেশী করে আক্রমণ করছে। উপদেশের জন্য আমি কারো কাছে যাই না, সেজন্য ঠিক করলাম এখান হতে রেলগাড়ীতে একদম মোম্বাসা চলে যাওয়াই উচিত। তাই কাল বিলম্ব না করে মোম্বাসা যাবার জন্য তৈরী হ'তে লাগলাম। এদিকে নিগ্রো বয়ের কথামত জার্মান পূর্ব-আফ্রিকা টাংগানিয়াকা ভাল করে ভ্রমণ করব এটাও ঠিক করে নিলাম। নিগ্রো বয়ের উপদেশ আমার কাজে লেগেছিল। গাড়ি ছাড়বার সময় কালীপদবাবু আমাকে হাত নেড়ে বিদায় দিলেন। তাঁর আতিথেয়তা এখনও মনে আছে।

সমাপ্ত

শাদা কালো

(উপন্যাস)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দাদুর চিঠিটি ওর পত্ররক্ষণীর মধ্যে সযত্নে তুলে রেখে অসিত তাকালো প্রমীলার পানে।

"হাসছিস যে?"

"ওটা মুখের হাসি ভাই," বলল প্রমীলা।

নির্ম্মল জুড়ে দিল: "সাহেবপুরাণে বলে না—laughter veiled in tears?"

প্রমীলা প্রতিবাদ করল: "না ভাই, আমি যে হাসছি এটা ম্লেচ্ছ হাসি নয়—একেবারে যাকে বলে সনাতন খাঁটি মেয়েলি হাসি। আমার হাসির ভাষ্য যদি চাও তা হলে কথা দাও আগে যে রাগ করতে পারবে না। দিলে তো। আচ্ছা—তবে শোনো কী জন্যে আমি হাসছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল সোজাসুজি জিজ্ঞেস করি তুমি কী ভাবো বলো তো? রমা যে স্বামীর ঘর করতে চায় নি সে কি শিবকে ভালো লেগেছিল বলে, না ঐ স্বামীর ঘরকে ঘর মনে হয় নি বলে?"

"এ সন্দেহ তোর হ'ল কেন শুনি আগে?"

"মেয়েরা ভগবানকে সাধে কোনো ভক্তের জন্যে ব'লে। কিন্তু দাদু এহেন ভক্ত তো ছিলেন না—অর্থাৎ রমার কাছে। ছিলেন কি?"

অসিত হাসল: "এতক্ষণে আঁচ পেলাম তোর তীরন্দাজির নিশানাটি কে। কিন্তু না—রমার ক্ষেত্রে এমন কোনো রোমান্সের বিন্দুবিসর্গও হয় নি—আগেও না, পরেও না।—না প্রতিবাদ করিস্ নে—শোন্, তাহ'লেই উত্তর পাবি তোর প্রশ্নের।"

* * *

অসিত বলল: "যাদু লাফিয়ে উঠল: 'আবটাবাদ? মাইল পঞ্চাশেক বৈ তো নয়—চলুন আমার মোটরেই দেব পৌছে। চলো না অমিতা, ঘুরে আসবে।'

"কিন্তু অমিতার যাওয়া হ'ল না—কারণ ঠিক এই সময়েই মাসিমার হ'ল ইনফ্লুয়েঞ্জা। কাজেই যাদুই নিয়ে গেল আমাকে আবটাবাদ ওর মোটরে। বিকেল বেলা পৌঁছে দিয়ে রাতেই এল ফিরে।"

প্রমীলা বলল: "তুমি আবটাব[illegible]ইলে কোথায়?"

অসিত বলল: "আমি উঠেছিলাম [illegible]ন ডাকবাংলোয়—কিন্তু খবর পেতে না পেতে রমা এসে ধরে নিয়ে গেল। কিছুতে ছাড়ল না। বলল: 'আবটাবাদে আপনার পায়ের ধুলো পাবে শুধু ম্লেচ্ছ ডাকবাংলোটা দাদা!—কত যে নাম শুনেছি'—ইত্যাদি।

"এত সহজে ও আমাকে আপনার ক'রে নিলে যে কী বলব। কারণ দাদুর চিঠি প'ড়ে মনে হয়েছিল ও মেয়ে মিশুক নয় একেবারেই। তার ওপরে সে সময়ে ওর মাথার ওপর দিয়ে এত ঝড়ঝাপটা যাচ্ছে—"

প্রমীলা হেসে বলল: "তাই তো চাইল ও তোমার বিশাল পক্ষপুটে আশ্রয়। ভক্তিমতীর [illegible] অসহায় fledgling আর কে এ জগতে?"

নির্ম্মল বলল: "কী যে সব ঠাট্টা করে মিলি যখন তখন। অসিত হয়ত বলে বসবে—তাহ'লে দিলাম মুখে চাবি।"

প্রমীলা মিনতির সুরে বলল: "না না ভাই। বলো। কথা দিচ্ছি আর ঠাট্টা করব না।"

অসিত বলল: "না রে না, ঠাট্টাটা তোর অস্থানে হয় নি। কারণ ও বড় ভালোবাসত গান। গানে আশ্রয় পেত সত্যিই। তাই হয়ত এত সেধে নিয়ে গেল। দাদু বললেন: 'শাকরেদ পেলে এখানেও? চৌকিদার স্বর্গে গেলেও হাঁকডাক করে—প্রাক্তন দাদা, প্রাক্তন।"

* * *

অসিত বলল: "বলেছি রূপকাকা ছিলেন অসম্ভব ধনী—হ্যাঁ তাঁকে এখন থেকে রূপকাকাই বলব—যে নামে তাঁকে আমি ডাকতাম। কারণ তাঁর কেন জানি না আমার ওপর মায়া পড়ে গিয়েছিল প্রথম থেকেই—একেবারে ঘরের ছেলে যাকে বলে। কিন্তু এখানে তাঁর একটু পরিচয় দিয়ে নিই। কেমন?"

* * *

"রূপকাকা ধনী ছিলেন এ কথা বলেছি। কিন্তু তিনি যে কি রকম অসম্ভব ধনী তা আমি জানতাম না। ভাগ্যবান্ পুরুষ যাকে বলে। সাহেবেরা বলেন বটে যে 'মানুষ তার ভাগ্যের স্থপতি'—কিন্তু ধনের বেলায় বোধ হয় এ কথা পুরো খাটে না। কেননা রূপকাকার মত আরও দু'একটি বণিকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে—তাদের কারুর বেলায়ই এ কথা বলতে পারি নে যে তারা ধুলোমুঠো ধরলে সোনামুঠো হ'ত। কিন্তু রূপকাকা যখন সুরু করেন একটা সওদাগরি আপিসের পনের টাকা মাইনের কেরানি হ'য়ে। তার পরে যাকে বলে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডবল প্রমোশন। স্পেকুলেশন, ঘোড়দৌড় প্রথমে। তারপর সেই উপায়ে লব্ধ মূলধন নিয়ে অভ্রের ব্যবসা সাঁওতাল পরগণায়। তার পরে কাপড়ের মিল—জমিদারী—টাকা খাটানো—চায়ের ব্যবসা। সে এক এলাহি কাণ্ড।"

"'কিন্তু দাদা, বলেছিলেন দাদু একবার হেসে—'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে—বলে না? তাই এ হেন ভাগ্যধরের ভরাডুবি হ'তে চলল এই একটিমাত্র দুর্ভাগ্যে—ঐ একরত্তি মেয়েটা বাগ মানল না কিছুতে। ভগবান্ যে কাকে কোন্ পথ দিয়ে টেনে আনেন নাকে দড়ি দিয়ে তাঁর চরণের আস্তাবলে—কেউ কি জানে?—এ হেন অতি সজাগ, অতি চতুর মানুষের কানে কি না আকাশবাণী! তা আবার পুজোর ঘরে!!

প্রমীলা বলল: "একটু দাঁড়াও ভাই, একটা প্রশ্ন: আকাশবাণী বলতে কী বুঝছ? সত্যি কি শোনা যায়? তুমি শুনেছ?"

অসিত বলল: "আমি শুনি নি—তবে শোনা যে যায় এর প্রমাণ এত বেশি আছে।"

প্রমীলা বলল: "মানে তোমাদের যোগাশ্রমে অনেকে শুনেছেন এই তো?"

অসিত: "তা কেন? আশ্রমের ধারপাশ দিয়েও যারা যায় নি তাদেরও অনেকেই শুনেছে। আমি একজন সংসারী স্কুল-মাষ্টারকে জানতাম তিনি একবার আমার সঙ্গে ধ্যানে বসেই বললেন—তোমার কি তলপেটে একটা ব্যথা আছে?"

'কেমন ক'রে জানলেন?'

'তোমার গুরুদেব বলে গেলেন।"

'বলেন কি?'

'আরো ব'লে গেলেন—তোমাকে সময় হ'লেই ডেকে নেবেন—ভেবো না।'

"আমি সে সময়ে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম মিলি—যদি তবুও ভবিষ্যদ্বাণীটা বিশ্বাস করতে পারি নি পুরোপুরি। কিন্তু ঠিক সময়ে যখন গৃহ প্রিয়পরিজন সব ছাড়তে হ'ল তখন মানতে হ'ল যে কলিযুগেও আকাশবাণী হয়। কিন্তু এ তো মাত্র একটা। আমি বহু দর্শন স্পর্শন শ্রবণের খবর দিতে পারি যার—"

প্রমীলা বলল: "আর বলতে হবে না ভাই। আমাদের পোড়া মনে সংশয় আসে ব'লেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম—তোমাকে জেরা করতে চাই বলে নয়। কিছু মনে কোরো না ভাই, কেমন?"

অসিত হেসে ওর হাতটা কোলে টেনে নিয়ে বলে: "পাগল, না দারোগা!" ওরা হেসে ওঠে।

* * *

অসিত বলল: "ওদের বাড়িটি ছিল একটি ছোট পাহাড়ের চূড়ায়। অনেক টাকা দিয়ে ও জমিটা রূপকাকা কিনেছিলেন শুধু আবটাবাদ রমার ভালো লেগেছিল ব'লে। রমা আমাকে পরে বলেছিল—ও এখানে এসেছিল আশ্রমের কাছাকাছি থাকা হবে ব'লে। রূপচাঁদের যে এটা বুঝবার মতন বুদ্ধি ছিল না তা নয়, কিন্তু কেবল ঐ মেয়ের সঙ্গেই তিনি চতুরালি খেলতে পারতেন না। তাই ওজর দেখিয়ে বা জমি, পাওয়া যাচ্ছে না বলে মেয়ের অনুরোধকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। আমাকে পরে একদিন বলেছিলেন একথা একটু দুঃখ ক'রেই: "বাবা এত তো করি ঐ একরত্তিটার জন্যে কিন্তু কিছুতে কি পারি ওকে সামলাতে। ও কখন যে কি ক'রে বসে—ভাবি সময়ে সময়ে

আর হাসি মনে মনে: যে পুরুষসিংহকে বড় বড় ভাটিয়া, মাড়োয়ারী, পার্সী, ইহুদিরাও বাগ মানাতে পারল না সেই আমি কি না ঐ ছোট্ট পাখিটার কাছে বেহাত—একেবারে বেহাত বাবা, সত্যি বলছি। দয়াময় নাম দিল তাঁর কে?"

'কিন্তু এতে দুঃখ পান কেন রূপকাকা? রমা যে এ হেন বিলাস ছেড়ে ভগবানের দিকে যেতে চাইছে এও কি তাঁরই দয়া নয়?'

'বুঝি বাবা সবই বুঝি,' বলেন বৃদ্ধ মাথা নেড়ে। 'কিন্তু—ঐ এক ছাড়া কথাটাতেই চমকে ওঠে সংসারীদের মন। নৈলে জানো তো সবই—মেয়েটাকে আমি জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে তবু দুঃখ পাই ভাবতে পাছে সংসারে যে অসুখী হ'ল সে ভগবানের পায়ে শরণ নিয়ে সুখী হয়! সত্যি বাবা, দুঃখ পাই আমি এতে। শুনতে আশ্চর্য লাগে তবু এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি যে রমা একটু আধটু অসুখী হয়েও যদি রতিলালের ঘর করত তো আমি খুসি হতাম। তবে পাছে ফের ও বিষ খায় বাবা সেই ভয়েই আছি আমি কাঁটা হ'য়ে। তোমাদের আশ্রমের এত কাছে এসে ডেরা ফেলতে রাজি হয়েছি শুধু ঐ এক ধমকে। ও মেয়েকে তুমি জানো না বাবা। বাইরে দেখতেও যেমন নরম ভিতরে কি তেমনি শক্ত!—ইস্পাত? উঁহু:—হীরে বাবা হীরে। ঠিক, ঐ কথাটাই ওর সম্বন্ধে বলা চলে। এক কথায় ও উপোস সুরু করে বা ব্রত নেয় সাতদিন থাকবে শুধু একটু দুধ খেয়ে। যে গোঁ ও একবার ধরবে আর কি ছাড়বার নাম করবে ভেবেছ? পাগল! বলে ও কি জানো?—পরমহংসদেব না কি বলতেন সত্যে আঁট না থাকলে ভগবান্ মেলে না। কাজেই যদি ও মুখ ফসকেও ব'লে ফেলে একবার যে দশ দিন উপোস করবে তো ক'রে ব'সে আছে। আবটাবাদে বাড়ি না নিলে হয় ত ও ব'লে বসত—হুঁ বেশ—তবে পনের দিনের উপোষ এবার।'

"দুঃখ হ'ত সত্যিই এ ধরণের কথা শুনে। কিন্তু আশ্চর্য লাগত। কারণ রমা আমার কাছে এসে যখন আমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিত—কিছুতে ছাড়ত না—বলত পায়ে হাত বুলোতে ওর বড্ড ভালো লাগে—দাদু বলতেন হেসে 'ও মেয়ের শ্রদ্ধা দেখানোর ঐ রীতি—ওকে মানা কোরো না দাদা—করলে কী যে ক'রে বসবে জানো না তো। হয়ত ব'লে বসতে পারে হাত বুলোতে দিলে না যখন তখন নাকে চিমটি কাটবে—আর কাটবে যদি বলে এক বার তো সে সত্য ওকে রক্ষা করতেই হবে—তাতে তোমার নাকের যে দুর্গতিই হোক না কেন।'

"ও হেসে বলত দাদুকে ছোট্ট কিল দেখিয়ে: 'আচ্ছা—তোলা রইল—পরে হবে দাদু!'

"বড় মিষ্টি লাগত ওদের সম্বন্ধ। সংসারী ঠাকুর্দা নাৎনির মধ্যে মাধুর্যের অভাব নেই মানি কিন্তু ঠিক এই ধরণের mutuality কখনো দেখি নি আমি। কারণ সংসারে ঠাকুর্দার কাছে নাৎনি খুব দরকারি চিজ হ'লেও নাৎনির কাছে ঠাকুর্দা বড়জোর একটা চিত্তরঞ্জক সামগ্রী—তার বেশি নয়। কিন্তু রমার কাছে দাদু ছিলেন একেবারে অত্যাবশ্যক। ওর পুজোআচ্চা স্তবস্তোত্র শাস্ত্রপাঠ ধ্যান-ধারণা সবেরই সাথী ছিলেন দাদু। স্থবির ও তরুণীর মধ্যে এ ধরণের সম্বন্ধ আর কখনো চোখে পড়ে নি আমার।"

প্রমীলা বলল: "কিন্তু রূপচাঁদ এতে দুঃখ পেতেন না?"

অসিত বলল: "না পেয়ে উপায় আছে? কিন্তু কী করবে বেচারি? মেয়ের কাছে যে ও বেহাত—সত্যিই বেহাত বলে নি ও নিজে মুখেই? তবে দাদুকে রূপকাকা ভালোবাসতেন এই যে বাঁচোয়া। শুধু ভালোবাসা নয় শ্রদ্ধাও ছিল আর সেই সঙ্গে একটা প্রত্যাশা যে সন্ন্যাস থেকে যদি রমাকে কেউ ঠেকাতে পারে তবে সে দাদু। কিন্তু এবার ফিরে আসি ঘটনালোকে।

* * *

অসিত বলল: "আবটাবাদে যখন আমি পৌঁছলাম তখন একবারও ভাবি নি যে ওখানে দু-এক দিনের বেশি থাকতে হ'তে পারে। কিন্তু পাকেচক্রে প্রায় সাড়ে চার মাস ওদের সঙ্গে বাইরে কাটাতে হ'ল। অবিশ্যি আমার অতদিন না থাকলেও চলত কিন্তু দাদু একদিন হঠাৎ বললেন: 'দাদা, রূপচাঁদের প্রায়ই বুক ধড়ফড় করে—কখন কি হয় বলা যায় না—একটু সামলালে তবেই যেও—গুরুদেবকে লিখে দাও না। তিনি কি অনুমতি দেবেন

না তোমাকে এখানে দু-চার দিন থাকতে?' আমি বললাম: 'গুরুদেব কি কাউকে মানা করেন কিছু করতে দাদু?—তবে আশ্রমে আমার—' ব'লে ইতস্তত করতেই দাদু বললেন: 'আর একজন পোষ্যবোন তো?—কিন্তু এর চেয়ে সেরা সে নয় কখনই।' আমি হেসে বললাম: 'কেমন ক'রে জানলেন?' দাদু বললেন হেসে: 'দাদা রমার মতন বোন্ কোটিতে গোটিক হয় এ তুমি লিখে রেখে দাও পরে যখন আমার বয়স হবে এবং তোমার পোষ্যবোনের সংখ্যা এক কোটি হবে তখন মিলিয়ে নিও—দেখবে তাদের মধ্যে ওর চরিত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্।—তা ছাড়া'—ব'লেই গম্ভীর হ'য়ে 'ওর বড় সংকট অবস্থা যাচ্ছে—ওর পক্ষে কেবল আমাদের মতন দুই বৃদ্ধের সাহচর্য ঘোর মরাল্ হ'তে পারে কিন্তু জোর কপালের চিহ্ন ব'লে মনে করা চলে কি?—না দাদা, সত্যি তুমি ওকে একটু সঙ্গ দাও। ওর মধ্যে একরোখা ভাবটা কেমন যেন abnormality-র দিকে ঝুঁকছে ব'লে আমারও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয়। তোমার মতন এক-আধটা প্রকৃতিস্থ সঙ্গী পেলে ও ধাতে আসবে।—বিশেষ তোমার গান শুনে। তুমি বিলেত-ফেরত দাদা, এটুকু তো জানো যে স্নায়ুর পক্ষে গানের মতন শান্তিপ্রদ মলম খুব কমই মেলে এ-জগতে।'

"কাজেই মিলি", বলল অসিত, "পাকেচক্রে প'ড়ে থেকে যেতে হ'ল—যদিও মাঝে মাঝে অমিতার চিঠি পেতাম—কবে আসছ অসিদা? ওকে লিখতাম বুঝিয়ে—কিন্তু এসব কথা চিঠিতে লেখাও চলে না কাজেই ব্যাপারটা ওর কাছে পরিষ্কার হ'ত না এ নিশ্চয়। তবে আমি ভাবতাম অমিতার কাছে আমি তো ঠিক তেমন necessity নই—যেমন রমার কাছে। যাক্ গে— অহংকারের মতন কি একটা যেন উঁকি মারছে—তাই আত্মকথা ছেড়ে রমার কথায়ই আসি ফিরে।

"যে সময়ে আমি ওখানে পৌঁছই সে সময়ে রূপকাকার মাঝে মাঝেই খুব বুক ধড়ফড় করত ব'লে সবাই একটু ব্যস্ত ছিল। আমি আবটাবাদে ওদের অতিথি হবার পর থেকে ওখানে প্রায়ই গান হ'ত। রমাও যোগ দিত—যখন আমি স্তোত্র গাইতাম। মানে, সহজ সুরে। ওর কণ্ঠের একটা স্বাভাবিক মিষ্টতা ছিল ব'লে দাদু আমাকে আরো ধরলেন ওকে একটু আধটু শেখাতেই হবে। ও প্রথম প্রথম শিখতে সংকোচ বোধ করত, কিন্তু ক্রমশ ওর গলা খুলতে আরম্ভ করল, যখন দু-চার দিন বাদে রতিলাল বিদায় নিল। হ্যাঁ রতিলালকে আর উপেক্ষা করা চলে না। কারণ ও-ড্রামার নায়ক তো ও-ই বটে।

"রতিলালের সঙ্গে সে সময়ে আবটাবাদে আমার দেখা হয়েছিল মাত্র দুদিন। প্রথম দিন বিশেষ কথাবার্তা হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ও আমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করল ওর হোটেলে। বিশেষ ক'রে ধরল ব'লেই যেতে হ'ল। নইলে চায়ে আমি যাই না ভুলেও। কে কোন্ ফিলম্ দেখেছে, কিম্বা নতুন কি বই পড়েছে, কিম্বা ঐ দুঃসহ গদ্যছন্দ—এসব আর সয় না—তা খুব ভালো হ'লেও না।

"দেখলাম সাহেবিয়ানাটা ওর কাছে বেশ সহজ হ'য়েই এসেছে। অনেক আছে তাদের সাহেবিয়ানা দেখলে মনে হয় অকালকুসুম—ফুটছেও বটে বাতাসে হেলছে দুলছেও বটে, কিন্তু কেমন যেন বিমনা ভাব। যেন খাপ খাওয়াতে পারছে না আকাশ বাতাসের সঙ্গে। কিম্বা যেন টবের ফুল। ফুলও বটে, প্রকৃতির ছোঁওয়াও তাতে লেগে—তবু পায় নি সে তার সহজ কানন-পরিবেশ। রতিলালের সাহেবিয়ানা এ জাতের নয়। ও সিগারেট খাওয়া থেকে ঘোড়ায় চড়া সবতাতেই বেশ পাকা সাহেব—হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট মিস্টার ফার্মনেস্। দেখলে ভালো না লাগতে পারে কিন্তু অস্বস্তি বোধ হয় না।

"এই জন্যেই ওকে আমার খারাপ লাগে নি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কেন ও যোগটোগ বুঝতে পারে না। ওর সত্যিই মনে হ'ত ধ্যানট্যানে মানুষ যা দেখে সবই হয় স্বকপোলকল্পিত না হয় ক্রমাগত সাধনের ফলে এক ধরণের স্নায়বিক অসুস্থতা—hallucination যার বিলিতি নাম। আমাকে দেখে ও যেন একটু ভরসা পেল। দাদুকে ওর মনে হয়েছিল সেকেলে। শ্বশুরের উপর দারুণ অবজ্ঞা। 'Senile' বলত ও ঠোঁট বেঁকিয়ে। তবু আমাকে কেন যে ও নেকনজরে দেখল বোঝা ভার। বোধ হয় ধর্মের প্রসঙ্গকে আমি পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলাম বলে।

"ওর একটা দিক আমার বেশ ভাল লাগল। চলতি

ভাষায় যাদের বলে খোলামেলা প্রকৃতির মানুষ ও ছিল তাদেরই দলে। গোপনিকতা reserve—ওর ছিল না। তাই সহজেই ওর দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ তুলল। আমি ও বিষয়ে ওর আলোচনায় যোগ দিতে একটু কুণ্ঠিত বোধ করতে ও হো হো করে হেসে বলল: 'এসব সেই সাবেকি superstition অসিত দা। After all marriage is sex—you can't get away from it. And what is there to be hushed about this universal urgency ?'

"আমি বললাম: 'তোমার সঙ্গে খানিকটা আমি একমত মানতেই হবে তবে তুমি আর একটু দূর গেলে আর মতৈক্য থাকবে কি না সন্দেহ।'

"ও বলল: 'আমি বুঝেছি আপনি কী বলতে চাইছেন—repression দরকার, এই তো? What do you call it, that high sounding name—ব্রহ্মচর্য না ?' ব'লেই সুভদ্র হবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'আমাকে excuse করবেন দাদা, আমি রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না। আপনাকে দেখে শ্রদ্ধা হয়েছে ব'লেই ডেকেছি। আমার কথায় যদি আপনি shocked হন—'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'না রতিলাল বিলেত আমিও গিয়েছিলাম, কাজেই আমি জানি ওদের মতামততে উপাসনা করতে করতে মানুষ কি রকম অন্ধ হ'য়ে পড়ে অজ্ঞাতে। তাই তোমার ঠাট্টা বিদ্রূপ আমি ধরব না, মা ভৈঃ। কেবল একটা কথা। আমাদের ধর্ম সাধনা ব্রহ্মচর্য গুরুবাদ এসবই যখন সেকেলে ও সবাই জানে তখন আমাকে ডেকেছ কেন ? What have we in common between you, the ultra moderns, and we, the old fashioned ?'

"ও সামলে নিল: রাগ করবেন না অসিত-দা। I am a sceptic but not irreverent. কিন্তু যাক ওসব কথা। বাস্তবিকই why should I puzzle over Yoga and all that kind of rot—it's no business of mine. আমি আপনাকে ডেকেছি শুধু এই জন্যে যে আপনাকে আমার ভালো লেগেছে—বিশেষ আপনার গান। কেন লেগেছে don't ask me—I can't tell you. তবে লেগেছে—that's a fact. তাই ভাবলাম আপনাকে একটু তাতিয়ে দিয়ে দেখাই যাক না—ব'লে ফের হো হো ক'রে হাসি।

"ওর প্রাণখোলা হাসিটা লাগল ভালো। বললাম আমিও হেসেই: 'কিন্তু heat expands কথাটা সায়েন্স বললেও ওটা খাটে অচেতন জগতে। মানুষ অনেক সময় রেগে মৌনব্রতই হয়—expansive হয় না—এটা একটু মনে রাখবে কি ?'

"Let's shake hands' ব'লেই ও হাত বাড়িয়ে দিল একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে। তার পর বলল: 'কিন্তু joking apart—শুনুন আমি কেন ডেকেছি আপনাকে—why beat about the bush after all ?—আমি আপনাকে ডেকেছি to seek your advice.'

'সে কি হে?' বললাম আমি হেসে 'সাহেবরা নেটিভদের advice দেয় এই-ই তো শুনে এসেছি চিরকাল।'

'আহা হা—why take an offence Asida when none was intended ?—না শুনুন আমি জানতে চাই আপনি কী মনে করেন! দাদু আমাকে বলেছেন তিনি আপনাকে সবই লিখেছেন। কিন্তু আমার কথাটিও না হয় শুনলেনই—আপনাদের ঐ কেষ্টকে না মানলেও আমি ত তাঁরই জীব বটে—ব'লে ফের হো হো ক'রে হাসি—'সত্যি, I don't want Roma to be unhappy—why should I ? কিন্তু হয়েছে কি, ওকে আমার বড্ড ভালো লেগেছে। No doubt it is sex—but after all, physical beauty is a concrete fact as even Yogis like you must admit—রাগ করবেন না there's a dear—দাদু আমাকে বলেছেন you have beautiful পাতানো sisters galore—হা হা হা—'

"আমি এবার একটু বিরক্ত হয়েই বললাম: 'মেয়েদের সম্বন্ধে আমরা একটু সেকেলে—এভাবে হাসাহাসি যদি করতেই চাও এখানে ফিরিঙ্গি ক্লাবেই পাবে হাসির সাথী। আমি উঠি তাহলে ?

"ও আমার হাত চেপে ধরল: 'do sit down—I thought you could take a joke—'

"আমি বললাম: 'আমার এক বান্ধবী আছেন—আইরিশ—তিনি ছড়া রচেন ইংরেজীতে একটি ছড়া মনে পড়ছে:

A joke was a dart you found delicious
Though the wounded wretch complained!
But the missile, alas, would seem so vicious
If you were the target, friend!

'ও লজ্জিত হ'ল—এই প্রথম বলল 'A good repartee I admit. আচ্ছা আর চাইব না এমনধারা delicious তীরন্দাজি কিন্তু আমার complaint-টাও একটু বুঝতে চেষ্টা করলেনই বা। After all to have a wife and yet not to be able to plead guilty to it—হা হা হা হা!'

"মনটা একটু নরম হ'ল মিলি! যে মানুষ শুধু অপরের ব্যথা নিয়ে হাসে না নিজের ব্যথা নিয়েও হাসতে পারে তাকে একটু সমীহ করতেই হয়, নয় কি? বললাম: 'তোমার তরফের কথাটা আমি একটুও বুঝতে চেষ্টা করি নি এটা ধ'রে নিলে কেন? কিন্তু after all, রতিলাল, আশা করি তুমিও মানবে যে মানুষ জন্মায় নি কারুর দাস বা দাসী হ'য়ে। তুমি যাকে চাও সে তোমাকে যদি না চায় সেটা দুঃখের জানি, কিন্তু যে তোমাকে চায় না তাকে "চাইতেই হবে" ব'লে জোর করাটা কি আরও দুঃখের নয়?'

"রতিলাল সিগারেট টানতে টানতে ভাবল খানিক, পরে বলল: 'কথাটা আপনি বলেছেন ভালো। কিন্তু আমাকে চাইবে না বা ও কেন? After all, I am not an impossible customer.

"আমি বললাম: 'ভুলটা এবার তোমারই হচ্ছে রতিলাল। কারণ আমাকে আমি যে চোখে দেখি আমায় তিনি-ও যে সেই চোখেই দেখতে বাধ্য এটা ধ'রে নিলে egoismএর মর্যাদা থাকতে পারে কিন্তু realism-এর মর্যাদা থাকে কি?'

"ও একটু ভেবে বলল: 'তাহ'লে আপনি কী করতে বলেন আমায়?'

"আমি একটু আশ্চর্য হ'য়ে বললাম: 'তোমার কী কর্তব্য সেটার আমিই বা নির্দেশ দিতে যাব কেন, আর দিতে গেলে তুমিই বা শুনবে কেন?'

"ও হঠাৎ বলল: 'শুনুন অসিদা। You are a man of experience —you 'll surely understand. আমি এই stipulation করেছি যে, আমি রমাকে ছেড়ে দিতে রাজি যদি ও পুরো একটি বছর বিলেতে কাটায়।'

"আমি বললাম: 'শুনেছি। কিন্তু এ তোমার অন্যায় আবদার রতিলাল—unfair। ওর বিলেত একেবারেই ভালো লাগে না।'

"রতিলাল বলল: 'ওর কী ভালো লাগে শুনি?'

'যা তোমার লাগে না।'

"মানে, ধম্মো এই তো?'

'Bull's eye!'

'ঠাট্টা রাখুন। শুনুন ধর্মে আমার আপত্তি নেই। তবে আমি চাই না ও will-o'-the-wispএর পিছনে ছুটে মরতে। তাই বলছিলাম—'

'জানি। দাদু লিখেছেন। কিন্তু তুমি কি প্রত্যাশা করো আমার কাছে? তুমি জানো আমি সংসারকেই মনে করি will-o'-the-wisp—ধর্মকে নয়। কাজেই আমি যদি বলি যে সংসারে যারা সুখ সুখ ক'রে ছুটে মরে তারাই ছোটে আলেয়ার পিছনে তাহ'লে তুমি কী যুক্তি দিয়ে বোঝাবে যে আমরাই ভ্রান্ত আর তোমরাই সত্যসিদ্ধ! না বোঝ না রতিলাল। এ নিয়ে তর্ক ক'রে ফল নেই। যুগে যুগে অনেক শ্রেষ্ঠ মানুষই যে ধর্মের দিকে গিয়েছেন একথা অ-শ্রেষ্ঠরাও অস্বীকার করে না। কিন্তু ওর ফলে তাঁরা কী পেলেন না পেলেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে রায় দিবে কারা—যারা সে বস্তু চোখেও দেখে নি?'

"ও উঠে দাঁড়াল, বলল: 'আমি বুঝেছি অসিদা। Thanks, না formal thanks নয়। আমি বুঝতে পেরেছি। কারণ আপনাকে দেখে আমার মনে হয়েছে যে কিছু আপনারা পানই পান—যেটা আর কোনো গেরুয়াধারীকে দেখেই আমার মনে হয় নি। আপনার কথায় আমার শ্রদ্ধা না থাকুক একটা কী vilbration আমি পেয়েছি যাকে—how shall I put it?—I can't define

বেশ। তাহ'লে ওরা যা চায় তাই হোক। রমার বিলেত যেতে হবে না। তবে এক কথা: একবৎসর বাদে আমি উদয় হব ফের—the wicked comet: আমার অনুরোধ এই বছরের মধ্যে ও কোনো আশ্রমে বা nunnery-তে না যায়। এই বছরের মধ্যে যদি ওর মন না বদলায়—well, I promise to leave her free to pursue what she will. কেমন এই একটি কথা আমি চাই—এই একটি বছর ও আবটাবাদেই থাকবে—আর কোথাও না। Game?'

"আমি বললাম: 'রমাকে যতদূর আমি জানি তাতে মনে হয় ওতে ও রাজি হবে। ওর আপত্তি অসত্য বিলেত দেশটার সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করায়।'

' Right. Let's shake hands

'সুদর্শন প্রাণবন্ত মানুষটির প্রতি কেমন যেন দয়া হ'ল কিন্তু শুধু দয়াই নয়। কোথায় যেন একটা ব্যথাও বেজে উঠল। দাদু ওকে হয়ত ঠিক বুঝতে পারেন নি—মনে হ'ল। তবে সেটা সম্ভবত এই জন্যে যে তিনি আমাদের আগের generationএর লোক। যতই বলি না মিলি অতীতের আর বর্তমানের মধ্যে একটা ফাঁক থাকেই যার ওপর দিয়ে সেতু গড়াও চলে না—তাই প্রায়ই এ ওকে ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু আমি ওর সমসাময়িক—একই ধাতের লোক, অনেকটা একই আবেষ্টনে মানুষ। তাই বোধ হয় আমার কথায় ও এত সহজে সুবুদ্ধির দিকে ঝুঁকল ঝোঁকালো দুর্বুদ্ধি ছেড়ে।

"পরদিনই ও চলে গেল। যাবার সময়ে আমাকে দিয়ে গেল ওর রূপো বাঁধানো একটি সুন্দর ছড়ি।

'যখন বেড়াবেন একা একা একটু ভাববেন আমার কথা।'

'কী ভাবব শুনি?'

'The devil is not as black as he is painted—হা হা হা হা।'

ক্রমশঃ

দ্বন্দ্ব

(গল্প)

শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী

চীফ মেডিক্যাল অফিসার বিখ্যাত কে. এন. গাঙ্গুলির মেয়েকে বিয়ে করতে না চায় এমন ছেলে ওদের সমাজে বিরল ছিল। ইংরেজী ভাষায় ওর নাকি অসাধারণ দখল ছিল, জার্মান ফ্রেঞ্চ ভাষণও ওর কণ্ঠস্থ, এ ছাড়া চমৎকার ভঙ্গিমায় ও জাপানিতেও কথা বলতে পারতো। এক কথায় বলতে গেলে ইউরোপীয়ান্ চালচলনগুলি আত্রেয়ীর নখদর্পণে ছিল যেন, খেলাধুলা, নাচগান প্রভৃতি খুঁটিনাটি কার্য্যগুলিও সে নিখুঁত অনুকরণে আয়ত্তাধীন ক'রে নিয়েছিল।

এ হেন মেয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে লোভনীয় বই কি; অনেক তরুণই ওকে সহধর্ম্মিণী ক'রে পেতে চাইত।

সেদিন আত্রেয়ীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ওদের গৃহে নিমন্ত্রণের আয়োজন ছিল। সন্ধ্যার পর বেশ জমকালো এক "বল-ডান্স" অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়ে গেল, আত্রেয়ীর নৃত্যসঙ্গী তরুণ ব্যারিষ্টার মুকুল দত্ত বললো, "আপনার ফিগারটা চমৎকার কিন্তু মিস্ গাঙ্গুলি, ডান্সের ভঙ্গিমাটিও তাই ভারী সুন্দর হয়—আমি কি ভাবছি জানেন, কে সে ভাগ্যবান যার ঘর আপনি আলোকিত করবেন; সত্যি কথা বলতে কী আপনার মত অ্যারিষ্টক্র্যাসি বজায় রেখে চলতে খুব কম মেয়েই পারে।

মুকুল প্রশংসমান দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চুরুটে একটি লম্বা টান দিল।

মিহি সুরে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠে আত্রেয়ী বললে —"আপনার আজকালের ও সস্তা অ্যারিষ্টক্র্যাসি যেঁদি-বুঁচিও বজায় রাখতে পারে; বেশী কিছু নয় মিঃ দত্ত, কয়েকবার বায়োস্কোপের আধুনিক ছবিগুলো দেখতে পেলেই ব্যস, ওইখানা টেবিল সাজান, চামচ কাঁটা নাড়া আর ওই রূপসজ্জায় কেতাদুরস্ত হয়ে ওঠা ওদের কাছে অনায়াসলব্ধ হয়ে যাবে। যতই অজ্ঞ সে মেয়ে হোক না কেন আপনি দেখবেন দুদিনে কাঁসার বাসুন তাল্লাক দিয়ে কাচের বাসুনের আমদানী ক'রে ফেলতে পারে—"

ক্ষণকালের জন্যে মুকুলের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছলো, তবু সে নিজেকে সংযত রেখেই বললো—"তা'হ'লেও মিস গাঙ্গুলি, সূর্য্যের দীপ্তি আর চাঁদের কিরণ দুটো এক জিনিস নয়; আপনি নিজস্ব মহিমায় উজ্বল, তাই আপনার সঙ্গে কারও তুলনা হয় না—,তাই আমি বলছিলুম, আপনি যাকে বিয়ে করবেন—"

"বিয়ে আমি করবো কি না সে কথা আমি নিজেই এখনও জানি না মিঃ দত্ত।"

সুমিষ্টস্বরে আত্রেয়ী আরও যেন কী বলতে যাচ্ছিল, ওর কথার মধ্যে রুক্ষ ভাবে মুকুল বলে উঠলো,—"বিয়ে যদি না করবেন, তবে এমন ক'রে ফ্লার্ট ক'রে ঘোরেন কেন?"

"ফ্লার্ট আমি করি না মিঃ দত্ত," গম্ভীর গলায় আত্রেয়ী বললো—"আপনারা এ কথা স্বীকার করেন কি না জানি না, আমরা প্রত্যেকে পারিপার্শ্বিকের কলের পুতুল মাত্র, তাই যে শিক্ষা, যে সংস্কারের মধ্যে আমরা গড়ে উঠেছি, তার প্রভাবমুক্ত আমরা সহজে হ'তে পারি না, অণু-পরমাণুতে সেই রক্তের স্রোত বয়ে যায়, তাই ব'লে নিজের সত্তা, সত্তার সুন্দর বস্তু ভালোবাসাকে সস্তা করে দিতে পারি না—"

উচ্চকণ্ঠে শ্লেষের হাসি হেসে মুকুল বললো, "তাই সেই পল্লীগ্রামের বাউণ্ডুলেটার পিছনে পিছনে ফেউর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন—"

একটু গর্ব্বমিশ্রিত স্মিত হাসি হেসে সেদিন আত্রেয়ী উত্তর দিয়েছিল— "ওই বাউণ্ডুলে আপনাদের মত মেকী সাহেব যে নয়,—তা সত্যি, তবে সে রাজপুত্র এ কথা জানবেন—, ভাগ্য যথেষ্ট সুপ্রসন্ন হলে তবে রাজার বাড়ী জন্ম হয়।" তারপর সেই গর্ব্বের ভঙ্গিমায় আঁচল দুলিয়ে আত্রেয়ী ঘর থেকে বের হয়ে গেছলো।

* * *

সত্যি কথা। আত্রেয়ী সহপাঠী এক রাজকুমারকে ভালোবেসেছিল। রাজপুত্র বই কি—; আজও কুমার মৃণালের বাপ রাজা উপাধিতে ভূষিত, বাঙ্গলার এক পল্লী অঞ্চলের দিঘাপাতিয়া গ্রামে রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণের প্রতাপ কে না জানে? অথচ প্রজাবাৎসল্যে পল্লীপ্রীতিতে তাঁর অন্তর ছিল নিরন্তর উদ্বুদ্ধ। নিজস্ব রুচিগত আদর্শের মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করে চলতেই তিনি পছন্দ করতেন। তাই রাজধানী সহর অঞ্চলে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বাস্থ্যসুন্দর আবাসস্থল রয়েছে, তবু পল্লী-প্রাসাদই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করতেন। দুই ধারে দেবদারু-কুঞ্জে সুসজ্জিত ছায়াঢাকা সড়কের পথ গ্রামে গিয়ে মিশেছে, তারই এক প্রান্তে সুউচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত প্রকাণ্ড রাজসৌধ, আমোদ-ভবন, পূজামন্দির, পশুশালা, ফলের বাগান প্রভৃতি অতিক্রম করার পর টাওয়ার-ক্লকে সুসজ্জিত, রুচিসম্পন্ন দেউড়ি,—সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। গৃহ-অভ্যন্তরে বাহির মহল, অন্দর-মহল প্রভৃতি পরিবেষ্টন করে ফুলের বাগান, টেনিস লন ইত্যাদি। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে প্রকাণ্ড এক পুষ্করিণী, স্বচ্ছ তার জলোচ্ছ্বাসে তীর টলমল করছে, মর্ম্মর রচিত ঘাটের চত্বরে তখন পত্নীসহ রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণ সমাসীন। বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে, রাণী মধুস্রবার তার চেয়ে কিছু কম। শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যা তখন আসন্ন হয়ে এসেছে, পরিম্লান দিগন্ত ধূসর, কেয়াফুলের সুমিষ্ট গন্ধে বাতাস আমোদিত। এ হেন সময় তীরস্থ একখানি জলবিহারের নৌকার দিকে তাকিয়ে রাণী মধুস্রবা বললেন—"নৌকাখানা কতদিন অব্যবহার্য্য হয়ে পড়ে রয়েছে,—মৃণালের বয়স যখন আমাদের ছিল কতই না জলকেলি করেছি—"

রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণ একটু রহস্য করে বললেন—এস না রাণী, আজও আমরা আগের মত জলনৃত্য সুরু করে দি—বয়স হয়েছে এখন আমাদের? তার জন্য কী? বুড়োবুড়ির প্রেমও উপভোগ্যের বইকি—"

পাতলা ঠোঁটে তরুণীসুলভ হাসি হেসে মধুস্রবা বললেন—"দরকার নেই আর ওই উপভোগ্যের বস্তু হয়ে, পরীক্ষা হয়ে গেছে, খোকনকে তুমি লিখেও দাও, তাড়াতাড়ি চলে আসুক, এই শ্রাবণেই ওর কিন্তু বিয়ে দিতেই হবে, বউ আসবে, ওরা দুজন আবার আমাদের মত নৌবিহার করবে—"একটু থেমে মধুস্রবা আবার বললেন, "মেয়েটি কিন্তু আমাদের দেশের হওয়া চাই, তা না হ'লে সহুরে মেয়ের আবার এই গ্রামে মন বসবে না—"

রাজা বললেন—"তা ছাড়া আমারও মৃণালকে বড় দরকার হয়েছে, অথচ সে লিখেছে তুমি বোধ হয় শোন নি, পরীক্ষার ফল জেনে একেবারে আসবে, এ দিকে মাধব-পাড়ায় একটা পুকুর না কাটালে প্রজাদের বড় কষ্ট, তার পর চাষীদের জন্যে ইস্কুলটা খুললুম,—আমি একা আর পেরে উঠছি না—"

এই সময় দাসী রূপার ট্রেসহ একখানি চিঠি ওদের সমীপে পৌঁছে দিয়ে গেল। চিঠিখানা কোলকাতা থেকে মৃণাল মৃগেন্দ্রনারায়ণকে লিখেছে।

সংক্ষিপ্ত একখানি চিঠি, কিন্তু তা পাঠ করতে মৃগেন্দ্র-নারায়ণের বুকে যেন একটি শেল বিদ্ধ করলো, প্রফুল্ল মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠলো। কয়েকটি মুহূর্ত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত থেকে তিনি চিঠিখানা সজোরে স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। মধুস্রবা পড়লেন, পুত্র লিখেছে—

"শ্রীচরণকমলেষু—

বাবা, আমাদের বি-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বের না হ'লেও আমি খবর পেয়েছি—আমি ভালো ভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছি শীঘ্রই বাড়ী ফিরছি। কিন্তু এর আগে আপনার নিকট একটি প্রার্থনা জানাচ্ছি—বিখ্যাত চীফ মেডিক্যাল অফিসার মিঃ কে. এন. গাঙ্গুলির মেয়েকে আমি বিবাহ করতে ইচ্ছা করি, এ বিষয় আপনার এবং পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণীর মত পেলে বিশেষ আনন্দিত হই। আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলুম। সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করবেন। সেবক মৃণাল"

মধুস্রবাও কিছুক্ষণ একটিও কথা বলতে পারলেন না—তার পর একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"তখনই তোমায় বারণ করেছিলুম, খোকাকে কোলকাতায় পাঠিও না, কী দরকার রাজার ছেলের এম-এ বি-এ পাশ করে—একে বনেদী বংশের ছেলে, তায় সুন্দর চেহারা আবার লেখাপড়া শিখছে—এ ছেলে পড়তে পায় নাকি—ছুঁচোল মেয়েগুলোর সব জিব লক্‌লক্ করে—"

মৃগেন্দ্রনারায়ণ তখনও স্থাণুর মতই স্থির, অসাড়; স্ত্রীর একটি কথারও প্রত্যুত্তর করলেন না, নির্ব্বাক ওষ্ঠপ্রান্তে যেন মূক হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর।

মধুস্রবা পুনরায় বললেন—"নিজেরা সব জাতিধর্ম্ম খুইয়ে সাহেব সেজেছি না বোষ্টম বনেছি তার ঠিক নেই—যত সব ম্লেচ্ছপনা—ছিঃ—। ও মেয়ে এ সংসারে আনলে, মা-লক্ষ্মী অত অনাচার কিছুতেই সইবেন না—"

এইবার মৃগেন্দ্রনারায়ণ যেন আগ্নেয়গিরির মত উৎসারিত হয়ে উঠলেন, বললেন—"না রাণী, সে কিছুতেই হ'তে পারে না, তাহ'লে আমার সোনার সৌধ ধুলিসাৎ হয়ে যাবে যে। তুমি জানো আমার এই চাষীদের ইস্কুলের পিছনে কত বিরাট আদর্শ, কত বড় কল্পনা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে, মৃণাল না হ'লে সব যে ব্যর্থ হয়ে যাবে! না—না আমি যে সে কথা ভাবতেই পারছি না, কিন্তু সহরের মেয়ে, সাহেব মানুষের মেয়ে এখানে এই পল্লীগ্রামে থাকতে কী রাজী হবে, শোন রাণী আজই দার্জ্জিলিং মেলে আমি কোলকাতা চলে যাচ্ছি, কাল আসাম মেলে যেমন ক'রে পারি খোকাকে নিয়ে ফিরবো—"

মধুস্রবা আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে বললেন—"রাধারাণী ওর সুমতি দিও মা।"

* * *

সহরের উপকণ্ঠে কোলকাতার বৃহত্তম প্রাসাদ। পরদিন সকালবেলা বাড়ী পৌঁছে মৃগেন্দ্রনারায়ণ সর্ব্ব প্রথম মৃণালকে ডেকে পাঠালেন। মৃণাল তখন চা পানের পর গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে একটি ইংরেজি উপন্যাস পাঠ করছিল। পিতার এরূপ অভাবনীয় আগমনে বিস্মিত সে কম হয় নি, সংবাদ না পাঠিয়ে তিনি তো এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে কখনও এসে উপস্থিত হন্ না? তবে? তবে বিবাহে কী তাঁর অনুমতি নেই—মৃণাল আর ভাবতে পারলো না, চঞ্চল পদক্ষেপে পিতার সামীপ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

মৃগেন্দ্রনারায়ণের পরিধানে তখনও গাড়ীর বেশ-প্রসাধন, চুলগুলো অগোছাল, চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ভাব সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা রয়েছে। একখানি সোফায় শিথিল ভঙ্গিতে বসেছিলেন, পুত্রের দিকে ক্লান্ত চোখে তাকিয়ে বললেন—"মৃণাল এসেছ? বস।" বাইশ বছরের যুবক পুত্র। সৌম্য সুন্দর চেহারা, তারুণ্যের দীপ্তিতে চোখ দুটি উজ্জ্বল, গৌরবর্ণ উন্নত কপালে কয়েকটি কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি মুহূর্ত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মৃগেন্দ্রনারায়ণ বললেন—"তোমার চিঠি পেয়ে তোমায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি খোকা আমি—, আমি ইচ্ছে করি না তুমি আধুনিক সমাজে বিয়ে কর—, তাই—"

আর শোনবার মত স্থৈর্য্য কুমার মৃণালের ছিল না, সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠলো—"সে হয় না, সে কিছুতেই হয় না বাবা, সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে যে—"

"সমস্ত ঠিকঠাক কী রকম," এবার রুক্ষ স্বরে রাজ মৃগেন্দ্র-নারায়ণ বললেন, "আমি তোমার অভিভাবক বর্তমান থাকতে ঠিকঠাক হয়ে গেল কী রকম?"

কুমার মৃণালেরও তারুণ্যের গরম রক্ত এবার টগবগ করে ফুটতে সুরু করলো, উদ্ধত ভঙ্গিতে সে বললো,—"আমিও যে সাবালক হয়েছি, একথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?"

বিস্ময়ে মৃগেন্দ্রনারায়ণের কণ্ঠস্বর মূক হয়ে গেছলো, তিনি আর একটিও বাক্য ব্যয় করতে পারলেন না। কথাটি যথার্থ যে পুত্র সাবালক হয়েছে, কিন্তু বাপ-মা যে স্বপ্নেও সে চিন্তা করতে পারেন না। সন্তানের শৈশব ও বাল্যের স্মৃতি যে বাপ-মার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে রেখে দেয়। তাদের ক্ষমতার কথা তাঁদের চিন্তায় বাধা দেয়, অক্ষমতার অসহায়তাই স্মরণে আসে শুধু! এরই নাম কী অপত্য-প্রীতি? একেই কী বলে সন্তানবাৎসল্য? পিতাকে নীরব দেখে এবং মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ ভেবে, এবার একটু নম্র ভাবে মৃণাল বললো—"ছেলেকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে যখন আপনার মনে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি, তখন আধুনিক মেয়েকে তার স্ত্রী করে দিতে—, আপনি একটু ভেবে দেখুন বাবা—"

প্রশ্ন জটিল। গম্ভীর গলায় মৃগেন্দ্রনারায়ণ বললেন,—"আমি কিছু ভেবে দেখতে চাই না, তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, তবে ভয় পেওনা, আমি তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করবো না, অভিশাপ দেব না—শুধু ভাববো মৃণাল আমাদের সাবালক হয়েছে।" একটু বেদনা-মিশ্রিত স্নেহের হাসি হেসে তিনি রাজসিক ভঙ্গিমায় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

* * *

অনেকটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। কুমার মৃণাল সেই একভাবে সোফায় বসে রয়েছে, যখন বেয়ারা এসে স্নানের সময় হয়েছে জানাল, ওর মনে হোল যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠলো। সত্যই কী বাবা এসেছিলেন? তাঁর সঙ্গে সে তর্ক করেছে, তিনি কি আবার ফিরেও গিয়েছেন? এ কথাগুলি মৃণাল কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওকে নীরব দেখে বেয়ারা পুনরায় বললে, "স্নানের সময় হয়ে গেছে যে ছোট হুজুর—"

"বাবা ফিরে গেছেন নাকি রে শ্যামলাল?" অস্ফুট গলায় মৃণাল ওকে জিজ্ঞেস করলো।

"জী হুজুর," শ্যামলাল বললে, "সকালবেলা দেখলুম রাজাবাহাদুর এলেন, আবার ফিরেও তো গেলেন—"

"আচ্ছা তুই যা শ্যামলাল, আমি একটু পরে স্নান করতে যাচ্ছি"—অন্যমনস্কের মত মৃণাল ওকে বললো।

কিন্তু একটু পরেও ওর ওঠবার কোনই আগ্রহ প্রকাশ পেল না, ও ভাবলো, এমন তো কতই ঘটে, ও আত্রেয়ীকে কোনও কথা না জানিয়ে আজকে রাত্রির গাড়ীতে বাড়ী চলে যাবে, মা-বাপকে সে সুখী করবে। কিন্তু পর মুহূর্তেই আত্রেয়ীর ছবিখানা দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে ও ভাবলো—না কিছুতেই আত্রেয়ীকে ফাঁকি দিতে পারে না—সে অসম্ভব। ওর একদিনের কথা মনে পড়লো, তখন ওর মাত্র কয়েক দিন আত্রেয়ীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। যেদিন ওদের কলেজে একজন অধ্যাপকের বিদায়-উৎসব ছিল, সভা ভাঙতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, অগ্রহায়ণ মাস, অথচ গরম কাপড়ও সঙ্গে কিছুই আনে নি। গাড়ীর অপেক্ষায় গেটের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবি, যেন ওর হাড় পর্য্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে

হিমেল বাতাস বইছিল। এই সময় পিছন থেকে আত্রেয়ী এসে বললো "কি গো আপনভোলা রাজপুত্তুর, শীতে কাঁপছেন দাঁড়িয়ে? গরম কাপড় সঙ্গে নেই?" একটুও সে অপেক্ষা না করে নিজের শালখানা ওর কাঁধের ওপর রেখে দিল। ও বাধা দিয়ে বলে উঠলো আর তুমি, আপনি? না না, এ কি করছেন? আপনি কি গায়ে দেবেন?" উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠে আত্রেয়ী বলেছিল "জানেনই তো আমরা আধুনিকারা অত্যন্ত আত্মচকিত অত্যন্ত আত্মপ্রিয়; ব্যস্ত হবেন না, মা আসবেন গাড়ীতে নিতে, তাঁর সঙ্গে কিছু থাকবেই—"

মধুর স্মৃতিতে মৃণালের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। এই সময় বেয়ারা এসে জানাল টেলিফোনে আত্রেয়ী গাঙ্গুলি ওকে ডাকছে। ও গিয়ে রিসিভার ধরতে আত্রেয়ী জানাল—"ওর মাসতুত ভাইয়ের ফরাসী স্ত্রী কয়েক ঘণ্টায় জন্যে দেখা করতে এসেছেন, অন্য জায়গায় এনগেজমেণ্ট আছে, শীঘ্রই চলে যাবেন, উনি ইচ্ছে করেন মৃণালকে এক বার দেখতে, মৃণাল যদি—"

খুশি হয়েই মৃণাল সম্মতি প্রদান করলো।

* * *

মিঃ কে. এন. গাঙ্গুলির ছোট বারান্দায় একখানা শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর আত্রেয়ী রিসিভার নামিয়ে রাখতে ওর ফরাসী বৌদি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন— "আসবে তো ভাই তোমার সুইট্‌হার্ট? (প্রিয়তম)"

—"নিশ্চয়ই"—মধুর হেসে আত্রেয়ী উত্তর দিল।

কিন্তু তোমার দাদার কাছে শুনলুম, ও অভিজাত বংশের ছেলে হলেও আমাদের সমাজে অভ্যস্ত নয়— তার পর মাত্র এই বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, কিছু ফরেনের এডুকেশন—"

"ফরেন এডুকেটেড্ হবার দিন ওঁর তো চলে যায় নি বৌদি—" উৎসাহের সঙ্গে আত্রেয়ী বললে—"কথা আছে বিয়ের পর আমরা দুজনে হোল ওয়ার্লড ট্যুর করবো, এই ভ্রমণটাও কম বড় একটা শিক্ষা নয়—আর পয়সা থাকলে কোন্ সমাজে না অভ্যস্ত হওয়া যায় বল? আধুনিক রুচিসম্পন্ন করে বাড়ী-ঘর সাজিয়ে ফেলতেই বা কতক্ষণ? শুধু ইংরেজী কেন? আমেরিকা, রাশিয়া সব সমাজের স্টাইলই নখ-দর্পণে হয়ে যাবে তখন—তোমায় কিন্তু এখন থেকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখছি বৌদি। প্রত্যেক ছুদিনের বন্ধুটিতে আমাদের বাড়ী আসতেই হবে। লক্ষ্ণৌ, লাহোর যতদূরেই তুমি থাকো না কেন—"

এই সময় মৃণালের গাড়ীর বাঁশী বাইরে বেজে উঠতে ওরা দুজনে গেটের দিকে তাকাল। ফরাসী মহিলা মৃণালের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা শুনে যতখানি নিরাশ হয়েছিলেন, তাকে দেখে তার চেয়ে বেশী আশাহত হলেন, কারণ মৃণালের পরিধানে ছিল নিতান্ত দেশীয় বেশভূষা, ধুতি ও পাঞ্জাবি।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তিনি চলে গেলেন, তাঁর গাড়ীর বাঁশী দূরে মিলিয়ে গেলে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে আত্রেয়ী বললো—"তোমাকে আমি বলে দিয়েছিলুম মৃণাল, আমার ফরাসী বৌদি এসেছেন—তবু তুমি এই ন্যাষ্টি ড্রেস পরে এলে? কেন সেই ভাল স্যুটটা পরতে পারলে না?"

স্তিমিত শিখায় যে প্রদীপ জ্বলছিল বাতাস পেয়ে তা যেন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো, উত্তপ্ত কণ্ঠে মৃণাল বলল—"সে আমার যা খুশি পরে এসেছি, তোমাদের ফরাসী মহিলাকে সম্মান দেখাতে আমার জাতীয় পোষাক ছাড়বো কেন? এই জন্যেই তো তোমাদের এই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে, আধুনিক রুচিকে অনেকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে চান না—শূন্য, নিঃসীম শূন্যতায় একেবারে ফাঁকা নিছক অনুকরণের ভিত্তির ওপর তোমাদের এই স্টাইল আর ফ্যাসানের বনেদ গড়ে ওঠে।"

এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মৃণালের কাছে আত্রেয়ী দুই বৎসরের মুখর আলাপনের মধ্যে এই প্রথম শুনলো। তাই ও এতগুলি কথার একটিও উত্তর দিতে পারলো না— বিস্ময়ে ওর কণ্ঠস্বর নির্ব্বাক হয়ে গেছলো, মূক ওষ্ঠপ্রান্ত থরথর করে কাঁপছিল। অর্থহীন দৃষ্টি মেলে খোলা জানালার বাইরে ও তাকিয়ে রইল। ক্রমে ওর ঘন কালো চোখের উদাস চাহনি ছলছলিয়ে এল, শুষ্ক দৃষ্টি সজল হয়ে উঠলো। কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে গালের উপর পড়লো।

মৃণালও নিতান্ত কম অনুতপ্ত হয় নি, ও ভাবতেই

পারছিল না আত্রেয়ীর প্রতি এরূপ উক্তি সে কী করে করলো। আত্রেয়ী ওকে বরাবর বলেছিল, "তোমরা রাজা মহারাজা তোমাদের সমাজের যোগ্য আমি নই—"তবু সেই তো ওকে অন্তরলক্ষ্মী করতে সাদর-সম্ভাষণ জানিয়েছিল। মৃণাল আর অপেক্ষা করলো না, নিকটস্থ একখানি টেবিলের উপর আত্রেয়ী বসেছিল, ও তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললো,"আমায় ক্ষমা কর আত্রেয়ী, আমি ইচ্ছে ক'রে তোমায় কষ্ট দিই নি, আমাদের রক্ষণশীল সংসারের অমুক্ত বক্তব্যগুলো আমার অবচেতন মনে আবরিত ছিল, আজ আমার অজ্ঞাতেই তা প্রকাশ হয়ে গিয়েছে, তুমি বিশ্বাস করবে না, তোমার দুটো স্নেহমধুর কথা শুনতে আমার বেদনা-আর্ত্ত মন কতখানি উৎসুক, কতখানি কাঙাল হয়ে রয়েছে যে—"

এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না আত্রেয়ী, "বেদনা-আর্ত্ত মন" ও চমকে উঠলো, একটু কেঁপে উঠলো, ত্রস্তে মৃণালের সোফার কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর অবিন্যস্ত রুক্ষ চুলগুলি অঙ্গুলি-সঞ্চালনে গুছিয়ে দিতে দিতে সুমিষ্ট করে বললো, "বেদনা-আর্ত্ত মন কেন বলছ মৃণাল? কী তোমার হয়েছে আমাকে বলবে না? তোমার চেহারাও কী রকম যেন—"

এবার মৃণালও আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারলো না, চোখের কোণ দিয়ে ওর জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, যেন শ্রাবণের বর্ষণ অন্তে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ কতকটা প্রশমিত হয়ে এল। দুর্ব্বল মনকে এবারও আয়ত্ত করে নিয়ে আনুপূর্ব্বিক ঘটনাটি বিস্তারিত করলো। সমস্ত শুনে এবারও আত্রেয়ী একটিও কথা বলতে পারলো না। ওর বেদনা-গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে মৃণাল বললো, "আমি বাবাকে জানিয়েছি আমি তোমাকে বিয়ে করবই—"

তার পর অস্ফুট গলায় আত্রেয়ী বললো—"তিনি যদি তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করেন?"

"না তা করবেন না, তিনি জানিয়ে গেছেন," মৃণাল বললো।

এবার আত্রেয়ী যথেষ্ট আশ্বাস অনুভব করলো, বললো—"নিতান্তই তাঁরা যদি আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখেন, আমরা কী করতে পারি বল? আর সম্বন্ধ রাখলেও আমরা তো গিয়ে সেই পাড়াগাঁয়ে থাকতুম না, সুতরাং আমাদের পক্ষে দুই-ই সমান—"

"আর তা ছাড়া," মৃণাল বললো, "আধুনিক শিক্ষায় ছেলেকে যখন শিক্ষিত করেছেন, জীবন-সঙ্গীনিটিও তার আধুনিকা হওয়া দরকার একথা বোঝা উচিত তাঁদের—"

তার পর ওরা মৃণালের বাপ-মায়ের সাহায্য না পেলেও কী উপায়ে বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করবে, সেই আলোচনায় মন দিল।

* * *

কিন্তু যতই উৎসাহের সঙ্গে ওরা বিবাহের আয়োজনে মেতে উঠুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত মত পরিবর্ত্তন করতে ওদের হয়েছিল বৈকি! একেই বলে বোধ হয় বিবেকের অনুগত মন, বিবেক-অনুপ্রাণিত অন্তর। তাই আত্রেয়ীর ফরাসী বৌদি লক্ষ্ণৌ থেকে যখন লিখলেন—"তোমাদের দাম্পত্য জীবন মধুময় হোক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তোমাদের বিবাহ-উৎসবে আমি যোগদান করতে পারছি না, কারণ জানো তো আমার ছেলেটি অত্যন্ত ছোট, কাজের বাড়ীর নানারকম অনিয়মে ওর প্রতি হয়তো বা অযত্ন হয়ে যাবে—পনেরো দিনও হয় নি ও টাইফয়েড থেকে উঠেছে। তাই তোমার দাদা কী বলছেন জানো, 'আত্রেয়ীর বিয়েতে যাবার তোমার কতদিনের সখ, আর ছেলের জন্য তুমি এতখানি স্বার্থ ত্যাগ করছো,ভবিষ্যতে ও কী তোমায় যথার্থ মর্য্যাদা দিতে পারবে? তা না পারুক কী বল ভাই আত্রেয়ী, আমি তখন ভাববো আমি তার উপযুক্ত মা নই তাই সে আমায় সম্মান করতে পারে না—"

এই পর্য্যন্ত চিঠিখানা পড়েছিল আত্রেয়ী, তার পর সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছলো। মা এসে বললেন, "চল না আজ হ্যামিলটনে গিয়ে গয়নার অর্ডারগুলো দিয়ে আসি, আর বেশী সময় কই?"

আত্রেয়ী বললো—"না মা আমি মৃণালকে বিয়ে করবো না ভাবছি—"

"সে কী রে?" বিস্ময় প্রকাশ ক'রে মা বললেন।

আত্রেয়ী বললে—"ওঁদের ছেলে, ওঁদের যখন মত নেই

কী দরকার বল ওঁদের ওই একটা ছেলেকে নিয়ে টানাটানি করে—”

মা খুশি হয়ে মেয়েকে সমর্থন ক'রে বললেন—“আমিও সে কথা অনেক দিন ভেবেছিলুম শুধু তুই দুঃখ পাবি বলে চুপ ক'রে ছিলুম, জানিস আত্রেয়ী এ কথা নীতি বাক্য নয় অথবা শিক্ষামূলক নয়, প্রধান কথা বাপ-মা-বৰ্জ্জিত জীবন একটা বিরাট শূন্য ছাড়া আর কিছুই নয়—

এই সময় ভৃত্য এসে জানিয়ে গেল—গাড়ী বের কথা হয়েছে—মা বললেন—“চল না আত্রেয়ী, দীপ্তিদের বাড়ী থেকে খানিকটা বেড়িয়ে আসি, আমি বুঝতে পারছি তোর মনে এখন তুমুল ঝড় বইতে সুরু করেছে—”

“সত্যি কথা মা,” ম্রিয়মাণ হেসে আত্রেয়ী বললো—“কিন্তু দীপ্তিদের বাড়ী গেলে আমার সে ঝড় থামবে না যে। মৃণালের সঙ্গে একবার দেখা করে তাকে সব কথা না বলতে পারলে, আমি কিছুতেই শান্ত হ'তে পারবো না—তুমি যাবে মা আমার সঙ্গে? চল না?”

“চল, আমাকে দীপ্তিদের বাড়ী নামিয়ে দিস্, ওর ভাইটিকে আমার কিন্তু বেশ ভাল মনে হয়—”

জননীর এ কথায় আত্রেয়ী কোনও প্রত্যুত্তর করলো না, শুধু একটা প্রগাঢ় দীর্ঘনিশ্বাস ও বুকের তলে চেপে নিল।

মৃণালের ঘরে ঢুকে ও দেখলো, সে একান্ত মনোনিবেশের সঙ্গে কী যেন লিখছে, পাশে একখানা খবরের কাগজ খোলা রয়েছে, ওর দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে মৃণাল বললে—“আত্রেয়ী এসেছ? বস। বাবাকে চিঠি দিলুম—” ও লিখতে লিখতে বলতে লাগলো—“জান্‌তে চাইলুম তিনি আমাদের কবে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন? সে চিঠির তিনি কোনও উত্তর দিলেন না, সম্ভবতঃ খরচপত্রের জন্য একটা মোটা অঙ্কের চেক পাঠিয়ে দিলেন—” এইবার ও কলমটা রেখে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললো—“ভালবাসা যেখানে শূন্য হয়ে রইল, সেখানে নিছক টাকার প্রার্থী হয়ে সেই অনুকম্পার আশ্রয় ঐশ্বর্য্যের দাসত্ব করাটা নিশ্চয় খুব গৌরবের হবে না, তাই সে চেক আমি তখনই ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছি,—এই দেখ না কাগজে একটা খুব ভালো চাকরীর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে এখুনি দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি—”

আত্রেয়ী কয়েকটি মুহূর্ত্ত থেকে রুদ্ধপ্রায় গলার স্বরটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললো—“সে হয় না মৃণাল, আমি মত বদলে ফেলেছি, তোমার বাপ-মাকে দুঃখ দিয়ে তোমাকে আমি পেতে চাই না, তোমার মত স্বামী পেতে হ'লে যথেষ্ট তপস্যা থাকা চাই, আমার সে তপস্যা এখনও শেষ হয় নি, এ জন্মটা তাই ক'রে যাব, পরজন্মে নিশ্চয়ই আমাদের মিলন হবে—”

ওকে থামিয়ে দিয়ে অধীর কণ্ঠেমৃণাল বলে উঠলো—“না-না, এসব তুমি কী প্রলাপ বকছ আত্রেয়ী—এ কিছুতেই হতে পারে না, আমি তাহলে কী করে বাঁচবো—”

“দুদিন খুবই কষ্ট হবে, তারপর সব সয়ে যাবে মৃণাল, আত্রেয়ী বললো, “বাংলার ঘরে ঘরে অকাল বৈধব্য-প্রাপ্ত মেয়েরা কী করে বেঁচে থাকে বল ত?”

“তারা যে মেয়ে আত্রেয়ী, আশৈশব শিক্ষা পেয়ে থাকে, কষ্টই তাদের জীবনের আলো, সংযমসাধনাই জীবনের ব্রত—আর আমরা পুরুষরা এই কথাই জেনে আসি—উচ্ছৃঙ্খলতাই আমাদের ধর্ম্ম, জীবনটাকে নিঙড়ে নিঙড়ে উপভোগ করাটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—তাই আমরা একটার পর একটা স্ত্রী বিয়োগান্তে বিবাহ করতে কুণ্ঠিত হই না—অনেকে আবার স্ত্রীজাতিকে বিলাসের দ্রব্য ছাড়া কিছুতেই ভাবতে পারি না, সুতরাং সেক্ষেত্রে—”

“সুতরাং—সে ক্ষেত্রে আমি বলি মৃণাল” দৃপ্ত ভঙ্গিমায় অথচ কোমল কণ্ঠে আত্রেয়ী বললো—“তোমরা আধুনিক তরুণরা অন্যায় সে সমাজব্যবস্থা বদলে দাও, তোমাদের প্রতি সমাজ বিধানের বিরুদ্ধে দাঁড়াও—রুচিগত আদর্শের দিক থেকে মেয়ে এবং পুরুষের কর্ম্মজীবন ভিন্নমুখী হোক—ক্ষতি নেই তাতে—তবে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সংযমের দিক থেকে উভয়ের আসন এক পর্য্যায়েরই হোক, তার মানে সম্মানের আর সম্ভ্রমের হোক—মানবতার মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক—এই পর্য্যন্ত বলে নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আত্রেয়ী থেমে গেল—তারপর একটু ত্রস্তভাবে মৃণালের দিকে এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে ওর পদধূলি গ্রহণ করে একটি প্রণাম করে বললো—“অনেক কথা বললুম মৃণাল, তার

মূল মর্ম্ম এই—আমায় ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো—আর আমার সময় নেই, গাড়ীর সময় হয়ে এল, দিল্লী যাচ্ছি—ডাক্তারি পড়তে চেষ্টা করবো—" —সে আর একটি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে দ্রুত পায়ে প্রস্থান করলো। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের মত ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে মৃণাল ওইস্থানে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ওর গাড়ীর বাঁশী যখন আর শোনা গেল না, তখন ও একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে ভাবলো—

"তোমায় ভুলতে পারবো কি না জানি না আত্রেয়ী, কবি বলেছেন, সংসারের জটিল আবর্ত্তে প্রিয়ার মাধুর্য্যের নাকি অপচয় ঘটে—, তাই দূরেই তুমি চিরসুন্দর হয়ে থাকবে—এই কথা মনে করে মনকে প্রফুল্ল রাখবো—আর পিতার আদর্শকে জীবনের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলবো—পল্লী-সংস্কারে আত্মনিয়োগ করবো—আর রাজপুত্রের দাবী নিয়ে সমাজ-ব্যবস্থায় তোমার আদর্শকে চলায়মান করতে চেষ্টা করবো।"

* * *

রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণ ও রাণী মধুস্রবা আশাতীত প্রফুল্ল হয়েছেন বৈকি—! মধুস্রবা বললেন—"রাধারাণীর মানত কখনও মিথ্যে হয় না, আমি তখনই জানতুম খোকা আসবেই, কী বিশ্রী কাণ্ড বাবা—সেই ম্লেচ্ছ সমাজের মেয়ে—গা-টা এখনও শিউরে ওঠে—"

মৃগেন্দ্রনারায়ণ বললেন—"আর তাছাড়া ওই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে বিয়ে করলে ওর মতি একেবারে বদলে যেত—আমাদের এই গ্রামের ছায়ায় পা দিত নাকি? অথচ কী উৎসাহজনক ওর কর্ম্মশক্তি—এখনও একমাস যায়নি ও ফিরেছে, কিন্তু এরই মধ্যে ইস্কুলের আশ্চর্য্য উন্নতি করেছে। চাষীদের পরিচালনা-পদ্ধতিও ওর যেমন নিখুঁত সুন্দর, ওদের তত্ত্বাবধান করবার ক্ষমতাও তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত—নবীন আর প্রবীণের এইখানেই প্রভেদ" —বলতে বলতে রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বাস্তবিক তাই। মৃণাল আন্তরিক দরদের সঙ্গে পল্লী-সংস্কার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছে। গ্রামের মেয়ে-পুরুষ উভয় পক্ষই ওর প্রশংসায় মুখর কণ্ঠে বলে, "যেমন বাপ, তেমনি তার ব্যাটা হয়েছে।"

মৃণাল ওদের কাছে শুধু শিক্ষক অথবা জমিদারই নয়, যেন বন্ধু; এমনি সখ্যতার সঙ্গে ও তাদের সঙ্গে গল্প করে, তাদের ঘরোয়া কাহিনী শোনে, আত্রেয়ীর কথামত পুরুষকে নারীর সমপর্য্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে যে পুরুষ দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে যায় অথবা নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে অসংযত চিত্তের পরিচয় দেয়, ও তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বাধা দেয়। এইখানেই আত্রেয়ীকে না পাওয়ার বেদনা ওর সার্থক হয়ে ওঠে। একবার ওর এই সাফল্যের কথা জানিয়ে আত্রেয়ীকে একখানা চিঠি লিখেছিল—কিন্তু সে চিঠির ও কোনও উত্তর পায় নি, হয়তো বা সে চিঠি আত্রেয়ীর হস্তগত হয় নি, হয়তো বা সে তাকে ভোলবার সাধনায় ব্রতী হয়েছে বলে উত্তর দেয় নি কোনও।

একদিন মধুস্রবা বললেন—"এইবার খোকার একটি সুন্দর দেখে বউ নিয়ে আসি কেমন?" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উঠে মৃণাল বলে—"না মা, ওই কাজটি কোর না, তা হ'লে আমার কাজকর্ম্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে, আমার ইস্কুলে এখন কত চাষী পড়তে আসে জান—প্রায় শ-খানেক—"

মা ওকে বাধা দিয়ে বললেন—"তা তোর বিয়ের আর স্কুলের সঙ্গে কি সম্বন্ধ বল ত? বউতো আমার কাছে থাকবে—"

এ কথার আর কোনও যোগ্য খুঁজে পায় নি মৃণাল, মুখটা শুধু সে অন্য দিকে ফিরিয়ে রেখেছিল। মধুস্রবা স্বামীকে বলেছিলেন—"খোকা এখনও সে বিশ্বেশ্বরীর কথা ভুলতে পারেনি, বিয়ের কথা বলতে মুখটা কি রকম কাঁদো কাঁদো করে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল।" মৃগেন্দ্র-নারায়ণ বললেন—"স্মৃতি ফিকে হয়ে আসতে একটু সময়ের প্রয়োজন হয় বইকি—একটা মোহ ত—আর কিছু দিন যেতে দাও—"

এর পর আরও প্রায় এক বৎসর অতিক্রম করেছে। আবার সেই পুষ্করিণীর তীরে মর্ম্মর-রচিত আসনে রাজা ও রাণী উপবিষ্ট—শ্রাবণের বর্ষণক্লান্ত গোধূলি-আকাশে কালো মেঘ স্তূপাকার হয়ে রয়েছে, কেয়াফুলের মদির গন্ধ সজল বাতাসকে মধুর ক'রে তুলেছে। এমনি সুবাসিত মুহূর্ত্ত সুখের স্মৃতিতে মনকে উতলা করে, করুণ কথাও স্মরণে আনে, তাই এবার রাণী মধুস্রবা বললেন—

"ভাবতেও ভয় করে এমনি একদিন মাত্র একখানা চিঠি কি দুঃসংবাদই বহন করে এনেছিল—"

মৃগেন্দ্রনারায়ণ একটু আন্‌মনাভাবে বললেন, "এখনও সে মেঘ কাটেনি রাণী; খোকাকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সংসারী করতে পারা যায় ততক্ষণ দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, কাল বিকেলবেলা ওর ঘরে গিয়েছিলুম, দেখলুম টেবিলে সম্ভবতঃ ওর কোনও বন্ধুর লেখা একটা খোলা চিঠি পড়ে রয়েছে—যে কাগজ খুঁজছিলুম তারই সন্ধানে ওই চিঠিখানা পড়তে সুরু ক'রে শেষ আর না করে পারিনি—"

"আবার সেই চিঠি," শঙ্কিত আগ্রহের সঙ্গে মধুস্রবা জিজ্ঞেস করলেন, "কার চিঠি? কি লিখেছে? আমায় বলনি কেন এতক্ষণ?"

চিঠিখানা রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণের পকেটেই ছিল, নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় সেখানা স্ত্রীর হাতে দিয়ে বললেন—"খোকাকে একবার নওগাঁ পাঠালুম, আজ রাত্রের মধ্যেই এখানা তার ঘরে পৌছে দিতে হবে।"

কম্পিত আগ্রহের সঙ্গে মধুস্রবা ততক্ষণ চিঠিখানা পড়তে সুরু করে দিয়েছেন। মৃণালের বন্ধুটি লিখেছে—

"বন্ধুবরেষু,

সম্প্রতি বদ্‌লি হয়ে দিল্লী এসেছি। এখানে আত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে এত বিস্মিত হয়েছি যে, তোমায় চিঠি না লিখে পারলুম না। কলেজে থাকাকালীন তোমার ভাগ্যকে ঈর্ষ্যা না করে থাকতে পারি নি, আত্রেয়ীর মত সর্ব্বগুণসম্পন্না মেয়ে কিনা একজন সহপাঠীকে বরমাল্যে বরণ করবে? তুমি রাজপুত্র একজন—এইটুকু ভেবেই মনে তখন সান্ত্বনা পেতুম। কিন্তু বন্ধু আজ জিজ্ঞাসা করি তোমায়—প্রিয়া হঠাৎ উপেক্ষিতা কেন হ'ল, উত্তর দেবে আমায়? এরই নাম কী তোমাদের রাজা-মহারাজার রাজকীয় প্রীতি—, রাজসিক ভালোবাসা? তাই মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলো, নিষ্ঠার সঙ্গে প্রেম-নিবেদন কাউকেই করতে পারো না। এত কথা তোমায় হয়তো বা লিখতুম না। অত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে সত্যই দুঃখ হয়; এই কী সেই হাস্য-পরিহাসে ঝর্ণার মত উচ্ছল, লীলাচঞ্চল মেয়ে? যেন গ্রামের ক্ষীণাঙ্গী নদীটি শান্ত এবং মন্থর গতিতে বেয়ে যায়; যেন মোমবাতির ম্লান নিস্তেজ শিখা ও, বিদ্যুতের সে দীপ্তি নিভে গিয়েছে। এক দিন আগ্রহ না চাপতে পেরে জিজ্ঞেস করে ফেললুম ওকে, কেন তার তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়নি। সে একটু ম্লান হেসে শুধু জানাল—'তপস্যা তার শেষ হয়নি, তাই সে তোমায় পায়নি।' এর বেশী সে আর কিছু বলতে চায় না। সত্য সত্যই সে যেন তোমার তপস্যাই সুরু করেছে। কী তার শ্রী হয়েছে চেনবার উপায় নেই, সে স্টাইল, ফ্যাসান সবই বদ্‌লে গেছে। একদিন আমার স্ত্রী ওকে নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। বিখ্যাত অ্যারিস্টোক্রাট সমাজের মেয়ে, ওর সমাদরের সাধ্যমত আয়োজন করেছিলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম—টেবল চেয়ার কাচের বাসনে কিছুতেই খেল না, এমন কি ইংরেজী খানাগুলো স্পর্শ পর্য্যন্ত করলো না, শুধু বললো—'এদেশে যখন দুধ, ঘি, মাখম, ছানার অভাব নেই তখন ও ফাউলকারী-টারীগুলো ধ্বংস করে লাভ কি বলুন ব্রতীনবাবু?' ওর এ পরিবর্ত্তনের হেতু কী তুমি বলবে আমায় মৃণাল? তুমি এ সম্বন্ধে ওকে কিছু বলে-ছিলে কোনওদিন—?"

চিঠিখানার আর মাত্র কয়েক লাইন উদ্বৃত্ত ছিল, কিন্তু মধুস্রবা আর পড়তে পারলেন না, মন তাঁর ক্রমশঃ আনমনা হয়ে এল, চোখদুটি সজল হয়ে উঠলো।

সহানুভূতির কণ্ঠে রাজা মৃগেন্দ্রনারায়ণ বললেন—"দুঃখ করছো কেন রাণী তুমি? এর প্রতিবিধান তো আমাদেরই হাতে রয়েছে, খোকার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আজই আমি মিঃ কে. এন. গাঙ্গুলিকে চিঠি লি[illegible] দিচ্ছি—"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাণী মধুস্রব[illegible] ভেজে চোখদুটি আঁচলে মুছে ফেললেন।

* * *

কয়েকটি মাস অতিক্রম করেছে—কুমার মৃণালের সঙ্গে আত্রেয়ীর বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজ-বংশোচিত রীতিতে নামের আদ্য অক্ষর "ম" বর্ণে পরিবর্ত্তিত করে নব বধূর নাম হয়েছে মীনাক্ষী। একদিন মধুস্রবা বধূর চিবুক স্পর্শ ক'রে সস্নেহ কণ্ঠে বললেন—"ইস্, এই রত্ন আর একটু হ'লেই হারিয়ে ফেলতুম আর কী? এমন বউ কী সকলের ভাগ্যে জোটে—ভাগ্য প্রসন্ন না হ'লে—"

একটু সলজ্জ হেসে আত্রেয়ী ওরফে মীনাক্ষী মুখ নত

করলো, তার পর হঠাৎ ফস্ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রে ফেললো, "হ্যা মা বলুন না, আমাদের ম্লেচ্ছ সমাজের মেয়েকে আপনি কত ঘৃণা করতেন, ভয় করতেন, হঠাৎ আপনার মত বদলে গেল কী ক'রে?"

"পাগলী মেয়ে তাও বুঝি জানিস্ না এখনও?"—মধুস্রবা ঈষৎ হেসে বললেন—"খোকার এক বন্ধুর চিঠিতে তোর পরিচয় পেয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, মানুষ প্রেমের জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করতে পারে?"

রাজাবাহাদুর বললেন—সত্যিকার ভালবাসা মানুষকে এমনি ক'রে ত্যাগ করতে শেখায়, ওই মেয়েই খোকার পূর্ব্ব জন্মের স্ত্রী ছিল, তা না হ'লে স্বেচ্ছায় কেউ এত স্বার্থত্যাগ করতে পারে এখনও?"

মৃণাল তখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে, বললো—"কী অন্যায় তোমার মা, ব্রতীনের চিঠিখানা বুঝি দেখেছিলে? আগে বললে না কেন? তবে ওদের নিমন্ত্রণ জানাতুম।"

"শুধু নিমন্ত্রণ কেন—" মা বললেন—"নাতি হোক—অন্নপ্রাশনের সময় লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসবো।"

এই প্রসঙ্গ চাপা দেবার উদ্দেশ্যে মৃণাল একটু ব্যস্ত ভাবে মীনাক্ষীকে বললো—জানো বাবা কী বলেছেন—আমাদের ইস্কুলে বয়স্কা স্ত্রীলোকদের জন্যে দুপুরে একটা ক্লাশ হবে, তোমায় তাদের দু-ঘণ্টা করে পড়াতে হবে—"

মীনাক্ষী মৃদু ভাষণে বললে, "তোমার আগে বাবা আমাকে এ কথা বলেছেন—"

রাণী মধুস্রবা প্রফুল্ল নয়নে ওদের দিকে তাকিয়ে ওদের অজ্ঞাতে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। সে দিন রাধা-অষ্টমী ব্রত উপলক্ষে রাজগৃহে বিরাট ধুম পড়ে গেছলো। খানিকটা দূরে প্রাসাদ সংলগ্ন দেবালয়ে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্ত্তি সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছিল। মধুস্রবা স্বহস্তে পূজার উপাচারাদি গোছগাছ করছিলেন। এই সময় একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে, ভিজে চুল পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মীনাক্ষী এসে বললো—"আপনার কষ্ট হচ্ছে—আমায় দিন্ মা আমি চন্দন ঘষি, আপনি না হয় নৈবিদ্য সাজান—"

মধুস্রবা ওর এ কথার প্রথমে কিছু উত্তর দিলেন না, মীনাক্ষী ভেবেছিল হয় তো বা তিনি শুনতে পান নি, তাই পুনরায় কথাগুলো বললো সে। মধুস্রবা এবার বললেন—"তোমার তো এ সব কাজ করবার অভ্যেসও নেই—জানাও নেই, আমিই এগুলো ক'রে দি, তুমি তার চেয়ে ভোগের ঘরে দেখ তো ঝিগুলো তরকারী কুটছে কি না; আমি গিয়েই রাধারাণী কৃষ্ণজীর রান্না চড়িয়ে দেব—"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্না মেয়ে এই মীনাক্ষী, হাসিমুখে সে ওই স্থান পরিত্যাগ করলো। তবে প্রত্যাখ্যানের দুঃখ পেয়েছিল বই কি—

বেদনাকে তরল করতে রাত্রিবেলা স্বামীকে বলেছিল সে—"তোমাদের দেবতার কাছে আমি কিন্তু এখনও অশুচি হয়ে আছি জানো তো?"

আনুপূর্ব্বিক কথাগুলি শুনে মৃণাল একটু হেসে বললো—"ওটা মার মনের একটা সহজাত সংস্কার বুঝলে না, তুমি কত মুরগী খেয়েছ এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না যে; তাই না নবীন আর প্রবীণের মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীনের চিরকালের মত-বিরোধ; সন্দিগ্ধতার মধ্যেই ওদের পরস্পরের সন্ধি, তাই দ্বন্দ্ব তাদের অন্তহীন অনন্তকালের—"

মন্দির-প্রাঙ্গণ তখন উৎসব-সমারোহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। সমস্ত রাত্রিব্যাপী যাত্রাগান, কবি-সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছিল। কয়েকটি মুহূর্ত্ত থেমে সাদর স্নেহের সঙ্গে মৃণাল স্ত্রীর একখানি হাত ধরে বললো—"ছিঃ মিনু, আজকের দিনে অভিমান করতে নেই, মা তবে দুঃখ করবেন, চল যাই মন্দির থেকে একবার ঘুরে আসি—"

মীনাক্ষী আর আপত্তি করতে পারলো না, স্বামীর অনুসরণ করলো।

বেদনা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

যে কাজ হ'ল না করা তার ব্যর্থতার বেদনায়
যদি চিত্ত নিরাকুল রহে নিত্য, সেই দুঃখ তবে
একদিন হাতে ধরি পঙ্গুজনে কর্মক্ষেত্রে লবে,
অসাড় আড়ষ্ট অঙ্গে সেই ব্যথা নব-প্রেরণায়
দিবে আনি কর্ম-শক্তি নবোৎসাহ, নবীন যৌবন
জাগিবে জরার বক্ষে, নিদাঘের দাহময় খরা
আনে যথা আষাঢ়ের পুঞ্জ-মেঘে ঘন বরিষণ,
ঊষর উত্তপ্ত ভূমি হয় পুন শ্যামলা উর্বরা।

অভাব বেদনা মাঝে শক্তির অমোঘ বীজ রহে,
বক্ষে যে ধরে না ব্যথা বন্ধ্যা তার শক্তি প্রজননী।
শূন্য যবে আপনার দৈন্যময় রিক্ততায় দহে
সে অনলে টেনে আনে আশীর্ধারা বহ্নিনির্বাপনী
নীলকান্ত অন্তরীক্ষ পরিপূর্ণ করি মেঘ-জালে,
আপনি পর্জন্যদেব সহস্র আসারে সুধা ঢালে।

অভিবাদন

শ্রীঅমল দত্ত

এই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করো,
হাত তুলে ধরো!
ইতিহাস শূন্য গর্ভ হতে
পথে এসে দাঁড়াও অচেনা,
ভৌগলিক বৃত্তখানি কাঁধে
চিরদিন হয়ে আছো দেনা?
জয় করো ভয় করো যারে
ভয় করো জয়ের সে নামে
তোমার বামের পথ দক্ষিণে না থামে।

এই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করো
হাত তুলে ধরো!
অনেক কাঙাল
অনেক জঞ্জাল
হয়ে আছে জড়ো
তোমার পথের 'পরে
তোমার বুকের ঝড়ে
হিমালয় হতে বড়ো।
সমাজের কাঠামোটা নিয়ে ছিলে তুলি
সে হয়েছে ধূলি।

সেই ধূলিস্তূপ হতে
তুমি এসো ভাঙা পথে,
সূর্যের স্বাক্ষর থাক পেশীতে তোমার,
হে সুন্দর, হয়ে এসো পার!

এই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করো
হাত তুলে ধরো
বেঁধে আছো বুক যারা লাঙল ফলায়
বয়লারে কয়লা ঢেলায়,
মিলের সিটিতে
ক্রেণের খুঁটিতে,
ডেভির ল্যাম্পের শ্বাসে,
ঐশ্বরিক মহুয়া বিশ্বাসে!
জরাজীর্ণ অস্থিমজ্জা সার
সব শক্তি করো জড়ো
সব হাত হোক একাকার।

এই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করো
হাত তুলে ধরো।
অপবাদ অপমান নিন্দাগ্লানি
তোমার সঙীন,
তাই দিয়ে ইতিহাস হোক না রঙিন!
তুমি তার বড়ো।

আগামী কাল

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী

সেদিন কংকাল নাই
পৃথিবীর কোনোখানে প'ড়ে।
বুলেটের তীক্ষ্ণ শরে
বাতাস কাঁদে না কোথা মাঠে ও নগরে।
সুন্দরবনের ভয় কোনোখানে নাই ; যতদূর
চলে চোখ :
সিডেন, লণ্ডন, রোম, তাহিতি, হাওয়াই।
মৃতনাবিকের গন্ধে
বাতাস নয়ক' ভার এতটুকু আর :
ভারত, ভুমধ্যতীর অথবা টায়ার।
লাল, নীল রকমারি নোতুন তারায় বোনা
সেদিনের ধ্যানস্থ আকাশ—
অগুরু-চন্দন গন্ধ মৌসুমী বাতাস।
নিবিড় তৃপ্তির গানে,
সুরে সুরে মুখরিত ভুবন ও গগন :
সেদিন নিখিল জুড়ে ফুলের রঙন।
সেদিনের মানুষের দু'চোখের আগে—
দূর, দূর নক্ষত্রেরো অশ্রু-সিন্ধু জাগে।
মুছাতে সে সব চোখ
তাইত' সেদিন যাত্রা অসীমের বুকের ভিতোর—
রাখী নিয়ে বেদনার রঙীন সুতোর।
আজিকার লেলিহান ধ্বংসের শ্মশানে :
এই স্বপ্ন দেখে যাই
নিমীল নয়ানে।

শকুন

শামসুদ্দীন

উড়ে চলে শকুনের দল
পক্ষ মেলি দূর দূরান্তরে,
খুঁজে ফিরে আহারীয় সব
উর্দ্ধ্ব পথে দেশ দেশান্তরে।
পেলে শব ধরণীর পরে
আসে নেমে চকিতের সাথে,
সেটা ওর জন্মগত রীতি
বর্ষে নাক কেনে দোষ তাতে॥

আজি হেরি মানুষের দল
অহংকারে বিমানের রথে
ছুটে ফিরে ঝটিকার মত
মারি নর নিজ গৃহপথে।
এটা নহে জন্মগতরীতি,
মানুষ মারিবে মানুষেরে,
শকুন বলিব কারে আর
শকুন ত খায় নাক মেরে॥

রণমদ পিয়ে নর আজি
বুকে লয়ে মত্ততার কথা,
ভুলিয়াছে ধর্ম্মজ্ঞান, নীতি
ভুলিয়াছে মানুষের ব্যথা।
শকুন বেঁধেছে বাসা দেখি ;
ভাবিতেছি ঝড় আসে কবে,
ডানা ভেঙে ধরার ধুলায়,
লুটায়ে পড়িবে হাহা রবে॥

সঞ্চয়ন

(বিদেশী পত্রিকা হইতে)

মানুষ এবং মাকড়সা

[ডাঃ ডব্ল্যু, এস, ব্রিস্টো (Dr. W. S. Bristowe) লিখিত এই প্রবন্ধটি The Countryman নামক পত্রিকা থেকে সংকলিত। এই প্রবন্ধটিতে মাকড়সাকে ঘিরে যে-সব কুসংস্কার গ'ড়ে উঠেছে তারই আলোচনা করা হয়েছে।]

প্রাচীনত্বের কুয়াসায় তাদের জন্মকাহিনী মিলিয়ে যাবার পরও সভ্যদেশে অনেক কুসংস্কার বেঁচে আছে—এটা অনেক লোকের কাছেই অদ্ভুত ঠেকতে পারে। লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ উল্কি-অঙ্কনকারী (tattooist) আমাকে বলেছেন যে বহুবার তাঁকে যুবতী মেয়েদের পিঠে সৌভাগ্য-সূচক ছোট মাকড়সার চিত্র আঁকতে নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমি এমন একজন সিঁদেল চোরের সংস্পর্শে এসেছিলাম যার কপালে কয়েকটি ছোট মাকড়সার উল্কি ছিল; তার বিশ্বাস ছিল যে এর ফলে তার অনিশ্চিত ব্যবসায়ে সার্থকতা আসবে। মন্টে কার্লোতে একজন জুয়াড়ীর দেখা পেয়েছিলাম—তার কাছে অর্ধেক লাল এবং অর্ধেক কালো রঙের কাচের ঢাকনি-দেওয়া একটা বাক্সে একটা মাকড়সা ছিল; কোন রঙের উপর সে টাকা ধরবে সেটা ঠিক করার জন্য বাক্সের মধ্যে মাকড়াটিকে নাড়াচাড়া দেওয়া হ'ত। ব্রিটেনের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ অধিবাসী বিপদের আশঙ্কায় যদি সম্ভব হয়—মাকড়সা মারতে চাইবে না। আমাদের জীবনের উপর মাকড়সার প্রভাব আছে—এই ধরণের একটা ধারণা ইউরোপ, এশিয়া, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর আফ্রিকায়, পলিনেসিয়ায় এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচলিত আছে।

রেশম বুননে মাকড়সার দক্ষতার ফলে আদিম মানুষের মনে যে-সব পৌরাণিক কাহিনী এবং কুসংস্কার সৃষ্টি হয়েছিল, তার আলোচনা করা যাক্। একটি বহু-প্রচলিত কাহিনীতে দেখা যায় যে একজন পলাতক মাকড়সার জন্য অনুসরণকারীদের হাত থেকে বেঁচেছিল; তার লুকানোর জায়গার মুখে মাকড়সা জাল বোনায় মনে করা হয়েছিল যে সম্ভবত সে ভিতরে নেই। কর্ণওয়াল এবং বুলগেরিয়ায় বলা হয় যে শিশু যীশুখ্রীষ্ট এমনই ভাবে হেরডের হাত থেকে বেঁচেছিলেন। কর্নিস্ কাহিনীতে দেখা যায় যে ভোজন-পাত্রের (manger) মুখে মাকড়সা জাল বুনেছিল; বুলগেরিয়ার কাহিনীতে দেখা যায় যে-গুহায় যীশুকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার মুখে মাকড়সা জাল বুনেছিল। হিব্রুতে সলের হাত থেকে ডেভিডের পরিত্রাণ প্রসঙ্গে এই গল্প আছে। জাপানে দ্বাদশ শতাব্দীর বীর ইয়োরিতোমো বৃক্ষ-কোটরে লুকিয়ে থাকার সময় এমনই ঘটনা ঘটেছিল। গত শতাব্দীর একটি ব্রিটিশ ফৌজদারী মামলায় দেখা যায় যে একটা তালাবন্ধ ঘরে পলাতক হত্যাকারী লুকিয়েছিল—কিন্তু পুলিস সে তালা খোলে নি—কেন না চাবির গর্তে একটা মাকড়সার জাল দেখে তারা মনে করেছিল যে বহুদিন ধরে তালাটি ব্যবহার করা হয় নি। কিন্তু মাকড়সা একটি গোলাকার জাল একঘণ্টার কম সময়েই তৈরি করতে পারে।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে অ্যারাকনিকে চিরকাল সূতাকাটা এবং কাপড় বোনার অভিশাপ দেওয়া হয়েছিল এবং আমার মনে হয় এর থেকেই এই বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে যে কারও কাপড়ের উপর দিয়ে মাকড়সা দৌড়িয়ে গেলে—নতুন কাপড় বোনার সম্ভাবনা থাকে। ব্রিটেন (হেব্রাইড্‌স্ সমেত) এবং আয়ার্ল্যাণ্ড ছাড়াও উত্তর অ্যামেরিকা এবং ইউরোপের অনেক স্থানে এই কুসংস্কার প্রচলিত আছে। নতুন কাপড় থেকে উপহার, উপহার থেকে সম্পত্তি কিংবা অর্থ এবং অর্থ থেকে সাধারণ ভাবে সৌভাগ্য খুব দূরবর্তী নয়। এর স্বাভাবিক ফল হিসাবেই দেখা যায় যে মাকড়সাকে হত্যা করা নিজের মাথায় ঢিল ছোঁড়া কিংবা নিজের বাড়ী ধ্বংস করারই সামিল। সৌভাগ্যসূচক মাকড়সাকে সন্তুষ্ট করতে বাম কাঁধের উপর দিয়ে তাকে মৃদুভাবে ফেলে দিতে হয় কিংবা মাথার চারদিকে সুতোয় করে তাকে তিনবার নাচাতে হয় (হার্টস্, কেম্ব্রিজ এবং সাফোক্)।

কতকগুলো কুসংস্কার আবার মাকড়সার প্রকৃত গতির উপর নির্ভর করে। ইংল্যাণ্ডে সূত্র-সাহায্যে অবতরণ

নীল মাকড়সা আগতপ্রায় সম্পত্তি কিংবা উপহারের সূচক। চীনে দীর্ঘ সূত্রশেষে লম্বমান মাকড়সা দূরবর্তী কোন বন্ধুর আসন্ন আগমন সূচনা করে। জাপানে পা গুটিয়ে সূত্র থেকে লম্বমান মাকড়সা উপহারসহ কোন অতিথির আগমন সূচনা করে, কিন্তু মাকড়সার পা যদি ছড়ানো থাকে, তবে শূন্য হাতেই অতিথির আগমন হবে। যুক্তরাষ্ট্রে যদি সম্মুখে সরলরেখায় মাকড়সা নীচে নামে তবে কোন উপহার কিংবা সৌভাগ্যের আগমন সূচিত হয়—কিন্তু যদি বাঁ দিকে মাকড়সা নামে তবে সেটা কুলক্ষণ।

হল্যাণ্ড, সুইটজার্ল্যাণ্ডে এবং চীনে সকালে মাকড়সা দেখা যেমন মঙ্গলসূচক, সন্ধ্যায় মাকড়সা দেখা তেমনি অমঙ্গলসূচক; ফ্রান্স, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া এবং ইটালীতে আবার এর বিপরীতটা সত্যি।

শোনা যায় যে বল্কানের কোন দেশে নাকি তরুণীরা তাদের প্রেমপাত্রকে বশীভূত করার জন্য জীবন্ত মাকড়সাকে ফাঁপা মুখবন্ধ নল খাগড়ার মধ্যে আবদ্ধ করে তাদের শয়নগৃহের নির্জনতায় প্রার্থনা করে। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে ডেম অ্যালিস্ কাইটেলার নামক একজন ইংরেজ ডাইনীর বিচারকালে প্রকাশিত হয়েছিল যে সে নাকি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মাকড়সা চূর্ণ করে তার ঔষধ প্রস্তুত করত। ইংল্যাণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে যে গির্জা অভিমুখে গমনশীল বিবাহ-যাত্রী-দলের পথ যদি কোন মাকড়সা পার হয়, তবে সে বিবাহ সুখ-সমৃদ্ধ হয়। মিশরে দৈবের সৌভাগ্যকে ছেড়ে দেওয়া হয় না—কেন না বিবাহ-রাত্রে নবদম্পতির শয্যায় একটি মাকড়সা রেখে দেওয়া সেখানকার সাধারণ রীতি। চীনের কোন কোন অঞ্চলে মাকড়সার জালের আপাত-স্থায়ী অস্তিত্ব মাকড়সাকে দীর্ঘ জীবনের প্রতীক করেছে। সাংহাই অঞ্চলে বয়োবৃদ্ধ মাকড়সাগুলোকে তাদের জ্ঞানের জন্য পূজো করা হয়। আমি শুনেছি যে ব্রহ্মদেশে সাপুড়েদের এক হাতের চেটোয় মাকড়সার উল্কি পরানো থাকে; এই হাত দিয়ে তারা সাপকে ভয় দেখিয়ে মাথা নামাতে বাধ্য করে।

মাকড়সা আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে এই বিশ্বাসের কথা প্লিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এখনও পল্লীবাসী এবং নাবিকদের মধ্যে এ বিশ্বাস দেখা যায়। মাকড়সার উপর বৈদ্যুতিক আলোড়নের ফলাফল এখনও গবেষণা সাপেক্ষ। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হবার পরে পরেই যদি মাকড়সা জাল বুনতে সুরু করে কিংবা জালের মাঝামাঝি জায়গায় আসে, তবে ইংল্যাণ্ডে মনে করা হয় যে আবহাওয়ার উন্নতি হবে এবং আর বৃষ্টি হবে না। ঘাসের উপর মাকড়সার সূক্ষ্ম জাল দেখলে ইংল্যাণ্ড এবং মহাদেশের (ইউরোপের) কৃষকরা ভবিষ্যতে সুন্দর আবহাওয়ার প্রত্যাশা করে।

* * *

দুই শতাব্দী পূর্বে এবং সম্প্রতি আরও বেশী করে এ দেশে (ইংল্যাণ্ডে) বিভিন্ন রকমের ব্যাধির জন্য ঔষধে যথেষ্ট মাকড়সা ব্যবহার করা হ'ত। বিশেষভাবে জ্বরের চিকিৎসায় মাকড়সা এবং তার জালের খুব প্রসিদ্ধি আছে। ব্রিটেনে কাণের ব্যথা, আঁচিল, বাত, কোষ্ঠকাঠিন্য, পাণ্ডুরোগ, হুপিংকাশ, এবং দাঁতের যন্ত্রণার জন্যও মাকড়সার ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মাকড়সার কাহিনী বিষয়ে আমার কাছে বহু উদাহরণ সংগৃহীত আছে। ব্রিটেনের পল্লী অঞ্চলে এখনও কেটে গেলে ক্ষত স্থানে টেগেনারিয়া জাল (Tegenaria webs) প্রয়োগ করা হয়। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে জাল প্রয়োগের ফল সম্পূর্ণ যান্ত্রিক, কিন্তু যে এন্‌জাইমের (enzyme) আধিক্যের ফলে মাকড়সার দেহ থেকে জাল বেরুনো মাত্র কঠিন হয়ে যায়, টাটকা জাল প্রয়োগ করলে সেই এন্‌জাইমের সাহায্যে ক্ষতস্থানের রক্ত জমবার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে (ডাঃ বার্জেস্ বার্নেট্ আমাকে এ-কথা বলেছেন)।

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রে মাকড়সার রেশমকে ব্যবসায়-দ্রব্যে পরিণত করার জন্য অনেক ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। মোজা, দস্তনা, ওয়েস্টকোট্—শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি তৈরী করা হয়েছিল। হায়, রোমুরের (Reaumur) গণনানুসারে এক পাউণ্ড রেশম উৎপাদনের জন্য ৬৬৩৫৫২টি মাকড়সার প্রয়োজন। পরে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা 'নেফিলি' (Nephilae) নামক বড় মাকড়সা ব্যবহার করত। এই মাকড়সার উৎপাদন শক্তি আমাদের অ্যারানিয়া (Aranea) মাকড়সার চেয়ে

অনেক বেশী এবং জৌলুস ও দৃঢ়তার দিক থেকে এর সুতো গুটিপোকার রেশমের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু এদের প্রতিপালন, এদের কীট-পতঙ্গ সরবরাহ এবং পরস্পরের হাতথেকে এদের রক্ষা-সমস্যা শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল। বর্তমানে গবেষণাগারে এবং চিড়িয়াখানায় মাকড়সা এবং কীটপতঙ্গ প্রতিপালন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক বেড়ে গেছে; এখন হয়ত এই সব অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। বনেট দেখিয়েছেন যে একটি গুটিপোকার কাছ থেকে প্রাপ্ত ·১৯০ গ্র্যাম রেশমের সঙ্গে তুলনায় পাঁচটি নেফিলা (Nephila) মাকড়সার কাছ থেকে ·৩০৫ গ্র্যাম্ রেশম পাওয়া যায়।

দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, মাইকোমিটার (micometer), ক্যাথেটোমিটার (cathetometer) প্রভৃতি যন্ত্রপাতিতে সূক্ষ্ম বিভাগ-সৃষ্টির জন্য প্রায় এক শতাব্দীর বেশী দিন ধরে মাকড়সার সুতো ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বুর্গম্যান নামে ইন্‌স্ব্রুকের একটি পরিবার মাকড়সার রেশমের উপর সূক্ষ্ম চিত্রকলা অঙ্কিত করে জীবিকানির্বাহ করত। এর একটি চমৎকার উদাহরণ—ম্যাডোনা এবং শিশুর মূর্তি চেস্টার ক্যাথেড্রালে রক্ষিত আছে। কয়েক বছর আগে লয়ারবাসী একজন ফরাসী নাকি ৪ পাউণ্ডে একশ হিসাবে মাকড়সা বিক্রয় করত। মদের বোতলগুলোকে প্রাচীন প্রমাণ করার জন্য এই সব মাকড়সাকে মদের পাত্রাধারে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। অস্ট্রেলেসিয়ায় মাকড়সার জাল দিয়ে মাছ ধরার জাল তৈরী করা হয়।

আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে ঋতু বিশেষে বেক্স্-হিলের কাছে সাসেক্সের একটি মাঠে একর প্রতি বিশ লক্ষেরও অধিক মাকড়সা পাওয়া যায়। আমি দাবী করি যে পাখীরা যত কীট-পতঙ্গ খায়...তার চেয়ে অনেক বেশী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে মাকড়সারা এবং একমাত্র ইংল্যাণ্ড্ ও ওয়েল্‌সেই মাকড়সারা ২২০,০০০,০০০,০০০,০০০,র বেশী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করে।

আমি মানুষকেই কীট-পতঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রু বলে মনে করি। মানুষের কতকগুলো কাজ কয়েক প্রকারের কীট-পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি করতে সাহায্য যে না করে তা' নয়—তবে সাধারণত তার সজ্ঞান প্রচেষ্টা পিছনে না থাকলেও, তার জলসেচন এবং কৃষিকার্যসম্বন্ধীয় কাজ, তার যন্ত্রশিল্প এবং স্থাপত্যশিল্পের কাজ মোটামুটি কীটপতঙ্গদের সংখ্যা কমায়। তা ছাড়া যখনই সে মাঠে বেড়াতে যায়, তখনই অজ্ঞাতসারে সে পায়ে মাড়িয়ে অনেক সংখ্যক কীট-পতঙ্গকে ধ্বংস করে কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর সারা বছরে মোটর ট্রেণ এবং এরোপ্লেনের দ্বারা যে-সব কীট পতঙ্গ নিহত হয়—তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য—বোধ হয় পাখীরা যত কীটপতঙ্গ খায়—তার চেয়ে এই সংখ্যা বেশী। সজ্ঞানে আমি নিজে হাতে বছরে এক হাজারের অধিক কীট-পতঙ্গ হত্যা করি (মশা মাছি প্রভৃতি) এবং এটাকে যদি গড় হিসাবে ধরে নেওয়া যায় (অবশ্য এটা গড় নয়), তবে বছরে ব্রিটেনে হাতে-মারা কীট-পতঙ্গের মোট সংখ্যা হবে প্রায় ৪৫০০০,০০০,০০০। তার পর আমরা কীটপতঙ্গ ধ্বংসকারী ঔষধ দিয়েও অসংখ্য কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করি।

ব্রিটেনের অধিবাসীদের চারজনের মধ্যে এক জনের চোখেও যদি প্রতি বছরে একটি পোকা পড়ে, তবে শুধু এই উপায়ে নিহত কীটপতঙ্গের বার্ষিক সংখ্যা হয় ১০০০০০০০রও উপর। কার্যত আমার মনে হয় যে আমার চোখে বছরে অন্তত চব্বিশটি পোকা পড়ে।

—

রাশিয়ার খেলার মাঠ

[সোভিয়েট রাশিয়ায় খেলা-ধূলোর অভাবিত প্রসারের ফলে রুশদের দৈহিক স্বাস্থ্যের যে প্রচুর উন্নতি হয়েছে—সেইটাই বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদি একথা বলা যায় যে ওয়াটার্লু'র যুদ্ধ জয় প্রকৃতপক্ষে ইটনের খেলার মাঠেই সম্পাদিত হয়েছিল, তবে একথাও বলা চলে যে সোভিয়েট রাশিয়ার খেলার মাঠগুলোর জন্যই স্ট্যালিন-গ্রাডের যুদ্ধ-জয় সম্ভব হয়েছিল। Willy W. Meisl লিখিত বর্তমান প্রবন্ধটি World Digest নামক পত্রিকায় প্রকাশিত সার-সংগ্রহের অনুবাদ]

রুশদের দীর্ঘ-স্থায়ী বীরত্ব শুধু পরিপূর্ণ নৈতিক এবং দৈহিক উপযুক্ততা থেকেই আসা সম্ভব। এটা দৈব-

প্রেরিত কোন দানও নয়—কিংবা রুশ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নয়। এর পিছনে আছে জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত বহু বৎসরব্যাপী পরিকল্পনা এবং অক্লান্ত কর্ম-প্রচেষ্টা। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ওয়েলিংটনের উক্তি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করে বলতে পারবে; "সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৯২১ থেকে ১৯৪১এর মধ্যে যে ১০০০০ খেলার মাঠ এবং ৩৫০০ ব্যায়ামাগার নির্মাণ করেছিলেন, সেইখানেই যুদ্ধ জয় করা হয়েছিল।"

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দেশে খেলা-ধূলোকে জনপ্রিয় করবার মত ভীষণ কাজের সম্মুখীন হয়েছিলেন রাশিয়ার দৈহিক শিক্ষা-বিভাগ (The Supreme Council for Physical Education); খেলা-ধূলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ সংখ্যায় ১৭ কোটিরও অধিক একটা জাতিকে খেলা-ধূলো-সচেতন করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসে সর্বপ্রথম জারের রাশিয়া খেলা-ধূলোর জন্য নিযুক্ত একজন মন্ত্রী নিয়ে গর্ব অনুভব করত—তবু ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০০০০ সভ্য সমেত রাশিয়ায় ২৫০টির বেশী ক্লাব ছিল না।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দৈহিক শিক্ষাবিষয়ক প্রচার-কার্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু প্রচার-কার্যের সমর্থনে ছিল পরিকল্পনা এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টা। শীঘ্রই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট মস্কো, লেনিনগ্রাড, তিফলিস, মিনস্ক এবং কিয়েভে দৈহিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রতি বৎসর এই সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮০০ শিক্ষক চার বৎসরের পাঠ্য শেষ করে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে আসতেন। সংখ্যায় ২৮টি স্টেট্ স্কুলে পাঠকাল ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত; এ সব প্রতিষ্ঠানেও খেলা-ধূলোর শিক্ষকেরা শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে শুধু ট্রেড ইউনিয়ানগুলোরই ক্লাবের সংখ্যা হয়েছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সভ্যদের সমান—অর্থাৎ ত্রিশ হাজার ক্লাব; এদের সভ্য সংখ্যা হয়েছিল যাট লক্ষ; ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের শেষে যখন নয়টি খেলা-ধূলা বিষয়ক বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং একান্নটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সারা ইউনিয়নে খেলাধূলো বিস্তারের জন্য বছরে দশ হাজার পর্যন্ত শিক্ষক বেরিয়ে আসতেন, তখন ক্লাবগুলোর সভ্যসংখ্যা হয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ। ছয় হাজারেরও বেশী চিকিৎসক খেলাধূলোয় বিশেষজ্ঞ হয়েছিলেন এবং সোভিয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটিতে দৈহিক শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

ফ্যাক্টরীতে প্রচলিত সমাজ-তান্ত্রিক অনুকরণ এবং প্রতি-যোগিতার রীতি খেলার মাঠেও অবলম্বিত হয়েছিল। সখের জন্য খেলাধূলো করবার সময় ছিল না। চ্যাম্পিয়নরা ছুটি থেকে সুরু করে মোটর বাইসিক্ল, মোটর—এমন কি নগদ অর্থ পর্যন্ত পুরস্কার হিসেবে পেত। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের বসন্ত-কালে প্রসিদ্ধ বুকসাতারু বয়শেস্কো পৃথিবীতে যে বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন তার জন্য তাঁকে ৩০০০ রুবল্ পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল; তিনি বুক-সাঁতার দিয়ে ৬৫·৪ সেকেণ্ডে ১০০ মিটার অতিক্রম করেছিলেন—অর্থাৎ ৫৯ সেকেণ্ডে ১০০ গজ। এক-চতুর্থাংশ মাইলে মেশকভ্ হচ্ছেন পৃথিবীর সব চেয়ে দ্রুত-গতি বুক-সাঁতারু—২ মিনিট ১০·৩ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার (২১৮ গজ) অতিক্রম করে উশকভ ইউরোপে ফ্রী স্টাইল রেকর্ড্ স্থাপন করেছেন।

পথের এবং মাঠের খেলা, বক্সিং এবং ফুটবল—প্রকৃত পক্ষে স্কি-ইং থেকে লন্ টেনিস্ অবধি খেলাধূলার প্রত্যেক শাখাতেই এইরূপ দ্রুত উন্নতি দেখা গিয়েছিল। ১৪ ফুট ২ ইঞ্চি ডিঙিয়ে নিকোলাস্ অসলিন পোলভল্টে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। রাশিয়ার লক্ষ্য-বেদ্ধারা ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিযোগিতায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাতেন, বর্তমানে কঠোর বাস্তব-ক্ষেত্রেও তাঁরা সেইরূপ কৃতিত্ব দেখাচ্ছিলেন। কুস্তি এবং ভারোত্তলনের দিকে অসংখ্য রুশরা আকৃষ্ট হ'ত। অতীত রাশিয়ায় হ্যাকেস্মিডট, পডুব্নি, লুরিশ এবং অ্যাবার্গের মত বলবান লোক জন্মেছিলেন—বর্তমানের সোভিয়েট ব্যায়াম-বীররাও সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ভারোত্তলন বিষয়ে পৃথিবীর ৩৫টির মধ্যে ২৪টি রেকর্ডই তাঁরা ভঙ্গ করেছেন।

নারীদের খেলাধূলো বিষয়ে কর্তৃপক্ষ যে আগ্রহ দেখান সেটাও উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক ১লা মের উৎসবানুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ 'রাউণ্ড মস্কো' (Round Moscow) নামক

'রিলে রেসে' (Relay Race), প্রত্যেক দলে দশজন নারী এবং বিশ জন পুরুষ থাকে। সোভিয়েট ক্রীড়া-জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য নারীদের রেফারী হিসাবে শিক্ষা দান খুব সফল হয়েছে। স্কেটিংএ নরওয়েবাসী এবং অ্যামেরিকাবাসীদের যে রেকর্ড ছিল, নারী-স্কেটার ম্যারিয়া ইসাকোভা সে রেকর্ড ভঙ্গ করছেন। ছাত্রী ভেরা ফেডোরোভা প্যারাস্যুটে ১২৫০০ ফিট লাফিয়ে যে রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন পরে অন্যান্য মেয়ে সে রেকর্ড ভেঙেছে; বর্তমানে প্যারাস্যুট থেকে লম্ফপ্রদান একটি প্রিয় ক্রীড়াবিশেষ। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি-সম্পন্না বিমান-চালিকা ফার্টাশেড একজন যাত্রীসহ ৪০০ মাইল উড়ে গিয়ে পৃথিবীতে রেকর্ড স্থাপন করেছেন। বর্তমান যুদ্ধ সুরু হবার পূর্বে প্রায় দুই লক্ষ রুশ তরুণতরুণী বিমান চালনা এবং প্যারাস্যুটে লম্ফপ্রদান শিক্ষা করেছিল। লালফৌজ বর্তমানে এই সব তরুণতরুণীর মধ্য থেকে বিমান-চালক এবং বিমান চালনা বিষয়ে অন্যান্য সহকর্মী খুঁজে নিতে পারে।

সব চেয়ে জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে ব্রিটিশ ফুটবল খেলা এবং সোভিয়েট রাশিয়া তার ১৫ লক্ষ সুসংবদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় নিয়ে গর্ব বোধ করে। যুদ্ধ সুরু না হলে আর্সেনাল, গ্লাসগো রেঞ্জার্স্, কেল্টিক, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি এবং অন্যান্য ব্রিটিশ টিম সোভিয়েট ইউনিয়নে আমন্ত্রিত হ'ত। তারা আমাদের দেশের মতই বড় এবং আধুনিক স্ট্যাডিয়ামে খেলত। যুদ্ধ পূর্ব মস্কোতে ব্যতিক্রম হিসাবে নয়, সাধারণ নিয়মানুসারেই ষাট হাজারের অধিক দর্শকদের জনতা খেলার মাঠে ভিড় করত, কোন কোন খেলায় দর্শকদের সংখ্যা এক লক্ষ পর্যন্ত হত। সোভিয়েট ফুটবল লীগে ২৬টি ক্লাব খেলে। খেলাইলোর জন্য বিশেষ সাংবাদিক সঙ্ঘ আছে এবং 'ফ্যানে'র সংখ্যাও হবে কয়েক লক্ষ। ছয় বৎসর আগে প্রাগ্ এবং প্যারীতে ডিনামো (কিভ্) দেখিয়ে দিয়েছিল যে শ্রেষ্ঠ সোভিয়েট টিমগুলো মহাদেশের শ্রেষ্ঠ পেশাদার ক্লাবগুলোর সমকক্ষ। স্পার্টাক্ (মস্কো) সমগ্র ইউনিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ টিম বলে বিবেচিত হয়েছিল—তাদের লেফ্‌ট ব্যাক সোকোলভ্, তাদের ক্যাপ্টেন এবং সেণ্টার হাফ স্টারোস্টিন্ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট খেলোয়াড় সমগ্র দেশে সুপরিচিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ক্লাব এবং তাদের খেলোয়াড়রাও এমনি প্রসিদ্ধ ছিলেন—সোভিয়েট ফুটবলের অনুসারিগণ সর্বদা ব্রিটিশ লীগের উন্নতি এবং পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলত।

কিন্তু রুশরা চ্যাম্পিয়ান-পূজোর প্রশ্রয় দিত না; তারা প্রধানত জি, টি, ও (G. T. O.) রীতি অনুসারে জনগণের দৈহিক শিক্ষাবিধানের উপরই দৃষ্টি সংবদ্ধ রাখে; জি, টি, ও, ব্যাজ পেতে হ'লে প্রার্থীকে সাঁতার, দৌড়, লাফ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাঙ্গীন যোগ্যতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হয়। উপরন্তু তাকে নির্ভরযোগ্য লক্ষ্যবেদ্ধা হতে হবে, শারীর-স্থান, প্রাথমিক চিকিৎসা, রেফারীগিরি এবং সংগঠন সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকা দরকার। পুরুষ, নারী এবং ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে—এই জাতীয় পরীক্ষায় বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ৭০ লক্ষ এই জাতীয় যোগ্যতার ব্যাজ বিতরিত হয়েছে এবং লালফৌজের নিয়মিত সৈন্য ও সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৮৯ জনই এই জাতীয় ব্যাজ পরিধান করে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের ১০০০০ খেলার মাঠ এবং ৩৬০০ ড্রিল হাউস ও ক্লাব হাউসের অস্তিত্বের ফলে খেলা-ধূলো বিষয়ক ব্যবসায়েরও সম্প্রসারণ দরকার হয়েছিল। একটি উদাহরণ নেওয়া যাচ্ছে—১৯২৪ খৃস্টাব্দে ৭০০০ জোড়া স্কি-র উৎপাদন বেড়ে ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে দাঁড়িয়েছিল ২২ লক্ষে। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে সোভিয়েট বাজেটে এক কোটি রুব্‌ল নির্দিষ্ট হয়েছিল দৈহিক ব্যায়ামের উন্নতির জন্য; ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে এই অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছিল। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ জানতেন যে এটা হচ্ছে জনগণের অর্থের সদ্ব্যয়।

সোভিয়েট ক্রীড়াবৃত্তি কতটা গভীর প্রভাব বিস্তার করছে সেটা স্ট্যাখানেভিজ্‌মের কৃতকার্যতা থেকেই বোঝা যায়। খনি-শ্রমিক স্ট্যাখানোভ সঙ্ঘবদ্ধ কাজ এবং প্রতিযোগিতার বৃত্তি এখন ভালভাবে ব্যবহার করে-ছিলেন যে তাঁর উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি হয়েছিল। তাঁর নীতি এবং কৃতিত্ব সৎ নাগরিকত্বের প্রতীক্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরণের কাজ জগতের কাছে ছিল সম্পূর্ণ

তুন: ব্যবসায়ে বীর এবং চ্যাম্পিয়ন—উৎপাদন ক্ষেত্রে রকর্ড স্থাপয়িতা। সম্প্রতি যখন লণ্ডনে A Day in London নামক চিত্র দেখানো হয়েছিল, তখন বিস্ময়-মুগ্ধ একজন সমালোচক লিখেছিলেন: "যে-সব লোক একদিনে অনেক পেরেক, ইট কিংবা অনেক হন্দর কয়লার কাজ করে রেকর্ড স্থাপন করেছে, তাদের দেখতে পাওয়া খুবই দুঃখের বিষয়—তারা ইংল্যাণ্ডের ফুটবল খেলোয়াড় কিংবা হকি এবং যুক্তরাষ্ট্রের চলচ্চিত্র-তারকাদের মতই জাতীয় বীর বিশেষ।"

—

জনসাধারণের জন্য কলেজ

[অক্সফোর্ডের কর্পাস ক্রিস্টি কলেজের সভাপতি স্যার রিচার্ড লিভিংস্টোন বর্তমান প্রবন্ধে জনসাধারণের শিক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটি লণ্ডনের The spectator পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।]

(অপেক্ষাকৃত ভাল সময়ে) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর উপর দিয়ে বিমান-ভ্রমণ করলে দেখা যায় যে পল্লীবাসভবন কিংবা বোর্ডিং স্কুলের মত অনেক বড় বড় বাড়ী ছড়িয়ে আছে। কোথাও নেমে এ রকম একটি বাড়ী পরিদর্শন করতে গেলে দেখা যায় যে সেটি একটি কলেজ; সেখানে ষাট থেকে দুই-শ পর্যন্ত বয়স্ক লোক বাস ক'রে পড়াশুনা করে। ডেনমার্কে এই জাতীয় বেশীর ভাগ ছাত্রই কৃষক এবং গৃহস্থ এবং তাদের পাঠের বিশিষ্ট বিষয় ইতিহাস এবং সাহিত্য। সুইডেনের ছাত্রদের মধ্যে যন্ত্রশিল্পের শ্রমিক এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ের সভ্যরাও থাকে এবং পাঠ্য বিষয়েরমধ্যে থাকে বিদেশী ভাষা, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম, ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি। ডেনমার্কের ৩৫ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মোটামুটি এই প্রকার ষাটটি কলেজ আছে (১৯৩৯ খৃস্টাব্দে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬১৭৩); ফিনল্যাণ্ডের সমান সংখ্যক অধিবাসীর জন্য আছে ৫৩টি কলেজ; নরওয়েতে ত্রিশ লক্ষেরও কম অধিবাসীদের জন্য আছে ৩২টি কলেজ; সুইডেনে ষাট লক্ষ অধিবাসীদের জন্য আছে ৫৯টি কলেজ (১৯৩৬ খৃস্টাব্দে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০০)। যদি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করা যায় তবে দেখা যায় যে আমাদের চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের জন্য এরূপ নয়টি মাত্র কলেজ আছে; শান্তির সময় এই কলেজে নিয়মিত ছাত্রের সংখ্যা ৩০০র কিছু উপরে।

অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় আবাসিক জনশিক্ষা চালু জিনিস—দেশের জীবনের উপর তার গভীর প্রভাব; ইংল্যাণ্ডে কিন্তু তা নয়। এখানে কথায় না হোক্, কাজে আমাদের নীতি এই যে শিক্ষা ১৪, ১৬, ১৮, ২১ কিংবা যে বয়সে স্কুল অথবা কলেজ ত্যাগ করা হয়, সেই বয়সেই শেষ হয়ে যায়। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়রা কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করে কিংবা কাজ করে এবং তারা ঠিকই করে। কেন না প্রতি বৎসরই পৃথিবী আরও বেশী তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত হয় এবং নিজের কাজ ভাল ভাবে করার জন্য, বুদ্ধিমানের মত ভোট দেবার জন্য এবং জীবন-দৃশ্যের বুদ্ধিমান দর্শক হবার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পরিমাণও বেড়ে যায়। আমরা যখন ভাবা ও শেখা বন্ধ করি, তখন বুদ্ধিগত দিক থেকে আমাদের মৃত্যু হয়; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা কি করে এই মৃত্যুর হাত এড়াতে পারি? এ বিষয়ে মুক্তির একটি মাত্র পথ আছে: বয়স্ক-জীবনে নিয়মিত পড়াশুনার সুযোগ বিধান করতে হবে যাতে প্রত্যেকেই শিক্ষা-জীবনের অভাব এবং ক্ষতি পরিপূরণ করতে পারে, রাষ্ট্রনীতি, নীতিবিজ্ঞান, ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা করতে পারে—পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে। তার মানে হচ্ছে প্রত্যেক বয়স্ক লোকের জন্য শিক্ষাবিধান করা—যারা পূর্ণ শিক্ষা পায় নি তাদের জন্য এবং যারা পেয়েছে তাদের জন্যও।

এর আরও মনে হচ্ছে আবাসিক জনশিক্ষা বিধান। এ কথা বলার মানে অনাবাসিক শিক্ষার নিন্দা করা নয়। কিন্তু সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর অবসর সময়ে লেখাপড়ার প্রত্যক্ষ অসুবিধা আছে অনেক এবং নির্জন মনোরম পারিপার্শ্বিকে পড়াশুনায় সমগ্র সময় নিয়োজিত করার সমান প্রত্যক্ষ সুবিধা আছে।

যেখানে সম্ভব আমাদের আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। এটা কি স্বপ্ন? স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মত ইংল্যাণ্ডেও এই স্বপ্ন সার্থক না হবার কোন কারণ নেই।

এ বিষয়ে অসুবিধা কি ? প্রথম হচ্ছে ব্রিটেনে এই জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই। অবশ্য ইংল্যাণ্ডে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান না থাকার কোন হেতু নেই—ডেন্‌মার্ক এবং ফিনল্যাণ্ডে যেটা সম্ভব, এ দেশেও সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব এবং অনেক প্রকারে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বক্তৃতা দেবার একটা বিভাগ থাকে—এই বিভাগ থেকে জেলায় জেলায় ক্লাস এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এই কাজটিকে স্বাভাবিকভাবে সম্প্রসারিত করে কাছাকাছি একটা বড় বাড়ী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সেটিকে আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে; এ ব্যবস্থায় সে অঞ্চলকে নতুন ভাবে সেবা করা হবে—সে অঞ্চলের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যাবে। বিভিন্ন প্রকারের লোকের জন্য এগুলো হবে বিভিন্ন ধরণের —বুদ্ধিবৃত্তি এবং শিক্ষার ব্যবধানও থাকবে অনেক। স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও উচিত বয়স্কদের জন্য কলেজ স্থাপন করা। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকা উচিত। ডেনমার্কে সব কিংবা প্রায় সব, সুইডেনের অধিকাংশ জনসাধারণের উচ্চ বিদ্যালয় বে-সরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত—ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠী কিংবা সমিতি সেগুলো স্থাপন করে—সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করার অধিকার তাদের থাকে।

এ বিষয়ে দ্বিতীয় এবং আপাতদৃষ্টিতে বেশী ভয়ঙ্কর অসুবিধা এই যে এ ধরণের কলেজ যদি থাকতও, তবে খুব কম লোকই সে সব কলেজে অধ্যয়ন করার সময় পেত। এ বিষয়ে আমার এই উত্তর দেওয়ার লোভ হয় যে স্ক্যাণ্ডি-নেভীয়দের পক্ষে যেটা সম্ভব, ইংরেজদের পক্ষেও সেটা সম্ভব। কিন্তু বলা হবে যে কর্মব্যস্ত লোকেরা কি করে তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখবে (সুইডেনের নির্ধারিত পাঠ্যকাল) ? সুইডেনে এটা সম্ভব এই জন্য যে সেখানে ফার্মগুলো তাদের কর্মচারীদের নির্দিষ্ট কালের জন্য ছুটি দিয়ে তাদের জন্য কাজ রেখে দেয়। এদেশের বেসরকারী ফার্মগুলোর এবং স্টেট ও মিউনিসিপ্যালিটির এই রীতি অনুসরণ না করার কোন হেতু নেই। আদর্শগত কারণ ছেড়ে দিলেও, তাদের কর্মচারীরা যে বুদ্ধি-দীপ্ত হয়ে ফিরে আসবে—এই ত তাদের যথেষ্ট লাভ। সরকারী কর্মচারীরা যাতে হোয়াইট হল থেকে পড়াশুনার জন্য মুক্তি পেতে পারে, সে উদ্দেশ্যে স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেখে মনে হয় যে সরকার এই প্রয়োজন সম্বন্ধে সজাগ। দীর্ঘ পাঠ্যতালিকা অসুবিধাজনক হলেও, ক্ষুদ্র পাঠ্যতালিকা ত অসুবিধাজনক নয়। মাঝে মাঝে সমুদ্র তীরে কোন আবাসিক কলেজে, মহাদেশে (ইউরোপে), ব্ল্যাকপুলে কিংবা মিঃ বাট্‌লিনের ক্যাম্পে জাতীয় ছুটির দিন কাটান যেতে পারে।

বলা হবে যে এ ধরণের কলেজের চাহিদা নেই, এ রকম আবাসিক কলেজ স্থাপিত হলে কেউ সে কলেজে যাবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে পরিণত বয়সে লোকেরা চিন্তা করবার এবং জ্ঞানার্জন করবার সুযোগ চায়। * * *

স্কুলের বয়স বাড়ানো এবং আঠার বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক আংশিক শিক্ষাবিধান যুক্তিসঙ্গতভাবেই জন-শিক্ষার প্রসার সৃষ্টি করবে এবং জনশিক্ষার চাহিদা ও এর দ্বারা লাভবান্ হবার শক্তিও বৃদ্ধি কর , প্রয়োজন শুধু জন-শিক্ষার সুবিধা বিধান এবং আরও বেশী প্রয়োজন হচ্ছে সে সব সুবিধা আছে এই জ্ঞান। শ্রমশিল্প-উৎপাদিত বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার এই সাধারণ মিল আছে—একে ব্যবহারের দৃষ্টিপথে আনতে হবে। প্রচারকার্য প্রয়োজনীয়।

দেশী পত্রিকা হইতে

শ্রীঅরবিন্দ ও বৈজ্ঞানিক জড়বাদ

[হাওড়ার দ্বৈমাসিক সাহিত্য-পত্রিকা 'অভিবাদনে'র ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি সংকলিত। শ্রীঅরবিন্দ প্রবর্তিত দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়]

জড় প্রকৃতি, জীবন আর মন, এই তিনটি বিষয় নিয়েই দার্শনিকদের যত কসরৎ। এ ত্রয়ীর একটি না একটিকে নিয়ে মোটামুটি ভাবে এ পর্যন্ত তিনটি স্রোতে দার্শনিক চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের অবিরাম চর্চায় য়ুরোপ জড়বাদী দর্শনের ক্ষেত্রেই কেবল

অগ্রসর হয়ে পড়েনি, জীবনবাদী আর ভাববাদী দর্শনেও বিজ্ঞানের ছোঁওয়া লাগিয়ে নিয়েছে। তার মানে হল এই, ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল জ্ঞান নিয়ে যখনই ক্রমোন্নত বিজ্ঞান দর্শনকে প্রশ্ন করতে চেয়েছে—আত্মরক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে তখনই দর্শন বৈজ্ঞানিক যুক্তি খণ্ডন করবার জন্যে কতগুলো বিতর্ক নিজ দেহে সঞ্চয় না করে থাকতে পারে নি—আর তাতেই য়ুরোপীয় জীবনবাদী আর ভাববাদী দর্শনের চেহারাগুলো আধা-বৈজ্ঞানিক আধা-কাল্পনিক বনে গেছে। অবশ্য বিজ্ঞানের আবির্ভাবের আগেও যে য়ুরোপের অজড়বাদী দর্শনগুলোর চেহারা খুব সুস্থ ও সম্পূর্ণ ছিল তা নয়। স্পিনোজাকে ছেড়ে দিলে ভাববাদী দর্শনের কোন সার্থক ভঙ্গীই য়ুরোপে দেখা যায় না—এমন কি বহু প্রশংসিত গ্রীক্ দর্শনেও না। বিজ্ঞানের কোন প্রবল সংঘর্ষের সম্মুখীন না হয়েও ভারতবর্ষ দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে অসাধারণ অগ্রগতি দেখিয়েছে তা য়ুরোপের ধারণার বাইরে। জড় প্রকৃতি, জীবন আর মনের সমন্বয় সাধন করে মানুষের চিন্তাশক্তি যে কতটুকু বিস্ফারিত হতে পারে ভারতীয় বেদান্তের সূত্রগুলো তার প্রমাণ। অবশ্য ভারতীয় দর্শনে ধর্মপ্রাণতার ছোঁওয়া আছে—পৃথিবী ছাড়িয়ে যখন ভাববাদের উড্ডীনতা, তখন যে আকাশচারী ধর্মবাদ তার দোসর হবে তাতে নিন্দার কিছু নেই। সব চেয়ে আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে আধ্যাত্মিকতায় অভিষিক্ত ভারতীয় মন ভাববাদী দর্শনের রাজ্য থেকে জড় প্রকৃতিকে নির্বাসন দেয় নি। অথচ প্রাক্‌হেগেলীয় য়ুরোপ ভাবরাজ্যে জড়প্রকৃতির অস্তিত্বকে কিছুতেই ঠাঁই করে দিতে চায় নি। এমন কি মানুষের চেতনা-নিরপেক্ষ হয়ে যে জড়প্রকৃতি নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে টিঁকে আছে তা-ও তা মান্‌তে রাজী ছিল না।

গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রতিক্রিয়ায় ভাবাবাদীয় দর্শন যে ভাবে আত্মরক্ষা করেছিল হেগেল তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ডারউইনের প্রাকৃতিক বিবর্তনের মতবাদকে রোধ করবার জন্যেই হয়ত একটি পরম মনের (Absolute Mind) বিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন হেগেল। কিন্তু ভাববাদী দর্শনের আঁটঘাট বাঁধতে গিয়ে তিনি জন্ম দিলেন বৈজ্ঞানিক জড়বাদের। হেগেলের বামপন্থী শিষ্য কার্ল মার্ক্স হেগেলেরই সূত্র ধরে প্রাকৃতিক জড়বাদকে বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের রূপ দিয়ে ভাববাদী দর্শনের পথে চিরদিনের মত পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা সৃষ্টি করে তুললেন। তাতে অবশ্য ভাববাদের পথ খোঁজা শেষ হল না। হেগেলের 'মন'কে নেতি' বলে শোপেনহাওয়ার ভারতীয় উপনিষদের আশ্রয়ে যে মতবাদ তৈরী করলেন তাতে ইচ্ছাশক্তিই (Will) জগৎসৃষ্টির মূল হয়ে দাঁড়াল। বের্গসঁ দাঁড়ালেন প্রাণশক্তির (Elan vital) পতাকা হাতে। এই প্রাণশক্তির স্রোতে এবং আজ্ঞায়ই নাকি মানুষের উর্দ্ধ গমন হয়। নীটসে বললেন সব মানুষের উর্দ্ধ গমন হয় না—বিবর্তনে তৈরী হবে অতিমানুষ (Superman)। তাছাড়া আত্মিক ভাববাদেরও (Subjective Idealism) আবার একটি দল তৈরী হল: তাঁদের বলা যায় অনেকটা মায়াবাদী: জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ইন্দ্রিয়-লব্ধ ধারণা সম্বন্ধে তাঁরা সন্দিহান। বিশপ বার্কলির এই দলে বার্ট্রাণ্ড রাসেলও ভিড়ে যেতে আপত্তি করেন নি—তা ছাড়া এ যুগের দর্শনান্ধ (অবশ্য ভাববাদী দর্শন) কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, এডিংটন-হোয়াইটহেড সম্প্রদায়ও এই দলেরই লোক।

কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে দলে পেয়েও ভাববাদী দর্শন আর আগেকার মত আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। মার্ক্সীয় জড়বাদী দর্শন ক্রমেই জনমন আকর্ষণ করে চলেছে। কে বলবে, ধনতন্ত্রে যেমন সহজাত বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, তেম্নি ভাববাদী দর্শনের বিভিন্ন শাখা পরস্পর বিরোধাত্মক বলেই হয়ত তাঁদের আর আশানুরূপ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না; ভাববাদী দর্শনের সমর্থক যে কোন শিক্ষিত মনই এ ধরণের চিন্তা করতে পারে। আর এ মতবাদের যে কোন দার্শনিক প্রতিভার কাজ হবে এ বিরোধ অবসান করে ভাববাদী দর্শনের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় সাধন করা। শ্রীঅরবিন্দ তা-ই করেছেন।

বহুর একত্ব সাধন শ্রীঅরবিন্দের পক্ষে কষ্টকর নয়: তিনি উপনিষদেরই দেশের মানুষ। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ জড়প্রকৃতিকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক মন এই

জড়বাদকে বর্জন করতে চায় না: শ্রীঅরবিন্দ প্রকৃতিকে বাদ দিলেন না, সাংখ্য প্রকৃতিকে বাদ দেয় নি। বৈজ্ঞানিক জড়বাদীদের মূল সূত্র তিনি সমর্থন করে লিখেন: "The material wrold existed before man was upon the earth."—"মানুষের জন্মের আগেও জড়প্রকৃতির অস্তিত্ব ছিল।" সৎ, চিৎ, আনন্দ—Existence, Consciousness, Delight—সচ্চিদানন্দই হ'ল বিশ্ব-সৃষ্টির মূলাধার। শক্তি হিসেবে ইচ্ছা, মন, প্রাণ সব কিছুই সচ্চিদানন্দের বিভূতি হিসেবে বিশ্লেষণ করা যায়। সেই অদ্বৈত, সৎ, সচেতন সত্তা নিম্নগামী বিবর্তনে বহুধা প্রকাশিত হয়েছেন, জড়রূপ হচ্ছে সেই বিবর্তনের সর্বশেষ স্তর। সেই জড়রূপ থেকে উর্ধ্ব বিবর্তনে অনসুবেদ্য মন ক্রমে অতিমনের (supermind) আশ্রয়ে সচ্চিদানন্দের আলোক প্রাপ্ত হয়। হেগেলীয় বিবর্তন ধর্মকে শ্রীঅরবিন্দ উপেক্ষা করেন নি—তবে হেগেলীয় 'মন' নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট নন। জগৎ পরম মনের পরিকল্পনা হেগেলীয় এই ধারণা থেকে আর একটু দূরে শ্রীঅরবিন্দ এগিয়ে গেছেন। তিনি বলেন: "জগৎ এমন একটি সত্তার সচেতন জন্ম নেওয়া, মনের বাইরে যার অবস্থান।" তার পর বিবর্তনে যে নীটশের অতিমানব-ধরণের কিছু আবির্ভূত হবে তা-ও তিনি অস্বীকার করেন না। তবে শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব নীট্‌শের অতিমানবের মতই ততটা জাগতিক নয়, খানিকটা অলৌকিক—Supramental Being—অতি-মানসিক সত্তা; জীবন হবে তাঁর ঐশ্বরিক, মনের ব্যবহার ঐশ্বরিক। শ্রীঅরবিন্দ-পরিকল্পিত অতি মানসিক অবস্থা উপনিষদ-কল্পিত জীবন-সীমান্তের অনুরূপ নয়। হিন্দু দর্শনের বিদেহ-কৈবল্যে বা বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণে এসে তা উপস্থিত হয় নি। স্থাণু অবস্থাকে অস্বীকার করে যাবার শক্তি তার আছে। নির্বাণ বা বিদেহ কৈবল্য ভিন্ন আর একটি পথ আবিষ্কার শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব। এ আবিষ্কারকে তিনি অভিজ্ঞতার দান বলে অভিহিত করেন। আমরা মনে করতে পারি এ আধ্যাত্মিক অনুভূতি চেতনা বা মনেরই দুঃসাহসিক অভিযানের ফল। এখানে শ্রীঅরবিন্দ যোগী। অবশ্য যে দার্শনিক চিন্তা, মন, ইচ্ছা, ভাব, চেতনা প্রভৃতি বিমূর্ত্ত সত্তার উপর নির্ভরশীল——ধর্মের পথ অনুসরণ না করলে তার পথ চলা শেষ হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক বিচারের এখানে স্থান নেই—স্থান আছে বিশ্বাসের। ভাবমূলক দর্শনকে যে শ্রীঅরবিন্দ অন্বয়মুখী করে একটি পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। বিভিন্ন ধরণের ভাববাদী দর্শন হয়ত শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে সান্ত্বনা খুঁজে পাবে—কিন্তু বৈজ্ঞানিক জড়বাদ কি তাঁর 'দিব্য জীবনে'র আশ্বাসে খুসী থাকবে? দিব্য জীবনের প্রভাবে মানবের মুক্তির ছবি জড়বাদের বৈজ্ঞানিক চোখে ছায়া ফেলতে পারে না।

কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ মনে করেছেন বৈজ্ঞানিক জড়বাদ বুঝি এবার পরাভূত হ'ল। তিনি বলছেন জড়বাদের গোঁড়ামি ক্রমোন্নত জ্ঞানের কাছে নাকি আর টিঁকছে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-জগতে চেতনার আবিষ্কার করে ফেলেছেন! (যদিও বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় কিনা সন্দেহ।) কাজেই জড়জগতেও চেতনা উপস্থিত থাকতে বাধ্য। হোক না তা উপলব্ধি করা অসাধ্য তবু তা আছে। শ্রীঅরবিন্দের যুক্তিটা অনেকটা এ রকম: মানুষে চেতনা আছে—উদ্ভিদ-জগতে জগদীশচন্দ্র চেতনা আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন, কাজেই উদ্ভিদ-জগতের চেতনা আছে—প্রকৃতিতে বাকী থাকে আর জড়পদার্থ—তাতে কেন চেতনা থাকবে না?—হঠাৎ প্রকৃতি[illegible] এমন একটি ফাঁক পড়ে থাকবে? ক, খ, যদি [illegible] খায়, গ ভাত খাবে না কেন?—কেন সবাই একতা রক্ষা করবে না?

"Thought has a right to suppose a unity where that unity is confessed by all other classes of phenomena. . . . And if we suppose the unity to be unbroken, we then arrive at the existence of consciousness in all forms of the force which is at work in the world."

জড়জগতে চেতনার প্রমাণের জন্য আমাদের চিন্তা-শক্তিকে এবং নিজেকেও কতগুলো ব্যাপার suppose করতে হবে। এম্নি যদি ধরে নিতে হয় তবে উদ্ভিদের বেলায় একজন বৈজ্ঞানিককে ডেকে আন্‌বার কি দরকার? হিন্দুশাস্ত্রোক্ত উদ্ভিদের প্রাণের কথা বিশ্বাস না করলেও আমরা ত তা ধরে নিতে পারতাম। এই ধরে নেওয়ার

ব্যাপারে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই খুসী হতে পারেন নি, তাই বলছেন :

"Even if there be no conscient or super-conscient 'Purusha' inhabiting all forms, yet is there in those forms a conscious force of being . . . ."

জড়প্রকৃতিতে চেতনা আবিষ্কার করতে গিয়ে এবার তাঁকে চেতনার অর্থও পাল্টাতে হ'ল। এখানে চেতনাকে মনের সঙ্গে যুক্ত যেন কেউ না ভাবে, এখানে চেতনা অস্তিত্বের আত্ম-সচেতন শক্তি। চেতনাকে শক্তি বা এনার্জ্জি বলে (ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন এনার্জ্জিও জড় ধর্ম পালন করে চলে) বর্ণনা করে শ্রীঅরবিন্দ খানিকটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং বলতে বাধ্য হচ্ছেন :

"Essentially, we arrive at that unity which materialist science perceives from other end when it asserts that mind can not be another force than matter, but must be merely development and ohtcome of material energy."

সত্যি, বৈজ্ঞানিক জড়বাদ তাই মনে করে : মনে করে মন জড়বস্তুর একটা গুণশক্তি, যকৃত যেমন পিত্তরস পরিবেশন করে তেমনি মগজ চিন্তা ও মনন বিকীরণ করে : চেতনার দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত নয়, জীবনই চেতনার নিয়ামক। দেহ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক জড়বাদের এসব অভ্রান্ত ধারণাকে সমর্থন করেই চলে।

তবু জড় প্রকৃতিতে সত্তার একটা সচেতন শক্তি প্রমাণ করবার জন্য শ্রীঅরবিন্দ শেষটায় বলেছেন : "কোন বস্তুর বিবর্তন মান্‌তে গেলে বিবর্তনের ফলটা বস্তুগত ছিল মনে করতে হবে।"

"Nothing can evolve out of matter which is not therein already contained. . . . Man's consciousness can be nothing else than a form of Nature's consciousness."

একথা বলে বৈজ্ঞানিক জড়বাদের যুক্তি যে তিনি কি ভাবে খণ্ডন করলেন বোঝা গেল না। বৈজ্ঞানিক জড়বাদ-বলে বস্তুর বিবর্তন হয়ে চলে নূতন নূতন গুণ উদ্ভব করে, সে-গুণ বিবর্তনের আগে বস্তুর দেহে থাকে না। যেমন হাইড্রোজেন অক্সিজেনে জল হয়, বস্তুগত ভাবে জলে হাইড্রোজেন্ অক্সিজেন্ পাওয়া যাবে, কিন্তু হাইড্রোজেন্ অক্সিজেনে জলের জলীয়তা পাওয়া যাবে না। হাইড্রোজেন্ অক্সিজেনের বিবর্তনে জলীয়তা নামে একটি নতুন গুণের উদ্ভব হল। ঠিক তেম্নি জড়ের বিবর্তনে প্রাণ-শক্তি, মনন-শক্তি, চেতনা গুণ হিসেবে উদ্ভূত হয়েছে, বিবর্তনের পূর্বে জড়দেহে যাদের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলবেন, অস্তিত্ব আছে, তা' আমাদের পার্থিব জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর। আমরা প্রকৃতিকে ঠিকমত বুঝতে পারিনে বলেই এরকম বলে থাকি।

বৈজ্ঞানিক বিচারকে ত্যাগ করে শেষটায় যদি শ্রীঅরবিন্দ একথাই বলবেন, অজ্ঞানতার দোহাই পেড়ে ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা বিশ্বাসের আশ্রয়ই নেবেন, তাহলে আর দার্শনিক চিন্তাধারা দিয়ে তাঁর গ্রন্থ রচনার কি প্রয়োজন ? ভারতবর্ষের বহু সাধক সন্ন্যাসী এই উপলব্ধি আর বিশ্বাসের কথা বলে গেছেন, কিন্তু পৃথিবীর ধর্ম সে সব কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, ভারতবর্ষের মনও সেই বিশ্বাসে আবদ্ধ হয় নি ; তাই তাঁরা আজ বিস্মৃত। সেই বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করবার অধিকার অবশ্য যে কোন মানুষেরই আছে—কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিষয়কে খণ্ডন করতে খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা ন্যায়-দর্শন, খানিকটা ব্যক্তিগত উপলব্ধি দিয়ে গ্রন্থ রচনার কোন প্রয়োজন আছে কি ? আর কারু কাছে তার প্রয়োজন থাকলেও যে বৈজ্ঞানিক জড়বাদীর কাছে অবাস্তব—একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য)

পুস্তক-পরিচয়

ভবিষ্যতের বাঙালী—এস্, ওয়াজেদ আলি। প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস্, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

কবি এবং প্রবন্ধ লেখক হিসাবে মি: এস্, ওয়াজেদ আলির প্রচুর সুখ্যাতি আছে। আলোচ্য প্রবন্ধ পুস্তকেও তিনি তাঁর স্বাভাবিক চিন্তাশীলতা, প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি ব্যাপক জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়েছেন দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। ভবিষ্যতের বাঙালী, রাষ্ট্রের রূপ, রাষ্ট্র ও নাগরিক, হিন্দু-মুসলমান, ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য প্রেমের ধর্ম এবং জাতীয় জাগরণ—এই সাতটি প্রবন্ধ বর্তমান গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। প্রবন্ধ সাতটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্নতা থাকলেও, এগুলোর মধ্যে গভীর অন্তর্সংযোগ রয়ে গেছে। সব কয়টি প্রবন্ধেরই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ভবিষ্যতের বাঙলা দেশ, বাঙালী জাতি এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়।

ভবিষ্যতের বাঙালীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে মি: ওয়াজেদ আলি গভীর স্বাজাত্যবোধ এবং বলিষ্ঠ আশা-বাদী মনের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমানে বাঙলা দেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে যে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাবল্য চলছে, তার মধ্যে বসে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে অক্ষুণ্ণ রেখে বলিষ্ঠ মননশীলতা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকানো নি:সন্দেহে আশার কথা। তিনি হিন্দু মহাসভা কিংবা মুসলিম লীগ প্রবর্তিত দুই জাতি-তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন যে অন্যান্য সভ্য দেশের মত ভবিষ্যতে বাঙলা তথা ভারতবর্ষে ধর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ বিবর্জিত এমন রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবে তার মূল ভিত্তি হবে গভীর স্বদেশ-প্রীতি। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ধর্ম-বিভেদের কোন প্রশ্নই উঠবে না। তাই তিনি বলেছেন: "নবীন আরবী অথবা নব্য তুর্কীর মত প্রকৃতির লীলানিকেতন এই সৌভাগ্যসম্পদ্‌শালিনী বাংলা দেশে বাঙালীর জীবনেই বা আদর্শ অখণ্ড জাতীয়তা সম্ভব হবে না কেন? এ সম্ভাব্যের প্রচুর উপকরণ বাঙালীর প্রকৃতিতে এবং বাংলার আকাশে-বাতাসে, নদী-নালায়, পথে-প্রান্তরে ও শ্যামলিমায় বর্তমান।" আলোচ্য প্রবন্ধ-গুলোতে মি: ওয়াজেদ আলি এই সব বিভিন্ন উপকরণ নিয়েই আলোচনা করেছেন।

তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষে বিশ্বাস করেন বটে—তবে তাঁর ভবিষ্যতের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবে বিভিন্ন প্রদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে। এই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করতে হলে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে ভুলে যেতে হবে ধর্ম-রাষ্ট্রের আদর্শ: রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে জাতীয়তার আদর্শে। লেখক আধুনিক ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন সভ্যদেশের সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের উদাহরণ উধৃত করে তাঁর এই যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গড়ে তুললে যে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধের বীজ বর্তমান থাকে—তিনি বেশ জোরের সঙ্গেই একথা বলেছেন। এই প্রবন্ধ-পুস্তকের অন্তর্গত হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধটি নানা কারণেই বিশেষভাবে উল্লেখ[illegible]। এই প্রবন্ধে শুধু যে লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় তা নয়—এর মধ্যে পাওয়া যায় তাঁর গভীর দেশ-প্রীতির পরিচয়। তিনি তাঁর মাতৃভূমি বাংলাকে ভালবাসেন বলেই উদাত্ত কণ্ঠে বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে বিভেদ ভুলে স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পরিচয় দিতে আহ্বান করেছেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ যতদিন আমাদের সমাজ-জীবনকে ছেয়ে থাকবে, ততদিন বঙ্গ-জননীর মুক্তি নেই। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দূরীকরণের ক্ষমতা যে অনেকটা ভবিষ্যতের তরুণ বাঙালী সাহিত্যিক এবং কবিদের হাতে সে বিষয়ে লেখকের কোন সন্দেহ নেই। তাই তিনি বর্তমান এবং

আগামী যুগের সাহিত্যিকদের তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়েছেন।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে স্বীকার করতেই হয় যে এ 'ভবিষ্যতের বাঙালী' একখানি উল্লেখযোগ্য পুস্তক। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক বাঙালীরই বর্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করা উচিত। লেখক স্বয়ং আদর্শ-বাদী—জাতীয়তার স্বপ্নে বিভোর। তাই তাঁর অনেক যুক্তি বিশ্লেষণ করলে হয়ত অবাস্তবতার স্পর্শ পাওয়া যাবে। তার কারণ যে অর্থনীতি আধুনিক সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ তার প্রতি তিনি যথেষ্ট সুবিচার করেছেন বলে মনে হয় না। তবু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে মিঃ এস, ওয়াজেদ আলির 'ভবিষ্যতের বাঙালী' বাঙালী জাতিকে তাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবন সম্বন্ধে নতুন ভাবনার খোরাক যোগাবে। লেখকের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও অহেতুক ভাষার মার প্যাচ নেই—তিনি যা বলতে চেয়েছেন সেটা সহজ, সরল বাংলা ভাষায় গল্পের মতই সুখপাঠ্য করে বলতে পেরেছেন। এটা খুব কম কৃতিত্বের কথা নয়।

গোপাল ভৌমিক

ক্ষত্রিয় গোপ জাতির নব-জাগরণ—পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। মূল্য ।/০

ভারতভূমি ধর্মের লীলাক্ষেত্র। একমাত্র ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে যত আলাপ-আলোচনা, বাদ-বিতণ্ডা, সেই প্রাচীন-কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে হয়ে আসছে, এমন আর কোন দেশে হয় নি। আজও অনেক অন্ধমোহ ও বিশ্বাস দূর করতে ধর্মের কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। আলোচ্য পুস্তকখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমরা প্রীত হলুম। একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের যথার্থ পরিচয় দিতে লেখক নানা যুক্তি প্রমাণসহ কঠোর উক্তির ভিতর একদিকে যেমন যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি বক্তব্য বিষয়টিকে সাধারণের সমক্ষে যথাযথরূপে উপস্থাপিত করতেও সমর্থ হয়েছেন। লেখক গোপ জাতির আনু-পূর্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, 'গোপজাতি যদুবংশ সম্ভূত ও ক্ষত্রিয়।' হিন্দুসমাজে চাতুর্বর্ণ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘভাষণ করেছেন। হিন্দুজাতির বর্তমান অবনতির কারণ নির্দেশ করে তার প্রতিকারের উপায় দেখাতেও তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু লেখকের কতকগুলি মতামত মোটেই ঐতিহাসিক প্রমাণগ্রাহ্য নয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণজাতি সম্বন্ধে তাঁর বক্রোক্তি প্রামাণ্য যুক্তিসহ লিখিত হওয়াই অধিকতর সমীচীন ছিল। যাহা হোক এই পুস্তকখানিতে লেখকের একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। ভাষা সাবলীল ও প্রচারকার্যের উপযোগী। ছাপা ও বাঁধাই চলনসই।

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের অচল অবস্থা

গত ৯ই আগষ্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্তারের এক বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই এক বৎসরে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার যদি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে তাহা ভালর দিকে যে হয় নাই, তাহা সম্প্রতি প্রচারিত বিলাতের প্রতিনিধিস্থানীয় একশত নরনারীর আবেদন-পত্রেও স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত আবেদন-পত্রে বলা হইয়াছে: "অচল অবস্থার অবসান না হওয়ার ফলে দেখা দিয়াছে অবিশ্বাস ও হতাশা। এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকিলে ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্প্রীতি স্থাপনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে।" এই আবেদনে যাঁহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বার্শ্মিংহামের বিশপ, ব্রাডফোর্ডের বিশপ, ক্যাণ্টারবেরীর ডিন, ওয়েষ্ট-মিনষ্টারের আর্চ্চডিকন, অধ্যাপক জোয়াড, অধ্যাপক ল্যাস্কি এবং পার্লামেণ্টের কতিপয় সদস্যও আছেন। এই আবেদন মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ আমেরী, লর্ড লিনলিথগো এবং ভাইকাউণ্ট ওয়াভেলের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে।

গত এক বৎসরের মধ্যে নানা দিক দিয়াই সমগ্র ভারতে একটা ব্যর্থতার মনোভাব সৃষ্ট হওয়ার কারণ ঘটিয়াছে। দেশে অন্নাভাব ক্রমশঃ অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থা আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। কিন্তু প্রতিকারের জন্য কি চেষ্টা করা হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ ফল কিছুই অনুভবযোগ্য হইতেছে না। ভারত-সচিব মিঃ আমেরী ভারতের অন্নাভাব সম্বন্ধে যেন একটা আত্মসন্তুষ্টির ভাব প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, পারিবারিক আয় বেশী হওয়ায় কৃষকরা বেশী করিয়া খাইতেছে, বিত্তবান্ কৃষকরা খাদ্য-শস্য বিক্রয় করিতে চায় না। দেশের খাদ্য-সমস্যার প্রতি ভারতের ভাগ্যবিধাতাদের এই উদাসীনতা-সুলভ মনোভাব! ইহা ব্যতীত ভারতের বহু লোক এখনও কারাগারে বন্দী রহিয়াছেন। গত ৫ই আগষ্ট মিঃ আমেরী কমন্স সভায় জানান, ১লা মে তারিখে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক বন্দীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ৭ শত ৪ জন এবং অপরাধের জন্য কারারুদ্ধ লোকের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার ২ শত ৮৬ জন। এই হিসাবের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বন্দীর সংখ্যা ধরা হয় নাই। মিঃ আমেরী জানাইয়াছেন, ১লা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশে দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ২৩২ জন এবং ৪১৩ জন ছিল আটক বন্দী।

ভারতে আজ যে-সকল সমস্যা, যে-ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দিয়াছে, একমাত্র জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন দ্বারা অচল অবস্থা দূর করিয়াই তাহার প্রতিকার করা সম্ভব। গত এক বৎসরে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে বাদ দিয়া ভারতের অচল অবস্থাকে শুধু বহালই রাখিতে পারা যায়, সমাধান করিতে পারা যায় না। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কংগ্রেস নেতৃন্দেকে মুক্তিও দিবেন না, তাঁহাদের বিচারের ব্যবস্থাও করিবেন না, আবার অন্যান্য নেতাদিগকেও তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে সুযোগ দিবেন না। গত ৫ই আগষ্ট কমন্স সভায় মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, "কারাগারে গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়াই ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের সুবিধা রহিয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি হইতে বোঝা যাইতেছে, কংগ্রেসকে বাদ দিয়া অন্যান্য নেতারা অচল অবস্থার অবসান করুন, ইহাই তাঁহারা চান। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা সম্ভব হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। মিঃ আমেরী কি ইহাই চান যে, হয় কংগ্রেসকে বাদ দিয়া অচল অবস্থার সমাধান হউক, না হয় যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক? কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যে একশত প্রতিনিধিস্থানীয় নরনারীর আবেদনের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের বিশ্বাস, "যাহাতে ভারত ও বৃটেন উভয়ের পক্ষে সম্মানজনক ও গ্রহণযোগ্য কোন মীমাংসা হয়, তজ্জন্য বৃটিশ ও ভারতীয় নেতৃবর্গের বর্ত্তমান অচল অবস্থা সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা করার সময় আসিয়াছে।" তাঁহাদের এই আবেদনের কি ফল হইবে তাহা আমরা অনুমান

করিতে চাই না। কিন্তু এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কি এই কথাই বোঝা যাইবে না যে, ভারতের মত ইংলণ্ডেও জনমত প্রকৃতপক্ষে শাসকশ্রেণীর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ?

—

বড়লাটের বিদায়ী বক্তৃতা

ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভাদ্বয়ের যুক্ত অধিবেশনে গত ২রা আগষ্ট বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বিদায়ী বক্তৃতায় তাঁহার সাড়ে সাত বৎসর শাসনকালের মধ্যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে অসমর্থ হওয়ার কথা উল্লেখ করিবেন, ইহা খুব স্বাভাবিক। তাঁহার এই অসমর্থ হওয়ার মূল কোথায় তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, যে বিষয়টি তাঁহার বক্তৃতায় অনুল্লেখিত থাকার জন্য বিশেষভাবে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাই আমরা প্রথমে উল্লেখ করিব। প্রথমতঃ, মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বন্দী থাকা, তাঁহাদের সহিত বাহিরের নেতাদের যোগাযোগ স্থাপন করিতে না দেওয়া প্রভৃতি বক্তৃতায় স্থান পায় নাই। বিলাতের ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকা মনে করেন, ইহাতে বড়লাটের বক্তৃতার মূল্য অনেকখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বক্তৃতায় যদিও মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কিন্তু ভারতের যাহা জীবনমরণের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই গুরুতর খাদ্যসমস্যা সম্পর্কে কোন কথাই তাঁহার বক্তৃতায় স্থান পায় নাই। বস্ত্রসমস্যা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেও আশান্বিত হইবার মত এখনও কিছু দেখা যায় নাই। বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলাফল অনুভব করিবার পূর্ব্বে কোনরূপ আশাবাদ পোষণ করা সম্ভব নহে।

মুদ্রাস্ফীতির বিপদ সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে সচেতন আছেন, বড়লাটের বক্তৃতায় তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি-রণাঙ্গনের সর্ব্বত্র যে সংগ্রাম অব্যাহত ভাবে চলিবে, সে আশ্বাসও তিনি দিয়াছেন। সেই সঙ্গে এই কথাও তিনি বলিয়াছেন, "এই মারাত্মক আপদ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ করা চলিবে না।" মুদ্রাস্ফীতি যে কতদূর মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে বড়লাটের এই উক্তি হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির কুফল নিবারণের জন্য সরকারী উদ্যোগ সন্তোষজনক ভাবে কার্যকরী কি না তাহাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিলাতের ইকনমিষ্ট পত্রিকা পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাস্ফীতি নিবারণের নীতিকে রাজা কেনিউটের সমুদ্রতরঙ্গকে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

লর্ড লিনলিথগো স্বীকার করিয়াছেন: "দেশের আর্থিক নিরাপত্তাই একমাত্র কথা; ইহার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন।" কথা অতি সত্য, কিন্তু এ কথাও অতিসত্য যে এই সহযোগিতার জন্য গবর্ণমেণ্টের দিক হইতেই উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন সর্ব্বপ্রথম। সহযোগিতার জন্য চাই জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এবং জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য চাই অচল অবস্থা দূর করা। এই দিক দিয়া এ পর্য্যন্ত কি হইয়াছে? লর্ড লিনলিথগো 'যুদ্ধকালে প্রকৃত তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং সুদূর প্রসারী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন' আনিতে সক্ষম হওয়ার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদই এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন যত গুরুত্বপূর্ণই হউক, বড়লাট উহাকে 'আশানুযায়ী সাফল্য লাভ' বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। যদি সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদই চরম সফলতা হইত, তবে তিনি এ কথা বলিতেন না: "ইহা সত্য যে, আমি দেশের শাসন-ব্যবস্থায় বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলিকে অংশ গ্রহণ করাইতে পারি নাই।" তাঁহার এই অসামর্থ্যের জন্য বড়লাট ভারতের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যকে দায়ী করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য যে-সকল পরিকল্পনা তিনি উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার একটিতেও ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল না। তাঁহার ভেটো দেওয়ার ক্ষমতার প্রশ্ন লইয়াই ক্রিপ্স মিশন ব্যর্থ হইয়া গেল। 'ভারতের কোনও দল একটিও গঠনমূলক প্রস্তাব উপস্থিত করে নাই', তাঁহার এই উক্তি ভ্রান্ত। অনৈক্য, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রভৃতি যে-সকল কারণকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করিবার অজুহাত স্বরূপ ব্যবহার করেন, আসলে তাহার কোন ভিত্তি নাই। প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইলে,

মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতেও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুলকালাম আজাদ রাজী ছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই কেন?

বাংলায় বন্যার ধ্বংসলীলা

বাংলার অন্নসঙ্কটের তীব্রতার মধ্যে বন্যার ধ্বংস-লীলা আমাদের আর এক চরম দুর্দ্দৈব। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের বহুগ্রাম বন্যাবিধ্বস্ত হইয়া সহস্র সহস্র নরনারীর যে শোচনীয় দুর্দ্দশার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অতিশয় মর্ম্মন্তুদ। ১৪ই ও ১৫ই জুলাই ছোটনাগপুরের পাহাড়ে প্রবল বারিপাতের ফলে দামোদর নদের জলোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান জিলার সাতটি ইউনিয়নের ৭০টি গ্রাম প্লাবিত হইয়া যায়। প্লাবিত অঞ্চলের শতকরা ৮০খানি গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছে, বহু সহস্র মণ ধান বন্যার জলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্নসংস্থানের উপায় ধানের চারা এবং রোয়া ধানও বিনষ্ট হইয়াছে, বহু গৃহপালিত পশুর প্রাণ নাশ হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বন্যার জলে মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের দরিদ্র অধিবাসীদের যে কি চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

২১শে জুলাই-এর এক সংবাদে প্রকাশ, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কিশোরপুরে কাঁসাই নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রায় ৫০ খানি গ্রাম বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে, এবং আউসের ফসল ও আমনের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কান্দী হইতে ২০শে জুলাই-এর সংবাদে প্রকাশ, অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা এবং কিউয়া নদীতে ভীষণ বন্যা নামে এবং বহু স্থান বন্যাপ্লাবিত হয়। দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদীতে জলবৃদ্ধির ফলে হুগলী জেলার পাঁশকুড়া, খানাকুল ও আরামবাগ থানার বহুস্থান জলপ্লাবিত হইয়াছে। দামোদর নদীর জল হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু হাজারীবাগ, রাঁচী ও রামগড়ে প্রবল বর্ষণের ফলে ৪ঠা আগষ্ট হইতে আবার জল বৃদ্ধি পায়। ফলে ইতিপূর্ব্বে যে-সব গ্রামের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ছাড়াও ২০ খানির অধিক গ্রাম বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখা ও কেলেঘাই নদীতে প্রবল বন্যা নামিয়াছে। কাঁসাই নদীর বন্যায় তমলুক মহকুমার কতকাংশ প্লাবিত হইয়াছে।

বন্যার উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের জনগণের অবস্থা আমরা অনুমান করিতে পারি। বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠান দুর্গতদের সেবাকার্য্য করিতেছেন। দেশে অন্ন-সমস্যা কঠোর হইলেও এমন অবস্থাপন্ন লোক যথেষ্ট আছেন যাঁহারা এই সেবাব্রতে অকাতরে অর্থ সাহায্য করিবেন। দীনতম ব্যক্তিও নিজের অন্নমুষ্টি হইতে সেবাব্রতে দান করেন বাংলা দেশে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু এবার বন্যার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা শুধু বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের সাময়িক অন্নাভাবের সমস্যা নয়। খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতা আরও কঠোর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এখন হইতেই প্রতিকারের ব্যবস্থা না হইলে আগামী বৎসর আমাদের অন্নসঙ্কট আরও অধিকতর তীব্র হওয়ার আশঙ্কা আছে। দেশবাসীদের সেবাব্রতের দ্বারা শুধু এই সমস্যার সমাধান হইবে না; গবর্ণমেণ্টকে এখন হইতেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতে হইবে।

বাংলার বাহিরে বন্যা

বাংলার বাহিরে মাদ্রাজের গুণ্টুর জেলায়, কটকে, রাওলপিণ্ডীতে এবং মেবার ও আজমীড় মাড়োয়ারে বন্যা হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মেবার ও আজমীড় মাড়োয়ারের বন্যাই বেশী ধ্বংসমূলক হইয়াছে। মেবার ও মাড়োয়ারের পাহাড়ে অত্যধিক বারিপাত হওয়ার ফলে আজমীড় মাড়োয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত খারী নদীতে অভূতপূর্ব্ব বন্যা হয়। বন্যার প্লাবনে প্রায় ৫০খানি গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং আপাততঃ অনুমান যে পাঁচ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রাওলপিণ্ডী জেলায় মোহন ও অন্যান্য বহু নদীতে বন্যা হওয়ায় কয়েক জন লোক নিহত এবং বহুসংখ্যক গবাদি পশু মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মোহন নদীর তীরে জলের শক্তি দ্বারা চালিত বহু পেষাই কল আছে। বন্যার স্রোতে অনেক পেষাই কল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বহু লোক

হতাহত হইয়াছে, তন্মধ্যে বালক-বালিকার সংখ্যাই বেশী। এক দিকে অন্নকষ্ট আর এক দিকে বন্যার ধ্বংসলীলা—ভারতবাসীর চরম দুর্দ্দিন।

—

দেশের দুরবস্থার স্বরূপ

দেশের দুরবস্থার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে—আমরা সকলেই অল্পাধিক ভুক্ত-ভোগী। কিন্তু দুরবস্থার সামগ্রিক রূপটি আমাদের ব্যক্তি-গত খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যায় না। বাংলা দেশে অনশনে মৃত্যু সম্বন্ধে দুইটি মুলতুবী প্রস্তাব গত ৬ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে উত্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উভয় প্রস্তাবই বিধিবহির্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত করেন। প্রস্তাব দুইটির একটি উত্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন মিঃ কে, সি, নিয়োগী, আর একটি স্যার আবদুল হালিম গজনবী। বিধিবহির্ভূত হইলেও প্রস্তাবদ্বয়ের মধ্যে বাংলা দেশে সঙ্কটজনক খাদ্যপরিস্থিতির ফলে বহু লোকের অনশনে মৃত্যুর কথা সূচিত রহিয়াছে। পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাবদ্বয় উপস্থাপিত হইতে না পারিলেও প্রস্তাবের মূল প্রশ্নটি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপেক্ষার বিষয় নহে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে খাদ্যপরিস্থিতির সম্পর্কে আলোচনার সময় মিঃ কে, সি, নিয়োগী বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থাকে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের অবস্থার সহিত তুলনা করেন যে-সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের কর্ম্মচারীদের অজুহাতে খাদ্য-শস্য মজুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্যার এডওয়ার্ড বেন্থলের উক্তি সম্পর্কে মিঃ নিয়োগী বলেন, স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল মনে করেন যে, ক্লাইব ষ্ট্রীটই কলিকাতা এবং কলিকাতাই বাংলা দেশ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মনোভাবও ঠিক ঐরূপই ছিল। বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ নিয়োগী যাহা বলিয়াছেন, তাহার কতকটা পরিচয় সদাব্রত খুলিয়া বিনামূল্যে মণ্ড বিতরণ কার্য্যে বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ কর্ত্তৃক সাহায্যদানের প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া যায়। এই প্রস্তাবে মণ্ড প্রস্তুত প্রণালী নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চাউল, ডাইল অথবা ছোলা, বাজরা ও জোয়ার সমপরিমাণে লইয়া শাকসব্জির সহিত মিশাইয়া রান্না করিতে হইবে। এমন ভাবে রান্না করিতে হইবে যে প্রতি সের খাদ্যে যেন চারি সের মণ্ড প্রস্তুত হয় অর্থাৎ মণ্ডের পরিমাণ গৃহীত খাদ্যশস্যের চতুর্গুণ হইবে।

এই মণ্ড মাত্র একবেলা দেওয়া হইবে এবং প্রতিজনকে তিন ছটাকের বেশী মণ্ড দেওয়া হইবে না। মণ্ড বিতরণের সময় একজন ডাক্তার উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তার কথাও উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। আহারার্থীরা অনশন-ক্লিষ্ট কিনা ডাক্তার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যাহারা অনেক দিন কিছুই খাইতে পায় নাই, তাহাদিগকে মণ্ড দিবার পূর্ব্বে চিনি বা গুড়ের সরবৎ কিংবা ভাতের মাড় দিতে হইবে। বহু লোক যে অনেক দিন ধরিয়া খাইতে পাইতেছে না, এই প্রস্তাব হইতে কি তাহারই আভাষ পাওয়া যায় না? এই প্রসঙ্গে গত ২৬শে জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় রাজপথ হইতে দ্রুত মৃতদেহ অপসারণের প্রয়োজনীতা এবং মুমূর্ষু রোগী সম্পর্কিত আলোচনার কথা স্বতঃই লোকের মনে না পড়িয়া পারে না।

মিঃ বি, এন রায়চৌধুরী এবং শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম কলিকাতার রাজপথে রোগীর কথা উল্লেখ করেন। মিঃ রায়চৌধুরী ঐরূপ একটি রোগীকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করাইবার চেষ্টা করাইয়া অকৃতকার্য্য হন। তাঁহাকে জানান হয়, মুমূর্ষু হইলেও অনশন-ক্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় না। ডাঃ আহমদ বলেন, হিন্দু-সৎকার সমিতি এক দিনে ২৭টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেন এবং ঐ দিন আঞ্জুমান ইসলাম প্রতিষ্ঠান আরও কয়েকটি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের পাবলিক হেলথ কমীটির নিকট হেলথ অফিসার ডাঃ এম, ইউ আহমদ ভিক্ষুক-সমস্যা সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টে তিনি রাস্তায় প্রাপ্ত রোগীদের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে একশত বেড ছাড়িয়া দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। হাসপাতালে উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই সকল মুমূর্ষু ভিক্ষুককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা সম্ভব হয় নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকের যক্ষ্মা আছে।

এই জন্য যাদবপুর ও পাতিপুকুর হাসপাতালেও একশত বেডের কথা তিনি বলিয়াছেন। তাঁহার রিপোর্টে কলিকাতার রাস্তায় প্রাপ্ত মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাও আছে। রিপোর্টে তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমান বৎসরের সাত মাসে যতগুলি মৃতদেহ অপসারিত করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা গত বৎসর ও তৎপূর্ব্ব বৎসরের মোট বাৎসরিক সংখ্যাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতার রাজপথ হইতে মৃতদেহগুলি যথাসম্ভব সত্বর মর্গে স্থানান্তরিত করিবার জন্য দরজা-জানালা বন্ধ একখানি গাড়ীসহ একদল লোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনটি মর্গে দিনে তিন বার যাহাতে মৃতদেহ অপসারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতার রাজপথ হইতে মৃতদেহ অপসারণের জন্য ইতিপূর্ব্বে সৎকার সমিতি ও মফিজুল ইসলামই যথেষ্ট ছিল। এখন এই দুইটি সমিতির পক্ষে এই কার্য্য সম্পন্ন করা আর সম্ভব হইতেছে না। ইহা কলিকাতার রাজপথে মৃতদেহের সংখ্যা বৃদ্ধিই সূচিত করিতেছে। মৃতদেহের এইরূপ সংখ্যার বৃদ্ধির কারণ কি?

রাজপথের রোগাদের জন্য ব্যবস্থা

অনাহার এবং অল্পাহারের ফলে মুমূর্ষু অবস্থায় কলিকাতার রাজপথে যাহারা পড়িয়া থাকে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি তাহাদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ক্যাম্বেল এবং বেহালার এ-আর-পি জরুরী হাসপাতালে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতঃপর দুই দিনেই কলিকাতার রাজপথ হইতে ১২৭ জন অনাহার-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উল্লিখিত দুইটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। হাসপাতালে উঁহাদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অনাহারক্লিষ্ট লোকদের জন্য কলিকাতায় লঙ্গরখানা খোলা হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতার রাজপথে অনাহারক্লিষ্ট মুমূর্ষু ব্যক্তিদের সংখ্যা দেখিয়া এই অন্নদানের ব্যবস্থা যে কত অপ্রতুল তাহা কতক পরিমাণে অনুমান করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ লঙ্গরখানায় প্রদত্ত মণ্ডের আশায় মফঃস্বলের বহু অনাহারক্লিষ্ট লোক যে কলিকাতায় আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকদের পক্ষেই শুধু মণ্ডের আশায় কলিকাতায় আসা সম্ভব। কিন্তু সুদূর মফঃস্বলের অবস্থা কি? মফঃস্বলেরও নানা স্থান হইতে অন্নাভাবের শোচনীয় সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল সংবাদের মধ্যে দেশের প্রকৃত অন্নসঙ্কটের অতি সামান্য পরিচয়ই কি পাওয়া যায় না? কলিকাতার অবস্থা সংবাদপত্রের মারফৎ সহজেই মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু মফঃস্বলের প্রতিকারহীন অন্নাভাব-ক্লিষ্ট জনগণের প্রকৃত অবস্থা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার অতি সামান্য সুযোগই পায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশে আবার যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পুনরাবৃত্তি হইতে চলিতেছে ইহা তাহার সামান্য আভাষ মাত্র।

খাদ্য-সঙ্কট বৃদ্ধির আশঙ্কা

কলিকাতা, হাওড়া ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মজুত-বিরোধী অভিযান নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে মফঃস্বলে খাদ্যাভিযান সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে মোটের উপর ঘাটতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খাদ্যাভিযানের দ্বিতীয় পর্ব্বের ফলাফল সম্বন্ধে সরকারী হিসাব এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এক সংবাদে প্রকাশ, কলিকাতা সহরে খাদ্যাভিযানের ফলে আট জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সাড়ে চারি হাজার মণ চাউল এবং তিন জন ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে বিনা লাইসেন্সে এক হাজার মণ আটা মজুত রাখার জন্য মামলা দায়ের করা হইয়াছে। আর এক সংবাদে প্রকাশ, ১০।১২ জন লোককে খাদ্যশস্য মজুত করিয়া রাখার অভিযোগে ১১ই আগষ্ট প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে উপস্থিত করা হয়। খাদ্য অভিযানের সময় তাহাদের নিকট ৬ হাজার মণ চাউল, ৮৬০ মণ আটা এবং ৮০ মণ গম পাওয়া গিয়াছে।

মজুত-বিরোধী অভিযানের ফলাফল যাহাই হউক, বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলার খাদ্যসচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দীর আশাবাদের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। অল্পাধিক তিন মাস পূর্ব্বে তিনি যখন পুনরায় বাংলার মন্ত্রী হইলেন সেই সময় মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দী দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, বাংলার চাউলের পরিমাণ বিবেচনায় শঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ

নাই। গত ১৩ই মে রাইটার্স বিল্ডিং-এ সাংবাদিকদের এক বৈঠকে ভারত-সরকারের বাণিজ্য- ও খাদ্য-সচিব স্যার আজিজুল হক, বাংলার বে-সামরিক সরবরাহ সচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দী এবং ভারত-সরকারের খাদ্যবিভাগের সেক্রেটারী মেজর-জেনারেল উড মানসিক বিপর্য্যয়কেই খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী করিয়াছিলেন। কিন্তু গত ৮ই আগষ্ট বিডন ষ্ট্রীটে 'বিনামূল্যে অন্ন বিতরণ কেন্দ্রে'র উদ্বোধন উপলক্ষে মিঃ সুহরাওয়ার্দী বলিয়াছেন, "আগামী, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা চরম সীমায় উঠিতে পারে।" এই শঙ্কা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমরা একমত, কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি? গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে মতবাদই থাসিয়া থাকুক, জনসাধারণকে Smile-এর 'Self-help'-এর বই দেখাইয়া দিলেই, বর্ত্তমান যুগের গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে শেষ হইল, মিঃ সুহরাওয়ার্দীও তাহা স্বীকার করিবেন না।

নিরন্নকে অন্নদান এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অল্প দামে চাউল ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করাই আগামী ৩।৪ মাসের সঙ্কট পাড়ি দিবার একমাত্র উপায়। গত ৩০শে জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে এক জনসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী জানাইয়াছেন, কলিকাতায় দৈনিক ৩২ হাজার নিরন্নকে অন্নদান এবং দুঃস্থ পরিবারভুক্ত ৫৫ হাজার লোককে অল্পমূল্যে চাউল আটা ইত্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য অবাঙালী বণিকদের সহায়তায় পরিকল্পনা গঠন করা হইয়াছে। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহান্, কিন্তু কলিকাতার মত বিশাল সহরের পক্ষে এই পরিকল্পনাই পর্য্যাপ্ত নয়। কলিকাতা সহরই বাংলা দেশও নয়। সুতরাং সরকার হইতেও বাংলার সর্ব্বত্র অনুরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তি সেবাব্রত এবং অল্প দামে খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহের আয়োজন করিবেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যও গবর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে; নতুবা 'Self-help' আমাদের কোন কাজেই লাগিবে না।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় খাদ্য-পরিস্থিতি

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদে এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ হইয়াছে। কিন্তু এই আলোচনার ফল কি দাঁড়াইল—খাদ্য-সঙ্কটের ঘনমেঘাচ্ছন্ন ভারত তথা বাংলার অর্থনৈতিক আকাশ কতটুকু মেঘমুক্ত হইল? বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় আইন সভাদ্বয়ে খাদ্য-পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার ফল আমাদের কাছে অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলিয়া মনে হইতেছে। বাংলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নরনারীদিগকে অবিলম্বে অন্নসঙ্কট হইতে মুক্তি দিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন আভাষ কি কেন্দ্রীয় পরিষদে স্যার আজিজুল হকের বক্তৃতায়, কি রাষ্ট্রীয় পরিষদে মেজর জেনারেল উডের বক্তৃতায় আমরা পাইলাম না। সরকারী পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে লাভান্বেষীরা সতর্কতা অবলম্বন করিয়া পরিকল্পনাকে তাহাদের সুযোগে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে, এই উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করা অসম্ভব। সমর-যানবাহন বিভাগের সদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল বলিয়াছেন, দেশে যেটুকু অভাব আছে তাহা কার্য্যকরী পরিচালনা দ্বারা পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু পরিচালনা যে কার্য্যকরী ভাবে করা হইতেছে তাহার প্রমাণ দেখা যাইতেছে কৈ?

বাংলার খাদ্যাভাবের দায়িত্বটা স্যার আজিজুল হক বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক সাহেবের উপর চাপাইতে চাহিয়াছেন। হক সাহেবও উহার প্রতিবাদে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, শত্রুকে বঞ্চনা করিবার নীতির ফলে বাংলা দেশ খাদ্য সম্বন্ধে অভাবগ্রস্ত হইয়াছে। অতঃপর খাদ্য-সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলার অবশিষ্ট খাদ্যশস্য যাহা আছে তাহাও দিয়া দিতে হইবে, কিন্তু প্রতিদানে বাংলা দেশ কিছুই পাইবে না। হক সাহেব তাহার এই আশঙ্কা অযৌক্তিক মনে করেন না। কারণ হৈমন্তিক ধান্য ভাল হওয়ার আশা ছিল, সুতরাং বাংলা দেশ হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানি করা না হইলে, বাংলায় উৎপন্ন ফসল দ্বারাই বাংলার প্রয়োজন মিটিয়া যাইতে পারিত। হক সাহেব বলেন, সরবরাহ সম্পর্কে বাংলাকে বাদ দিবার প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বাংলা দেশে বেপরোয়া ভাবে চাউল শুধু ক্রয় করাই হইল না, বাংলা দেশ হইতে উহা রপ্তানিও করা হইল। হক সাহেবের মত ইহাই বাংলার অন্ন-সঙ্কটের কারণ।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে মেজর জেনারেল উড যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রাদেশিক স্বরাজের দোহাই দিয়া সমস্যা এড়াইবার চেষ্টা বলিয়াই লোকের মনে হইবে। কোন্ প্রদেশে কত ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত আছে তাহা জানাইতে প্রাদেশিক সরকারকে বাধ্য করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নাই, এ কথা বিশ্বাস করিবার মত কিছু ভারত শাসন আইনে পাওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশেই তো পূর্ব্বাঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল গঠিত হইয়াছিল। মেজর জেনারেল উডের বক্তব্য এই যে, অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলা তো সাহায্য পাইয়াছেই, তাছাড়া ১লা জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট বাংলাকে দৈনিক এক ট্রেন করিয়া খাদ্যশস্য দিয়াছেন। সেপ্টেম্বর মাস হইতে আউশ ধান বাজারে উঠিবে। সুতরাং মেজর জেনারেল উডের হিসাব মতে, বাংলার খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রিত হারে বণ্টনের ব্যবস্থা হইলে বাংলার জনগণের ৯০ দিনের খাওয়া খরচ বেশ চলিয়া যাইবে। তারপর ডিসেম্বর মাসে আমন ধান তো উঠিবেই। ইহা ব্যতীত আগামী কয়েক মাস কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার যে বাড়তি খাদ্যশস্য আসিবে তাহার চাউল ইত্যাদি সব মিলাইয়া শতকরা ৩৬ ভাগ বাংলাকে প্রদান করিবেন। সুতরাং বাংলায় অন্নসকটের কারণ কি? তাই তো, বাংলায় এই যে এত অন্নকষ্ট, এত অনাহার ইহার সবই কি রজ্জুতে সর্পভ্রম? আর রজ্জুতে সর্প ভ্রম না হইলে এই খাদ্যশস্যগুলি গেল কোথায়? ভ্রমই হউক আর খাদ্যশস্য যেখানেই যাউক, মায়াবাদী বৈদান্তিকও যখন ক্ষুধাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না, তখন প্রতিকারহীন জনগণের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভব? কাজেই কেন্দ্রীয় আইন সভাদ্বয়ে আলোচনার পরও আমাদের খাদ্যসঙ্কট যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ হোসেন ইমাম বলেন, ব্যক্তিগত হিসাবে গত মার্চ্চ মাসে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে, এপ্রিল মাসে হইয়াছে ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকার খাদ্যশস্য, ১৯৪২-৪৩ সালে ৪৭ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, "উৎপাদনকারীরাও মজুত করিতেছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীরাও উহা বাদ দিতেছেন না।" বিতর্কের উপসংহারে মেজর জেনারেল উড মিঃ হোসেন ইমামের অভিযোগের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি যে হিসাব উপস্থিত করেন তাহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম সাত মাসে ভারত হইতে এক লক্ষ টনেরও কম খাদ্যশস্য ভারত হইতে রপ্তানি করা হইয়াছে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই রপ্তানির পরিমাণ সাড়ে সাত লক্ষ টন। কিন্তু দেশে যখন খাদ্যের অভাব তখন এই এক লক্ষ টন (প্রায় ২৮ লক্ষ মণ) খাদ্যশস্যই বা দেশ হইতে রপ্তানি হইবে কেন, ক্ষুধার্ত্ত দেশবাসী এ কথা নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

বাংলা হইতে অত্যাধিক চাউল রপ্তানিই যে বাংলায় অন্নাভাবের কারণ মেজর জেনারেল উড এক হিসাব উপস্থিত করিয়া তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কলিকাতা বন্দর হইতে ১৯৪২ সনের এপ্রিল হইতে ১৯৪৩ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৪৮ হাজার ৪ শত ৮০ টন চাউল রপ্তানি করা হইয়াছে, কিন্তু উহার বেশীর ভাগ চাউলই বাংলায় উৎপন্ন নহে। কিন্তু উহার মধ্যে বাংলায় উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ যে কত তাহা তিনি কিছু বলেন নাই। বঞ্চনা-নীতির চাউল সম্বন্ধে তিনি বলেন, উহার পরিমাণ ৩০ হাজার টন। তন্মধ্যে ২৭ হাজার টনই পুনরায় বাংলার নিকট বিক্রয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট চাউল হইতে একশত টন চাউল সামরিক বিভাগকে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালে দেশরক্ষা বিভাগের জন্য সাত হাজার টন চাউল ক্রয় করা হইয়াছে, কিন্তু ১৯৪৩ সনে ঐ বিভাগ বাবদ কোন চাউল ক্রয় করা হয় নাই। কিন্তু বাংলা হইতে চাউল রপ্তানি যদি বাংলার অন্নাভাবের কারণ না-ই হয়, তাহা হইলেও অন্নাভাবের প্রতিকার করিবার প্রয়োজন শেষ হইয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ বঞ্চনা-নীতির যে ২৭ হাজার টন চাউল বাংলার নিকট পুনরায় বিক্রয় করা হইল তাহাই বা গেল কোথায় অর্থাৎ এই চাউলের বণ্টন হইল কি ভাবে? কেন্দ্রীয়

আইন সভাদ্বয়ে খাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে বিতর্কের পরেও কোন আশার আলোক দেখা যাইতেছে না, সবই যেন রহস্যাবৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অন্ন-সমস্যা দিন দিনই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিতেছে।

—

দক্ষিণ-আফ্রিকায় চাউল রপ্তানির অভিযোগ

গত ১৩ই আগষ্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল, ইণ্ডিয়ান মুসলিম এবং মারোয়াড়ী চেম্বার অব্ কমার্সের কমীটিগুলি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে এক টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে সম্প্রতি এক চালানে বহু চাউল দক্ষিণ-আফ্রিকায় রপ্তানি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছেন। এই টেলিগ্রামে তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, "কেন না, চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়া সম্প্রতি সরকারী ঘোষণা জারী হওয়া সত্বেও, এই রপ্তানি হইয়াছে।" তাঁহাদের মতে, এই ঘটনায় "এ দেশের নিরন্নজনগণকে অন্নদান করার প্রাথমিক দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট যে উদাসীন" এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে।

একখানি সরকারী প্রেস নোটে এই কয়েকটি বণিক সমিতির অভিযোগের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ১৯৪৩ সনে ৭২৭ টন চাউল ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি করা হইয়াছে। প্রধানতঃ প্রবাসী ভারতীয়গণের জন্য এই চাউল প্রেরিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এই যুক্তি দ্বারা উহা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য যদি ভারত হইতে চাউল রপ্তানি করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভারতে বিদেশী যাহারা আছেন, তাঁহাদের জন্যও তাঁহাদের স্বদেশ হইতে ভারতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর ব্যবস্থা করা উচিত।

—

কেন্দ্রীয় পরিষদে রাজবন্দী সংক্রান্ত প্রস্তাব

কেন্দ্রীয় পরিষদে বন্দী মুক্তির প্রস্তাব নয়, রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারী। তাঁহার প্রস্তাবে তিনি এই মর্ম্মে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, সপারিষদ বড়লাট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট-সমূহকে এই মর্ম্মে সুপারিশ করিবেন যে, তাঁহারা যেন কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদিগকে কারাগার পরিদর্শনের এবং রাজবন্দীদের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ প্রদান করেন, কারণ ইহাতে রাজবন্দীদের অভাব-অভিযোগগুলি জানিবার এবং সেগুলির প্রতিকার করিবার সুবিধা হইবে। শ্রীযুত যোশী এই প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের সার মর্ম্ম এই যে—কারাগারে এবং বন্দীশিবিরে রাজবন্দীদের জীবন-যাত্রার সুব্যবস্থা, বহির্জ্জগতের সহিত তাঁহাদের সংযোগ রাখিবার সুযোগ দান, প্রয়োজনীয় স্থলে পারিবারিক ভাতা দেওয়া এবং অবিলম্বে তাঁহাদের মুক্তি দান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে এই কাজগুলি করিতে হইবে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের সহযোগিতায় এবং আইন সভা কর্ত্তৃক এতদুদ্দেশ্যে গঠিত কমীটির পরামর্শ অনুসারে।

মূল প্রস্তাব এবং শ্রীযুত যোশীর সংশোধন প্রস্তাব দুই-ই ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। অগ্রাহ্য হওয়া মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নহে, কিন্তু আমরা বিস্মিত হইয়াছি স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ম্যাক্সওয়েলের উক্তিতে। শ্রীযুত যোশীর প্রস্তাবে তিনি প্রায় রাজী হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে আইন-সভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমীটির সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবার যে কথা আছে শুধু সেই কারণে শেষ পর্য্যন্ত শ্রীযুত যোশীর প্রস্তাবে তাঁহার রাজী হওয়া আর হইল না। আইন সভাকে তাঁহার এত ভয়ের কারণ কি? আইনসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কমিটিতে দেশের লোকের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য থাকিবে বলিয়াই কি?

প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মূল প্রস্তাবটিতে গবর্ণমেণ্ট মাত্র তিন ভোট বেশী পাইয়া জিতিয়াছেন। আর শ্রীযুত যোশীর সংশোধন প্রস্তাবে জিতিয়াছেন প্রেসিডেণ্টের কাষ্টিং ভোটে। কংগ্রেসী সদস্যদের অনুপস্থিতির কথা বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্টের এই জয় প্রকৃতপক্ষে জয়-গৌরবহীন বলিয়াই মনে হইবে। এই জয়ের পরেও আর একটা প্রশ্ন রহিয়া গিয়াছে। বিনাবিচারে গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে

আটক রাখিয়াছেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান এবং পারিবারিক ভাতাদান করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেণ্ট এড়াইতে পারেন না।

—

দিল্লীর দুর্গে ভূ-গর্ভস্থ সেল

কেন্দ্রীয় পরিষদে রাজবন্দী সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনার সময় মিঃ কে, সি, নিয়োগী অভিযোগ করেন, দিল্লীর দুর্গে ভূগর্ভস্থ কক্ষেও রাজবন্দীদের আবদ্ধ রাখা হয়। রাষ্ট্রীয় পরিষদে এই বিষয় লইয়া প্রশ্ন করা হইলে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ ই, কনরান্ উক্ত সেলগুলির নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা দেন: সেলগুলির মেজে উপরিভাগ হইতে ১৬ ফিট নিম্ন। ঐগুলিতে সূর্য্যের আলো সরাসরি প্রবেশ করে না, তাই সেলগুলি কিছু অন্ধকার। সেলের সম্মুখে আকাশের দিকে খোলা অন্ততঃ ত্রিশ ফিট স্থান আছে। মিঃ কনরাণের মতে আটক ব্যক্তিদের পক্ষে উহা স্বাস্থ্যকরও বটে।

স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে স্কুলপাঠ্য পুস্তকের জ্ঞানও যাঁহাদের আছে তাঁহারাও এই ভূগর্ভস্থ সেলগুলি কিরূপ স্বাস্থ্যকর হইতে পারে তাহা অনুমান করিতে পারেন। কিন্তু সরকারী স্বাস্থ্যতত্ত্বই আলাদা, না আটক হইলেই তাহার স্বাস্থ্যের প্রকৃতি বদলাইয়া যায়, তাহা কিছুই আমরা বুঝিলাম না। আন্দামান যে ভূস্বর্গ তাহাও আমাদের শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু মিঃ কনরাণের উক্তি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে যুগান্তর আনয়ন করিবে সন্দেহ নাই।

রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁহার প্রস্তাবের আলোচনায় শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারীর উক্তি মনে না পড়িয়া পারে না। তিনি বলিয়াছেন, মুক্তি পাইবার পরও রাজবন্দীদের শতকরা ৩০ বা ৪০ জনই আজীবন ভগ্নস্বাস্থ্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবেন। তাঁহার এই আশঙ্কা অমূলক মনে করিবার কারণ আছে কি?

—

মিঃ লুই ফিশারের রচনা

মার্কিন সাহিত্যিক মিঃ লুই ফিশারের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি ভারতে প্রকাশ সম্বন্ধে যে বিধিনিষেধ জারী করা হইয়াছে তাহার সমর্থনে ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন: (১) মিঃ লুই ফিশারের রচনা বিদ্বেষ ও ভ্রান্ত বিবরণে পূর্ণ, (২) উহাতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্ট হয়, (৩) উহাতে সম্মিলিত জাতিসমূহের সম্পর্ক ছিন্ন হইতে পারে।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, উহা সত্যই বিদ্বেষ ও ভ্রান্ত বিবরণে পূর্ণ, তাহা হইলে ভারতবাসী কি এতই বোকা যে উহা বুঝিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই। যদি থাকে তবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা গবর্ণমেণ্ট কেন করেন? ভারতবাসীর উপর এইটুকু আস্থাও কি তাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন না? আমেরিকায় 'ভারত সম্পর্কে পঞ্চাশটি তথ্য' নামক ভ্রান্তিপূর্ণ যে পুস্তিকা প্রচার করা হইল, তাহার প্রচার গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করেন না কেন? মিঃ লুই ফিশারের রচনা আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচারিত হওয়া তো বন্ধ হয় নাই! তাহাতে যদি সম্মিলিত জাতি সমূহের সম্বন্ধ ক্ষুন্ন না হয়, তাহা হইলে ভারতে প্রকাশিত হইলেই বা হইবে কেন?

—

পারস্পরিক ব্যবহারমূলক আইন

কেন্দ্রীয় আইন সভাদ্বয়ে পারস্পরিক ব্যবহারমূলক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় স্বার্থ সঙ্কোচক যে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারই প্রতিবাদে এই আইন। কিন্তু এই আইন দ্বারা কতটুকু সুফল আমরা পাইতে আশা করিতে পারি রাষ্ট্রীয় পরিষদে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর মন্তব্য হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, সমস্যার মূল কথা হইল এই যে, ভারত-প্রবাসী দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীকে ভারতে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা সম্ভব কি না? বর্ত্তমান ভারত শাসন আইনে তাহা সম্ভব নহে। ভারতে তাহাদের চাকুরী সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। ভারতে তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বঞ্চিত করিবার ক্ষমতা ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। পণ্ডিত কুঞ্জরুর কথা এই যে ভারত শাসন আইনের সংশোধন না হইলে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় স্বার্থসঙ্কোচক আইনের প্রকৃত জবাব দিবার ক্ষমতা ভারতের নাই।

পণ্ডিত কুঞ্জরুর মন্তব্যের জবাবে মিঃ বোজম্যান

বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই আইনটি বিশেষভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে রচিত হয় নাই। তাহা যদি না হয়, তবে এই আইনের সার্থকতা কি? দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় স্বার্থসঙ্কোচক আইনের প্রতিবাদ তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন? মিঃ বোজম্যান মনে করেন, দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতে চাকুরী করিয়া ভারতেরই স্বার্থ রক্ষা করিতেছে। অদ্ভুত যুক্তি! কেন, দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ছাড়া কি ভারতের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়? তিনি আরও বলেন, সাম্রাজ্যের কোনখানেই ভারতবাসীর চাকুরী পাইতে বাধা নাই, তবে পায় না শুধু শাসনপরিচালনের নীতির জন্য। কিন্তু এইরূপ নীতির কারণ কি এবং সাম্রাজ্যের অন্যত্র ভারতবাসীর চাকুরী সম্পর্কে ইহাই যদি নীতি হয় তবে দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের ঐরূপ নীতি গ্রহণে বাধাই বা কোথায়?

—

মুসোলিনীর বিদায় ও ইটালী

ইটালির ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনীর আকস্মিক পদত্যাগ অনেকের কাছেই বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হইয়াছে। তাঁহার পদত্যাগের পর ইটালীর নূতন গবর্ণমেণ্টের আচরণ তাহা অপেক্ষা একটুও কম বিস্ময়কর নহে। এই বিস্ময়কর আচরণের অন্তরালে কি আছে, তাহা অনুমান করা সম্ভব না হইলেও মুসোলিনীর পদত্যাগে ইটালীতে ফ্যাসিজমেরও পতন হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার উপায় কি? মুসোলিনীর অভ্যুত্থানও কম-আকস্মিক ছিল না। পলায়ন-উন্মুখ মুসোলিনীকে টেলিগ্রাম করিয়া ডাকিয়া আনিয়া ইটালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল কেন তাঁহাকে রাষ্ট্রনায়কের পদে বরণ করিয়াছিলেন ফ্যাসিজমের তত্ত্বকথা দ্বারা যদি তাহার ব্যাখ্যা করা যায়, তবে মুসোলিনীর পদত্যাগেই ফ্যাজিসমেরও পতন হইয়াছে কি না, তাহা বুঝা যায় কি?

মুসোলিনীর পদত্যাগের পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ইটালীর স্বার্থের দিক হইতে এবং মিত্রশক্তিরও স্বার্থের দিক হইতে বিনাসর্ত্তে এবং সামগ্রিকভাবে, আংশিকভাবে নহে—ইটালীর আত্মসমর্পণ আবশ্যক।" কিন্তু ইটালীর নূতন গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত মিঃ চার্চ্চিলের এই দাবী পূরণ করেন নাই। মুসোলিনীর পদত্যাগের পাঁচ দিন পরে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, 'ইটালীতে কলঙ্কিত ফ্যাসিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা আজ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।' কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়া শেষ হইয়াছে কিনা, তাহা আজও বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু এদিকে ব্রেনার গিরিপথ দিয়া জার্ম্মান সৈন্য দ্রুত ইটালীতে প্রবেশ করার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন গবর্ণমেণ্ট গঠন ও সামরিক আইন জারীর প্রাক্কালে ইটালীর রাজা এবং তাঁহার নবনিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বাদোলিওর মতে যুদ্ধ চলিতে থাকার কথা আছে। যুদ্ধ চলিতে থাকার যে অর্থই করা যাউক না কেন, আর একটি সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর নূতন গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মানীর সহিত সন্তোষজনক সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য মুসোলিনীর গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আগ্রহশীল।

জুরিখের এক সংবাদে প্রকাশ, ইটালীর সমাজতন্ত্রবাদী দল এক ইস্তাহার জারী করিয়া বলিয়াছেন, বাদোলিওর শাসন মুসোলিনীকে বাদ দিয়া ফ্যাসিজম। কেবল গণ-বিপ্লবের আশঙ্কায় মুসোলিনীকে বাদ দিয়া সমরনায়কদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ না করিলেও ইটালীকে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইতে দেওয়া নিবারণ করা সম্ভব নহে, তখন মুসোলিনীর পদত্যাগের পরেও মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ না করা হইতে ইটালীকে ফ্যাসিজমের অবসান অনুমান করা যায় কিনা, একমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

—

সাম্রাজ্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

গত ৮ই আগষ্ট ইয়র্ক সহরে শিক্ষকদের নিকট শিক্ষা-সংক্রান্ত বক্তৃতাবলীর উদ্বোধন বক্তৃতায় ভারতসচিব মিঃ আমেরী সাম্রাজ্যবাদের এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগটাকে কেহ কেহ interpretation-এর—ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের যুগ বলেন। সুতরাং মিঃ আমেরী যে সাম্রাজ্যকে স্বর্গরাজ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন তাহা

আর বিচিত্র কি? যীশুখৃষ্ট যখন পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামিয়া আসিবার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তখন তিনি বোধ হয় কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে ১ হাজার ৯ শত ৪৩ বৎসর পরেই পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে।

মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, "আমরা এখানে এবং ডোমিনিয়নগুলিতে শুধু ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সুরু করিয়াছি যে, সাম্রাজ্য বাহিরের কোন বন্ধন নয়, অতিরাষ্ট্র নয়, স্বর্গরাজ্যের মতই উহা আমাদেরই ভিতরে।" তাঁহার এই উক্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়া একটা বাস্তব ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ সত্যই মিঃ আমেরীর মনের মধ্যে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে? স্বাধীনতা গণতন্ত্রের কথা মুখে যতই বলুন অন্তরের সাম্রাজ্যবাদ বাহিরে ঔপনিবেশিক নীতির মধ্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে। এমন যে স্বর্গরাজ্যের মত অন্তরের অন্তরতম জিনিষ তাঁহাকে তাঁহারা বর্জ্জন করিতে পারেন কোন্ প্রাণে!

যাহারা এই অন্তরের জিনিষকে চিনে না, বুঝে না, তাহারাই বলে বৃটিশ সাম্রাজ্য হয় ভাঙিয়া পড়িবে, না হয় যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। মিঃ আমেরী এই সকল জড়বাদীকে উপযুক্ত উত্তর দিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্য উহার কোনটা করিতেই অস্বীকার করিয়াছে। তবে সাম্রাজ্য বস্তুটি কি? যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে সকলেই স্বাধীনভাবে সহযোগিতা করিতে পারে, কেহই বাদ পড়ে না সেই রাজনৈতিক জীবনের প্রতিভূই হইল সাম্রাজ্য, ইহাই মিঃ আমেরীর সাম্রাজ্যবাদ। ইহার পরেও যদি পরাধীন দেশগুলি মনে করে যে, বাঘের সঙ্গে ছাগশিশুর সহযোগিতা করা বাঘের উদরে প্রবেশ করারই নামান্তর, তাহা হইলে তাহাদের চরম দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। সাম্রাজ্যের ভিতর কি রকম সহযোগিতা হইবে তাহার দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া মিঃ আমেরী সোভিয়েট রাশিয়ার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সোস্যালিষ্ট রিপাব্লিক হইলে আর ভারতবর্ষের ভাবনা কি? তবু ভাবনা যে আছে তাহা মিঃ আমেরী পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়াই যে যুদ্ধোত্তর যুগে সাম্রাজ্যবাদের মহান্ পরীক্ষা হইবে, মিঃ আমেরী এই ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। ভাবনার কারণ অবশ্যই আছে। ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া এতদিন ভারতকে স্বাধীনতা দানরূপ মিঃ আমেরীর মহান্ উদ্দেশ্যে বাধা দিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের পরেও যে দিবে না, সে সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। আমরা বলি, বৃথা এই আশঙ্কা। অনৈক্যের অজুহাত যতদিন থাকিবে, ততদিন স্বর্গরাজ্য সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

—

আটলাণ্টিক সনদের দ্বিতীয় বার্ষিকী

আটলাণ্টিক সনদের দ্বিতীয় বার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন, "প্রথমতঃ আমরা এই নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার কামনা করি যে, প্রত্যেক দেশের লোকেরই তাহাদের স্বদেশের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ সকলের নির্ব্বিঘ্নতা, শ্রমিকের জীবন যাত্রার মান উন্নত করা, অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধান ও সামাজিক নির্ব্বিঘ্নতার জন্য আমরা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা কামনা করি।"

আটলাণ্টিক সনদের চার্চ্চিল-ভাষ্যের পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের এই উক্তি ভারতবাসীর কাছে দুর্ব্বোধ্য বলিয়াই মনে হইবে। মিঃ চার্চ্চিল সোজা কথায় জানাইয়াদিয়াছেন, ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির জন্যই এই সনদ রচিত হইয়াছে। তখন এসম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অভিমতও দাবী করা হইয়া[illegible]। কিন্তু তিনি নীরবতা ভঙ্গ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তাঁহার এই নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ বলিয়া যদি তিনি মানিতে রাজী না-ও হন, তাহা হইলেও বর্ত্তমানে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে চার্চ্চিল-ভাষ্য খণ্ডিত হয় নাই। যদি চার্চ্চিল-ভাষ্য তিনি খণ্ডন করিতে চাহিতেন, তাহা হইলে সেকথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার কোন বাধা তো তাঁহার পক্ষে ছিল না। তিনি সে দিক দিয়া না যাইয়া, সাধারণভাবে প্রত্যেক দেশের লোকের শাসনতন্ত্র রচনার কথা যাহা বলিয়াছেন, চার্চ্চিল-ভাষ্যের সহিত তাহার অসঙ্গতি কোথায়? পৃথিবীর পরাধীন দেশগুলিতেও যে আটলাণ্টিক সনদ প্রযোজ্য তাহা যেমন স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন,

তেমনি পরাধীন দেশগুলিতে উহা কি ভাবে প্রযোজ্য হইবে সে-সম্বন্ধেও কোন সন্দেহ রাখা উচিত নহে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তিতে ইহার কোনটাই না থাকায় পরাধীন দেশগুলি উল্লসিত হইবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছে না।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আরও বলেন, "সম্মিলিত জাতি-বর্গের প্রত্যেকেই আটলাণ্টিক সনদের উদ্দেশ্য ও নীতি মানিয়া লইয়াছেন।" তাঁহার পূর্ব্বোক্ত উক্তির অর্থ যদি ইহাই হয় যে, বৃটেনের অধীনস্থ দেশগুলিতেও আটলাণ্টিক সনদ প্রযোজ্য হইবে, তাহা হইলে চার্চ্চিল-ভাষ্যের পরে সম্মিলিত জাতির প্রত্যেকেই সনদের উদ্দেশ্য ও নীতি মানিয়া লওয়ার অর্থ কি দাঁড়ায়?

—

কুইবেকের বৈঠক

কানাডার কুইবেকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের মধ্যে আর এক দফা আলোচনা চলিতেছে। সিসিলির যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতঃপর যুদ্ধের পরবর্ত্তী অধ্যায় কি ভাবে এবং কোথায় সুরু হইবে তাহা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং কুইবেক বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই বৈঠকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় এই যে, অন্যান্য বৈঠকের মত এই বৈঠকেও ষ্ট্যালিন বা তাঁহার কোন প্রতিনিধি যোগদান করেন নাই। তাঁহাকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, এমন কোন সংবাদ শোনা যায় না।

সিসিলি বিজয়ের পর অক্ষশক্তিবর্গকে কোথায় আক্রমণ করা হইবে তাহাই কুইবেক বৈঠকের মূল বিষয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নই উঠে এই যে, ইটালী আক্রমণ করা হইবে কি না। ইটালী আক্রমণ না করিয়া জার্ম্মানীকে আঘাত হানিবার আর কোন উপায় আছে কি? বলকানের দিক হইতে জার্ম্মানীকে আক্রমণ করা সম্ভব কি? বলকানের দিক হইতে জার্ম্মানীকে আক্রমণ করিতে হইলে সম্ভবতঃ তুরস্কেরও যুদ্ধে যোগদান করা প্রয়োজন হইয়া পড়িবে। তুরস্কের নিরপেক্ষতায় এত দিন মিত্রপক্ষের সুবিধাই হইয়াছে। মিত্রশক্তির প্রত্যক্ষ সুবিধার জন্য তুরস্ক যুদ্ধে যোগদান করিবে কি না, সে সম্বন্ধে কিছুই অনুমান করিবার উপায় নাই।

কুইবেক সম্মেলনে জাপানকে আক্রমণ করার বিষয়ও যে আলোচনা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্ত ঘেঁষিয়া জাপান ব্রহ্মদেশে অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্মদেশে জাপান যে তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে ইহা ধরিয়া লইয়াই জাপানকে আক্রমণ করার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। শত্রুকে শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া সঙ্গত নয়। প্রাচীর যুদ্ধের কথা বলিতে গেলে ভারতীয় সমস্যার কথাও আপনি আসিয়া পড়ে। সমরনীতির দিক দিয়া ভারতের রাজনৈতিক দাবী পূরণ যে প্রাচীতে মিত্র-শক্তিবর্গের সামরিক শক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী করিবে, কুইবেক সম্মেলনে তাহাও আলোচিত হওয়া উচিত। কত দূর কি হইবে কিছুই বলা যায় না। কুইবেক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অচিরেই সামরিক অভিযানের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

—

যুদ্ধ-পরিস্থিতি

রুশ রণাঙ্গন এবং সিসিলিই এই মাসে যুদ্ধের বড় খবর। রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মানীর গ্রীষ্ম অভিযান আরম্ভ হইয়াই শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার গ্রীষ্মকালেও রাশিয়া আক্রমণ চালাইবে বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল তদনুসারে লালফৌজের অভিযান চলিতেছে। ৫ই আগষ্টের সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত ওরেল সহরের পতন হইয়াছে। রুশবাহিনী কর্ত্তৃক ওরেল অধিকার রুশ-রণাঙ্গনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ওরেলের পতন প্রমাণ করিতেছে জার্ম্মানীর গ্রীষ্মাভিযানই শুধু ব্যর্থ হয় নাই, জার্ম্মানী এখন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। ওরেল দখলের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রুশবাহিনী কর্ত্তৃক বিয়েলগোরড দখল রুশ-রণাঙ্গনের আর একটি গুরুত্ব-পূর্ণ ঘটনা। খারকোভেরও পতন আসন্ন।

১৬ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, সিসিলির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অতঃপর মিত্রশক্তি কোথায় আক্রমণ করিবে ইহা যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তেমনি জার্ম্মানী কি করিবে তাহাও বিবেচনার বিষয়। রুশ রণাঙ্গনে শীতকাল

আসিতেছে। এদিকে জার্ম্মানী নরওয়ে পরিত্যাগ করিতে পারে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মানী নরওয়ে পরিত্যাগ করিলে সমুদ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। কাজেই জার্ম্মানীর উপর মিত্রশক্তিবর্গের চাপ বৃদ্ধি না হইলে জার্ম্মানী যে নরওয়ে ত্যাগ করিবে তাহা মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ উত্তর-ইটালীতে জার্ম্মানী হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কাজেই জার্ম্মানী যে ইটালীকে সহজে ছাড়িয়া দিবে, এরূপ মনে করিবারও কোন কারণ দেখা যায় না।

—

কলিকাতায় কলার অভাব

কলিকাতাবাসীর জ্বালানী কয়লার অভাব কিছুতেই দূর হইতেছে না। বাংলার অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে জানান হইয়াছে, ২রা আগষ্ট হইতে ১১ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দৈনিক ২০ ওয়াগন করিয়া জ্বালানী কয়লা কলিকাতায় আসিয়াছে। কয়লার বণ্টন যাহাতে ন্যায্য ভাবে হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কয়লা-ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স লওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি কিছুতেই হইতেছে না। কোন কোন কয়লার দোকানে দৈনিক ২।১ ঘণ্টা করিয়া কয়লা দেয়—তাহাও আড়াই সের কিংবা পাঁচ সেরের বেশী দেয় না। এই আড়াই সের বা পাঁচ সের কয়লার জন্য সারি বাঁধিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়াই শুধু থাকিতে হয় না, অত্যধিক ভীড় ও ঠেলাঠেলির মধ্যে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। কয়লা যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আসিয়া থাকে, সরকার যদি ন্যায্য বণ্টনের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে কয়লা সংগ্রহ করা এখন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল কেন? কয়লার বাজারেও কারচুপি চলিতেছে নাকি?

—

মিঃ জিন্নাকে আক্রমণ

মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নাকে একজন মুসলমান আততায়ী ছুরিকা দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহার আঘাত খুব সামান্যই লাগিয়াছে। আততায়ীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রাজনৈতিক ছুরি মারার মত কাপুরুষোচিত কাজ আর কিছু নাই। এই দুর্নীতি দেশ হইতে যত শীঘ্র দূর হয় ততই দেশের কল্যাণ। কাহারও রাজনৈতিক মতামত যাহাই হউক, তাহার জন্য তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করা অত্যন্ত জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয়। আমরা দেশকে এই জঘন্য মনোবৃত্তি হইতে মুক্ত দেখিতে ইচ্ছা করি।

—

পরলোকে চীনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিন সিন

চীনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিনসিন ২রা আগষ্ট তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রোগে ভুগিতেছিলেন। কয়েকদিন আগে তিনি মারা গিয়াছেন বলিয়া এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে জানা গেল তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। সেই সময় অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, এবারের মত তিনি রক্ষা পাইলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই আশা আর পূর্ণ হইল না।

ডাঃ লিন সিন ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সমগ্রই নয়াচীন গঠনের কার্য্যেই নিয়োজিত ছিল। ১৯১১ সালে চীনা বিপ্লবের পর তিনি প্রথম চীনা পার্লামেণ্টের সিনেটার নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি চীনা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট হন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ লিন সিন ছিলেন পুরাতন বিপ্লবী নেতা। তাঁহার বিপ্লবী স্বপ্নকে ক্রমশঃ সার্থক হইতে দেখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি।

—

দুঃখের নদী দামোদর

দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবল বন্যায় জনগণের যে দুর্গতি হয়, দুর্গত জনগণের সেবাকার্য্য দ্বারা তাহার সাময়িক প্রতিকার মাত্র হইতে পারে। কিন্তু ইহার স্থায়ী প্রতিকার না হইলে পুনঃ পুনঃ জনগণকে এই দুর্গতি হইতে রক্ষা করা সম্ভব নয়। দামোদর-বন্যার প্রতিকার সম্বন্ধে ডাঃ মেঘনাদ সাহা 'বাংলার দুঃখের নদী দামোদর' শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপ্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বে

একটি দামোদর-পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ডাঃ সাহা সে-সম্বন্ধেও তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৯১৩ সালে দামোদরের যে বন্যা হয় তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহার পর ১৯১৯ সালেও ঐরূপ একটি বন্যা হইয়াছে। দামোদর নদের বন্যার কারণ সম্বন্ধে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, দামোদর পার্ব্বত্য নদী নহে, ডাঃ সাহার মতে উহা গিরিনদী। ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চলে উহার উদ্ভব বলিয়া গলিত তুষার দ্বারা উহা পরিপুষ্ট হয় না। বর্ষায় উহার জলোচ্ছ্বাস আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়া বাঁধ ভাঙিয়া ফেলে। সুতরাং প্রতিকারের উপায় এই জলোচ্ছ্বাসকে প্রশমিত করার ব্যবস্থা করা। নদীর স্রোত ও গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা দ্বারাই তাহা করা সম্ভব। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই।

ডাঃ সাহা যে প্রতিকারের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা তিনটি জলাধার নির্ম্মাণের পরিকল্পনা। দামোদর, বরাকর এবং উশ্রী এই তিনটি নদীর জন্য তিনটি জলাধার নির্ম্মাণ করিতে হইবে। প্রথম দুইটি জলাধারের প্রত্যেকটি ১৫০০০ ঘনফুট জল ধরার উপযোগী এবং তৃতীয়টি ৭০০০ ঘনফুট জল ধরার উপযোগী হওয়া চাই। ডাঃ সাহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দামোদর-বন্যারই যে কেবল প্রতিকার হইবে তাহা নহে, রাঢ় অঞ্চলের কৃষিকার্য্যও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।

নারীর অধিকার

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

নারীকে দেবীর আসন প্রদান করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন। এক সময় এই দেবীত্বকে এতদূর তাঁহারা টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে জীবন্ত নারীকে মৃত পতির সহিত এক চিতায় দগ্ধ করিয়া দেবীত্বের মর্য্যাদা তাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। কিন্তু খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ শাসক দেবীত্বের মর্য্যাদা বুঝিল না। তাই ইংরাজ আমলে সতীদাহ প্রথা আইনের বলে রহিত করা হইল। কিন্তু বালবিধবা কন্যাকে চিরবৈধব্যের দেবীত্বের আসনে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ষাট বৎসরের বৃদ্ধ পিতা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কন্যারই সমবয়সী একটি পঞ্চদশী তরুণীর পাণি পীড়ন করিয়া আর একটি বিধবা তৈয়ারীর পথ পরিষ্কার করিয়া রাখেন, এরূপ দৃষ্টান্ত এখনও একেবারে বিরল নহে। বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত হইলেও নারীর দেবীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ আজও প্রচলিত হয় নাই। হিন্দুদের চক্ষে যে নারী দেবী বেদ-উপনিষদ হইতে তাহার অনেক প্রমাণ পর্য্যন্ত উপস্থিত করা হয়। ফলে হিন্দু-সমাজে দেবীর দেখা অনেকেই মিলে, কিন্তু দেবের দেখা মিলে না। ভারতবর্ষ নারীকে দেবীর মর্য্যাদা দিলেও প্রতীচীর অধিবাসীরা কিন্তু তাহা মোটেই স্বীকার করিতে রাজী নয়। ভারতে নারীর অবস্থা যে ক্রীতদাসীর মত, এই কথাটাই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন। তাই ইংরাজ রাজত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলনে ভারতে নারীমুক্তির আন্দোলন সুরু হইয়াছে, মেয়েরা বি-এ, এম-এ পাশ করিতেছে, স্বাধীনভাবে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু ভারতীয় নারীর দেবীত্ব ঘুচিয়াছে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতীয় নারীর প্রতি যতই অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকাক না কেন, প্রতীচীর নারীরাই তাহাদের পূর্ণ অধিকার কি আজ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? একথা ঠিক যে পাশ্চাত্য নারীরা ভারতীয় নারীদের অপেক্ষা অনেকখানি বেশী অগ্রসর হইয়াছে—অথবা পুরুষ তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিয়াছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া প্রতীচীর নারীরাও পুরুষের সমান অধিকার পায় নাই। ইংলণ্ডে ১৮৮৪ সালে ক্ষেত মজুর-

দিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু সকল নারী তো দূরের কথা ত্রিশবৎসর বয়স্কা নারীদের ভোটাধিকার পাইতেও অনেকদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের কোন রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের উন্নতির জন্য কিছু করে, তখন রাষ্ট্রনায়কদের মনে পড়ে শুধু পুরুষ নাগরিকদের কথা—নারীরা তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়।

এক সময়ে ইউরোপীয় নারীদের অবস্থা ভারতীয় নারীদের অবস্থা অপেক্ষা বেশী কিছু ভাল ছিল না। উইলিয়ম এড্ওয়ার্ড হার্টপোল লেকীর মতে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম প্রচলিত হইলে "যিশু মাতা মেরীর ছবি অঙ্কিত হওয়ার ব্যবস্থার পর হইতে ইউরোপে নারীদের অবস্থা উন্নত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,

"The world is governed by its ideals, and seldom or never has there been one which has exercised a more profound and, on the whole, a more salutary influence than the mediaeval conception of the Virgin. For the first time woman was elevated to her rightful position, and the sanctity of weekness was recognised as well as sanctity of sorrow. No longer the slave or toy of man, no longer associated only with the ideas of degradation and of sensuality, woman rose, in the person of the Virgin Mother, into a new sphere, and became the object of a reverential homage of which antiquity had had no conception. (*Rationalism in Europe*, p. 78).

ভাবধারা দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়, না অন্য কোন শক্তি দ্বারা জগত এবং ভাবধারা দুই-ই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা পরে আলোচনা করিবার স্থল আমরা পাইব। কিন্তু লেকীকে এই প্রশ্ন করিতে হইয়াছে যে, খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপে ডাইনী (witch) অভিযোগে যাহাদিগকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া নারী সম্পর্কে প্রাচীন ইউরোপের কতগুলি ধারণার কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন! ভারতের কোন কোন ধর্মসম্প্রদায়ের নারী সম্পর্কে ধারণার সহিত এই সকল ধারণার যথেষ্ট মিল আছে। এই সকল ধারণারমূলকথা: নারী নরকের দ্বারস্বরূপ। নারী সম্পর্কে কেটো (cato) ঘোষণা করিয়া ছিলেন:

"If the world were only free from women, men would not be without the converse of the gods."

সিসেরো (Cicero) নারীর কথায় বলিয়াছিলেন:

"Many motives will urge men to one crime, but that one passion will impel women to all crimes."

ক্রাইসোস্টম (Chrysostom) নারীকে বলিয়াছেন:

"A neressary evil, a natural temptation, a desirable calamity, a domestic peril, a deadly fascination, and a painted ill."

খৃষ্টান ধর্মের প্রভাব, যিশুজননী মেরীর প্রতি শ্রদ্ধা ইউরোপের খৃষ্টভক্ত পুরুষদের মন হইতে নারী সম্বন্ধে এই সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে পারে নাই। বিজ্ঞানের আবিষ্কার নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিবার পর এই সকল ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, নারীকে আর ঐ রকম হীন চক্ষে পুরুষ দেখে না বটে, কিন্তু ইউরোপে নারী এখনও তাহার অধিকার পাইয়াছে কি? পায় নাই যে সে কথা ঠিক। কিন্তু কেন পায় নাই, তাহার উত্তর পাইতে হইলে নারী সম্বন্ধে উল্লিখিত ধারণার সৃষ্টি কেন হইয়াছিল তাহারও উত্তর আমাদের পাইতে হইবে। আমাদের আরম্ভ করিতে হইবে শুধু সমাজ সৃষ্টির গোড়া হইতেই নয়, একেবারে সৃষ্টির গোড়া হইতে।

প্রথম প্রশ্ন, সৃষ্টিতত্ত্বে নারীর স্থান কোথায়? হিন্দুদের পুরাণে গল্প আছে, ব্রহ্মা প্রথমে শুধু পুরুষই সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই সংসারী হইল না। সংসারী হওয়ার তাহাদের উপায় যে ছিল না, বৃদ্ধ পিতামহ ব্রহ্মার মাথায় এই প্রশ্নটাই বোধ হয় প্রথমে ঢোকে নাই। তাঁহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে। যখন শিখিলেন, তখন সৃষ্টি করিলেন নারী। আমাদের দেশে প্রচলিত একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে যে, প্রথমে নাকি নারিকেল গাছ হইতেই মানুষের জন্ম হইত। শুধু পুরুষ হইত না, নারীও হইত। কিন্তু তবু নারী-পুরুষ মিলিয়া ঘর বাঁধিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ প্রবাহিত রাখিবার জন্য নারিকেল গাছ হইতেই নূতন নরনারীর জন্ম হইত। ব্রহ্মা দেখিলেন, এ তো বড় বিপদ—প্রত্যেক বারই তাহাকে নূতন মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে, এ বড় মুস্কিলের কথা। বুড়া বয়সে কি আর এত পরিশ্রম সহ্য হয়! শেষে বৃদ্ধের মাথায় এক নূতন বুদ্ধি খেলিয়া গেল—তিনি স্থির করিলেন, নারিকেল গাছ হইতে আর মানুষ জন্মিবে না, মানুষ হইতে মানুষের সৃষ্টি হইবে। বিধাতা যখন এই আইন পাশ করিলেন, তখন ঘর বাঁধিবার জন্য মানুষকে আর সাধাসাধি করিতে হইল না। মানুষ নিজের গরজেই ঘর বাঁধিয়া ব্রহ্মার

সৃষ্টিস্রোত অব্যাহত রাখিতে লাগিল। ব্রহ্মাও অনেক পরিশ্রমের দায় হইতে বাঁচিয়া গেলেন। মানুষ সৃষ্টি সম্বন্ধে বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, 'কৃষ্ণের যতেক লীলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' নর অর্থাৎ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আত্মানুরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে একথা না হয় তর্কের খাতিরে মানিলাম, নারী সৃষ্টি হইল কিরূপে এবং কবে এবং কাহার আত্মানুরূপ করিয়া? বৈষ্ণব অবশ্য রাধাকৃষ্ণ যুগল রূপের উপাসক, কিন্তু তাহাতে সৃষ্টিতত্ত্বে নারীর স্থান নির্দ্দেশ করা যায় না।

সৃষ্টিতত্ত্বে নারীকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে। ভগবতী বলিতেছেন, "ঐকৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।"—জগতে তো শুধু এক আমিই তো আছি, আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? শক্তি-উপাসকরা নারীকেই অবশ্য প্রধান স্থান দিয়াছেন। কালীর পদতলে শবরূপী মহাকাল। ভিখারী শিব অন্নপূর্ণার কাছে অন্নপ্রার্থী। এই সব কাহিনী পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের স্মৃতিচিহ্ন কি না বৈজ্ঞানিকরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে আছে, ভগবান প্রথমে শুধু আদমকেই সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাকে দিলেন নন্দন কাননের আধিপত্য। কথায়ই বলে নন্দন কানন— অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, কত বৃক্ষলতা, কত বিচিত্র পশুপাখী। খাওয়া পরারও কোন ভাবনা আদমের ছিল না। কিন্তু তথাপি বেচারী আদমের মনে সুখ নাই— কেমন একটা শূন্যতা। এমনটি যে হইতে পারে তাহা বোধ হয় ভগবান বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যখন বুঝিতে পারিলেন তখন ঘুমন্ত আদমের বুকের পাঁজর হইতে সৃষ্টি করিলেন নারী ইভকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই নারীর জন্যই আদমকে নন্দন-কানন হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। সৃষ্টিতত্ত্বের এই পৌরাণিক আলোচনা হইতে দেখা যায়, সৃষ্টিতে পুরুষের স্থান আদিতে, পুরুষের পরে হইয়াছে নারীর আবির্ভাব। শুধু তাই নয়, নারীই হইয়াছে পুরুষের সকল দুঃখের কারণ।

এই প্রসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বের একটা দার্শনিক দিকও আমরা আলোচনা করিতে পারি। হিন্দুদর্শনের মধ্যে সাংখ্য দর্শনই হইল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন। এই দর্শন অনুসারে সৃষ্টি হইল সম্পূর্ণ রূপে প্রকৃতির কার্য্য—সোজা কথায় নারীর কার্য্য, পুরুষ দর্শক মাত্র। সাংখ্যদর্শন সৃষ্টি কার্য্যে প্রাকৃতিকে প্রাধান্য দিলেও প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ বহু; প্রকৃতি অচেতন, কিন্তু পুরুষ চৈতন্যময়। অচেতন প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইল কিরূপে, সে জন্য সাংখ্যকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রমাণ করিবার জন্য চৈতন্যময় বহু পুরুষের কল্পনা করিতে হইয়াছে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া ধরিয়া লইতে হইয়াছে। তাহাতেও সাংখ্যকার রেহাই পান নাই। চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে অচেতন প্রকৃতি কিরূপে সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে পারে, উপমার সাহায্যে তাহা প্রমাণ করিতে হইয়াছে। সাংখ্যকার যদি সে যুগে না জন্মিয়া বৈজ্ঞানিক জড়বাদের যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার পরিশ্রম অনেক সহজ হইয়া যাইত। সে কথা এখানে আলোচনা করিবার স্থলাভাব। সাংখ্য-দর্শন আলোচনায় আমাদের একমাত্র প্রধান কথা এই যে, আদৌ সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব ছিল নারীর। শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদ গোটা সৃষ্টিকেই বাতিল করিয়া দিলেও, সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্বের আলোচনা উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সৃষ্টিটা রজুতে সর্পভ্রম। কিন্তু এই সর্পভ্রম হইল কেন? না, মায়ার জন্য। কিন্তু মায়া কি? তাহা বলা যায় না, মায়া অনির্ব্বচনীয়া। কিন্তু কেহ যদি বলে যে, সৃষ্টিটা রজ্জুতে সর্পভ্রম নয়, বরং উহা বেদান্তবাদীর নির্ব্বিকল্প সমাধিসুলভ ভ্রান্তি জ্ঞান, এই ভ্রান্তি জ্ঞানের ফলে সর্পকেই তিনি রজ্জু বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন, তাহা হইলে তাহা অপ্রমাণ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার নাই। কিন্তু আমাদের কাছে মায়াবাদের আসল কথা এই যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম সৃষ্টি করিবার জন্য একটি অনাদি সৃষ্টি প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে হইয়াছে এবং এই সৃষ্টিপ্রকৃতিতে আরোপ করা হইয়াছে নারীত্ব। সৃষ্টিপ্রকৃতি, মায়া, অনির্ব্বচনীয়া সমস্তই নারীত্ববোধক। সুতরাং সাংখ্যে এবং বেদান্তে সৃষ্টি-ব্যাপারে নারীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। কথাটা খুব অদ্ভুত, এমন কি স্ববিরোধী বলিয়াও মনে হইতে

পারে। কারণ আজ যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, সন্তানের জন্মের জন্য পুরুষ এবং নারী এই দুই জনের মধ্যে কে অপরিহার্য্য, তাহা হইলে এই প্রশ্ন শুধু হাস্যরসেরই সৃষ্টি করিতে পারে। বর্ত্তমানে প্রজা-সৃষ্টির ব্যাপারে এ কথাটা সত্য হইলে সৃষ্টির ক্রমবিবর্ত্তনের দিক হইতে নারীর সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের একটা বিশেষ অর্থ আছে। এখানে পুরাণ এবং দর্শনকে বাদ দিয়া আমাদিগকে বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে।

বাইবেলের ভগবান আগে আদমকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিনা, অথবা লোকপিতামহ ব্রহ্মা আগে শুধু পুরুষই সৃষ্টি করিয়াছিলেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। এঁদের দুই জনের একজনকেও সাক্ষী মানিবার উপায় আমাদের নাই। উপায় থাকিলে যে খুব সুবিধা হইত এ কথা আমরা অস্বীকার করি না, অন্ততঃ কমিশনে জবানবন্দী করাইতে পারিলেও আমরা তাহাতেও রাজী হইতাম। কাজেই সে আশা ছাড়িয়া হাতের কাছে যে সাক্ষী পাওয়া যায় তাহাই আমাদের মানিয়া লওয়া ছাড়া আর উপায় কি? আমাদের এই সাক্ষী বায়োলজী বা জীববিজ্ঞান। জীববিজ্ঞানের দিক হইতে প্রাণ-জগতের বিবর্ত্তনে পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে পরে, পুরুষ যেন নির্জ্ঞান প্রকৃতির উত্তর-চিন্তার ফল। পুরুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, পুরুষ একটা ব্যতিক্রম বা variation; তাহার এই বৈশিষ্ট্যকে দ্বন্দ্ব বা frictionও বলা যাইতে পারে। প্রাণ-জগতে যেমন পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে পরে, সমাজ-জীবনেও তেমনি পুরুষপ্রাধান্য পরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহজাত প্রবৃত্তিই প্রথম মানবিক শক্তি। সমাজ-ব্যবস্থার আদিতে জননীর মাতৃত্ব-বৃত্তিই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং এইজন্য মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই আদিম সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে-যুগে পিতা হিসাবে পুরুষের খুব শ্রেষ্ঠ স্থান কিছু ছিল না। জননীকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে পরিবার ও গোষ্ঠী। এই পরিবার ও গোষ্ঠীই সমস্ত সভ্য সমাজের আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। তৎকালীন সামাজিক অবস্থা পরিবারের মধ্যে জননীকেই দিয়াছিল প্রধান স্থান। মাতৃকুলাত্মক বিবাহই ছিল গোষ্ঠীর বন্ধনসূত্র অর্থাৎ নারী এবং গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধনসূত্র ছিল বিবাহ। সন্তান-সন্ততিরা মাতার নামেই পরিচয় দিত, সম্পত্তির মালিকও ছিল নারী। সুতরাং দেখা যাইতেছে সৃষ্টিতত্ত্বেই নারীর স্থান শুধু আদিতে নয়, সামাজিক জীবনেও প্রথমে নারীরই ছিল প্রধান্য বা আধিপত্য। নারী অনেক দিন হয় সেই আধিপত্য হারাইয়াছে, শুধু হারায়ই নাই, হইয়াছে একান্তভাবে পুরুষের অধীন। আদিতে নারীরই আধিপত্য ছিল কেন, কেনই বা সেই আধিপত্য নারী হারাইল এবং পুরুষের অধীন হইল কেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমাদিগকে পাইতে হইবে, নারীর অধিকারের দাবীর ন্যায্যতা যদি প্রমাণ করিতে হয়।

কোন এককালে নারীরই ছিল আধিপত্য, এ কথায় অনেকেই হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন, জানেন মশায়, শাস্ত্রে আছে, পিতা রক্ষতি কৌমারে। জানি, এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য নাই—কুমারী কালে থাকে পিতার রক্ষণাবেক্ষণে, যৌবনে ভর্ত্তার এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের, স্বাতন্ত্র্য আর কি করিয়া থাকিবে? জানিলেও এটাই যে সনাতন ব্যবস্থা—ভগবান নারীদের জন্য এই বিধানই করিয়া গিয়াছেন এ কথা মানা হয় না। অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনীয়তাও ফুরাইয়া যায় না। মাতৃকুলাত্মক পরিবারের কথা মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে, ভুলিবার পক্ষে যত কিছু ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন পিতৃকুলাত্মক পরিবারের যুগে তাহা করিবার কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই। এই বিস্মৃতির জন্যই বর্ত্তমান যুগে কোন অসভ্য জাতির মধ্যে মাতৃকুলাত্মক পরিবার দেখিলে উহা অনেকের কাছে ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয়। স্যার ই. বি. টেইলর মাতৃকুলাত্মক পরিবার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

"Yet this widespread law of female descent, deep as it lies in the history of society, had been so lost sight of among the ancient civilized nations, that when Herodotus noticed it among the Lykians, who took their names from their mothers and traced their pedigrees through the female branches only, the historian fancied this was a peculiar custom, in which they were unlike all other people. (*Anthropology*, Vol. II, p. 132).

আমরা সাধারণতঃ মনে করি, আমাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানকে বর্ত্তমানে যে আকারে দেখিতেছি, আবহমান কাল হইতে এই আকারই চলিয়া আসিতেছে। এই বিশ্বাস

যে শুধু আমাদের দেশেই আছে তাহা নয়, ইউরোপেও ছিল এবং এই বিশ্বাসের প্রভাব ইউরোপও বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। বাইবেলের পুরাতন পর্য্যায়ের প্রথম পাঁচ খণ্ডে পিতৃকুলাত্মক পরিবারের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। উহাই যে পরিবারের আদিমতম রূপ তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শুধু তাই নয় বাইবেল-কথিত পিতৃকুলাত্মক পরিবারের একজন পুরুষের বহু স্ত্রী থাকাটা বাদ দিয়া ইউরোপের বুর্জ্জোয়া পরিবারের সহিত তাহার ঐক্যও মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। সুতরাং পিতৃকুলাত্মক পরিবারের প্রথা যে সনাতন তাহা একরূপ স্বীকার করিয়াই লওয়া হইত এবং এখনও অনেকে স্বীকার করেন। সুদূর অতীতে—এত সুদূর অতীত যে তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত মানুষের নাই—বিবাহ-প্রথা আদৌ হয়ত মানব-সমাজে ছিল না, এইরূপ অবশ্য অনেকেই মনে করেন। শ্বেতকেতু মুনি কেন এবং কিরূপে বিবাহ-প্রথা প্রচলন করিয়াছেন, তাহার কাহিনীও আমরা মহাভারতে পড়িয়াছি। কিন্তু পরিবার যখন প্রথম সৃষ্টি হইল তখন এখনের মতই পিতৃকুলাত্মক পরিবারই সৃষ্টি হইয়াছিল ইহা এখনও অনেকের বিশ্বাস।

মাতৃকুলাত্মক পরিবারের স্মৃতিচিহ্ন আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের মধ্যে দুই-একটা হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করার কোন চেষ্টা এই পর্য্যন্ত হয় নাই। নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার মুখে প্রথম অন্ন তুলিয়া দিবার মুখ্য অধিকারী মামা। মেয়ে বিবাহের সময় মাতুলই কন্যা সম্প্রদানের মুখ্য অধিকারী। সম্প্রদানের মুখ্য ব্যাপারে পিতা কেহই নন, বরং পিতা সম্প্রদান করিলে কন্যা অসুখী হয় এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। বিলুপ্ত মাতৃকুলাত্মক পরিবারের এইগুলি স্মৃতিচিহ্ন কিনা, তৎসম্পর্কে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। পিতৃকুলাত্মক পরিবার যে খুব দূর অতীতেই সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের পুরাণে পরশুরামের মাতৃহত্যার কাহিনী বর্ণিত আছে। এই কাহিনীটি মাতার অধিকারের বিরুদ্ধে পিতার অধিকারের নিশ্চিত বিজয়-প্রতিষ্ঠা প্রমাণিত করিতেছে। পরশুরামের মা ঘাটে যাইতেছিলেন। তাঁহার আঁচল হইতে একটি বিল্বপত্র ঝুলিতেছিল। বেলপাতাটির লোভে মহাদেব মানুষরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার পিছন পিছন যাইতেছিলেন। ব্যাপারটি পরশুরামের পিতা জমদগ্নি মুনির দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি পত্নীর একনিষ্ঠায় সন্দেহ করিয়া পুত্র পরশুরামকে মাকে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। পরশুরাম পিতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন বটে, কিন্তু মাতৃহত্যার পাপ হইতে রক্ষা পাইলেন না—তাঁহার হস্তস্থিত কুঠার আর হস্ত হইতে স্খলিত হইল না। তীর্থ ভ্রমণ করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। যে-যুগের এই কাহিনী সে-যুগে মাতার অধিকারের আর চিহ্নমাত্রও ছিল না। এই মাতৃহত্যার ব্যাপারটিকে একটা ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাখ্যায় আবৃত রাখা হইয়াছে। ফলে উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য আমাদের নিকট অপ্রকাশিতই রহিয়া গিয়াছে।

গ্রীক পুরাণেও একটি মাতৃহত্যার কাহিনী আছে। ট্রোজান যুদ্ধের নেতা আগামেমনের (Agamennon) নাম আমাদের পরিচিত। ট্রয় নগরী ধ্বংস করিয়া তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রা (Clytemnestra) তাহার প্রণয়ীর প্ররোচনায় তাঁহাকে হত্যা করে। আগামেমনের পুত্র ওরেস্‌টেস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মাতাকে হত্যা করে। মাতার অধিকারের রক্ষক ফিউরিত্রয় (Furies) ইহার প্রতিশোধ লইতে চায়। ওরেস্‌টেসের পক্ষাবলম্বন করিল এপোলো। এথেনার উপর বিচারের ভার পড়িল। ওরেস্‌টেস যুক্তি প্রদর্শন করিল যে, তাহার মা দুইটি অপরাধ করিয়াছে—একটি অপরাধ স্বামীকে হত্যা করা, আর একটি অপরাধ ওরেস্‌টেসের পিতাকে হত্যা করা। সুতরাং তাহার মা তাহার অপেক্ষা বেশী অপরাধী। ফিউরিরা যুক্তি প্রদর্শন করিল, ক্লাইটেম্‌নেষ্ট্রা যে-পুরুষকে হত্যা করিয়াছে তাহার সহিত তাহার রক্তের সম্পর্ক নাই। ("She was not kin by blood to the man she slew")। সুতরাং যাহার সহিত রক্তের সম্পর্ক নাই সে ব্যক্তি যদি স্বামীও হয়, তাহা হইলে কি আসে যায়! কিন্তু রক্তের সম্পর্ক আছে বলিয়া মাতৃহত্যা গুরুতর অপরাধ। এথেন্সবাসী যে সকল জুরী লইয়া এথেনা এই বিচার করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে দুই মত দেখা গেল। কতক জুরী বলিল, ওরেস্‌টেস

অপরাধী, কতক বলিল অপরাধী নয়, দুই দিকেই সমান ভোট। শেষে এথেনার কাষ্টিং ভোটে ওরেস্‌টেস্‌ মুক্তি পাইল। এথেন্সবাসী জুরীরা দুই মত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে, তৎকালে এক বিবাহ প্রথার অভ্যুত্থান হইলেও, নারীর অধিকার কিছু খর্ব্ব হইলেও মাতার দিক হইতেই বংশপরম্পরা গণনা হইত। এই বিচারের ফলে মাতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল।

সমাজের ভিত্তি পরিবার। এক পরিবার ভাঙিয়া বিভিন্ন পরিবারের সৃষ্টিতে হইল গোষ্ঠীর উৎপত্তি। বিভিন্ন গোষ্ঠী মিলিয়া হইল কৌম (tribe)। বিবাহ-প্রথা যখন প্রচলিত ছিল না, তখন পরিবারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বিবাহ-প্রথার সৃষ্টিতে গঠিত হইল পরিবার। কিন্তু এই বিবাহ বর্ত্তমান যুগের নারীর এক বিবাহ-প্রথা নয়। বর্ত্তমান যুগে যে এক বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে তাহা আসলে নারীর এক বিবাহ। ইহার ব্যতিক্রম পাশ্চাত্য দেশে যেখানে এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুরুষের দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করা আইনসিদ্ধ নহে। নারীর এক বিবাহ ছাড়া পুরুষের বহু বিবাহ পৃথিবীর অনেক স্থানেই এখনও প্রচলিত অর্থাৎ আইনসিদ্ধ রহিয়াছে, যদিও অর্থনৈতিক চাপে পড়িয়া মধ্যবিত্ত পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা এখন আর সম্ভব হয় না এবং বর্ত্তমানে উহা কতকটা রীতিতে পরিণত হইয়াছে। নারীর একবিবাহ এবং পুরুষের এক এবং বহু বিবাহ ছাড়া, নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ কোথাও কোথাও এখনও প্রচলিত আছে। কিন্তু সুদূর অতীতে প্রথম যখন বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইল, তখন যে-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইল তাহা ওয়েষ্টারমার্কের কথিত মত নারীর একবিবাহ নয়, উহা ছিল সমষ্টি-বিবাহ। (group marriage)। ওয়েষ্টারমার্কের মতবাদ খণ্ডিত হইলেও, তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদের বিরুদ্ধে উপেক্ষা এবং নীরবতার ষড়যন্ত্র কেন চলিয়াছে তাহা এখানে আলোচনা করিবার স্থলাভাব। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তির ইতিহাসে ইহা একাধিকবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিজ্ঞানীদের পক্ষেও নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনা করা বড় কঠিন, বিশেষতঃ যদি এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানবপ্রকৃতি এবং মানবসমাজের মূল উৎস সম্পর্কে হয়।

সমষ্টি-বিবাহের অর্থ একই কৌমের অন্তর্গত একদল পুরুষ আর একদল নারীকে বিবাহ করে। অনেকে বলেন, এইরূপে বিবাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সমষ্টি-বিবাহে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় তাহা দেখা দরকার। পরিবারে সীমার মধ্যে সমস্ত পিতামহ এবং পিতামহীরা পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। তাহাদের পুত্র-কন্যারা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী অর্থাৎ পিতা এবং মাতা। তৃতীয় স্তরে আসিল তাহাদের পুত্র-কন্যা, তাহারাও পরস্পর স্বামী-স্ত্রী। এই জিনিষটা বর্ত্তমান যুগে খুবই শকিং বলিয়া মনে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? দ্বিতীয়তঃ যে-সময় এইরূপ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত, তাহার বিশেষ কিছুই বিবরণ পাওয়া যায় না। নির্ভর করিতে হয় অবস্থা ঘটিত প্রমাণের উপর—এই প্রমাণ আবার অনেক অদ্ভুত কাহিনী দ্বারা আবৃত। কিন্তু সহোদর ও সহোদরার মধ্যে যে বিবাহ হইত 'যম' ও 'যমী'র কথোপকথনে তাহার ইঙ্গিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য এবং তাঁহার সহোদরা পিপ্পলাদ ঋষির জনক-জননী। হিন্দু-শাস্ত্র ঘাঁটিলে আরও অনেক এইরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। সীজার বৃটনদের সম্পর্কে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহাতে সমষ্টি-বিবাহের আভাষ পাওয়া যায়।

সহোদর এবং সহোদরার মধ্যে বিবাহ-প্রথা যখন নিষিদ্ধ হইল, তখন সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমবিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইল আর এক ধাপ। হঠাৎ বা একদিনে বা এক পুরুষে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই, হইয়াছে ক্রমে ক্রমে। সমষ্টি-বিবাহের যুগে যে পরিবার তাহাকে আমরা বলিতে পারি গোত্র-পরিবার বা Consanguine family. সহোদর সহোদরার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার পর যে পরিবার সৃষ্টি হইল তাহাকে বলা হইয়া থাকে 'পুনালুয়া' পরিবার। পুনালুয়া শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ সহচর বা অংশীদার। মর্গ্যান এই পুনালুয়া পরিবার সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বা nattural selection-এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলিয়া অভি-হিত করিয়াছেন। সহোদর-সহোদরা বিবাহ যখন অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইল, তাহার প্রতিক্রিয়া গৃহস্থালীর মধ্যেও দেখা দিল অর্থাৎ সাবেক গৃহস্থালী ভাঙিয়া অপর নূতন পরিবারের সৃষ্টি হইল। অনেকে মনে করেন কুল বা গোষ্ঠীর উৎপত্তি এই পুনালুয়া পরিবার হইতেই হইয়াছে।

সমষ্টি বিবাহ যতদিন প্রচলিত ছিল ততদিন পিতৃ-পরিচয় নির্দ্ধারণ করার অনেক অসুবিধা ছিল। কিন্তু সন্তান কাহার গর্ভজাত তাহা জানিবার কোনই অসুবিধা ছিল না। কাজেই বংশপরিচয় যে মেয়েদের দিক দিয়াই নির্দ্ধারণ করা সম্ভব ছিল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। সন্তানরা উত্তরাধিকারী হইত মায়ের। অসভ্য যুগের (Savagery) সবটা এবং বর্ব্বর যুগের (Barbarism) প্রথম দিকে কতক অংশ ছিল সমষ্টি বা যৌথ-বিবাহের যুগ। সমষ্টি বিবাহের পরিবর্ত্তে যখন পুনালুয়ান বিবাহ প্রচলিত হইল তখন পরিবারের সীমাও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। সমষ্টি-বিবাহের যুগে এক কৌমের সব স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ছিল এক-পরিবার। প্রথমে খুব নিকটবর্ত্তী এবং ক্রমে ক্রমে দূর হইতে দূরতর আত্মীয়ের মধ্যেও বিবাহ করা যখন নিষিদ্ধ হইল তখন সমষ্টি-বিবাহ আর সম্ভব হইল না, পরিবারের সীমান্তও সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ সমষ্টি-বিবাহের যুগের সমাজ-স্তরের লোকেরা ছিল যাযাবর অসভ্য, কিন্তু পুনালুয়া পরিবার যখন গঠিত হইতে আরম্ভ করিল তখন আদিম সাম্যবাদী মানবগোষ্ঠী (Communities) কোন-না-কোন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এক জননীর গর্ভজাত পুত্র কন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে সহোদরা ভগ্নীদের এক বা একাধিক বংশ মিলিয়া নূতন গৃহস্থালীর গোড়াপত্তন করিল এবং তাহাদের সহোদর ভ্রাতারা গোড়াপত্তন করিল আর একটি গৃহস্থালীর। কৌম দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। সব ভগ্নীদের মিলিয়া যৌথ স্বামীরা থাকিত বটে, কিন্তু তাহাদের ভাইরা আর তাহাদের স্বামী হইতে পারিত না। এই ভগ্নীদের স্বামীরা আর তাহাদের ভাই নয়, তাহারা পুনালুয়া অর্থাৎ ঘনিষ্ঠ সহচর। এই ভগ্নীদের ভ্রাতাদের গৃহস্থালীতেও স্ত্রীলোক থাকিত, কিন্তু তাহারা ভগ্নী নয়, তাহারাও পুনালুয়া। মর্গ্যান ইহাকেই পুনালুয়া পরিবার বলিয়াছেন। পুনালুয়া পরিবারের ইহা আদি রূপ। ক্রমে যতই দূরবর্ত্তী আত্মীয়ের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ হইতে লাগিল, পরিবারেরও নানা রকম রূপ দেখা দিতে লাগিল। সম্বন্ধের মধ্যেও পরিবর্ত্তন দেখা দিল, কিন্তু ইহা বুঝিবার জন্য আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন পরিবার তখনও মাতৃকুলাত্মক অর্থাৎ বংশ এবং সম্বন্ধ ধরা হইত মায়ের দিক দিয়া। অর্থাৎ 'ক'-এর মাসীদের যে পুত্রকন্যা তাহারা 'ক'-এর মায়েরও পুত্রকন্যা। 'ক'-এর কাকা-জেঠার পুত্রকন্যারাও 'ক'-এর পিতার পুত্র-কন্যা। কিন্তু 'ক'-এর মামার পুত্রকন্যারা 'ক'-এর মায়ের ভাইপো ও ভাইঝি। তেমনি 'ক'-এর পিসতুত ভাই-বোনেরা 'ক'-এর বাবার ভাগিনা ও ভাগ্নী। দূরবর্ত্তী ভ্রাতা-ভগ্নীদের মধ্যেও যখন বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, তখন যাহাদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল তাহাদিগকে লইয়া নারী পরম্পরা রক্তের সম্বন্ধবিশিষ্ট একটি মণ্ডলী গঠিত হইল এবং এই মণ্ডলীই পরিণত হইল গোষ্ঠীতে।

বিবাহ-প্রথার বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা হইতে যে নূতন পরিবার সৃষ্ট হইল তাহার নাম pairing family বা যুগল পরিবার। সমষ্টি-বিবাহ প্রচলিত থাকার সময়েও এমন কি তাহারও পূর্ব্বেও সময় সময় দুইজন নারী-পুরুষের অল্প সময় বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালের জন্য স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। ইহাকে বলা যায় যুগল বিবাহ বা pairing marriage। যাহা পূর্ব্বে সাময়িক ছিল বা ব্যতিক্রম ছিল বিবাহ-সম্বন্ধে বিধিনিষেধের জটিলতা তাহাই রীতিতে পরিণত হইল। এই ব্যবস্থায় একজন পুরুষ এবং একজন নারী স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত। কিন্তু পুরুষের বহু পত্নীত্ব অধিকারটাও ছিল, যদিও অর্থনৈতিক কারণে পুরুষ এই অধিকার ব্যবহার করিবার সুযোগ কম পাইত। দ্বিতীয়তঃ, পুরুষের নিকট একনিষ্ঠা তেমন দাবী করা হইত না, যদিও স্ত্রীলোকের নিকট সতীত্বের দাবীটা ছিল খুব কঠোর অন্ততঃ যত দিন যুগল-বিবাহ সম্বন্ধ ছেদন করা না হইত। এই যুগল-বিবাহ ছিন্ন করাও খুব সহজ ছিল—স্বামী কিম্বা স্ত্রী যে কেহ ইচ্ছা করিলেই এই বিবাহ সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পারিত। বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইলে পুত্র কন্যারা মায়ের অধিকারেই থাকিত।

রক্তের সম্বন্ধ বর্জ্জিত নরনারীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে মর্গ্যান লিখিয়াছেন:

"The influence of the new practice, which brought unrelated persons into the same marriage relation, tended to create a more vigorous stock physically and mentally. . . . When two advancing tribes, with strong mental and physical characters, are brought together and blended into one people by accidents of barbarous

life, the new skull and brain would widen and lengthen to the sum of capabilities of both. (*Ancient Society*, p. 459).

যুগল-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হওয়ার পর হইতে হরণ-বিবাহ (marriage by capture) এবং কন্যা ক্রয় দ্বারা বিবাহের (marriage by purchase) উদ্ভব হইয়াছে। এই দুইটিকে ঠিক বিবাহ-প্রথা না বলিয়া স্ত্রী সংগ্রহের উপায় বলিলে ঠিক হয়। মানব-সমাজে যে আরও গভীর ও গুরুতর পরিবর্ত্তন আসিতেছিল স্ত্রী সংগ্রহের এই উপায় দুইটি তাহারই পূর্ব্বলক্ষণ। কিন্তু পরিবর্ত্তন আনিতে হইলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া প্রয়োজন শুধু যুগল-বিবাহের পক্ষে তাহা আনয়ন করা সম্ভব ছিল না। আদিম সাম্যবাদী গৃহস্থালী ভাঙিয়া নূতন স্বাধীন গৃহস্থালী পাতিবার সামর্থ্য যুগল-বিবাহের ছিল না। যে-পর্য্যন্ত না নূতন সামাজিক শক্তির উদ্ভব হইয়াছে সে-পর্য্যন্ত শুধু যুগল-বিবাহ নূতন রকমের পরিবার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বস্তুতঃ পরিবার একটি সজীব এবং সক্রিয় প্রতিষ্ঠান, উহা কখনই স্থাণুর ন্যায় অচল নয়। পরিবার ক্রমশঃ নিম্নতর হইতে উচ্চতর রূপ গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু পরিবারের এই রূপান্তর সমাজবিবর্ত্তনের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সমাজ যতই নিম্নতর পর্য্যায় হইতে উচ্চতর পর্য্যায় উঠিতে থাকে পরিবারও তেমনি সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত তাল রাখিয়া পরিবর্ত্তিত হয়।

সাম্যবাদ সকলে মানুক আর নাই মানুক, একথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, পৃথিবীতে মানুষের প্রাধান্যের মূল তাহার খাদ্য উৎপাদন-সামর্থ্যের-নৈপুণ্য। এ কথাও অতি সত্য যে, পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই খাদ্য উৎপাদনের স্বাধীন শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে প্রকৃতির প্রতিকূলতার সহিত লড়াই করিয়া। সুতরাং ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নয় যে, মানুষের এই খাদ্য উৎপাদনের নূতন নূতন সামর্থ্য অর্জ্জন নূতন নূতন সামাজিক উন্নতির ভিত্তি স্বরূপ হইবে। সমাজের ধারা অব্যাহত রাখিতে হইলে প্রজা সৃষ্টির ধারাও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। মানব-ইতিহাসের বিশেষ যুগে মানুষ যে-সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় খাদ্য উৎপাদন এবং প্রজাসৃষ্টির রীতি দ্বারা। মানব-সমাজের আদিম স্তরে মানুষের খাদ্য উৎপাদন শক্তি ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অতি নগণ্য; সুতরাং সামাজিক সম্পদও ছিল অতি সামান্য। সমাজের উৎপাদন শক্তি যত সঙ্কীর্ণ থাকে, সম্পদ যত সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজ-ব্যবস্থায় ততই অধিক পরিমাণে গোষ্ঠীর প্রাধান্য দেখা যায়। গোষ্ঠীর প্রাধান্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের খাদ্য উৎপাদন শক্তি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে আসে বিনিময়-প্রথা। বিনিময়-প্রথার যতই প্রসারপ্রতিপত্তি হইতে থাকে, সমাজে ধনবৈষম্য ততই প্রবলতর হইয়া উঠে। ধনবৈষম্য-জনিত ধনী দরিদ্রের সৃষ্টিই ধনীকে দেয় দরিদ্রের শ্রমশক্তি শোষণ করিবার সুযোগ। উৎপাদন শক্তি ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়।

উৎপাদন-ব্যবস্থার যে-যুগে যুগল-বিবাহ প্রথার সূচনা হইল সে-যুগে পারিবারিক ব্যবস্থা ধন-সম্পদের নিয়ন্ত্রণাধীন আসে নাই, ধনসম্পদই ছিল পারিবারিক নিয়ন্ত্রণের অধীন। কিন্তু ইতিমধ্যে উৎপাদন-শক্তির এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বর্ব্বর-যুগের প্রথম দিকে স্থায়ী সম্পদের তালিকা অতি ক্ষুদ্র! বাড়ী-ঘর কাপড়-চোপড়, গয়নাগাটি খাদ্য উৎপাদন বা সংগ্রহের অতি মোটা রকম যন্ত্রপাতি, খাদ্য রান্না করিবার বাসন-কোসন ইত্যাদি। দিনের খাদ্য দিনই সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল পশুপালনের যুগে! ইউফ্রেটিশ ও তাইগ্রিস নদীতীরে সেমেটিক জাতিকে এবং ভারতের পঞ্চনদের তীরে, গঙ্গার তীরে আর্য্যজাতিকে আমরা গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি-পশুপালের সম্পদে সমৃদ্ধ দেখিতে পাই। খাদ্যউৎপাদন অনেকটা সহজ হইয়া গিয়াছে—কঠোর পরিশ্রম করিয়া বন্যজন্তু শিকার করিতে হয় না, সামান্য যত্ন লইয়া গৃহপালিত পশুগুলিকে প্রতিপালন করিলেই খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত থাকিয়া যায়—দুধ, মাংস ইত্যাদি নিয়মিতভাবে মিলিয়া থাকে। কিন্তু এই সম্পদের মালিক তখনও গোষ্ঠী। এই পশুপাল কোন সময় গোষ্ঠীর সম্পত্তি হইতে পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হইল তাহা বলা

কঠিন। যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে আমরা সম্পত্তিতে পরিবারের মালিকত্ব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই—সম্পত্তিতে অধিকার পরিবারের সকলেরই শুধু পরিবারের কর্ত্তার নয়। এই যে পারিবারিক সাম্যবাদ বা family communism তাহা আজিও ভারতের যে-সকল অঞ্চলে মিতক্ষরা আইন প্রচলিত আছে সেই সকল অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। জীমূতবাহনের দায়ভাগ বাংলায় সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। প্রকৃত হিন্দু যৌথ পরিবার মিতাক্ষরা শাসিত পরিবারেই দেখা যায়। বাংলার যৌথ-পরিবার আসলে বোর্ডিং হাউস বা জয়েন্ট মেসিং (joint messing)। কি দায়ভাগ শাসিত বাংলায় কি মিতাক্ষরা শাসিত ভারতের অন্যত্র সম্পত্তি যে এককালে গোষ্ঠীর ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনে। মুখ্যাধিকারিত্ব বা priority আছে বটে, কিন্তু একের অভাবে অন্যে এই ভাবে পরপর এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জ্ঞাতিই মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মৃত ব্যক্তির মাতুলও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধান অবস্থা বিশেষ আছে। বাইবেলের ওল্ডটেষ্টামেন্টের প্রথম খণ্ডে এব্রাহামকে আমরা পরিবারের সমস্ত পশুপালের মালিকরূপে দেখিতে পাই। এব্রাহামের এই অধিকার মিতাক্ষরা শাসিত হিন্দু-যৌথ পরিবারের কর্ত্তার মত, না ব্যক্তিগত অধিকার, বাইবেল হইতে তাহা ঠিক বোঝা যায় না। তবে একথা ঠিক যে বাইবেলের এব্রাহাম পিতৃকুলাত্মক পরিবারেরই সূচনা করিতেছে। প্রামাণ্য ইতিহাসের গোড়ায়-পরিবারের কর্ত্তাকে পৃথকভাবে কতগুলি জিনিষের মালিকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পত্তিতে যখন পরিবারের স্বতন্ত্র অধিকার তখন সম্পদের পরিমাণই শুধু দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল না, এই বর্দ্ধিত সম্পদ মাতৃকুলাত্মক পরিবারের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ-ব্যবস্থার মূলেও করিল প্রচণ্ড আঘাত। সমাজে তখন যুগল-বিবাহের প্রচলন হওয়ায় পিতৃপরিচয়ের প্রমাণও খুব সহজলভ্য হইয়া পড়িয়াছে। সন্তানের জননী এবং জনক দুই জনকেই যখন চিনিতে পারা গেল এবং সম্পদেরও বৃদ্ধি হইল তখনই সম্ভব হইয়াছে নূতন ধরণের পরিবার প্রতিষ্ঠা করা।

পরিবারের মধ্যে শ্রম বিভাগ ছিল। খাদ্য সংগ্রহ করা বা উৎপাদন করা ছিল পুরুষের কাজ। খাদ্য সংগ্রহ বা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির মালিকও ছিল পুরুষ। যুগল-বিবাহের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন যখন ছিন্ন হইয়া যাইত তখন স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নিজ নিজ সম্পদ ভাগ করিয়া লইত, কিন্তু সন্তানের উপর অধিকার ছিল মায়ের। পুত্র-কন্যারা মায়ের সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হইত, বাপের সম্পত্তির হইত না। মাতৃকুলাত্মক পরিবারে নারী পরম্পরা বংশধারা নির্দ্দেশ করা হইত। কিন্তু গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়া যখন যুগল-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইল তখন স্বামী এবং স্ত্রী হইল পরস্পর ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক। কাজেই পুরুষের যে সম্পত্তি তাহার উত্তরাধীকারী হইত তাহার গোষ্ঠীর লোকেরা, তাহার নিজের পুত্র-কন্যারা কিছুই পাইত না। পুত্র-কন্যারা মায়ের গোষ্ঠীর অন্যান্যদের সঙ্গে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইত। সম্পত্তির পরিমাণ যখন সামান্য ছিল তখন ইহা লইয়া কেহ মাথা ঘামাইত না। পুরুষের মৃত্যুর পর তাহার সামান্য সম্পত্তির জন্য তাহার গোষ্ঠীর লোকেরাও তেমন উদ্‌গ্রীব ছিল না। মাতৃকুলাত্মক পরিবার বলিয়া পুত্র-কন্যারা পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইত না, হইত মায়ের গোষ্ঠীভুক্ত। পুরুষ দেখিল, তাহার সম্পত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে তাহার পুত্র-কন্যাকেও নিজের ঔরসজাত বলিয়া চিনিতে পারিল, কিন্তু মহা মুস্কিল এই যে, তাহার সম্পত্তি সে তাহার পুত্র-কন্যাকে দিয়া যাইতে পারে না, তাহার সম্পত্তি পায় তাহার গোষ্ঠীর লোকেরা। অবস্থাটা দাঁড়াইল এইরূপ: গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশুপালের মালিক পুরুষের যখন মৃত্যু হইল, তখন এই পশুপাল তাহার পুত্র-কন্যারা পাইল না, পাইল কে, না তাহার ভ্রাতা-ভগ্নীরা, এবং তাহার ভগ্নীদের পুত্র-কন্যারা অথবা তাহার মাসীদের ছেলেমেয়েরা। পুরুষের মন এই অবস্থায় আঘাতপ্রাপ্ত হইবেই তো! সে তাহার ঔরসজাত পুত্র-কন্যাকে চিনিয়াছে, তাহার সম্পদ পশুপালেরও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, পরিবারে

নারীদের অপেক্ষা তাহার গুরুত্বও বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং সে তাহার অর্থনৈতিক শক্তিকে সন্তানের অনুকূলে উত্তরাধিকার প্রথা পরিবর্ত্তনের জন্য নিয়োজিত করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কিন্তু ইহা একটা সামাজিক বিপ্লব। কবে এবং কি উপায়ে এই বিপ্লব সাধিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু হইয়াছে যে তাহা ঠিক। এই বিপ্লবের ফলে মাতৃকুলাত্মক পরিবার ধ্বংস হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে গেল নারীর অধিকার ও মর্য্যাদা। নারীকে যদি এই অধিকার ও মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইতে হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের দৃষ্টিতেই সমাজ-বিবর্ত্তনের ধারাটি সন্ধান করিয়া, এই অধিকার লাভের পথটি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আগামীবারে সে-সম্পর্কে আমরা আলোচনা করিব।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

মাতৃভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী"

পঞ্চম বর্ষ | আশ্বিন, ১৩৫০ | ৯ম সংখ্যা

চিত্তধারা

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

মানুষের অন্তরের দুটো দিক আছে। একটা দিক তার জীব-ধর্ম্ম ও বিষয়-বুদ্ধির গরজে দৈনন্দিন নানাপ্রকার তুচ্ছ হীনতা ও ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে বস্তুবাদকে মেনে চলে; বিশেষ করে এটা তার পার্থিব কর্ম্মময়তার দিক। আর একটা হচ্ছে তার আত্মিক, অর্থাৎ ধ্যানের দিক; অতীন্দ্রিয় সাধনার মাঝ দিয়ে সে চায় পার্থিব দুঃখ-দুর্দ্দশা ও বিষয়-বুদ্ধির অতি উর্দ্ধে একটা শান্তি-নিরাপত্তার আশ্রয়ে জীবনের যথার্থ কল্যাণ সৃষ্টি ক'রতে। দু'দিক থেকে এ' দু'টি বিরুদ্ধ ধারা এসে প্রতিনিয়ত মানুষের চিত্তের পর্দ্দায় আঘাত ক'রচে। দেখা যায়—মানুষের মন তা'হলে একক্ নয়। একদিকে সে যেমন বস্তুবাদী, অন্যদিকে ভাববাদীও বটে। কোনো অংশকে কোনোটা থেকে পৃথক করে' মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে আমরা ভাব্‌তে পারি না। তবে একটা বিষয় মাত্র বলা চলে যে, জ্ঞানী বা অজ্ঞান চিত্তের অবচেতন মুহূর্ত্তে এক অংশের কাজ আর এক অংশ থেকে অনেকটা বেশী দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে। কারণ, যে বিচারদৃষ্টি দ্বারা মানুষ নিজেকে পরীক্ষা করবে, যে অনুভূতি দ্বারা সে নিজের আসল সত্তাকে জান্‌তে পারবে,—অবচেতনাবস্থায় তা' তার কাছে থাকে সুপ্ত··· অপরিজ্ঞাত। মানুষ যখন যথার্থ তার মানবীয় জীবন সম্বন্ধে প্রকৃত চৈতন্যশীল হ'য়ে ওঠে,—তখনই তার ভালো-মন্দের আসল বোধশক্তি আসে, আলো-অন্ধকারের রূপ নির্ণয় করবার শৈল্পিক্ দৃষ্টি জাগে। এই যে চৈতন্যশক্তি,—তা' একদিকে যেমন জ্ঞান ও চিন্তার মাঝ দিয়ে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, আবার কোনো একটা অসংবদ্ধ অবস্থার মধ্যেও স্বতঃউৎসারিত হ'য়ে উঠ্‌তে দেখা যায়।···

—বাল্মীকি মুনির যখন শুধু দস্যুবৃত্তিই জীবনের চরম আদর্শ ও পরম প্রাণধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল, অন্তরের অতীন্দ্রিয় দিকটা তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রবুদ্ধশক্তির অভাবে অচৈতন্য সত্তার মধ্যেই তাঁর মিশে ছিল,···চিত্তের কঠিন জৈবিক লালসা তাঁর মধ্যে তখন এমন পশুত্বের সৃষ্টি করেছিল, যা' একমাত্র দস্যুবৃত্তিকে আশ্রয় করে তীর আর ধনুক নিয়ে প্রাণী শীকার করা ভিন্ন অন্যপথ ছিল না। এখানে তাঁর যে বিষয়-বুদ্ধির মোহ,—তা' একান্তভাবে নৈর্ব্যক্তিক্ মনের পশুভাবেরই একমাত্র পরিচায়ক। জীবনের সোজা পথের আলোয় তাঁর সত্তা তখন মিশে যেতে পারেনি।··· কিন্তু এই দস্যুই এক সময় ঋষিত্বে পরিণত হলেন। তাঁর কণ্ঠেও এক সময় জেগে উঠলো—"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম গম শাশ্বতি সমাঃ যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী কাম-মোহিতম।"···

নিজেকে নিয়ে যখন মানুষ অতিরিক্ত বিষয়ী মোহাবর্ত্তে ডুবে থাকে,—পৃথিবীর বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন প্রাণধারা ও সত্যালোক এসে তাঁর উপর ততটা প্রতিফলিত হ'তে পারে না।—বাইরের সংঘাত (!) তার প্রয়োজন, চিন্তা ও জ্ঞান তার প্রয়োজন। এম্‌নিতর একটা ভাব-মুহূর্ত্তের মধ্য দিয়েই দুর্দ্ধর্ষ দস্যু বল্মীক-স্তূপাবৃত হয়ে' একদিন মুনি

হয়ে' উঠ্‌লেন। নিজের জীবন দিয়ে যিনি এক সময় ধ্বংসের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়েছিলেন, তিনি আবার শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ হয়ে বীণা হাতে শান্তি প্রচার করে গেলেন, রামায়ণ রচনা করে পুণ্যের সেতু গড়ে রেখে গেলেন। এম্‌নি করেই মূর্খ কালিদাস একদিন পণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিলেন, ভৃগুরাম একদিন রামত্বে পরিণত হয়েছিলেন।…গোঁড়া জীবধর্ম্মী ও বস্তুবাদী হয়ে এক সময় যাঁরা নিজেদেরকে জীবনের উর্দ্ধাসনে স্থান দিতে পারেন নি, অন্য সময় তাঁরাই আবার তুচ্ছ এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের দুঃখ-পাপ হটকারিতার উর্দ্ধে অন্তরের প্রকৃত ধ্যান দিয়ে মানবীয় প্রেম, ধর্ম্ম ও মুক্তির বাণী প্রচার করে গেছেন। যদিও তাঁদের জীবনধারা একপর্য্যায়ভুক্ত নয়, তথাপি একেই কাল-বিবর্ত্তিত অন্তরের স্বতঃ স্ফূর্তি বলা চলে।

মানুষের চিত্তের এ' দু'টি বিপরীত ধারা লক্ষ্য করবার বিষয়।

মেদের সাথে মজ্জার যে সম্বন্ধ, বস্তুর সাথে ভাবেরও সেই সম্বন্ধ। সংসারের মরুপথ মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত করে তুল্‌ছে। সংসার অনিত্য,…ফাঁকিবাজি জেনেও স্বভাবধর্ম্মী মানুষ তাকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। জন্মকালে দেব-চিত্ত তাকে যে সাম-সঙ্গীত শুনিয়েছে, আন্দোৎফুল্ল হাসি-কথা জানিয়েছে,—ক্রমবর্দ্ধমান জীবনের চলাপথে তার কাছে তা' ফানুষের মতই হাওয়ায় উড়ে গেছে। দিনে দিনে কালে কালে পারিপার্শ্বিক নানা রকমের আবর্ত্তের মধ্যে তাকে এসে নাম্‌তে হয়েছে। সমাজের কাছ থেকে, দেশের কাছ থেকে, আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে সে শুধু শিক্ষা পেয়েছে আত্ম-পূর্ত্তির, আত্মদানের মন্ত্র কেউ তাকে শিখায়নি। কেমন করে' নিজেকে বাঁচিয়ে পরকে মারা যায়, কেমন করে' নিজের পকেটকে ভারী ক'রে পরকে নিরাশ্রয় করা যায়, কেমন করে' নিজের টাকার অঙ্ক পঁচিশ থেকে পঁচাত্তরে দাঁড়ায়, হাজার থেকে কোটিতে গিয়ে পৌঁছায়, কেমন করে' আপন বস্তুকে সৌন্দর্য্যময়ী করে' গড়ে তুলে পরের কাছে নিজের জৌলুস প্রচার করা যায়,…কেমন করে' নিজের লালসাকে চরিতার্থ করবার জন্যে পাশবিক বৃত্তির আশ্রয় নিয়ে পরকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে আনা যায়,—মোদের জগৎ, মাটির ক্ষেত্র মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। শিক্ষা দিয়েছে ঠকাতে, ঠকতে নয়,—মারতে, মরতে নয়,—বাঁচ্‌তে, বাঁচাতে নয়। এই যে আত্ম-স্বার্থ বজায় রেখে সর্ব্বত্র চলা, সবার সাথে ব্যবহার করা,—এখানে জীবনের উৎকর্ষতা নেই, আদর্শ নেই;—তবু এটা একটা বৃত্তি। তবে, আসলে এটা মন ও দেহের, আত্মার নয়।

প্রকৃত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এমন উদাহরণের অভাব নেই।…চালের বাজারে বা গুড়ের হাটে কোন এক খাণ্ডেলওয়ালা বা বণিক-পরিবার টাকা ছড়িয়ে গুদাম এঁটে প্রকাণ্ড ব্যবসা জুড়ে দিয়েছে।—তার আদর্শ, সুখ ও স্বপ্ন ঐ ব্যবসায়িক অংশটাকেই কেন্দ্র করে। মন কষাকষি, দর কষাকষি, খুনোখুনি ঐ গুদাম ঘরকে আশ্রয় করেই সংঘটিত হ'য়ে চলেছে। পারলৌকিক চিন্তা তার মধ্যে নেই, অতীন্দ্রিয়-তার মোহ তার মধ্যে স্থান পায় না,—দিব্বি সতেজ তার গতি, তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি। তার কাছে তুমি গিয়ে গানের কথা বলো, গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করো, সে তোমাকে বাতুল মনে করে' তাড়িয়ে দেবে, সমাজের কণ্টক বলে ঘৃণা করবে;—জীবনে তুমি যাকে সারবস্তু বলে গ্রহণ করেছ, নিতান্ত অসার…আবর্জ্জনা বলে তার কাছে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু তার কাছে তুমি তারই বাণী বহন করে নিয়ে যাও,—কেমন করে' অমুক দত্তকে ঠকিয়ে খাণ্ডেলওয়ালা বা বণিকের আরো দু'পয়সা লাভ হয়, পাকা অঙ্কের হিসেব মিলিয়ে তাকে তুমি বলো, দেখবে—নির্ব্বিকার চিত্তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তোমাকে গুরুঠাকুর মনে করে' তোমার পাশে কাটিয়ে দেবে। কেন এমন হয়? এমন প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। বস্তুতঃ চিত্তের যে অংশে উর্দ্ধতন জ্ঞানের আলোক প্রতিফলিত হয়ে নির্ম্মল সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধিতে প্রাণধারাকে সঞ্জীবিত করে' তোলে,—সেই ব্যবসায়ী মনের কাছে সে অংশটা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে আছে। তাই তুমি যতো জ্ঞানের কথা বলো, ত্যাগের কথা বলো,—তার কাছে তা' নিতান্ত তুচ্ছ। খুনী খুনের কথাই ভালোবাসে, আইনজীবী তার মক্কেলের জন্যেই পালঙ্কের ব্যবস্থা করে, চিকিৎসক তার সহধর্ম্মিণীর চাইতে তার রোগীকেই ভালোবাসে বেশী। সবার মূলে রয়েছে

ঐ ব্যবসায়িক বুদ্ধি। মেদের তাড়না আর মাটির আসক্তি প্রতিনিয়ত চুম্বকের মত সবাইকে আকর্ষণ করচে,—ভাব জগতের দিকে তার বিকর্ষণ গৌণ মাত্র।

কিন্তু তাই বলে কি এ কথা বলবো যে বস্তু মিথ্যা, মেদ ও মাটি স্বপ্নমাত্র?—তা নয়। মানুষের বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে তার আত্মীয়-পরিজনকে। তাতে করে তার অর্থের প্রয়োজন, বস্ত্রের প্রয়োজন। তাকে খেতে হবে, প'রতে হবে, চ'লতে হবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ যত কিছু মিল-ফ্যাক্টরি, কল-কারখানা, হাট-বাজার, আফিস-আদালত আর গুদামবাড়ী গড়ে' উঠেছে,—সবার মূলে র'য়েছে কর্ম্মজগৎকে কেন্দ্র করে একমাত্র বেঁচে থাকবার যৌগিক্ ব্যবস্থা,...বিষয়কে আঁকড়ে ধরে জীবনকে পরিতৃপ্ত স্থায়িত্বের মধ্যে টেনে টেনে বাড়িয়ে তোলার একটা অনন্ত লিপ্সা ও প্রচেষ্টা। কীর্ত্তি নাই থাক্, আনন্দ নাই থাক্,—মানুষের তবু বাঁচ্‌বার লিপ্সা বড়। নিতান্ত সচল ব্যক্তিটি থেকে সুরু করে অচল অন্ধ প্লীহাগ্রস্ত রোগীটি পর্য্যন্ত এই বেঁচে থাক্‌বার জন্যে সংগ্রাম করে' চলেছে। এই যে বস্তু-জগৎ, এই যে কুঠি-ইমারৎ আর কারেন্সি নোটের পরিব্যপ্তি,—এ শুধু মানুষকে সেই টিকে থাক্‌বার অধিকার ও সুযোগ দেবার জন্যেই। এই সংগ্রাম (!) যদি না থাক্‌তো, তবে মানুষের ব্রহ্মবাদী ওঁ-এর জগৎটাও মিথ্যে হয়ে যেতো,—স্বপ্ন হয়েই থাক্‌তো। সমস্ত কিছু আদর্শ, মুক্তি, প্রেম ও মাহাত্ম্য প্রচারের মূলে রয়েছে এই বেঁচে থাকা।...

কিন্তু এর মধ্যে কথা আছে। ইঁদুর আর ছুঁচোও তো বেঁচে থাকে, শকুন আর কুকুরও তো বেঁচে থাকে। তাদের মধ্যেও জৈবিক লালসা আর ক্ষুধা আছে, উদর পুষ্টির জন্যে,...ঘর বাঁধ্‌বার জন্যে তাদেরও লিপ্সা আছে, প্রচেষ্টা আছে। ক্ষুধার তাড়নায় আর বেচে থাক্‌বার সজাগ দাবীতে তারাও তো স্বার্থের আশ্রয় নেয়, কাটা-কাটি, হানাহানি আর বিষদংশনে তারাও তো জখম হয়। মানুষের সাথে তাদের তবে পার্থক্য কোথায়? আছে। পার্থক্যটা মনে নয়, বিবেক-সত্তায়। সৃষ্টিজগতে এই সত্তার কষ্টিপাথরেই ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার হয়, মানুষ আর জন্তুর পার্থক্য বিবেচিত হয়।...আত্মার নিবিড়তম যোগে এই বিবেকসত্তা আত্মধর্ম্মী, আত্ম-চৈতন্যশীল, আর মন জড় ইন্দ্রিয়সান্নিধ্য হেতু জড়ধর্ম্মী। মনের কাজ হচ্ছে বিষয়কে নিয়ে, বস্তুকে নিয়ে; পারিপার্শ্বিক পার্থিব বিচ্ছিন্নতার সাথে তার নিত্যদিনের খেলা। তাই শঠতা, হীনতা, পশুত্ব, স্বার্থপরতা, লোভ আর লালসা থেকে সে মুক্ত নয়। মনের ঔদার্য্য বলে আমরা সচরাচর যে কথাটা বলে থাকি, বস্তুতঃ তা হচ্ছে অন্তরের জিনিষ, চিত্তের জিনিষ, মনের নয়। পরন্তু, বিবেক-সত্তার সাথে যুক্ত হয়েছে এসে আত্মশক্তি। এখানে পাপপুণ্য বুঝ্‌বার ক্ষমতা আছে, মানবত্ব ও পশুত্বের সীমারেখা টেনে ন্যায়-অন্যায় বোধের নির্দ্দেশ আছে। এখানে ত্যাগ আছে, মাধুর্য্য আছে, মুক্তি আছে। এই বিবেক-সত্তার স্বচ্ছধারা মানুষের মধ্যে প্রবলবেগে প্রবহমান বলেই মানুষ—মানুষ। নইলে তাতে আর পশুত্বে কোনো অমিল ছিল না।

অথচ এই পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে নিতান্ত দুর্ব্বল মনের ভোগ-লালসা আর সহস্র হীন কার্য্যধারার মধ্য দিয়েও মানুষের জীবনে এমন এক একটা পবিত্র মুহূর্ত্ত আসে, যখন তাকে চিত্তের ডাকে সাড়া দিতে হয়,—অন্তরের অতিমানুষটির প্রেরণায় বিষয়-বুদ্ধির অতি ঊর্দ্ধে নিজেকে তুলে ধরতে হয়। তখন তার অন্তর্দৃষ্টিতে এই আদর্শই প্রকটিত হয়ে' ওঠে "ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখমস্তি।" বিস্মৃতির জগতে স্বার্থের পাঁচিল-ঘেরা গণ্ডির মধ্যে সুখ নেই, অনন্ত ভূমার মধ্যেই শান্তি। সেই ভূমাশক্তিকেই মানুষ তখন তাই প্রাণপণে ডেকে বলে "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" অসত্য হ'তে আমাকে সত্যেতে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে পূর্ণ জ্যোতিতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃত-জগতে নিয়ে চলো...জীবনের এই সন্ধি মুহূর্ত্তে মানুষ প্রত্যক্ষরূপে বুঝতে পারে যে প্রপঞ্চময় এই জগতের কোনো ভিত্তি নেই, এই বিশাল বিক্ষুব্ধ ক্ষেত্র জীবনের সোপান হ'তে পারে বটে, কিন্তু সর্ব্বস্ব নয়। তাই একদিন দেখ্‌তে পাই—ঐ খাণ্ডেলওয়ালা ব্যবসার দপ্তরে বেদে মন দিয়েছে, বণিক তার নীচ স্বার্থপরতা ভুলে 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ' বলে অলঙ্কারাবদ্ধ সিন্ধুকের পাশে যোগে বসেছে। মানুষের জীবনের এই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। প্রত্যেকের জীবনে

এই পরিবর্ত্তন এসেছে। যুগে যুগে জীবনের এই পরিবর্ত্তন ঘটবেই। এই চিত্ত-বিবর্ত্তনে এক সময় বিদ্রোহ মিথ্যা হয়ে যায়, জিঘাংসা-বৃত্তির অবসান ঘটে, শান্তির জগতে, মানবতার জগতে সংগ্রামশীল এই মেদ ও মাটি তখন হাস্যাস্পদ অনুশোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। জটিল বিষয়-বুদ্ধির বাইরে খাণ্ডেলওয়ালা আর বনিক তখন অন্তর্দৃষ্টিতে স্বভাবতঃই দেখতে পায়—যে-পরকে ঠকিয়ে নিজে একদিন স্ফীত মুনাফায় দেহের চর্ব্বি বাড়িয়েছে, জীবনের ক্ষেত্রে সেই পর ব্যক্তিটির মূল্য কমে যায় নি, মূল্য লাঘব হয়েছে তার নিজের।…যৌবনের প্রতাপ থাকে যখন প্রবল, শক্তির ঔদ্ধত্য যখন থাকে অদম্য,—মানুষের মনে মানবতার বিচার-বুদ্ধি তখন থাকে না, মহত্ব ও কীর্ত্তির চাইতে অপকীর্ত্তিই তার কাছে সোনার ভূষণ বলে মনে হয়, ছলনার ইন্দ্রজালে স্বার্থের মোহকে আচ্ছন্ন করে' সংসারময় অপরাজেয় প্রভুত্বের ভ্রূকুটি হেনেই সে তখন ভাবে—'এই আমার ধর্ম্ম, এই প্রভু-শক্তিই আমার পরমার্থ লাভ।' কিন্তু ধীরে ধীরে যতই দিন এগোতে থাকে, মেদের জগৎ যখন ক্রমেই তার লোলচর্ম্মে এসে পরিস্ফুট হ'য়ে দেখা দেয়,—তখন তার সেই প্রভুত্ব আর স্বার্থান্ধ মোহ নিজের কাছে মহা গ্লানি হ'য়ে দাঁড়ায়। প্রতাপের অন্নে তখন কৃপাশীলা অন্নপূর্ণার ডাক পড়ে, ঔদ্ধত্যের দৃশ্যশক্তির কাছে তখন অদ্বৈতের অদৃশ্য শক্তিই কাম্য হ'য়ে ওঠে। চক্ষে তখন তার লোভের দৃষ্টি নিঃশেষ হয়ে যায়, উর্দ্ধে নীলাকাশ পানে চেয়ে চেয়ে শুধু বল্‌তে চায়—

"হে আমার রাজরাজেশ্বর,
কী কাজ তোমার বলো
দীন এই ভৃত্য'পরে করিছ নির্ভর?"

এমন বিবর্ত্তনধারা প্রত্যেকের জীবনে আমরা প্রত্যক্ষ ক'রেছি। কখনো কোনো ক্ষেত্রে এর 'এক্‌সেপ্‌শান্‌' বা অন্যথা থাক্‌তে পারে বটে, কিন্তু জীবনের গতানুগতিক্‌ হাটের পথে সওদাগিরির পালা একই পর্য্যায়ের। মানব-চিত্তের 'ক্ষুদ্র আমি'-টা বার বার তার দেনা-পাওনার লগ্নি করে' চ'লেছে জীবনের খণ্ড খণ্ড বিপণিতে,—সঙ্কীর্ণতাকে নিয়ে, হীনতাকে নিয়ে সে মহত্বের অনুশাসন ভেদ করে' প্রতিনিয়ত ছুটে চ'লেছে বিশৃঙ্খলতার মধ্যে,—বন্ধ্যা মহান্ধকারের দিকে; অন্যদিকে তার 'বৃহৎ আমি'-টা বার বার তাকে বন্ধনহীন গতির পথে মহা পরিব্যাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে চ'লেছে। জীবনের এই যে দু'টি পার্থিব ও অপার্থিব শক্তি—প্রতিনিত্য মানুষকে তারা দু'দিক থেকে মাটির দিকে আর ব্যোমের দিকে আকর্ষণ ক'রছে। 'ক্ষুদ্র আমি' বল্‌ছে, "আমার জগৎকে তুমি যতো বিদ্বেষই হানো, এই সত্যং, একে তুমি অস্বীকার ক'রবে কি দিয়ে?" 'বৃহৎ-আমি' বল্‌ছে, "তোমার স্থিতিকে তো আমি অস্বীকার করিনি, অস্বীকার ক'রেছি তোমার নীতিকে, তোমার আইনকে। তোমার দিকে চেয়ে দেখো,—শুধু কুহেটিকা, শুধু আলেয়ার ফাঁকি; আর আমার পানে চেয়ে দেখো,—চতুর্দ্দিকে মহা শিবের আবির্ভাব। আমার এই কল্যাণের মধ্যে এসে তুমি আশ্রয় নাও, তোমার সকল ক্লান্তি জুড়িয়ে যাবে। তুমি পরিপূর্ণ আনন্দের প্রতীক হ'য়ে উঠ্‌বে। তোমার স্থিতি আছে, তবু তুমি সত্য হয়ে উঠতে পারোনি;—আমার গতি আছে, তাই দিকে দিকে দেখো আমার দূরদিগন্তকে কেমন সত্যের রঙে রাঙিয়ে তুলেছি।…"

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই স্থিতি আর গতির খেলা চ'লেছে। জীবনকে মাটির রসে আকৃষ্ট করে' অহং-এর বেড়াজালে মনকে ঘিরে রাখা যাক্‌, ভোগৈশ্বর্য্য… যাতনা-বিসম্বাদ আর মুহূর্ত্তের কল্পিত শান্তির স্থায়িত্বের গতি পেরিয়ে সে একদিন মহামুক্তির [illegible] অনন্ত গতির মধ্যে ছুটবেই।—এই তার সর্ব্বকালের ধর্ম্ম। যে গতির নিশান তার সাম্‌নে তখন ওড়ে—তার মধ্যেই তার মহাজীবনের পরম সত্যটিকে সে দেখতে পায়। ক্ষুদ্রত্ব তখন বৃহত্বে এসে পরিণত হয়, 'আমি'-টা তখন অনন্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। মাটির মায়া তাকে আর বেঁধে রাখতে পারে না, ব্যবসায়িক কূট-চক্র পারে না তাকে ধরে রাখতে। লোক থেকে লোকান্তরে তার তখন দিবারাত্রির দ্বিধাহীন …বন্ধনহীন যাওয়া-আসা। কবির কাব্যে তাই বিচিত্র-রূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে—

"জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,

তার লাগি' নিমন্ত্রণ লোকে লোকে—
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।"...

তা' হ'লে' দেখা যাচ্ছে—দৈনন্দিন পারিপার্শ্বিক যে বস্তু জগতের সাথে আমাদের মায়া-মোহের সম্বন্ধ, ঘাত-সংঘাতের সংযোগ,—জীবনের চলার পথে তা' উপলক্ষ্য মাত্র; বস্তুতঃ, যে-পথকে সম্প্রতি 'গতি' বলে' নির্দ্দেশ করা হ'ল, সেইটেই মানুষের চরম সত্য...চলার লক্ষ্য। একথা অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন বটে যে, "বস্তু-মন বলে যেটাকে ধরা হ'য়েছে, তার কি তবে স্থিতিই শুধু, গতি নেই?—মনের চলা ও উদ্ভাবন বলে যে বস্তুটা আমরা উপলব্ধি করি, সেইটেই কি তার গতির পরিচায়ক নয়?" উত্তর হচ্ছে—"তা বটে।"...কিন্তু বস্তু-মনের যে সম্প্রসারণ, তাতো দৃশ্যকে ছাড়িয়ে নয়, দিগন্তপ্রসারী নয়! যেমন দরজা-জানালা সব বন্ধ করে' গৃহাবদ্ধ হয়ে' বসে থাকলে আকাশের ঐ অসীম নীলিমাকে দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না,—চারপাশের বেড়া, খুঁটি আর নিজের বাঁধানো ফোটোগ্রাফের ছবিটিই বার বার চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়,—বিষয়কে নিয়ে আঁকড়ে থেকে বুদ্ধির গরজেও মন তেমনি বস্তু-ক্ষেত্রকে ছাড়িয়ে উঠতে পারে না। দরজা-জানালা খুলে দিলে দূর-দিগন্ত যেমন এক নিমিষে এসে সারা চোখে বিকশিত হয়ে' ওঠে, মন ও চক্ষুকে আনন্দ দান করে,—তেমনি জীবনের সত্যের সন্ধান, প্রেম ও আলোকের সন্ধান যে পায়নি, পৃথিবীর মানুষ হিসেবে প্রকৃতই সে ব্যর্থ হয়ে' গেছে। যথার্থ মানবীয় আদর্শে চিত্তের বাতায়ন যার চোখে খুলে গেছে, আমিত্বের ক্ষুদ্রতা বলে', লোভ ও ইন্দ্রিয়-প্রীতি বলে' তার কাছে কিছু নেই। ঐ দিগন্তপ্রসারী নীলিমার মতই অনন্ত শান্তি এসে তার কাছে তখন ধরা দেয়, সর্ব্বভুক না হয়ে' সার্ব্বজনীনের বিরাট বেদীমঞ্চে সে তখন সর্ব্বজনের সাথে একাত্ম হয়ে' ওঠে।—এখানে গতি বলতে ব্যাপক অর্থে ধরা হ'য়েছে।

এ গতির সীমা নেই, গণ্ডি নেই, বন্ধন নেই। আপনার ভাবেই আপনি সে বয়ে' চ'লেছে। এই ভাব-জগতের একবার যে সন্ধান পেয়েছে, জীবনের অসার অনিত্য বস্তু তার কাছে সব মিথ্যা হয়ে' গেছে; মহা ওঁ-এর ওঙ্কার-ধ্বনিতে সর্ব্বচিত্ত তার রসসিক্ত হয়ে' উঠেছে। বস্তু-জগতের মৃত্যু আছে, কিন্তু এ জগতের মৃত্যু নেই। 'ভূমা'কে যে উপলব্ধি ক'রতে পেরেছে, তারার আহ্বান যার শ্রুতিশক্তিকে স্পর্শ ক'রতে পেরেছে, সে-ই সত্যি সত্যি আনন্দ ও অমৃতময় হ'য়ে উঠেছে। মানব-জীবনের এই যে 'ডিনামিক এলিমেন্ট' বা গতি-ভাবের অংশ—একে কেন্দ্র ক'রেই মানুষ প্রকৃত শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছে, সমস্ত কিছু দারিদ্র্য-দুঃখ-দুর্দ্দশার ঊর্দ্ধে অনাবিল নিরোগ-চিত্তের বন্ধন দিয়ে চেয়েছে সে জীব-জীবনের পার্থিব সত্তাকে কর্ম্মের সাথে ধর্ম্ম-মন্দিরে সত্যিকারের সুখ-সমৃদ্ধিতে গড়ে' তুলতে। বিচারের চোখে এ গতির শেষ লক্ষ্যে যে একবার এগিয়ে গেছে, নিজেকে সে যেমন পরিপূর্ণ আনন্দ-বৈভবে বীর্য্যবান করে' তুলতে পেরেছে, ধূলি-ধূসরিত এই পৃথিবীর পথেও তেমনি সে তার সেই বৈভবকে ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই বৈভবকে যারা যথার্থ শক্তি ও প্রেমের দ্বারা গ্রহণ করতে পেরেছে,—জগৎ ও জীবন তাদের বাসন্তীচন্দ্রিমার মতই বিকশিত হ'য়ে বিশ্বের সমস্ত আবিল ক্লেদরাশিকে ঢেকে দিয়েছে, মুছে দিয়েছে জৈবিক মনের নিত্য দিনের লাঞ্ছনা ও দাবদাহকে।—এই গতির পথে পাশ্চাত্য মনীষীরা মানুষের স্বাভাবিক চৈতন্যশীল চিত্ত-ক্রিয়াকে 'হিডোনিজম্' বা শান্তিবাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। জগতের যত কিছু শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য,—তা' শুধু মানব-জীবনের এই চরম বিকাশের দ্বারাই সম্ভবপর হ'য়েছে। আমরা যদি স্থির লক্ষ্য করে' দেখি, তবে দেখতে পাই—যে ব্যক্তিটি তার Static condition of mind বা মনের জড় অবস্থাকে ঘুচিয়ে Dynamic element of life বা জীবনের গতি-ভাবের দিকে বেশী অগ্রসর হ'য়েছে, জগতে সে-ই একমাত্র কলা-সম্পদ বা রূপ-শিল্পের প্রেরণা ও জন্ম দিতে পেরেছে। আর অচেতন মনের অক্ষমতা নিয়ে যে শুধু জড় ও পার্থিব মোহাবস্থাকে তুষ্ট করে' এসেছে—রুচির দিক দিয়ে মানবীয় আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-সমৃদ্ধির দিক দিয়ে সে চিরদিনের মতই নিজের কাছে বন্দী-হওয়া মন নিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে দূরে পড়ে' রয়েছে।

বস্তুতঃ, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও সুখের অন্ত নেই। কেউ রাজ্য জয় করে' সুখানুভব করে, কেউ রাজ্য দান

করে' সুখী হয়,—কেউ মদ খেয়ে তৃপ্তি পায়, কেউ নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করে' শান্তি বোধ করে,—ব্যাধ তার শিকার পেয়েই আনন্দ-মুখর হয়ে' ওঠে, আবার ঋষি তার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই যথার্থ শান্তি পায়। সুখের হাটে প্রতিনিত্য এই ভোগ ও ত্যাগের খেলা চলেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিচার করে' দেখ্‌তে গেলে মানবী আদর্শের দিক দিয়ে সত্যিকারের সুখ কাকে বলি? সুখের তো সংজ্ঞা নিরুপণ করা যায় না! মানুষের মনের এই যে Contrary waves of peace বা বিরুদ্ধ-শান্তি-প্রবাহ, কোনোটাই তো মিথ্যা নয়! মাতালের মদে শান্তি, আর ঋষির ত্যাগে শান্তি,—দু'টোরই তো স্থায়িত্ব আছে, দু'টোই তো স্বাভাবিক! তবু মাঝখানে ঐ একটা প্রশ্ন থেকে যায়,—মানবীয় আদর্শের দিক দিয়ে প্রকৃত 'সুখ' কাকে বলি? এখানে একটা বিষয় চিন্তা করবার আছে। মানুষের বস্তু-মন ও ভাব-মনের সাথে গুণ বা জ্ঞান-সত্তা এবং নিগুর্ণ বা নির্জ্ঞান-সত্তা বলেও দু'টো বস্তু জড়িয়ে র'য়েছে। যিনি যথার্থ পূর্ণ মানুষ—তাঁর মধ্যে গুণ বা জ্ঞান-সত্তাই প্রবল; নিগুর্ণ ভাবের যোগ সেখানে অবিবেচ্য বা গৌণ; আর অপূর্ণ ব্যক্তি যে—তার মধ্যে ঐ নিগুর্ণ বা নির্জ্ঞান-সত্তার প্রভাবই প্রখর। এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের 'নাবালক-কিশোর' ও 'সাবালক-বৃদ্ধের' প্রলম্বিত চিন্তধারারই অনুরূপ। তা' হলে' দেখতে পাই—নিগুর্ণ মনের যে সুখ-পিপাসা, তা' মানবীয় আদর্শের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ নয়, অংশ মাত্র। জ্ঞান-সত্তাই হ'চ্ছে মনুষ্যত্ব বা মানব-ধর্ম্মের মূল উৎস। গীতায় কর্ম্মবাদের সাথে এই জ্ঞানযোগেরই নির্দ্দেশ আছে। জ্ঞানের এই পথটাই হচ্ছে আসলে সাধনার পথ, কল্যাণ, ভক্তি ও সিদ্ধির পথ, মুক্তির পথ। যত কিছু দুঃখ, গ্লানি পাপ ও প্রপঞ্চময়তার মাঝ থেকে আমরা এই পথেই মুক্তি পেতে পারি। মাতাল যে, খুনী যে, তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বণিক যে, সে তো এই পথের যথার্থ সন্ধান পায়নি! তাই তার সহস্র লক্ষ পৈশাচিকতার ক্লেদরাশি থেকে এই না-পাওয়ার পথের সন্ধানেই সে একদিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলে। কেউ এই না-পাওয়াকে পেয়ে হারায়, কেউ পেয়ে সিদ্ধ হয়, কেউ বা পায়ই না। পেয়ে হারাবার দুঃখ তবু সহনীয়, কিন্তু না-পাওয়াকে না-পাবার যে বেদনা, তা' থেকে মুক্তি পেয়ে প্রবুদ্ধ চিত্তের স্বর্গরাজ্যে সে আর গিয়ে পৌঁছতে পারে না; ব্যর্থ হতাশ্বাসেই তার বাকী দিনগুলি এক এক করে' বিক্ষুব্ধ মৃত্যুর দিকেই ধাবিত হয়ে' চলে। মৃত্যুর কোলই তার জীবনের শেষ লক্ষ্য। আর যে পেয়ে সিদ্ধ হয়, মৃত্যুর বন্ধন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না; মৃত্যুকে অতিক্রম করে ভাবীকালের চিরন্তন-ধারার মধ্যে সে নিত্যকাল বিহার করে। সে যা মন্ত্র রেখে যায়, তা প্রেমের মন্ত্র, ত্যাগের মন্ত্র। এই ত্যাগই সর্ব্বকালের সঞ্চয় হয়ে থাকে। উপনিষদের ঋষিরা আমাদের তাই বলে গেছেন, 'তেন ত্যাক্তন ভুঞ্জিথা'—ত্যাগের দ্বারা ভোগ করো। গীতা আমাদের যে নির্দ্দেশ দিয়েছে, তার মধ্যেও এই ত্যাগেরই মন্ত্র নিহিত রয়েছে। মানুষ এই ত্যাগের মধ্যে মধুর হয়ে' উঠেছে তখনই, যখন অখণ্ড আত্মার চৈতন্য-শক্তি ও উর্দ্ধতন জ্ঞানের আলোয় তার সর্ব্বসত্তা দীপ্তিমান হয়ে' মিশে গেছে। এই ত্যাগই তার আত্মিক ধ্যান ও সাধনার ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করে' তুলেছে, এই ত্যাগের মধ্য দিয়েই সে জীবনের যথার্থ কল্যাণ ও শান্তি প্রচার করে' গেছে।

মানুষের সার্থকতা তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে। যে মানুষ সমাজে···বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করতে চায়নি তার মধ্যে বুঝতে হবে চৈতন্য নেই, সে অচেতন···ক্লীব। কিন্তু স্বভাবধর্ম্মী মানুষ, আমাদেরই চতুর্দ্দিকে যারা সীমাহীন পাঁচিলের মতো ভীড় করে' আছে তাদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখি—আত্মবিকাশের জন্যে কী তাদের কঠোর অধ্যবসায়, কী তাদের কঠিন কৃচ্ছ্র সাধন। স্বচ্ছ আয়নার ভিতর দিয়ে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিমূর্ত্তি দেখে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমাদের দৈহিক লাবণ্যকে প্রকাশ ক'রে অপরের কাছ থেকে নিজেদের সৌন্দর্য্য-সুখ্যাতি শুনবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে উঠি—চিত্তের দিক দিয়েও এমনটাই বটে। যে শিল্পী, সে চায় জগতের মনের মুকুরে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখতে; বিশ্ববাসীর প্রাণমন্দিরে খ্যাতির গরিমা নিয়ে বাঁচতে। এইটেই হচ্ছে মানুষের পূর্ণ সাধনা ও জ্ঞানের দিক। দেহের লাবণ্য আজ আছে, কাল থাকবে না, অর্থের প্রাচুর্য্য আজ

স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেছে, কাল হয়ত নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, ঔদ্ধত্যের রক্ত-নিশান আজ হয়ত দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছে, কাল ভেঙে পড়বে; কিন্তু মানুষের যে জ্ঞানের অংশ, ত্যাগ ও সাধনার জগৎ, তা কোনোকালে ধ্বংস হবার নয়, চিরদিন তার বৃদ্ধি থেকে বৃদ্ধি, কীর্ত্তির থেকে কীর্ত্তির মধ্যে তার শাশ্বত যুগের বাস। বুদ্ধের সাধনা তাই নিঃশেষ হয়ে' যায়নি, বিটোভেনের বাঁশির সুর আর র‍্যাফেলের শিল্প তাই কালের আবর্ত্তে তলিয়ে যায়নি, তাজমহল দর্শকের দৃষ্টি থেকে আজও ছুটি পায়নি, কালিদাস আর সেক্সপিয়ারের কাব্য আজও বেঁচে আছে, মার্ক্সের দর্শন আজো তাই সাম্যের গান প্রচার করে চলেছে। জ্ঞানের স্পর্শলাভে মানুষের 'ক্ষুদ্র-আমি'টা অনবরত তার এই 'বৃহৎ-আমি'র দিকে ধাবিত হয়ে' চলেছে, বলছে—"অপূর্ণতার মাঝ থেকে আমি মুক্তি চাই, 'Fight more light', জীবনকে আমি আলোয় আলোয় ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলতে চাই।" এই চাওয়াই তো তার সুখের চাওয়া, শান্তির চাওয়া মাধুর্য্যের চাওয়া। যে চাইতে জানে, সে পেতেও জানে। সেই will force বা ইচ্ছাশক্তি যার মধ্যে নেই, জগতের অনন্ত সান্ত্বনার মধ্যেও সে শান্তি পেলে না, নিতান্ত বিভ্রমের মতই জীবন তার বয়ে গেল,—আর যে তার ইচ্ছা-শক্তিকে মহৎ বীর্য্যের দ্বারা নিয়োজিত করতে পারলো,— জগতের অমৃতের স্বাদ তারই জন্যে সঞ্চিত রইল। Traditional Law of Nature বা প্রকৃতির ধারাবাহিক নিয়ম এই পরম সত্যটিকেই আমাদের কাছে খুলে ধরেছে।

কিন্তু এখানে কি তাই ব'লে একথা ব'লবো যে, পৃথিবীর লোকেরা, সংসারের কাজের বোঝা ফেলে দিয়ে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে এসে সকলে এক সাথে ঠাঁই নাও! একথা যারা বলে—তাদের উন্মাদ বল্‌তে হবে। বস্তুতঃ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও বিকাশের মূলে, সাধনা ও জ্ঞানের মূলে আসলে বেঁচে থাকবার সমস্যাটাই প্রধান। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে উপলক্ষের প্রয়োজন। তবে দেখতে হবে—বাঁচার নামে বাগাড়ম্বরতাই শুধু প্রকাশ না পায়, পেশার নামে, ব্যবসার নামে ব্যভিচারিতা এসে জীবনে ঠাঁই না নেয়।...প্রলোভনের আশ্রয় না নিয়েও তো আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, স্বার্থ আর লোভকে হত্যা করে' তো আমরা বাঁচতে পারি! অথচ জীবনের অপরিহার্য্য এমন সুলভ ধর্ম্মকে আমরা স্বভাবতঃই গ্রহণ করি না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে ঐ খাণ্ডেল-ওয়ালা আর বণিকের মতই একটা দুর্দ্দমনীয় কুটিতা। ত্যাগের দ্বারা আমরা বাঁচতে চাই না, ভোগের মধ্য দিয়েই আমরা পরিতৃপ্তি চাই। এই সম্ভোগ-লিপ্সাই আমাদের নাড়ীতে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, পরস্বাপ-হারী করে' তোলে আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে। অথচ, ভাল-মন্দের দোষগুণ আমাদের বিবেক-সত্তায় প্রতিনিয়ত এসে প্রতিফলিত হয়ে উঠছে। Will force বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা ক্রমাগত সেই ভালোর দিকে, পুণ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে পারি। তবু প্রতি পদে আমরা মোহগ্রস্ত হয়ে' পাপের রাজ্যে সৈন্য আমদানি ক'রছি। এইটেই আমাদের জীবনের প্রধান অলক্ষ্মীর পথ। শান্তি তাই মোহের শান্তি হয়ে' দুদিন পরে আলেয়ার মতো উড়ে যায়। খেয়াশেষের বৈঠা হাতে তখন আমরা কাঁদতে বসি। যৌবনের স্বপ্ন বার্দ্ধক্যে এসে ফানুষে পরিণত হয়। দার্শনিক প্রবর (Seneca)-ও এই কথাটাই একদিন যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—

> Many men spend much of their time in making the rest miserable. Lusty blood in youth hath attempted those things which akying bones have repented in age. . .

তাই তিনি নির্দ্দেশ দিলেন,—

> "How well it would be if men would but exercise their brains as they do their bodies, and take as much pains for virtue as they do for pleasure." . . . .

...যে virtueর কথা Seneca প্রকাশ করেছেন, সেইটেই মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-পরিবৃত গুণ বা জ্ঞান-সত্তা। আসলে মানবীয় গুণ বা ধর্ম্ম হচ্ছে তার মনুষ্যত্বে। এই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত রেখে চিত্তের ইচ্ছাশক্তি বা will powerকে অবলম্বন করে' মানুষ তার নিজেকে মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অজ্ঞানতার মাঝ থেকে জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে পারে। কারণ, তার মধ্যে এমন একটা supreme power বা অলৌকিক শক্তি আছে, যাকে আগুনে দগ্ধ করা যায় না, অস্ত্রে দ্বিখণ্ডিত করা যায় না, বিরুদ্ধ কোন বলের কাছেই পরাভব নেই তার কোন কালে। সেই শক্তিকে জানতে হবে,

উপলব্ধি করবার প্রয়োজন তাকে সর্ব্বাগ্রে। তবেই ইচ্ছার দ্বারা ইচ্ছার পরিপূরণ হবে, সত্যের দ্বারা আমরা কামনা-সিদ্ধ হবো।

"What you wish to be, that you are, for such is the force of our will, joined to the supreme, that whatever we wish to be, seriously, and with a true intention, that we become.—(Jean Paul Richter).

তাই দেখতে পাই, জগতের যথার্থ পূর্ণ মানুষ যিনি—তাঁর মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তিই জীবনকে সমস্ত দিক থেকে ছেঁকে গুছিয়ে এনে সমগ্র শক্তির মূলে যে সত্য ও অখণ্ড পূর্ণসত্তা বিরাজ ক'রছে, তারই মধ্যে নিয়োজিত করে' অমৃতময় ও দীপ্তিমান হ'য়ে উঠেছে। প্রত্যেকের জীবনেই এই সংযোজন-শক্তি ও ইচ্ছা প্রয়োজন,—প্রত্যেকটি মানুষেরই লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য হচ্ছে' জীবনকে সেই উর্দ্ধতন গতির পথে পূর্ণ-লোকের অবিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতার মধ্যে এনে ঠাঁই দেওয়া।

"The aim of every man should be to secure the highest and most harmonious development of his powers to a complete and consistent whole."—(Humboldt).

বৈষয়িক জীবনের আবর্ত্ত আছে, লালসা ও নীচতা আছে, হিংসা ও স্বার্থপরতা আছে; কিন্তু এর মধ্যেই নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত না করে' মানুষ যদি মৃত্যুর পটভূমিকে সামনে রেখে প্রকৃত বিবেকবুদ্ধির ইঙ্গিতে পরিতৃপ্ত ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা, জ্ঞান ও ভাবের দ্বারা সেই স্থির লক্ষ্যের দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে' চ'লতে পারে, তবে তো তার সত্তা ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্ত্তের পাশে ঘুরে মরে না, শকুন আর কুকুরের মতো শুধু নিষ্পিষ্ট জৈবিক সমস্যার মধ্যেই বিচরণ করে না! তার যে তখন বস্তু ও ভাব, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য এক হয়ে' মিলে গিয়ে সত্যিকারের আনন্দ-রাগিণীর 'মিল'-এ এসে জীবনের পরিপূর্ণ রস-মাধুর্য্যে অনুরণিত ও স্পন্দিত হয়ে' ওঠে। বৈরাগ্য-সাধনেই জীবনের শান্তি নয়, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও চিত্তের আনন্দ-স্বরূপকে যে একবার ধরতে পেরেছে, মুক্তি ও সিদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ তারই জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। তাই কর্ম্মমুখর জগৎ ও জীবনের স্তরে স্তরে' বিষয় ও ভাবকে মিলিয়ে অন্তরের বিরুদ্ধ দু'টি ধারার মধ্যে যে ব্যক্তিটি তার পরিপূর্ণ মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সাধনা ও প্রেমের সেতু গড়ে তুলতে পেরেছেন,—তিনিই সত্যি সত্যি মনীষী ও নিত্যকালের দীপ-শিখাটি॥

"ধীরে বহে ডন্"

(অনুবাদ উপন্যাস)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিখেল্ শোলকভ্

সপ্তম অধ্যায়

মোখব-পরিবার এ অঞ্চলের অনেক-পুরুষের বাসিন্দা। প্রথম পিটারের রাজত্বকালে একখানি সরকারী বজরা, বিস্কিট্ এবং বারুদ বোঝাই করে ডনের ভাঁটির দিকে যাচ্ছিল। শিগোনাকের দুর্বৃত্ত কসাকরা ডনের উজানে সেই বজরাখানি লুঠ করে। রাত্রে বজরার উপর উঠে নিদ্রিত প্রহরীদের খুন করে, সমস্ত মাল লুণ্ঠন করে তারা বজরাখানি ডুবিয়ে দেয়।

জারের কাছে সংবাদ পৌঁছুতেই ভোরোনেজ থেকে সরকারী ফৌজ এসে শিগোনাক সহরটি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেল। অপরাধী সমস্ত কসাকদেরই শিরশ্ছেদ করা হয়; এ ছাড়া অন্য চল্লিশেক কসাককে ভাসমান যূপকাষ্ঠে লটকে ডনের ভাঁটির দিকে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। আশা, এই সঙ্কেত হয়ত অবাধ্য গ্রামবাসীদের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে।

বছর দশেক পরে শিগোনাকের ভস্মস্তূপের মধ্যে আবার বসতি স্থাপিত হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জারের আদেশে মোখব নামে এক কৃষকও গুপ্তচর হিসাবে এসে সেখানে বসতি স্থাপন করলে। কসাক সংসারে দৈনন্দিন যা প্রয়োজন সেই সব নিয়ে মোখব এক ব্যবসা ফেঁদে বসল। সঙ্গে চলল চোরাই মালের ব্যবসা; বছরে মাল কিনবার অছিলায় মোখব একবার কি দু'বার ভোরোনিজ যেত। আসল উদ্দেশ্য গ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্তাদের ওয়াকেফ্‌হাল করা।

এই রুসীয় কিষাণ নিকিটকা মোখব থেকেই মোখব পরিবারের গোড়াপত্তন। ক্রমে এরা কসাক জমিতে বেশ ভাল করে শিকড় গেড়ে আগাছার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ভোরোনেজের শাসনকর্তা তাদের একখানি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। পুরুষানুক্রমিক ধরে তারা সশ্রদ্ধভাবে সেই জরাজীর্ণ অভিজ্ঞানখানি গোপন গর্ব্বে রক্ষা করে এসেছে। যদি প্রাটোনোভিচের পিতামহের আমলে সেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড না হ'ত তবে আজও হয়ত সেখানি দেখা যেত। এই মোখব তাসের জুয়াতে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন। কায়ক্লেশে আবার পায়ে ভর করে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই বৈশ্বানরের শুভদৃষ্টি তাকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। দুই পুরুষেও সে চোট সাম্‌লান যায়নি।

সার্জ্জি প্রাটোনোভিচকে সব কিছুই নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। বাতব্যাধিগ্রস্ত পিতাকে সমাধিস্থ করে সার্জ্জিকে পাঁচ পাঁচটি বছর নিতান্ত জঘন্যভাবে জীবন যাপন করতে হয়েছে। পয়সা আয় হ'লে জুয়াচুরি, বাটপাড়ি কোনটাতেই তার আপত্তি ছিল না। এইভাবে পাঁচটি বছর কাটিয়ে গরু-বেচা টাকা দিয়ে একদিন সহসা সার্জ্জি প্রাটোনোভিচ হ'য়ে ছোট্ট একটি স্থঁচ, ফিতা প্রভৃতির দোকান খুলে বসল। কিন্তু আধ-পাগলা এক পুরোহিতের মেয়েকে বিয়ে করেই তার কপাল ফেটে পড়ল। যৌতুক পেয়েছিল যথেষ্ট। তাই দিয়েই এক কাপড়ের দোকান খুলে দিলে। বরাত জোরে সময়টাও খুব অনুকূল হয়ে উঠল। সমর কর্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে গ্রামশুদ্ধ কসাকরা তখন ডনের বাম তীর থেকে দক্ষিণ তীরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করল। কেননা ওপারের জমিতে তেমন ফসল ফলত না। বেসাতির জন্য মাইল ত্রিশেক না গিয়ে, তারা হাতে কাছের দোকান থেকেই কিনত। তা ছাড়া গ্রাম্য চাষীদের প্রলুব্ধ করবার জন্য যা প্রয়োজন সার্জ্জির দোকানে তার এতটুকু অভাব ছিল না।

কারবার বাড়িয়ে মোখব এই সরল গ্রামবাসীদের ঘরসংসারে প্রয়োজনীয় সব মালই দোকানে রাখতে আরম্ভ করল। এমন কি চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত সে রাখত। কাজেই লাভ অনিবার্য্য। বছর তিনেকের মধ্যেই সার্জ্জি মুনাফার কল্যাণে বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে পড়ল।

কৃকলাসের মত সার্জ্জি প্রাটোনোভিচ মোখব তাতরস্ক এবং সন্নিহিত গ্রামগুলির রক্ত চুষে খেত। সমস্ত ক'টি গ্রাম তার মুঠোর মধ্যে। মোখবের কাছে না ধারে এমন একটা লোক গ্রামে খুঁজে পাওয়া যায় না। নয় জন লোক তার ময়দার কলে কাজ করত। সাতজন ছিল দোকানে আর চার চারটে ছিল দারোয়ান। এক কুড়ি লোক উদরান্নের জন্য এই ব্যবসায়ীর মুখের পানে হা করে চেয়ে থাকৃত।—সে দিলে তবে জুটবে। প্রথম পক্ষে মোখবের দুটি সন্তান। একটি মেয়ে, এলিজাবেতা, আর ছেলে ঐ বেহদ্দ কুঁড়ে ভ্লাদিমির। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এনার কোন সন্তানসন্ততি হয়নি। কাজেই প্রথম পক্ষের ঐ সন্তান দুটির পরই তার সমস্ত মাতৃস্নেহ ঢেলে উজাড় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এনার দুর্ব্বল চিত্ত তাদের মনের উপর বেশ একটি অপ-প্রভাব বিস্তার করেছিল। বাবা এদের দিকে বড় বেশী ফিরে চাইত না। আস্তাবলের চাকর কি পাচিকা ঠাকরুণের উপর যতটা নজর দিত তার বেশী নজর দেবার অবসর তার ছিল না। সত্যিই তো। অবসরই বা কোথায়? সারাদিনরাত্রি তো ব্যবসা নিয়েই তাকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হ'ত। কাজেই যা হবার তাই হ'ল। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাগে আনা দুষ্কর হয়ে উঠল। তাছাড়া এনার বুদ্ধি এত প্রখর ছিল না যে সে শিশুমনের রহস্যভেদ করতে পারে। কাজেই বাপমায়ে এত মিল থাকা সত্ত্বেও, সন্তান দুটি হ'ল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। কারও সঙ্গে কারও এতটুকু মিল নেই। যেন অপরিচিত কেউ। ভ্লাদিমির বেহদ্দ কুঁড়ে, তারপর

আবার ভীরু অথচ ওরই মধ্যে অ-বালকোচিত গাম্ভীর্য্য আন্‌বার চেষ্টা আছে। লিজার সঙ্গী ছিল পাড়ার যত সব অনূঢ়া স্ত্রীলোক আর পাচিকা ঠাকরুণ। ইনি আবার সহজ পাত্রী নয়। এককালে বেশ এদিকওদিক ছিল। কাজেই এই অসম নারী-সংসর্গ লিজার মনে এক অশোভন কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল; যার ফলে, তার ক্ষত মানস কৌমার্য্য বয়সের গণ্ডীকে অস্বীকার করে স্বয়ং পুষ্ট গুল্মের মত অকালে তার তন্বীদেহে এক অশোভন তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল।

* * * *

২

অপার বৎসর চলে যায়। বৃদ্ধ জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে, মুকুল হয় পল্লবিত।

ভাদিমির যোৎষব তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী এসে অন্যান্য বারের মত এবারেও সে কারখানা পরিদর্শন করতে গেল। কসাক গাড়ী চালকদের সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা এবং মন্তব্য শুনে তার অর্দ্ধ চেতন অহমিকা কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠত।

"কর্ত্তার ছেলে। পরে ইনিই তো মালিক..."

গাড়ী এবং গোবরের স্তূপের মধ্যে দিয়ে সন্তর্পনে হেঁটে ভাদিমির কারখানার ফটকে উপস্থিত হ'ল। পাওয়ার প্লাণ্টটা দেখা হয়নি মনে পড়তেই সে আবার ফিরল। মেশিন ঘরের প্রবেশ দ্বারের সন্নিহিত লাল তেলের ট্যাঙ্কটার পাশে তিমোফি, ভ্যাসিট্‌ এবং ডেভিড হাঁটু অবধি পাজামা গুটিয়ে কাদা ছান্‌ছিল।

"এই, ঐ দেখ্‌ কর্ত্তা এসেছে!"—কৌতুকচ্ছলে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভ্যাসিট্‌ বল্লে।

"শুভদিন। কি কচ্ছ তোমরা?"

টেনে কাদার মধ্য পা আলগা করে ডেভিড অসন্তুষ্ট-ভাবে বল্লে—"কাদা ছান্‌ছি। আপনার বাবা যে ক'জন মেয়ে রেখে কাজটি করাবেন—উহুঁ! পয়সার বেলা ঠিক আছেন। বড্ড মাছের প্রাণ যাই বলুন।"

এই সদাপ্রফুল্ল শ্রমিকটির অবজ্ঞেয় মন্তব্যে অন্তরে বিষম চটে গিয়ে ভাদিমির জিজ্ঞাসা করলে—মাছের প্রাণ মানে?"

হেসে ডেভিড বল্লে—"বড্ড ছোট নজর।"

আর সবাইও উক্তির সমর্থনে হেসে উঠল। এই অপমানের খোঁচা সরাসরি ভাদিমিরকে আঘাত করলে। ডেভিডের পানে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—"তাহলে তোমরা সন্তুষ্ট নও?"

"আমাদের সঙ্গে নেমে কাজ করুন এসে, বুঝতে পারবেন কোন্ বোকা এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। বাবা যদি কোনদিন নিজে করতেন তাহলে টের পেতেন,—একদিনেই পেটে ব্যথা ধরে চিৎ হ'তে হ'ত।"

ডেভিড আরও সোৎসাহে আপন কাজ করে যেতে লাগল। যথোচিত শোধ তুলবার পরিকল্পনা করে, ভাদিমির মনে মনে চোখা একটি উত্তর ঠাওরাল। "বেশ, তাহলে বাবাকে বলব আমি যে তোমরা এ কাজে সন্তুষ্ট নও।"

আড় চোখে ডেভিডের পানে চেয়েই, তার মুখে মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেখে ভাদিমির স্তম্ভিত হয়ে গেল। নিতান্ত জোর করেই সে হাসছিল। আরও সবাইর মুখও কালো হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ তিনজনেই নীরবে কাজ করতে লাগল। তারপর সহসা ডেভিড মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চেয়ে বল্লে—"আমি রহস্য করেছি, ভোলোদিয়া।"

—"বেশ তো, যা বল্লে বাবাকে আমি তাই জানাবো।" পিতার অপমানে ভাদিমিরের চোখ ফেটে জল এল। মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে সে দ্রুতপদে সেখান থেকে সরে পড়ল।

—"ভোলোদিয়া! ভাদিমির সার্জ্জিভিস্!"—কাদা ছেড়ে ডেভিড সন্ত্রস্তকভাবে তার পেছন পেছন ছুটল। ভাদিমির থাম্‌লে ছুটে গিয়ে ডেভিড হাঁপাতে হাঁপাতে মিনতি করুণস্বরে বল্লে—"আপনার বাবাকে বল্‌বেন না! না বুঝে আমি বোকার মত কাজ করে বসেছি, আমায় মাফ করুন! দোহাই ভগবানের, না বুঝে আমি চট্ করে বলে বসেছি।"

"আচ্ছা, বল্‌ব না।"—ভ্রূকুঞ্চিত করে উত্তর দিয়ে ভাদিমির কারখানার ফটকের সাম্‌নে গেল। শুন্‌লে কর্কশকণ্ঠে ডেভিডকে শাসিয়ে ভ্যাসিট বল্‌ছে—"কেন বল্‌তে গেলি, না খোঁচালে কোন অনিষ্ট ওরা করবে না।" ক্রুদ্ধভাবে ভাদিমির বলে উঠল—"বদমাইস্ কোথাকার!" ভাবলে—বলে দেবো বাবাকে? পেছনে ঘাড় ফিরাতেই

ডেভিডের সদাপ্রফুল্ল মুখ চোখে পড়ল। ঠিক করল—"হাঁ, বোলবোই।"

বাড়ী ফিরে সোজা সে বাবার নিভৃত কক্ষের সামনে গিয়ে দরজায় আঘাত করল। সার্জ্জি প্লাটোনোভিচ একটা চামড়ার কৌচের পর দেহভার এলিয়ে জুন মাসের একখানি মাসিকের পাতা উল্টাচ্ছিল। হাড়ের বাটওয়ালা একখানা কাগজ-কাটা ছুরি তার পায়ের কাছে পড়েছিল।

—"কি, কি চাই।"

—"কারখানা থেকে যখন ফিরছিলাম···।" ভূমিকা না করেই দ্বিধাজড়িতভাবে সে আরম্ভ করে দিল, কিন্তু ডেভিডের হাস্যোজ্জ্বল মুখের কথা মনে পড়তেই মুহূর্ত্ত মধ্যে দ্বিধা কেটে সে আবার বল্‌তে শুরু করল—"শুন্‌লাম ডেভিড বলছে······"

নিবিষ্টভাবে পুত্রের রিপোর্ট শুনে সার্জ্জি বল্লে—"ওকে বরখাস্ত করে দেবো!" স্থূল দেহভার আনত করে কোন ক্রমে সার্জ্জি পায়ের কাছ থেকে ছুরিখানা তুলে নিলে।

* * *

৯

সন্ধ্যার পর গ্রামের বুদ্ধিজীবিগণ মোখবের বাড়ী এসে আসর জমাত। দলের মধ্যে থাকত মস্কোর শিল্প-শিক্ষায়তনের ছাত্র বয়ারিশ্‌কিন, যক্ষ্মা এবং আহমিকায় অন্তঃসার শূন্য মাষ্টার মশাই বালান্দা, আর তাঁরই সহকারিণী এবং সহবাসিনী স্থিরযৌবনা মার্থা গেরাশিমোভ্‌না;—(মেয়েটার পরিধেয় সায়াতে সব সময়ের জন্য একটা অভদ্র ইঙ্গিত থাকত।) আর ছিলেন চিরকুমার পোষ্টমাষ্টার মশাই, গা থেকে তার সস্তা গন্ধদ্রব্য এবং গালার গন্ধ আসত। এরা ক'জন নিয়মিত সভ্য। সৈন্যদলের অধিনায়ক ইউজিন লিষ্টনিট্‌স্‌কি মাঝে মাঝে এষ্টেট্‌ থেকে ঘোড়ায় চড়ে এসে এদের দলে যোগ দিতেন। কাজের মধ্যে এদের বারান্দায় বসে চা-পান; আর অর্থহীন তর্কের কসরৎ। কিন্তু এ তর্কেও যখন ভাঁটা পড়ে আসত, হয়ত কোন অভ্যাগত গিয়ে মোখবের দামী গ্রামোফোনটা খুলে বসতেন।

প্রধান প্রধান ছুটীর সময়ে কখনও কখনও হয়ত মোখব বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করে বিরাট ভোজে আপ্যায়িত করতেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। স্বভাবতঃ তিনি বেশ ব্যয়কুণ্ঠ। শুধুমাত্র একটা ব্যাপারেই তার সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। পড়াশুনার ঝোঁক ছিল খুব, কাজেই বইও কিনতেন দেদার। কিন্তু বই কেনা তার শুধু সখ নয়। যা পড়তেন তা বুঝবার মত এবং তা থেকে সুসংবদ্ধ একটা ধারণা গঠন করবার মত মানসিক তীক্ষ্ণতা তাঁর ছিল।

গ্রামের পাদ্‌রীদ্বয়, ফাদার ভিশারিয়ন এবং ফাদার প্যাংক্রাটির সঙ্গে মোখবের একেবারেই কোন বনিবনা ছিল না। বহুদিন ধরে এদের মধ্যে মন কষাকষি চ'লেছে। তাই বলে পাদ্‌রীদ্বয়ের মধ্যেও তেমন সম্প্রীতি ছিল একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। জনসাধারণের মন বিপথগামী করবার মত তীক্ষ্ণ চাতুর্য্যে ফাদার প্যাংক্রাটি সিদ্ধ ছিলেন। আর সিফিলিস্‌ রোগাক্রান্ত বিপত্নীক ফাদার ভিশারিয়ন অনেকটা অমায়িক হলেও, তেমন মিশুক নন। তাছাড়া ফাদার প্যাংক্রাটির গগনস্পর্শী অহমিকা এবং লাগানে স্বভাব তার আদৌ ভাল লাগত না।

বালান্দার ছাড়া সকলেরই বাড়ী ছিল। মোখবের বাড়ী স্কোয়ারের উপরেই তারই সামনে কিছুটা দক্ষিণে সরে স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে তার দোকান। দোকানের সংলগ্নই একখানা নীচু চালায় একটি পানশালা। এরই শ' খানেক গজ দূরে গীর্জ্জার প্রাচীর। গীর্জ্জার ওপাশেই স্কুলের দেয়াল; পাশে ফাদার ভিশারিয়ণ এবং ফাদার প্যাংক্রাটির বাড়ী। দুটি বাড়ীই সৌসাদৃশ্যহীন। এর পেছনে দোতলা বাড়ী একটা। তার পেছনে পোষ্টাফিস্‌। পোষ্টাফিসের গায়ে আবার দোতলা বাড়ী একটা। এই সব কিছুর ওধারে কসাকদের শ্রেণীবদ্ধ টিনের কুটীর ক্রমে ঢালু হয়ে কারখানার কাছে গিয়ে ঠেকেছে। অধিবাসীরা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক হীনভাবে অন্তরীনের মত নিজ নিজ বাড়ীতে বসবাস করত। সন্ধ্যার পরই গ্রামে একটা নিথর শুব্ধতা নেমে আসত। পড়শীর বাড়ী গেলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, তাছাড়া সূর্য্যাস্তের পরই যে যার ঘরের খিল আটকে, কুকুরগুলি প্রাঙ্গণে ছেড়ে দিত। গ্রাম্য চৌকি-

দারের হাঁকডাকেই কেবলমাত্র এই পল্লীব্যাপী শুদ্ধতার অপহ্নব ঘটাত! এ ছাড়া টু শব্দটি শুনবার যো ছিল না।

* * * * *

৪

আগষ্টের শেষাশেষি একদিন মিট্কা করশুনভের সঙ্গে নদীতীরে এলিজাবেতার দেখা হয়। সবে মাত্র ওপর থেকে বেয়ে এসে সে ঘাটে নৌকা বাঁধছে। এমনি সময়ে সুসজ্জিত একখানি ডিঙ্গি চোখে পড়ল। তরুণ ছাত্র বয়ারিস্কিন ডিঙ্গিখানি বাইছে। ক্লান্তিতে তার স্বেদ-সিক্ত নগ্ন মস্তক চকচক করছিল এবং কপালের শিরা সব ক'টা জেগে উঠেছে।

প্রথমে ডিঙ্গির মধ্যে এলিজাবেতাকে মিট্কা ঠিক লক্ষ্য করতে পারেনি—তার খড়ের টুপীটা এমনিভাবে মুখের ওপর টানা ছিল যে দূর থেকে কে ঠাহর করা দুঃসাধ্য। রোদে পোড়া হাতখানি দিয়ে লিজা কতগুলি কুমুদ বুকের কাছে চেপে রেখেছে। মিট্কাকে দেখেই সে ডেকে বল্লে—"করশুনভ, তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করেছ।"

"প্রবঞ্চনা করেছি!"

—"মনে পড়ে, আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে বলেছিলে।"

বয়ারিশকিন্ দাঁড় ছেড়ে, পিঠ সোজা করে বসতেই ডিঙ্গিখানির গলুই নদীর পাড়ে আট্‌কে গেল। নৌকা থেকে লাফিয়ে নেমে লিজা হেসে বল্লে—"মনে পড়ে না!"

—"সময় করেই উঠতে পারি নি'—অনেক কাজ করতে হয়। অপরাধীর মত মিট্কা বল্লে। লিজা তার কাছে এগিয়ে এল।

—"বেশ, তাহ'লে এখন কবে নিয়ে যাবে বল।"

—"কাল্‌কেই যেতে পার।"

—"এবার ভুল হবে না তো?"

—"না।"

"তা'হলে তোমার জন্য আমি বসে থাকবো কিন্তু। সেই জানালার কথা ভোলোনি' নিশ্চয়। কালকে কিন্তু নিয়ে যাওয়া চাই।"

লিজা একটু চুপ করে থেকে আবার হেসে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার বাড়ীতে তো বিয়ে গেল একটা, না?"

—"হাঁ, আমার বোনের।"

—"কার সঙ্গে?"—উত্তরের অপেক্ষা না করেই লিজা আবার রহস্য-চপল হাসি হাস্‌লে। "তাহলে ঠিক আস্‌বে তো? না আস্‌বে না?" আর একবার তার চপল হাসি মিট্কাকে জলবিছুটি মারলে।

আবার তারা ডিঙ্গিতে উঠল' গিয়ে। বয়ারিশকিন অধৈর্য্য হয়ে ঠেলে ডিঙ্গি জলে ভাসাল। লিজা তার মাথার ওপর দিয়ে চেয়ে মিট্কাকে বিদায়-অভিনন্দন জানালে। কিছুদূর নৌকা এগুলেই মিট্কা শুনতে পেল বয়ারিশকিন জিজ্ঞেস করছে—"ছেলেটা কে?"

—"ও আমার পরিচিত!"—লিজা উত্তর করল।

—"প্রণয়ের ব্যাপার নয় তো।"

দাঁড়ের শিকলের শব্দে আর লিজার জবাবটা মিটকা শুনতে পেল না। দেখলে বয়ারিশকিন হেসে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু লিজার মুখে দেখা গেল না—তার টুপীর লিসোক্ ফিতাটি বায়ুভরে পিঠের ওপর নিশ্চিন্ত আরামে গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

বড়শীতে মাছ ধরবার মত সখ মিট্কার আদৌ ছিল না বললেই চলে। মাঝে মাঝে কখনও খেয়াল হ'লে যেত। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাবেলা অপরিসীম ব্যস্ততা এবং ব্যগ্রতা নিয়েই সে পরদিবসের অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজন করতে লেগে গেল। সব কিছু গোছগাছ করে সে সামনের ঘরে এসে হাজির। গ্রীস্কা দাদু জানালায় বসে তামার ফ্রেমওয়ালা চশমা চোখে বাইবেল পড়ছিলেন। দুয়ারের চৌকাঠে হেলান দিয়ে বিনীত ভাবে মিট্কা ডাকল—"দাদু!"

বৃদ্ধ চশমার ওপর দিয়ে চাইলেন তার পানে।

—"কি?"

—"মোরগ ডাকলেই আমাকে তুলে দিও।"

—"কেন, অত সকালে কোথায় যাবি?"

—"মাছ ধরতে।"

মৎস্য সম্বন্ধে বৃদ্ধের কিছু দুর্ব্বলতা ছিল; তবু মিটকার প্রস্তাবে বাধা দানের ভাণ করে তিনি বল্লেন—"তোর

বাবা বলেছে কালকেই শণ পাকাতে হবে। বাজে কাজ করবার আর সময় আছে নাকি ?"

দরজার পাশ থেকে সরে মিট্‌কা ছলনার আশ্রয় নিয়ে বল্লে—"বেশ, তাই হবে। ভেবেছিলাম, তোমাকে বেশ বড় দু-চারটে মাছ ধরে এনে দেবো, তা শণ যখন পাকাতেই হবে, তখন আর কি করা যায়, নাই গেলাম !"

—"দাঁড়া, কোথায় যাচ্ছিস্"—সত্রাসে বৃদ্ধ বল্লেন, তারপর চশমাটা খুলে আবার বল্লেন—"আচ্ছা, আমি বোলবো তোর বাবাকে। তুই যাস্। আমি ডেকে দেবো।"

দুপুর রাতে একহাতে পাজামা টেনে ধরে, অপর হাতে লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে মিট্‌কার কাছে এসে হাজির। গোলাঘরে একখানা কম্বলের পর মিট্‌কা শুয়েছিল। বৃদ্ধ লাঠি দিয়ে কয়েক বার খোঁচা মারলেন, কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। প্রথমে আস্তে খোঁচা মেরে চাপা স্বরে বৃদ্ধ ডাক্‌ছিলেন—"মিট্‌কা, মিট্‌কা, এই মিট্‌কা !" প্রত্যুত্তরে একটা হাই তুলে মিট্‌কা পা টান করে শুলো। রেগে বৃদ্ধ তখন সজোরে তার পেটের পর খোঁচা মারতে লাগলেন। ধড়মড় করে উঠে, মিট্‌কা লাঠির মাথা টেনে ধরল।

রেগে বৃদ্ধ বল্লেন—"কি ঘুম রে বাপু !"

মিটকা নিঃশব্দে উঠে উঠান পার হয়ে স্কোয়ারের কাছে হাজির হ'ল। মোখবের বাড়ীর কাছে পৌঁছে সে ছিপটা রেখে, চোরের মত পা টিপে টিপে, কুকুরগুলি টের না পায় এমনিভাবে আঙুলে ভর করে বারান্দায় উঠলে। প্রথমে দরজার তালা খুলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু কবাট ভেতর থেকে বেশ ভাল করে খিল দেওয়া। তারপর বারান্দার বালাষ্টার্ড ধরে ধরে সে সেই জানালাটার কাছে গেল। জানালার একখানা কবাট ভেজান ছিল। ফাঁকের মধ্য দিয়ে নারীদেহের সুবাস এবং অপরিচিত অঙ্গরাগের গন্ধ ভেসে আসছে।

—"এলিজাবেতা সার্জিভ্‌না ?"

মিটকা ভাবলে ডাকটা খুব জোরে হয়ে গেছে। অপেক্ষা করতে লাগল। কোনও সাড়া নেই। তাহ'লে সে কি জানালা ভুল করেছে ? যদি মোখবই এই ঘরে শুয়ে থাকে ? সে কি···যদি সে বন্দুক ছোড়ে ?

—"এলিজাবেতা সার্জিভনা, মাছ ধরতে যাবে না !"

যদি সে জানালা ভুল করে থাকে তাহ'লে একটা মাছ আজ ধরা পড়বেই !

জানালার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে, চটে মিট্‌কা জিজ্ঞাসা করল—"উঠবে, না কি ?"

অন্ধকারের মধ্য থেকে শঙ্কিত একটি স্বর আস্তে জিজ্ঞাসা করল—"কে ?"

—"আমি, করশুনভ ! মাছ ধরতে যাবে না !"

—"ও ! হাঁ যাচ্ছি, দাঁড়াও !"

ভিতরে নড়াচড়ার শব্দ হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে নিদ্রাতুর জড়িত কণ্ঠের চাপা কথা শোনা যাচ্ছিল। মিট্‌কা দেখলে অস্পষ্ট সাদা একটা ছায়ার মত ঘরের এদিকে ওদিকে খশ্‌খশ্ শব্দ করে নড়ছে। কিছুক্ষণ পরেই জানালায় লিজার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি দেখা গেল।

—"এই পথেই বেরুতে হবে। তোমার হাতখানা বাড়াও।" মিট্‌কার হাতখানা চেপে ধরে লিজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে তার চোখের পানে।

সটান হেঁটে উভয়েই ডনের পারে এসে উপস্থিত। সন্ধ্যাবেলা নৌকাখানা ডাঙ্গায় বাঁধা ছিল, কিন্তু জোয়ারের জলে তখন তা সামান্য দূরে ভাস্‌ছে।—"জুতো খুল্‌তে হবে ?"

—"এসো কোলে করে পার করে দিচ্ছি।"

—"না না থাক, তার চেয়ে আমি জুতোই খুল্‌ছি।"

—"কেন, কোলে করে নেওয়া তো আরও ভাল !"

—"না, থাক্ !"—সলজ্জকণ্ঠে লিজা জানাল।

কিন্তু মিট্‌কা কথা কাটাকাটি না করেই সোজা হাঁটুর ওপরে তার পা-দুখানি বাঁ-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে, সহজেই তাকে তুলে ফেল্‌লে। লিজা সসঙ্কোচে তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে নীরবে হাস্‌তে লাগল ! মেয়েদের কাপড় কাচবার পাথরে মিট্‌কা যদি হোঁচট না খেত তাহলে হঠাৎ এই সংক্ষিপ্ত চুম্বনটি সংঘটিত হ'ত না। অস্ফুট আর্তনাদ করে লিজা মিট্‌কার ঠোঁটে তার গাল চেপে ধরলে ? নৌকা থেকে দু'এক পা দূরে মিট্‌কা থমকে দাঁড়াল। ঠাণ্ডাজলে পা শিরশির করছিল। নোঙর খুলে, ডিঙ্গিতে ঠেলা মেরে মিট্‌কা লাফিয়ে উঠল। দাঁড়িয়েই সে বাইছিল। নদী

পাড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নৌকাখানি ওপারের দিকে চলল। হঠাৎ বালুতটে ধাক্কা লেগে নৌকার 'দাঁড়' কেঁপে উঠল। কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই মিট্‌কা মেয়েটিকে পাঁজা কোলে তুলে একটা হথর্ণ ঝোঁপের ওপাশে নিয়ে গেল। মেয়েটি অসহায়ের মত তার মুখ কামড়ে এবং আঁচড়ে দিতে লাগল, দু'একবার অস্ফুট আর্ত্তনাদও করেছিল; সব কিছুই নিষ্ফল বুঝে, রুদ্ধ কান্নায় তার বুক ভরে এলো। চোখে কিন্তু অশ্রুর কণামাত্র ছিল না।

গোটা নায়কের সময় তারা বাড়ী ফিরল। প্রভাতের অরুণ আভায় তখন আকাশের বুক ছেয়ে গেছে। নদীর বক্ষে শুরু হয়েছে পবনের লীলায়িত নৃত্য। মিট্‌কা সেই ফেনিল তরঙ্গমালার উজানে পাড়ি দিয়েছে। লিজার পাণ্ডুর মুখে, চোখের পাতায় এবং আলুলায়িত কুন্তল-গুচ্ছে হিমশীতল জলকণা জড়িয়ে ঝলমল করছে। অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে তন্ময়ভাবে সে হাতের ফুলটির পাপড়ি খুঁটছিল। মিট্‌কাও অন্যদিকে চেয়ে নীরবে দাঁড় টান্‌ছে; মুখে শঙ্কা, সন্তুষ্টি এবং অপরাধীর ভাব। অবশেষে নৌকার মুখ ঘুরিয়ে মিট্‌কা বল্লে—"সেমিওনভের ঘাটে তোমায় নামিয়ে দোব, সেইটেই কাছে হবে।"

নদীতীরে ওয়াটল্ গাছের বেড়া শুকিয়ে গেছে। চড়াইপাখী ঠুক্‌রে সূর্য্যমুখীকে পাপড়িহীন করে ফেলেছে, তার পরিণত বীজ ইতস্ততঃ চারিধারে ছড়িয়ে পড়ছে। নবীন তৃণের শোভায় প্রান্তর অপূর্ব্ব শ্যামলশ্রীমণ্ডিত। দূরে অশ্বখুরে বালি উড়ছে। দক্ষিণা পবনে নদীর বক্ষ কল্লোলমুখর।

এলিজাবেতা নৌকা থেকে নামবার সময়ে মিট্‌কা একটা মাছ তার হাতে দিলে।

—"তোমার ভাগ নাও।"

বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাইলে লিজা। মাছটাও যাহোক্ নিলে।

—"আচ্ছা, যাচ্ছি তাহোলে।"

একখানি ছোট্ট শাখায় মাছটা ঝুলিয়ে মলিনমুখে চল্ল লিজা। হথর্ণ ঝোঁপেই তার সমস্ত উৎসাহ এবং আনন্দের সমাধি হয়েছে।—'এলিজাবেতা।'

বিস্ময় ও বিরক্তি চেপে লিজা ফিরল। পাশে এসে মিট্‌কা সসঙ্কোচে জানাল—"তোমার জামার পেছনে…… একটা ফুটো! খুবই ছোট তবু…"

লজ্জা, অপমান ও শঙ্কায় লিজার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। খানিক পরে মিট্‌কা বুদ্ধি বাতলে বল্ল—"পেছনের পথটা দিয়ে যাও।"

—"কিন্তু স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে তো আমাকে যেতেই হবে। ভেবেছিলাম কালো জামাটা পড়ে আস্‌ব……" লিজার কণ্ঠে একটা ক্ষোভ ও অপ্রত্যাশিত অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল।

—"পাতা লাগিয়ে সযত্নে করে দোব?"—সরল ভাবে মিট্‌কা প্রস্তাব করল। কিন্তু চোখচোখি হতেই দেখে লিজার চোখের কোণ চিক্‌চিক করে উঠেছে।

* * * *

৫

পরদিনই পবনের মৃদু মর্ম্মরের মত কথাটি পাড়াময় ছড়িয়ে পড়ল,—মিট্‌কা করশুনভ সারারাত সাজি প্রাটোনোভিচের মেয়েকে নিয়ে বাইরে কাটিয়েছে। মাঠে গরুর পাল নিয়ে গিয়ে, কুয়ার পাশে, নদীর পাড়ে কাপড় কাচতে গিয়ে নারীমহলে ঐ এক কথা!

—"নিজের মা নেই তো!"

—"তাছাড়া বাপ তো সারা দিনরাত কাজে ব্যস্ত, সৎমাও তেমন নজর দেয় না।"

—"দোকানের দারোয়ান বল্লে, "দুপুর ে একটা লোককে সে জানালা বেয়ে উঠতে দে..ছে। প্রথম ভেবেছিল,—চোর, জানালা ভাঙবে হয়ত। দৌড়ে গিয়ে দেখে মিট্‌কা।"

—"আজকালকার মেয়েরা পাপে ডুবে আছে। কোন কাজেরই নয়!"

—"মিট্‌কা আর্থার মাইকেলকে বলেছে, সে নাকি বিয়ে করবে ওকে।"

—"মিট্‌কা শুন্‌লাম জোর করে……"

—"থাক্, আর দোষ ঢাক্‌তে আসিস্‌নে—অরাজী কোটিকে কুত্তা কখনও উত্যক্ত করে না।"

কথাটা ক্রমে মোখবের কাণেও পৌছাল। দালানের কড়ি মাথায় ভেঙে পড়বার মত সংবাদটি মোখবকে স্তম্ভিত

এবং মুহ্যমান করে ফেল্ল। দু'দিন ধরে না গেল দোকানে, না এলো কারখানায়।

তৃতীয় দিবসে বলিষ্ঠ কটা ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে মোখব জিলায় চল্ল। পশ্চাতে সুন্দর এবং সুসজ্জিত একখানি জুড়ী গাড়ী,—এলিজাবেতা নীরবে তার মধ্যে বসে। তার মুখ শুকিয়ে মৃতের মত বিবর্ণ এবং পাণ্ডুর হয়ে গেছে। কোলের উপর পাতলা একটা সুটকেশ রেখে নিতান্ত মুখরক্ষার জন্যই জোর করে হাস্‌ছিল সে। ফটকের সাম্‌নে সে ভাদিমির এবং সৎমাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাল। প্যাণ্টালীমন প্রোকোফিভিচ তখন সবে দোকান থেকে বেরিয়েছেন। এদের দেখে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কর্ত্তার মেয়ে কোথায় যাচ্ছে ?"

মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার বশে নিকিটা আসল কথা চেপে সসঙ্কোচে জানাল—"মস্কোয় পড়তে যাচ্ছে।"

পরদিনই যা ঘটল, নদীর ধারে কুয়ার পাশে এবং মাঠে বহুকাল ধরে তা' একমাত্র আলোচ্য বিষয় হয়ে রইল। সন্ধ্যার ঠিক আগেই, গোধূলির সময়ে, মিট্‌কা সার্জ্জি প্রাটোনোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যায়। নিরালা হবার জন্য অনেকক্ষণ সে অপেক্ষা করে বসে রইল। বেড়াবার জন্য সে মোটেই যায়নি! উদ্দেশ্য মোখবের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করবে। বার চারেকের বেশী তাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি। শেষবার সাক্ষাতের সময়ে মিট্‌কা কথার ছলে জিজ্ঞাসা করেছিল—"এলিজাবেতা, আমায় বিয়ে করবে ?"

—"মূর্খ!"

—"আমি তোমায় আদর করব, তোমায় ভালবাসব। কাজকর্ম্ম করবার জন্য আমাদের মাইনে করা লোক রয়েছে, তুমি শুধু জানালায় বসে বই পড়বে।"

—"তুমি আস্ত একটি বোকা!"

মিট্‌কা চুপ করল। সেদিনকার মত কথাবার্ত্তা এই পর্য্যন্তই। সন্ধ্যাবেলা মিট্‌কা একটু সকাল করে বাড়ী ফিরল। পরদিন সরাসরি বাবার নিকট প্রস্তাব করলে—"আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর বাবা!"

মিরণতো শুনে অবাক্।

—"সত্যি করে বল্‌ছিস্!"

—"হাঁ সত্যি।"

—"খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছ না? মাথাটি এমন করে বিগড়ে কে দিলে, মার্থা ?"

—"সার্জ্জি প্লাটোনোভিচের কাছে ঘটক পাঠাও।

উচ্চহাস্য করে মিরণ বল্লে—"বেশ, আজ তো দেখছি বেশ খোস্ মেজাজেই আছ।"

মিট্‌কা নাছোড়। মিরণ তখন চটেমটে বল্লে—"মূর্খ! সার্জ্জি প্লাটোনোভিচ লাখপতি। সে ব্যবসাদার, আর তুমি ? যা আমার সুমুখ থেকে, ভাগ, না হয় চাবকে তোমাকে আমি সোজা করব।"

—"আমাদের বার জোড়া বলদ আছে। জমিজমাও বিস্তর, তাছাড়া সে কৃষক। আর আমরা কসাক্।"

—"সরে যা' বল্‌ছি।"—সরাসরি মিরণ জবাব দিল।

একমাত্র পিতামহই যা একটু মিট্‌কার প্রতি সহানুভূতিশীল। তাছাড়া আর শ্রোতাই তো জুটল না। মিরণকে রাজী করবার জন্য বৃদ্ধ বহু চেষ্টা করল।

—"কেন তুই রাজী হচ্ছিস্ না, মিরণ? ছেলেটার মাথায় যখন ধরেছে......"

—"আপনিও তো দেখছি বাবা আস্ত একটি খোকা! সত্যি, মিট্‌কাটা তো একেবারেই বোকা, আর আপনি..."

—"মুখ সাম্‌লে কথা কইবি ?" সক্রোধে মাটিতে লাঠি ঠুকে বৃদ্ধ বল্লে। "আমরা তাদের সমান নই ? কসাকের ছেলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিতে পারছে, এ তার পরম ভাগ্যের কথা। এ অঞ্চলের সবাই চেনে আমাদের, আমরা চাষী নই—আমরা প্রভু। যা, গিয়ে প্রস্তাব করে আয়। ঐ কারখানাটা তাকে যৌতুক দিতে হবে।"

মিরণ আবার চটে উঠল। কাজেই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে মিট্‌কা নিজেই মোখবের কাছে যাবে স্থির করল। সে বেশ ভাল করেই জানত যে, বাবা যখন গোঁ ধরেছেন কিছুতেই তার একচুল নড়চড় হবে না। ভাঙ্‌বে, তবু মচকাবে না। তার কাছে মিনতি জানান নিষ্ফল।

উৎসাহ ভরে শিস্ দিতে দিতে মোখবের বাড়ী পর্য্যন্ত গেল। কিন্তু সদরের কাছে এসেই যেন কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। সে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু এ ভীরু দুর্ব্বলতা

ক্ষণিকের। আঙিনা পার হয়ে মিট্‌কা মোখবের ঘরে এসে হাজির হ'ল। সিঁড়িতে ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে—"কর্তা বাড়ী আছেন ?"

—"চা খাচ্ছেন, একটু বসুন !"

মিট্‌কা বসে অপেক্ষা করতে লাগল। সিগ্রেট ধরালে একটা, তাও পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে হাত দিয়ে মোখব বাইরে এল।" মিট্‌কাকে দেখেই ভ্রূ কুঞ্চিত করে বল্লে—"ভিতরে এস।"

মোখবের প্রাইভেট ঘরে ঢুকে মিটকার মনে হ'ল, তার সঞ্চিত সাহসটুকু বুঝি সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

টেবিলের পাশে গিয়েই মোখব নাটকীয় ভঙ্গীতে দূরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"বল !" পশ্চাতে তার আঙুলগুলি টেবিলের পর আঁচড় কাটতে লাগল।

—"আমি আমার..." মোখবের রূঢ় দৃষ্টির পানে চেয়েই মিট্‌কা চমকিত হয়ে থাম্‌লে। "এলিজাবেতাকে হয়ত আপনি আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন !" হতাশা, ক্রোধ এবং শঙ্কা সব কিছু মিলে তার কপালে ঘাম দেখা দিল। মোখবের বাম চক্ষুটি ঈষৎ কেঁপে উঠল। ঠোঁট কামড়ে নীরবে সে দাঁড়িয়ে মিট্‌কাকে লক্ষ্য করতে লাগল, তারপর ঘাড় প্রসারিত করে সাম্‌নে ঝুঁকে বলে উঠল—"কি বল্লি ? কি ? বেরো, বেরো পাজী—বেরিয়ে যা এখান থেকে। আমি তোর নামে আতামানের কাছে আর্জ্জি দেব।"

মোখবের চীৎকারে মিট্‌কারও সাহস দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

"একে অপমান মনে করবেন না। আমি শুধু আমার অপরাধ শোধরাতে চাই।"

রক্তচক্ষু পাকিয়ে মোখব ভারী একটা লোহার য়্যাশ ট্রে মিট্‌কার প্রতি নিক্ষেপ করলো। লাফিয়ে উঠে ট্রে-টা ঠক করে মিটকার হাঁটুর উপর আঘাত করল। নির্লিপ্তের মত যন্ত্রণা সহ্য করে মিট্‌কা দরজা খুলে, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে বল্লে—"বেশ, তাই হবে প্লাটোনোভিচ। কিন্তু আমি এখন শপথ করে বলছি...কে চায় তাকে এখন ? ভেবেছিলাম তার কলঙ্ক ঘোচাবো...কিন্তু চিবানো হাড় কুকুরেও ছোঁবে না।"

রুমালখানা ঠোঁটে চেপে প্লাটোনোভিচ দৌড়ে এসে সদর আটকে দাঁড়াল। মিট্‌কা প্রাঙ্গণে লাফিয়ে পড়ে ফটক খুলে বেরবার চেষ্টা করল। কিন্তু সার্জ্জের ইঙ্গিতে ইতিমধ্যে কোচোয়ান ইয়েমেলিস কুকুর চারটে খুলে দিয়েছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘেউ ঘেউ শব্দে তারা মিট্‌কার উপর লাফিয়ে পড়ে কামড়ে তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিতে লাগল। কিল লাথি মেরে সেগুলিকে তাড়িয়ে মিট্‌কা কোনমতে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। পাইপ মুখে ইয়েমেলিন্ ঘরে ঢুকে খিল আটকে দিলে।

মোখব একটা রেন্‌ওয়াটার পাইপে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোনমতে ফটক খুলে মিট্‌কা দৌড়ে বাইরে এলো। কুকুরগুলিও তার পেছন পেছন তাড়া করলে। একটার গলাটিপে মিটকা তাকে সাবার করলে। কসাকদের পাশ কাটিয়ে অপর তিনটার হাত থেকেও সে বহু কষ্টে রক্ষা পেল। ক্রমশঃ

বর্ষাবর্ণনায় কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ

গায়ত্রী রায়

ধরণীর রঙ্গমঞ্চে ছয়ঋতুর নৃত্যলীলায় যে বিচিত্র রূপের সমারোহ ফুটিয়া উঠে দিকে দিকে, প্রকৃতির পূজারী রবীন্দ্রনাথ, সে রূপ-সম্ভারের পায়ে হৃদয় উজাড় করিয়া অঞ্জলি ঢালিয়াছেন। রুদ্র বৈশাখের 'ধূলায় ধূসর রুক্ষ' রূপ, শারদ লক্ষ্মীর অমলধবল শোভা, হিমের রাতের রহস্যে ঢাকা সৌন্দর্য্য সকলই তাঁহার কবিচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু কবিহৃদয়ের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তিনি অর্পণ করিয়াছেন 'শ্যাম গম্ভীর সরসা, নবযৌবনা বরষাকে'। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ বর্ষারই কবি, ঋতুরাজ বসন্তের অনুপম মাধুরীর মাঝেও যে পূর্ণতা তাঁহার কবিমানস লাভ করে নাই, তাহাকে তিনি পাইয়াছেন বর্ষার শ্যাম সমারোহের মাঝে। তাই বর্ষার আবির্ভাবে উন্মুখ কবিচিত্ত গাহিয়া উঠিয়াছে—

"বহুদিন হোল কোন ফাল্গুনে ছিনু আমি তব ভরসায়
এলে তুমি ঘন বরষায়।"

এই দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের এক গভীর আত্মীয়তা রহিয়াছে মহাকবি কালিদাসের সহিত। ঋতুচক্রের আবর্ত্তনে ধরণীর অঙ্গের বিচিত্র সৌন্দর্য্য-লীলার অনুপম আলেখ্য কালিদাস আঁকিয়াছেন তাঁহার ঋতুসংহারে, কিন্তু সেখানেও শ্রেষ্ঠ রাজাসন তিনি দিয়াছেন বর্ষাকে। তাঁহার অমর কাব্য মেঘদূত প্রকৃতপক্ষে বর্ষারই জয়গান।

বস্তুত বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী মানবপ্রকৃতির সহিত, শতবর্ষপূর্ব্বেকার মানবমনের আজও এক গভীর ঐক্য রহিয়াছে। তাই বর্ত্তমানের শত কোলাহলের মাঝেও গগনে ঘনঘটার আবির্ভাবে কবির গৃহত্যাগী মন মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে আসন লইয়া, উড়িয়াছে বহুযুগের ওপারে, যেখানে

"বিরহিণী মর্মে মরা মেঘমন্দ্রস্বরে
নয়নে নিমেষ নাহি
গগনে রহিত চাহি,
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।"

আষাঢ়ের 'ঝরঝর বরিষণ' যেন সেই বিস্মৃত অতীতের কাহিনীর রেস বহিয়া আনিয়াছে কবির হৃদয়-অঙ্গনে।

"যে মিলনের মালাগুলি
ধুলায় মিশে হোল ধূলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে,
আজি সজল সমীরণে।

বাস্তবিক পৌরাণিক যুগের সুধাকণ্ঠ কবি কালিদাসের লেখনী ও বিংশশতাব্দীর রবীন্দ্রনাথের লেখনী বর্ষার কাব্যের আসরে যে অপরূপ ঐক্যতান বাদনের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মাধুর্য্য সত্যই উপভোগ্য।

কবি কালিদাস বর্ষাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন রাজার ঐশ্বর্য্যে।

"সঃ শীকরাম্ভোধরমত্তকুঞ্জরস্তড়িৎপতাকোঽশনিশব্দ-
মর্দ্দলঃ।
সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতির্ঘনাগমঃ কামিজনপ্রিয়ঃ
প্রিয়ে॥"

অর্থাৎ, দেখ কামিজনের অতিপ্রিয় বর্ষাঋতু রাজার ন্যায় উপস্থিত হইয়াছে, রাজার ন্যায় ইহারও জলকণাবর্ষী মেঘ মত্তমাতঙ্গ, বিদ্যুল্লেখা বিজয়পতাকা, গম্ভীর বজ্রনিনাদ আগমন ঘোষণার মাদল।

কবি রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে আহ্বান করিয়াছেন,

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে
শিখীদম্পতি কেকা-কল্লোলে বিহরে
দিগবধূ-চিত-হরষা
ঘনগৌরবে আসে উন্মাদ বরষা।"

বর্ষার বারিধারায় সদ্যস্নাতা পৃথিবীর স্নিগ্ধরূপ কবি-অন্তর ভরিয়া অনুভব করেন, তাহার লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠে,

প্রভিন্নবৈদূর্য্যনিভৈস্তৃণাঙ্কুরৈঃ সমাচিতা প্রোত্থিতকন্দলী-দলৈঃ।
বিভাতি শুক্লেতররত্নভূষিতা বরাঙ্গনেব ক্ষিতিরিন্দ্র-গোপকৈঃ॥

অর্থাৎ দলিতবৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্যামল তৃণাঙ্কুরে, নবোদ্গত কন্দলীপত্রে এবং ইন্দ্রগোপকীটসমূহের দ্বারা সমাবৃত হইয়া পৃথিবী নীলাদিরত্ন ভূষিতা বরাঙ্গী সুন্দরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে।

"মুদিত ইব কদম্বৈর্জাত পুষ্পৈঃ সমন্তাৎ পবনচলিত-শাখৈঃ শাখিভির্নৃত্যতীব।
হসিতমিব বিধত্তে সূচিভিঃ কেতকীনাং নবসলিল-নিষেকচ্ছিন্নতাপোবনান্তঃ॥

অর্থাৎ—আজ নবজলসম্পাতে বনস্থলীর সমস্ত তাপ বিদূরিত হইয়াছে; চতুর্দ্দিকে বিকশিত কদম্বকুসুমে তাহার প্রফুল্লতা, পবনকম্পিত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে নৃত্য ও কেতকীকুসুমের পরাগলিপ্ত তীক্ষ্ণ কিঞ্জল্কগুলির মধ্যে তাহার হাস্য প্রকাশিত হইতেছে।

নবজলধর দর্শনে উৎফুল্ল হৃদয় কবি গাহিয়া উঠেন,

"হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচ রে,

* * *

নয়নে আমার সজল মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে
নয়নে লেগেছে।
নব তৃণদলে ঘনবন ছায়ে,
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপ-নিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে
নয়নে সজল স্নিগ্ধ মেঘের
নীল অঞ্জন লেগেছে।"

বর্ষার স্রোতোবেগে উচ্ছল নদীর চিত্র রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"পূবে হাওয়া বয় কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছলছল উঠে বাজি রে।"

কালিদাস আঁকিয়াছেন বর্ষার প্রবহমান বারিধারার দৃশ্য, ধূলিমলিন পৃথিবীর সকল মলিনতা ধৌত করিয়া বিভিন্ন স্রোতে বহিয়া যাইতেছে—

"বিপাণ্ডুরং কীটরজস্তৃণান্বিতং ভুজঙ্গবক্রগতি-প্রসর্পিতম্।
সসাধ্বসৈর্ভেককুলৈর্নিরীক্ষিতং প্রযাতি নিম্নাভিমুখং নবোদকম্।"

অর্থাৎ—বর্ষার আবিলতায় পাণ্ডুবর্ণ, এবং কীট রজ ও তৃণাদিতে সমাচ্ছন্ন হইয়া নূতন জলস্রোত ভুজঙ্গের ন্যায় কুটিল গতিতে কেমন নিম্নাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে, আর ঐ স্রোতকে ভেকসমূহ ভয়ে ভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছে।

আষাঢ়-সন্ধ্যার জলভারাবনত আকাশের পানে চাহিয়া কবি বলিয়াছেন—

"নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে
ওগো আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর
আউষের ক্ষেত জলে ভর-ভর
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে, দেখ্
চাহি রে।"

পূর্বমেঘকে দেখিয়া কালিদাসের মনে যে চিরবিরহীর অনুভূতি জাগিয়াছিল, তাহা রূপ লাভ করিয়াছিল তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘদূতে'। মানবমনের এই চিরন্তন বিরহের অনুভূতি গভীরতর ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছত্রে:—

হেরি চারিধার,
বৃষ্টি পড়ে অবিশ্রাম; ঘনায়ে আঁধার
আসিছে নির্জন নিশা। প্রান্তরের শেষে
কেঁদে চলিয়াছে বায়ু অকূল উদ্দেশে।
ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র নয়ান
কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান।
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ।

আকাশে মেঘের আবির্ভাব হইলে প্রিয়জনের সান্নিধ্যের জন্য প্রবাসীর মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠে

'রঘুবংশে' কবি রামচন্দ্রের মুখ দিয়া তাহাই বলাইয়াছেন—

গন্ধশ্চ ধারাহতপল্বলানাং কাদম্বমর্দ্ধোদগতকেসরঞ্চ।
স্নিগ্ধাশ্চ কেকাঃ শিখীনাং বভূবুর্যস্মিন্নসহ্যানি
বিনা ত্বয়া মে॥

অর্থাৎ নববারিসিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ, অর্দ্ধোদ্গত কদম্বের মুকুল এবং ময়ূরগণের মধুর কেকারব, এই সকল পদার্থ সুখজনক হইলেও তৎকালে তোমার বিরহে অসহ্য মনে হইত। আর বর্ষণমুখর রাত্রির স্তব্ধ তিমিরে পরমদেবতার সঙ্গমলাভে ব্যাকুল কবির হৃদয়ব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার অমর লেখনীমুখে—

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণসখা বন্ধু হে আমার,
আজি আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নয়নে ঘুম নাই যে মম,
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার॥

যৌবনের উপাসক কবি কালিদাস শিশুমনের উপর বর্ষার প্রভাব বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু আবালবৃদ্ধবনিতার কবি রবীন্দ্রনাথ শিশুকে ভুলিতে পারেন নাই। মেঘের খেলা দেখিয়া তাঁহার মনে জাগিয়াছে, ছেলেবেলায় শোনা 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান'।

"মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে
কতদিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান।"

কালিদাস বর্ষার বাহিরের রূপ ও প্রেমিক মনে তাহার প্রভাবই শুধু বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নাই। তাঁহার কবিমানস বর্ষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি মানবের মাঝে বর্ষার রূপ দেখিতেছেন— 'আজি বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে!'

শ্রাবণ বরিষণ যেন কোন্ বিস্মৃত অতীতের অস্পষ্ট বাণীকে তাঁহার কানে আনিয়া দিয়াছে, সেই বাণীকে হৃদয় দিয়া অনুভব করিবার জন্য কবি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

"শ্রাবণ বরিষণ পার হ'য়ে
কি বাণী আনে ঐ র'য়ে র'য়ে
গোপন কেতকীর পরিমলে
সিক্তময়ূরের বনতলে
দূরের আঁখিজল ব'য়ে ব'য়ে
কি বাণী আনে ঐ র'য়ে রয়ে।

নক্ষত্রখচিত নৈশ আকাশের অন্তরালে কবি Keats যে রহস্যের আভাস পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, বাধাবন্ধহারা ঈশানের পুঞ্জমেঘের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথও যেন শুনিয়াছেন সেই অস্পষ্ট রহস্যময় বাণী—

"ঈশান কোণেতে ঐ যে ঝড়ের বাণী
গুরু গুরু রবে কি করিছে কানাকানি।
দিগন্তরালে কোন ভবিতব্যতা
স্তব্ধতিমিরে বহে ভাষাহীন ব্যথা,
কালো কল্পনা নিবিড় ছায়ার তলে
ঘনায়ে উঠেছে কোন আসন্ন কাজে।

বর্ষার এই অন্তর্নিহিত বাণীকে উপলব্ধি করবার জন্য কবি সমস্ত অন্তর দিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার মনে হইতেছে—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিয়াছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শতশত গীতমুখরিত বন-বীথিকা।"

শুধু তাহাই নহে, ঝটিকাক্ষুব্ধ বর্ষণমুখর রাত্রির রহস্যময় রূপ কবিকে দিয়াছে চরম আত্মোৎসর্গের প্রেরণা, তাই মরীয়া হইয়া তিনি গাহিয়া উঠিয়াছেন—

"আজি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে
মরণ-খেলা
নিশীথবেলা।"

অজানাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল কবিহৃদয় হয়তো এই আত্মোৎসর্গের প্রয়াসের মধ্য দিয়াই বর্ষার প্রকৃত রূপ ও অস্পষ্ট বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ধর্মঘট

(গল্প)

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

মহাজাতি পত্রিকা অফিসে ধর্মঘট হইয়াছে।

সমস্ত কম্পোজিটার, মেসিনম্যান, দপ্তরি সকলে মিলিয়া কাজ বন্ধ করিয়া স্বত্বাধিকারীর দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধভাতা দ্বিগুণ না করিলে, মাহিনা বাড়াইয়া না দিলে, চালডাল না পাইলে কাজে যোগদান করিতে তাহারা অসমর্থ। দিনের মজুরিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া রাত্রি জাগিয়া যদি না তাহারা দিনের অন্নই সংগ্রহ করিতে পারিল তবে এমন কাজ করিবে তাহারা কিসের প্রলোভনে? পঁয়ত্রিশ টাকা চালের মণ, শুধু চাল কিনিতেই যদি তাহাদের বেতন নিঃশেষ হইয়া যায় তবে সংসারের অপর প্রয়োজনের দাবী মিটাইবে তাহারা কেমন করিয়া? দেশে স্ত্রীপুত্র-পরিবার প্রতিপালন সে তো দুরূহ ব্যাপার—ডবল ডিউটি করিয়াও তাহারা শুধু অন্ন সংস্থান করিতে পারে না।

তরুণ কম্পোজিটার অনাদিচরণই এই প্রস্তাব তুলিয়াছিল, প্রেসের সকল কম্পোজিটার এবং অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দকে উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহাদের অবস্থার কথা বুঝাইয়া তাহাদের দাবী এবং অধিকার-বোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল এবং ধর্মঘটের ব্যাপারে সে-ই সর্বপ্রথম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নেতৃত্বে আজ সকলে কাজবন্ধ করিয়া প্রেসে মিটিং ডাকিয়াছে, শ্রমিক-আন্দোলনের ব্যাখ্যা করিয়াছে এবং নিজেদের দাবী সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া স্বত্বাধিকারী মহানন্দ বাবুর নিকট তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা সবিস্তারে প্রস্তাবাকারে নিবেদন করিয়াছে।

স্বত্বাধিকারী চতুর লোক। মহাজাতি দৈনিক সংবাদ-পত্র চালাইয়া মস্ত ব্যবসা ফাঁদিয়াছেন। ভবিষ্যতে মহাজাতি গড়িতে যে পরিমাণে দেশসেবার কাজ করিতেছেন ব্যাঙ্কের ব্যালেন্সও সেই পরিমাণে অপর পক্ষে বর্ধিত হইতেছে। শহরের বুকে চার-পাঁচখানি প্রাসাদসম অট্টালিকা, তাঁহার গাড়ি ঐশ্বর্য্য—সে হইল তাঁহার ব্যবহারিক জীবন। তাঁহার অন্তরের আদর্শনীতি যাহা তাহা হইতেছে মহাজাতি মহাসমাজ। যেখানে উচ্চ নীচে ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, সুস্থ সবল সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য না থাকিলেও মতবাদ তাঁহার স্বার্থান্ধ হইতে পারে না তাই বলিয়া।

মহাজাতির ভিতর দিয়া সমাজতান্ত্রিকতার মহাবাণীই তিনি প্রচার করিতেছেন। সম্পাদক হইতে কর্মচারী সকলেই তাঁহার তাঁবেদার ভৃত্য—স্বল্প বেতনভোগী সওদা-গরী অফিসের কেরাণীর মতই তাহাদের অবস্থা। কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে মহাদারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেও মহাজাতিরই সেবক তাহারা এই তাহাদের আদর্শ। মহাজাতির স্বত্বাধিকারী মহানন্দ বাবু একথা বার বার তাঁহার কর্মচারীদের স্মরণ করাইয়াছেন।

আজ তাঁহার প্রেসের কর্মচারীরা ধর্মঘট করিয়াছে। সুগন্ধ বালাখানার তামাকের আমেজে ভরপুর হইয়া কর্মচারীদের দাবীপত্র তিনি পাঠ করিতেছিলেন। খানিকটা গম্ভীরভাবে তিনি কিছু ভাবিয়া লইলেন, তারপর স্বয়ং কর্মচারীদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদের ধর্মঘট সভায় তিনিই সর্বপ্রথম বক্তৃতা দিতে উঠিলেন—

"ভাইসব, তোমাদের অভিযোগ আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। জীবন ধারণের গুরু ব্যয়-ভার আজ ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে পীড়িত করেছে। বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে আজ আমাদের জীবন-যুদ্ধও সমানতালে পা ফেলে চলেছে। আজ আমরা সকলেই সৈনিক, সম্মুখে আমাদের রণক্ষেত্রের অগ্নিপরীক্ষা। খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, জীবন ধারণের সমস্যা আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখবেদনার সঙ্গে সামাজিক এবং রাষ্ট্রিক সংগ্রামের সংযোগ সংস্থাপন করেছে। বন্ধুগণ! আজিকার এই যুদ্ধে আমাদের ধৈর্য এবং বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে। আপনারা মহাজাতির সেবক—কাগজ অভাবে, দুর্মূল্যতায়, অর্থাভাবে মহাজাতি পত্রিকার মহাবক্ষে আজ যে ঊর্মি মুখরতা—কালবৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডবলীলায় আজ যে মহাঝটিকার বিক্ষুব্ধতা আমাদের পত্রিকার জীবন-তরণী তার মাঝে টলমল করছে আপনারা সেই নিমজ্জমান তরণীর কর্ণধার ভাইসব হুঁসিয়ার!

"ত্যাগের মহা আদর্শের মহামন্ত্রে আপনারা দীক্ষিত। দেশের সেবায়, দশের সেবায়, সমাজের সেবায়, রাষ্ট্রের সেবায়, জনগণের সেবায় আপনারা আপনাদের যে

মহাপ্রাণ উৎসর্গ করেছেন—আপনাদের সে আদর্শ জয়যুক্ত হোক্‌! এই বুভুক্ষিত মুমূর্ষু ক্ষয়িষ্ণু জাতির কংকালে প্রাণ-সঞ্জবনীর অমৃত সুধাপাত্র হাতে করে আপনারা ভুলে যান আপনাদের স্বার্থগত দুঃখ-বেদনা আপনাদের অর্ধ ক্ষুধার জ্বালা।"

মহানন্দবাবুর বক্তৃতায় সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনাদিচরণ কেবল ইহারই মাঝে বলিয়া ফেলিল—"কিন্তু আমাদেরও যে বাঁচতে হবে—এই দুর্মূল্যের দিনে আমাদের পেটভাতাও জুটছে না। আমরা যদি নিজেরাই না বাঁচতে পারলুম তবে অপরকে আমরা বাঁচাবো কেমন ক'রে?"

অনাদিচরণের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল "আমরা বাঁচতে চাই—কঠিন পরিশ্রমের বিনিময়ে দুটো খেয়েপরে কেন আমরা বাঁচবো না? আমরা বাঁচতে চাই—যেমন করেই হোক্‌ আমরা বাঁচতে চাই!"

মহানন্দ বাবু আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কণ্ঠস্বরে আরও ভাবাবেগ টানিয়া আনিয়া কহিলেন—"বন্ধুগণ! আপনারা সেই মহা আদর্শ-ধর্মে দীক্ষিত আপনাদের স্নায়ু-তন্ত্রীতে সেই রক্তধারা প্রবাহিত, আপনারা সেই মহামন্ত্রের আদর্শ পূজারী যেখানে পিনাকীদেব সমগ্রবিশ্বের হলাহল নিজকণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। সেই মহাদেবের মন্ত্রপূতঃ শিষ্য আপনারা আজ দেশের চরম দুর্দিনে আপনারা সেই মহাত্যাগী মহাযোগীর জীবন-আদর্শের কোন অনুপ্রেরণাই কী মর্মের মাঝে অনুভব করতে পারছেন না? মহাজাতি আপনাদেরই একান্ত নিজস্ব—মহাজাতিকে, বাঁচিয়ে আপনারাও বাঁচুন! আজ দেখুন রাশিয়াকে কী আদর্শ ক্ষতি স্বীকার করেও আজ তারা দেশমাতৃকার সেবায় ব্রতী। দেশের অগণিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পথহারা ভ্রান্ত পথিকেরা আপনাদেরই সুপরিচালিত সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশের প্রতীক্ষায় আপনাদের মুখাপেক্ষী। এই জনগণকে আপনারা অন্ধকার হতে আলোকের পথে পরিচালিত করুন! জাতীয় এই সংগ্রামে—ব্যক্তির এই সংগ্রামে—সমাজের এই সংগ্রামে তথা সমগ্র পৃথিবীর এই সংগ্রামে—জনগণের এই সংগ্রামে—হে আদর্শ বীরগণ, আপনারা অগ্রগামী হয়ে জয়যুক্ত হোন! জনগণ জয়ী হোক!! মহাজাতির দুর্দিনে আপনারা দুর্গত—মহাজাতির সুদিনে আপনারা নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। আপনাদের দাবী—আপনাদের ন্যায়তঃ অধিকারকে কোনদিনই আমি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবো না। আমি আশা করি অতঃপর আর কোন অভিযোগই আপনাদের নেই। এই সুযোগে বন্ধুগণ, আপনাদের আমি কৃতজ্ঞতা এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।"

ঘন ঘন করতালির মাঝে মহানন্দ বাবুর বক্তৃতা শেষ হইল। মহাজাতির কর্মচারিগণের ধর্মঘট এককথায় মিটিয়া গেল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন স্যাঁৎসেঁতে হল ঘরটিতে রুদ্ধশ্বাসের মাঝে মহাজাতির সেবকগণ যে যাহার কাজে আবার মন দিল।

অনাদিচরণ বাধ্য হইয়াই চুপ করিয়া ছিল। মহানন্দ বাবুর ধাপ্পাবাজীতে এত সহজেই সে ভুলিতে রাজী নয়। কিন্তু অপর সকলকে আর জাগাইবার মতন উত্তেজিত করিয়া বিক্ষুব্ধ করিবার মতন কোন অস্ত্রই তাহার হাতে নাই। মহানন্দ বাবুর বক্তৃতায় তাহারা গলিয়া পড়িয়াছে। পেটে যাহাদের ক্ষুধার জ্বালা কণ্ঠের মাদক সুধা তাহাদের ভুলাইয়াছে।

উঁচু টুলটি টানিয়া লইয়া গেলির পর গেলি সে অক্ষরের মালা গাঁথিয়া চলিল। মনে তাহার ঝড় বহিতেছে, শালা পাকা ধড়িবাজ! তাহার সমস্ত প্রচেষ্টাকে এককথায় মাটি করিয়া দিয়াছে। পাখার তলায় বসিয়া অর্থ এবং আহার্য-প্রাচুর্যের মাঝে মহাজাতির মহাসেবার আদর্শ বুঝি আওড়ান চলে—কিন্তু তাহাদের মতন যাহারা দীনদরিদ্র অক্লান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহাদের দুই বেলা দুই মুঠা অন্নেরও সংস্থান হয় না তাহারা করিবে জাতির সেবা—সমাজের সেবা? বণিকের পদতলে আত্মবিসর্জন দিয়া তাহাদের ঘৃণিত তাচ্ছিল্যের দয়া ভিক্ষা করিয়া দিন যাহাদের চলে—মন তাহাদের মরিয়া গেছে। মানুষের কথা দূরে থাকুক ঈশ্বরের দানও তাহাদের প্রতি অকরুণ! অনাদিচরণ অনুভব করিল—ধাপ্পাবাজী দিয়া তাহাদের ভুলানো কত সহজ!

অনাদিচরণ অবসন্ন হইয়া পড়িল—ক্ষুধার জ্বালায় সর্ব শরীরে তখন তাহার আনচান করিতেছে।

সর্বেশ্বর আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল—"কী অনাদি-দা, বলি বক্তিমে কেমন শুনলে ?"

দপ্তরি রমজান মিঞা কহিল—"তা বেশ বললে মাইরি। সব উঁচুদরের কথা—বড় জ্ঞানগম্যবাণী। শালা পয়সা তো সকলেই রোজগার করে—চোর ডাকাতেও আবার ভদ্দর আদ্‌মিও—কিন্তু মানুষ বলতে কারা ?"

চোখে সুতাবাঁধা পুরু চশমার ফাঁক হইতে চোখ মেলিয়া বৃদ্ধ কম্পোজিটার যতুমিস্তির কহিল—"সে কথা ঠিক !"

অনাদিচরণের অসহ্য লাগিতেছিল। শরীরে এখনও তাহার তারুণ্যের তেজ—আক্ষরিক শিক্ষা মনে এখনও তাহার বিদ্রোহ জাগাইয়া তোলে। কিন্তু স্রোতের ধারা এখন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী—এখন বাধা দিতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা মাত্র।

আর এসব চিন্তা এখন তাহার ভালোও লাগিতেছে না। ঘর হইতে বাহির হইবার সময় দেখিয়া আসিয়াছে—একটি দানাও আর চাল নাই। দেশ হইতে আজই বৃদ্ধা মাতা তাহার শতবিধ অভাব-অনটনের ফিরিস্তি দেওয়া পত্রাঘাত করিয়াছে। বুভুক্ষিত পরিবার তাহার—নিজের জঠরেও ক্ষুধার জ্বালা। প্রতিকারের আশার দীপ নির্বাপিত হইয়াছে—সুতরাং কিছুই ভালো লাগিতেছে না তাহার।

ওদিকে মহানন্দ বাবুর ঘর হইতে অনাদিচরণের ডাক আসিল। মহানন্দ বাবু তখন আরাম-কেদারায় শুইয়া নিশ্চিন্ত মনে তামাক সেবন করিতেছেন। অনাদিচরণ আসিয়া সম্ভ্রমের অভিবাদন জ্ঞাপন করিলে তিনি তাহাকে কহিলেন—"কী রকম তোমাদের অভিযোগ সব মিটেছে তো ?"

অনাদি মাথা চুল্‌কাইয়া কহিল—"আজ্ঞে আপনার অমন উপদেশের পর আমরা আর কী বলতে পারি বলুন ? কিন্তু বাবু আমার বড়ই অভাব আজ সমস্ত দিন অনাহারী—বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে সেখানে মুমূর্ষু পরিবার।"

অনাদি কণ্ঠে আর বিদ্রোহের সুর নাই—চোখ দুইটি তাহার অশ্রুধারায় চিকচিক্ করিয়া উঠিল !

মহানন্দ বাবু কহিলেন—"এখন মাইনে পাও কত ?"

"আজ্ঞে ডবল ডিউটি করে তিরিশ টাকা আর পাঁচ টাকা যুদ্ধভাতা এই পঁয়ত্রিশ ! বাড়িতে অনেকগুলি ছাঁপোষা—এখানে নিজের খরচ—পঁয়ত্রিশ টাকায় এখন শুধু একমণ চাল পাওয়া যায়।"

মহানন্দবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"সত্যিই হে অনাদিচরণ দেশের আজ বড় দুর্দিন। [illegible] কাগজপত্রের যে অবস্থা তাতে নিজের সংসার [illegible] অসাধ্য হয়ে উঠেছে—কী যে করি ? আচ্ছা সে যা[illegible]—এইমাস থেকে তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে [illegible]—এখন থেকে তুমি চল্লিশ টাকা করে পাবে। ওদের [illegible]উকে একথা ঘুণাক্ষরেও জানিয়ো না যেন। তোমা[illegible] আমি পছন্দ করি—যাহোক্ শিক্ষাদীক্ষা তোমার আছে—ভদ্রলোকের ছেলে, অবস্থার বিপর্যয়ে পড়ে তুমি এসেছো। ও বেটারা যত সব মুখ্যু—ছোটলোকের দল—ওদের কখনও খ্যাপাতে আছে ? বুঝতে পারে না—ওদের বিচার-শক্তি কোথায় ? ওরা অন্ধ ! যাও এই নাও একটাকা—কিছু খেয়ে দেয়ে এসো, তারপর কাজ করো গে। তোমার অভাব আমাকে চুপি চুপি এসে বললেই তো পারতে। ওসব ধর্মঘট-মর্মঘট ও সব বুদ্ধিশুদ্ধি ভালো নয়। ওদের [illegible]ও এসব পথ দেখিও না। গরিবের ছেলে খেটে [illegible] খেতে হবে তোমাকে, মনিবকে তুষ্ট করাই তোমার কর্তব্য। কাল আমার কাছ থেকে এসে কিছু টাকা নিয়ে যেও—বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। আর আজ যাবার সময় সের দশেক চাল দরোয়ানের কাছ থেকে নিয়ে যাবে—আমি দিয়ে দেবো। যাও—কেমন খুশি তো ?"

অনাদিচরণ আপ্যায়িত হইল—"আপনার অনেক দয়া বড়বাবু, ভগবান্ আপনাকে তাই এত বড় করেছেন !"

অনাদিচরণ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে মহানন্দবাবু আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলেন—"দেখ এসব যেন ওরা কোন মতে জানতে না পারে। আর ধর্মঘট করার কথা কখনও স্বপ্নেও যেন ভেবো না—তাহলে আমাকে কিন্তু অন্য পথ ধরতে হবে।"

অনাদিচরণ অবনত মস্তকে স্বীকৃতি জানাইল।

অনাদিচরণ শান্ত হইয়াছে।

খাবারের দোকান হইতে খাবার খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে যখন সে ঘনঘন জ্বলন্ত বিড়িতে টান দিতে লাগিল তখন তাহার চিত্তে আর কোন বিদ্রোহের লেলিহান শিখা জ্বলিতেছে না।

স্যাৎসেঁতে ঘরটিতে প্রেসের কালিঝুলির মাঝে তাহার নির্দিষ্ট আসনটিতে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত সে তাহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল। গেলির পর গেলি ম্যাটার কম্পোজিং হইতেছে। মহাজাতির সম্পাদকীয় স্তম্ভ তাহার হাতে পড়িয়াছে। প্রধান প্রবন্ধ হইতেছে ধর্মঘট। আজিকার ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া মহানন্দ বাবুর বক্তৃতা মহাজাতি বক্ষে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতেছে।

বক্তৃতাটি সম্পাদকের লেখনী মারফৎ আরও তীব্র জোরালো এবং প্রাণস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি কথায় যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। কথাগুলির মর্মার্থ অনাদিচরণ এখন যেন বেশি করিয়া উপলব্ধি করিতেছে। বৈদিক যুগের অমৃতস্য পুত্রাঃ আজ তাহারা মুমূর্ষু পৃথিবীর মাঝে অমৃত সুধা বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। জাতির মৃত প্রাণে তাহারা দিবে জীবনী-শক্তি সাম্যবাদের মহামন্ত্রে তাহারা সৃষ্টি করিবে নূতন পৃথিবী। জনগণ তাহারা—নরনারায়ণ তাহারা। জীবন-যুদ্ধে, রাষ্ট্র-যুদ্ধে, সমাজ-যুদ্ধে জয় তাহাদের অবশ্যম্ভাবী। দুঃখ তাহাদের ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য তাহাদের আত্মশুদ্ধি, মৃত্যু তাহাদের নবজীবনের মহা ইংগিত অনাগত কালের তাহারাই হইল ভাবী সূর্য।

অনাদিচরণের রক্তে দোলা লাগিল। সমস্ত বিক্ষোভ তাহার দূরীভূত হইল, মন তাহার অহংকার এবং আত্ম-উৎফুল্লতায় ভরিয়া উঠিল—মহাজাতির মহাসেবক সে!

ঘনঘন বিড়ি টানিতে টানিতে আবেগ উজ্জ্বল কণ্ঠে বার বার সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জনগণ জয়ী হোক!"

রমজান মিঞা, যদুমিস্তির এবং সর্বেশ্বরকে শুনাইয়া অনাদিচরণ গর্বিতভাবে কহিল—"জানো হে আমরাই হচ্ছি জনগণ—নরনারায়ণ—অনাগত কালের আমরাই হচ্ছি ভাবী সূর্য!"

মহাজাতি পত্রিকা অফিসে আর কোন ধর্মঘটের সংবাদ আমরা আজ পর্যন্ত পাই নাই। মহানন্দ বাবুর আদর্শ বাণী জয়যুক্ত হইয়াছে। অন্ধকার স্যাৎসেঁতে ঘরখানিতে অনাদিচরণ, সর্বেশ্বর, যদু মিস্তির, রমজান মিঞা প্রভৃতি কর্মচারিগণ নির্বিবাদে মহাজাতির সেবকরূপে নিশ্চিন্তমনে কাজ করিয়া ভবিষ্যতের মহাজাতি গঠনে সহায়তা করিতেছে।

রূপকথা

(নাটিকা)

সুশীল রায়

১ম দৃশ্য

[একটি জীর্ণ কুটীর। কুটীরের উপযোগী ছোটোখাটো মলিন ধূসর জিনিষ-পত্র। এক কোণে একটি ভাঙা নড়বড়ে চৌকী, নড়িলে-চড়িলে মড়মড় শব্দ করিয়া ওঠে। ছেঁড়া বিছানা। তারি ঠিক বিপরীত দিকে, ঘরের অন্য কোণে একটি লক্ষ্মীর পট, পটের সমুখে পিলসুজ, শঙ্খ, রেকাবী ইত্যাদি, পিলসুজে টিপটিপ করিয়া জ্বলিতেছে বাতি। পাশেই একটি ছোটো জানালা, প্রায় বন্ধ করা আছে। বাহিরে ভীষণ বৃষ্টি ও ঝড়ের শব্দ।]

১ম নাতি। তারপর কি হ'লো দিদিমা!

দিদিমা। তারপর আর কী? (হাসিয়া) গল্প তো শেষ হ'য়ে গেলো!

২য় নাতি। না, তা হবে না! সেই রাজপুত গেলো কোথায়?

১ম নাতনি। সে সওদাগরের নৌকায় বুঝি চ'ড়ে বস্‌লো? হ্যাঁ, দিদিমা? উঃ, কী ভীষণ ছেলে সে, না দিদিমা?

১ম নাতি। ধ্যাৎ, হ্যাঁ দিদিমা, না দিদিমা। চুপ কর্ তুই! উঃ, কী ভয়ানক, না দিদিমা! আজকের মতো এম্‌নি ঝড়, এমনি বৃষ্টি, তারি মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সাগরের ধারে এসে দেখলো—কি দেখলো দিদিমা?

দিদিমা। বললাম যে, সে দেখলো—দূরে একটি সওদাগরের নৌকো, তীরের দিকেই আসচে ক্রমে ক্রমে। সে হাত তুলে ইসারা করলো—

১ম নাৎনি। চেঁচিয়ে ডাক্‌লো না কেন?

(বাজের শব্দ)

দিদিমা। ভয় নেই। আমার কাছে স'রে এসে বস্।

২য় নাতি। সেদিনও তো এম্‌নি বাজ ডাক্‌ছিলো, না? রাজপুত্তের বুঝি ভয় করে নি?

দিদিমা। ভয়? রাজপুত্তের আবার ভয় কিসের? সে এসেছে বীরের মতো সাহস নিয়ে, মগধের রাজকন্যাকে সে জয় করে নিয়ে যাবে—

১ম নাৎনি। কবেকার কথা দিদিমা?

দিদিমা। সে কি আজ? সে হলো গিয়ে, সেই অশোক রাজার আমলে। রাজপুত্তুর তার দেশ ছেড়ে চলে এলো। সঙ্গে আছে তার অনুচর ব'লেইছি তো, সেই অনুচর রাজপুত্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো। কেমন?

১ম নাতি। বেশ তো। তারপর?

দিদিমা। দূরে সওদাগরের নৌকো দেখে হাত তুলে ডাক্‌লো, উত্তর পেলো না। তখন সে অনুচরকে নিয়ে চললো রাজপুরীর পথে, রাজকন্যের খোঁজে—যেতে যেতে তারা দেখলো দূরে ওই রাজপুরীর গম্বুজ—

[হঠাৎ দম্‌কা বাতাসে সশব্দে জানালা খুলিয়া গেলো, বাতি গেলো নিভিয়া, মঞ্চ অন্ধকার]

১ম নাতি। (অন্ধকারের মধ্যেই তার পর?

দিদিমা। আলোটা যে নিভে গেলো! আগে জ্বেলে দিয়ে আয়, জান্‌লা দিয়ে ছাট আসচে বন্ধ কর্, বলছি।

পট পরিবর্ত্তন।

[আলো জ্বালিতেই সমুখে ফুটিয়া উঠিল প্রকাণ্ড রাজপুরী]

[নেপথ্যে—

১ম নাতি। এবার বলো—

দিদিমা। প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। বিরাট তার চত্বর। সেখানে রাজপুত্র আর তার অনুচর ধীরে ধীরে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এসে পৌঁছলো]

(রাজপুত্র ও তার অনুচরের প্রবেশ এবং অভিনয় আরম্ভ।)

শাল্মলী। তারপর পুরন্দর! বহুদেশ অতিক্রম ক'রে এসে তো পৌঁছলাম, এখন উপায় নির্দ্ধারণ করো! তুমি দূতরূপে এর আগে এসে সবি তো জেনে গেছো, সবি তো দেখে গেছো, তবু তোমার এমন হতবুদ্ধি হওয়ার কারণ তো আমি ভেবে পাই না!

পুরন্দর। কুমার, ব্যস্ত হ'লে চলবে কেমন ক'রে বলুন! আমি এসে সব কিছুই জেনে গেছি বটে, তবে রাজকুমারীর সাক্ষাৎ তো আমি পাইনি, আমি শুধুমাত্র সন্ধান ক'রেছি প্রবেশ পথের, সেই পথে আপনাকে নিয়ে এলাম।

শাল্মলী। কারো সাথে তোমার দেখা হয়নি?

পুরন্দর। হ'য়েছে। কিন্তু রাজকুমারীর সাক্ষাৎ পাইনি! আমি তাঁরি সখী এবং মন্ত্রীর একমাত্র কন্যা উজ্জ্বলাকে দেখেছি।

শাল্মলী। তাকে কিছু ব'লেছিলে?

পুরন্দর। ব'লেছিলাম। আমি রাজকুমারীর সন্ধান করায় সে করুণ চোখে তাকালো আমার দিকে, তার অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না। আমার তখন যোগী-বেশ, আমি ব'ললেম—রাজকুমারী বুঝি অসুস্থা? তা তিনি শীগ্‌গিরই সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বেন। যোগীর কথা শুনে উজ্জ্বলা আমার যত্ন ক'রেছিলো, অভ্যর্থনা ক'রেছিলো। ভিতরে গিয়ে সে আমায় ব'ললো—রাজকুমার শাল্মলীর সন্ধান ব'লতে পারো, ঋষি? তিনি কি অবিলম্বে আসবেন? আমি প্রবীণের মতো শিরসঞ্চালন ক'রে ব'ললেম—আসবেন, কোনো চিন্তা নেই!

শাল্মলী। ব'লেছিলে? তারপর?

পুরন্দর। চিন্তিত মন্ত্রীকন্যা নিঃশ্বাস ফেললেন। আচ্ছা কুমার, সেই মহাসমুদ্রের বুকের ওপর দিগ্বিজয়ী রাজার সঙ্গে যখন আপনার দেখা হয়, তখন কি তিনি আপনাকে কন্যা দান করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

শাল্মলী। না পুরন্দর। তাঁর কন্যার সম্বন্ধে কোনো কথাই আমার সঙ্গে হয় নি। আমি যখন সেই নৌকায় ব'সে নীল আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে আছি সহসা আমার চোখের সমুখে ভেসে উঠ্‌লো এক মূর্ত্তি। প্রথম মুহূর্ত্ত আমার মনে হ'লো এ মূর্ত্তি দেবী-প্রতিমা, পরমুহূর্ত্তে সে ভ্রান্তি দূর হ'লো—আমি দেখ্‌লেম প্রতিমা মানবী। তারপর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

পুর। কুমার, চঞ্চল হ'লে চল্‌বেনা। আপনি স্থির হোন্। রাজকুমারীও যখন আপনার প্রতি অনুরক্ত হ'য়েছেন—

শাল্মলী। কিন্তু পুরন্দর, মহাবিঘ্ন আছে। সুফলা নাকি বাগ্‌দত্তা। তার পিতা কোন্ এক রাজপুত্রের কাছে কন্যা সম্প্রদান করবেন ব'লে প্রতিশ্রুত। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন? এ-ক্ষেত্রে সহজে তো এ-কার্য্য হবার কোনো উপায় দেখিনা। হয়ত ব্যর্থ-মনোরথ হ'য়ে আমায় ফিরে যেতে হবে!

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

কে গায়? রাজকুমারী, না উজ্জলা?

পুর। কুমার আপনি একটু আড়ালে যান, আমি সব সন্ধান নি!

(গান গাহিতে গাহিতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল দাসী)

প্রভাতে আজ কী হেরিলাম নয়ন জানে, নয়ন জানে!
লুব্ধ ভ্রমর উন্মনা, হায়, কুসুম-ঘ্রাণে! (কেন কে জানে)
গোপন গুহায় ঝর্ণা ঘুমায়
নামিল ধরায় কাহার টানে! (কেউ না জানে)

(পুরন্দর একটি থামের আড়ালে দাঁড়াইল।)

পুরন্দর। (থামের আড়াল হইতে গান)

আমি তা জানি, আমি তা জানি!
পরাণে আমার ব্যাকুল জোয়ার আনিল চন্দ্রবদনখানি!

দাসী। (চারিদিকে তাকাইয়া কাহাকেও না দেখিয়া) কে? কে আমাকে ব্যঙ্গ করে!

পুরন্দর। (আগা
ব্যঙ্গ? ব্যঙ্গ কারে
ব্যঙ্গ নাহি জানি!
যদি তিক্ত বেদনায় ব
যদি-বা কাঁদিয়া উঠি
যদি গান গাহি সেই
তারে তুমি ব্যঙ্গ কহ

দাসী। (বিস্মিত হইয়া) কে তুমি? এখানে এসে ছড়া কাট্‌ছো, কে তুমি?

পুরন্দর। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) শাপভ্রষ্ট দেব আমি। তুমি?

দাসী। আমি দাসী।

পুরন্দর। আমি দাস তব।

দাসী। তুমি কে আগে বলো! আমি নইলে 'রাণী-মা রাণী মা' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠ্‌বো!

পুর। তুমি দাসী, আমি তব দাস।
তোমারি সন্ধানে আমি বহুদেশ ক'রেছি ভ্রমণ
বহু তীর্থ করি দরশন
আজি মাগি তব পরশন
মোরে তুমি দিবে কি বেদন?

দাসী। আমি অত বেদন-টেদন বুঝি না বাপুঃ! সত্যি কথা বলো আগে, তুমি কে?

পুর। আমি? আমি দাস তব!

দাসী। আমার দাস হ'তে হবে না! আমিই বলে দাসীগিরি ক'রে, গান ক'রে, কোনো-রকমে রোজগার করি এই রাজবাড়ি থেকে! রাজকুমারীর মন জুগিয়ে চলছি আমি—

পুর। আমি তব জুগাইব মন!
কুমারীর পাবো দরশন?

দাসী। (অতিষ্ঠ হইয়া) রাখহ ভড়ং! আমি চলি।

(প্রস্থানোদ্যত)

পুর। (বাধা দিয়া) তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
ব্যঙ্গ করো মোরে তুমি?
জানো না, কী তিক্ত ব্যথা হৃদয়ের কিবা
হাহাকার।

১ম নাতনি ! ঐ, সজনী, আমি ভালোবাসিয়াছি।
বস্লো ? আঁা,ঐ আসিয়াছি
দিদিমা ? বহুদূর হ'তে শুনি নাম।
১ তোমার রূপেতে মুগ্ধ আমি।
চিক্কণ ভুরুর নিচে পাটল নয়ন
হে সুন্দরী, মোরে আজ ক'রেছে উন্মন !
রাজকুমারীর থেকে শতগুণে তুমি-যে সুন্দরী !
নেহারীব ঐরূপ যুগ যুগ ধরি !

দাসী। (তুষ্ট হইয়া, হাসিয়া) সত্যি ?

পুর। মিথ্যা নাহি কহে কভু মহাবীর।

দাসী। মহাবীর তুমি ?

পুর। (সহাস্যে) নিজগুণ নিজমুখে কত বা কহিব !
বিশ্বেরে বাঁধিতে পারি এই বজ্র হাতে।
এই বক্ষে বাঁধা পড়ে খরস্রোতা নদী !
(বিক্রম প্রদর্শন)

দাসী। (স্তম্ভিতা, মুগ্ধা। চারিদিকে দৃষ্টিপাত।)

পুর। গাহ গান। আমি শুনি।

দাসী। গান ? কিবা গান গাব আমি।
প্রাণে মোর গান আর নাই ! (নিশ্বাস পাত)

পুর। (মুখ লুকাইয়া হাসিল।) তবু। তবু গাহ !

দাসী। এদিকে এসো। কেউ যদি এসে পড়ে !

পুর। চলো যাই !

(সেই বিরাট প্রাঙ্গণের একটি নিভৃত অংশে বসিল।)

দাসী। (গান)

তুমি অপরূপ, সুন্দর তুমি, তুমি হে হৃদয় দেবতা !
দূর হ'তে তুমি কেমনে জানিলে মোর হৃদয়ের এ-ব্যথা !
উপবাসী তরু কাল-বৈশাখে
প্রেমবারি দিয়া বাঁচাইলে তা'কে
জীবনে কখনো ভুলিব না, প্রিয়, তোমার উদার মমতা !

পুর। (হাসিল) তুমি গাও। আমি একটু দূর থেকে শুনি, কেমন ? কাছে থেকে যত মধুর দূরে থেকে আরো যে মধুর। তুমি গাও !

দাসী আচ্ছা।

(গান)

বহু দিবসের বহু আরাধনা শুনিলে কি এত দিনে ?
দূর দেশ হ'তে বিদেশিনী কাছে এলে আজ পথ চিনে !
যাহা কিছু আছে লহ তা হৃদয়ে
দু'জনের যাহা যাক্ এক হ'য়ে
তোমার হৃদয়ে আমার হৃদয়ে থাকুক্ কেবল একতা !

[পুরন্দর প্রাঙ্গণের অন্য অংশে আসিলে শাল্মলী তাহার নিকট আসিল। দু'জনে চুপি চুপি কি যেন কথা কহিল। শাল্মলী অঙ্গুরীয় পুরন্দরকে দিল]।

পুর। (পাশে বসিয়া) ভালো। আচ্ছা দাসী, আমার একটা কথার জবাব দেবে ?

দাসী। কি বলো !

পুর। তোমাদের রাজকুমারী কি রাতদিন কাঁদে ?

দাসী। হ্যাঁ !

পুর। কেন, তা বলতে পারো ?

দাসী। রাজকুমারী ভালো বেসেছে মিথিলার রাজ-কুমার শাল্মলীকে, কিন্তু এখানে তার বিয়ে হ'তে পারে না, রাজার অমত। কারণ, রাজার সঙ্গে শাল্মলীর পিতার দ্বন্দ্ব।

পুর। ভালোবাস্লে আবার বিয়ে হয় না, কী যে বলো !

দাসী। (অপাঙ্গে পুরন্দরের দিকে চাহিয়া) হয় ?

পুর। (হাসিয়া) নিশ্চয় হয়।

দাসী। (লজ্জিতা)।

পুর। আমার ইচ্ছে করে রাজকুমারীকে একবার দেখি !

দাসী। দেখবে ? আমি দেখাতে পারি !

পুর। কখন ?

দাসী। আজ রাত্রে। খুব চুপ ক'রে কিন্তু, কেউ জান্তে পেলে আমার গর্দ্দান যাবে।

পুর। কেউ জান্বে না। আচ্ছা বেশ। এই না, তুমি আমায় ভালোবাসো !

দাসী। কিন্তু তুমি কে তা আমায় ব'ললে না !

পুর। তোমার দাস ! আমার নাম ? পরে বলবো। আর দেখো, এই আঙটি তুমি যদি রাজকুমারীকে চুপ ক'রে দিতে পারো তবে কি হবে জানো ?

দাসী। কি হ'বে ?

পুর। তোমার মাইনে বেড়ে যাবে। দিতে পারবে ?

দাসী। নিশ্চয় পারবো।

(অঙ্গুরীয় প্রদান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর

[রাজকুমারী সুফলা পালঙ্কে উপবিষ্টা। চামরী চামর ঢুলাইতেছে। মন্ত্রীকন্যা উজ্জলা নত মুখে বসিয়া আছে।]

সুফলা। (দীর্ঘনিশ্বাস) কত দিবসের কত আরাধনা, সব কি এমনি ক'রেই বিফল হবে, উজ্জলা ? তুই বললি, এক ঋষি এসে বলে গেছে—সে আসবে ! কিন্তু কই ? সে তো এলো না ! মিথিলার রাজকুমার শাল্মলী ! চিরদিন সে কি আমার থেকে এমনি সুদূরে থেকে আমায় এমনি ক'রেই উন্মনা ক'রে রাখবে ?

উজ্জলা। সে কি কথা, প্রিয়সখী ! সে আসবে, সে আসবে ! তুমি ধৈর্য্য ধর !

সু। ধৈর্য্য ? (নিশ্বাসপাত) আজ এক বৎসর হ'লো। একটি সুদীর্ঘ বৎসর আমি তো ধৈর্য্য ধরেই আছি। আর তো ধৈর্য্য আমার নেই ! কি কুক্ষণে জানিনা, আমি সাগর যাত্রা করলুম, কি কুক্ষণে জানি না তার সাথে আমার দেখা হ'লো সেই সমুদ্রের বুকের ওপর ময়ূরপঙ্খী নৌকায় ! আকাশ ঘন নীল, জলীয় স্নিগ্ধ বাতাস আর তারি মাঝে হঠাৎ সাগর-দেবতার মতো সে আবির্ভূত হ'লো আমার সম্মুখে। আমার ইহকাল, আমার পরকাল সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে তস্করের মত সে চ'লে গেল। বলে গেল—আসবো। এল না।

উ। আসবে প্রিয়সখী, সে আসবে। আমার মন বলছে—সে অবশ্যই আসবে।

সু। আর কবে আসবে উজ্জলা ? তুমি সবি জানো, আর মাথার ওপর বলীর খড়্গ, আমার যে পাত্র নির্ব্বাচন ক'রে ফেলেছেন আমার পিতা ! এমন অভিশপ্ত আমি, আমি আমার ন্যায্য দাবী থেকেও বঞ্চিত হ'য়েছি। রাজকুমারী আমি, কিন্তু স্বয়ম্বরা হবার আমার যে অধিকার রাজা আমায় তা দিলেন না। যদি সে সৌভাগ্যলাভ ঘটতো তবে সভায় শাল্মলী অবশ্যই উপস্থিত থাকতো, আমি তাকে বরমাল্য অর্পণ ক'রে এদেশ ছাড়া হ'য়ে চ'লে যেতে পারতেম। শাল্মলীকে যে মনে মনে বরণ করেছি সে কথা পিতার অজ্ঞাত নয় ! এবং পাছে ছদ্মবেশী শাল্মলী সেই সভায় উপস্থিত থেকে বরমাল্য লাভ করে এই আশঙ্কায় আমাকে স্বয়ম্বরা হ'তে দিলেন না।

উ। সবি জানি। তোমার দুর্ভাগ্য !

সু। হুঁ। দুর্ভাগ্যই বটে ! এই অঙ্গুরীয় (প্রদর্শন) সে আমায় দান করেছে, এই স্মারক-অঙ্গুরীয়। আজো আমি এটি ধারণ ক'রে আছি। আচ্ছা, উজ্জলা, তুই বলতো সে কি আমায় ভুলে গেছে ? আমি এই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তাকে আমার অঙ্গুরীয়টিই শুধু দিই নি, আমার হৃদয়ও যে দান করেছি ! সে কি সে দাতার মর্য্যাদা রাখতে ভুলে গেছে ?

উ। সে কি কথা প্রিয়সখী ! সে ভুলে যায় নি। সে আসবে। আমার মন বলছে—সে আসবে।

সু। কিন্তু আমার মন যে সায় দিতে পারছে না ! সমস্ত সময় মনের মধ্যে দারুণ একটি আতঙ্ক। কেবলি মনে হচ্ছে—এই কক্ষ, এই পালঙ্ক, এই তুই, এই আমি হয়ত সব সহসা কোথায় মিলিয়ে যাবো, যদি আমি তার সাক্ষাৎ না পাই ! পিতার প্রতিশ্রুতির জন্যে সন্তানের এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত। একবার তুই ভেবে দেখ উজ্জলা !

উ। ভেবে আমি দেখেছি রাজকুমারী !

সু। তোর স্বয়ম্বর তো আগামী কাল, না উজ্জলা ?

উ। হ্যাঁ।

সু। ভাল। তোরা সব সুখী হ। তোদের সুখে যেন সুখী হ'তে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর। উজ্জলা একটা গান কর্, আমার মন অতিরিক্ত খারাপ, আমায় একটা গান গেয়ে শোনা।

উ। (গান)

ফিরে যদি নাহি চাও কেমনে বাঁচিব হায়,
তোমার চোখের দিঠি আমার চোখের ভায় !
যদি না চাহিলে ফিরে
ফাঁকি দিলে আঁখিটিরে
আঁধার আমারে ঘিরে কাঁদে মনোবেদনায় !

তোমার চোখের মাঝে
মোর, নয়ন লুকানো আছে
বারেক চাহিয়া ফিরে এ-আঁধার কর সায়।

সু। এ-আঁধার করো সায়। বাঃ, চমৎকার। এ-আঁধার করো সায়! কিন্তু এ-আঁধার যে কোনো উপায়ে কোনোদিন দূরীভূত হবে, এ-কথা তো আমার মনে হয় না উজ্জ্বলা!

উ। অত কাতর হ'লে চলবে না রাজকুমারী। জানি তুমি বাগদত্তা, তোমার পিতা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তোমাকে দান করবেন বিলোপের রাজকুমারের হাতে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিই কি বড়ো, হৃদয়ের আবেদন কি এতই তুচ্ছ, তার দাবীতে কান দেওয়া কি ভগবা· নিষেধ ক'রে রেখেছেন? এ আমি বিশ্বাস করি না, প্রি·সখী। তুমি স্থির হও, নিজের মনে দৃঢ়-সঙ্কল্প থাক্ দেখো প্রাণের আগ্রহ অবশ্যই জয় লাভ করবে।

সু। করবে?

উ। করবে। আমি বারবার বলছি, তুমি যা চাও, তাই পাবে। তোমার পথে কোনো বিঘ্ন আসবে না। যদি কোনো বাধা এসে পড়ে, সে বাধা লঙ্ঘন করার জন্যে নিযুক্ত করো এই উজ্জ্বলাকে। সে তার সমস্তটুকু আন্তরিকতা দিয়ে তোমার সাহায্য করতে কৃপণতা করবে না।

সু। তুই আমার সাহায্য করবি? সত্যি করবি? আমার যে ভয়ানক আনন্দ হ'চ্ছে উজ্জ্বলা। আমি যে মনে অতিরিক্ত জোর পাচ্ছি! আশীর্ব্বাদ করি, তুই সুখী হ'। চিরদিন তুই সুখে থাক্। আমায় তুই তাহলে, সাহায্য করবি?

উ। নিশ্চয়। তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধুতা তাতে তোমাকে সুখে রাখাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য।

সু। বন্ধুত্বের আবার কর্ত্তব্য কি, উজ্জ্বলা?

উ। কর্ত্তব্য নয়? সব কাজেরই স্বতন্ত্র কর্ত্তব্য আছে। আমাকে তোমার গান গাইতে বলাও যেমন কর্ত্তব্য, আমার গান গাওয়াও কর্ত্তব্য। পৃথিবী ঘুরছে কর্ত্তব্যের খাতিরে, আমরা বেঁচে আছি—কর্ত্তব্য করছি, ম'রে যাবো —কর্ত্তব্য করবো।

সু। (হাসিয়া) তুই মস্ত একটা দার্শনিক দেখছি!

উ। দার্শনিক তো? যাক্ বাঁচা গেছে। এবার তুমি স্থির হ'য়েছ তো। আগে আমাকে সেই সংবাদটি দাও। তা না হ'লে আমি এখান থেকে উঠ্ছি না! উঃ, কী ভীষণ মেয়ে-যে তুমি! কেবল কাঁদা, কেবল কাঁদা! আর কান্নাকাটি ক'রো না, আমি তোমার কান্নাকাটির পথ বন্ধ করছি!

সু। কর তাই, তাই কর। তাহ'লে তো আমি বেঁচে যাই!

উ। সঙ্গে সঙ্গে যে আমরাও বেঁচে যাই, প্রিয়সখী! আমাদের মনেই কি কম দুঃখ? রাজকুমারীর চোখে জল দেখলে যে সমস্ত রাজ্যের চোখেও জল নেমে আসে এতো তুমি জানো!

সু। আচ্ছা, উজ্জ্বলা এত মনের জোর তুই কোথা থেকে পেলি? তুই বলছিস্ শাল্মলী আসবে!

উ। ঋষির কথা কি কখনো মিথ্যা হয়? সে ব'লেছে—শাল্মলী আসবে। এ তো আমি বিশ্বাস না ক'রে পারি না! এ যে ঋষির মুখের কথা।

সু। ঋষির মুখের কথা! তা বটে! (নিশ্বাসপাত) খুব আনন্দ লাগছে, আর একটা গান করবি ভাই?

উ। শুধু গান? (হাসিয়া) সঙ্গে নাচ হ'লে তো—

সু। বেশ। সেই ভালো। বাঁদী—
নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দাও!

[বাঁদীর প্রবেশ ও প্র[illegible]]

উ। (হো হো হাসিয়া) সত্যি [illegible]মার খুব আনন্দ হ'য়েছে দেখ্ছি। সত্যি-সত্যিই নাচ?

সু। তা নয় তো কি? এবার তুই গা—

উ। (গান)

মনের গহনে মোর এলো রে আনন্দ
ঘুচিল মনের গ্লানি যত দ্বিধা দ্বন্দ্ব!
কিশালয় কাঁপে শাখে
পুলকে জাগায়ে রাখে—
আলোক লাগিল ঘোর দু'নয়নে অন্ধ!

[নর্ত্তকীদের নাচিতে নাচিতে প্রবেশ ও নৃত্য প্রদর্শন]

সু। নাচ দেখলি তো?

উ। দেখ্লুম। আবার দেখবো, যেদিন তোমার

হাতে মিলনের রাখী-বন্ধন পড়বে। সেদিনের আশাতেই দিন গুণছি এখন। মহাবীর শাল্মলীর হাতে হাত রেখে শপথ ক'রো—তোমাদের এই প্রিয়সখী উজ্জ্বলাকে তোমাদের কোনো আনন্দ অবসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে না!

সু। (সহাস্যে) পাগল!

—৩য় দৃশ্য—

[রাজপ্রাসাদ-প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের দূরতর অংশে মায়া দাসী কর্ম্মব্যস্ত, শশব্যস্তে পুরন্দরের প্রবেশ।]

পুর। এই যে, এই যে তুমি! তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমি হয়রাণ!

মায়া। (অভিমানভরে) আর আমি বুঝি খুঁজিনি কাউকে? আমার বুঝি আর খোঁজ করার ইচ্ছে হয় নি, না? কতক্ষণ ঐ জানালার ধারে, ঐ বাগানের পথে, পদ্মদীঘির শান-বাঁধানো ঘাটে কত সময় নষ্ট করলেম, দেখা পেলাম না। ভাবলেম, বুঝি ভুলে গেছো!

পুর। (চমকিত) ভুলে গেছি? বল কি সুন্দরী?

চাঁদে কভু ভোলে কি চকোর?
কুসুমেরে ভোলে না ভ্রমর!
আমি পুরন্দর, আমি কভু ভুলিব তোমায়?

যাক্ সে কথা! কেমন আছো? সত্যি, আমার কথা ভেবে তোমার চোখের কোণে রীতিমত কালি প'ড়ছে দেখ্‌ছি! ছি! ছি! অত কি ভাবতে আছে? অত ভেবোনা, ক্যা? আমার যখন দেখা না পাবে জেনে নেবে, আমি কোথাও না কোথাও ব'সে তোমারি কথা ভাবছি! সত্যি, তোমার কথা ভাবতে আমার এতো ভালো লাগে কেন ব'লতে পারো?

মায়া। (সলজ্জ) জানি না। যাঃ ও!

পুরন্দর। চল্‌লুম! (প্রস্থানোদ্যত)

মায়া। (হস্ত ধারণ) যেতে বললুম নাকি? তোমার নাম বুঝি পুরন্দর?

পুর। (চমকিত) কে বললে?

মায়া। এই যে তুমি ব'ললে—'আমি পুরন্দর।'

পুর। ব'লেছি বুঝি? তবে তাই' আর তোমার নাম?

মায়া। মায়া।

পুর। চমৎকার। আমরা দু'জন যখন এক হবো। হ'য়ে কি করবো বলো তো?

মায়া। (লজ্জিতা) জানি না। যাঃ ও!

পুর। (পুরন্দর প্রস্থানের ভঙ্গী করিয়া হাসিল) আমরা যখন এক সঙ্গে হবো, তখন চ'লে যাবো দু'জনে কোথায় জানো? সেই অনেক দূর। সেখানে বিরাট এক নগর তৈরি করবো, তার নাম দেবো কি জানো? (মায়াকে ও নিজেকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া) মায়াপুর। কেমন হবে, ভালো হবে না নামটা? সে নগরে কাউকে থাক্‌তে দেবো না, থাক্‌বো কেবল তুমি আর আমি—আর দাসদাসী থাক্‌বে যদিও!

মায়া। মায়াপুর না মায়াপুরী?

পুর। চমৎকার! মায়াপুরী!

(গান)

আমাদের মায়াপুরী, আমাদের মায়াপুরী
সেথা, আমরা দু'জন সকাল বিকাল বেড়াই ঘুরি।
সেথা দিনেতে আস্‌বে চাঁদ, রাতে আস্‌বে সুরুয
সেথা আকাশে তারার ফসল চাইবো শুধু
আমরা অবুঝ।
আর নিশিদিন হিয়ায় হিয়ায় বাজাব প্রেম-বাঁশুরী
আমাদের মায়াপুরী—

মায়া। তুমি গান গাইতে জানো দেখছি! আমিও গাইবো?

পুর। গাইবে? বেশ গাও, এখ শুনি। নাও ধরো!

(গান)

মায়াপুরীর পথের দু'ধার সোনাতে রইবে বাঁধা,
সেখানে কেবল হাসি, সেখানে নেইকো কাঁদা!

(মিলিত সঙ্গীত)

বিহানের প্রথম পাখী গাবে গান মনের সুখে
সাঁঝেতে হীরার পিদিম জ্বলিবে তোমার বুকে
জ্বলিবে আমার বুকে
জ্বলিবে দোঁহার বুকে!
আমাদের মায়াপুরী—
সেথা, পলাশের ডালে ডালে ফুটিবে গোলাপ-কুঁড়ি!

মায়া। (নিশ্বাসের শেষে) সে-স্বপ্ন কতদূর ?

পুর। স্বপ্ন। একে তুমি স্বপ্ন বলো ? এই যে আজ তোমাদের মন্ত্রীকন্যার স্বয়ম্বর, সেটা কি স্বপ্ন ? এই যে আমি-তুমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, এটা স্বপ্ন ?

মায়া। আমার কিন্তু স্বপ্ন ব'লে মনে হ'চ্ছে! আমি সত্যি বিশ্বাস করতে পারছি না একে সত্য ব'লে! এত বড় সৌভাগ্য কি আমার হবে ? তুমি মহাবীর, আমি দাসী!

পুর। আমি মহাবীর তবু আমি যে তোমার দাস! এ-কথা তো তোমায় আমি ব'লেছি!

মায়া! হ্যাঁ, ব'লেছ ?

পুর। চিন্তা করো না। ভালো কথা, তুমি রাজকুমারীকে আঙটিটা দিয়েছ ? কি বললো আঙটি পেয়ে ?

মায়া। সে এক কাণ্ড! কি যে মন্তর দেওয়া ছিলো জানি না, রাজকুমারী প্রায় মূর্চ্ছা—

পুর। মূর্চ্ছা ? সে কি কথা ? আমি তো কোনো মন্তর দিয়ে দিয়নি! তারপর ?

মায়া। তারপর আমার বরাতে তিরস্কার। রাণী তিরস্কার করলে, রাজা করলে, যে যেখানে ছিলো সব্বাই! আমি সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলাম!

পুর। রাজকুমারীকে তো আমায় দেখালে না ? আমার তাকে বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করছে! সেদিন রাত্রে দেখাবে ব'ললে—তারপর তোমার কোনো সন্ধানই পেলাম না!

মায়া। আমিও তো তোমার কোনো সন্ধান পাইনি! দেখ্‌তে চাও ? আচ্ছা বেশ, আমি তোমাকে দেখাবো! আজই রাত্রে, তুমি বাগানের পশ্চিম দুয়ারে রাত্র দ্বিপ্রহরের সময় আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রো, আমি তখন গিয়ে তোমাকে পথের সন্ধান ব'লে আসবো। তারপর তুমি নিজে যাবে! ঘুমন্ত রাজকন্যাকে তুমি দেখ্‌তে পাবে!

পুর। ঘুমন্ত রাজকন্যা ? কেন, যদি জাগ্রত রাজকন্যাকে দেখ্‌তে চাই ?

মায়া। ওরে বাবা! না, সে আমি পারবো না। আমার গর্দ্দান যাবে! অতবড় দুঃসাহসের মধ্যে আমায় তুমি যেতো বলো ?

পুর। কখনই নয়। বেশ ঘুমন্ত রাজকন্যাকেই দেখবো।

মায়া। আমি তোমাকে প্রবেশ-পথ ব'লে দোবো। তুমি সরাসরি রাজকন্যার শয়নকক্ষে চলে যেতে পারবে ?

পুর। সেখানে কেউ থাকবে না ?

মায়া। পরিচারিকারা থাকবে। তবে, তারা তখন ঘুমিয়ে পড়বে অকাতরে। তোমার কোনো ভয় নেই!

পুর। আচ্ছা, তবে সেই কথাই রইলো।

৪র্থ দৃশ্য

[রাজঅন্তঃপুর। পূর্ব্বোক্ত কক্ষে চিন্তিতা সুফলা আসীন। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছে। পরিচারিকারা কর্ম্মব্যস্ত। এমন সময় উজ্জ্বলার দ্রুত প্রবেশ।]

সু। কে ? উজ্জ্বলা ? আবার তুই ? কি মনে ক'রে ভাই ?

উ। কি শুনলুম প্রিয়সখী ? তোমায় নাকি কে একটা অঙ্গুরীয় পাঠিয়েছে। অঙ্গুরীয় স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তুমি নাকি মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়ো। কি ব্যাপার কি রাজকুমারী ?

সু। ব্যাপার ? বিশেষ কিছু নয় উজ্জ্বলা। এই সেই অঙ্গুরীয়! আমার হৃত-সম্পদ আমি ফিরে পেয়েছি।

উ। তাইত! এতো তোমারই অঙ্গুরীয়! কে দিয়ে গেলো ? মহাবীর শাল্মলী কি তবে ফিরে এসেচে ? অঙ্গুরীয় কে দিলে তোমায় ?

সু। মায়া।

উ। মায়া পেলে কোথায় ?

সু। সে বলছে : সে রাজপ্রাঙ্গণে কুড়ি[illegible] পেয়েছে!

উ। শাল্মলী কি তবে তার [illegible]ত্যাবর্ত্তন-বার্ত্তা তোমাকে জানাবার জন্যে—

সু। তাই, উজ্জ্বলা, আমিও তাই মনে করছি।

উ। (সগর্ব্বে) দেখ, আমি ব'লেছিলাম না—সে আসবে, সে আসবে। এবার আমায় পুরস্কার দাও!

সু। পুরস্কার ? কি পুরস্কার দেব তোকে ? তোর যোগ্য-ভূষণ আমার কই!

উ। আছে!

সু। কী সে।

উ। থাক্‌। পরে বলবো!

সু। বলিস্‌।

[মায়ার প্রবেশ]

সু। কি খবর মায়া?

মায়া। রাণীমা ডাকছেন।

সু। তা যাচ্ছি। [মায়ার প্রস্থান]

উজ্জ্বলা, আর দেরি নয় ভাই, তোর স্বয়ম্বরের সময় হ'য়ে এলো। তুই যা! ভাল দেখে বর পছন্দ করিস্ ভাই! যেন তোরটি হয় সবার সেরা, আমাদের ঠকিয়ে দিতে পারবি?

উ। কি কথা-যে বলো তুমি!

সু। ভালো কথাই বলি! আচ্ছা ভাই, মা ডাকছে; আমি চললেম। তুই তো আর দেখাই করবি না, কেমন?

উ। কেন করবো না?

৫ম দৃশ্য

[ধূ ধূ মাঠ। একটি গাছের নীচে বসিয়া রাখাল বাঁশী বাজাইতেছে। আর একটি রাখালবালক তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বাঁশী কিছুক্ষণ বাজিবার পর—]

১ম রাখাল। রাজ্যে আজ লক্ষ রাজকুমারের, তারো বেশি মন্ত্রীকুমারের আবির্ভাব হ'য়েছে ভাই!

২য়। স্বয়ম্বর সভায় সব্বাই বুঝি যোগ দেবে?

১ম। হুঁ!

২য়। কোন্‌দেশ থেকে নাকি শাল্মলী ব'লে এক মহাপুরুষ এসেচে, সব্বাই মিলে তাকে খুঁজছে!

১ম। কেন?

২য়। আমাদের রাজকুমারী চায় তাকে বিয়ে করতে। তাকে বিয়ে না করতে পেলে সে নাকি থাকবে চিরজীবন আইবুড়ো; কিন্তু মজাটা একবার দেখো—রাজ্যের আনাচে-কানাচে তার খোঁজ ক'রেও কেউ তার পাত্তা পাচ্ছে না।

১ম। সে কি কথা? সে এলোই-বা কখন?

২য়। কে জানে? তবে সে নাকি এসেচে। তার হাতের একটি আংটি পাওয়া গেছে ব'লে রটনা। কিন্তু কোথায় যে সে গেলো, তার কোনো—

১ম। আরে মুস্কিল! সে হয়ত' পালিয়ে গেছে!

২য়। পালিয়ে গেছে কি? পালিয়েই যদি যাবে, তবে আবার এলো কেন? সেও যে চায় রাজকুমারীকে বিয়ে করতে। সেই মতলবেই তো এসেছিলো!

১ম। অত চুরি ক'রে আসার মানে? রাজা-রাজড়ার ব্যাপারই আলাদা!

২য়। কেন, জানিস্ না তুই? আমাদের রাজা অনেক দিন আগে বিলোপের মহারাজার কাছে যে প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন, তাঁর কন্যাকে সেই মহারাজার পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। সে প্রতিজ্ঞা তো তিনি ভঙ্গ করতে পারেন না। এইখানেই তো, শাল্মলীতে আর রাজকুমারীতে মিলনের বাধা।

১ম। তা যদি বলিস্, সে একটা কথা বটে। কিন্তু শাল্মলীর খোঁজ করা হ'চ্ছে কেন?

২য়। রাজার আদেশ। কারণ জানিনা, ভাই! হয়ত নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবেন। নইলে, এমনো হ'তে পারে—গর্দ্দান্!

১ম। তা হ'তে পারে না! কী এমন অপরাধ যে গর্দ্দান নেবে?

২য়! যাই হোক্, কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় লুকিয়ে আছে, কী আশ্চর্য্য বলো তো?

১ম। কি ক'রে বলি ভাই! এত খোঁজ-খবর তবু পাত্তা নেই?

[দুই-তিনজন প্রহরীর দ্রুত প্রবেশ।]

১ম প্রহরী। এদিকে কোথায় পাবো? এ যে ধূ-ধূ মাঠ!

২য় প্রহরী। ঐ ওদের জিজ্ঞাসা করা যাক্!

[রাখালদের নিকটে গমন।]

১ম প্রহরী। এদিক দিয়ে কোন লোক যেতে দেখেছ? কোনো রাজপুত্র, কোনো ভিখারী, কোনো সওদাগর?

২য় রাখাল। না বাপুঃ, এখান দিয়ে সারাদিনের মধ্যে কেউ যায়নি!

২য় প্রহরী। বলা যায় না, ছদ্মবেশ প'রে পালিয়ে গেছে হয়ত। আচ্ছা ওদিকে চলো!

[প্রহরীদের প্রস্থান!]

২য় রাখাল। দেখ্‌লি মজা?

১ম রাখাল। আর কিছু নয়। সে যায়ও নি কোথাও। ওই যে স্বয়ম্বর সভার লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রের ভিড় তার মধ্যেই লুকিয়ে প'ড়েছে।

২য় রাখাল। ঠিক! তাই হয়ত হবে! তোর বেশ বুদ্ধি আছে তো?

১ম। বুদ্ধিই যদি না থাকবে, তবে সাধেই কি রাখাল হ'য়েছি! চল যাই!

[বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে প্রস্থান]

(আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে)

দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ

(ভ্রমণ)

ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

আমার দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রমণকথা অনেক লেক্‌চারে এবং অনেক সাপ্তাহিক পত্রেই প্রকাশ করেছি। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তস্থল জ্যাহোন্সবার্গ এবং নাতাল প্রদেশের কথা এখানে বলতে চেষ্টা করব। কথা প্রসংগে আমি বলেছি, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় শ্রমিকগণ ইউরোপীয় মজুরদের সংগে থেকে একদম তাদের প্রকৃতিই পেয়ে গিয়েছিল। আমি একদিন একটি জুতার কারখানায় গিয়েছিলাম। টিফিনের সময় যখন ভারতীয় মজুরগণ অন্যান্য ইউরোপীয় মজুরদের সংগে কারখানা থেকে বের হয়ে এল তখন লক্ষ্য করে দেখলাম, এরা হাউমাউ করে চীৎকার করছে না, অথবা কোন বাজে কথা বলে একে অন্যের গায়ে ঢলে পড়ছে না। নিকটস্থ রেঁস্তোরায় গিয়ে কাগজে বাঁধা সেণ্ডউইচ এবং এক পেয়ালা কাফে হাতে করে নিয়ে আপন মনে বসে খাচ্ছিল। সেণ্ডউইচ-এ অনেক সময়ই গোমাংস থাকে, মাঝে মাঝে শূকর মাংসও থাকে। যারা মাংস খায় না তারা দুটুকরা রুটি এবং কাফের পেয়ালা, মাংসভোজী হিন্দুদের কাছে বসেই খাচ্ছিল। কেউ সেজন্য একটা কথাও বলছিল না। আমারা সর্বপ্রথমই দেখি কে কি খেয়েছে এবং তাই নিয়ে আলোচন করি। আলোচনা হ'তে তর্ক সুরু হয়, তারপর সুরু হয় কলহ। অবশ্য আমাদের কলহ কখনও রক্তারক্তিতে পরিণত হয় না, কারণ রক্ত দেখ্‌লেই আমরা ভয় পেয়ে যাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার মজুররা নানারকমেই ইউরোপীয় মেজাজ পেয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মজুর কখনও অত্যাচার সহ্য করে না, আমেরিকার ধরণে তার প্রতিকার করে। আমেরিকায় যেমন বিনা লাইসেন্‌সে পিস্তল কিনা যায় দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তেমনি ইউরোপীয়-গণ বিনা লাইসেন্সেই পিস্তল কিনতে পারে। ভারতীয় মজুরগণ পিস্তল কিনতে অধিকারী নয় বলেই তারা গোপনে পিস্তল ক্রয় করে ইউরোপীয়দের চেয়েও বেশি। যেখানে লোক প্রাণটাকে তৃণজ্ঞান করে সেখানে গোয়েন্দা মহাশয়গণ মাথা তুলে কথা বলতে সক্ষম হন না। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মজুর সরকারী কাজে যোগ দেওয়া মোটেই পছন্দ করে না, আর যারা গোপনে সরকারী কাজ করেন তাদের বুকের পাট্টা এত শক্ত নয় যে ভারতীয় মজুরের গৃহে গিয়ে ভারতীয় ধরণে হামকি তুমকি করবেন। "আমি পুলিশ" একথা বলার পূর্বেই পুলিশের স্বর্গবাসী হওয়ার ভয়ই সেখানে বেশি বলে শুনেছি। সেজন্যই দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মজুররা একদিক দিয়ে ইউরোপীয় রাইট পেয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধি যখন সত্যাগ্রহ করেছিলেন তখন তিনি ভাল করেই বুঝেছিলেন, তাঁর মুভমেণ্ট সফল হয়েছিল উন্নত মজুরদের অনুগ্রহেই।

যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সুরু হ'ল তখন ভারতীয় মজুর ধীরে আস্তে কাজ পরিত্যাগ করে আপন ঘরে এসে নিশ্চিন্ত মনে বসে রইল না। তারা আপন ঘর রক্ষা করারও বন্দোবস্ত করতে লাগল। [illegible]ন ঘর রক্ষা করতে গিয়ে ছেলে বুড়া সবাই মরবার জন্য প্রস্তুত হ'ল এসংবাদটা বুয়র সরকার পেয়েছিলেন। এখানে আমি বুয়র সরকারকে ধন্যবাদ দিবই, কারণ বুয়র সরকার ইচ্ছা করলেই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সৈন্য ডেকে আনতে পারতেন এবং ভারতীয় গ্রামগুলি এক এক করে উড়িয়ে দিতে সক্ষম হতেন। এই ধ্বংসের কাজে বুয়র সরকারকে কেউ বাঁধা দিত না অথবা কোনরূপ প্রতিবাদও করত না। কিন্তু বুয়র সরকারের তখনকার দিনের কর্ণধার জেনারেল স্মাট দেখলেন ভারতবাসী দু'দলে বিভক্ত—ব্যবসায়ী এবং মজুর। ব্যবসায়ীরা তলে তলে মজুরদের উশ্‌কিয়ে দিচ্ছে আর প্রেম্‌সে ব্যবসা করছে। জেনারেল স্মাট দেখলেন,

সব নিরপরাধী মজুরদের হত্যা করে লাভ নাই। তাই তিনি মহাত্মা গান্ধির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধি বোধ হয় মনে করেছিলেন—ভারতের মজুরগণও উন্নত, তাই এখানেও তিনি কৃতকার্য্য হবেন। কিন্তু ভারতীয় মজুর এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় মজুরে আকাশ পাতাল প্রভেদ রয়েছে। আজ পর্যন্ত কেউ একথা প্রকাশ করে নি যে, বুয়র সরকার মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহকে সত্যাগ্রহ বলে স্বীকার করে না। বুয়রগণ মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহকে কুলি আপরাইজিং বলত। আপরাইজিং আর সত্যাগ্রহ এককথা নয়।

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন এবং ইণ্ডিয়ান ভিউজ

মহাত্মা গান্ধি ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন বলে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বের করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধি দেশে আসার পর শ্রীযুক্ত মণিলাল গান্ধি দক্ষতার সহিত তাহা পরিচালনা করে আসছিলেন। মণিলাল ভেবেছিলেন তাঁর পিতার মতই তিনি মজুর এবং ধনীদের মাঝখানে থাকবেন এবং উভয় পক্ষেরই মতবাদ তাঁর সাপ্তাহিকে প্রকাশ করবেন কিন্তু মণিলাল হয়তঃ ভাবতেও পারেন নি তাঁর পিতার অবর্তমানে ভারতীয় ধনীদের মাঝে এমনই একটা পরিবর্তন আসবে যার ধাক্কা তিনি সামলাতে পারবেন না এবং ধনী ও মজুর পৃথক হয়ে পড়বে। গত মহাযুদ্ধের পর যখন পৃথিবীব্যাপী দরিদ্রতা এসে দেখা দিল তখন ভারতীয় মজুরগণ ও কর্মচ্যুত হয়। কর্মচ্যুত হয়ে তারা ভারতীয় ধনীদের দ্বারস্থ হয় এবং তথাকথিত সত্যাগ্রহের সুফলের কথা ধনীদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনীরা কিন্তু তাদের সেই মহৎ কাজের কথা স্বীকার করতে রাজি হলেন না, উপরন্তু ডেস্‌টিটিউট সাজিয়ে তাদের ভারতে পাঠাবারই বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। মণিলাল চোখের সামনে এই অন্যায় দেখে তা নীরবে সহ্য করতে পারেন নি। তিনি তার প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে সেই বেকারদের পক্ষে প্রবন্ধ বের হ'তে লাগল। তার প্রবন্ধ পাঠ করে অনেক ধনীই তাঁকে পথভ্রষ্ট আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু কথায় যখন কাজ হ'ল না তখন তাঁর কাগজ যাতে উঠে যায় তারও বন্দোবস্ত করতে ধনীর দল কুণ্ঠিত হয় নি। যখন কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন দেখা গেল হঠাৎ 'ইণ্ডিয়ান ভিউজ' বলে একখানা সংবাদপত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিত হয়ে ছায়া দিবার জন্য এগিয়ে আসছে। আধমরা বৃক্ষে যৌবন আসার পর তাতে অনেক রকমের ফলই ধরল। কিন্তু ফল নানা রঙের হ'লে কি হয়, মজুর তা ছুঁইলও না।

মজুরের দল যখন ইণ্ডিয়ান ভিউজের দিকে পিছন দিয়ে বসল তখন ইণ্ডিয়ান ভিউজ তার স্বরূপ প্রকাশ করল, একঘেয়ে দক্ষিণ ভারতীয় কংগ্রেসের সংবাদ ছাপতে লাগল।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস চার আনায় কংগ্রেস সভ্য গ্রহণ করে না। সেখানে একটি সুন্দর নিয়ম অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এখনও সে নিয়ম বর্তমান আছে কিনা তা আমি জানি না। সে নিয়মটি হ'ল এই যে, যদি কেউ কংগ্রেসে নাম লিখাতে চায় তবে তাকে কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মির দ্বারস্থ হতে হয়, তারা যদি আবেদনকারীকে মনোনীত করেন তবে কংগ্রেস সভ্য হ'তে পারা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার মজুরের দল তারজন্য চেষ্টা করে দেখেছে এবং বুঝতে পেরেছে, তাদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার কংগ্রেসের দ্বার বন্ধ, তাই তারা সেদিকে আর অগ্রসর হতে না চায় ছিল।

যদিও দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মাঝে দুটি দল গড়ে উঠে একে অন্যের প্রতি অসদ্ ব্যবহারই করছিল এবং প্রত্যেক দলেই তাদের মতবাদ নিয়ে সফলের চেষ্টার চেষ্টাও, করছিল এতে কিছু ফল যেটেই ভাল হ'তে লাগল না। কুলিরা কুলি রয়ে গেল, ভারতীয় কোন মতেই হ'তে পারল না। উভয় দলে মিলবার সম্ভাবনাও ছিল না। একদল যখন অন্য দলকে ঘৃণা করে এবং একের সর্বনাশ অন্যে করতে চায় তখন মিলনের পথ আর মোটেই খোলা থাকে না।

আমরা চোখে দেখতে পাই, হিন্দু-মুসলমানের গড়-মিলে এদেশে কত সর্বনাশ হচ্ছে। চোখের দেখা বিষয় সকল সময় ঠিক হয় না। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানে কোনরূপ বিবাদ আছে কিনা তাও আমি ভাল করে বুঝতে পারি না। বিবাদ হয় তখনই যখন স্বার্থে আঘাত পড়ে। হিন্দুতে হিন্দুতে যখন একে অন্যের স্বার্থে আঘাত

করে তখন হিন্দুতে হিন্দুতে বেশ লড়াই হয়। মুসলমানের বেলাও সেরূপই ঘটে। অতএব দেখা যাচ্ছে স্বার্থ হানি ছাড়া কোনমতেই বিবাদ ঘটতে পারে না। এখন দেখতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় মজুর এবং ধনীদের মাঝে কোনরূপ স্বার্থ নিয়ে গণ্ডগোল আছে কিনা? যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে, এদের মধ্যে বেশ স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রথম বাঁধল, যখন মহাত্মা গান্ধি জেনারেল স্মাটের সংগে পেক্ট করে যে সকল সুবিধা পেয়েছিলেন তার সবটাই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ভাগে পড়ল। যে মজুরদের অনুগ্রহে মহাত্মাজী বাজী মাত করলেন সেই মজুররাই কোন সুবিধা পেল না। সেজন্য দোষী মজুররাই, ধনীরা সেজন্য দোষী নয়। একথাটা আমি বেশ ভাল করেই অবগত আছি। কোন বিষয় ভাল করে অবগত হ'য়ে লাভ নাই, যদি তা প্রকাশ করতে পারা না যায়। মজুরের দল সত্যাগ্রহের সুফলে বেশ ভাগ বসাতে সক্ষম হয় নি কেন, মহাত্মা গান্ধি সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। আমিও সে কথাটা অপ্রকাশিতই রাখতে চাই।

তারপর সুরু হ'ল নানা দিকে নানা রকমের ব্যবসা। কুলির দল যখন একটু শিক্ষা পেল তখন বড় কুলি অর্থাৎ ভারতীয় ধনীদের ঠেলে ফেলে এগিয়ে যেতে লাগল। ঐ ছোট কুলিরা কখনও বড়লোক বলে নিজেদের পরিচয় দেয় না, এবং ওদের মাঝে যারাই নিজেদের বড়লোক বলে বাহাদুরী করতে অগ্রসর হন তাকেই তারা নানারূপে শাস্তি দেয়। এতে করে তাদের সমাজও ভাংগে না। মনে রাখতে হবে ভারতীয় প্রথামতে সামাজিক শাস্তি দেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকাতে চলে না। কি করে শাস্তি দেওয়া হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার কতগুলি স্থানে ভারতীদের জন্য মদ্যপানের বন্দোবস্ত আছে। এরূপ মদ্যপানের স্থানে স্ত্রীপুরুষ সবাই যায় এবং একত্রে বসে মদ খায়। যখন ইউরোপীয় বয় এসে গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢেলে দেয় তখন যাকে শাস্তি দেওয়া হয় তার গ্লাসে মদ ঢালতে নিষেধ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলা হয়, লোকটির অসুখ। তিনজন লোক যখন বলে লোকটির অসুখ হয়েছে, তখন বয় সেই লোকটিকে মদ খাবারের ঘর হ'তে বার করে দেয়। এরূপভাবে দু'একদিন অপমানিত হবার পরই তিনি স্ত্রীলোকই হন আর পুরুষ লোকই হন, আপোষে সকল রকম দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলেন।

মণিলাল গান্ধি যেদিন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয় মজুর-শ্রেণীর পক্ষ হয়ে কাজ করতে লাগলেন সেদিন থেকেই একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই দলের নাম হয়েছিল 'কলোনিয়েল বর্ণ এণ্ড ইণ্ডিয়ান সেট্‌লারাস এসেসিয়েশন'। তাতে যোগ দিয়েছিলেন মিঃ নাইডু। মিঃ নাইডু ব্যারিষ্টার এবং ভারতীয়দের মাঝে একজন শিক্ষিত লোক। মজুরদের মাঝে যাতে কোনরূপ ভাংগন না ধরে সেজন্য ভারতীয় মজুরগণ ইউরোপীয় মজুরের কংগ্রেসে মিলে যেতে বাধ্য হয়। কারণ তারা বেশ ভাল করেই বুঝেছিল, ভারতীয় মজুরদের মাঝে ভাংগন ধরাবার জন্য ভারতীয় ধনীরা আপ্রাণ চেষ্টা করবে, হয়ত আর একটা মুসলিম মজুর সভাই করে বসবে। ভারতীয় মজুরগণ ধর্মের নাম করলেই গলে যায়। হিন্দুয়ানী আর মুসলমানী এসে দেখা দেয়। ইউরোপীয় মজুরদের মাঝে যদি কেউ ধর্মের নাম নিয়ে ভাংগন ধরাবার চেষ্টা করে তবে তার কথা কেউ শুনবে না। ইউরোপীয় মজুর ভাল করেই জানে, ধনীর দল ধর্মকে ব্যবহার করে মজুরদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করার জন্য।

ভারতীয় মজুরদের মাঝে কয়েকজন লেফ্‌টেনেন্টের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়। তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কাছে বলত আর আমি রাত চারটা পর্যন্ত সেই অভিজ্ঞতার কথা কান পেতে শুনতাম। সে অভিজ্ঞতা বড়ই করুণ এবং মর্মস্পর্শী।

রীতিমত কন্‌স্‌পিরেসি

যে সকল মজুর গত মহাযুদ্ধের পর বেকার হয়েছিল তাদের ভারতে ফেরত পাঠাবার ভার দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কংগ্রেসের উপর অনেকটা ছেড়ে দেন। অনেকটা ছেড়ে দিবার মানে হ'ল কংগ্রেস কর্মিরা যা করবেন তার সুপারভাইজারী করার ভার সরকারের হাতেই ছিল খোলা কথায় যদি বলা হয় তবে বলা যেতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেস নিজে গায়ে পড়ে দক্ষিণ

আফ্রিকার সরকারকে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন। এর পেছনে একটি কুমতলব ছিল। যে সকল লোক ভারতে ফিরে আসতে রাজি হ'ল, তাদের পাথেয় দিবার বন্দোবস্ত হয়েছিল এবং যে সকল মজুর আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে ফিরে আসবে না বলে নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করল তাদের একটা মোটা টাকাও দেওয়া হয়েছিল। এই মোটা টাকার পরিবর্তে তারা যে নাগরিকত্ব হারাল অথবা নাগরিকত্ব হারাবার বন্দোবস্ত করল সে ধারণাই তাদের ছিল না। তারা ভেবেছিল আবার যখন সুদিন আসবে তখন তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে যাবে। কিন্তু কলকাতায় যখন আসল এবং "প্রবাসী" অপিসের সামনে এসে দাঁড়াল তখন তারা বুঝল মাতৃভূমিতে তারা আসেনি এসেছে একটি উদ্ভট দেশে যেখানে তাদের ধাতের সঙ্গে সবাই গরমিল হয়ে গেছে। এরূপ বিভিন্ন ধরণের আচার-ব্যবহারে তারা একদিন যদিও অভ্যস্থ ছিল, কিন্তু একটু স্বাধীনতা পেয়েই তারা বুঝেছিল ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম কত হীনস্তরের। অবশ্য এসব হীনস্তরের কথা আমি এখন বলতে যাব না, তবে আমাকে শুনতে হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে যখন ডেস্‌টিটিউটের দল ভারতে আসল এবং বুঝল এদেশে তাদের থাকা সম্ভব নয়, তখন অনেকেই জাহাজে করে ইঃ আফ্রিকা পৌঁছে সেখান থেকে পদব্রজে দক্ষিণ আফ্রিকাতে চলে গিয়েছিল। যারা সেই কাজটি করবার মত অর্থ যোগাড় করতে পারল না তারা পদব্রজে দক্ষিণ আফ্রিকাতে চলে গেল। এই ভ্রমণকাহিনীর কথা কেউ জানে না, সেই ভ্রমণকাহিনী কেউ লেখেনি, কখনও লেখা হবে না। আমিও তা লিখব না। তবে একটুকু এখনও আমার মনে হয়, এদের পর্যটন কাহিনী প্রকৃতই রোমাঞ্চকর। আমি যখন তাদের সেই রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী শুনতাম তখন মনে হতো, আমার ভ্রমণ-কথা সেই করুণ কাহিনীর কাছে কিছুই নয়। এই ডেস্‌টিটিউটরাই দক্ষিণ আফ্রিকার ধনী পরিচালিত কংগ্রেসদ্রোহী। এদের সঙ্গে কি কোনদিন দক্ষিণ আফ্রিকার ধনী ভারতবাসীদের কোনরূপ বন্ধুত্ব স্থাপন হ'তে পারে? এবার হয়ত হবে, কারণ যে নতুন বিল দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার প্রণয়ন করেছেন তার দ্বারা ঐ ধনী শ্রেণীর লোক তাদের স্বস্থানে যেতে বাধ্য হবেন। এবার তাদের না স্বর্গ না নরক এরূপ অবস্থা হ'তে একদম নরকে আসতে হবে। এবার তাদের মজুদের সংগেই থাকতে হবে এবং হয়ত মজুরদের কথা একটু ভাবতেও হবে। তবে ধনীদের একটু কষ্ট হবে, সেই কষ্ট আর কিছুই নয়, শুধু তাদের বুজরুকীবুজরুক পোষাক পরিত্যাগ করতে হবে। আরবগণ দক্ষিণ আফ্রিকাতে এসে তাদের দেশের পোষাক পরিত্যাগ করে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ দক্ষিণ আফ্রিকাতে যাবার পর যখন একটু ধনী হয় তখন আরবের পোষাক গ্রহণ করে। এসব পোষাক ইউরোপীয়গণ এক্সমাসের দিনে পরে পথে ঘাটে তাণ্ডবনৃত্য করে থাকে। যে পোষাক পরলে লোকে হাসে, যে পোষাক ইউরোপীয়গণ একমাত্র গরম দেশেতেই ব্যবহার হতে পারে বলে জানে সেই পোষাকে যখন ভারতীয় ধনীদের পথে ঘাটে দেখে তখন তারা সে পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পথ পরিত্যাগ করার কারণ শুধু তাই নয়, ভারতীয় চক্ষু এতই প্রখর যে ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের পথে-ঘাটে দেখলেই যেন গিলে খেতে চায়। তারা এসব নীরবে সহ্য করবে কেন? বৃটিশের সংগে বুয়রগণই লড়াই করেছে এবং যুদ্ধের যা ফলাফল তা তারাই ভোগ করবে। আরববেশে ভারতবাসী সেই সুখদুঃখের ভাগীদার হবার হক মোটেই পেতে পারে না। সেজন্যই পেগিং বিলের প্রবর্তন হয়েছে। ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত আরব সেই দুষ্ট আইনে পতিত হয় না কেন, সে সংবাদ মিঃ কাজি এবং তাঁর ধামাধরা কংগ্রেসীরা জানতেও রাজী নন। এতদিন সেই সংবাদ অবগত হতে রাজি ছিলেন না, এখন হবেন। কারণ এখন আরবরা আর তাদের বাড়িতে খানা খেতে আসবে না। যদি আসে তবে ইউরোপীয় সমাজ তাদেরও পরিত্যাগ করবে। আরবগণ এত মূর্খ নয় যে, তাদের পরিত্যক্ত পোষাকে সজ্জিত ভারতবাসীর সংগে এসে দিন কাটাবেন।

ভারতবাসী এখনও ধর্মের নামে পাগল হয়, বুয়রগণ অথবা ভারতীয় মজুরগণ সেরূপ অন্ধবিশ্বাসে পাগল হ'তে পারে না, কারণ তারা শিক্ষিত। মিঃ শেঠ নামীয় একজন ভারতীয় কংগ্রেস-নেতা আফ্রিকা ভ্রমণে যাবার পর তার সংগে আমার দেখা হয় এবং তাকে আমি অনেকবারই

অনুরোধ করেছিলাম, তিনি দয়া করে যেন ভারতীয় ধনীদের সামান্য কিছু উপদেশ দিয়া যান। ভারতীয় ধনিগণ বৃটিশ পুঁজিবাদীর বুচকা ঘাড়ে করে রাখতে পারেন তাতে কেউ বাধা দিবে না, কিন্তু দয়া করে একবার ইউরোপীয়দের রাত্রিবাস পাজামা পরিত্যাগ করে, ফেসানি ড্রেস আরব্য পোষাক পরিত্যাগ করে ইউরোপীয় পোষাক পরুতে অনুরোধ করে যান। শুধু "কালারবার" বলে চীৎকার করলে চলবে না, 'কালারবার' যার ফলে সৃষ্টি হয় সেদিকটাও দেখতে হবে। বব ছাটে চুল কেটে সাড়ী পরলে যেমন বিশ্রী দেখায়, তেমনি বাক্সে পোষাক পড়লেও বিশ্রী দেখায়, সেদিকটা তাদের অনুধাবন করা উচিত। ভারতীয় মুসলমান মজুর এসব বালাই পরিত্যাগ করতে পেরেছে; ধনীরা তা পরিত্যাগ করবার কারণ খুঁজে পাওয়া বড়ই মুস্কিল। মিঃ শেঠ তা না বলে শুধু 'কালারবারের' জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদেরই গালি দিয়েছেন, ভারতবাসীদের কিছুই বলেন নি। পাজামা এবং আরব পোষাক ব্যবহারের ফলে পেগিং বিল যা ভারতীয় মজুরগণ গত তিনবৎসর যাবৎ আটকে রেখেছিল তা আইনে পরিণত হয়েছে। (ক্রমশঃ)

শুক্‌নো বরফ

শ্রীশরদিন্দু চৌধুরী

বরফ কি শুক্‌নো হতে পারে? বরফে হাত দিলেই ত তা হতে ধীরে ধীরে জল গড়িয়ে এসে অল্পক্ষণ পরেই হাত ভিজিয়ে দেয়। এই বরফ কি কখনো শুক্‌নো হতে পারে —যা হতে জল গড়াবে না? হাঁ, সম্প্রতি শুক্‌নো বরফ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তাই এখানে বলব।

এদেশে ইলিশ মাছ উপহার দেবার রীতি অনেক কাল থেকেই প্রচলিত। কোন দূরদেশে আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী সন্দেশ-রসগোল্লার সাথে ইলিশ মাছও পাঠান হয়। দূরে ইলিশ মাছ অমনি পাঠালে ত চলবে না—তাহলে পচে যাবে। তাই মাছ কুটে হলুদ নুন দিয়ে মেখে মাটির হাড়ীতে ভরে সরা দিয়ে ঢেকে পাঠান হয়। তাতে মাছ পচে না। আজকাল আর এরূপে মাছ পাঠান হয় না। কেবল যাঁদের বাড়ীতে বুড়ী ঠাকুমা কিংবা দিদিমা আছেন, তাঁরাই এখনও আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে এরূপে মাছ পাঠিয়ে থাকেন। আজকাল বরফ আবিষ্কৃত হওয়ায় লোকেরা মাছ পাঠাতে হলে আস্ত মাছই বরফে আবৃত করে তা পাঠায়—অথবা আরও ঠাণ্ডায় পাঠাবার জন্যে কখনও কখনও নুন ও বরফ মিশিয়ে তা দিয়েও মাছ পাঠাতে পারে। এতে খুব সুবিধে হয়েছে।

বরফ আবিষ্কৃত হবার আগে মানুষ খাদ্যদ্রব্য, যেমন মাছ-মাংস শুকিয়েও স্থানান্তরিত করত কিংবা বেশী দিন রাখত; কিন্তু তাতে খাদ্যের ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেত এবং খুব বেশী দিনও রাখা যেত না। এখন বরফ দিয়ে কিংবা ঠাণ্ডায় জমিয়ে রাখলে খাদ্যদ্রব্য, শাকসব্জী, ফল প্রভৃতি অনেক দিন টাটকা অবস্থায় রাখা যায় তাতে ভিটামিনও নষ্ট হয় না। অবশ্য সেই শৃগালের মত "অদ্য ভক্ষ্যোধনুর্গুণঃ" বলে নয়, কারণ তাতে [illegible] এটাবারই সম্ভাবনা বেশী। শৃগাল বোধ হয়, [illegible] দেখেনি তার সামনের প্রচুর মাংস একমাস বা বহু দিন রাখলে তা পচে যাবে।

আজকাল মাছ, তরিতরকারী, ফল সবই বরফ দিয়ে রেলে ষ্টীমারে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু বেশী দিন বরফ দিয়ে রাখলে অসুবিধেও অনেক আছে। আজকাল স্পেশাল কামরায় বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে তার মধ্যে খাদ্য জিনিস পাঠান হয়। অসুবিধেগুলি হচ্ছে এইরূপ—অনেক সময় বরফ গলে গলে ফলাদির উপর জল গড়িয়ে পড়ে ফলে সেই জলে ফলগুলো পচে উঠে। এটা একটা মহা অসুবিধে। তা ছাড়া আরও অসুবিধা আছে রাস্তায় হঠাৎ যদি বরফ ফুরিয়ে যায় তখন নিকটস্থ ষ্টেশনে বরফ পাবার জন্যে গাড়ীকে থামতে হবে

স্টেশনটি ছোট হলে সেখানে বরফের কারখানা না-ও থাকতে পারে। সহরের কেন্দ্রস্থলে বরফ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করে সেখান হতে মোটরভ্যানে সহরের অন্য অংশে বরফ সরবরাহ করে এ অসুবিধে কতকাংশে দূর করা যেতে পারে। নুন ও বরফ মিশিয়ে ঠাণ্ডা উৎপন্ন করলে অনেক সময় ক্ষারজনিত জলের দ্বারা রেল গাড়ীর কামরার লোহা ক্ষয়ে যায়। তাতে আবার একটি নতুন খরচ বেড়ে যায়। অনেকে প্রত্যেক রেল গাড়ীতে এক একটি ক্ষুদ্র বরফের কারখানা স্থাপনের কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাতেও সব অসুবিধে দূর হয় নি।

বরফের এই অসুবিধেগুলো বিবেচনা করে মানুষের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগলো কি করে—এমন জিনিষ দিয়ে ঠাণ্ডা উৎপন্ন করা যায় যা হতে তরল পদার্থ বের হয়ে খাদ্য জিনিষ পচাবে না—যা হতে রেলের কামরার ক্ষয় হবে না; যা তাড়াতাড়ি ফুরায় না। তরল এমোনিয়া, তরল সালফারডায়োক্সাইড প্রভৃতি দিয়েও ঠাণ্ডা উৎপন্ন করবার চেষ্টা হ'ল। এই তরল পদার্থগুলো বায়বআকারে উড়ে যাবার আগে খানিকটা উত্তাপ ঐ জিনিষগুলো হতে নিয়ে যায়, তাতে ঐ জিনিষ ক্রমেই ঠাণ্ডা হতে থাকে। কিন্তু এ প্রক্রিয়াও তেমন সুবিধাজনক নয়। অবশেষে শুক্‌নো বরফ আবিষ্কৃত হওয়ায় এসব অসুবিধে দূরীভূত হয়েছে।

শুক্‌নো বরফ বা dry ice-এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে solid carbon-dioxide বা কঠিন কার্ব্বনডায়োক্সাইড। একে শুক্‌নো বরফ বলে—কারণ, একে সাধারণ চাপে গলালে তরল কার্ব্বনডায়োক্সাইডে পরিণত না হয়ে তৎক্ষণাৎ বায়বীয় কার্ব্বনডায়োক্সাইডে পরিণত হয়। কিন্তু বরফ গলালে জল পাই। জল হতে পরে বাষ্প পাই। কিন্তু বরফ হতে সরাসরি বাষ্প পাই নে। সেই জন্যে সাধারণ বরফ শুক্‌নো বরফ নয়।

Dry-ice বা শুক্‌নো বরফ প্রস্তুত করবার প্রক্রিয়া বিশদরূপে বর্ণনা করা এ স্থানে সম্ভব নয়। তবে এটুকু জানতে হবে, কঠিন কার্ব্বনডায়োক্সাইড প্রস্তুত করতে প্রথমতঃ কার্ব্বনডায়োক্সাইড গ্যাসকে বিশুদ্ধ করতে হবে তারপর তাকে নির্দ্দিষ্ট তাপ (critical temperature) পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করে এবং উপযুক্ত চাপ দিয়ে তাকে তরল করা হয়। এইরূপে তরল কার্ব্বনডায়োক্সাইড পাওয়া যায়। বায়বীয় কার্ব্বনডায়োক্সাইডকে তরলীকৃত করবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট যন্ত্র আছে। তার পর সেই তরল কার্ব্বনডায়োক্সাইডকে নির্দ্দিষ্ট যন্ত্রে নেওয়া হয়। সেখানে উহাকে আরও ঠাণ্ডা করে এবং চাপ দিয়ে কঠিন করা হয়। এরূপে কঠিন কার্ব্বন ডায়োক্সাইড বা শুক্‌নো বরফ তৈরী হয়। শুক্‌নো বরফ ইষ্টকখণ্ডের আকারে সরবরাহ করা হয়। শুক্‌নো বরফের দ্বারা কি কি সুবিধে হয়েছে তাই এখন বলছি।

প্রথমেই ত এর এক সুবিধে হচ্ছে ইহা শুষ্ক, সাধারণ চাপে ইহা তরল অবস্থায় রূপান্তরিত না হয়ে সরাসরি বায়বীয় আকারে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং জল গড়িয়ে খাদ্যাদি পচবার যে অসুবিধে তা সহজেই দূরীভূত হয়। আর এ হতে যে গ্যাস বের হয় তা বের করে দেবার জন্যে পাইপ থাকে। আর এই গ্যাস খাদ্যদ্রব্যের সংস্পর্শে এলেও তা নষ্ট হয় না। যদিও শুক্‌নো বরফ কঠিন, তবুও একে যে কোন আকারে কাটা যেতে পারে। ইহা ক্ষয়কারী কিংবা মাদক দ্রব্য নয়। আর এর একটি মস্ত সুবিধে হচ্ছে—এই বরফ হতে যে গ্যাস বের হয় তা যতক্ষণ খাদ্য দ্রব্যের উপর থাকে ততক্ষণ বাইরের উত্তাপকে খাদ্যের ভেতর ঢুকতে দেয় না। বরফকে কম্বল দিয়ে ঢেকে রাখলে তা যেমন বরফকে বেশী গলতে দেয় না—সেইরূপ এই গ্যাসও কম্বলের ন্যায় ভিতরের শুষ্ক বরফকে আর বায়বীয় হতে দেয় না। তাতে এই সুবিধে হয় যে, একটি গাড়ীতে মাংস, মাছ, শাকসব্জি ফল মূল ইত্যাদি পূর্ণ করে তার উপরে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক শুষ্ক বরফের খণ্ড দিয়ে, অনেক দূর অনায়াসে নিয়ে যাওয়া যায়। কারণ প্রথমতঃ যেটুকু শুষ্ক বরফ বায়বীয় হয় তাহাই কম্বলের কাজ করে এবং আর বরফ নষ্ট হতে দেয় না। এক পাউণ্ড সাধারণ বরফ এদিকে যতখানি কাজ করতে পারে, এক পাউণ্ড শুষ্ক বরফ তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করতে পারে।

সাধারণ চাপে শুষ্ক বরফের উত্তাপ খুবই কম। নুন ও সাধারণ বরফ মিশিয়ে যতটুকু ঠাণ্ডা উৎপাদন করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা শুধু শুষ্ক বরফ হতেই

পাওয়া যায়। কোন যন্ত্রের ব্যবহার না করে ৯০ ডিগ্রি সে কিংবা তার চেয়েও কম উত্তাপ এর সাহায্যে সৃষ্টি করা যায়। উত্তাপের পরিমাণও সহজেই ইচ্ছাধীন রাখা যায়। গাড়ীতে কিংবা খাদ্যাগারে যতটুকু ঠাণ্ডা দরকার সেই অনুপাতে বরফ ব্যবহার করলেই হ'ল। সুতরাং ইহার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য স্থানান্তরিত করতে কম স্থানে এবং অল্প ওজনেই কাজ হাসিল হয়। এ তৈরী করতে খরচও বেশ কম। সাধারণ বরফের অর্দ্ধেক কিংবা তিন-চতুর্থাংশ খরচেই শুষ্ক বরফ তৈরী করা যায়। আর কার্ব্বণ ডায়োক্সাইড্ ত সারা পৃথিবী জুড়েই আছে।

যে কোন আকর হতে কার্ব্বণডায়োক্সাইড প্রস্তুত হোক না কেন তা হতেই শুষ্ক বরফ তৈরী করা যায়—কেবল সব ক্ষেত্রেই ওকে বিশোধিত করে নিতে হবে। শুষ্ক বরফের আরও অনেক ব্যবহার হচ্ছে, যেমন আইস্‌ক্রিম তৈয়ারীর জন্য এবং গাড়ীতে করে ইহার সরবরাহের জন্য। জমান খাদ্য স্থানান্তরিত করবার জন্যে ত এর ব্যবহার আছেই। ধাতু নির্ম্মাণ কারখানায় এবং বৈদ্যুতিক কাজে শুষ্ক বরফ লাগে। শুষ্ক বরফ হতে যে কার্ব্বণডায়োক্সাইড বের হয় তা খুব বিশুদ্ধ। সেজন্যে এই বিশুদ্ধ গ্যাস মদ্যজাতীয় পানীয়ে ব্যবহৃত হয়। তার পর যে-সব খাদ্য কার্ব্বণডায়োক্সাইড গ্যাসে পচে না তাও এই বিশুদ্ধ গ্যাসের মধ্যে রাখা হয়। আগুন নেবানোর কার্য্যে এবং ডাক্তারীতেও এর ব্যবহার অনেক। রেডিও টিউব (Radio tube) এবং নিয়ন লাইট (Neon lights) প্রস্তুত করবার সময় বায়ুশূন্য নলগুলো ঠাণ্ডা করবার জন্যে শুষ্ক বরফের দরকার হয়। জলের কলের নল মেরামতের জন্যে অনেক সময় শুষ্ক বরফের সাহায্যে নলের ভিতরের জল জমিয়ে দিয়ে এবং এরূপে জলের প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে তার পর মেরামত করা হয়—অবশ্য যে জায়গায় ভালব্ দিয়ে জল প্রবাহ বন্ধ করা যায় না। শুষ্ক বরফ আরও অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শুষ্ক বরফ নির্ম্মাণের একটি কারখানা সর্ব্ব প্রথম ১৯২৫ খৃঃ অব্দে আমেরিকায় স্থাপিত হয়। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই এর প্রচলন এত বেড়ে গিয়েছে যে, আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে আরও অনেক শুষ্ক বরফের কারখানা স্থাপিত হয়েছে। আমাদের দেশে কিন্তু এখনও এই জিনিষটির প্রচলন হয়নি। আশ্চর্য্যের বিষয়, কেবল আইসক্রীম নাড়াচাড়া করবার জন্যেই সর্ব্বপ্রথম এই শুষ্ক বরফের ব্যবহার হয়েছিল। আজও শুষ্ক বরফ অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও শতকরা ৫০ ভাগ শুষ্ক বরফই আইস্‌ক্রীমের ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সভ্য জগতের এই অতি প্রয়োজনীয় জিনিষটি আমাদের দেশেও যাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত হয়, তাই করতে হবে। এর ব্যবহার আমাদের দেশে খুব বেড়ে গেলে বুড়ি দিদিমা বা ঠাকুমারা দূর দেশে কুটুম্ববাড়ী টাট্‌কা জ্যান্ত ইলিশ পাঠাতে পারবেন। আর তা পচবার ভয় থাকবে না। এ ছাড়া কলকাতার ন্যায় বড় সহরে ও বড় বড় বাজারে ফল, শাকসব্জী সঞ্চয় করে রাখবার জন্য শুষ্ক বরফের Refrigerating chamber নেই। তা যদি থাকৃত তবে আর সকালের মাছ বিকেলে পচে যেত না। আর বাজারে একদিনের বেশী শাক-সব্জী বা ফলগুলিও রাখা যায় না—তা শুকিয়ে যায় বা পচে যায়। তাই বড় বড় সহরে এই সব খাদ্য-জিনিষ রাখবার জন্যে একটি ঠাণ্ডা ভাঁড়ার ঘর করা দরকার এবং তার মধ্যে সহরবাসীর উপযুক্ত খাদ্য যেমন মাছ, মাংস, ফলমূল সঞ্চিত করা দরকার। শুষ্ক বরফের সাহায্যেই আজকাল ইহা একমাত্র সম্ভব। সুতরাং শুষ্ক বরফের কারখানা সাধারণ বরফের কারখানার মতই ভারতের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন আছে এবং এদিকে আমাদিগকে উদ্যোগী হতে হবে। তবে আমাদের খাদ্য আর এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে না। একদিনে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে শুষ্ক বরফের ঠাণ্ডা ভাঁড়ার ঘরে রেখে এক মাস তা স্বচ্ছন্দে খাওয়া যাবে।

সঞ্চয়ন

(বিদেশী পত্রিকা হইতে)

স্বাধীন চীনের ইতিহাস

[বর্ত্তমান প্রবন্ধটি অধ্যাপক হ্যারল্ড্ এম্, কুইগ্লি লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত। মৌলিক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল নিউ ইয়র্কের International Conciliation পত্রিকায়। জাপানের বিরুদ্ধে লড়্তে গিয়ে কি করে স্বাধীন চীনকে তার সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য ক্রমাগত পর্ব্বতসঙ্কুল পশ্চিম চীনে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ প্রবন্ধটিতে।]

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের সুরু থেকেই চীনের জাতীয় গভর্ণমেন্টের সমর কৌশলের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পশ্চিম চীনে পশ্চাদপসরণের প্রত্যাশার উপর; বাধাদানের জন্ম এখন এক সমগ্র রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্প্রদায় সংগঠনের চেষ্টা করা হয়েছে যেটা আক্রমণকারী শক্র সৈন্যের পক্ষে অনধিগম্য। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর জেনারেল চিয়াং বলেছিলেন; "হ্যাংকো (মধ্য চীনে) রক্ষার পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমে সংগঠন-মূলক কার্যগুলোর সংরক্ষণ যাতে পশ্চিমে চীনে সংবাদ আদানপ্রদান, পথঘাটের উন্নতি করা যায়, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা একত্রিত করা যায় এবং যাতে মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনের সব টেনিক শিল্পগুলোকে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থানান্তরিত করতে পারা যায়।"

জাতীয়তাবাদীদের কাজ ছিল পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশ-গুলোকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা যাতে সমুদ্রোপকূল ভাগ, শিল্প-প্রধান সহরগুলো এবং প্রধান প্রধান যাতায়াতের পথগুলো জাপানের অধিকারে চলে গেলেও অর্থনৈতিক পঙ্গুতার সৃষ্টি না হয়, যাতে জাপানের সামরিক অধিকার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দূর না হয়।

স্বাধীন অঞ্চলে অনেক কয়লা এবং চীনের অধিকাংশ ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, সীসা, দস্তা, টাংস্টেন্, রসাঞ্জন (antimony), টিন প্রভৃতি আছে; কিছুটা স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান প্রস্তরও আছে। টিন হচ্ছে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান্ রপ্তানী খনিজদ্রব্য; দক্ষিণ ইয়ুনানে আদিম পদ্ধতিতে টিনের খনি থেকে টিন তোলা হয়। সেন্‌সি, পশ্চিম সান্‌সি এবং কাংসুতে সমগ্র অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়; এই অঞ্চলের যন্ত্রশিল্পের উন্নতির পক্ষে এই কয়লা যথেষ্ট বটে—তবে এই কয়লা উৎপাদন ব্যাপারে এখনও আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। জেচোয়ান্ (Szechwan), ইয়ুনান্ এবং কোয়েচোতে যথেষ্ট সংরক্ষিত কয়লা আছে; তার সাহায্যেও যন্ত্রশিল্পের প্রসারের যথেষ্ট সুবিধা হতে পারে। স্বাধীন চীনে কিন্তু সামান্য মাত্র সংরক্ষিত লৌহ আছে। কাজেই বিস্তৃতভাবে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের জন্যে বর্ত্তমানে জাপানীদের অধীন ইয়াংসি নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশের কয়লা ও সস্তা আদানপ্রদান পদ্ধতির সঙ্গে স্বাধীন চীনের পশ্চিম এবং দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের কয়লা ও অন্যান্য খনিজদ্রব্যের সম্মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানের গুরুতর পরিস্থিতির জন্যে পূর্ব জেচোয়ানের লৌহ খনিগুলোতে ভয়ানক চাপ পড়েছে। সমগ্র চীনের সংরক্ষিত তাম্রের পরিমাণ কম—ইয়ুনানেই যা কিছু তাম্র পাওয়া যায়। জেচোয়ানের লবণ-কূপ সংখ্যায় অনেক এবং তাদের উৎপাদনী শক্তিও প্রচুর। ব্যবসায়িক গুরুত্বপূর্ণ কোন পেট্রোলিয়াম্ কূপ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি; যে কয়টা কূপ এ পর্য্যন্ত দেখা গেছে—সেগুলো স্বাধীন চীনের সেন্সি, কাংসু এবং জেচোয়ানেই অবস্থিত।

স্বাধীন চীনের অবিকৃত যে-সব অঞ্চলের হিসাব পাওয়া যায়, তার থেকে দেখা যায় যে, কৃষিকার্যে প্রযুক্ত জমির পরিমাণ কোয়েইচোতে শতকরা ২·৬ থেকে কোয়াংসিতে শতকরা ২২ পর্যন্ত আছে। পুরাণো প্রদেশ-গুলোর মধ্যে জেচোয়ান্ হচ্ছে বৃহত্তম—কিন্তু এই প্রদেশটির ফুলের বাগান এবং ফলের বাগান সমন্বিত শত ২·৫ ভাগ জমি মাত্র কৃষিকার্যের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ২৬টি প্রদেশের শতকরা ১৫ ভাগ জমির থেকে এই

বিভিন্নতার কারণ এই যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আদিত্যকায় খুব পাহাড় পর্বতের আধিক্য।

কৃষি-জাত দ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্যে জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পরিকল্পনা করেছেন এবং তদনুযায়ী কাজও করছেন। চীনের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা দক্ষিণ পশ্চিমে চলে আসায় গভর্ণমেণ্টের এই প্রচেষ্টার খুব সহায়তা হয়েছে। এঁদের অনেক লোকই বিভিন্ন সমস্যায় নিযুক্ত হয়েছিলেন—যেমন তুলোর বীজ ও রেশমের গুটির উন্নতি, উন্নত ধরণের ধান, গম এবং অন্যান্য অনেক প্রকারের ফলের চাষ, পশু-পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে চা উৎপাদন এবং টাং (tung) তৈল উৎপাদন প্রভৃতি। এখন তাঁরা খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দ্রব্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাজে তাঁদের আবিষ্কার প্রয়োগ করতে মনোনিবেশ করেছেন। আগে যে সব জমিতে আফিং এবং তামাক বোনা হ'ত এখন সেগুলোতে প্রচুর কলাই উৎপন্ন হয়। ইয়ুনান্ কোয়েচো এবং জেচোয়ানের নতুন যন্ত্রশিল্পগুলোর জন্যে তুলোর চাষে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এবং উন্নত ধরণের তুলোও পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই গভর্ণমেণ্টের কৃষি-ঋণসহ উন্নত ধরনের বীজ বিতরণের ফলে অনেক দ্রব্যের উৎপাদন-পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। জেচোয়ানে গভর্ণমেণ্ট থেকে রেশমের চাষের সাহায্য করা হচ্ছে এবং কৃষকদের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। মধ্য এবং পূর্ব অঞ্চলে কয়েকটি সমধিকৃত প্রদেশের সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। টাং এবং অন্যান্য শাকসব্জী-জাত তেলের দিকেও এইরূপ মনোযোগ করা হচ্ছে।

বর্তমানের জন্যে স্বাধীন চীনের যন্ত্রশিল্প প্রধানতঃ ছোট এবং অকেন্দ্রিক হ'তে বাধ্য; বৃহৎ যন্ত্র-শিল্প গ'ড়ে তুলতে সময় লাগে এবং ভালভাবে সংগুপ্ত না থাকলে, জাপানী বোমারু বিমানসমূহ বড় বড় কারখানা ধ্বংস করতে পারে। এই সমস্যায় সমবায়-নীতি প্রয়োগ করে উল্লেখ-যোগ্য ফল পাওয়া গেছে—যদিও প্রাপ্য মূলধন অপ্রচুর এবং শিক্ষিত এঞ্জিনিয়ারও কম। জাপান-অধিকৃত অঞ্চলের নিকটবর্তী সহর থেকে যন্ত্রপাতি সরিয়ে এনে এবং আশ্রয় প্রার্থী শ্রমজীবী, কুলি এবং কৃষকদের মধ্যে থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে, সেন্সি, হুনান, কিয়াংসি, কাংসু এবং অন্যান্য প্রদেশে গ্রাম্য কারখানা স্থাপিত করা হয়েছে এবং সে-সব কারখানায় লৌহ-যন্ত্র, মোজা, সাবান, মোমবাতি, ময়দা, চামড়ার জিনিস, কার্পাস এবং পশম বস্ত্র, কাগজ, কাচ প্রভৃতি নির্মাণ করা হচ্ছে। সমবায় কারখানাগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণে ছোট মেসিন্‌গান তৈরী হচ্ছে। সমবায়ী কর্মীরা একত্র কাজ করে এবং তারা অল্প প্রতিদানেই সন্তুষ্ট। তারা নিজেদের নির্বাচিত পরিচালকদের মারফৎ কারখানাগুলো পরিচালনা করেন। এই আন্দোলনের আশা এই যে এর সাহায্যে সৈন্যদলের সরবরাহ-কার্য চালানো যায়, বেসামরিক জনগণের প্রয়োজন মেটানো যায়—এই ভাবে জাপানী মালের উপর নির্ভরতা কমে যায়—জনগণ কর্মরত এবং সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্যথায় যে-সব মাল জাপানীদের কাছে বিক্রয় করার কিংবা জাপানীদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তার জন্য বাজার খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীন চীন এবং অধিকৃত অঞ্চল—এই উভয় স্থানেই সমবায় কারখানাগুলোর কাজ চল্‌ছে।

খনি থেকে কয়লা এবং লৌহ উত্তোলনের জন্যে এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণের জন্যে সম্প্রতি প্রচুর পরিমাণে যন্ত্রাদি আমদানী করা হচ্ছে; এর থেকে মনে হয় যে যে বৃহত্তর পরিধিতে যন্ত্রশিল্পের উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টা চল্‌ছে। রাইফল্, মেশিনগান্ এবং ছোট ছোট কর বন্দুক নির্মাণকারী কারখানার কাজ চল্‌ছে। পূর্বাঞ্চলের সহর-গুলোর থেকে অনেক টন খনিসম্বন্ধীয় এবং ধাতুবিদ্যা-বিষয়ক যন্ত্রাদি সরিয়ে এনে হুনান এবং জেচোয়ানে পুনঃ-স্থাপিত করা হয়েছে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এবং পরি-কল্পনায় সাধারণ যন্ত্র, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, বস্ত্র, চীনামাটির পাত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরী হচ্ছে।

যানবাহনঘটিত সুবিধা সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়, কেননা এদের সাহায্যেই অস্ত্রশস্ত্র, ট্রাক, পেট্রোলিয়াম, এরোপ্লেন এবং অন্যান্য সামরিক দ্রব্যাদি আমদানী করা হয়; তা'ছাড়া সেনাবাহিনী এবং বন্দুক প্রভৃতি স্থানান্তরে নিয়ে যাবার জন্যে, রসদ এবং স্থানীয় কারখানাজাত

দ্রব্যাদি বিতরণের জন্যে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্যে —উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি রপ্তানীর জন্যেও যানবাহনের প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বেশ সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায় কাজ চলেছে এবং চল্‌ছে। কয়েক হাজার মাইল মোটর চলাচলের রাস্তা তৈরী করা কিংবা সংস্কার করা হয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক শ মাইলের বেশী রেলপথ নির্মাণ করা না হলেও, রেল পাওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি রেলপথ বৃদ্ধির চেষ্টা চল্‌ছে। ইয়ুনানের কুন্মিং থেকে রেঙ্গুনের ব্রিটিশ লাইনের শাখাপ্রান্ত ব্রহ্মের লাসিও পর্যন্ত বিস্তৃত প্রসিদ্ধ 'বার্মা রোড' (Burma Road) যানবাহন চলার উপযোগী। এই পথটি মাত্র সাতাশ মাইল দীর্ঘ, কিন্তু অতি শীঘ্র নির্মিত হওয়ায় এই পথটি সঙ্কীর্ণ এবং অরক্ষিত বন্ধুর এবং খাড়া। পথটি প্রায় আট হাজার ফুট উর্দ্ধে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পার্বত্যাঞ্চলের মধ্য দিয়ে গেছে। এই অঞ্চলে মে মাস থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভীষণ বৃষ্টিপাত হয়। পথটি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে, কিন্তু জনশক্তি এবং নির্মাণ দ্রব্যাদি পাওয়া গেছিল তার তুলনায় এই সব বাধাবিঘ্ন ছিল তুচ্ছ। জুলাইমাসে জাপানের অনুরোধে এই পথ বন্ধ করে দেবার পূর্বে অস্ত্র শস্ত্রাদি এবং অন্যান্য মাল প্রচুর পরিমাণে এই পথে ইয়ুনানে এসে পৌছাত এবং সেখান থেকে নতুন নতুন পথ দিয়ে জেচোয়ান, কোয়েচো এবং কোয়াংসিতে যেত। এমনি ভাবে স্বাধীন চীনের কাছে ফরাসী ইন্দোচীনের সাধারণ পথ এবং রেলপথও বন্ধ হয়ে গেছে।

জাপানীরা বন্ধ করতে পারবে না এমন একটি মোটর-পথ উত্তর-পশ্চিম দিকে জেচোয়ানের সঙ্গে সিংকিয়াংকে যোগ ক'রে তুর্কিস্থান—সাইবেরীয় রেলপথ পর্যন্ত নির্মিত হচ্ছে। এই পথটি জাতীয় রাজধানী চুংকিং থেকে সোভিয়েট সীমানার নিকটতম স্থান পর্যন্ত চলে গেছে, এর দৈর্ঘ্য দু' হাজার পাঁচশ মাইল। চুংকিং থেকে চেংটুর পথে সিয়াম্ পর্যন্ত পথটি সুনির্মিত—গত কয়েক বৎসর যাবত এ পথটি ব্যবহৃত হ'চ্ছে। তারপর কান্সুর রাজধানী ল্যাংচো অবধি এবং তারও পশ্চিমে, শ' শ' মাইল পর্যন্ত এ পথটি পায়ে হাঁটা পথের মত। এই পথে এমন অনেক গিরিবর্ত্ম আছে যে গুলো সমুদ্র-তল থেকে দশ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। তা' সত্ত্বেও এই পথটি ক্রম বর্দ্ধমান কামান বারুদ, পশম, চা, পশুলোম, চামড়া এবং উটের লোমের ব্যবসায় চলাচলে খুব সাহায্য করছে। এই পথে দুঃসাহসিক অভিযানে উট, খচ্চর এবং মোটর লরী একত্র সহযোগিতা করে।

সিন্‌কিয়াং নামে চীনের একটি প্রদেশ হলেও এবং এখানে একজন চীনা শাসনকর্তা থাকলেও, এই প্রদেশটিতে সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাব প্রচুর এবং মস্কোর দয়াতেই এই প্রদেশের মধ্য দিয়ে মাল চলাচল সম্ভব হয়। গত বসন্তকালে (১৯৪২) সিন্‌-কিয়াংয়ে রুশ সৈন্যদের চলাচল দেখে মনে হয়েছিল যে, ইতি পূর্ব্বে বৃহত্তর মঙ্গোলিয়ার মত সিন্‌কিয়াংও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অঘোষিত সভ্য হয়ে দাঁড়াবে। রুশ যুদ্ধায় এবং যুদ্ধ পরামর্শ দাতাদের মূল্য স্বরূপ স্বাধীন চীনকে হয়ত বৃহৎ অথচ তার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত নয় এমন একটি প্রদেশ বিসর্জন দিতে হচ্ছে। কিন্তু তার নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতার উদ্দেশ্য এ মূল্যের উপযুক্ত বৈ-কি!

"আমার বাড়ী ডুবে গেছে"

[বর্ত্তমান প্রবন্ধটি সিয়াও চিয়েন (Hsiao ch'ien) নামক চীনা গ্রন্থকারের China but not Cathay নামক গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। জাপান চীনের বিরুদ্ধে যে নিষ্ঠুর সামগ্রিক যুদ্ধ চালাচ্ছে তাতে অসহায় চীনবাসীদের দুরবস্থার অন্ত নেই। জাপানীরা অনেক সময় বড় বড় নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে গ্রামাঞ্চল ভাসিয়ে দেয়।]

দূর থেকে দেখলে দেয়াল-দেয়া চুয়াংচো সহরকে অনন্ত সমুদ্রের বুকে ক্ষুদ্র নৌকার মত মনে হয়। সহরটির চারদিক জলে ঘেরা। কেবল সহরের উত্তর দিকটায় জলের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে গাছের আগা, আলোক-স্তম্ভ কিংবা ঘরের ছাদ দেখা যায়; এই অঞ্চলটা উচ্চভূমি। মাঝে মাঝে মানুষের কষ্টের করুণকাহিনী বহন করে আসবাবের ভাঙা-ভাঙা টুকরো উপরে ভেসে ওঠে। প্রাতঃকালীন আকাশ ধূসর মেঘে ছাওয়া এবং দূর চক্রবালকে বন্যার জল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার উপায় নেই। বাতাসে ক্ষীণ হলেও তীক্ষ্ণ বুলেটের শব্দ

শোনা যাচ্ছে। হয়ত যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি থেকেই শব্দটার জন্ম হয়। কিন্তু তাতেই শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়।

যুদ্ধ চলার সময় যুদ্ধক্ষেত্র দেখা ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়। ভীতি আসে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এখানে প্ল্যাটফর্মে বিপদের হাত থেকে কোন রকমে বেঁচে শত শত নিরাশ্রয় লোক অপেক্ষা করছে। তারা পশ্চিমদিকে যাবার জন্যে ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে। কোথায় যে তারা যাবে, তা' তারা জানেও না, জানতে চায়ও না। এই বৃদ্ধ নরনারীরা বিভিন্ন ভঙ্গীতে রেল লাইনের পাশে কিংবা প্ল্যাটফর্মে শুয়ে আছে। তাদের পুত্র এবং স্বামীরা এখনও গেরিলাদের সঙ্গে পার্বত্য অঞ্চলে লুকিয়ে আছে কিংবা আছে জনসাধারণের সৈন্যদলে (People's Militia)। বহুবার গুজব শোনা গেছে যে তারা এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা নিরাপত্তার জন্যে চিটিং নদীর যে বাঁধটি তৈরী করেছে, জাপানের সাম্রাজ্যিক বাহিনী সেটা ধ্বংস করবে। "দস্যু গেরিলাদের পরিবারগুলোকে শাস্তি দিতে হবে।" তারপরই এল দুঃখের রজনী; বড় বড় বিপদ-সূচক ঘণ্টা বেজে উঠল; নারী এবং শিশুদের অসহায় ক্রন্দন শোনা গেল। সমর্থ-দেহ লোকেরা পাথর মাটি, নুড়ি যা পেল তাই দিয়ে বাঁধের পূব দরজা বন্ধ করার চেষ্টা করল—আর তাদের মেয়েরা শিশু, গৃহপালিত মুরগী এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে ইতস্তত দৌড়াতে লাগল। এটা তাদের পলায়নের তৃতীয় দিন। প্রথম দুদিন তারা অনেক কান্নাকাটি করেছিল, বাঁধ, ট্রেন এবং বন্যাপ্লাবিত তাদের ঘরের খবরের জন্য চীৎকার করেছে। শিশুরা তাদের পিতাদের খুঁজেছে এবং বয়স্করা তাদের ভাগ্যের দোষ দিয়েছে। এখন তারা অনেকটা ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। দৈহিক দিক থেকে তারা একেবারে পরিশ্রান্ত।

কয়েকজন লোক নগ্ন কাঁধে শাদা বস্তা বহন করে চলেছে—তাদের পিছু নিয়েছে একদল লোক। পিছনে কনুই দিয়ে লোকেরা পথ সৃষ্টি করছে। ভীড়ের মধ্য থেকে একজন মধ্য বয়েসী নারী তার হাড়-বের করা হাত দুটি বিস্তৃত করে উদ্বিগ্ন ভাবে চীৎকার করছে: "কিন্তু মহাশয়, আমি আমার কার্ড হারিয়ে ফেলেছি।" তার বলীরেখাঙ্কিত গাল বেয়ে চোখের জল নামতে সুরু করে এবং ইতিপূর্বেই বিশৃঙ্খল তার চুল শক্ত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বেই মাদুর বিছানো একটা উন্মুক্ত স্থানে লোকগুলো থামে। বস্তাগুলো খালি করা হয় এবং ছোট ছোট বাদামী রঙের অতি সাধারণ রুটি সব মাদুরে গড়িয়ে পড়ে। শীঘ্রই একটা ছোট টিলার মত সৃষ্টি হয়। আরও লোক এসে জড় হয় এবং অনেক প্রকারের মাছিও এসে সেই স্থানটিতে ভীড় জমায়।

ত্রাণ-কর্মচারী হেঁকে বলে: "প্রত্যেক দলের নেতারা!" তারা যথাশীঘ্র শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক নেতার পিছনেই কয়েক ডজন করে ক্ষুধার্ত মুখ খোলা।

"পাঁচ একে পাঁচ, পাঁচ দুগুণে দশ, তিন পাঁচে…" বিবর্ণ চোখগুলো ঘনিষ্ঠভাবে লোকের হাতগুলোকে অনুসরণ করে এবং গণনার তালে তালে চিবুকগুলো ওঠানামা করে।

চুয়াং-অ্যান্-এর একজন নারী তার অংশ পেয়েছে। সে তার ছেঁড়া পোষাকের সামনে সেটা তুলে ধরে নিজের মনে বলে: "আমি আটষট্টি বৎসর বেঁচে আছি। আমি এখনও এরূপ নিষ্ঠুর মানব-হৃদয় দেখি নি।" সে বিড়বিড় করতে করতেই রুটির টুকরোগুলো অন্তরাল করার জন্যে ছেঁড়া পোষাকের মধ্যে হাত চালায়। সে তার মুখে এক টুকরো ঠেলে দেয় এবং সামনে ঝুঁকে পড়া তার বুকের হাড়গুলো আন্দোলিত হতে থাকে।

নামহীন একটি সমাধির পাশে বসে আছে একটি যুবতী। কোলে করে সে একটি শিশুকে আদর করছে। শিশুটি সলোভে তার ঝুলে-পড়া শিথিল স্তনদ্বয় নিয়ে টানাটানি করছে এবং দুগ্ধহীন স্তনের বোঁটায় মিথ্যাই মুখ লাগাচ্ছে। মায়ের বয়েস কুড়ি বছরের বেশী নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার চোখ দুটি হয়েছে জ্যোতিহীন। নিজের উৎসাহ দেখানোর জন্যে উৎসুক একটি সবুজ মাছি—বারে বারে শিশুর মাথায় উড়ে এসে বসছে। মাথাটায় ফোঁড়া আর ঘা। শিশু উত্যক্ত হয়ে উঠে তার পাতলা কালো মুখটি ফিরায় এবং আঁচড়াতে চায়। কিন্তু তার ছোট হাতটি অর্ধ উত্তোলিত করতে না করতেই মাছিটা সব বুঝে ফেলে এবং উড়ে গিয়ে নিকটস্থ একটা ঝোঁপের কাছে অন্য একটা নর-স্তূপের উপর বসে।

বৃদ্ধ স্টেশন-মাস্টারকে দেখতে পেয়ে লোকেরা উদ্বিগ্ন ভাবে প্রশ্ন করে: "কখন ট্রেন পাওয়া যাবে?" স্টেশন মাস্টারের কোলে একটি পাঁচ-ছয় বছরের শিশু, শিশুটির গায়ে রঙীন জামা—মাথার দুই পাশে কঠিন চিহ্ন অঙ্কিত। তার কানের পিছনে গোলাকার কালো আস্তরণ। শিশুটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

"মাল ওজন করার ঘরের বাইরে কোন হৃদয়হীনা মা এই শিশুকে ফেলে গেছে?"

কেউ এগিয়ে আসে না। চোখের জলে শিশুটির মুখ এত বিকৃত যে তাকে চেনাই মুস্কিল। স্টেশন মাস্টার তাকে একটা সাইনবোর্ডের পাশে নামিয়ে রাখে। এখন তার চোখে জল কম কিন্তু কান্নার বেগে তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। একজন ত্রাণ-কর্মচারী বৃদ্ধের হাতে একপাত্র ভাতের মণ্ড দেয়। বৃদ্ধ তাকে খাওয়াতে বসে। শিশুটি তার শুকনো মুখ খুলে সশব্দে গিলতে থাকে।

"তোমার পদবী কি?" স্টেশন মাস্টার প্রশ্ন করে। ছেলেটির চোখের জলে তার বিশৃঙ্খল দাড়ি ভেজা। শিশুটি শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় এবং আবার খাবার পাত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ময়লা পেটটিকে ছোট বেলুনের মত ভর্তি করা হচ্ছে। যখন পাত্রের তলদেশ পর্যন্ত খালি হয়ে আসে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আঙুল দিয়ে মুখ মুছে সে এখন তার চারদিকে ঘিরে দাঁড়ানো অপরিচিত লোকদের দেখতে থাকে। হঠাৎ সে মাথা ওঠায় যেন তার কোন কিছু মনে পড়ে গেছে। সে বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ওঠে: "আমি মাকে চাই! আমি মাকে চাই!"

স্টেশন মাস্টার শিশুটিকে উঠিয়ে প্রশ্ন করে: "হতভাগা বেচারি, বল্‌তো তোর বাড়ী কোথায়?"

শিশুটি চারদিকে ক্ষণকাল তাকায়। তারপর সে মাথাটা বৃদ্ধের বগলের নীচে ঠেসে দেয়। তার ছোট দেহটা ভয়ে কাঁপে।

"আমার বাড়ী ডুবে গেছে!"

গণতন্ত্রের অগ্নি-পরীক্ষা

[বর্তমান প্রবন্ধটি ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং রাষ্ট্রনীতিবিদ অধ্যাপক হ্যারল্ড জে, ল্যাস্কির লেখা। The New Statesman and Nation পত্রিকা থেকে সংকলিত। প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ল্যাস্কি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ইহুদী-বিরোধী আন্দোলন মাত্রই গণ-তন্ত্র-বিরোধী।]

এটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে যুদ্ধকালে ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় ইহুদী-বিরোধ বেড়ে গেছে। কিন্তু এটা যে শুধু যে-শ্রেণী নিজেদের রাগ সহজ নির্দেশ্য কোন দোষের পাত্রের উপর চাপাতে চায়, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা' নয়। যুদ্ধের পূর্বে অধিবাসীদের যে-সব অংশের মধ্যে এরূপ মনোভাব ছিল না বল্লেই চলে, তাদের মধ্যেও এমনো ভাব দেখা দিয়েছে—যেমন রাজনীতিবিদ্‌, শাসনকর্তা, গৃহকর্ত্রী, ব্যবসায়ী, সামাজিক কর্মী এবং সাগরপারের সহরের হোটেল-রক্ষকদের মধ্যে। এদের জোর ক'রে চেপে ধরলে, বেশীর ভাগ লোকই স্বীকার করবে যে, এ ধরণের মনোভাব অযৌক্তিক। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই আবার এ ধরণের মনোবৃত্তির আবির্ভাবের জন্যে একটা না একটা অজুহাত নিয়ে তৈরী থাকে।

বিভিন্ন ধরণের সবযুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ইহুদীরা বিশিষ্ট সামরিক খ্যাতি অর্জন করতে পারে নি বলে তাদের দোষ দেওয়া হয়ে থাকে। কোন কোন ইহুদী চোরা বাজারে অংশ গ্রহণ করে বলে তাদের দোষী করা হয়। তারা নিজেদের দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আকাশ বাতাস পূর্ণ করে বলেও তাদের দোষ দেওয়া হয়। আনুপাতিক বিচারে বড় রকমের ইভ্যাকুয়েশন ক'রে তারা ম্যাঞ্চেষ্টার, লীড্‌স্‌ এবং লণ্ডনের পূর্বাংশ থেকে চ'লে গিয়ে বিমান আক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে চেয়েছে বলেও তাদের দোষ দেওয়া হয়। তারা মন্ত্রীদের বিরক্তির উদ্রেক করে, কেননা আরবদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে তারাই জটিল করে তোলে এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরা আমাদের প্যালেস্টাইনের নীতির সমালোচনা করে। তারা শাসনকর্তাদের বিরক্তি উৎপাদন করে—কেননা যে-সব জটিল সমস্যার সৃষ্টি তারা করে, তাদের অস্তিত্বের ফলে শাসন-বিভাগে দীর্ঘ গবেষণা চলে এবং পার্লামেণ্টে অনর্থ সৃষ্টি হয়। তারা সামাজিক কর্মীদের বিরক্তিভাজন এই কারণে যে সাধারণ অধিবাসীদের সম্বন্ধে

প্রযুজ্য বাঁধাধরা নীতির মধ্যে তারা পড়ে না; তাই যে বিষয়ে তারা প্রাসঙ্গিক সেই বিষয়ে এই যুদ্ধের সময় শ্রান্তিকর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তারা ব্যবসায়ীদের বিরাগ-ভাজন এইজন্যে যে তাদের তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি তাদের দুর্দম গতিকে প্রত্যেক লাভজনক নতুন বাজারের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তারা গৃহকর্ত্রী এবং হোটেল-রক্ষকদের বিরক্তি উৎপাদন করে এই জন্যে যে তারা যে বোর্ডিং গৃহ কিংবা হোটেলে সমবেত হয়, সেখানে তাদের সমষ্টিগত আনুগত্যের বিশেষ ছাপ পড়ে। তারা তাদের প্রফুল্লতার জন্যে, আত্মরক্ষার উৎসাহের জন্যে এবং তাদের অসুবিধার কথা জানানোর ক্ষমতার জন্যে এদের সবাইকে বিরক্ত করে তোলে।

তারা যে সহানুভূতির যোগ্য এ সত্য অনুভূত হয়; নাৎসী পাশবিকতার তারাই যে চূড়ান্ত প্রমাণ এ সত্যও স্বীকৃত হয়। কিন্তু এ কথাও অনুভূত হয় যে চূড়ান্ত দুর্দৈবের সময় তারা নিজেদের করুণ অভিনয়াংশের উপর বড় বেশী জোর দেয়। তারা ভয়ঙ্কর অন্যায়ের সামনে মর্যাদা-দীপ্ত নীরবতা রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে অবিরাম নির্দয় অস্বস্তির সৃষ্টি করে।

আমার মনে হয় যে দুইটি বড় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী একমাত্র ব্রিটিশ কিংবা অ্যামেরিকান ইহুদীই আজকের দিনে তাদের ইহুদী-ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যে মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা এবং বেদনার মূল্য দিতে হবে, তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে। একপক্ষে ইংরেজ এবং অ্যামেরিকান হিসেবে তার একমাত্র উচ্চাশা হচ্ছে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত না করা—কেননা এই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় জয়লাভের উপর তার জীবন নির্ভর করছে; অপরপক্ষে, যে নিরাশ্রয় লক্ষ লক্ষ ইহুদী ইউরোপ মহাদেশে আছে—তাদের প্রতি আনুগত্যও সে এড়াতে পারে না; ঐতিহাসিক সময়ে একটা দুর্ঘটনা না ঘটলে তাদের ভাগ্যে যা' ঘটেছে, তার ভাগ্যেও তা-ই ঘটতে পারত। ইংরেজ এবং অ্যামেরিকান হিসেবে নীরব থাকলেও, এ বিষয়ে সে সচেতন যে যে-রাষ্ট্রনীতি-বিদদের কর্মব্যস্ততায় তার ভবিষ্যতের গুরুত্ব সামান্য, তাদের কাছে ইউরোপীয় ইহুদীদের ভবিষ্যতের গুরুত্ব আরও কম। যদি সে ইহুদী হিসেবে কথা বলে, তবে আজ হোক, কাল হোক, সে এমন এক মতামতের আবহাওয়ার সম্মুখীন নিশ্চয়ই হবে যাতে সে সহজেই বুঝতে পারবে যে সে যাদের কাছে আবেদন করছে, তাদের একটা অর্ধজাগ্রত বোধ আছে যে যাই হোক, সে একজন বিদেশী এবং সে এমন সব বিদেশীর পক্ষে ওকালতি করছে যাদের দাবী কোনক্রমেই অধিকারপদবাচ্য নয়। সে যদি ইহুদী-বিরোধের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে চায়, তবে সে দেখতে পায় যে সেটা বিচারসঙ্গত যুক্তির বাইরে। যে-সব ভয়ঙ্কর জটিলতায়পূর্ণ ভিত্তির উপরে আধুনিক সভ্যতায় ইহুদীরা দাঁড়িয়ে আছে, তার কথা সে যদি বলতে চায়, সে খুব সম্ভব এই দৃঢ়বিশ্বাসই সৃষ্টি করে যে সে যে-ঐতিহ্যে নিজের সমগ্র সত্তাকে বিজড়িত মনে করে, তার বাইরে সে চিরতরে দাঁড়িয়ে আছে।

সে সর্বদাই সহানুভূতিশীল বিবেচনা চাইতে পারে এবং সাধারণত পায়ও; কিন্তু যখন সে সহানুভূতির ফলস্বরূপ চূড়ান্ত কাজের প্রত্যাশা করে, তখন যে-সীমার মধ্যে তাকে বাস করতে হবে, সেই সীমা সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে ওঠে। * * * * * * আকাশে সূর্য যখন জ্বলে, তখন সে স্থানীয় অধিবাসীদের উপরে; ব্যারোমিটারে যখন ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন সে বাধ্য হয়েই স্থানীয় অধিবাসীদের সুনির্দিষ্ট পদমর্যাদাকে ঈর্ষা করে।

মোটামুটি বলতে গেলে, ফরাসী বিপ্লবের সূত্রপাতের সময় পাশ্চাত্য জগতের ইহুদীদের বন্ধন-শৃঙ্খল খুলে ফেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল; সে যে-স্বাধীনতা ভোগ করুক, সেটা ছিল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের পর ইতিহাসে যে উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তারই একটা অংশবিশেষ। আমার মনে হয় কেউ যদি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে দীর্ঘ বিপর্যয়ের ইতিহাস পড়ে তবে এ বিষয়ে তার দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে পারে না যে আভিজাত্য-জনিত বিশেষ সুবিধা, ব্যবসায়িক নিয়ন্ত্রণ, ধর্মসম্বন্ধীয় কুসংস্কার কিংবা জাতীয় আত্মকেন্দ্রিকতা প্রভৃতি যে-সব শক্তি ইহুদীদের মুক্তিকে বাধা দিতে চেয়েছিল, তারা ছিল সেই সংকীর্ণ শৃঙ্খলাবিধানের নিত্য উপাদান—যাকে ফরাসী বিপ্লবের বন্যা ধ্বংস করতে চেয়েছিল। যে গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণে মানুষ কুলশীল ধর্ম-বিচার না করে

নিজেকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, ইহুদীদের মুক্তি ছিল তারই অংশ বিশেষ। যতদিন পর্যন্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণের অনুকূল ছিল, ততদিন ইহুদীদের অধিকার সংরক্ষণ সভ্যতার অঙ্গবিশেষ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু যখনই গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণের গতি থেমে গিয়েছিল, তখন প্রথম কুঠারাঘাত পড়েছিল এই নীতির প্রচেষ্টার উপরে।

কাজেই এটা স্বাভাবিক যে এযুগে যখন সুবিধাবাদীর দল হিটলার-মুসোলিনির মত সভ্যতা বিরোধী লোক দিয়ে প্রতি-বিপ্লব করিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবের সাম্প্রসারণকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, তখন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে ইহুদীদের অধিকারগুলোকেই সর্বপ্রথমে বলি দিতে হবে। ব্রিটেন্ অ্যামেরিকা প্রভৃতি দেশের গণতান্ত্রিক মাটিতেও প্রতি-বিপ্লবের শক্তিগুলো আছে, তারা যে ইহুদী বিরোধের নামে স্বাধীন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে তারা লড়ছে, তার উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করাব চেষ্টা করবে, এটাও যথেষ্ট স্বাভাবিক।

এটাও স্বাভাবিক, যে-সব রাজনীতিবিদ্ এই আন্দোলন নেতৃত্ব করছে তারাও মৌখিক ছাড়া আর কোন ভিত্তির উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে এমন একটা প্রতীকের বিরুদ্ধে লড়তে পারে না; এই প্রতীকের দ্বারা যাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তারা অতীতের দীর্ঘ ইতিহাস এবং বর্তমানের আবেগ-প্রবণ প্রচারের সাহায্যে বুঝতে পেরেছে যে এই প্রতীকই হচ্ছে তাদের বিশেষ শত্রু।

ধনী ইহুদী গরীবদের শত্রু; গরীব ইহুদী ধনীর শত্রু। কৃষক ইহুদী ব্যবসায়ীর মধ্যে দেখতে পায় তার মূল্যের সমতা-রক্ষার আশঙ্কা। ব্যবসায়ী তার মধ্যে দেখতে পায় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি হিসেবে ইহুদীরা এমন সব অঞ্চল আক্রমণ করে যেখানে বিদেশীদের প্রভাব থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, সাহিত্য কিংবা শিল্পের জগতে ইহুদীরা সংস্কৃতিকে এমন সব ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত করে, যেগুলি তার নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত নীতির ফল নয়। ইহুদী যদি তার প্রাচীন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়, তবে সে খ্রীস্টীয় স্বপ্রকাশ নীতির সমস্ত বিরোধী; যদি সে তার প্রাচীন ধর্মকে অস্বীকার করে, তবে যে পার্থিবীকরণের বিরুদ্ধে সমস্ত খ্রীস্টান জগৎ সদা জাগ্রত, সে তারই প্রধান চর। যে-যুগে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কথা বলে স্বীকৃত গুণগুলোকে পুনর্মূল্য নির্ধারণ হচ্ছে, সে যুগে প্রত্যেকেরই ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু অভিযোগ করার মত আছেই। আইন্ হোক, কিংবা রীতির অনুশাসনেই হোক, অভিযোগকারীদের কাছে নতি স্বীকার করে, তাদের অনুভব করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সুযোগের দরজাগুলো আরও বেশী করে তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। ইহুদীরা নিঃসন্দেহে উচ্চৈস্বরে এবং আরও তিক্ততার সঙ্গে অভিযোগ করবে; কিন্তু তারা কখন অভিযোগ করে নি?

আমি যে বিষয়ে ওকালতি করছি সেটা অতি সরল; ইহুদী-নির্যাতনের সঙ্গে জনসাধারণের স্বার্থবিসর্জন বিজড়িত। ইহুদী-বিরোধী আন্দোলনের পতাকার পিছনে নিঃসন্দেহে একটা নানারঙের পোযাক পরা সৈন্যদল এগিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু যে-সেনাপতিরা এই সমর-কৌশল পরিচালনায় নিযুক্ত, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক সম্প্রসারণকে বাধা দেওয়া। যারা ইহুদীদের শত্রুদের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়, এ কথা না জানলেও তারা প্রতি-বিপ্লবের সঙ্গেই হাত মেলাতে চায়। প্রায় ক্ষেত্রেই এই প্রতিবিপ্লব যে অসংখ্য ছদ্মবেশ গ্রহণ করে, তার দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হ'ন। প্রায় ক্ষেত্রেই আবার তাদের ভ্রান্তি সাহায্য পায় সেই সব ইহুদীর ভীরুতার কাছ থেকে যারা সাময়িক নোঙর ফেলাকে নিরাপদ পোতাশ্রয় বলে মনে করে এবং আধুনিক রাজনীতিবিদ্‌রা অন্যায়ের সামনে যে মৌনতার ষড়যন্ত্রে নিপুণ, তাদের সেই কাজে প্রবৃত্ত করে।

তবে আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা অভ্রান্ত—ইহুদীর শত্রু সভ্যতারও শত্রু। যারা আজ ইহুদী-বিরোধী আন্দোলনগুলো সংগঠন করে, তারাই কাল স্বাধীনতার সাধারণ ভিত্তিকে আক্রমণ করবে। একটা জাতি নিজেদের বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন করার মতন ইহুদীদের স্বাধীনতার দাবীকে স্বীকৃতি দেয় কিনা তাই দিয়েই সে জাতির নৈতিক উচ্চতার মাপ করা হয়। জাতি যখন ইহুদীদের যন্ত্রণার সামনে চুপ করে থাকে, তখন সে জাতি তার নিজেরই ভবিষ্যৎ দাসত্ব সংগঠনে সহায়তা করে।

(দেশী পত্রিকা হইতে)

ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্যবাদের এক অধ্যায়

[বর্তমান প্রবন্ধটি 'মন্দিরা' নামক মাসিক পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যা থেকে সংকলিত।]

আধুনিক দুনিয়ার রাজনৈতিক আন্দোলন ও মতবাদ-গুলির মধ্যে 'সাম্যবাদ' বা 'সমাজতন্ত্র' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও সমাজতন্ত্র আপন ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে ছাড়ে নাই। 'সাম্যবাদ' বা 'সমাজতন্ত্র' সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই আমার প্রথমেই মনে পড়ে জনৈক আখ্যাতনামা লেখকের সেই উক্তিটি—"যেমন আকাশে অযুত তারা আছে, তেমনি পৃথিবীতে অযুত সমাজতন্ত্র।" ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও সমাজতন্ত্রের এই 'বহুরূপিতা'র কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তদুপরি ভারতের নিজস্ব ঐতিহাসিক ধারা ও জলবায়ুর গুণে এখানে সমাজতন্ত্রের গতি এবং প্রকৃতিটাও একটু বিচিত্র রকমেরই হইয়াছে বলিতে হইবে। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন পরিত্যাগের পর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাশ অবধি এই আট বৎসর কাল ভারতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি লক্ষ্য করিলেই একথার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে এই সময়টা গিয়াছে ভারতের প্রধানতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিকতার যুগ। এই সময়ের মধ্যে কংগ্রেস্ সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রের মধ্যেই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ পর্য্যন্ত করিয়া সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে আত্মীয়তার নিগড়ে বাঁধা পড়িয়াছিল।

১৯৩০-৩৩ সাল ছিল ভারতীয় রাজনীতির ঘোর আবর্ত্তের সময়। আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে তাহার প্রকাশ। যুবক ভারত স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের পীড়ন-নীতিই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হইল। বিপ্লবী আন্দোলন উচ্ছিন্ন হইল। গান্ধীজি রাজনীতি পরিহার করিলেন। তাঁহার হরিজন আন্দোলন ও পল্লীউন্নয়নের মধ্যে সেই পরাজয়েরই অভিব্যক্তি দেখা গেল। এই ব্যর্থতার অমানিশার মধ্যে ভারতীয় যুবকের আত্মা অধীর হইয়া একটা আশার আলোক খুঁজিতে লাগিল। তাহার দমিত কর্ম্মোন্মাদনাকে প্রধাবিত করার একটা পথ চাই। ঠিক এই সময়ে ভারতীয় যুবমন অধিকার করিয়া বসিল একটি অভিনব স্বপ্নকুহক।—'কোমিণ্টার্ণ' বা তৃতীয় (সাম্যবাদী) আন্তর্জাতিকের স্বপ্ন! 'রাশিয়া' 'রাশিয়া' করিয়া ভারতীয় যুবকবৃন্দ এবং রাজনৈতিক কর্ম্মিগণের কলকাকলীতে ভারতের গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

তারপর হইতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবি-সংবাদী নেতৃত্বে ভাঁটা পড়িল। 'গান্ধী ভাগো' আওয়াজ ভারতের আকাশে ধ্বনিত হইতে লাগিল। 'বন্দে মাতরম'কে ছাপাইয়া উঠিল 'ইনকিলাবে'র ধ্বনি। ভারতে বিশেষ করিয়া তরুণ সমাজের মধ্যে 'রাশিয়া' ও 'সাম্যবাদ' দিগ্বিজয় করিয়া চলিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে দেখা গেল যে ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভিতর ও বাহিরে, বারো আনাই "সাম্যবাদী"। সকলের মুখেই 'সাম্যবাদ' আর 'সমাজতন্ত্র'। তবে কেহ পুরা, কেহ বা আনা—কেহ সিকি—,আর কেহ বা দু' আনা সাম্যবাদী মাত্র। গান্ধীবাদের ভাঙা হাটে সমাজতন্ত্র তাহার আসর জমাইয়া বসিল। বলিতে কি, তাহাদের নিকট নিছক জাতীয়তাবাদ প্রগতিহীন এবং অপাংক্তেয় হইয়া উঠিল।

তারপর ইউরোপীয় রাজনীতে মহাযুদ্ধের ঘনঘটা আসিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অকস্মাৎ অশনি-পাতের ন্যায় যুদ্ধের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ভারতের সাম্যবাদ মার্কা দল-উপদলগুলি পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় নিজেদের মনোভাব নির্দ্ধারণে মনোযোগী হইল। 'রাশিয়া'র ভূত তখনো তাহাদের ছাড়ে নাই।

১৯৪১ সালের জুন মাস। হঠাৎ মহাযুদ্ধের পট পরিবর্ত্তন হইল। জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমণ করিয়া বসিল। বহু দেশের বিপ্লবী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানবেন্দ্রকে আমরা "সতেরো আনা সমাজতান্ত্রিক" বলিব—কারণ তার কমে তাঁর কৌলিন্যের মর্য্যাদা রক্ষা হইবে কেন? তিনি যুদ্ধের সূচনাতেই একটা দুঃসাহসের কাজ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান যুদ্ধটা গতবারের ন্যায়

আর "সাম্রাজ্যবাদী" যুদ্ধ মাত্র নহে, ইহা হইল সাম্যবাদ ও শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ শত্রু ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে 'গণতান্ত্রিক' দেশগুলির যুদ্ধ। অতএব শ্রমিক সমাজকে প্রাণপণ করিয়া এই "জন-যুদ্ধে" জয়লাভ করিতেই হইবে। পাঠক আজ ভাবিতেছেন ইহাতে আর নূতনত্ব কি আছে —এ রকম কথা তো দল বিশেষের মুখে আমরা অহরহই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, মানবেন্দ্র তাঁহার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টির জোরে যুদ্ধের সূচনাতেই এ কথা বলিয়াছিলেন। তখন কেহই তাঁহার কথাকে আমল দেয় নাই। পৌনে দুই বৎসর পরে যখন সত্য সত্যই নাৎসী জার্মানী "সাম্যবাদের খাস কেল্লা" সোবিয়েত ভূমি আক্রমণ করিল, তখন মানবেন্দ্র তাঁহার সুনিপুণ বিশ্লেষণ এবং সুপ্রমাণিত ভবিষ্যদৃষ্টির প্রশংসা পাইবার আশায় বলিলেন—"আমিত পূর্ব্বেই জানিতাম এইরূপ ঘটিবে। ১৯৩৯ সালেই বীজোনিহিত অঙ্কুরের মতই যুদ্ধের ফ্যাসিবাদ বনাম গণতন্ত্র এ রূপটি আমার চোখে ধরা পড়িয়াছিল—জার্ম্মানীর রাশিয়া আক্রমণে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় সেই সত্যরূপেরই প্রকাশমাত্র হইল।" কিন্তু হায়, এবারেও তাঁহার কথায় বড় একটা কেহ কর্ণপাত করিল না। সে যাহাই হউক, রুশজার্ম্মান যুদ্ধ ভারতের নকল "সাম্যবাদী"দেরই কিছু না কিছু নাড়া দিয়া গেল। যে সাম্রাজ্যবাদেরই বিরুদ্ধে তাঁহারা এতকাল 'ইনকিলাব' (বিপ্লব) করার কথা বলিয়া আসিয়াছেন, সেই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রেরণার মূল উৎস রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। "ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি" (তখন অবৈধ) খাস ব্রিটেন হইতে "সাম্যবাদের" পেটেণ্ট লইয়া কাজ করিতেছিলেন। * অতএব তাহাদিগকে আমরা "ষোল-আনা সাম্যবাদীর" গৌরব দিতে বাধ্য। এই ষোল আনা সাম্যবাদীরাও রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধ এবং ইঙ্গ-রুশ চুক্তির ফলে বেকায়দায় পড়িয়া গেলেন। এদিকে লণ্ডনের নির্দ্দেশের প্রতীক্ষায় মৌন হইয়া বসিয়া থাকাও চলে না, তাই তাঁহারা একদিকে সোবিয়েটের প্রতি নৈতিক ও যৎসামান্য আর্থিক সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার নীতি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু স্বভাবতঃই এবারে নীতিটা একটু দ্বিধাগ্রস্ত, পাদক্ষেপ সংশয়যুক্ত—তবু চলিতে হইবে, তাই তাঁহারা যা-হোক করিয়া চলিতে লাগিলেন। আর আর "সাম্যবাদীরা"—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী প্রমুখেরা —রাশিয়ার প্রতি নৈতিক সহানুভূতি দেখাইতে পশ্চাৎপদ হইলেন না—কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সম্বন্ধে দ্বিধাযুক্ত রহিলেন।

তারপর প্রায় ছয় মাস কাটিয়া গেল। ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে সহসা ইঙ্গ-রুশ চুক্তির মত আকস্মিকভাবে ভারতের "ষোল-আনা সাম্যবাদীরা" দল ঘোষণা করিলেন যে রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধটা "জন যুদ্ধে" পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এবার হইতে ভারতের কর্ত্তব্য শেষ রক্তবিন্দুটি দিয়া ফ্যাসিবাদকে প্রতিরোধ করা। পাঠক ভাবিতে পারেন, একথাটা রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের সুরুতেই না বলিয়া ছয় মাস কাল বিলম্ব হইল কেন? পাঠক ভুল বুঝিবেন না, ভারতের "ষোল-আনা সাম্যবাদীরা" বুদ্ধিবৃত্তিতে কাহারো চেয়ে হীন নহেন, —তাঁহাদের মস্তিষ্ক সঞ্চালনে দ্রুততার অভাবের জন্য নহে, যুদ্ধকালীন জলপথের নানা বিঘ্ন এড়াইয়া বিলাতের "কমরেড্‌দের" নির্দ্দেশ পৌঁছিতে অযথা বিলম্বের দরুণই নীতি-নির্দ্ধারণে তাঁহাদের এই ছয়মাস কাল বিলম্ব। যাই হোক, এবার হইতে সাম্রাজ্যবাদের "ইনকিলাবী" যোগাযোগ সুরু হইল।

ইতিমধ্যে জাপান ইঙ্গ-অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। অগ্রসরমান জাপানের বিজয়-অভিযান ভারতের মনোজগতে বিদ্যুৎ-স্ফুরণ করিয়া চলিয়াছে।

১৯৪২এর এপ্রিলমাস। স্বাধীনতার "নাড়ু" হাতে লইয়া স্বনামখ্যাত ক্রীপ্‌স্ সাহেব আসিলেন ভারতবর্ষকে যুদ্ধকার্য্যে প্রলোভিত করিবার জন্য। তিনি প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

১৯৪২এর আগষ্ট মাস। বোম্বাই কংগ্রেসে 'কুইট্

* এইখানটায় জানিয়া রাখা ভাল যে মস্কোর সঙ্গে ভারতের সহজ যোগসূত্র কোনকালেই নাই। ভারত ইংরাজের সাম্রাজ্য! অতএব ভারতে সাম্যবাদের ট্রেড মার্ক দেওয়ার অধিকারী ইংরেজ সাম্যবাদীরা। কোমিণ্টার্ণের এই ব্যবস্থা।

ইণ্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব পাশ হইল। নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইলেন। তারপর সুরু হইল ভারতব্যাপী "বিপ্লবী" আলোড়ন। সাম্যবাদী 'জনযোদ্ধাদে'র "জাপানকে রুখ্‌তে হবে" ধ্বনি তার মধ্যে কোথায় ডুবিয়া গেল।

এবার হইতে ভারতীয় রাজনীতি নতুন অঙ্কে প্রবেশ লাভ করিল। নিয়মতান্ত্রিকতার পথ-ভ্রষ্ট কংগ্রেস "বিদ্রোহী" হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। "ষোলআনা সাম্য-বাদীর" দল আত্মগুপ্তির কুহক কাটাইয়া রাজানুগ্রহে এবারে বৈধভাবে প্রকাশ্য রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু রাজার পারিষদ পদপ্রাপ্তির সৌভাগ্যটা অপূর্ণ রহিল।

কিন্তু সবচেয়ে পরিবর্ত্তন হইয়াছে পূর্ব্ব কথিত সেই আধুলি, সিকি ও দু'আনা সাম্যবাদীদের। কংগ্রেস সমাজ-তন্ত্রী দল এবং সাম্যবাদের ধ্বজাধারী অযুত দল উপদলের কথাই আমরা বলিতেছি। পাঠক ক্ষমা করিবেন, "ইহাদের সকলের নাম করিবার সাধ্য আমাদের নাই। ১৯৩৪-৩৯ সালের মধ্যে গান্ধীবাদের ভাটার সময়ে অল্পে অল্পে ইহারা রাশিয়ার রঙে রঙীন হইয়াছিলেন, তবে ষোল আনা নয়। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, নগরে, গ্রামে, হাটে, মাঠে, রেলস্টেশনে, কুলিবস্তীতে সর্ব্বত্রই ইহারা দৃষ্টিগোচর হইতেন। "ইহাদের নিশান ছিল লাল, ইহাদের আসনবসন সবই ছিল লাল। অন্ততঃ লালাভ-ত-বটেই! হাজারে হাজারে, লক্ষে লক্ষে ভারতকে ইহারা "সাম্যবাদের" কলতানে মুখ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জাতীয়তাবাদ ও গান্ধীবাদ ছিল ইহাদের চক্ষুশূল, নাসিকা কুঞ্চন-বিধান-কারী।

কিন্তু হায়, আজ ইহারা কোথায়? নবীন বর্ষার জল-ধারার ন্যায় 'জাতীয়তা' ও "গান্ধীবাদের" প্লাবনে ইহাদের ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে। ঘোর দুঃস্বপ্নের মত সমাজ-তন্ত্রের স্বপ্ন-কুহক তাঁহাদের কাটিয়া গিয়াছে। সমাজ-তন্ত্রের নামে আর তেমন করিয়া ইহারা মাতিয়া উঠেন না। জাতীয়তার নামে আর ততটা নাসিকা কুঞ্চিত করেন না। 'ইন্‌কিলাব' না বলিয়া 'বন্দেমাতরম্‌' বলিলে আজ আর ইহাদের নিকট জাতি-চ্যুত হওয়ার ভয় থাকে না।

১৯৪৩এর মে মাস। লাল মস্কো হইতে ঘোষণা হইল —"কোমিন্টার্ণ" ভাঙ্গিয়া দিতেছি। "স্বাধীন" দেশসমূহের সাম্যবাদী ভাইরা, রাজভক্ত প্রজা হইয়া তোমরা তোমাদের ফ্যাসি-শত্রু নিধনে মনোনিবেশ কর। সুদৃঢ় "জাতীয় ঐক্যের" ভিত্তিতে যুদ্ধ করিয়া সমরোত্তর সাম্যবাদী (!) ভবিষ্য সমাজ গড়িয়া তোল।"

এর পরে রাশিয়া ও সমাজতন্ত্রের শেষ স্বপ্ন-রেশটুকুও কাটিয়া গেল।—ভারতের "সমাজতন্ত্রীরা সব আজ গান্ধী-বাদের ভরা গাঙে। শুধু "ষোল আনা সাম্যবাদী" কম্যুনিষ্ট দল এবং "সতের আনা সাম্যবাদী মানবেন্দ্রের দলই এই জোয়ারের জল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আছেন। পরাধীন ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন ঠেকাইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুমূর্ষু ভারতবাসীর বুকের উপরে ভারতের সাম্যবাদীরা আজও ভারতের পথে পথে 'জাপানী দস্যুর" হাত হইতে ইংরাজের রাজ্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, হা মার্ক্‌স্‌! হা লেনিন!! হায় রে সমাজতন্ত্র!!!

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ব্রিটিশ রাজের হাতে স্বেচ্ছায় দাস-খত লিখিয়া দিবার জন্য যখন আর কেহই বড় অবশিষ্ট রহিলেন না, তখন এই "সাম্যবাদী"রাই" অগ্রসর হইয়া সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে স্বহস্তে তাঁহাদের "সাম্যবাদী" দাসখত লিখিয়া দিলেন।—ইতিহাস তাঁহাদের এই কীর্ত্তি-কাহিনী বড় যত্নে বুকে ধরিয়া রাখিবে!...

শাদা কালো

(উপন্যাস)

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নির্ম্মল বলল—"লোকটাকে যে ভালোই লেগে গেল রে।"

অসিত বলল—"তাই দূর থেকে দেখলে অনেক কিছুই শক্ করে যা কাছ থেকে দেখলে মনে হয় শুধু যে দুর্বোধ্য মনে হয় না তাই নয়—যেন সইতেও ভালো লাগে।—অন্তত রতিলালের সম্বন্ধে একথা আমার বেশি ক'রেই মনে হয়েছিল যদিও ওকে কতটুকুই বা আমি জেনেছি। কিন্তু যাক ওর কথা—রমার কথায়ই আসি ফিরে।

"বলেছি রমা আমার কাছে গান শেখা সুরু করেছিল। একটু হয়ত ভুল বলা হ'য়ে গেছে। কারণ গান শেখা বলতে যা বোঝায়—অর্থাৎ নমিতা কি মূর্চ্ছনা কি অমিতা যেভাবে আমার কাছে গানে তালিম নিত ও ঠিক সেভাবে শিখত না। কারণ গান ওর লক্ষ্য ছিল না—ছিল উপাসনার মন্ত্র, পূজার নৈবেদ্য। ওর আগে কাউকে আমি এভাবে গান শেখাই নি; যাকেই শিখিয়েছি প্রধানত গানের জন্যেই বটে—এমন কি ভজন কীর্ত্তনের বেলায়ও। কিন্তু ও গান শিখত গানের স্পন্দনে ওর হৃদয়ে ভক্তি জেগে উঠত ব'লে—গানের স্বরবিন্যাস বা সুরটি হয়ত ওর কাছে তৃষ্ণার জল ছিল ব'লে নয়। আমি ওকে গান শেখাতাম আরো এই জন্যেই, কেন না এ নতুন ধরণের দীক্ষা দেওয়ার মধ্য দিয়ে এর নতুন রসের স্বাদ পেতাম আমি। ও কখনো কোনো গানের সুর নিয়ে মন্তব্য করত না—উদ্ভাসিত হয়ে উঠত তার ভক্তিভাব নিয়ে। সুর ওর কমনীয়কণ্ঠে ফুলে উঠত সুন্দর হ'য়েই—কারণ বড় গায়িকা ও ছিল না বটে, কিন্তু কণ্ঠের স্বাভাবিক মাধুর্য ও কুমারী হৃদয়ের অনাবিল ভক্তি দুয়ে মিলে ওর গান ক'র তুলেছিল সত্যিই উপভোগ্য। একথা আবটাবাদের ওদের দুএকটি প্রতিবেশীর মুখেও শুনেছি। ওর গানে তারা অভক্ত হ'য়েও মুগ্ধ হ'ত। সুরের পথেই ও তাদের মন টানত একথা সত্য নয়। টানত ওর ভক্তির জাদুতে। সুরের চেয়ে যে ভক্তি কত বড় ওকে শেখাতে গিয়ে শিখলাম যেন নতুন ক'রে।

"আমার খুব আনন্দ হ'ত আমার নিজের এই বিচিত্র উপলব্ধিতে। বলতে কি, গানকে যে-ভাবে আমি দেখতে চেয়েছি বহুদিন থেকেই অথচ পারি নি কিছুতে—ওর মধ্যে দেখতাম সেই ভাবেরই সরল ধারা ঝ'রে পড়ছে ঝর্ণার মতন সহজ উৎসারে। গানের মধ্যে দিয়ে সুরের তরল স্রোত ওর মনকে তেমনি সহজে নিয়ে যেত ভক্তির মোহনায় যেমন সহজে বরফ-গলা স্রোতস্বিনীর সহজ বেগ নিয়ে যায় তাকে নীল সমুদ্রের কোলে।

"দাদু এটা দেখে বড় খুসি। উনি তো এই-ই চাই-ছিলেন—রমার এম্‌নি একজন সাথী। বলতেন প্রায়ই হাসিমুখে 'বেঁচে থাকো দাদা, বেঁচে থাকো। ভক্তিমন্ত্রকে যে বাঁচায় তারই ভক্তিদীক্ষা সার্থক। গুরুবল তোমার সার্থক হয়েছে ইতিমধ্যেই পরে হবে তার জয়জয়কার, দেখে নিও।'

'কী যে বলেন দাদু!'

'না দাদা, কম্‌প্লিমেন্ট দেবার পাত্র আর যিনিই হোন্ তোমার শ্রীমৎ দাদু স্বামী নন। তার জন্যে যেও তোমার অন্য ফ্যান-দের কাছে। আমি যে অনুভব করেছি তোমার মধ্যে তোমার গুরুদেবের শক্তি।'

'করেছেন সত্যি।'

'নৈলে কি তোমায় ভাবতাম দাদা? মনে নেই মহাভারতে কৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পরে অর্জ্জুনের সেই

গাণ্ডীব তুলতে না পারা? গুরুচরণে যাদের ভক্তি সহজ তাদের ক্ষেত্রে এম্‌নিই হয়। তাদের মধ্যে যে-শক্তি কাজ করে সে তাদের নিজস্ব মূলধন নয়—ধার করা—অথচ এই ঋণই সব চেয়ে বড় সম্পদ্ জীবনে। এমন কি দানের মহিমার চেয়েও এই ঋণের মহিমা বেশি। মনে পড়ে না পরমহংসদেবের উপমা—মা রাশ ঠেলে দিচ্ছেন যে কথামৃত ফুরুবে কী দুঃখে?'

"আমি এধরণের কথায় যতই কুণ্ঠিত বোধ করতাম রমা ততই হ'য়ে উঠত প্রসন্ন। দুষ্টুমির ভাব ওর মধ্যে খুব কমই ছিল। কেবল এই ধরণের আলোচনাতেই সে উঠত জেগে। বলত আমাকে 'আহা এ-ও বোঝেন না দাদু! দাদা ওরকম ক্ষেত্রে না না না না করেন আপনি আরো হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ করবেন এই আশায়ই তো।'

নির্মল বলল—"আর রূপচাঁদ? সে বেচারি বুঝি র'য়ে গেল বাইরের দেউড়িতেই!

অসিত বলল—"না। তবে ঠিক অন্তরঙ্গভাবে অন্দর মহলে ঢুকতে পাননি। কারণ চান নি।"

প্রমীলা বলল—"চান নি?"

অসিত বলল—"ওরে দিদি। দরদী হবার একটা দায়িত্বও যে আছে একথা যে ঠেকেছে সে-ই শিখেছে। রূপকাকা বেশিক্ষণ সইতে পারতেন না ধর্মের প্রসঙ্গ যদিও ক্রমশ তাঁরও বদল হচ্ছিল একটু একটু ক'রে। মানে তিনিও যোগ দিতেন দাদুর শাস্ত্রপাঠনের সময়ে—আমাদের ধর্ম দিয়ে আলাপ আলোচনার সময়ে কিন্তু যেন দায়ে-সারা ভাবে। কেবল গানের আসরে তিনি দিতেন সাড়া—সহজেই। আর মনে হয় এই পথেই ধীরে ধীরে ভক্তির রস তাঁর অন্তরে ঠাঁই ক'রে নিল—অজান্তে। তাই রমাকে যখন আমি কীর্তন বা স্তোত্র শেখাতাম তিনি হাজিরি দিতে ভুলতেন না। থেকে থেকে রমার মুখে আমার সুরভঙ্গির এক একটা মিড়ে বা তানে উঠতেন আহা আহা ক'রে। দাদুর একটা হাসিভরা কথা মনে পড়ে: যে গান হ'ল ঘরশত্রু বিভীষণ—নাস্তিকের কাছে।"

প্রমীলা বলল—"কিন্তু তোমার রূপকাকাকে কি নাস্তিক বলবে?"

অসিত বলল—"দাদু বলতেন প্রথম প্রথম ওধরণের সকাল সন্দে একটু আধটু সন্ধ্যা আহ্নিক ও হ'ল নাস্তিক-তারই দাড়ি কামানো। দাড়িটা বেশি উগ্র হ'লে চোখে পড়ে ব'লেই একটু মনোরম ক'রে নেওয়া আর কি—ও হ'ল একটু আধটু বুড়ি ছুঁয়ে রাখা—শ্যাম কুল দুই-ই বজায় রাখার চতুরালি। ওধরণের কত ঠাট্টা যে করতেন তিনি বন্ধুর সাম্‌নেই। রূপকাকা প্রতিবাদ করতেন কদাচ, হাসতেনই বেশি, তাও মৃদু হাসি। কেননা লোকটি স্বভাবে তার্কিক ছিলেন না। কর্মিষ্ঠ প্র্যাকটিকাল মানুষ কথার রাজ্যে ওঁকে কেমন যেন পরদেশী মনে হ'ত। কিন্তু তবু মনে হ'ত—এসব তিনি শুনতেন বেশ মন দিয়েই। দুঃখ পেয়ে আরো যেন বুঝতে চাইতেন—বিশেষ ক'রে মেয়ের জন্যে—কী সে ভাব যার জন্যে সংসার স্বামী সম্পত্তি পিতৃস্নেহ সবই ওর কাছে ভরা যৌবনেও হ'য়ে গেল অবান্তর। হয়ত বা নিছক কৌতূহল—জোর ক'রে কিছু বলা চলে না। কিন্তু সে যাই হোক্ আমাদের ধর্ম ধ্যান পাঠ ইত্যাদির আসরে উনি ক্রমশ শ্রদ্ধা নিয়েই যোগ দেওয়া সুরু করলেন এতে আমরা সবাই পুলকিত হ'য়ে উঠলাম। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যেন বেশ একটু রস পেতে সুরু করলেন। তখন দাদুই ফের ওঁকে দিলাশা দিয়ে বলতেন; 'সাবাস ভায়া সাবাস। এ যেন অজামিলের নারায়ণ নামে ছেলেকে ডাকতে না ডাকতে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি। একদিকে এমন মৈত্রেয়ী কন্যা অন্যদিকে তার গুণী ভক্ত গীতিগুরু। হবে না কেন?'

"এতে অবশ্য আমিই বেশি বিব্রতও বোধ করতাম। কিন্তু এর একটা সুফল ফলল এই যে এ ধরণের ঠাট্টা তামাশার ফলেই রূপকাকার ভয়টা কাটল। ওঁর ধারণা ছিল ধর্ম বুঝি একটা দারুণ নীরস দাড়িনাড়া কর্তব্যের দেনা শোধ করা—সাংঘাতিক গুরুগম্ভীর গবেষণা। কিন্তু এইভাবে একটা সহজ সরল গীতিপ্রফুল্ল রসস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তিনি যেন আশ্বস্ত হ'য়ে উঠলেন—যার ফলে তাঁর বদল সুরু হ'ল একটু একটু ক'রে। আর সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ভালো হচ্ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে—মানে মাস দেড়েক বাদে—হঠাৎ ফের রতিলাল—একেবারে সটাং আমার ঘরে। সকালবেলা উঠে রমা আমি ও দাদু ধ্যানে বসেছি—একেবারে ওর অভ্যুদয়।

"আমি ভাবতেও পারিনি। ভেবেছিলাম চাকরবাকর কেউ বুঝি। তাই দোরে টোকা শুনে যেই বলেছি 'আও ভিতর!' ও'মা! দেখি একবারে 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।'

"রমার স্নিগ্ধ কোমল মুখের সে—পরিবর্তন আমি ভুলব না। উঠে দাঁড়াল—কিন্তু মুখ ফিরিয়ে—শক্ত হ'য়ে একেবারে ঘরের কোণে আশ্রয়। দাদু ব'সেই রইলেন। আমি উঠে বললাম—'ব্যাপার কী রতিলাল?'

"রতিলাল বলল—আশ্রম থেকে কে না কি লাহোরে ওরই এক বন্ধুকে লিখেছে যে রমা আশ্রমে এল ব'লে।

আমি বললাম 'সে কি? কে লিখল?'

রতিলাল বলল 'নাম করা যায়। তবে লিখেছে আপনি ওকে আশ্রমে নিয়ে যাবার জন্যে যোগটোগ ছেড়ে এখানে র'য়ে গেছেন।'

দাদু বললেন: 'তাই বুঝি তোমার এই ঘরে রইতে নারি সই অবস্থা?'

রতিলাল রাগ চেপে বলল—'আমার অবস্থার কথা থাকুক। আমি জানতে এসেছি কথাটা সত্যি কি না।'

"রমা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়ালো, বলল তীক্ষ্ণকণ্ঠে—কোন্ অধিকারে?"

"রতিলাল কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকালো বলল 'মানে?'

রমা বলল: 'অসিদাকে জেরা করতে এসেছ কোন আইনের অধিকারে? এবার মানেটা বুঝতে পেরেছ কি?'

আমি রমাকে শান্ত হ'তে ব'লে রতিলালের দিকে তাকিয়ে বললাম 'বোসো না। দাঁড়িয়ে কেন!'

ও বসল না, বলল, 'আপনি বরং আসুন আমার ওখানে একবার।'

রমা বলল: 'না।'

রতিলাল বলল: 'কেন?'

রমা বলল: 'আমার সম্বন্ধে আলোচনা আমার সাক্ষাতেই হোক—আমার ইচ্ছে।'

আমি ওকে আদর ক'রে বললাম—এমন করে না দিদি ছি। ও যখন বলছে—'

"রমা আরো শক্ত হ'য়ে বলল: 'না অসিদা। চায় এতটুকু বিশ্বাস নেই আমার ওপর—কে কাকে কী লিখেছে সেই জন্যে যে ছুটে আসে তদন্ত করতে তার সঙ্গে আমার অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হয় এ আমি চাই না।'

"দাদু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন: 'অত ক্ষেপতে নেই ক্ষেপী। শোন্ বলি—'

'কেন নেই দাদু? আমি কি ওকে কথা দিই নি যে এক বছর যাব না কোনো আশ্রমে—থাকব এই আবটাবাদেই? আমার কথার উপর যার এতটুকু শ্রদ্ধা নেই তার স্বামিত্বের দাবিতে আমিই বা শ্রদ্ধা করব কিসের জন্যে? না অসিদা, আমার মাথার দিব্যি রইল—যদি এর পরেও ওর ওখানে যাও তুমি, আমার মরামুখ দেখবে।'

"দাদু আরো ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন: "কি যে বলে পাগলি মেয়ে!'

পাগলি টাগলি নয়। কথা যা হবার এখানেই হবে—আর কোথাও না।'

"রতিলাল রেগে উঠল এবার। 'এ আবদার নয় বলুন তো অসিদা?' বলল ও চড়া গলায়। 'আমার পারিবারিক কথা সব আলোচনা করতে হবে হাটের মাঝখানে?—To wash dirty linen in public?'

"ঠিক এই সময়ে রূপকাকা ফিরছিলেন বেড়িয়ে। আমার ঘরটা ছিল গেটের কাছেই—কাজেই ফিরতে হ'লে আমার জানলার ঠিক নিচে দিয়েই আসতে হয়। রতিলালের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনে বৃদ্ধ হন্তদন্ত হ'য়ে এসে হাজির। ঢুকেই রুষ্ট কণ্ঠে বললেন: একী ব্যাপার!'

"রতিলাল কোনোমতে শ্বশুরকে একটা প্রণাম ঠুকে বলল সুর নামিয়ে: 'আমি—মানে—'

"রূপকাকা শান্ত অথচ রুক্ষকণ্ঠে বললেন: 'To wash dirty linen in public কথাটা কানে গেল। ফের এই সব চাষাড়ে ভাষা?'

"ও লজ্জিত হ'য়ে বলল: 'আপনি কাছাকাছি ছিলেন জানতাম না।'

"রূপকাকা বললেন: 'কিন্তু আমি আমার বাড়ির কাছাকাছি থাকব না তো কি থাকব দ্বীপান্তরে?—কিন্তু মরুক গে—কী ব্যাপার শুনি—যার জন্যে সকাল বেলায় উঠেই হল্লা?'

"এবার দাদু ধরলেন তাঁর ধারালো ব্যঙ্গ, বললেন: 'ব্যাপার আর কিছুই নয় ভায়া, রতিলাল শুনেছে

কাকেন হরিতো কর্ণৌ তস্মাদ্ধি পরিবেদনা—কাজেই ডাকছে: কুত্র গচ্ছসি পাষণ্ড! দেহি মে সম্পদং মম। ব্যাপারটা তো সহজ নয় ভায়া সাক্ষাৎ কান—পৈতৃক কান—হ'লই বা ঈষৎ লম্বা—কান তো।'

'রতিলাল ক্ষেপে উঠল, আমার দিকে ফিরে বলল: 'দেখলেন তো অসিদা, কেন আমি চাইছিলাম privacy? এই সব cranky fanaticদের সামনে কি কখনো কোনো serious আলোচনা সম্ভব?'

"দাদু হেসে বললেন: 'কী করবে ভায়া—যখন এমনি স্ত্রীভাগ্য নিয়ে জন্মেছ যে seriousদের কথায়ই হাসে আর crankদের কথায় কাঁদে। তবে আমি এখন প্রস্থান করি—তোমরা নিভৃতে করো চুটিয়ে গম্ভীরাত্মা আলোচনা।'

"রমা বাধা দিতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি ইঙ্গিত ক'রে বারণ করলাম। ও ঘুরে দাঁড়াল ফের দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে। দাদু বেরিয়ে গেলেন।

"রূপকাকা বললেন: 'আচ্ছা, শুনি এবার কী জন্যে তোমার ফের এত privacyর দরকার হ'ল।'

"রতিলাল নত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। অগত্যা আমিই কথা কইলাম, বললাম: 'ও শুনেছে কার কাছে যে আমি না কি রমাকে পটাচ্ছি আমাদের আশ্রমেই আশ্রয় নিতে। তাই ছুটে এসেছে।'

"রমা ফিরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল: 'এই লোকের হাতে তুমি আমাকে দিয়েছ বাবা—যে স্ত্রীকে নিজের তৈজস-অস্ত্রেরও অধম মনে করে।—'

"রতিলাল বলল: 'তার মানে?'

"রমা বলল: 'তৈজসপত্রকেও লোকে বিশ্বাস করে—আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না।'

"রতিলাল: 'কথাটা তুমি বুদ্ধিমতীর মতন বলো নি রমা, কারণ যাকে অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না তাকে বিশ্বাস করার কথা কেউ তোলে না। কিন্তু সে যাক্। আমি জানতে এসেছি অসিদা যদি তোমাকে নিয়ে যেতে না-ই চান তবে এতদিন এখানে কী করছেন আশ্রম ছেড়ে। —না অসিদা please don't take offence—আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি বলেছি আগেই। আমার শুধু ভয় পাচ্ছে আপনার প্রভাবে প'ড়ে ও রাতারাতি দৌড় দেয় আপনাদের আশ্রমে।'

"রমা তীব্র স্বরেই ব'লে উঠল: 'যখন আমার কথা দেওয়ার কোনো মূল্যই তোমার কাছে নেই তখন এসব আলোচনার কী মানে?—না বাবা, আপনাদের ও সব ইসারা আমার ভালো লাগে না—কেন আমি চুপ করব শুনি? কোন্ অধিকারে ও এ ভাবে চড়াও হয় আমাদের বাড়িতে?—তোমার চেক কি ও ভাঙায় নি?'

"রতিলাল বলল: 'তুমি কি ভাবো আমি টাকার জন্যে—'

"রূপকাকা বললেন: 'যাক এ বিশ্রী আলোচনা রতিলাল। এ সব তো চুকে বুকে গেছে। শোনো—আমি আর এসব সইতে পারছি নে। মিটমাটের চেষ্টা আমি যথেষ্ট করেছি। এখন তোমাকে বলছি কান দাও: তুমি যদি ভালোয় ভালোয় তোমার সব দাবি না ছাড়ো তো আমি যা পারি করব। শোনো এ বৃথা ভয় দেখানো নয়। তুমি জানো আমার ঐ মেয়ে বৈ কিছুই নেই, আর ওর সুখের জন্যেই তোমার চোখরাঙানি সয়ে এসেছি। কিন্তু ওকে যে ভগবান সংসারের জন্যে গড়েন নি তার অনেক প্রামাণই আমি পেয়েছি। আগেও এটা জানতাম —তবু জেগে ঘুমচ্ছিলাম। এখন ঘুম ভেঙেছে—চোখও ফুটেছে ভগবানের করুণায়। তাই আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি সাফ্ কথা—ও আশ্রমে যাবে, কি কৈলাসে যাবে, কি দিল্লি যাবে, কি মক্কা যাবে—সে নিয়ে কোনো জবাবদিহি ওর নেই কারুর কাছেই নেই—না আমার কাছেও না। মা আমার বহু কষ্ট পেয়েছে আমারই দোষে।—যে আমাদের থাকের মেয়ে নয় তাকে আমরা চেয়েছি আমাদেরই তাঁবে রাখতে। এ চাওয়া অন্যায়—পাপ—মহাপাপ—' বলতে বলতে বৃদ্ধ উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন।

রমা তাড়াতাড়ি ত্রস্ত হ'য়ে কাছে এসে বলল: 'লক্ষ্মীটি বাবা! তোমার হার্ট ভালো নয় লক্ষ্মীটি—তুমি অমন কোরো না।'

"বোধ হয় ও টের পেয়েছিল কিছু। কারণ এই ভাবে সান্ত্বনা দিতে যেই ও দৌড়ে এগিয়ে এসেছে বৃদ্ধ কেঁদে উঠলেন 'মা মা' বলে ঠিক শিশুর মত। ওর গলা জড়িয়ে ধরে ওর বুকে মাথা রেখে সে যে কী কান্না মিলি—ব'লে বোঝাতে পারব না। পাশের ঘর থেকে দাদু ছুটে এলেন কান্নার শব্দে। রমা কেঁদে বলল: 'দাদু, বাবার কী হ'ল দেখুন—কিছুতে বুঝছেন না। দেখুন দাদু—সামলান—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।'

"কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধের দম প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, ওঁর পা থর থর ক'রে কাঁপতে সুরু করেছে—আমি ও দাদু গিয়ে ধরতেই—'মা মা' করতে করতে টলে পড়লেন। রতিলালও এগিয়ে এল। কিন্তু রমা কঠোর ভাবে আঙুল দিয়ে ঘরের দোর দেখিয়ে বলল: 'আর একটিও কথা না।' রতিলাল মন্ত্রচালিতের মতন বেরিয়ে গেল। আমরা তখন ধরাধরি ক'রে রূপকাকাকে আমার বিছানায়ই শোয়ালাম। রমা বলল কেঁদে: 'ডাক্তার অসিদা!'

"আমি ছুটলাম ওদের মোটর নিয়ে সিভিল সার্জ্জনের বাড়ি।

* * *

প্রমীলা বলল: "কী কাণ্ড!"

অসিত বলল: "কিন্তু যা ঘটল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবার কথা নয় মিলি। কারণ ভেবে দেখ ব্যাপারটা ধর্মপরিণীতা বলছে স্বামীকে বেরিয়ে যেতে আর ধর্মেরই জোরে। সাধারণ পাতিব্রত্যে এটা অধম বটেই তো। কিন্তু সত্যিকারের ধর্মের কোঠায় কটা ছন্দই বা লোকাচারের চোখে ধর্ম ঠেকে? আশ্রমে গিয়ে এইটে আমি শিখেছি যেন নতুন ক'রে মিলি যে ধর্মের সঙ্গে যেখানে স্বার্থের সংঘাত সেখানে সত্যিকার ধর্ম প্রায়ই দাঁড়ায় না যদি কোনো মহাপুরুষের বা গুরুর আশ্রয় না পায়। আমি বলতে পারি রমা কিছুতে এ ভাবে রুখে উঠতে পারত না যদি না ওর বিশ্বাস হ'ত যে ও গুরুদেবের শরণাপন্ন হ'লে ও আশ্রয় পাবেই। কিন্তু এ সব মন্তব্য থাক। ফিরে আসি গল্পেরই কোঠায়।"

* * *

অসিত বলল: "সিভিল সার্জ্জন এসে বললেন মাথার একটা রক্তকোষ ছিঁড়ে গেছে। এ যাত্রা বাঁচাবার আশা আছে, তবে ভবিষ্যতে ফের এ রকম কোনো উত্তেজনা হ'লে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত।

"তারপর ভুলব না রমার সেই সেবা। যমে মানুষে টানাটানি। ওর সেই প্রার্থনা। সেই কান্না। ওর প্রতি স্নেহের আতিশয্যের দরুণই যে বাপের আজ এ-অবস্থা এ ও কিছুতে সইতে পারল না। মুহূর্ত্তে ওর মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কন্যা—স্নেহের দুলালী—সাধিকা গেল দূরে স'রে।

"দাদু বুঝতেন না এটা। সংসারের ছন্দ তাঁর কাছে একটু অচেনা মতনই হ'য়ে গিয়েছিল বহুদিনের বৈরাগ্যের ফলে। কাজেই রমাকে তিনিও বিচার করতে সুরু করলেন ঠিক এই সময়েই। ও তাতে দুঃখ পেত কিন্তু পারত না নিজের প্রার্থনার বা আচরণের ছন্দ বদ্‌লাতে। শেষে বলল: 'গুরুদেবকে লেখো অসিদা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি। বাবা এভাবে মারা গেল, আমিও বাঁচব না। সত্যি—আমিই তাঁকে মেরে ফেললাম!'

"কিছুতে ওকে বোঝাতে পারি না। আরো এই জন্যে যে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল তবু রূপকাকার জ্ঞান হয় না। কী করি তার করলাম গুরুদেবকে। পরদিনই যাদুর মোটরে এল ফুল। আমি সে-সময়ে ওদের নিয়ে এত ব্যস্ত যে আশ্রমের খবরটা পর্যন্ত নিতে পারলাম না।

"গুরুদেবের ফুল ঠেকালাম অচেতন মানুষটির মাথায়—পরে রাখলাম তাঁর বালিশের নিচে। আশ্চর্য, ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি চোখ চাইলেন। কিন্তু দেখা গেল একটি চোখ নষ্ট হ'য়ে গেছে। সিভিল সার্জ্জন মুখ মেঘলা ক'রে বলল: 'এ যাত্রা বেঁচে গেলেন বটে তবে—চোখ নষ্ট হ'য়ে যাওয়া সুলক্ষণ নয়।'

"সেটা আমরাও বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু বুঝে আর করছি কী? ঠায় অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর পথ ছিল না।

"যাহোক্ সাত আট দিন বাদে রূপচাঁদ পথ্য করলেন। দিন দশ-বার বাদে আস্তে আস্তে বেড়াতে সুরু করলেন। মাস খানেক পরে অনেকটা ধাতস্থ। অবশ্য একটি চোখ গেল চিরদিনের জন্যেই। কিন্তু আশ্চর্য সেজন্যে তাঁর বিশেষ কোনো খেদ দেখা গেল না। বরং কথাবার্তা ধরণধারণের মধ্যে দেখা দিল যেন এক নতুন শান্তির আভাস—নব তিতিক্ষার শক্তি। সে বড় সুন্দর মিলি! সেই resignation-এর ভাব। পুরো আত্মসমর্পণ নয় অবশ্য কিন্তু ওরই সগোত্র।

"এ পরিবর্তন ওর আসছিল এমনিই—ধীরে ধীরে। এই হঠাৎ অসুখের ফলে সেই পরিবর্তনের স্ফীতি যেন বেড়ে গেল। শক্ত অসুখের ফলে অনেক সময়ে গভীর একটা পরিবর্তন হয় অনেকের—এ আমি বহুবার দেখেছি—বিশেষ ক'রে আশ্রম-জীবনে। যার নির্ভরের ভাব আসছিল না তার আসে নির্ভরের শক্তি, যার মনে ভক্তির উদয় হচ্ছিল না কিছুতেই তার আসে ভক্তি, যার বিশ্বাসের অভাব তার আসে বিশ্বাস। আরও কত কী যে ঘটে অপ্রত্যাশিতভাবে। যেমন প্লাবনের প্রলয়ের পরে মাটির উর্বরতা বেড়ে যায় অনেকটা তেমনি। কিন্তু না—এরকম ক্ষেত্রে উপমা টুপমা কাজে আসে না বড় একটা। কারণ এ ধরণের ভূমিকম্পের পরে সারা সত্তায় জাগে যেন এক নবচেতনা—নতুন কোনো আবির্ভাবের স্পন্দন। রূপকাকার মধ্যেও তাই এল গভীর পরিবর্তন।"

নির্মল বলল—"রতিলালের কী হ'ল?"

অসিত বলল—"সে সেইদিনই ফিরে গেল কলকাতায়। যাবার সময়ে শুধু আমাকে বলে গেল একটা চিঠিতে যে ওর ভুল ও বুঝেছে—আর রমার উপর কোনো উপদ্রব করবে না কোনোদিনও। সে চিঠিটা আমার নেই। তবে তাতে ও লিখেছিল ওর অনুতাপের কথাই বেশি ক'রে। শেষে পুনশ্চের মধ্যে রমার কাছে ক্ষমাও চেয়েছিল। দাদু বললেন হেসে, কৃষ্ণের কাছে কুন্তীর স্তব মনে পড়ে দাদা—ভাগবতে।

> বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগৎগুরো
> ভবতো দর্শনং যৎ স্যাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্?

কী সুন্দর কথা দাদা! নয়? কী—না, প্রভু, বিপদই আসুক আমাদের বার বার—কারণ তোমার আবির্ভাব তো সম্পদের মাঝে নয়। অথচ দাদা, আমরা ভাবি তাঁকে পাব হেসেখেলে চারদিকে সুখের তাকিয়ায় ঠেশান দিয়ে। —তোমার মুখে ঐ গানটা আমার বড় ভাল লাগে। ঐ —কী যেন?—

> 'মোরা হৃদে না তোমারে বরি'
> বাহিয়া কুসুম-তরী
> চাহি নিয়তি তোমারে মা এড়ায়ে কাঁটায়—
> যাকে মেলে শুধু কাঁটাপথে প্রাণ সাধনায়!'

নির্মল বলল, "তা বুঝলাম তাই, কিন্তু তা ব'লে তো এর নাম 'সমাধান' দেওয়া চলে না। কী হ'ল ঐ মেয়েটার। বিয়ে-করা স্বামী ছাড়া যত সহজ চোখে-না-দেখা জগন্নাথকে ধরা যে তত সহজ নয় তা ত দেখাই গেল যখন বাপের অসুখ হ'তে না হ'তে ও করল কেঁদেকেটে কুরুক্ষেত্র।"

অসিত বলল "কথাটা তোর পুরো ঠিক হ'ল না নির্মল। কারণ পারিবারিক দুঃখে যে কেঁদে কেটে কুরুক্ষেত্র করে সে-ই তো আর পারমার্থিক সুখের শ্রীক্ষেত্র রচে না। তাছাড়া তুই ব্যাপারটাকে ঠিক ধরতে পারিস নি। ভগবানের পথে যখনই মানুষ একটু এগোয় বাধা আসে নানা দিক দিয়ে—যার আর্ষ নাম হ'ল কলির ছিদ্র-পথ। কলি সত্যিই খোঁজে এ-ছিদ্র ভাই—এটুকু আমি বলতে পারি বার বৎসর যৌগিক বনবাসে কাটানোর পর। রমার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতার পুনরুত্থান হ'ল সেটাকে তাই ব্যর্থতা বা পরাজয় বলা চলে না। কারণ ওর মধ্যেকার যে মানুষটা বাপের দুঃখে মমতার কান্নাকাটি সুরু করল সেই মানুষটাই কিন্তু শিবের কাছে কাঁদে নি 'সংসারদুঃখগহনা-জ্জগদীশ রক্ষ' ব'লে।"

প্রমীলা বলল—"কথাটা পরিষ্কার হ'ল না ভাই, কিছু মনে করো না। যে-ভালোবাসা আমরা প্রিয়জনকে দিই ঠিক সেই ভালোবাসাই ত দিই ভগবানকে?"

অসিত বলল :—"কথাটা পুরো সত্য নয় যদিও কিছু সত্য আছে এর মধ্যে। কিন্তু মিথ্যেটা মিশেল হ'য়ে দেখা দেয় এই জন্যে যে প্রিয়জনকে আমরা যে ভালোবাসা দিই

চার পেছনে সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে প্রতিদানের প্রত্যাশা থাকেই। কিন্তু ভগবানকে যে-ভালোবাসা দিতে হয় তার দীক্ষা এ নয়—মানে, সে চায় না কিছু তাঁর কাছে, চায় শুধু নিজেকে দিতে তাঁর পায়ে। সাংসারিক ভালোবাসায় প্রতিদান পাওয়া খুবই স্বাভাবিক—legitimate—এ ছন্দ সবাই মেনে নেয় এর উপরে কেউ-ই উঠতে পারে না ব'লে। কিন্তু ভগবানকে যখন ভালোবাসতে চাই তখন কী বলি? মনে পড়ে দাদুর কথা: 'দাদা ভাগবতে কি সাধে বলেছে—একান্তিনো যস্য ন কাঞ্চনার্থং বাঞ্ছান্তি যে বৈ ভগবৎ-প্রপন্নাঃ? ঐকান্তিক যাঁরা তাঁরা ভগবানের শরণাপন্ন হন শুধু তাঁরই জন্যে—কোনো বর পেতে নয়। আমি বলছি না এটা আমরা প্রথমেই পারি—এ হ'ল অহৈতুকী ভক্তি—ঐকান্তিকতার চরম ফল। আমার বলবার উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রপন্ন যাঁরা, তাঁদের আদর্শ এই-ই—কিন্তু সাংসারিক ভালোবাসায় অহৈতুকী প্রেম বড় জোর একটা কথার কথা—আদর্শের কোঠায়ও পড়ে না। রমার কাহিনী আর একটু শুনলেই এটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। শোন্।"

* * *

অসিত বলল: "রত্তিলালের অন্তর্ধানের পরই বাড়িতে শান্তি ফিরে এল। অবিশ্যি রূপকাকার অসুখের জন্যে সবারই মনে একটা উৎকণ্ঠা ছিলই—কিন্তু সে তো এধরণের অশান্তি নয়—তার মধ্যে মিশিয়ে ছিল একটা মমতার মাধুর্য। যতই বলি না কেন সাংসারিকতা আমাদের এখনো রক্তে মিশে। তাই দাদু 'মমেতি চ ভবেম্মৃত্যু' ব'লে শাসালে হবে কী—'আমার আমার ব'লে ডাকি আমার এও আমার তা' গাইতে দেহে মনে কে যেন আবীর দিয়ে রঙিয়ে দেয়। মমতা নিয়ে মোহ নিয়ে সত্য সাধনা হয় না—কিন্তু কাব্যসাধনা তো হয়ই। তাই যদিও এক্ষেত্রে হঠাৎ রমার মধ্যে অন্য এক রূপ দেখা দিল যার নাম দেওয়া যেতে পারে পারিবারিকতা তবু সেটার মধ্যে লাবণ্যের নির্যাস মেশানো ছিলই নানাভাবে, আর সে লাবণ্যের ছন্দ আমাদের কাছে বহুপরিচিত।

"কিন্তু মুস্কিল এই যে, এই যে লাবণ্যসম্ভোগ এরও দাম ওকেই দিতে হ'ত। কর্মফল এড়াবার জো নেই—এক করুণার জাদুতে এ অসম্ভব সম্ভব হয়—তবে সে করুণাও আসে বহু সাধনা সুকৃতির ফলে। কাজেই যতই ও ঝুঁকতে লাগল ওর বাপের দিকে ততই ওর মধ্যে ভগবৎভক্তির শিখা হ'য়ে আসতে লাগল নিভন্ত। দাদু সময়ে সময়ে খেদ করতেন। বলতেন: 'দাদা মনটা পালাই পালাই করছে যে ফের।' আমি বলতাম: 'না না—এসময়ে ও কে ছেড়ে যাবেন না দাদু লক্ষীটি। সংসার বুদ্ধি যখন ওকে টানবে তখনই ত চাই আপনার ওকে আরো জোর দেওয়া উল্টো দিকে। মমতার দুর্বলতা ত পেয়ে বসেই আমাদের দাদু, তাই ব'লে কি গুরু রাগ করেন, না হিতার্থী হ'য়ে ওঠে দুর্বাসা?'

(ক্রমশ)

নারীর অধিকার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী, বি-এল

কোন্ কবি যেন বলিয়াছেন: 'নামে কি করে, গোলাপে যে নামে ডাক সুধা বিতরে।' নাম সম্বন্ধে কবির এই আপ্তবাক্য গোলাপের বেলায় হয়ত: নির্ভুল ভাবেই প্রযোজ্য, কিন্তু শব্দব্রহ্ম নামের মাহাত্ম্য সত্যই বলিয়া শেষ করা যায় না। নাম-নামীর অভেদত্বকে শুধু ভক্তিপন্থাতেই নয়, বিপ্লবের পথেও মানুষ কাজে লাগাইয়াছে, নাম বদ্লাইয়া মানুষ বদ্লাইয়া ফেলিয়াছে গোটা জিনিষটাকেও। যে-বিপ্লবের ফলে মাতৃকুলাত্মক পরিবারের স্থলে পিতৃকুলাত্মক পরিবার গঠিত হইয়াছে সে বিপ্লবে নাম একটা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এই বিপ্লবের রূপ সম্বন্ধে যদিও কিছু জানা যায় না, তথাপি ইহা সত্য যে, এক গোষ্ঠীর লোকের সহিত আর এক গোষ্ঠীর লোকের বদ্লাবদ্লী না করিয়াই, যে যেখানে ছিল তাহাকে সেইখানে রাখিয়াই এই বিপ্লব সাধিত হওয়া সম্ভব হইয়া ছিল শুধু নাম-মহাত্ম্যে।

মাতৃকুলাত্মক পরিবারের যুগে পুত্রকন্যারা পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইত না, হইত মাতার গোষ্ঠীভুক্ত, মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীই তাহারা হইত, পিতার সম্পত্তি তাহারা পাইত না। উত্তরাধিকারের এই বিধান পরিবর্ত্তন করিয়া পুত্রকে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধীকারী করার জন্য এই নূতন বিধান করা হইল যে, গোষ্ঠীর পুরুষদের সন্তান-সন্ততিরা গোষ্ঠীর ভিতরেই থাকিবে, কিন্তু নারীদের সন্তান-সন্ততিরা গোষ্ঠীর বাহিরে চলিয়া যাইয়া পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইবে। এই নূতন বিধানের ফলে মাতৃপরম্পরা বংশধারা গণনা করার পদ্ধতি এবং মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার বিধান বাতিল হইয়া গেল, সুরু হইল পিতৃপরম্পরায় বংশধারা গণনা এবং পুত্র হইল পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

মাতৃকুলাত্মক পারিবারিক ব্যবস্থা যে বিধান মতে পিতৃকুলাত্মক পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইল তাহা আমাদের কাছে নূতনত্বহীন অর্থাৎ truism বলিয়া এই পরিবর্ত্তনটা অর্থহীন মনে হওয়া খুব স্বভাবিক। পিতৃ-কুলাত্মক পরিবারের সহিতই আমরা জন্মাবধি পরিচিত, উহার রীতিনীতিতেই আজন্ম আমরা অভ্যস্ত। আমরা দেখিতেছি, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যা পিতার গোষ্ঠী-ভুক্তই থাকে আর বিবাহের পর হয় তাহার স্বামীর গোষ্ঠী-ভুক্ত। পুত্রবরাবরই পিতার গোষ্ঠীভুক্তই থাকে। সুতরাং পুত্রের অর্থাৎ পুরুষের সন্তানসন্ততিরা পিতার গোষ্ঠীভুক্তই হয় আর কন্যার অর্থাৎ নারীর সন্তান-সন্ততিরা তাহার (নারীর) পিতার গোষ্ঠীভুক্ত না হইয়া হয় তাহার (নারীর) স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত। কাজেই পরিবর্ত্তনটা কি হইল এবং কিরূপে হইল তাহা যদি আমরা সহজে না বুঝিতে পারি, তাহা হইলে দোষের কিছুই নাই। দ্বিতীয়তঃ পরিবারের অনুরূপ করিয়া যে গোষ্ঠী গঠিত হয় নাই, এ কথাটা আমাদের মনেই থাকে না। কারণ বর্ত্তমান যুগের সমাজ-বিন্যাসের ইউনিট (unit) হইল পরিবার। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় এই রকম পরিবারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এখনো প্রকৃতপক্ষে আইনের দৃষ্টিতে পরিবারের কোন অস্তিত্ব নাই। উত্তরাধিকারের জন্য আইন দেখে গোষ্ঠী অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের নৈকট্য, পরিবার নয়। নারীর উত্তরাধি-কারিত্বের মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'লিগেল ফিক্‌শনে' স্ত্রী স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও অর্থনৈতিক বিশেষ কারণে তাহাকে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা হইয়াছে। কিন্তু গোড়ায় স্ত্রীর এই অধিকার ছিল না। এখনও দেখা যায়, পিতা বর্ত্তমানে নিঃসন্তান পুত্র মরিয়া গেলে

পুত্রবধূ বিবাহের মন্ত্রের জোরে শ্বশুরের গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। বিধবা পুত্রবধূকে ভরণপোষণ করিতে শ্বশুরকে আইনতঃ বাধ্য করিবার কোন উপায় নাই, উহা শুধু তাহার নৈতিক দায়িত্ব—জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে যে নৈতিক দায়িত্ব অর্থহীন, মূল্যহীন, শুধু পোষাকী কথা। আমরা প্রসঙ্গ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এবার আসল কথায় আমাদের ফিরিতে হইবে।

গোষ্ঠীর পুরুষদের সন্তান-সন্ততিরা গোষ্ঠীর ভিতর থাকিবে আর নারীদের সন্তান-সন্ততিরা তাহাদের (নারীদের) স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত হইবে, এই বিধানের ফলে যে পরিবর্ত্তন হইল তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী ও পরিবার সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।* আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের শুধু একদম্পতি পরিবারের (monogamous family) অভিজ্ঞতাই আছে। কিন্তু গোত্র-পরিবার হইতেই ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে বর্ত্তমান একদম্পতি পরিবার গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পরিবার বিগ্রহবান্—আমাদের প্রত্যক্ষ দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু গোষ্ঠী ঠিক তেমন প্রত্যক্ষ-দর্শনযোগ্য বিগ্রহবান্ বস্তু নয়—রক্তের সম্পর্কের ভিতর দিয়া গোষ্ঠীর পরিচয় আমাদের পাইতে হয়। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, গোষ্ঠীর সদৃশ করিয়া পরিবার গঠিত হয় না, কিম্বা পরিবারের সদৃশ হইয়া গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে নাই। আমাদের দেশে 'রক্তের টান' ও 'নাড়ীর বন্ধন' বলিয়া দুইটি কথা আছে। বর্ত্তমান পিতৃকুলাত্মক গোষ্ঠীর পরিচয়ের মধ্যে শুধু রক্তের টানেরই সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের টান ও নাড়ীর বন্ধন দুইয়েরই পরিচয় পাওয়া যাইত।

পরিবার হইতেই গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। আদিতে এক কৌমের অর্থাৎ এক tribe-এর সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়াই ছিল এক পরিবার। এই পরিবার প্রতিষ্ঠিত ছিল আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থার উপর। বংশপরম্পরা গণনা করা হইত মাতার দিক দিয়া, মাতার পরিচয়ই ছিল মানুষের পরিচয়। বর্ত্তমান যুগে মানুষ আত্মপরিচয় দিতে যাইয়া বলে পিতার নাম, পিতার পিতার নাম, এবং পিতা-মহের পিতার নাম। মাতৃকুলাত্মক পরিবারের যুগে পরিচয় দিতে হইলে লোকে বলিত মায়ের নাম, মায়ের মায়ের নাম এবং মাতামহীর মায়ের নাম। অর্থাৎ কোনও এক পূর্ব্বপুরুষ মাতা হইতে (ancestral mother) মানুষ নিজের পরিচয় দিত, বংশের পরিচয় দিত। পিতৃকুলাত্মক পরিবার ও গোষ্ঠীর প্রচলন হওয়ার পরেও মানুষ অনেক দিন পর্য্যন্ত পিতার নামের সঙ্গে মায়ের নামও বলিত। যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন শুধু পাণ্ডবই নন, কৌন্তেয়ও বটেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় শুধু বাসুদেব নয়, তিনি দেবকীনন্দন। পিতৃকুলাত্মক পরিবারের যুগেও কখন কখন পিতার পরিচয় না হইলেও কোন ক্ষতি হইত না দেখা গিয়াছে। বল-রামকে আমরা রোহিণী-নন্দন বলিয়াই জানি, তাহার পিতৃপরিচয় কোথাও নাই।

এক কৌমের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া ছিল এক পরিবার বা এক গৃহস্থালী। নূতন নূতন শিশুর আগমনে লোক-সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হওয়ায় এই গৃহস্থালীতে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। এক গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া হইল দুই গৃহস্থালী। কিন্তু কে কোন্ গৃহস্থালীতে যাইবে তাহা স্থির হইয়াছিল কিরূপে? খাম-খেয়ালী মতে যে হয় নাই, তাহা ঠিক। যাহার যে গৃহস্থালীতে ইচ্ছা সেই গৃহস্থালীতে গিয়াছে, তাহাও নয়। একটা বিধান অনুযায়ী এই বিভাগ করা হইয়াছিল। এই বিধানটা পাওয়া গিয়াছিল হাতের কাছেই।

এক কৌমের সব স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া যখন এক গৃহস্থালী বা এক পরিবার ছিল, তখন ছিল সমষ্টি বা যৌথ-বিবাহের যুগ। এই যৌথ বিবাহের কি রূপ ছিল তাহা গত মাসে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখা দরকার, এই সমষ্টি-

---

* কোন কোন পাঠক-পাঠিকা লেখকের বিরুদ্ধে অভি-যোগ করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশে মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও গোষ্ঠীর বিশদ পরিচয় দেওয়া হয় নাই। এই অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ নারীর অধিকারের আলোচনায় মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও গোষ্ঠীর সম্যক পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া কতকটা উহ্য রাখিতে হইয়াছে। তবে তাঁহাদের দাবী পূরণের জন্য মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও গোষ্ঠীর সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা এ মাসে করা হইল।

বিবাহের যুগে পারিবারিক সম্বন্ধের কি রূপ ছিল। তৎকালে পারিবারিক সম্বন্ধের ছিল ছয়টি রূপ: পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগ্নী। ভ্রাতাদের ও ভগ্নীদের পুত্রকন্যারা শুধু পরস্পরই ভ্রাতা ভগ্নী নয়, তাহারা তাহাদের মাতার, মায়ের ভগ্নীদের ও ভাইদের, পিতার এবং পিতার ভ্রাতাদের ও ভগ্নীদের যৌথ পুত্রকন্যা। অর্থাৎ মা, মাসী, পিসী সকলকেই তাহারা মা ডাকিত এবং পিতা, পিতৃব্য, মেসো এবং মাতুল সকলকেই ডাকিত বাবা। হাওয়াই দ্বীপের অসভ্যদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত থাকা দেখা গিয়াছে।* এই ডাক শুধু গ্রাম-সুবাদে দাদা, কাকা ডাকার মত অর্থহীন সম্বোধন ছিল না। মাতৃকুলাত্মক পরিবার বিলুপ্ত হওয়ার বহু পরেও ঐরূপ সম্বোধন একেবারে বিরল ছিল না। সংস্কৃত তাত শব্দের অর্থ পিতা। মহাভারতে দেখা যায়, যুধিষ্ঠির অনেক সময় ধৃতরাষ্ট্রকে তাত অথবা পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি সকলেই যখন কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, তখন যুধিষ্ঠির অন্ধরাজকে এই বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, "পিতঃ, আমি হতভাগ্য যুধিষ্ঠির।" যুধিষ্ঠির এবং ভীম উভয়েই গান্ধারীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন, "পাণ্ডবগণও তোমার পুত্র।" প্রথম বার পাশা খেলার পর ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে বর দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "পাঞ্চালী, তুমি আমার পুত্রবধূগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।" ভীষ্মপর্ব্বে আছে, ভীষ্মকে বধ করার কথায় অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন, "একদিন আমি তাঁহার (ভীষ্মের) কোলে উঠিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে কুলপ্রদীপ, আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা।' এইগুলি কি শুধু শিষ্টাচারবোধক সম্বোধন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও এই সম্বোধনগুলিই কোন শিষ্টাচারসম্মত হইল তাহার ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। রাজসাহী জেলার কোন কোন স্থানে 'বড় বাপ', 'মেজো বাপ' 'ছোট বাপ' ইত্যাদি ডাকিবার রীতি দেখা যায়। এই সম্বোধনগুলি কোন্ সুদূর অতীত যুগের পারিবারিক সম্বন্ধের ঐতিহাসিক চিহ্ন তাহা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।

সমষ্টি-বিবাহের যুগে পুরুষের ছিল বহু স্ত্রী এবং স্ত্রীলোকের ছিল বহু স্বামী—একই সঙ্গে বহু স্বামিত্ব এবং বহু পত্নিত্ব বর্ত্তমান ছিল এবং পুত্রকন্যারাও ছিল তাহাদের যৌথ পুত্রকন্যা। পরিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান একবিবাহাত্মক পরিবার (monogamous family) গড়িয়া উঠিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের প্রতি স্তরে পরিবারের সীমান্ত ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানের একদম্পতি পরিবারে পরিণত হইয়াছে। সমষ্টি-বিবাহ-পরিবারে এক মাতার গর্ভজাত পুত্রকন্যাদিগকে অন্যদের হইতে পৃথক করিয়া চিনিতে পারা যায়। সুতরাং মাতৃপরিচয় ছাড়া আর উপায় কি? প্রথমে যখন সহোদর এবং সহোদরার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, তখন ভগ্নীরা তাহাদের স্বামীদের লইয়া এক গৃহস্থালী পাতিল এবং ভ্রাতারা তাহাদের স্ত্রীদের লইয়া পাতিল আর এক গৃহস্থালী। ইহাকে আমরা বলিতে পারি পুনালুয়া পরিবারের আদি রূপ। অনেক রকম রূপ পুনালুয়া পরিবার গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ইহার স্বরূপ লক্ষণ দুইটি যাহা দ্বারা বিভিন্ন রূপ সত্বেও পুনালুয়া পরিবারকে চিনিতে পারা যায়। প্রথমতঃ পুনালুয়া পরিবারেও যৌথ স্বামী এবং যৌথ স্ত্রী আছে। দ্বিতীয়তঃ যৌথ স্ত্রীদের ভ্রাতারা আর স্বামী পর্য্যায়ভুক্ত নহে এবং যৌথ স্বামীদের ভগ্নীরাও আর পর্য্যায়ভুক্ত নহে। প্রথমে শুধু সহোদর ভগ্নী ও ভ্রাতা স্ত্রী ও স্বামীর পর্য্যায় হইতে বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী ভ্রাতারা ও ভগ্নীরাও বাদ পড়িতে লাগিল। ভ্রাতাভগ্নীর বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহাদের সন্তান-সন্ততিরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল; একশ্রেণীতে রহিল মাসতুত ও খুড়তুত ভাইবোন। ইহারা তখনো আপন ভাইবোন বলিয়াই গণ্য হইত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িল মামাত ও পিসতুত ভাইবোন। ইহারা আর আপন ভাইবোন বলিয়া গণ্য হইল না—মামাত, পিসতুত ভাইবোনই হইল তাহাদের পরিচয়। এই সর্ব্বপ্রথম ভাগিনা ভাগ্নী, ভাইপো, ভাইঝি সম্বন্ধের সৃষ্টি হইল। কিন্তু মাসতুত ও খুড়তুত ভাইবোনের সৃষ্টি তখনও হয় নাই—হওয়ার কোন উপায় ছিল না।

* F. Engels—Origin of the Family, p. 29.

আমরা দেখিলাম, এই যে নূতন পরিবার গঠিত হইল (ইহারই নাম পুনালুয়া পরিবার) এই পরিবারের সীমান্ত পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। ক্রমে যতই দূরবর্ত্তী রক্তের সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইতে লাগিল, ততই পরিবারের পরিধি ক্ষুদ্রতর হইয়া এমন অবস্থা হইল যে, তখন যুগল-বিবাহ (pairing marriage) ছাড়া আর বিবাহ হইবার উপায় রহিল না। এখন দেখা যাউক, পুনালুয়া পরিবার হইতে গোষ্ঠীর সৃষ্টি হইল কিরূপে! আমরা দেখিয়াছি, এক গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া যখন দুই গৃহস্থালী হইল, তখন যাহাদের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে না, তাহারাই দুই ভাগ হইয়া দুই গৃহস্থালীর গোড়াপত্তন করিল। ইহাদের মধ্যে অতি নিকট রক্তের সম্পর্ক বিদ্যমান বলিয়া পুনালুয়ার বিবাহে ইহারা স্বামী স্ত্রী হইতে পারে না। যে রক্তের সম্পর্কের নৈকট্যের জন্য বিবাহ হইতে পারে না তাহাই হইল গোষ্ঠীর ভিত্তি। 'বিবাহ হইতে পারে না' এই নেতিবোধক বাক্য 'রক্তের সম্পর্ক আছে' এই ইতিবোধক বাক্যের অপর একটি দিক মাত্র। কিন্তু আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুনালুয়া পরিবারও এক রকম যৌথ বিবাহের পরিবার কেবল উহার সীমান্ত পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হইয়াছে মাত্র। পুনালুয়া বিবাহে জাত পুত্রকন্যাদেরও পিতৃ-পরিচয় দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। শুধু কাহার গর্ভজাত সেই পরিচয় দেওয়াই সম্ভব ছিল। কাজেই রক্তের সম্পর্কের নৈকট্য ধরা হইত মায়ের দিক দিয়া। সুতরাং যাহাদিগকে কোনও এক পূর্ব্বপুরুষ মাতার বংশধর বলিয়া চিনিতে পারা যাইত তাহারা মিলিয়াই হইল এক গোষ্ঠী। ভ্রাতারা আর ভগ্নীদিগকে বিবাহ করিতে পারিত না, সন্তানের পিতৃপরিচয়ও জানা যায় না, এই অবস্থায় বংশধারার প্রত্যেক স্তরে কন্যাদের সন্তানদের মধ্যেই শুধু জ্ঞাতিত্ব সম্পর্ক থাকিত। পুত্রদের স্ত্রীরা ভিন্ন গোষ্ঠীর মেয়ে। কাজেই পুত্রদের সন্তানগণ আর তাহাদের (সন্তানদের) পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিত না, তাহারা হইত মায়ের গোষ্ঠীভুক্ত। পাঠক-পাঠিকারা হয়তঃ এখনও বলিবেন, 'কৈ মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও গোষ্ঠীর পরিচয় তো এখনও স্পষ্ট কিছু বোঝা গেল না?' এই স্পষ্ট না হওয়ার এক কারণ, আমাদের চিন্তাধারার প্রতিস্তরেই পরিচিত পিতৃপরম্পরা বংশধারা আসিয়া গোলমাল সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ পরিবার এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্বন্ধটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে নাই। তাহার কারণ, পরিবারকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, কিন্তু গোষ্ঠীকে রক্তের সম্পর্ক দিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। গোষ্ঠীর অনুরূপ করিয়া পরিবার গঠিত হয় না, হইতে পারে না। কারণ পরিবারের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর দুই ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক। পরিবারের অর্দ্ধেকটা স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত বাকী অর্দ্ধেক স্ত্রীর গোষ্ঠীভুক্ত। হিন্দু বিবাহে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত হয়—আসলে উহা একটা 'লিগেল ফিক্‌শান'—প্রকৃত কথা স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। পরিবার আসলে দোয়াঁশলা—অর্দ্ধনারীশ্বর। ব্যক্তিগত ব্যাপারে উহা যত মূল্যবানই হউক, আইনের চক্ষে এখনও উহা যে সমাজ-সংগঠনের ইউনিটরূপে গৃহীত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠীভুক্ত তাহারাই যাহারা তাহাদের নিজের বংশাবলী কোন এক পূর্ব্বপুরুষ মাতা হইতে গণনা করিতে পারে। তিন পুরুষের অধিক দূর যাওয়া আমাদের নিষ্প্রয়োজন। প্রথম পুরুষ মাতা, দ্বিতীয় পুরুষ কন্যা, তৃতীয় পুরুষ কন্যার কন্যা। মায়ের যে পুত্রকন্যা তাহারা মায়ের গোষ্ঠীভুক্ত। কন্যার পুত্রকন্যারাও মায়ের গোষ্ঠীভুক্ত, কিন্তু পুত্রের পুত্রকন্যা আর পুত্রের মাতার অর্থাৎ মাতামহীর গোষ্ঠীভুক্ত নহে। কাজেই ভ্রাতাভগ্নী পরস্পর এক গোষ্ঠীভুক্ত হইলেও, মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী গণনার নিয়মে ভ্রাতাভগ্নীর পুত্রকন্যারা আর এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। কাহা-দিগকে লইয়া এক গোষ্ঠী তাহা নির্ণয়করিবার একটা সূত্র আমরা খুঁজিয়া পাইলাম। আমরা এখন বলি, পিতার গোষ্ঠী, মাতুল-গোষ্ঠী। কিন্তু মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠীর যুগে পিতার গোষ্ঠী ও মাতুল-গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্ব ছিল না, বরং বলা যাইতে পারে মাতার গোষ্ঠী ও মাতুলানীর গোষ্ঠী।

এক কৌম ভাঙ্গিয়া প্রথমে হইল দুই গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর মধ্যে লোক বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই দুই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি আবার দুইভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি গোষ্ঠী হইল। মূল গোষ্ঠী তখন পরিণত হইল কুলে (phratry)। মাতৃ-পরম্পরা কে কোন্

গোষ্ঠির লোক তাহা আমরা খুঁজিয়া পাইবার পথ পাইয়াছি। সহোদর-সহোদরাগণ এক গোষ্ঠীভুক্ত, এখন যাহাদিগকে আমরা মাসতুত খুড়তুত ভাইবোন বলি তাহারাও এক গোষ্ঠীভুক্ত। এই কারণেই মাসতুত বোনদের পুত্রকন্যার মধ্যে অথবা ভাইদের পুত্রকন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু মামাত, পিসতুত ভাইবোনরা আর এক গোষ্ঠীভুক্ত নয়। এইজন্যই মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠীর যুগে মামাত-পিসতুত ভাইবোনের বিবাহ (cross-cousin marriage) হইত। কারণ তাহারা পরস্পর ভিন্ন গোষ্ঠীর লোক। পিতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহুদিন পর্য্যন্ত cross-cousin marrage বা মাতুল-কন্যা পিতৃস্বসৃ-পুত্রের বিবাহ প্রচলিত ছিল। মহাভারতে আমরা পাই—অর্জ্জুন মাতুল কন্যা সুভদ্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সহদেবেরও এক স্ত্রী ছিলেন তাঁহার মাতুল শল্যরাজের কন্যা। শাক্যসিংহের স্ত্রী গোপাও তাঁহার মাতুল-কন্যা। বৌধায়নের স্মৃতিতে এবং শুক্র-নীতিতে মাতুলকন্যা বিবাহের নিন্দা করা হইয়াছে। সুতরাং উহা যে এক কালে ব্যাপক ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মাদ্রাজে মাতুলকন্যা বিবাহ প্রশস্ত। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশের এবং কন্যা ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হইয়াছে—অর্থাৎ ভ্রাতা ও ভগ্নীর পৃথক গোষ্ঠী সৃষ্টি হইয়াছে। মহর্ষি অত্রির বংশোদ্ভব চন্দ্র-পুত্র বুধ ইলাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদু হইতেই যদুকুলের উৎপত্তি। ভোজ, অন্ধক, কুকুর ও বৃষ্ণি বংশের সকলেই যাদব অর্থাৎ এই চারিটি বংশ যযাতি-পুত্র যদু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই মূলতঃ যদুবংশের সন্তান। ভোজবংশীয় রাজা উগ্রসেনের কন্যা দেবকীকে বৃষ্ণিবংশের রাজা শূরসেনের পুত্র বসুদেব বিবাহ করেন। এই বসুদেবের পুত্রই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণও ভোজবংশীয় রাজা জরাসন্ধের ভ্রাতা ভীষ্মকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নির্জ্জান প্রেরণাতেই হউক, কিম্বা সজ্ঞান প্রচেষ্টার ফলেই হউক, ক্রমশঃ যখন দূরবর্ত্তী রক্তের সম্বন্ধের মধ্যেও বিবাহ নিষিদ্ধ হইল, যুগল-বিবাহের উদ্ভব তখনই সম্ভব হইয়াছে। যুগল-বিবাহে জাত সন্তানের পিতৃপরিচয় পাওয়া খুব সহজ। তখন মানব-সমাজে নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি হইল: জ্যাঠতুত, খুড়তুত ভাই, মাসতুত ভাই। কিন্তু তখনও মাতৃপরম্পরা সম্বন্ধই গোষ্ঠীর বন্ধন-সূত্র—মাতৃপরম্পরাই গোষ্ঠী গণনা করা হইত। সম্পত্তি গোষ্ঠীর বাহিরে যাইতে পারিত না। পরিবারের মধ্যে মাতা এক গোষ্ঠীর লোক এবং পিতা অন্য গোষ্ঠীর লোক এবং পরিবার ও গোষ্ঠী মাতৃকুলাত্মক বলিয়া পুত্রকন্যা মাতার গোষ্ঠীভুক্ত হইত, পিতা যে-গোষ্ঠীর সন্তান সে-গোষ্ঠীভুক্ত হইত না। পুত্রকন্যার পক্ষে পিতার সম্পত্তির অধিকারী হওয়ারও উপায় ছিল না। গত সংখ্যায় আমরা দেখিয়াছি, পুরুষ যখন যথেষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হইল, পুত্রকন্যাকে নিজের ঔরসজাত বলিয়া চিনিতে পারিল, তখন সে চেষ্টা করিতে লাগিল পুত্রকন্যাকে নিজের সম্পত্তির উত্তরাধীকারী করিতে। কিরূপে পুরুষ এই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করিল তাহা এমাসে প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। উপায়টি হইল এই যে, অতঃপর পুত্রকন্যারা মাতার গোষ্ঠীভুক্ত না হইয়া পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইবে। এই একটি বাক্যের পরিবর্ত্তন—পরিবার ও গোষ্ঠীর রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল। কিরূপে বদলাইল তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়া মাতৃকুলাত্মক পরিবার ও গোষ্ঠী সম্পর্কে নূতন করিয়া আবার কিছু আলোচনা করিতে হইয়াছে। এখন একটা দৃষ্টান্ত দিয়া পরিবর্ত্তনটা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মনে করুন: ক ও খ এক যুগল-বিবাহের দম্পতী—ক স্বামী এবং খ স্ত্রী। তাহাদের একটি পুত্র চ এবং একটি কন্যা ছ। ক এক গোষ্ঠীর লোক এবং খ অন্য গোষ্ঠীর। মাতৃকুলাত্মক ব্যবস্থায় পুত্র চ এবং কন্যা ছ মায়ের অর্থাৎ খ-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইবে। চ ও ছ বড় হইয়া বিবাহ করিলে —চ-এর স্ত্রী হইল ট এবং ছ-এর স্বামী হইল ঠ। কিন্তু চ এর পুত্রকন্যারা চ-এর পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইবে না, হইবে তাহাদের মা ট-এর গোষ্ঠীভুক্ত। আবার ছ-এর পুত্রকন্যারা তাহাদের পিতা ঠ-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইবে না, হইবে মাতা ছ-এর গোষ্ঠীভুক্ত অর্থাৎ মাতামহী খ-এর গোষ্ঠীভুক্ত। কারণ বংশধারা গণনা করা হয় মাতৃপরম্পরা। কাজেই ক-এর পুত্র-পৌত্রেরা ক-এর গোষ্ঠীভুক্ত না হইয়া খ-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইবে।

পুরুষেরা যখন নূতন বিধান প্রবর্তন করিল যে, অতঃপর পুরুষের পুত্র-কন্যারা তাহারই গোষ্ঠীভুক্ত হইবে এবং নারীর পুত্রকন্যারা হইবে নারীর স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত, তখন বংশ-পরম্পরা গণনার ধারাটাই একদম বদলাইয়া গেল। ফলে, ক-এর পুত্র চ ও কন্যা, ছ ক-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইল। চ-এর যে পুত্রকন্যা হইল তাহারাও তাহাদের পিতা চ-এর অর্থাৎ পিতামহ ক-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইল। কিন্তু কন্যা ছ-এর পুত্র-কন্যারা আর ছ-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইল না অর্থাৎ মাতামহী খ-এর গোষ্ঠীভুক্ত হইল না, হইল পিতা ঠ-এর গোষ্ঠীভুক্ত। সুতরাং পরিবার এবং গোষ্ঠী দুই-ই হইয়া গেল পিতৃকুলাত্মক। সুতরাং পুত্রকন্যা পিতার গোষ্ঠীভুক্ত হইল, হইল পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং বংশপরম্পরা পিতৃ অনুক্রমে গণনা করা ছাড়া আর উপায় রহিল না। সুসভ্য সমাজে এখন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। এই ব্যবস্থায় বিবাহের পর নারী পিতার গোষ্ঠী হইতে স্বামীর গোষ্ঠীভুক্ত হয়, নারী পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না, কারণ সম্পত্তি গোষ্ঠীর ভিতরেই থাকিবে।

নামের পরিবর্ত্তনে কি ভাবে বিপ্লব সাধিত হইল তাহা আমরা দেখিলাম। এই বিপ্লবের ফলে নারী তাহার সমস্ত অধিকার হারাইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত নারী তাহার সেই লুপ্ত অধিকার পুনরায় অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় নাই, সমস্ত নারী আন্দোলন সত্ত্বেও। কিন্তু এই বিপ্লবের ফলে নারী তাহার অধিকার হারাইল কিরূপে তাহা এখনও বলা হয় নাই। মাতৃকুলাত্মক ব্যবস্থার যুগেও স্ত্রী-পুরুষে শ্রম বিভাগ ছিল—উভয়ের শ্রমের ক্ষেত্র ছিল পৃথক। পুরুষ শিকার করিত, মাছ ধরিত, ফলমূল সংগ্রহ করিত, খাদ্য সংগ্রহের যন্ত্রপাতি যোগাড় করিত, প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ করিত। আর মেয়েরা গৃহস্থালী দেখিত, খাদ্য তৈয়ার ও বণ্টন করিত, কাপড় বুনিত, সেলাই করিত, শিশুসন্তানের লালন-পালন করিত। নারীর-শ্রমের ক্ষেত্রে নারীরই ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য, পুরুষের শ্রমের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল পুরুষের। গৃহে ছিল নারীর আধিপত্য, গৃহের বাহিরে ছিল পুরুষের। খাদ্য সংগ্রহের যন্ত্রপাতির মালিক ছিল পুরুষ, আর নারী ছিল গৃহস্থালীর আসবাবপত্র, বয়ন ও সেলাইর যন্ত্রপাতির মালিক। গৃহস্থালী ছিল যৌথ—শুধু একাধিক পরিবারেই নয়, এক সঙ্গে বহু পরিবার এক যৌথ গৃহস্থালীতে বাস করিত। পুরুষেরা যে-সকল খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিত, নারীরা যাহা তৈয়ার করিত তাহাতে গৃহস্থালীর নারী-পুরুষের সকলেরই ছিল সমান অধিকার। গৃহ, বাগান, ক্ষেত, খামার, নৌকা সকলই ছিল যৌথ সম্পত্তি। ব্যক্তিগত লাভ বা লোভের কোন ক্ষেত্র তখন ছিল। কেহই দরিদ্র ছিল না, কেহই অভাবগ্রস্ত ছিল না। এই যুগে নারীর যে কি গৌরব ছিল, কি পদমর্য্যাদা ছিল, কি অখণ্ড প্রতাপ ছিল তাহা আজ আমাদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব। আমেরিকার অসভ্যজাতি ইরোকুইসদের সেনেকা শাখার লোকদের মধ্যে 'আশার রাইট' (Ashur Wright) অনেকদিন পর্য্যন্ত মিশনারীর কাজ করিয়াছেন। ঐ সময় তাহাদের মধ্যে যুগল-বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তখনও ইরোকুইস সেনেকাদের মধ্যে নারীর অধিকার সম্বন্ধে 'আশার রাইট যাহা বলিয়াছেন মর্গ্যান তাহা তাঁহার পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখানে তাহার কিছু উল্লেখ করা গেল:

"Usually, the female portion ruled the house. . . . The stores were in common; but woe to the luckless husband or lover who was too shiftless to do his share of the providing. No matter how many children, or whatever goods he might have in the house, he might at any time be ordered to pick up his blanket and budge; and after such orders it would not be healthful for him to attmept to disobey. The house would be too hot for him; and. . . . he must retreat to his own clan (gens); or, as was often done, go and start a new matrimonial alliance in some other. The women were the great power among the clans (gens), as everywhere else. They did not hesitate, when occasion required, 'to knock off the horns,' as it was technically called, from the head of a chief, and send him back to the ranks of the warriors. (*Ancient Society*, p. 455).

নারীর শ্রমের ক্ষেত্র পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই রহিয়াছে, বরং ধনীগৃহে নারীর কোন শ্রমই করিতে হয় না, কিছু কিছু পোষাকী কাজ ছাড়া। তবে নারী তাহার অধিকার হইতে বিচ্যুত হইল কেন? মাতৃকুলাত্মক ব্যবস্থার যুগে গৃহস্থালীতে শুধু সাম্যবাদই ছিল না, গৃহস্থালীর নারীরা ছিল সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত, আর

পুরুষরা অর্থাৎ স্বামীরা আসিত বিভিন্ন গোষ্ঠী হইতে। এরূপ ক্ষেত্রে গৃহস্থালীতে নারীর আধিপত্য অপ্রতিহত হইবে ইহা খুব স্বাভাবিক। সমাজে নারীর কি পদমর্য্যাদা, তাহা দিয়া নারী-পুরুষের শ্রমবিভাগ নির্দ্ধারিত হয় না। সভ্যসমাজের ধনীশ্রেণীতে নারীদের কোন কাজ করিতে হয় না, কতরকম কৃত্রিম সম্মানের বোঝা তাহাদের ঘাড়ে চাপান হয়। কত ভাবেই না সভ্য ধনীশ্রেণী তাহাদের স্ব-শ্রেণীস্থ নারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নারীদেরও প্রসাধন এবং বিলাস-ব্যসনের অভাব নাই। তবু কি তাঁহারা তাঁহাদের হৃত অধিকার ফিরিয়া পাইয়াছেন। সভ্য-সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর নারীর মতই কি তাহারা এখনও তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াই রহেন নাই?

মাতৃকুলাত্মক পরিবারের যুগে নারীর সত্যিকার মর্য্যাদা এবং ক্ষমতার কারণ আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই মর্য্যাদা এবং ক্ষমতা কিরূপ ধ্বংস হইয়া পিতৃকুলাত্মক পরিবার প্রতিষ্ঠিত হইল? পরিবারের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে শ্রমের বিভাগদ্বারা তাহাদের সম্পত্তির বিভাগও নিয়ন্ত্রিত হইত। পরিবারের মধ্যে সেই শ্রমবিভাগ এখনও তাহাই রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও নারীর প্রাধান্যের পরিবর্ত্তে পুরুষ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ পরিবারে বাহিরে শ্রমবিভাগের বিপুল পরিবর্ত্তন। মানুষ যখন পশুপালন করিতে শিখিল তখন সামাজিক শ্রমের এক যুগান্তরকারী বিভাগ সৃষ্টি হইল—পশুপালনকারী মানব-কৌমগুলি শিকারী মানব-কৌমসমূহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গেল। পশু-পালনকারী জাতিগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইল, তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলিও হইল স্বতন্ত্র রকমের। দুধ, দুধ হইতে উৎপন্নদ্রব্য, মাংসের পর্য্যাপ্ত ও নিশ্চিন্ত সরবরাহ, পশুচর্ম্ম, পশুলোম হইতে উৎপন্ন কাপড় ইত্যাদি জীবিকা সম্বন্ধে তাহাদিগকে শুধু নিশ্চিন্তই করিল না, বিনিময়ের পথও খুলিয়া দিল। উৎপন্ন-দ্রব্যের বিভিন্নতা হইতেই বিনিময়-প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। সকলেরই উৎপন্নদ্রব্য একরকমের হইলে বিনিময়ের স্থল কোথায়? প্রথম বিনিময় হইত এক কৌমের সহিত আর এক কৌমের, বিনিময় কার্য্যসম্পন্ন হইত গোষ্ঠীপতির মারফৎ। ক্রমে বিনিময় প্রথায় দাঁড়াইয়া গেল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টিতে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও বিনিময় সুরু হইল।

পশুপালনের যুগেই শ্রমের আর এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি হইল। পশুর বংশ যত তাড়াতাড়ি বাড়ে মানুষের বংশ তত তাড়াতাড়ি বাড়ে না। অথচ বর্দ্ধিত পশুপাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোকও চাই বেশী। নূতন শ্রমশক্তির প্রয়োজন। যুদ্ধ হইতে এই শ্রমশক্তির যোগান পাওয়া গেল—যুদ্ধে বন্দীরা হইল ক্রীতদাস। সমাজে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি হইল প্রভু ও দাস, শোষক ও শোষিতের শ্রেণী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রীপুরুষের শ্রমবিভাগে নারীরা ছিল তাহাদের শ্রমের যন্ত্রপাতির মালিক এবং পুরুষরাও ছিল তাহাদের যন্ত্রপাতির মালিক। খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পুরুষের, কাজেই খাদ্যসংগ্রহ সংক্রান্ত যাহা কিছু সমস্তের মালিক পুরুষ. পশুপালনের যুগে পশুর মালিকও পুরুষ, ক্রীতদাসও পুরুষের সম্পত্তি। কিন্তু প্রথমে সবই ছিল গোষ্ঠীর সম্পত্তি। গোষ্ঠীর সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হইল কিরূপে তাহা জানা যায় না। তবে বর্ব্বরযুগের মধ্যভাগে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টিতে গৃহেও পুরুষের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। গৃহে যাহা ছিল নারীর প্রতিপত্তির কারণ—অর্থাৎ তাহার গৃহস্থালীর শ্রম—অতঃপর তাহাই হইয়া উঠিল পুরুষ প্রাধান্যের কারণ। কারণ খাদ্যসংগ্রহের কাছে সেই গৃহস্থালীর শ্রম তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইল—ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী দ্বারাও তাহা করাইয়া লওয়া যায়। পশুপালের বৃদ্ধি, ক্রীতদাসের সৃষ্টি এবং বিনিময়ের প্রসারের দ্বারা যে বাড়তি সম্পদ সৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহার মালিক পুরুষ। নারীরা এই সম্পদ ভোগ করিতে পাইল বটে, কিন্তু উহাতে তাহাদের কোন স্বত্বস্বামিত্ব ছিল না। এই অবস্থায় নারীর পক্ষে তাহার প্রাধান্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে ইহা আর বিচিত্র কি? দুর্দ্দান্ত শিকারী পুরুষরা গৃহে নারীর আধিপত্য মানিয়াই চলিত, গৃহস্থালীর ব্যাপারে গৌণস্থান লইয়াই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু শান্তপ্রকৃতির নিরিহ পশু-পালপতি ধনের উদ্ধত গর্ব্বে গৃহেও নারীর আসন পুরুষের

আসনের নীচে টানিয়া নামাইয়াছে। তাহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র বাধা অবশিষ্ট ছিল মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী ও পরিবার। কিন্তু ইতিমধ্যে যুগল বিবাহের প্রচলন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর পিতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী এবং পরিবার প্রতিষ্ঠা করিতে তাহার আর বেশী বেগ পাইতে হইল না, পুরুষের বিপুল অর্থনৈতিক শক্তির সম্মুখে মাতৃকুলাত্মক গোষ্ঠী স্রোতের তৃণের মতই ভাসিয়া গেল।

মাতার অধিকারের বিলুপ্তি যে সমগ্র নারীজাতির পরাজয় তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষ যখন অর্থনৈতিক শক্তির বলে গৃহেও কর্ত্তা হইয়া বসিল, তখন নারীর পক্ষে তাহার অধিকার ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হওয়া রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি। অবশ্য যুগল বিবাহ যতদিন নারীর এক বিবাহাত্মক পরিবারে পরিণত না হইয়াছে, ততদিন নারীর স্বাধীনতা অনেকটা অক্ষুণ্ণ ছিল। স্ত্রী এবং পুরুষ যে কেহ ইচ্ছা করিলেই এই যুগল বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিত। পিতৃকুলাত্মক পরিবার প্রচলিত হওয়ার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত যুগল-বিবাহের প্রচলন ছিল। মনুর পুত্র ইক্ষাকু হইতে সূর্য্য বংশের এবং কন্যা ইলা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি। চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি নৃপতির কন্যা মাধবী পর পর চারি বার বিবাহ করিয়াছিলেন। মাধবী প্রথম বিবাহ করেন ইক্ষাকু বংশের রাজা হর্য্যশ্বকে। এই বিবাহে মাধবীর একটি পুত্র হইয়াছিল। অতঃপর মাধবী এই বিবাহ ছিন্ন করিয়া কাশীরাজ দেবদাসকে বিবাহ করেন। এই বিবাহেও তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। কিছুদিন পর মাধবী এই বিবাহ ছিন্ন করিয়া রাজা উশীনরকে বিবাহ করিলে শিবি নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। কপোতের প্রাণ রক্ষার জন্য এই শিবি রাজাই আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রাজা উশীনরের সহিত বিবাহও মাধবী অবশেষে ছিন্ন করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই বিবাহেও মাধবীর একটি পুত্র হয়, কিন্তু মাধবী এই বিবাহও ছিন্ন করিলেন। তখন যযাতি নৃপতি কন্যা মাধবীকে পুনরায় বিবাহ দিবার জন্য স্বয়ম্বরের আয়োজন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মাধবী আর বিবাহ করেন নাই।* মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরাশর মুনির সহিত ধীবরকন্যা সত্যবতীর যুগল-বিবাহের সন্তান। রাজা শান্তনু পরে এই সত্যবতীকেই বিবাহ করিয়াছিলেন। যুগল বিবাহ অপ্রচলিত হওয়ার পরেও এই বিবাহ প্রথা একেবারে বন্ধ হয় নাই। বোধ হয় এইজন্যই মনুসংহিতায় 'সহোঢ়া' পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু পুরুষের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও নারীর অর্থনৈতিক অক্ষমতা মিলিয়া কালক্রমে নারীর একবিবাহাত্মক পরিবার-প্রথাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

* মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব

কবিতা

নিষ্প্রদীপ

বিমল ঘোষ

উদাস গম্ভীর রাত্রি নিরাশাব্যাকুল।
শঙ্কার মুখোস ঢাকা শহরের আলো,
সাবধানে জ্বলে দীপ স্তিমিত বিদ্যুৎ
ছায়াময় রহস্য অদ্ভুত—
অবরুদ্ধ ঘরে।
চিন্তাক্লিষ্ট অন্ধকার মাথার কোটরে—
জ্বলেছে কি দীপ?
জ্বলেছে কি জৈব দীপাধারে
ভবিষ্যের দীপ্ত স্বর্ণশিখা?

সুপ্তিলোকে কুয়াশায় নীরব শহর
পুলিস সিভিক্ গার্ড ঘোরে
রাতের পাহারা।
কোথা দীপ্ত ভবিষ্যৎ?
স্বপ্ন দেখে ঘুমন্ত জনতা।
অযুত ব্যর্থতা,
ক্ষণতৃপ্ত মানুষের উষ্ণতপ্ত শ্বাস
বিশ্বাস ও অবিশ্বাস
পাশাপাশি ঘুমে অচেতন।

ব্রহ্মবিহার

(বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনা)

অমল দত্ত

প্রাণপাতে রক্ষা করে যেমন জননী—
সন্তানের সর্বদুঃখ গ্লানি হয় দূর:
প্রেমের বন্ধনে সবে বাঁধিবে তেমনি।
সর্বকালে সর্বলোকে মিত্রতার সুর
তোমার যাত্রার পথে যেন ওঠে রণি,
বাধাহীন হিংসাহীন তব মনপুর
দয়ার মন্দির বাসে রবে সুরভিত—
সবাকার মৈত্রীভাব, কেহ নয় ভীত!

সংসারের প্রতি কর্মে, প্রতি অনুষ্ঠানে,
জীবনের প্রতিছন্দে, প্রতি চিন্তাধারে,
চলিতে, ফিরিতে, পথে, হাসি খেলা গানে,
আলাপে প্রলাপে, তাপে, সুখদুঃখ ভারে
প্রেমভাব রেখো মনে দিনান্তর দিন—
এ ব্রহ্মবিহার লভে—চিত্ত অমলিন।

জনতা

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে মনে হয়,
আমাকে কি ওরা উপষে মারবে?
আমাকে কি ওরা দলিত করবে নির্মম রোলারে
মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়
আমি কি মানুষ?

ঘন বনঝাউ বাতাসের দোলায় ওদিকে কাঁপে
শিউলির বনে আসে হাওয়ার জোয়ার
কনকচাঁপারা মাথা দোলায়।

কিন্তু এরা কী বাঁচ্‌তে দেবে আমায়?
কেবলি বলে, কাজ, কোথায় তোমার কাজ?
কী আশ্চর্য্য, কাজ ছাড়া কী আমার জীবনে
আর কিছুই নেই?
আমার কি ছুটীর আকাশ চিরকালই
থাকবে গম্ভীর?
আমার সাম্‌নে জনতা,
আমার পিছনে জনতা!
হে ঈশ্বর! আমি কি মানুষ?

উপেক্ষিতা উর্ম্মিলা

শ্রীঅমিয় বসু (কাশফুল)

নীরবে সহিলে কত না বেদনা
হে রাজকুলবালা
যেন, আরতির লাগি দেব-দেউলে
বৃথাই প্রদীপজ্বালা।
রাজপ্রাসাদের বাতায়ন-পথে চাহি
আঁখির যে জল ঝরালে কপোল বাহি
সরযুর ধারা কতটুকু তার নিয়েছে বহিয়া চঞ্চলা।
উর্ম্মিলা···উর্ম্মিলা

রামায়ণ-বুকে আঁকা আছে শুধু রাম আর সীতা
তুমি রহিয়াছ পাষাণ-পুরীতে কাব্যের উপেক্ষিতা
ওগো অনাদৃতা, আজিও তোমার ছবি
অবহেলা করি আঁকিল না কোন কবি।
বিশ্বের দ্বারে তুমি যেন হায় লুণ্ঠিতা ফুলমালা
উর্ম্মিলা···উর্ম্মিলা।

ত্রিশঙ্কু বিলাপ

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

Do I wake, or sleep?
Keats.

বাতাসের কান্না শুনিছ কি?
শুব্ধ দিন, ছন্দহীন।
প্রেতের ছায়ারা কাঁপে কালের দেয়ালে;
ভাঙাচোরা স্মৃতিগুলি
উঁকি দেয়, কথা কয়, ইসারায় ডাকে—
স্মরণের গ্রন্থী বেঁধে জীবনের নাগিনীর পাকে!
আমরা চেয়েছি শান্তি, জীবনের প্রচুর বিস্তার,
সবুজ পৃথিবী আর আকাশ উদার,
একটি কুটির,
চাহি নাই প্রত্যহের ভিড়,
শাশ্বতেরে বাঁধিয়াছি স্পর্শভীরু নীড়ের মায়ায়
—শকুনির পাখায় পাখায়
আমাদের বসন্ত বিদায়!

শীতার্ত আকাশ আজ, তবু গড়ি আকাশ কুসুম;
শতাব্দীর আহিফেনে ভাঙে নাকো শতাব্দীর ঘুম;
পটভূমিকার পাশে কোথা যেন ওড়ে শঙ্খচিল,
ছায়া হানে প্রেতের মিছিল;
মুহূর্তেরা স্থির হয়ে আসে—
ক্ষণদীপ্তি প্রজ্ঞার আকাশে:
ছিন্নভিন্ন ছদ্মবেশ, নির্মোক মিলায়।
শকুনির পাখায় পাখায়
মৃতস্বপ্ন ওড়ে!

মনে হয়,
আগন্তুক ইতিহাসে আমাদের সাক্ষ্য রহিবে না।
বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী—মোরা তার শুধে চলি দেনা!
শাশ্বত শশকবৃত্তি; পলাতক মন
প্রেমভীরু ছোট এক মেয়ের মতন
আত্মগত প্রতিষ্ঠায় সম্মানিত আপনার কাছে
—সম্রাটের সিংহাসন জনাস্তিকে সাজানো রয়েছে!

পটভূমিকার স্পর্শে কোথা যেন ওড়ে শঙ্খচিল—
ছায়া হানে প্রেতের মিছিল:
তবুও স্বপ্ন কাঁপে—
তাহারে ঘিরেছে দেখি এক স্তিমিত আর বিষণ্ণ বিস্ময়:
—আমাদের স্বপ্নে জাগে দিগন্তের নব সূর্যোদয়।

আগামী

গোপাল ভৌমিক

নয় শুধু নয়—
আমাদের চিন্তা আর ভয়—
কেন্দ্রীভূত আত্মিক সঞ্চয়:
পৃথিবীর গর্ভকোষে ভ্রূণের মতন
কেঁপে-ওঠা আগামী স্বপন
আমাদের রক্তে দেয় দোলা—
যদি ভুলি, হবে তবে নিজেকেই ভোলা।

আমাদেরও পরে—
নির্যাতিত পৃথিবীর প্রতি ঘরে ঘরে—
আনে যারা নব রূপান্তর—
আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর
জানাবে না তাহাদের সাদর সম্ভাষ?
মিছে কেন ফেলি শুধু মুমূর্ষু নিঃশ্বাস?

সে কথাও জানি—
পরিচিত এ পৃথিবীখানি—
মুছে যাবে বিনিঃশেষে:
দুঃখ দৈন্য যাবে সব ভেসে,
ডুবে যাবে বারুদের ঘ্রাণ—
ইস্পাতের আরও আছে প্রাণ!
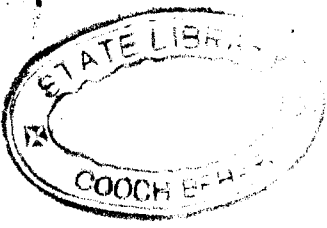
পুস্তক-পরিচয়

সমাজ ও সংস্কৃতি—রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ। প্রকাশক: পূর্ব্বাশা, পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। পৃষ্ঠা-সংখ্যা—২৪, মূল্য—তিন আনা।

এটি 'পূর্ব্বাশা সিরিজের' পঞ্চম পুস্তিকা। ইতিপূর্ব্বে এই সিরিজের আরও যে চারিটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চমটির সঙ্গে মিলিয়ে তাদের সব ক'টির বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটিরই মূল সুর এক: সমাজ-মানসের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও যে বিবর্ত্তন ঘট্‌ছে বিজ্ঞানানুমোদিত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাই দেখাবার চেষ্টা প্রত্যেকটি পুস্তিকায় আছে। এ থেকে এই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে বিখ্যাত প্রকাশক "পূর্ব্বাশা" একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বইগুলো বার করছেন। বাংলাদেশে একশ্রেণীর সাহিত্যিক ও সমালোচক হালে গজিয়েছেন যাঁদের বিচারে সাহিত্য শুধু সমাজনিরপেক্ষই নয়, সাহিত্য চিরন্তন সত্যশিব-সুন্দরেরও উদ্গাতা; অর্থাৎ এঁরা মনে করেন মাটির পৃথিবীকে অস্বীকার ক'রে কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে সুদূর গগনমার্গে বিহার করলে সাহিত্যের স্বধর্ম্মই যে শুধু রক্ষা পায় তা নয়, সাহিত্যের কৌলীন্যও তাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। সাহিত্যের শুচিতা, কৌলীন্য ও চিরন্তনতা বজায় রাখ্‌বার নামে 'স্থিতাবস্থা'কে ধরে রাখবার এই যে প্রয়াস তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে তৎপরিবর্ত্তে সাহিত্যের সুস্থ আদর্শটি সবার সামনে তুলে ধরবার জন্যেই "পূর্ব্বাশার" এই আয়োজন। সুতরাং "পূর্ব্বাশার" উদ্দেশ্যের সততা শুধু প্রশংসনীয় নয়, তার যুক্তিযুক্ততাও অনস্বীকার্য্য।

লেখক রবীন্দ্রবিনোদ সমালোচনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবাগত হ'লেও তাঁর বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণী শক্তি ও বক্তব্যবিষয়ের যুক্তিবত্তার প্রশংসা না ক'রে পারা যায় না। সমাজবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপ কী ভাবে বদ্‌লায় এবং যুগ থেকে যুগে এই রূপান্তর-ক্রিয়া কোন্ পদ্ধতি—প্রকৃতি অনুসারে সংসাধিত হয় সূক্ষ্ম নিপুণতার সঙ্গে লেখক তা-ই দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা সর্ব্বত্র না হইলেও প্রায় সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে—কোনো নতুন লেখকের পক্ষে এ বড়ো কম কৃতিত্বের কথা নয়। লেখক আলোচনাকে পরিস্ফুট করবার জন্য প্রথম দিকে বিভিন্ন দেশের সমাজ-বিবর্ত্তন ও তারই পটভূমিকায় সংস্কৃতির রূপান্তর নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন, পরে বিস্তারিত ভাবে ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্ত্তনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেছেন। উভয়ক্ষেত্রেই তিনি মার্কস-প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ-পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন—এবং সেই সূত্র ধ'রে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমস্ত রূপান্তরের মূলকারণ-রূপে অভিহিত করেছেন। উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজ এবং তারই super structureরূপে সংস্কৃতিরও রূপ বদ্‌লায় লেখক যুক্তির সাহা[illegible] তা সুন্দর প্রতিপন্ন করেছেন। যেহেতু তিনি মার্ক[illegible]বী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির আলোচনা করেছেন শুধু সেইজন্যেই তাঁর বিচার একদেশদর্শী হবে এ কথার কোনো মানে হয় না, কেন না যুক্তিই হচ্ছে মার্ক্সবাদের প্রাণ। আর যাঁর কলমে সেই যুক্তির ধার আছে জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক তিনি সত্যের পূজারী; কার্ল মার্কসের অদীক্ষিত শিষ্যদের তিনি একজন। আমরা রবীন্দ্র-বিনোদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত নই, তবে তিনি যে সত্যনিরীক্ষা ও যুক্তিনিষ্ঠার পূজারী একথা নিঃসন্দেহেই বোঝা যায়। এই নবীন লেখক এই ধরণের আরও বই লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করুন এই দাবী তাঁর ওপর আমাদের রইল।

নারায়ণ চৌধুরী

দক্ষিণায়ণ—বিমলচন্দ্র ঘোষ। কবিতাভবন, ২০২, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা। দাম দেড় টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার আসরে বিমলচন্দ্র ঘোষ সুপরিচিত কবি। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় তাঁর কবিতা প'ড়ে তৃপ্তি পেয়েছি। বর্ত্তমান কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত তাঁর কবিতাগুলোও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তেমনই তৃপ্তি দিয়েছে।

বিমলবাবু আধুনিক কবি হ'লেও, তাঁর কবিতায় আধুনিকতার চটক নেই—এটা বোধ হয় সুখের কথা। আজকের দিনে আধুনিক কবি নামে কেউ কেউ যেমন অহেতুক খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করেছেন, বিমল বাবুর ভাগ্যে সেরূপ খ্যাতি বা অখ্যাতি জোটে নি—অথচ তাঁর স্বকীয়তাকেও কেউ স্বীকৃতি না দিয়ে পারে নি। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমাদের বেশীর ভাগ আধুনিক কবিতার মধ্যেই দেখা যায় শুধু 'ভঙ্গী দিয়ে চোখ ভোলানো'র চেষ্টা। সম্প্রতি বাংলা কবিতা অবশ্য এই জাতীয় নিছক ভঙ্গীপ্রীতির হাত থেকে কিছুটা বিপন্মুক্ত হয়েছে—আমাদের অনেক তথাকথিত আধুনিক কবিরই জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হ'তে দেখা যাচ্ছে। বিদেশ থেকে আমদানী করা নিছক ভঙ্গীর জোরে এই চারপাঁচ বৎসর আগে অকবির দল বাংলাকাব্য-ক্ষেত্রে যে দৌরাত্ম্য সুরু করেছিলেন, তার চিহ্ন আজও বাংলা কাব্যের দেহ থেকে নিঃশেষে মুছে যায় নি। বিমলচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য এই যে সেদিনের বাংলা কবিতার বিশৃঙ্খলতার ভীড়েও তিনি তাঁর মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিলেন।

বিমলচন্দ্র ঘোষ কবিতায় আধুনিক মনন-শীলতার অধিকারী; কিন্তু তাঁর কাব্য-প্রেরণা সমসাময়িক বিলেতী এবং মার্কিন কবিতা পঠনজাত বদহজম থেকে উদ্ভূত নয়। তাঁর কবিতা অকৃত্রিম কাব্যানুভূতির ফল। ভাষা এবং কাব্যরূপের দিক থেকে তিনি ত উচ্ছৃঙ্খল ননই—বরং একটু যেন বেশীমাত্রায় সংযমী এবং ঐতিহ্যবাদী। তাঁর কবিতার ভাষায় তৎসমশব্দের এমন প্রাচুর্য দেখা যায় যে সমালোচকদের পক্ষে তাঁর মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষার প্রভাব আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার সঙ্গে বিমলবাবুর কবিতার অন্যান্য দু'একটি বিষয়েও সাদৃশ্য আছে। বিমলবাবুর কোন কোন কবিতার বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে মনে করিয়ে দেয়। তার পর আরেকটি সুলক্ষণ এই যে সুধীন্দ্রনাথের মত তিনিও দুর্বোধ্য নন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতা আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বলে মনে হ'লেও, তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য নয়। তাঁর কবিতার দৃশ্যমান দুর্বোধ্যতা সংস্কৃতজ শব্দের কাঠিন্য-জনিত। এই কাঠিন্যের কাঁটা তার ভেদ করতে পারলে সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অর্থবোধ কঠিন নয়। বিমলচন্দ্রের কোন কোন কবিতা সম্বন্ধেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। কোন কোন তথাকথিত আধুনিক কবির মত অহেতুক দুর্বোধ্যতার কুয়াশা সৃষ্টি করবার প্রয়াস তাঁর নেই।

কাব্য-রূপ, অলঙ্কার এবং উপমা প্রয়োগে বিমলবাবু ঐতিহ্যবাদী। আমাদের কোন কোন আধুনিক কবিকে দেখা যায় যে তাঁরা উপমা প্রভৃতি সংগ্রহের জন্যে ল্যাটিন এবং গ্রীক পুরাণের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। এসব উপমা অধিকাংশক্ষেত্রেই সাধারণ কাব্য-পাঠকের পক্ষে দুরূহ হয়ে ওঠে। বিমলবাবুর উপমাগুলো কিন্তু এদিক থেকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপোষক। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর উপমাদি আহৃত হয় সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি থেকে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রধানত মনের দিক থেকে সমাজ-সচেতন হ'লেও, 'দক্ষিণায়ণে' সংকলিত তাঁর অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক রোমান্টিক মনের প্রকাশ। তাঁর কবিতায় অধিকতর সমাজ-বোধের সঞ্চার হ'লে যে তাঁর কাব্য-সৃষ্টির গভীরত্ব এবং ব্যাপকত্ব আরও বেশী বেড়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দান বোধ হয় এই যে বিগত যুগের বাংলা কবিতার বাক্-বাহুল্যের স্থান দখল করেছে বাক্-সংযম। 'দক্ষিণায়ণে'র অধিকাংশ কবিতায় কিন্তু এই বস্তুটির অভাব পরিলক্ষিত হ'ল। 'দক্ষিণায়ণে'র কবিকে স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বাক্‌বহুল ব'লে মনে হয়। 'দক্ষিণায়ণে'র বেশীর ভাগ কবিতারই সুর এবং বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর। কয়েকটি সরস প্রেমের কবিতা এবং ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও আছে। কয়েকটি কবিতার আস্থাহীন চাঞ্চল্য এবং নৈরাশ্যবাদ উপভোগকে,

পীড়িত করে। 'দক্ষিণায়ণে'র মুদ্রণ-পারিপাট্য এবং অঙ্গ-সজ্জা প্রশংসনীয়। শিল্পী অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোপাল ভৌমিক

"শরৎ-সাহিত্যে নারী" (সমালোচনা)—শ্রীযুক্ত পান্নালাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় "শ্রীভারতী" (শ্রাবণ, ১৩৫০) পত্রিকায় 'শরৎ-সাহিত্যে নারী' শীর্ষক নিবন্ধে সামাজিক নীতির আওতায় বাড়িয়া উঠিয়া নারীর মনে যে দৃঢ় সংস্কার জন্মে তাহার সহিত নারীর হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্বই যে শরৎ-সাহিত্যের বিষয়বস্তু তাহাই স্পষ্টভাবে পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের লোকোত্তর প্রতিভা ও তাঁহার সৃষ্ট নারীচরিত্রের আলোচনায় তিনি নারী-হৃদয়ের অপূর্ব রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অধ্যাপক ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের আলোচনা উদ্ধৃত করিয়া তিনি প্রবন্ধের পটক্ষেপ করিয়াছেন: "প্রীতিহীন ধর্ম এবং ক্ষমাহীন সমাজের বিচারে যে রমণী কুলটা, তাহাদের যে দুর্বার প্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহার বিশুদ্ধতার চিত্র শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন। পাপপুণ্যের যে মাপকাঠি সমাজ মানিয়া লইয়াছে, তাহার সঙ্কীর্ণতা ও মূঢ়তা প্রতিপন্ন করাই শরৎ-সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য।" এই প্রবন্ধে শরৎ-সাহিত্যের নারী সম্পর্কে তিনটি দিক লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে: (১) নারীর হৃদয়জাত প্রেমাকাঙ্ক্ষা এবং বহির্জগৎ হইতে পাওয়া সংস্কার-প্রবৃত্তি; (২) নারী-মনের সংগ্রাম; (৩) নারীর মাতৃস্নেহ। শরৎ-সাহিত্য যে নারী-হৃদয়ের অনুভূতির তীব্রতায়, অভিব্যক্তির অকুণ্ঠ বাস্তবতায় মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে পান্নালালবাবু তাহাই বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকসাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

পান্নালালবাবু সমালোচনা-সাহিত্যে নবাগত। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি সূক্ষ্ম এবং যুক্তি বলিষ্ঠ। উদীয়মান সাহিত্য-সমালোচকহিসাবে বাংলা সাহিত্যের বেদীতলে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবেন, এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গদ্য-সাহিত্যে সাহিত্যভূষণ মহাশয়ের সমালোচনা-মূলক পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির পরিচয় পাই। তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না

স. চ.

বিবিধপ্রসঙ্গ
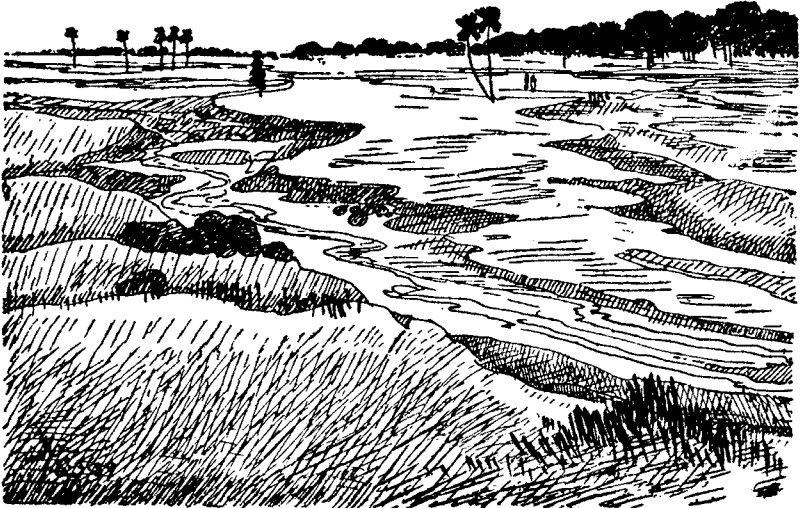
কলিকাতায় নিরন্ন নরনারী

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আমাদের কাছে ইতিহাসের মর্মন্তুদ কাহিনী। বাংলার অল্লাধিক একতৃতীয়াংশ লোক এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু বাংলায় বর্ত্তমানে যে দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে, বড়লাটের শাসন পরিষদের প্রাক্তন সদস্য স্যার জগদীশপ্রসাদ ইহাকে স্মরণকালের মধ্যে শোচনীয়তম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কত লোক যে না খাইয়া দিন কাটাইতেছে, অন্নাভাবে না খাইতে পাইয়া মরিতেছে, বিংশশতাব্দীর সংবাদ প্রকাশের সর্ব্বরকম সুব্যবস্থা সত্ত্বেও তাহার কতটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়! সরকারী হিসাব মত কলিকাতায় নিরন্ন লোকের সংখ্যা ৮২ হাজার। ইহাদের অধিকাংশই মফঃস্বল হইতে আসিয়াছে। বিনামূল্যে মণ্ড বিতরণ কেন্দ্রে দৈনিক ৬২ হাজার নিরন্ন লোক খাদ্য পায়, আর বাকী ২০ হাজার অন্য উপায়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। এই অন্য উপায় কি? কলিকাতার নাগরিকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এক মুষ্টি অন্ন, বা একটু ফেন সংগ্রহ করা—অথবা ডাষ্টবীনে ফেলিয়া দেওয়া উচ্ছিষ্ট হইতে অন্ন খুঁটিয়া খাওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় কি থাকিতে পারে? রাত্রি দশটা সাড়ে দশটা অবধি কলিকাতার রাজপথগুলি 'মা, একটু ফেন দাও মা' এই করুণ কাতর প্রার্থনার আর্ত্তনাদে মুখরিত হইয়া উঠে। কলিকাতার ফুটপাথগুলিতে নিরন্ন স্ত্রীপুরুষ, বালকবালিকা, শিশুদের অবস্থা যাঁহারা না দেখিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই দৃশ্যের মর্ম্মান্তিক স্বরূপ বুঝান অসম্ভব।

কলিকাতায় ফুটপাতে এই যে সহস্র সহস্র নিরন্নের সমাবেশ—ইহারা কাহারা? কোথা হইতে ইহারা কলিকাতায় আসিল? গত ২৭শে আগষ্ট বাংলার মন্ত্রীদের, সেক্রেটারীদের এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্ত্তাদের বৈঠকে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, ইহারা সব অসহায় শ্রমিক ও ভিক্ষুক। আমাদের বিশ্বাস, নৃতত্ত্ব অনুযায়ী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, ইহাদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। অন্নাভাবের প্রবল আঘাত প্রথমে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের উপরেই আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, কলিকাতায় যে সকল নিঃস্ব লোকের সমাগম হইয়াছে তাহারা কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলি হইতেই আসিয়াছে। সুদূর মফঃস্বল উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের নিরন্ন লোকদের কলিকাতায় আসা সম্ভব নয়।

বিনামূল্যে মণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা সত্ত্বেও কলিকাতায় অনশনপীড়িত লোকের সংখ্যা এবং অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। ১৬ই আগষ্ট সোমবার হইতে অনাহারপীড়িত লোকদিগকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা আরম্ভ হয়। প্রথম তিনদিনেই ২১৩ জন অনশন-পীড়িতকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়, তাহাদের মধ্যে কুড়ি জনের অধিক লোকের মৃত্যু হয়। ১৫ই আগষ্ট হইতে ২৩শে আগষ্ট পর্য্যন্ত তিনশত অনাহারপীড়িতকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে এবং দুইশত জনকে বেহালা জরুরী হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সংবাদে প্রকাশ, ১৬ই আগষ্ট হইতে ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার রাজপথে ৩৯২ জনের এবং হাসপাতালে ২৭৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গড়ে দৈনিক ৩৭ জন অনাহারে মরিতেছে এবং ১০৬ জন অনাহারে মৃতকল্প অবস্থায় হাসপাতালে ভর্ত্তি হইতেছে। কিন্তু ২৯শে ভাদ্র বুধবার কলিকাতায় অনশনে মৃত্যু হইয়াছে ৭৬ জনের এবং হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে ২০০ জন।

গত পাঁচ বৎসরে গড়ে জুলাই মাসের প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় ৫৮৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আর এবার কলিকাতায় জুলাই মাসে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৬৮৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রতি সপ্তাহে মৃত্যু হইয়াছে ৯৭টির বেশী। গত ২১শে আগষ্ট যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে ১১২৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসর ঐ সপ্তাহে গড়ে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫৬৮। গত ১১ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতায় ১২৯২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত পাঁচ বৎসর ঐ সপ্তাহে গড়ে ৬২৭ জনের মৃত্যু হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বাড়িয়াছে।

—

মফঃস্বলে অন্নসমস্যা

কলিকাতার অবস্থা মোটামুটি রকম নিয়মিতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবার সুযোগ পায়। কিন্তু মফঃস্বলের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবার কোন ব্যবস্থা নাই। তথাপি মফঃস্বলের অন্নাভাবের সংবাদ মাঝে মাঝে যাহা প্রকাশিত হয় তাহা মর্ম্মন্তুদ। সংবাদপত্রে মফঃস্বলের সংবাদ যাহা প্রকাশিত হইতেছে, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা অবগত আছেন। আমাদের ইচ্ছাসত্ত্বেও ঐ সকল সংবাদের বিস্তৃত আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না।

নোয়াখালীর ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অনশনে এবং অনাবৃত স্থানে অবস্থানের ফলে মিউনিসিপাল এলাকার ভিতরে ১২ জনেরও অধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ঢাকায় ৪ঠা হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৬৮ জন অনশনপীড়িত ব্যক্তিকে মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। তন্মধ্যে ছয়জন ভর্ত্তির পরেই মারা যায়। ১১ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে ঢাকায় ১১ জন লোক অনশনে মারা গিয়াছে। আরও ১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে দুর্ব্বলতাবশতঃ। এই সপ্তাহে ঢাকা মিউনিসিপালিটিতে 'অন্যান্য কারণে' ১১৫ জনের মৃত্যু রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। অন্যান্য কারণ কি, কিম্বা রোগের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। মুন্সীগঞ্জের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ঐ সহরে ৫০ জনেরও অধিক লোকের অনশনে মৃত্যু হইয়াছে। চাঁদপুরের সংবাদে প্রকাশ, ১৯শে আগষ্ট হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অনশনপীড়িত রোগীর মৃত্যুসংখ্যা ৩৯ জন এবং অতিরিক্ত মিশন হাসপাতালে ২৫শে জুলাই হইতে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ঐ শ্রেণীর মৃত্যু-সংখ্যা ১৮৮। দিনাজপুরের ১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ঐ সপ্তাহে সহর ও পল্লীঅঞ্চলে ১১ জন লোক মারা গিয়াছে। রংপুরের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তৎপূর্ব্ব দশ দিনে রংপুর সহরে ১২ জন লোকের অনাহারে মৃত্যু হইয়াছে। মাদারীপুরের ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মিউনিসিপালিটির দুইটি ওয়ার্ডে গত দেড় মাসে ১২৫টির অধিক মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত সংবাদগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় সবগুলি মফঃস্বল সহরের সংবাদ। সুদূর পল্লীর অবস্থা কিরূপ তাহা কিছু অনুমান করিতে পারা যায় কি? মফঃস্বলের সহরে যাহারা মরিতেছে তাহারা কি পল্লী হইতে আগত?

—

নিরন্নদিগের অন্নসমস্যা

কলিকাতায় নিরন্নদিগকে বিনামূল্যে মণ্ড বিতরণ করা হইলেও অনশনপীড়িতের সংখ্যা ও অনশনে মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহা সত্যই বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ। হয় মণ্ড বিতরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা কলিকাতায় আগত নিরন্নদের সংখ্যার তুলনায় পর্য্যাপ্ত নয়, না-হয় বিতরিত মণ্ডের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত নহে। উভয় কারণই বর্ত্তমান থাকিতে পারে। গবর্ণমেণ্ট মণ্ড প্রস্তুতের যে বিধান করিয়াছেন তাহা গত মাসে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। মণ্ড বিতরণের জন্য সরকার হইতে নিয়ন্ত্রিত দরে খাদ্যদ্রব্য পাইতে হইলে, সরকারনির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারেই মণ্ড তৈয়ার করিতে হইবে। এই মণ্ডের খাদ্যমূল্য সম্বন্ধে স্যার জগদীশপ্রসাদ এবং ভারতীয় মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের বাংলা শাখার অনারারী জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ কে, কে, সেনগুপ্ত যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মিঃ কে, কে, সেনগুপ্ত সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেককে যে পরিমাণ মণ্ড দেওয়া হয় তাহা দেহরক্ষার পক্ষে অনুপযোগী। তিনি হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, বিতরিত মণ্ডে ৭ শত হইতে ৮ শত ক্যালরীর বেশী খাদ্য এবং ২০ গ্রামের বেশী উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে না। জাতিসঙ্ঘের (লীগ অব নেশনস্) স্বাস্থ্য কমিটির মতে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে কম করিয়া হইলেও ২৫০০ ক্যালরি খাদ্য এবং ৭৫ গ্রাম মিশ্র প্রোটিন প্রয়োজন। সুতরাং নিরন্ন ব্যক্তিরা যে মণ্ড পাইতেছে তাহা তাহাদের দেহরক্ষার উপযোগী খাদ্যের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র। বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিমউদ্দিনের নিকট স্যার জগদীশপ্রসাদ যে স্মারকলিপি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত নির্দ্দেশে নিরন্নদের জন্য যে-পরিমাণ খাদ্য নির্দ্ধারিত

হইয়াছে তাহাতে খাদ্যের পরিমাণ দুর্ভিক্ষ আইন অনুসারেও লোকের জীবন রক্ষার পক্ষে অপর্য্যাপ্ত। তিনি বলেন, বহু দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা হইতে দুর্ভিক্ষ আইনে দুর্ভিক্ষ-কালীন খাদ্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। দুই ছটাক খাদ্য দুর্ভিক্ষ আইনে নির্দ্ধারিত খাদ্যের পরিমাণের প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র। এই মণ্ডই নিরন্নদের একমাত্র সম্বল। একবেলা এই মণ্ড খাইয়া বাঁচিয়া থাকা কিরূপে সম্ভব? ইহার উপর এই মণ্ডে জোয়ার ও বাজরা আছে। বাঙ্গালীর পাকস্থলী এই খাদ্যের সহিত পরিচিত নয়। স্যার জগদীশ প্রসাদ বলেন, উহা কিরূপে রন্ধন করিতে হয় তাহা বাঙ্গালী জানে না।

১৫ই আগষ্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট ২৫৩৭ জন অনাহারে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পরে হাসপাতালে উহাদের মধ্যে ৪৬১ জনের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ের মধ্যে কলিকাতার রাজপথ হইতে ৪৭৬টি মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ২৫ দিনে প্রায় হাজার নিরন্ন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট মণ্ড সম্বন্ধে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থায় নিরন্ন ব্যক্তিরা দেহরক্ষার উপযোগী খাদ্য পাইবে কিনা, তৎসম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ করা গবর্ণ-মেণ্টের কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় আগত নিরন্নদের অন্নসমস্যার মত থাকিবার সমস্যাও বড় কম নয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি না। এই অবস্থা যে কতদিন থাকিবে তাহাই বা কে জানে। বর্ষা গেল, সম্মুখে আসিতেছে শীত, শীতে উহাদের সমস্যা আরও কঠিন হইয়া উঠিবে। গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার আগত নিরন্নদিগকে ক্রমে ক্রমে কলিকাতার নিকটস্থ মণ্ড বিতরণকেন্দ্রে পাঠাইয়া পরে নিজেদের বাড়ীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দেশে খাইতে পায় না বলিয়াই উহারা প্রাসাদ-নগরী ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি কলিকাতা আসিয়াছে। বেদেদের মত যাহারা স্বাভাবিক যাযাবর নয়, দুর্ভিক্ষের অবস্থা না হইলে তাহারা কখনও নিজের বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না। মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দি ইতিপূর্ব্বে এই নিরন্ন লোকদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নিজেদের গৃহ হইতে, আশ্রয়স্থল হইতে, যে পরিবেশ তাহাদিগকে অন্ন যোগাইত সেই পরিবেশ হইতে উহারা চলিয়া আসিয়া অর্থ নৈতিক অতলজলে নিমজ্জিত হইয়াছে। নূতন দেশে রৌদ্রবৃষ্টির কষ্ট সহ্য করিবার মত জীবনীশক্তি উহাদের নাই। দুর্ভাগ্য-বশতঃ উহাদের কতক মরিতে বাধ্য। মৃত্যু তাহার প্রাপ্য অবশ্যই আদায় করিবে।" মৃত্যু তাহার প্রাপ্য আদায় করিতেছে সে কথা ঠিক। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশনারগণ তাঁহাদের একটি রিপোর্টে দুর্ভিক্ষ চিনিবার একটি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই উপায়টি হইল এই যে, নারী, পুরুষ এবং শিশু যাহারা স্বভাবতঃ যাযাবর নয় তাহারা যখন খাদ্য অন্বেষণে বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দূরদেশে যায়, যখন এই রকম দৃশ্য সর্ব্বদাই দেখা যায়, তখন গবর্ণমেণ্টকে একথা বুঝিতে হইবে যে, ইহা সাধারণ অন্নকষ্ট নয়, ইহা তাহাই যাহার নাম দুর্ভিক্ষ। মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দি নিরন্নদের কলিকাতায় আগমনে কি সূচনা করিতেছে তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই বলিয়াই উল্লিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেই দুর্ভিক্ষের প্রতিকার হইবে না। উহাদিগকে দেশে পাঠাইবার আগেই পল্লীতে অন্নসত্র খুলিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিরন্নদিগের অনশন-রোগ

কলিকাতায় যে সকল অনশনক্লিষ্ট লোককে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয় এবং অনশনে যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের প্রাত্যহিক সংখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সরবরাহ করা গবর্ণমেণ্ট মাঝখানে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণ-মেণ্ট কেন এরূপ করিয়াছিলেন আমাদের পক্ষে তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কাগজের স্বল্পতার জন্য সংবাদপত্রে স্থানাভাববশতঃ ঐ সকল সংবাদ প্রকাশ করিতে সংবাদপত্র সমূহের কর্ত্তৃপক্ষের অসুবিধা হইবে ভাবিয়া এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। কারণ, এই সকল সংবাদই যদি সংবাদপত্রসমূহ প্রকাশ না করেন, তবে সংবাদপত্রের সার্থকতা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ সংখ্যা-তথ্যের অকরুণ বাস্তবতাকে নাটকীয় অতিরঞ্জন মনে করাও বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলার অসামরিক

সরবরাহ সচিব মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস মৃত্যু তাহাদের ব্যর্থ হয় নাই—তাঁহাদের মৃত্যু এই প্রদেশের ভয়ানক দুরবস্থার প্রতি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। সুতরাং মৃত্যু-সংখ্যা প্রকাশিত হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে বাংলার অবস্থা ফিরিয়া গিয়াছে এইরূপ ধারণা অন্যান্য প্রাদেশের মনে সৃষ্টি হইয়া সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইতে পারিত। যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট পুনরায় উক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ভাল করিয়াছেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশ, পূর্ব্বে সরকারী বিবরণে 'অনশন' কথাটি থাকিত, এখন উহার পরিবর্ত্তে 'পীড়িত নিঃস্ব' কথাটি ব্যবহৃত হইতেছে এবং অধিকাংশ মৃত্যুই পুরাতন ব্যধির ফল বলিয়া নাকি বলা হইয়াছে। 'পীড়িত নিঃস্ব' তো বটেই, পীড়া বা রোগ ছাড়া কাহাকে আর হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়! তবে এদের আসল রোগটা অনশন রোগ। এই সত্যটি প্রকাশ না থাকিলে, হঠাৎ নিঃস্বদের এত রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ শুধু যে বিদেশেই অপ্রকাশিত থাকিত তাহা নয়, ভাবী বংশধরগণ প্রাত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় হঠাৎ পুরাতন রোগের ফলে বহু লোকের মৃত্যু হইল কেন তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইবে না। বাংলার ইতিহাসে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কাহিনীর পাতাটা সাদা থাকিয়া যাইবে।

—

বাংলার দুর্ভিক্ষ বাজেট

বাংলা গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব শ্রীযুত তুলসীচন্দ্র গোস্বামী গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বাংলা গবর্ণমেণ্টের ১৯৪৩-৪৪ সনের বাজেট নূতন করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন। হক-মন্ত্রিমণ্ডলী গত ফেব্রুয়ারী মাসে এক বাজেট উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজেটের কয়েক দফা পাশ হওয়া বাকী থাকিতেই হক সাহেব পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ২৪শে এপ্রিল বর্ত্তমান নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় এবং পরিষদের জুলাই মাসের অধিবেশনে যে খণ্ড-বাজেট পেশ করা হয়, স্পীকারের রুলিংএ তাহা বাতিল হইয়া যায়। এবার ১৯৪৩-৪৪ সনের সমগ্র বাজেটটি নূতন করিয়া পেশ করা হইয়াছে।

শ্রীযুত গোস্বামীর বাজেটে আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত রূপ আয়, ব্যয় ও ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে :—

আয়—১৮ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা।

ব্যয়—২৫ কোটি ৮১ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা।

ঘাট্‌তি—৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

ঘাট্‌তি ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা হইলেও গত বৎসরের তুলনায় আয় বাড়িয়াছে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় বাড়িয়াছে ৯ কোটি টাকারও কিছু বেশী। বাংলা গবর্ণমেণ্টের এত আয় বৃদ্ধি আর কখনও হয় নাই, এইরূপ বিপুল ঘাটতিও আর হয় নাই কখনও। ব্যয় বৃদ্ধি জনিত এই ঘাটতির মূল বাংলার বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ—স্মরণ কালের মধ্যে যাহার তুলনা মিলে না। অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমাদের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হেতু দুর্গতদিগকে সাহায্য করিবার ব্যবস্থার জন্য রাজস্বের উপর যে বিপুল বোঝা চাপিয়াছে এই বিপুল ঘাট্‌তি সম্পূর্ণরূপে তাহারই জন্য।" সাহায্যের ব্যবস্থা না করিলে মৃত্যু যাহাদের অবধারিত খরচের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাহাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ বিষয়ে শ্রীযুত গোস্বামীর সহিত আমরা একমত। কিন্তু দেশের লোকের দুর্দ্দশা যেমন ব্যাপক তেমনি তাঁহার বাজেটেও প্রতিকারের ব্যবস্থা ব্যাপক হইয়াছে কি না, তাহাই এই বাজেট সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য।

বাজেট ঘাট্‌তি ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা হইলেও আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ব্যয় বাড়িয়াছে নয় কোটি টাকারও বেশী। সুতরাং দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের জন্য কি ভাবে এই ব্যয় বৃদ্ধিটা বণ্টন করা হইয়াছে তাহা দেখা দরকার। দুর্গতি নিবারণের ব্যয় মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত :—

(১) অল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের পরিকল্পনায় যে সাড়ে তিন কোটি টাকা ক্ষতি হইবে তাহা।

(২) দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবত অর্থাৎ খয়রাতি সাহায্য এবং টেষ্ট রিলিফ বাবত ব্যয় ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা।

(৩) অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন বাবত ব্যয় ৮৩ লক্ষ টাকা।

দেখা যাইতেছে, বাজেট ঘাট্‌তির ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ

টাকার প্রায় সবটাই উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় দফা ব্যয়ের জন্য হইয়াছে। ব্যয় বৃদ্ধির দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় সিভিল ওয়ার্ক বাবত ৫৫লক্ষ, পুলিশ বিভাগ খাতে ২৭ লক্ষ সেচ বিভাগ খাতে ১১ লক্ষ, স্কুল বাবত ১৫ লক্ষ, কলিকাতা কর্পোরেশনকে সাহায্য বাবত সাড়ে পাঁচ লক্ষ এবং অসামরিক সরবরাহ বাবত ৩১ লক্ষ টাকা, মোট ১ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে।

বস্তুতঃ অল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ বাবত যে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা মূলধন ব্যয় নামে একটি পৃথক দফা ভুক্ত। এই দফায় খাদ্যশস্য, ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় এবং লবণ ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব ধরা হইয়াছে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের জন্য কোন লোকসান হইবে না এবং লবণও জরুরী অবস্থার জন্য মজুত থাকিবে। কাজেই এই দুইটির জন্য বাংলা গবর্ণমেণ্ট যে মূলধন ব্যয় করিবেন তাহা আবার ঘরেই ফিরিয়া আসিবে। খাদ্যশস্য ক্রয় বাবত ১০ কোটি টাকা মূলধন ব্যয় করার বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই দশ কোটি টাকা মূলধনের সব টাকাই যদি ঘরে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে খাদ্য-সাহায্য বাবত বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে কিছুই ব্যয় করার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু শ্রীযুত গোস্বামীর বাজেটে অনুমান করা হইয়াছে যে, এই ১০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করার ফলে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান হইবে। এই লোকসানের টাকা বাংলার রাজস্বের উপর দায়।

প্রথমতঃ আমাদের কথা এই যে, অন্নাভাব জনিত দুর্গতি নিবারণের যে ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে দুর্গতির বিরাটত্ব ও ব্যাপকত্বের তুলনায় তাহাকে পর্য্যাপ্ত বলিয়া কিছুতেই মনে করা যায় না। এই ব্যয়বরাদ্দ দ্বারা অন্নাভাব দুর্গতির কতটুকু প্রতিকার হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ অমূলক কি না, তাহা দেশের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারা যাইবে। দুর্ভিক্ষ-সাহায্যের ব্যয় বরাদ্দ ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে খয়রাতি সাহায্য ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার এবং বাকীটা টেষ্ট রিলিফ অর্থাৎ কাজ করাই মজুরী বাবত দেওয়া হইবে। বাংলা দেশে নিরন্ন লোকের সংখ্যা যদি কম পক্ষে এককোটিও হয়, তাহা হইলে মাথা পিছু তিন টাকার বেশী পড়িবে না। নিরন্ন লোকেরা খাইয়া বাঁচিবে কিরূপে? নিরন্ন লোকের সমস্যা বাঙালী জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কত বড় কঠিন সমস্যা কলিকাতা ও মফঃস্বলের মৃত্যু সংখ্যা দিয়া আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি।

দুর্ম্মূল্যতার জন্য চাউল ক্রয় করা যাহাদের পক্ষে কঠিন, তাহাদিগকে অল্প দামে চাউল বিক্রয় করিবার জন্যই দশ কোটি টাকা মূলধন ব্যয় করার বরাদ্দ করা হইয়াছে। যাহাদের নিকট অল্প দামে চাউল বিক্রয় করা হইবে তাহাদের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারী আছেন। সরকারী কর্ম্মচারী ছাড়া অবশিষ্ট চাউল কণ্ট্রোল দোকানে বিক্রয় হইবার জন্য। কিন্তু সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকসান কেন হইবে, তাহা শ্রীযুক্ত গোস্বামী কিছুই বলেন নাই। সরকারী এজেণ্টরা কি দামে চাউল কিনিয়াছেন এবং সরকারের নিকট কি দামে ক্রয় করিয়াছেন, তাহা না জানিলে জনসাধারণের পক্ষে এই সাড়ে তিন কোটি টাকা লোকশান হওয়ার কারণ বুঝিয়া উঠা কঠিন। এই লোকসানটা যখন রাজস্বের উপর দায়, তখন এই তথ্য অপ্রকাশ রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না। শ্রীযুত গোস্বামীর বাজেটে সাতকোটি টাকার উপর ঘাট্‌তি হইলেও এবং গত বৎসর অপেক্ষা ৯ কোটি টাকার উপর ব্যয় বরাদ্দ করা হইলেও, তিনি যে ভাবে এবং যে উপায়ে অন্নাভাবের দুর্গতি নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে দুরবস্থা দূর হওয়ার ভরসা করা যায় কি?

—

ভাবী বড় লাটের বক্তৃতা

ভারতের ভাবী বড়লাট ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াভেল ভারতে পৌঁছিবার পর তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর—লণ্ডনে পিলগ্রিম ভোজসভায় ভারতের জন্য তাঁহার মনের ঝুলিতে করিয়া যাহা লইয়া আসিতেছেন তাহা বিবৃত করিয়া যে বক্তৃতা তিনি দিয়াছেন তাহাতেই এই সমস্যা ত্রয়ের কথা বলা হইয়াছে। বৃটেনের জন্য ভারত কি করিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "সৈন্য এবং সমরসম্ভার সম্পর্কে ভারতের সাহায্য না পাইলে আমরা নিশ্চয়ই মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা করিতে পারিতাম না।"

লর্ড ওয়াভেল তাঁহার মনের ঝুলি হইতে চারিটি জিনিষ সকলকে দেখাইয়াছেন। ভারতের জন্য তাঁহার সত্যিকার ভালবাসা এবং ভারতবাসীর জন্য তাঁহার সহানুভূতি, প্রথম জিনিষ। দ্বিতীয় জিনিষটি গত যুদ্ধের সময় সিরিয়ায় এবং যুদ্ধের পরে মিশরে ও প্যালেষ্টাইনে শাসন পরিচালন সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা। তৃতীয়তঃ, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সমস্ত রকম সম্ভবপর সাহায্য করিতে বৃটেনের সর্বশ্রেণীর নাগরিকদিগের ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় ইচ্ছা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান। চতুর্থটি হইল বিশ্বাসঘাতক জাপানীদের নিকটে তাঁহার ঋণ। কিন্তু ভারতে পৌঁছিয়াই তিনি নিম্নলিখিত তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা করেন: (১) জাপানের সহিত যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের চেষ্টা. (২) গবর্ণমেণ্টের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। (৩) ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি। ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রথম কথা, অচল অবস্থার সমাধান। ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দূর করিবার অনুকূলে বৃটেনে এবং ভারতে জনমত যে অত্যন্ত প্রবল, তাহাও লর্ড ওয়াভেল দেখিতে পাইয়াছেন। তথাপি ভারতের অচল অবস্থা সমাধানকে তাঁহার নিকট অত্যন্ত কঠোর ও বিপজ্জনক বলিয়া মনে হইয়াছে। ইহাকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সনাতন ভারতীয় নীতির পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? আর, যত কঠোর এবং বিপজ্জনকই হউক, লর্ড ওয়াভেল যদি তাঁহার কথিত ভারতীয় সমস্যাত্রয়কে বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, এই তিনটি সমস্যার একটিও যেমন বিন্দুমাত্র অবহেলার বিষয় নয়, তেমনি ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির সহিত প্রথম দুইটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী জাপানের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যে দেশের মাটিকে ভিত্তি ভূমি করিয়া অভিযান চালান হইবে, সেই দেশের জনগণের নৈতিক দৃঢ়তা ও সাহস যে যুদ্ধজয়ের শক্তিশালী সহায় তাহা বহু যুদ্ধের বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীর যোদ্ধা লর্ড ওয়াভেলের কাছে অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। জনগণের নৈতিক দৃঢ়তাকে দুর্জয় করিয়া তুলিতে হইলে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্বের প্রেরণা। ভারতের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। লর্ড ওয়াভেল বলিয়াছেন, অতিরিক্ত তিন-চার লক্ষ লোককে ভরণপোষণ এবং শিক্ষিত করা গুরুতর কঠিন সমস্যা। আমরা একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, ভারতের অচল অবস্থার অবসান হইলে জনগণের অন্নসংস্থান ও জাপানের সহিত যুদ্ধে তাহাদের আত্মরক্ষার শক্তিকে দৃঢ় করিতে ভারতের জাতীয় নেতৃত্ব তাঁহার সুদৃঢ় সহায় হইবে। কেন্দ্রে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিলে বাংলার অন্নাভাব এত শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারিত কি?

লর্ড ওয়াভেল ভারতকে শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সুখী দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার এই শুভ ইচ্ছাকে সার্থক করিবার একমাত্র পথ ভারতের অচল অবস্থার সমাধানকে তিনি যদি কঠোর ও বিপজ্জনক মনে করিয়া পাশ কাটাইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার শুভ ইচ্ছাকে ফলপ্রসূ দেখা সম্ভব হইবে কিরূপে?

—

ভারতের স্বাধীনতা-সমস্যা

শ্রীযুক্ত রাজাগোপাল আচারী মনে করেন, 'জাতীয়তাবাদী ভারত এক্সিস পক্ষের 'অনুকূল' বৃটিশদের মন হইতে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইলে ভারতের অচল অবস্থার সমাধান হইবে। কিরূপে এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে হইবে তাহার উপায় তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ ছাত্রসঙ্ঘে এক বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, "এই উদ্দেশ্য সাধনে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।" কিন্তু বৃটিশদের মনে উল্লিখিত ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ারই বা কারণ কি? যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় কংগ্রেস জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চায়, ইহাই নিশ্চয়ই এই ভ্রান্ত ধারণার কারণ নহে! বিশেষতঃ ভারতসচিব মিঃ আমেরী কমন্স সভায় স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধী এক্সিস পক্ষের সমর্থক নহেন, জাপানের প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি নাই এবং ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহার বিরুদ্ধে ঐরূপ কোন অভিযোগ করেন নাই। তাহা হইলে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বাধা কোথায়?

বৃটিশ প্রচার-সচিব মিঃ ব্রাওন ব্রাকেন আমেরিকায় ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, উহাকে আপাততঃ ঠাণ্ডা ঘরে (cold storage) মজুত রাখা হইয়াছে। তাঁহার আর একটি উক্তির কথা মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকার লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন। উক্তিটি হইল এই, "মিঃ গান্ধীকে যে বন্দী করা হইয়াছে তাহার কারণ তিনি তাঁহার কার্য্য দ্বারা আমাদের সাধারণ শত্রুকে সাহায্য করিতেছিলেন।" কমন্স সভায় ভারত সচিবের স্পষ্ট উক্তির পর বৃটিশ প্রচার সচিবের আমেরিকায় ভারতের সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা সম্বন্ধে এই জঘন্য অপপ্রচার করিয়াছেন। ইহা যদি ভ্রান্ত ধারণার ফল হয়, তবে ভারত সচিবের স্পষ্ট উক্তির পরও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা থাকিবার কারণ কি?

ভারতকে স্বাধীনতা না দিবার পক্ষে সনাতন বৃটিশ যুক্তি হইল—'ভারতীয় অনৈক্য'। বৃটিশ শ্রমিকদলের নেতা ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী মিঃ সি, আর এটলী কার্ম্মার্থেনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল অবিশ্বাস ছাড়া আর কোন বাধাই ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্তির পথ রোধ করে নাই। এই একই সমস্যা সিংহল, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি সাম্রাজ্যের অপরাপর অংশেও প্রবল, ইহা আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।" বৃটিশের সাম্রাজ্য লোভ নাই, কিন্তু কি করিবেন, সাম্রাজ্যের সকল অংশেই অধিবাসীদের মধ্যে বদ্ধমূল অবিশ্বাসের জন্য সাম্রাজ্যই বৃটেনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। হয়ত 'কম্‌লি ছোড়্‌তা নেহি' যুক্তিটা আমেরিকার কাছে তেমন প্রাণস্পর্শী হইবে না বলিয়াই মিঃ ব্রাওন ব্রাকেন মহাত্মা গান্ধীর এক্সিস-প্রীতির ভ্রান্ত যুক্তি অবতারণা করিয়াছেন।

মিঃ এটলী সনাতন বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা ভারতবাসীর পরস্পর অবিশ্বাসকেই ভারতকে স্বাধীনতা দিবার অন্তরায়রূপে দেখিতে পাইয়াছেন। মিঃ ব্রাওন ব্রাকেন ভারতের রাজনৈতিক প্রশ্নকে ঠাণ্ডাঘরে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্টের নূতন সরবরাহ সচিব স্যার রামস্বামী মুদালীয়র দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন, বৃটেনের অধিবাসীরা যুদ্ধের পরে পুরাতন আদর্শ ও নীতি পরিত্যাগ করা এবং যে সকল দেশ স্বায়ত্তশাসনের জন্য প্রস্তুত তাহাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা স্থির করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে সবই পাওয়া যাইবে, এই আশ্বাস সত্ত্বেও ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখে একটা বড় প্রশ্ন রহিয়াছে। যুদ্ধের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সচিব মিঃ আমেরী বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের স্বাধীনতা লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে তাহা স্যার রামস্বামী মুদালীয়র বলেন নাই। ইহার উপর ভারতবাসীদের মধ্যে 'বদ্ধমূল অবিশ্বাস' তো আছেই।

দুর্ভিক্ষ ঘোষণার দাবী

গত ৩১শে আগষ্ট ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারত গবর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কনরান স্মিথ বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বলিয়াছিলেন:

I may say, however, that the Government of India view with misgivings the tendency in some quarters to over-dramatize the situation, possibly with the best of intentions, and they have no hesitation in condemning the tendency in other quarters to exploit the situation for purely political or sectional ends.

"আমি একথা বলিতে পারি যে, (বাংলার) পরিস্থিতিকে কোথাও কোথাও নাটকীয় অতিরঞ্জনে রঞ্জিত করা হইতেছে বলিয়া ভারতগবর্ণমেন্ট আশঙ্কা করিতেছেন। সম্ভবতঃ খুব ভাল উদ্দেশ্য লইয়াই এই অতিরঞ্জন করা হইতেছে। কিন্তু অন্যত্র নিছক রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতিকে নিয়োগ করার প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিতে তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতেছেন না।"

অনশন-মৃত্যুর ফলে বাংলায় যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাকে নাটকীয় অতিরঞ্জনে রঞ্জিত করা তো দূরের কথা, ভাষায় উহার একাংশ প্রকাশ করাও বোধ হয় অসম্ভব। মিঃ কনরান স্মিথের কাছে উহা নাটকীয় অতিরঞ্জন বলিয়া মনে হওয়ার কারণ সত্যই দুর্জ্ঞেয়। বাংলা গবর্ণমেন্টের রিপোর্ট ছাড়া বাংলার অবস্থা অবগত হওয়ার আর কি উপায় তাঁহার আছে তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী স্বচক্ষে দেখা

বাংলার অবস্থা সম্বন্ধে কোন বিবরণকে নাটকীয় অতিরঞ্জন ভাবিতে পারেন, ইহাই বা কিরূপে কল্পনা করা যায়? তবে আশ্বস্ত হওয়ার কথা এই যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য-সচিব স্যার জে, পি শ্রীবাস্তব বাংলার দুর্ভিক্ষকে নাটকীয় অতিরঞ্জন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি লাহোরে এক সংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, "বাংলায় অতি নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে এবং আগামী তিন মাস দুর্দৈব আরও ঘনীভূত হইবে। এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আটক করিয়া, ধার করিয়া অথবা চুরি করিয়া যাহা কিছু খাদ্য পাওয়া যায় সংগ্রহ করা। বাংলার অনাহারক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচাইবার ইহাই একমাত্র পন্থা।"

স্যার জে, পি শ্রীবাস্তব বাংলার অবস্থা কতকটা প্রত্যক্ষ করিয়া উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন। বাংলার যে এই অবস্থা, কোন ভাষায় তাহার নাটকীয় অতিরঞ্জন সম্ভব? ইহা কি বাংলায় দুর্ভিক্ষের অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে না? বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা স্যার নাজিম-উদ্দিন বলিয়াছেন, বাংলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা না হইলেও দুর্ভিক্ষের অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাঁহার এই উক্তি হইতে স্বাভাবিকই লোকের মনে দুইটি প্রশ্ন জাগিয়া থাকে। (১) যদি দুর্ভিক্ষের অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে তবে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করিবার কারণ কি? (২) ব্যবস্থা কি দুর্ভিক্ষের অনুযায়ীই করা হইয়াছে? স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার এবং স্যার জগদীশপ্রসাদ ভারত গবর্ণ-মেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জে, পি শ্রীবাস্তবের নিকট এক স্মারক লিপিতে বলিয়াছেন, "আমরা জ্ঞাত নহি এমন কোন কারণবশতঃ যদি বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয় না হয়, তাহা হইলে 'ফেমিন কোডে' নির্দ্দিষ্ট যে সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী, তাহা অবিলম্বে অবলম্বন করা প্রয়োজন।" তাঁহাদের উল্লিখিত মন্তব্য হইতে বোঝা যাইতেছে, বাংলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণার উপযোগী অবস্থা বর্ত্তমান এবং যদি কোন কারণে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে না করেন, তবে সে কারণ তাঁহাদের অজ্ঞাত। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ ঘোষণা না করার কারণটি তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা দুর্ভিক্ষ আইনের [illegible]নমতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ ক[illegible] বোঝা যাইতেছে, স্যার নাজিমউদ্দিনের উক্তি সত্ত্বে[illegible]ক্ষ আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ন[illegible]। এই দুইটি বিষয় আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে খাজা স্যার [illegible]মউদ্দিনের নিকট স্যার জগদীশপ্রসাদের স্মারকলিপি[illegible] তিনি বাংলার অবস্থা কতক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই [illegible]লিপি দাখিল করিয়াছেন। এই স্মারকলিপিতে তি[illegible] বলিয়াছেন, "স্মরণকালের মধ্যে বাংলায় এরূপ শোচনীয়তম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই।" নিরন্নদিগকে যে মণ্ড বিতরণ করা হয় তৎসম্বন্ধে স্যার জগদীশপ্রসাদ বলিয়াছেন, দুই ছটাক খাদ্য দুর্ভিক্ষ আইনে নির্দ্ধারিত খাদ্যের পরিমাণের এক-চতুর্থাংশ মাত্র।

এই সমস্তই বাংলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণার দাবী ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করা হইলে, দুর্ভিক্ষ আইনের বিধানমত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে —বাংলার জনগণকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার বাস্তব দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার জনগণের বাঁচিবার অধিকার যদি স্বীকৃত না হয়, সমগ্র বাংলাদেশ যদি একটি ভিক্ষাজীবীর দেশে পরিণত হয়, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আতঙ্কিত হইতে হয়।

অন্নাভাবের কারণ কি?

বাংলায় কেন এই ভীষণ অন্নাভাব দে[illegible] দিয়াছে? হঠাৎ বা একদিনে তো এই অবস্থা হয় নাই। স্যার জে, পি শ্রীবাস্তব বাংলার অন্নাভাবের কারণ সম্পর্কে বলিয়াছেন "আমরা সকলেই ভুল করিয়াছিলাম।" এই 'আমরা' কাহারা? কেন ভুল হইয়াছিল, কি ভুল হইয়াছিল, কত-দিন ধরিয়া ভুল হইতেছে, এই সকল প্রশ্ন উপেক্ষার বিষয় নয়। মন্ত্রী হওয়ার পর মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দি একটা আত্ম-সন্তুষ্টির ভাব দেখাইয়াছিলেন। 'খাদ্যাভাব নাই' ঠিক এই কথাটি তিনি বলেন নাই বটে, কিন্তু যাহা বলিয়াছেন তাহাতে, দেশে প্রকৃতপক্ষে চাউলের অভাব নাই, মন্ত্রি-মণ্ডলীর এইরূপ ধারণাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্বাস অনুযায়ীই কি খাদ্য অন্বেষণ অভিযানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই? এই অভিযানের ফলে কি পরিমাণ

খাদ্যশস্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ না করিবার কোন কারণ দেশের লোক খুঁজিয়া পাইতেছে না।

বস্তুতঃ বাংলার খাদ্যপরিস্থিতি একটা রহস্যাবৃত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সনের পূর্ব্ব বৎসরের কোন বাড়তি চাউল ছিল কি? ১৯৪২-৪৩ সনে বাংলাদেশে কি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হইয়াছে? গত ৯ মাসে কি পরিমাণ চাউল বাংলার অধিবাসীদের খাওয়ার জন্য ব্যয় হইয়াছে, কি পরিমাণ বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি হইয়াছে, কি পরিমাণ খাদ্যশস্য বা বাংলার বাহির হইতে বাংলাদেশে আমদানি করা হইতেছে ও হইয়াছে, এই সব তথ্য একমাত্র গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই জানা সম্ভব। কিন্তু মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দি বাংলার অন্নাভাবের ১১টি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উল্লিখিত তথ্যাদি প্রদান করেন নাই। ব্রহ্মদেশের চাউল না পাওয়ায় আমাদের চাউলের কিছু অভাব হইয়াছে সত্য। কিন্তু বাংলার বাহির হইতে ২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বাংলার জন্য প্রয়োজন হয় মাত্র। বাংলার বহু লোক একবেলা খাইয়া থাকিতেছে, বাংলার বাহির হইতেও খাদ্যশস্য আসিতেছে, তবু বাংলার অতলস্পর্শী গহ্বর কিছুতেই পূরণ হইতেছে না। বাংলায় যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয় তাহা অতি সত্বর কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়, এই প্রশ্ন বাংলার বাহিরেও উঠিয়াছে। বঙ্গীয় খাদ্য-পরিষদের সদস্যদিগের নিকট স্যার জ্বওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব এই রহস্যের উপর কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাৎ চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, অন্য প্রদেশের নিকট বাংলার জন্য খাদ্য চাহিতে গেলে এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইবে।

বাংলা গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রশ্ন তিনি করিয়াছিলেন কি না, কোন উত্তর পাইয়াছিলেন কি না, কিম্বা কি উত্তর পাইয়াছিলেন এবং সে-উত্তরে প্রশ্নকারী প্রদেশসমূহ সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি না, এসব সম্বন্ধে কিছুই আমরা জানি না। কিন্তু বাংলার বাহির হইতে খাদ্যশস্যের আমদানি সত্ত্বেও বাজারে কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে না।

গত ২৮শে আগষ্ট হইতে চাউলের মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বলবৎ হইয়াছে, কিন্তু সেই দিন হইতেই বাজারে চাউল অদৃশ্য। মিঃ সুহরাওয়ার্দ্দির হুসিয়ারী সত্ত্বেও বাজারে চাউল আর দৃশ্য হইতেছে না। ইহারই বা কারণ কি? বাজারে যদি নিয়ন্ত্রিত দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে মূল্যনিয়ন্ত্রণের সার্থকতা কি?

—

প্রতিবাদ, না স্বীকারোক্তি?

ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে, এই অভিযোগের প্রতিবাদে ভারত গবর্ণমেণ্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিবৃতিতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৯৪২-৪৩ সালে ভারত হইতে মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট এই রপ্তানিকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন না। কারণ ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারত হইতে ৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করা হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের প্রথম সাত মাসে খাদ্যশস্য রপ্তানির পরিমাণ ৯২ হাজার ১ শত ৩৭ টনের বেশী নয়।

১৯৩৭-৩৮ সনের অবস্থা যাহাই হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় এই পৌণে চারি লক্ষ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি যে প্রচুর রপ্তানি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় আছে কি? ভারত গবর্ণমেণ্টের এই প্রতিবাদকে স্বীকারোক্তি ছাড়া আর কিছু মনে হইতে পারে কি?

—

পোলার্ডের মামলার রায়

জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলা এবং মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পোলার্ডের আপীল শুনানীর জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি মিঃ খোন্দকার এবং বিচারপতি মিঃ লজকে লইয়া স্পেশ্যাল বেঞ্চ গঠিত হইয়াছিল। উকীল সত্যগোপাল মুখার্জ্জিকে প্রহার করার অভিযোগে মিঃ পোলার্ড যে দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন স্পেশ্যাল বেঞ্চ তাহা নাকচ করিয়া এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ফৌজদারী কার্য্যবিধির আইনের ১৯৭ ধারার বিধান অনুযায়ী গবর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে আর যেন কোন মামলা দায়ের করা না হয়। জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে মিঃ পোলার্ডের আচরণ সম্পর্কে তৎকালিন

প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব বহরমপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রধান বিচারপতির রায়ের যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখা যায়, "প্রধান বিচারপতির প্রবল সন্দেহ হয় যে, সেই হস্তক্ষেপের ফলে (হক সাহেবের পত্রে) জিয়াগঞ্জ মামলা ও পোলার্ডের মামলা উভয় মামলাই প্রভাবিত হইয়াছে।...তাঁহার মতে বিচারকার্য্যে অসঙ্গত হস্তক্ষেপের দরুণ দুইটি মামলা ই দণ্ডাদেশ নাকচ হওয়া উচিত।"

হক সাহেবের পত্র সম্বন্ধে আমরা সসম্মানে ইহা নিবেদন করিব যে, ঐ পত্র মিঃ পোলার্ডের মামলা সম্পর্কে লিখিত হয় নাই, লিখিত হইয়াছিল জিয়াগঞ্জ চাউল লুঠের মামলা সম্পর্কে। ঐ মামলার সরকারী তদ্বিরকারক হিসাবে মিঃ পোলার্ড যদি কিছু ত্রুটি করেন, তাহা হইলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই কি প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কর্ত্তব্য হইবে না? সরকার পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থিতের ত্রুটিতে সুবিচারে যাহাতে কোন বাধা না হয় তাহার শেষ দায়িত্ব কি স্বরাষ্ট্রসচিবেরই নয়? তিনি এই দায়িত্ব পালন না করিতেন, তবে কি স্বরাষ্ট্র-সচিব হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইত না? আমাদের আর একটি নিবেদন এই যে, মিঃ পোলার্ডের অভিপ্রায় অনুযায়ীই তাঁহার প্রথম আপীলের বিচার নদীয়ার দায়রা জজের এজলাসে হইয়াছিল। এবং তিনি মামলার দোষগুণ বিচার করিয়াই আপীল ডিস্‌মিস করেন। আমরা সসম্মানে ইহাও নিবেদন করিব যে, স্পেশ্যাল বেঞ্চের বিচারে মামলার দোষগুণের দিক দিয়া বিবেচনা করা হয় নাই। আমাদের সর্ব্বশেষ নিবেদন এই যে, মিঃ পোলার্ডের মামলার সহিত হক সাহেবের চিঠির কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়া তাঁহার পত্র সম্বন্ধে মন্তব্যের কোন সার্থকতা ছিল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না।

ফেডারেল কোর্টের রায়

কতিপয় রাজবন্দীর দরখাস্তের বিচারে কলিকাতা হাইকোর্ট সাব্যস্ত করেন যে, ভারতরক্ষা বিষয়ক ২৬নং বিধান বৈধ করিয়া যে নূতন অর্ডিনান্স জারী হইয়াছে তাহা বৈধ নহে। হাইকোর্টের ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বাংলা গবর্ণমেণ্ট ফেডারেল কোর্টে ৮টি আপিল দায়ের করেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতেও অনুরূপ ৭টি আপীল দায়ের হয়। ফেডারেল কোর্ট সাব্যস্ত করেন, ২৬ন[illegible] বৈধ করিয়া যে অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছে তা[illegible]বিধিসম্মত হইয়াছে, কিন্তু যে-পদ্ধতিতে আটক রাখা হইয়াছে তাহা বিধি সম্মত হয় নাই। ফেডারেল কোর্ট মন্তব্য করিয়াছেন, "এ সম্পর্কে যে বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে আমরা তাহার তীব্র প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।" তাঁহারা আরও মন্তব্য করেন "গ্রেফ্‌তারের বিষয়গুলির কোনটির সম্পর্কে গবর্ণর নিঃসন্দেহ হইয়াছেন (আদেশ দিবার সময় তো নহেই), এমন কি কোন অবস্থাতেই তিনি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহা প্রতীয়মান হয় [illegible]" ফেডারেল কোর্টের মন্তব্য হইতে ইহাই প্রতীয়মা[illegible]হইতেছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই শুধু ক্ষুণ্ণ হয় না[illegible] আইনের মর্য্যাদাও ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর

স্যার জন হার্ব্বার্ট গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় বিহারের গবর্ণর স্যার টামাস রাদারফোর্ড বাংলার অস্থায়ী গবর্ণর-রূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলার শো[illegible]নীয়তম অন্নাভাবের সময় তিনি বাংলার শাসন প[illegible]ন ভার গ্রহণ করিলেন। বাংলার অবস্থা তিনি অব[illegible] আছেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এক খোলা চিঠিতে তাঁহাকে বাংলার সমস্যার স্বরূপ জানাইয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি, তাঁহার শাসন-পরিচালনায় বাংলাদেশ এই অন্নাভাবের নিদারুণ পীড়ন হইতে মুক্তি পাইবে।

গল্প-প্রতিযোগিতা

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি বাংলা গল্প প্রতিযোগিতায় শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু লিখিত 'বালুচর' এবং শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায় লিখিত 'মর্ম্মর মূর্ত্তি' নামক গল্প দুইটি বিচারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বিচারক ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির, অমিয় চক্রবর্ত্তী এবং নীহাররঞ্জন রায়। প্রতিযোগিতার পুরস্কার একশত টাকা

লেখক এবং লেখিকাকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র-নারায়ণ রায় 'আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' নামক গল্পটির জন্য ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত কুড়ি টাকার একটি বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছেন। 'মাতৃভূমি'তে প্রকাশার্থ উপরোক্ত গল্প তিনটি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা যথাক্রমে আমাদের পাঠকদিগকে গল্প তিনটি উপহার দিব।

—

মহাযুদ্ধের পঞ্চম বর্ষ

৩রা সেপ্টেম্বর হইতে বিশ্বসংগ্রাম পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। চতুর্থ বৎসরের শেষ ভাগ হইতেই যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত হয়। উত্তর-আফ্রিকা হইতে জার্ম্মানী ও ইটালী বিতাড়িত হইয়াছে, মুসোলিনীর পতন হইল, মিত্রবাহিনী সিসিলি অধিকার করে এবং চতুর্থ বৎসর পূর্ণ হওয়ার দিনে ইটালীর মূলভূভাগ সম্মিলিত পক্ষের বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। অতঃপর ৮ই সেপ্টেম্বর ইটালী মিত্রশক্তির নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু মুসোলিনীর পতনের পরেও এই আত্মসমর্পণ দেড় মাস বিলম্ব হওয়ায় জার্ম্মান সৈন্যগণ উত্তর ও মধ্য ইটালী দখল করিয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে। অতঃপর জার্ম্মান প্যারাসুট সৈন্য, গোয়েন্দা পুলিশ এবং সশস্ত্র এস-এস বাহিনী মুসোলিনীকে মুক্ত করিয়াছে। এই দেড়মাস বিলম্বের জন্য মিত্রবাহিনীকে যুদ্ধ করিয়া ইটালীর জার্ম্মান-অধিকৃত অংশগুলিকে মুক্ত করিতে হইবে।

রুশরণাঙ্গনেও জার্ম্মানের পরাজয় ঘটিতেছে। রাশিয়া বেলগোরড, খারকভ, কারাবন, টাগানরগ, ইয়েলনিয়র দখল করিয়া কিয়েভ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। প্রাচীর রণক্ষেত্রেও মার্কিন বাহিনী কয়েকটি ক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছে। আত্তু, কিস্‌কা, এলুইশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, নিউ জর্জ্জিয়া দ্বীপ মুণ্ডার উড়োজাহাজ ঘাঁটি জাপানীদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। কুইবেক সম্মেলনে জাপানের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল স্থায়ী যুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যুদ্ধের গতি এখন সম্পূর্ণরূপে মিত্রশক্তির অনুকূলে। তবে জার্ম্মানী ও জাপানের শীঘ্রই পরাজয় ঘটিবে ইহা সকলে মনে করেন না।

—

পরলোকে শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু

বাংলার বিশিষ্ট মহিলা-কর্ম্মী, সাংবাদিক এবং সাহিত্য-সেবিকা শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু গত ১৫ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন, সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। তিনি স্বনামখ্যাত কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপযুক্ত কন্যা এবং স্বনামধন্য রাজনারায়ণ বসুর সুযোগ্যা দৌহিত্রী ছিলেন। স্বদেশীযুগে তিনি মহিলা-কর্ম্মীদের অগ্রণী ছিলেন। উত্তর স্বদেশীযুগে তাঁহার শিখের বলিদান একখানি বহুল প্রচারিত পুস্তক ছিল। তাঁহার সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকা তৎকালীন বাংলা সাময়িক পত্রিকা সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকা সম্পাদন করেন। তিনি নারী-সমিতি ও নারীকল্যাণ আশ্রমের সম্পাদিকা ছিলেন। বাংলার নারীজাতির উন্নতির জন্য তাঁহার অক্লান্ত নীরব শ্রম দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

—

পরলোকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র দেব

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব গত ১৫ই ভাদ্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা একজন একনিষ্ঠ প্রবীন কংগ্রেসসেবীকে হারাইল। জীবনে তিনি একনিষ্ঠার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে একজন সাধারণ স্বেচ্ছাসেবকরূপে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এক সময় তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন চরমপন্থী। বাংলার রাজনৈতিক দলাদলি সত্ত্বেও তিনি সকল দলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁহার দেশসেবার

একনিষ্ঠ আদর্শ প্রত্যেক বাঙ্গালী তরুণের অনুসরণীয়। আমরা তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

—

ভারতীয় সমস্যা ও আমেরিকা

ভারতের স্বাধীনতা দাবী সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও একটি মাত্র মত নাই। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থক আমেরিকাবাসী যেমন আছেন, তেমনি আমেরিকায় বৃটেনের ভারতীয় নীতির সমর্থকও আছেন। মার্কিন কংগ্রেসের রক্ষণশীল সদস্য মিঃ রবার্ট হিল এই শেষোক্ত দলের। তিনি আমেরিকাবাসীকে উপদেশ দিয়াছেন, "ভারতের প্রতি অবিচার হইতেছে একথা বলিও না। ইহা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। আমরা কি বৃটিশের পরামর্শ লইয়া ডেট্রয়েটের জাতিগত দাঙ্গার মীমাংসা করিতেছি? পোর্টরিকো সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের যে নীতি, তাহাতে কি ইংলণ্ড হস্তক্ষেপ করিতেছে? কোন রাষ্ট্রের তথাকথিত ক্ষতস্থানে হস্তক্ষেপ করা আন্তর্জ্জাতিক অংশীদারিত্বের উদ্দেশ্য নহে।" ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে মিঃ হিলের উক্তির মধ্যে যে মার্কিন মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়, আমেরিকায় তাহার প্রভাব বোধ হয় একেবারে সামান্য নয়। মিঃ ক্যাটেল মিচেল আমেরিকার 'নিউ রিপাবলিক' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, "বৃটেনের সহিত একমত হইয়া আমেরিকাও যেন ভাবিতেছে, ভারতবাসীকেই ভারতীয় সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।" তবে অন্য মতও যে আমেরিকায় আছে বিলাতের টয়েনবি হলের ওয়ার্ডেন ডাঃ জে, ম্যালনের মন্তব্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়। তিনি আমেরিকা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা যে সাম্রাজ্যবাদী এবং সামন্ততন্ত্রজাতি, এ-ধারণা আমেরিকাবাসীদের মজ্জাগত হইয়াছে।" অতঃপর তিনি আমেরিকাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটেন এবং ভারত একমত। তবে মুস্কিল এই যে, ভারতবাসীরা প্রতিনিধিমূলক এবং দায়িত্বসম্পন্ন এমন একটা প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারিতেছে না, যাহার হাতে ভারতের স্বাধীনতা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই ধরণের প্রচার-কার্য্যের ফল কিছু না কিছু ফলিয়া থাকেই।

কতক আমেরিকাবাসী মনে করেন, যুদ্ধের সময় ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে না। আপ্টন সিনক্লিয়ার এই দলের। তিনি বোম্বাইয়ের প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নিকট এক বাণীতে বলিয়াছেন, "ভারত যদি এখনই স্বাধীনতা চায় তবে ভুল করিবে।" তিনি ভরসা দিয়াছেন, যুদ্ধোত্তর গণতন্ত্র-সমূহ যখন শান্তিপূর্ণ জগৎ গঠন করিতে সমর্থ হইবে, তখন কার্য্যক্ষেত্রে কিছু সাফল্যের সম্ভাবনা লইয়া স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের নূতন পরীক্ষা সম্ভব হইবে।" কিন্তু প্রশ্ন এই যে, পরীক্ষায় পাশ-ফেলের বিচার করিবে কে? দ্বিতীয়তঃ, ভারত যুদ্ধের মধ্যেই পূর্ণ স্বাধীনতা চায় না, চাহিয়াছে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে। প্রকৃত সমস্যা এইখানেই। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের পক্ষে বৃটেন যেগুলিকে বাধা বলিয়া উল্লেখ করে, মিঃ মিচেল তাহা খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠনের জন্য বৃটেন আহ্বান করিলে কোন দলই তাহাতে যোগ দানে অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের শাসকবর্গ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। ঠাণ্ডাঘরে উহাকে তাঁহারা জীয়াইয়া রাখিতে চান, শ্রীযুক্ত রাজাজী এসম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আসলে ঠাণ্ডাঘরে রাজনৈতিক বিতর্ককে রুদ্ধ রাখা হইল না, একটি প্রয়োজনীয় সমরোপকরণই রুদ্ধ রাখা হইল।" তাঁহার এই উক্তি শুধু বৃটেনই নয়, আমেরিকার পক্ষেও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

—